প্রথম অধ্যায়

গোত্রকুল-পরিচয়

গোত্র-পরিচয়

শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র শাণ্ডিল্য গোত্রীয় বিপ্রসন্তান। গোত্র-প্রবর্তক মহর্ষি শাণ্ডিল্যদেবের সংক্ষিপ্ত পরিচয়-বৃত্তান্ত নিম্নে প্রদত্ত হইল।

ব্রহ্মার পুত্র বিরাট। বিরাটের পুত্র স্বায়ম্ভুব মনু। স্বায়ম্ভুব মনুর আট পুত্র—মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, ভৃগু, পুলহ, ক্রতু ও প্রচেতা।

মরীচির পত্নী কর্দম ঋষির কন্যা কলাবতী; অত্রির পত্নী দক্ষের কন্যা অনসূয়া দেবী; অঙ্গিরার পত্নী শুভা দেবী; পুলস্ত্যের পত্নী রাজর্ষি তৃণবৃন্দের কন্যা হবির্ভূ; পুলহের পত্নী কর্দম মুনির কন্যা গতি দেবী।

মরীচির পুত্র কশ্যপ। অত্রির পুত্র দুর্বাসা। অঙ্গিরার পুত্র দেবগুরু বৃহস্পতি। পুলস্ত্যের পুত্র বিশ্রবা। ভৃগু—ইনি ভৃগুবংশের আদি পুরুষ ও ধনুর্বিদ্যার প্রবর্তক; সৃষ্টিকর্তা বিষ্ণুর পত্নী লক্ষ্মী ইঁহার কন্যা এবং ভার্গব প্রভৃতি ইঁহার পুত্র। পুলহের পুত্র সহিষ্ণু। প্রচেতা—ইনি মানসিক অশান্তি নিবারণের জন্য দুঃস্বপ্ন বা অমঙ্গলনাশের উপায় সম্বন্ধে কতকগুলি ঋক্‌মন্ত্র রচনা করেন; ইঁহার পুত্র রুচি।

কশ্যপের পুত্র অসিত। অসিত ঋগ্বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি। ইঁহার পত্নীর নাম একপর্ণা। অসিতের পুত্র দেবল ও মহর্ষি শাণ্ডিল্য।

শাণ্ডিল্য গোত্রপ্রবর্তক ঋষি ও সর্বতত্ত্বার্থবিদ্‌ বলিয়া খ্যাত ছিলেন। বারেন্দ্র লাহিড়ী, রাঢ়ীয় বন্দ্যোপাধ্যায় এবং কুশারী প্রভৃতি বংশ এই শাণ্ডিল্য-ঋষি-গোত্রীয়।

পিতৃকুল-পরিচয়

শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের পিতৃকুল আভিজাত্য-গৌরবে সুবিশ্রুত। বঙ্গমাতার মুখোজ্জ্বলকারী বহু ক্ষণজন্মা মহাপুরুষ, কীর্তিমান রাজা-জমিদার ও বরেণ্য সন্তান এই কুল অলঙ্কৃত করিয়াছেন। বর্তমান অধ্যায়ের সংকীর্ণ অবকাশে এই বিশাল বংশের উপযুক্ত বিস্তৃত পরিচয়-প্রদান সম্ভবপর নয়। প্রসঙ্গানুরোধে অতি সংক্ষেপে ইহার কিঞ্চিৎ বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

এই বংশের পূর্বপুরুষ ক্ষিতীশপুত্র ভট্টনারায়ণ (১) হিমালয়ান্তর্গত

---

(১) ভট্টনারায়ণের পূর্বপুরুষ কবিব্যাস মহর্ষি বেদব্যাসতুল্য সুবিখ্যাত ব্যক্তি ছিলেন। কবিব্যাসের পুত্র বামদেব, বামদেবের পুত্র রামদেব, রামদেবের পুত্র ক্ষিতীশ, ক্ষিতীশের পুত্র ভট্টনারায়ণ—হরিমিশ্র প্রণীত—ব্রাহ্মণগণের সংক্ষিপ্ত পরিচয়ে ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়।

কান্যকুব্জের অধিবাসী ছিলেন। বঙ্গাধিপ আদিশূর ৯৯৯ সংবতে (২) তাঁহার পুত্রেষ্টিযজ্ঞে পৌরোহিত্য করিবার জন্য কান্যকুব্জাধীশ্বরের নিকট পঞ্চগোত্রের পাঁচজন সচ্চরিত্র সাগ্নিক বেদজ্ঞ ক্রিয়ানিপুণ ব্রাহ্মণ প্রার্থনা করিলে, কান্যকুব্জাধিপতি মহারাজ বীরসিংহ (জয়াদিত্য) অগ্রগণ্য পাঁচটি গোত্রের বিশিষ্ট বিদ্যাবুদ্ধিসম্পন্ন সৎক্রিয়াশালী বাক্‌সিদ্ধ মুনিবিশেষ পঞ্চ ব্রাহ্মণ (৩) এবং তাঁহাদের রক্ষণার্থ সদ্‌গুণসম্পন্ন পরমভক্ত পঞ্চগোত্রীয় পঞ্চ কায়স্থকে (৪) গৌড়ে (বর্ত্তমান উত্তরবঙ্গ বা মালদহ) প্রেরণ করিয়াছিলেন। উক্ত পঞ্চ ব্রাহ্মণের মধ্যে ভট্টনারায়ণ সর্বপ্রধান ছিলেন। বেদপারগ বিপ্র ভট্টনারায়ণ সুকবি বলিয়াও প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। 'বেণীসংহার'-নামক সুবিখ্যাত সংস্কৃত নাটক তাঁহারই রচিত। রাজপ্রদত্ত ব্রহ্মশাসন প্রাপ্ত হইয়া তিনি স্থায়িরূপে বঙ্গদেশে বাস করিতে থাকেন। ইঁনি শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের ঊর্দ্ধতন ঊনচত্বারিংশ পুরুষ।

ভট্টনারায়ণের এক পুত্র আদি গাঞি ওঝা খৃষ্টীয় নবম শতকের প্রথমভাগে বঙ্গেশ্বর-ধর্মপাল-কর্তৃক প্রদত্ত বরেন্দ্রভূমির অন্তর্গত 'ধামসার'-নামক গ্রাম প্রাপ্ত হইয়া তথায় বাস করেন। তাঁহা হইতে যে শাখা বিস্তার লাভ করিয়াছে, শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র তাহারই বংশধর।

ভট্টনারায়ণের অন্য এক পুত্র আদি বরাহ রাঢ় দেশের অন্তর্গত 'বন্দ্যঘাটি'

---

(২) আদিশূরো নবনবত্যধিকনবশতীমিতাব্দে পঞ্চ ব্রাহ্মণানানয়ামাস।
কৃষ্ণচন্দ্রচরিত। বিদ্যাসাগরকৃত বহুবিবাহ — পৃঃ ১৫।
(সম্বন্ধনির্ণয় – চতুর্থ সংস্করণ পৃঃ ১৩ পাদটীকা)

(৩) কনোজাগত সাগ্নিক পঞ্চমহর্ষির নামাদি যথা—

	মহর্ষির নাম	গোত্র	জীবিকার্থে বাসস্থান	অধুনাতন নাম
১।	ভট্টনারায়ণ	শাণ্ডিল্য	পঞ্চকোটি	পঞ্চকোট বা মানভূম
২।	শ্রীহর্ষ	ভরদ্বাজ	কংকগ্রাম	বাঙ্কুড়া (বাঁকুড়া)
৩।	দক্ষ	কাশ্যপ	কামকোটি	বীরভূম কামকোটি
৪।	বেদগর্ভ	সাবর্ণিক	বটগ্রাম	বর্দ্ধমান (বড়গ্রাম)
৫।	ছান্দড়	বাৎস্য	হরিকোট	মেদিনীপুর (হরিকুটী)
			গোপ	গোপ
			ব্রহ্মপুরী	

(৪) কায়স্থকুলতিলক পঞ্চকের মধ্যে কোন্ ব্যক্তি কাহার সঙ্গে আসিয়াছিলেন সে পরিচয় নিম্নে প্রদত্ত হইল। যথা—

	প্রভু	সেবক	গোত্র	কুল
১।	দক্ষ	দশরথ	গৌতম	বসু
২।	ভট্টনারায়ণ	মকরন্দ	সৌকালীন	ঘোষ
৩।	শ্রীহর্ষ	বিরাট বা দাশরথি	কাশ্যপ	গুহ
৪।	বেদগর্ভ	কালিদাস	বিশ্বামিত্র	মিত্র
৫।	ছান্দড়	পুরুষোত্তম	মৌদ্গল্য	দত্ত

(সম্বন্ধনির্ণয়—চতুর্থ সংস্করণ। পৃষ্ঠা—১৫, ১৬)

গ্রামে বাস করিয়া 'বন্দ্য' এবং পরে 'উপাধ্যায়'-সংযোগে 'বন্দ্যোপাধ্যায়' উপাধি ধারণ করেন। রাজা রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ, মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন সি. আই. ই., জাতীয় মহাসভার প্রথম সভাপতি উমেশচন্দ্র, বিচারপতি স্যার গুরুদাস, কবি হেমচন্দ্র ও রঙ্গলাল, অধ্যাপক জয়গোপাল প্রভৃতি বঙ্গের খ্যাতনামা ব্যক্তিগণ এই বংশের সন্তান।

ভট্টনারায়ণের আর এক পুত্র দীন বা কয় ওরফে নৃসিংহ রাঢ় দেশ বা বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত 'কুশ' বা 'কুশারী' গ্রামে বাস করিয়া 'কুশারী' উপাধি ধারণ করেন। জোড়াসাঁকো ও পাথুরিয়াঘাটার বিখ্যাত ঠাকুর-পরিবার এই শাখার অন্তর্গত। বিশ্ববিশ্রুত কবি রবীন্দ্রনাথ এই বংশের সন্তান।

ভট্টনারায়ণের অন্য এক পুত্র নৃপ বা নিপু রাঢ় দেশের অন্তর্গত 'কেশোর কোণা' গ্রামে বাস করিয়া 'কেশোরকুণি' পদবী প্রাপ্ত হন। নদীয়া রাজবংশের পূর্বপুরুষ রাজা কাশীনাথ রায় এই শাখার অন্যতম। নদীয়াধিপতি রাজা রাঘব, মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র, ক্ষৌণীশচন্দ্র রায় প্রভৃতি এই বংশজাত স্বনামধন্য পুরুষ।

পূর্বকথিত আদি গাঞি ওঝা হইতে উদ্ভূত শাখায় শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের উর্দ্ধতন এয়োবিংশ পুরুষ বিন্দুসাগরের এক পুত্র জয়সাগর রাজা বিজয়সিংহের রাজত্বকালে বরেন্দ্রভূমি (১) বা মালদহ জেলার অন্তর্গত পাবনায় বাস করিয়া 'বারেন্দ্র' নামে খ্যাত হন এবং অপর পুত্র মণিসাগর বরেন্দ্রভূমি হইতে রাঢ় দেশে আসিয়া তথায় রাঢ়ীয় সমাজে মিলিত হন এবং 'রাঢ়ী' বলিয়া পরিচিত হন।

জয়সাগরের এক পুত্র আদিমাধব বরেন্দ্রভূমির অন্তর্গত 'চম্পটী' গ্রামে বাস করেন। তাঁহার আর এক পুত্র মৌনভট্ট ওরফে মনু বরেন্দ্রভূমির অন্তর্গত 'নান্ন্যাসী' গ্রামে বাস করেন। ইঁহার অধস্তন অষ্টম পুরুষে বংশে জগদ্‌গুরু দিবাকর জন্মগ্রহণ করেন। তাহেরপুরের প্রাচীন রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা রাজা উদয় নারায়ণ ও রাজা কংসনারায়ণ এই শাখার অন্যতম। 'মনুসংহিতা'র সুপ্রসিদ্ধ টীকাকার পণ্ডিতকুলশিরোমণি কুল্লুকভট্ট খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে আবির্ভূত হইয়া উক্ত নান্ন্যাসী-বংশ অলংকৃত করিয়াছিলেন। পণ্ডিত কুল্লুকভট্ট তদীয় "মন্বর্থমুক্তাবলী"-টীকার উপক্রমণিকায় আত্মপরিচয় প্রদান-প্রসঙ্গে উল্লেখ করিয়াছেন যে, তিনি নন্দনবাসী (বর্তমান নান্ন্যাসী) নামক

---

(১) বল্লাল সেনের সময় পদ্মানদীর উত্তরে এবং করতোয়া ও কুশীনদীর মধ্যস্থ ভূভাগ রাজসাহী বরেন্দ্রভূমি এবং ভাগীরথীর পশ্চিম ও পদ্মার দক্ষিণ রাঢ়-ভূমি (বর্ধমান বিভাগ) বলিয়া পরিচিত ছিল।

সম্ভ্রান্ত বঙ্গ বারেন্দ্রী (বঙ্গদেশের রাজসাহী বিভাগ) কুলোদ্ভব দিবাকর ভট্টের পুত্র (১)।

পূর্বকথিত জয়সাগরের অন্য এক পুত্র স্বর্ণরেখ বরেন্দ্রভূমির অন্তর্গত 'সিহরী' গ্রামে বাস করিতেন। তাঁহার 'অচল' ও 'চল' নামে দুই পৌত্র ছিল। 'অচল' উত্তর এবং 'চল' দক্ষিণ বরেন্দ্রভূমিতে বাস স্থাপন হেতু যথাক্রমে উত্তর ও দক্ষিণ বারেন্দ্রী আখ্যায় অভিহিত হন।

জয়সাগরের অন্যতম পুত্র পীতাম্বর (শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের ঊর্ধ্বতন ষড়্বিংশ পুরুষ) একাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয় ভাগে বরেন্দ্রভূমির অন্তর্গত 'লাহিড়ী' গ্রামে বাস করেন।

জয়সাগরের প্রপৌত্র (শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের ঊর্ধ্বতন চতুর্বিংশ পুরুষ) বাৎস আচার্যের অন্যতম পৌত্র কালিসী বা কালিকা ওঝা রাজপ্রদত্ত 'বিশী' গ্রামে বাস করিয়া 'বিশী' পদবী ধারণ করেন। এই বংশে ষোড়শ শতাব্দীতে পিপড়া ওঝা জন্মগ্রহণ করেন। তিনি মোগল সম্রাট আকবরের অন্যতম সভাপণ্ডিত এবং অত্যন্ত ধর্মনিষ্ঠ ও দানশীল ছিলেন। সম্রাট তাঁহাকে অতিথিসেবার জন্য কয়েকটি ব্রহ্মোত্তর ভূমিসম্পত্তি দান করেন। তৎকালে তিনি 'পরইভিঙ্গী' গ্রামে অট্টালিকা, দেবালয় ও চতুষ্পাঠী প্রভৃতি নির্মাণ করিয়া বাস করেন। এই বংশের অন্যতম শম্ভুনাথ বিশী 'ওয়াটসন্ কোম্পানী'র কুঠীর তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন এবং তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র জয়নাথ বিশী একজন সুসাহিত্যিক ছিলেন। জয়নাথের রচিত 'দেবীযুদ্ধ', 'পদ্মপুরাণ' প্রভৃতি গ্রন্থ বাংলা সাহিত্যের সম্পদ্ স্বরূপ। বর্তমান খ্যাতনামা সাহিত্যিক শ্রীপ্রমথনাথ বিশী এই বংশের অন্যতম কৃতী সন্তান।

পূর্বকথিত পীতাম্বরের (শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের ঊর্ধ্বতন ষড়্বিংশ) পুরুষ) দুই পুত্র—সাধু ও রুদ্র মহারাজ বল্লাল সেনের প্রদত্ত কৌলীন্য ও ভূসম্পত্তি প্রাপ্ত হইয়া 'বাগছি' গ্রামে বাস করেন এবং 'বাগছি' আখ্যায় খ্যাত হন। ঋষি দীক্ষিত, হরিহর অগ্নিহোত্রী, দামোদর মিশ্র প্রভৃতি প্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণ সাধু বাগছি হইতে উদ্ভূত শাখার অন্তর্গত। এই শাখা হইতেই পুঁটিয়ার রাজবংশ আরম্ভ হইয়াছে। 'তারেঙ্গা'র 'চক্রবর্তী' বংশ রুদ্র বাগছির শাখার অন্তর্গত। কোচবিহারের প্রাক্তন ষ্টেট্-জজ ও 'ইণ্ডিয়ান্ নেটিভ্'-নামক ইংরাজী গ্রন্থের রচয়িতা রায় বাহাদুর যাদবচন্দ্র, ডাঃ শীতলচন্দ্র আই-এম্-এস্ প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ এই শাখার সন্ততি।

পীতাম্বরের অপর পুত্র লোকনাথ খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে মহারাজ বল্লাল সেনের প্রদত্ত কৌলীন্য-মর্যাদা প্রাপ্ত হইয়া 'লাহিড়ী' গ্রামে স্থায়িরূপে বসবাস হেতু 'লাহিড়ী' পদবী ধারণ করেন। লোকনাথ লাহিড়ী শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের ঊর্ধ্বতন পঞ্চবিংশ পুরুষ।

---

(১) "গৌড়ে নন্দনবাসিনাম্নি সুজনৈর্বন্দ্যো বরেন্দ্র্যাং কুলে
শ্রীমদ্ভট্টদিবাকরস্য তনয়ঃ কুল্লূকভট্টোঽভবৎ।"

শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের ঊর্দ্ধতন একবিংশ পুরুষ বল্লভাচার্য লাহিড়ী খৃষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীর শেষভাগে দেশবিখ্যাত পণ্ডিত কাশ্যপগোত্রীয় উদয়নাচার্য ভাদুড়ীর কন্যা লীলাবতী দেবীর পাণিগ্রহণ করেন এবং আপন ভগিনীকে উদয়নাচার্যের পুত্র পশুপতি ভাদুড়ীর সহিত বিবাহ দেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের ঊর্দ্ধতন সপ্তদশ পুরুষ মহামিশ্র একজন অসাধারণ বাগ্মী ও নৈয়ায়িক পণ্ডিত ছিলেন। 'মিশ্র' ইঁহার পাণ্ডিত্যের উপাধি। মহামিশ্রের ভ্রাতা নিত্যানন্দ মিশ্রও একজন বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন, পাণ্ডিত্যের জন্য ইনিও 'মিশ্র' উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। প্রাতঃস্মরণীয় মহাপুরুষ যোগিরাজ শ্যামাচরণ লাহিড়ী এই শাখার অন্যতম। ইনি ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দের ২৬শে সেপ্টেম্বর কাশীধামে দেহরক্ষা করেন। তাঁহার পূর্বপুরুষ (সম্ভবতঃ তাঁহার প্রপিতামহ রামবল্লভ) বরেন্দ্রভূমি ত্যাগ করিয়া নদীয়া জেলার 'ঘূর্ণি' (কৃষ্ণনগর) অঞ্চলে বাস করেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের ঊর্দ্ধতন ত্রয়োদশ পুরুষ ভবানন্দ আচার্যের অন্যতম পুত্র পদ্মগর্ভ আচার্য 'গীতাভাষ্য', 'দ্বাদশ উপনিষদ ভাষ্য', 'পৈঙ্গী রহস্য', 'ব্রাহ্মণ ভাষ্য' প্রভৃতি প্রসিদ্ধ গ্রন্থের রচয়িতা এবং 'ক্রমদীপিকা'র টীকাকার ছিলেন। পদ্মগর্ভের পুত্র পুরুষোত্তম আচার্য শ্রীচৈতন্যদেবের প্রিয় পার্ষদ ছিলেন। তিনি সন্ন্যাস-ধর্ম গ্রহণ করিয়া দামোদর গোস্বামী নামে খ্যাত হন। পদ্মগর্ভের অপর পুত্রের নাম লক্ষ্মীনাথ লাহিড়ী। কথিত আছে, শ্রীচৈতন্যদেব শ্রীহট্ট যাত্রাকালে ইঁহার আবাসে বিশ্রাম লাভ করিয়াছিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের ঊর্দ্ধতন নবম পুরুষ বাসুদেব লাহিড়ী একজন বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন। ইনিও পাণ্ডিত্যের জন্য 'মিশ্র' উপাধি লাভ করিয়াছিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের ঊর্দ্ধতন সপ্তম পুরুষ মনোহর (বাসুদেব মিশ্রের পৌত্র, শিবরাম লাহিড়ীর পুত্র) অষ্টাদশ খৃষ্টাব্দের প্রথম ভাগে পাণ্ডিত্যের শ্রেষ্ঠ উপাধি 'চক্রবর্তী' আখ্যাপ্রাপ্ত হন। কি সূত্রে এবং কাহার নিকট হইতে তিনি এই উপাধি লাভ করিয়াছিলেন, প্রচলিত কুলগ্রন্থে তাহার উল্লেখ নাই। তবে, বিভিন্ন পুরাতন বংশাবলী ও দলিলপত্র আলোচনায় মনে হয়, সম্ভবতঃ তাহেরপুর রাজসভা হইতে তিনি এই উপাধি পাইয়া থাকিবেন। মনোহর হইতে এতদ্বংশীয়েরা 'চক্রবর্তী' আখ্যায় পরিচিত হইয়া আসিতেছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের প্রপিতামহ ভবানীপ্রসাদ ঊনবিংশ খৃষ্টাব্দের শেষ-ভাগে বৈবাহিকতাসূত্রে পাবনা জিলার 'গোয়াখাড়া' গ্রামে আসিয়া বাস করেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের পিতামহ ঈশ্বরচন্দ্র চক্রবর্তী একজন বিশিষ্ট পণ্ডিত ছিলেন এবং তাঁহার বহু শিষ্য ছিল।

শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের পিতৃদেব শিবচন্দ্র চক্রবর্তী অতীব সজ্জন, ধর্মনিষ্ঠ, পরোপকারী ও বিচক্ষণ ব্যক্তি বলিয়া খ্যাত ছিলেন।

মাতৃকুল-পরিচয়

পিতৃকুলের ন্যায় শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের কাশ্যপ-গোত্রীয় মাতৃকুলও কৌলীন্য-মর্যাদায় সর্বত্র সুপরিচিত। যুগাবতার শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস, পূর্ণানন্দ গিরি পরমহংস, নাটোরের রাজা রামকান্তের পত্নী প্রাতঃস্মরণীয়া রানী ভবানী, সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র, কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র, কলিকাতা হাইকোর্টের ভূতপূর্ব বিচারপতি দিগম্বর চট্টোপাধ্যায়, ভূতপূর্ব হাইকমিশনার অতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, আই. সি. এস্., পাটনা হাইকোর্টের ভূতপূর্ব বিচারপতি অমরনাথ চট্টোপাধ্যায়, সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, মহামান্য পণ্ডিত প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ, মহামহোপাধ্যায় কামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ, ইংরাজী সাহিত্যের খ্যাতনামা অধ্যাপক হেরম্বচন্দ্র মৈত্রেয়, বিখ্যাত সাংবাদিক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, নাটোরের রাজা সুসাহিত্যিক জগদিন্দ্রনাথ রায়, ভাওয়ালের (ঢাকা) বিখ্যাত রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণ, সুসঙ্গের (ময়মনসিংহ) কীর্তিমান রাজা হরিরাম সিংহ, জয়পুর রাজ্যের ভূতপূর্ব রাজমন্ত্রী প্রভাসচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, কোচবিহারের ভূতপূর্ব রাজমন্ত্রী শিবপ্রসাদ বক্সী, বর্তমান জাতীয় অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি বহু স্বনামধন্য ব্যক্তি এই কাশ্যপ-কুলের মুখ উজ্জ্বল করিয়াছেন এবং তাঁহাদের অনেকের সহিত বহু প্রাচীন কাহিনী জড়িত রহিয়াছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের মাতৃবংশের ঊর্ধ্বতন পঞ্চত্রিংশ পুরুষ মহাত্মা দক্ষ (১) কান্যকুব্জের কুলাঞ্চল-নিবাসী ছিলেন। বঙ্গাধিপ আদিশূর কর্তৃক তদীয় পুত্রেষ্টিযাগে গৌড়ে আনীত সাগ্নিক পঞ্চ ব্রাহ্মণের অন্যতম ছিলেন কাশ্যপ-গোত্রীয় মহাত্মা দক্ষ।

শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের মাতৃকুলের ঊর্ধ্বতন অষ্টাবিংশ পুরুষ স্বর্ণরেখ হইতে 'বারেন্দ্র' শ্রেণী এবং তদীয় ভ্রাতা ভবদেব হইতে 'রাঢ়ী' শ্রেণীর প্রবর্তন হয়।

কথিত আছে, শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের মাতৃকুলের ঊর্ধ্বতন হড়বিংশ পুরুষ গরুড়কে দত্তক-পুত্র দেওয়া হয় এবং ইঁহার সময়েই এ দেশে সর্বপ্রথম দত্তক-প্রদান-প্রথার প্রচলন হয়। গরুড়ের কৈতেই (ক্রতু) ও মৈতেই (মৈত্রেয়) নামে দুই ভ্রাতা ছিলেন। মহারাজ বল্লাল সেনের প্রবর্তিত কৌলীন্য প্রথামতে কৈতেই—ক্রতু হইতে 'ভাদুড়ী' কুলীন এবং অপর ভ্রাতা মৈতেই—মৈত্রেয় হইতে 'মৈত্র' কুলীন উপাধির উদ্ভব হয়। শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের ঊর্ধ্বতন

---

(১) মহাত্মা দক্ষের পূর্বপুরুষের পরিচয়, যথা—বীতরাগের পুত্র সুষেণ মুনি, সুষেণ মুনির পুত্র ব্রহ্ম ওঝা, ব্রহ্ম ওঝার পুত্র দক্ষ।

ত্রয়োবিংশ পুরুষ যোগেশ্বর 'ভাদ্ড়ী-গাঞী' এবং অপর ভ্রাতা দিবাকর 'করজ-গাঞী' ছিলেন। (১)

শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকুলচন্দ্রের মাতৃবংশের ঊর্ধ্বতন অষ্টাদশ পুরুষ স্বনামধন্য পণ্ডিত উদয়নাচার্য ভাদ্ড়ী খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতাব্দীতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। ইনি ইতিহাস-প্রসিদ্ধ কুল্লুকভট্টের সমসাময়িক ছিলেন। সম্বন্ধ-নির্ণয় গ্রন্থে উক্ত হইয়াছে, উদয়নাচার্য রাজসাহী জিলার অন্তর্গত 'নিসিন্দা' গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। কাহারও কাহারও মতে ঢাকা জিলার 'বালিয়াটি' গ্রামে তাঁহার বাসস্থান ছিল। তিনি একজন অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। উদয়ন কাশীধামে গমন করিয়া পণ্ডিত কুল্লুকভট্টের নিকট দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। কাশীপ্রবাসকালে উদয়নাচার্য 'কুসুমাঞ্জলি'-নামক গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। ঐ সময় তিনি 'কিরণাবলী', 'আত্মতত্ত্ব-বিবেক', কণাদসূত্রের টীকা প্রভৃতি আরও বহু প্রসিদ্ধ গ্রন্থাদি রচনা করিয়াছিলেন। দর্শনশাস্ত্রে অসাধারণ মনস্বিতার জন্য উদয়ন পণ্ডিতকুলের চিরনমস্য হইয়া আছেন। কথিত আছে, তিনি জীবন পণ করতঃ বৌদ্ধাচার্য জিনাণীর সহিত বিচারে প্রবৃত্ত হইয়া তাঁহাকে পরাভূত করিয়াছিলেন। তাঁহারই উদ্যোগে কুলীনদিগের মধ্যে 'পরিবর্ত মর্যাদা' (২) ও 'করণ' এবং শ্রোত্রীয়দিগের মধ্যে 'ফোটা' ব্যবস্থাপিত হইয়াছিল। উদয়ন স্বয়ং এই কার্যে অগ্রবর্তী হইয়া লীলাবতী নাম্নী আপন বিদুষী দুহিতাকে শাণ্ডিল্য-গোত্রীয় বল্লভাচার্য লাহিড়ী (শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকুলচন্দ্রের পিতৃকুলের ঊর্ধ্বতন একবিংশ পুরুষ) নামক প্রখ্যাত কুলীনের সহিত বিবাহ দেওয়া উপলক্ষে 'পরিবর্ত মর্যাদা' ও 'করণ' সৃষ্টি করিয়াছিলেন। ইনি কুলশাস্ত্র-সংগ্রহও সংস্থাপন করিয়াছিলেন। কথিত আছে, উদয়নাচার্য পুরীধামে গমন করিলে স্থানীয় সম্ভ্রান্ত পাণ্ডাগণ মাল্যচন্দনাদি দ্বারা অর্চনা করতঃ এই যশস্বী পণ্ডিতকে সম্বর্ধনা জানাইয়াছিলেন।

---

(১) মহারাজ আদিশূর ভট্টনারায়ণ প্রভৃতি যে পঞ্চ ব্রাহ্মণকে কান্যকুব্জ হইতে আনয়নপূর্বক বঙ্গদেশে স্থাপিত করিয়াছিলেন, তাঁহাদের সন্তান-সন্ততিগণের মধ্যে যাঁহারা বরেন্দ্রভূমিতে বাস করিতেন, তাঁহাদের একশত পরিবারকে রাজা বল্লাল সেন বসবাসের জন্য একশত গ্রাম দান করেন। তাহাতেই উক্ত একশত পরিবারের ভিন্ন ভিন্ন 'গ্রামীণ' বা 'গাঞী' সংজ্ঞা হয়। এতদ্ভিন্ন রাঢ় দেশে উক্ত পঞ্চ ব্রাহ্মণের যে সকল বংশধরেরা বাস করিতেন, তাঁহাদের ছাপ্পান্নটি পরিবারকেও তিনি ছাপ্পান্নটি গ্রাম দান করিয়াছিলেন। সেজন্য তাঁহারাও উপর্যুক্তরূপে 'গ্রামীণ' বা 'গাঞী' সংজ্ঞা প্রাপ্ত হন। বরেন্দ্রভূমির একশত পরিবারের গাঞী-সংখ্যা নিম্নোক্তরূপে হইয়াছিল।—কাশ্যপ গোত্রে অষ্টাদশ গাঞী, শাণ্ডিল্য গোত্রে চতুর্দশ গাঞী, বাৎস্য গোত্রে চতুর্বিংশতি গাঞী, ভরদ্বাজ গোত্রে চতুর্বিংশতি গাঞী এবং সাবর্ণিক গোত্রে বিংশতি গাঞী—সর্বমোট একশত বরেন্দ্র গাঞী।

(২) কাশ্যপ-গোত্রীয় মদন ওঝা (করজ গাঞী) একজন অতি প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ও ক্ষমতাশালী মধ্যস্থ ব্যক্তি ছিলেন। কথিত আছে, তাঁহার সহায়তা নিবন্ধন উদয়নাচার্য ভাদ্ড়ী বারেন্দ্র-কুলের পরিবর্ত-প্রবর্তনে সমর্থ হইয়াছিলেন। —সম্বন্ধনির্ণয় ৩য় পরিশিষ্ট ১ম খণ্ড

ময়মনসিংহের মহারাজ শশিকান্ত আচার্যচৌধুরী, গৌরীপুরের জমিদার ব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, নাটোরের মহারাজ জগদিন্দ্র রায়, হরিপুরের জমিদার-বংশীয় বিচারপতি আশুতোষ চৌধুরী, খ্যাতনামা সাহিত্যিক ও ব্যারিষ্টার প্রমথ চৌধুরী ও ভারতীয় স্থল-সেনার অধিনায়ক মেজর জেনারেল জয়ন্ত চৌধুরী, তাহেরপুরের রাজবংশের রাজা বীরেশ্বর, চন্দ্রশেখর শশিশেখরেশ্বর রায়, প্রভৃতি খ্যাতনামা ব্যক্তিগণ কাশ্যপগোত্রীয় পণ্ডিত উদয়নাচার্যের বংশধর।

শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের মাতৃকুলের ঊর্ধ্বতন অষ্টম পুরুষ মোহনবল্লভ ভাদুড়ী ব্রহ্মচর্য-ধর্ম গ্রহণপূর্বক কাশীধাম যাত্রাকালে পথিমধ্যে হরিপুর গ্রামে উমানন্দ নিয়োগী মহাশয়ের গৃহে অতিথি হন। নিয়োগী মহাশয়ের একটি বয়ঃস্থা কন্যা ছিল। দুহিতাটিকে মোহনবল্লভের হস্তে সম্প্রদান করতঃ কন্যাদায় হইতে উদ্ধার পাওয়ার জন্য নিয়োগী মহাশয় সনির্বন্ধ প্রার্থনা নিবেদন করিলে, মোহনবল্লভ তাহা রক্ষা না করিয়া পারিলেন না। মোহনবল্লভের এই করণে তাঁহা হইতে এই বংশে 'কাপে'র সৃষ্টি হইল। মোহনবল্লভ অতঃপর সাঁতালের রাজা রামকৃষ্ণের নিকট হইতে নাজিরপুর পরগণা প্রাপ্ত হইয়া নাজিরপুর গ্রামের পার্শ্ববর্তী (পাবনার ভূতপূর্ব স্টীমার ষ্টেশন বাজিতপুর-ঘাটের অন্তঃপাতী, পাবনা সহরের নিকটবর্তী) হিমাইতপুর গ্রামে বসতি স্থাপন করেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের মাতৃকুলের ঊর্ধ্বতন ষষ্ঠপুরুষ রামজীবনের জ্যেষ্ঠভ্রাতা চন্দ্রশেখর ঢাকার নবাব-সরকারে মুন্সীর কার্য করিয়া সম্মানজনক 'চৌধুরী' উপাধি লাভ করেন। তদবধি হিমাইতপুর গ্রামের এতদ্বংশীয়েরা 'চৌধুরী' আখ্যায় পরিচিত হইয়া আসিতেছেন।

বহুকাল পূর্বের কথা। হিমাইতপুর গ্রামে কমলাকান্ত বাগচি নামে জনৈক নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। ইনি শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের জননীদেবীর মাতামহ। ইঁহার পত্নী কৃপাময়ী দেবী ছিলেন অতীব ভক্তিমতী নারী। তাঁহার অমায়িক ব্যবহারে গ্রামবাসী সকলে মুগ্ধ ছিলেন এবং তাঁহাকে অন্তরের সহিত শ্রদ্ধাভক্তি করিতেন। নামধ্যান ও পূজার্চনাদি লইয়াই কৃপাময়ী রাত্রিদিন ব্যাপৃত থাকিতেন। গৃহদেবতা রাধামদনমোহন-বিগ্রহের চরণে আত্মনিবেদনপূর্বক তিনি সংসারের দৈনন্দিন সকল কর্ম নির্বাহ করিতেন। দেবী কৃপাময়ীর এরূপ একটি স্বভাবসুলভ সহজ অভ্যাস ছিল যে, উঠিতে বসিতে, চলিতে ফিরিতে—সকল অবস্থায়ই তাঁহার মুখে অবিরাম 'হরিবোল' 'হরিবোল' নাম উচ্চারিত হইত। এজন্য গ্রামবাসী আবালবৃদ্ধবনিতা সকলে তাঁহাকে 'হরিবোলা বাগচি মা' বলিয়া ডাকিত। কৃপাময়ী দেবীর সরল ধর্মবিশ্বাসের বহু অপূর্ব কাহিনী এখনও লোকমুখে শুনিতে পাওয়া যায়।

কৃপাময়ী দেবীর চারিটি সন্তান হইয়াছিল। তন্মধ্যে প্রথম—পুত্র কেশব, দ্বিতীয়—কন্যা উমাসুন্দরী, তৃতীয়—পুত্র হরনাথ এবং চতুর্থ—কন্যা কৃষ্ণসুন্দরী। কৃপাময়ী দেবী বিধবা হইবার পর কন্যা কৃষ্ণসুন্দরীকে দ্বাদশবর্ষ বয়ঃক্রমকালে

কদগ্রামনিবাসী কাশ্যপ-গোত্রীয় রামেন্দ্রনারায়ণ ভাদুড়ী চৌধুরীর (শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের মাতামহ) সহিত বিবাহ দিয়াছিলেন। কৃষ্ণসুন্দরী দেবী ছিলেন রামেন্দ্রনারায়ণের দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী। প্রথমা পত্নী নিঃসন্তানা ছিলেন বলিয়া রামেন্দ্রনারায়ণ দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করিয়াছিলেন। কৃষ্ণসুন্দরীর গর্ভে রামেন্দ্রনারায়ণের তিন পুত্র ও তিন কন্যার জন্ম হয়। তন্মধ্যে রামেন্দ্রনারায়ণের জীবদ্দশায় প্রথম ও তৃতীয় সন্তান—দুই পুত্র শৈশবেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়। অপর চারি সন্তান—কন্যা নিস্তারিণী দেবী, মনোমোহিনী দেবী ও গোবিন্দমণি দেবী এবং পুত্র যোগেন্দ্রনারায়ণ। তন্মধ্যে কৃষ্ণসুন্দরী দেবীর জীবিতাবস্থায় নিস্তারিণী দেবী চল্লিশ বৎসর বয়সে এবং যোগেন্দ্রনারায়ণ (লোহা) ষোড়শ বর্ষ বয়সে পরলোকগমন করেন।

রামেন্দ্রনারায়ণ অতীব সদাচারী ও সাত্ত্বিক প্রকৃতির লোক ছিলেন। তিনি আজীবন নিরামিষ-ভোজনে অভ্যস্ত ছিলেন। আপন সন্তানদিগকেও তিনি কখনও মৎস্য-মাংস আহার করিতে দিতেন না। দিবসের অধিকাংশ সময় তাঁহার নামধ্যান ও সদ্‌গ্রন্থাদি-পাঠে অতিবাহিত হইত। গরীব-দুঃখীদিগকে মুক্তহস্তে দান করা তাঁহার চরিত্রের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল। শুনিতে পাওয়া যায়, অত্যধিক দানদক্ষিণাদি করিবার ফলে, আপন জীবদ্দশায়ই তাঁহার বহু বিষয়-সম্পত্তি নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। রামেন্দ্রনারায়ণ ছিলেন একজন সত্যনিষ্ঠ তেজস্বী পুরুষ। কথিত আছে, সমাজপতিগণের ঘোর বিরোধিতা সত্ত্বেও তিনি হিতবুদ্ধিপ্রণোদিত হইয়া কয়েকটি অনুলোম অসবর্ণ বিবাহ দিয়াছিলেন। এইজন্য সমাজের লোক তাঁহাকে এক-ঘরে করিলে, তিনি সর্বদাই দৃঢ়তার সহিত স্বীয় আচরণ সমর্থনপূর্বক নির্ভীক চিত্তে প্রচার করিতেন,—'যাক, সব ব্যাটারাই এক-ঘরে হয়ে গেল'।

রামেন্দ্রনারায়ণ একজন কৃতবিদ্য ও বিচক্ষণ ব্যক্তি ছিলেন। বাংলা, সংস্কৃত, ইংরাজী ও পারসী ভাষায় তাঁহার যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি ছিল। তিনি প্রথম জীবনে সিভিল কোর্টে আমীনের, পরে কিছুকাল পুলিশ-বিভাগে ইন্‌স্‌পেক্টারের এবং সর্বশেষে কোচবিহার স্টেটে ম্যানেজার-পদের গুরুদায়িত্ব পালনে বিশেষ যোগ্যতার পরিচয় দিয়াছিলেন। কি স্বভাব-চরিত্র, কি বিদ্যাবুদ্ধি, কি কর্মকুশলতা, কি ধনৈশ্বর্য ও প্রভাব-প্রতিপত্তি সর্ববিষয়েই তৎকালে তদঞ্চলে তিনি একজন খ্যাতিমান পুরুষ ছিলেন।

রামেন্দ্রনারায়ণ ১২৯০ বঙ্গাব্দে এবং তদীয় পত্নী কৃষ্ণসুন্দরী দেবী ১৩৩২ বঙ্গাব্দের পৌষ-সংক্রান্তি দিবসে ইহধাম ত্যাগ করেন। রামেন্দ্রনারায়ণ মৃত্যুর কয়েক বৎসর পূর্বে তাঁহার অতি আদরের কন্যা নবম বর্ষীয়া মনোমোহিনী দেবীকে পাবনা জিলার গোয়াখাড়া-নিবাসী শাণ্ডিল্য-গোত্রীয় শিবচন্দ্র চক্রবর্তীর সহিত বিবাহ দেন। শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র এই দম্পতির সর্বপ্রথম সন্তান।

দ্বিতীয় অধ্যায়

জনক শিবচন্দ্র

চাটমোহর পাবনা জিলার অন্তর্গত একটি প্রাচীন গ্রাম। ষোড়শ শতাব্দীরও বহু পূর্বের অনেক পুরাতন মন্দির, মসজিদ, দীর্ঘিকা প্রভৃতি অদ্যাপি এস্থানে বিদ্যমান আছে। ঈশ্বরদি-জংসন রেল ষ্টেশন হইতে ষোল মাইল দূরে বড়াল নদীর তীরে এই গ্রামটি অবস্থিত। ইহা একটি প্রসিদ্ধ ব্যবসায়-কেন্দ্রও বটে। চাটমোহর পোষ্টাপিসের অধীন গোয়াখাড়া গ্রামে ১২৬২ বঙ্গাব্দে শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের পিতৃদেব শিবচন্দ্র চক্রবর্তীর জন্ম হয়। শিবচন্দ্রের পূর্বপুরুষের বাস্তুভিটা ছিল চাটমোহরের নিকটবর্তী গুণাইগাছি গ্রামে। পাবনা জিলার অন্তর্গত দুলাই পোষ্টাপিসের অধীন কলাগাচি গ্রামে ছিল তাঁহার মাতুলালয়।

শিবচন্দ্রের পিতার নাম পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র চক্রবর্তী, জ্যেষ্ঠতাতের নাম হরেশ্বর চক্রবর্তী ও মাতার নাম মৃন্ময়ী দেবী। শিবচন্দ্রের সাত-আট বৎসর বয়ঃক্রমকালে তাঁহার পিতৃদেব এবং পনর-ষোল বৎসর বয়সে তাঁহার মাতৃদেবী স্বর্গারোহণ করেন। বাল্যকালে শিবচন্দ্র গোয়াখাড়ার নিকটবর্তী ভারেঙ্গা মধ্য-ইংরাজী বিদ্যালয়ে বিদ্যাভ্যাস করিয়াছিলেন।

শিবচন্দ্র যৌবনে পাবনা-সহরে তাঁহার মাসতুতো ভ্রাতা স্থানীয় ফৌজদারী আদালতের তদানীন্তন হেড্‌ক্লার্ক গোবিন্দচন্দ্র চক্রবর্তী মহাশয়ের বাসায় থাকিয়া কর্মজীবন আরম্ভ করেন। তৎকালে তিনি পাবনা ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডে কন্‌ট্রাক্টরের কার্য করিতেন। ইহাতে তাঁহার প্রচুর উপার্জন হইত। এই সময় চব্বিশ বৎসর বয়সে ১২৮৬ বঙ্গাব্দের ১৩ই অগ্রহায়ণ তারিখে ইঁনি পাবনা হিমাইতপুরের জমিদার কাশ্যপ-গোত্রীয় রামেন্দ্রনারায়ণ ভাদুড়ী চৌধুরীর কন্যা মনোমোহিনী দেবীকে বিবাহ করেন। পরিণয়কার্য নিষ্পন্ন হইবার পর শিবচন্দ্র নিজেই পাবনা-সহরে পৃথক বাসা করিয়া সপরিবারে বাস করিতে থাকেন।

শিবচন্দ্রের বিবাহের প্রায় চারি বৎসর পর তাঁহার শ্বশুর রামেন্দ্রনারায়ণের পরলোকগমন ঘটে। ইহাতে শ্বশ্রূ কৃষ্ণসুন্দরী আপন সংসারের দায়িত্ব লইয়া বড়ই বিব্রত হইয়া পড়েন। শত্রুপক্ষ সরিকগণ এই সময় সুযোগ পাইয়া কৃষ্ণসুন্দরীকে বঞ্চনা করিবার অভিপ্রায়ে তাঁহার বিরুদ্ধে নানা মিথ্যা মামলা-মোকদ্দমা দায়ের করিতে আরম্ভ করেন। এই অবস্থায় বিষয়-সম্পত্তি রক্ষার জন্য নানাভাবে অর্থব্যয়ে তিনি দিন দিনই দেনাদায়গ্রস্ত হইয়া পড়িতে থাকেন। স্বর্গগত শ্বশুর মহাশয়ের ত্যক্ত সম্পত্তি এইভাবে নষ্ট হওয়ার উপক্রম হইলে, ইহার রক্ষণাবেক্ষণের গুরুদায়িত্ব স্বতই জামাতা শিবচন্দ্রের উপর পতিত হইল। শিবচন্দ্র প্রথমতঃ নিজ পরিবার ও তাঁহার শ্বশুর-সংসারের বিষয়কর্মাদি

একই সঙ্গে পরিচালনা করিবার সংকল্প করিলেন এবং কিছুকাল সেভাবেই যথাসাধ্য চেষ্টাও চালাইলেন। কিন্তু তাঁহার একার পক্ষে এই বিপুল কর্তব্যভার বহন করা অসম্ভব হইয়া পড়িল। এই অবস্থায় আত্মীয়-স্বজনের পরামর্শ এবং শ্বশ্রূঠাকুরাণীর সনির্বন্ধ অনুরোধে শিবচন্দ্র গোয়াখাড়ার নিজ সংসার ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইলেন। অতঃপর তিনি বঙ্গাব্দ ১২৯৭ সাল হইতে হিমাইতপুরে শ্বশুরালয়েই নিয়তরূপে বাস করিতে লাগিলেন। এই সময় তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র অনুকূলচন্দ্রের বয়ঃক্রম দুই বৎসর পূর্ণ হইয়াছে।

সরিকগণের চক্রান্তে রামেন্দ্রনারায়ণের যে-সকল সম্পত্তি কোর্টের নিলামে পরহস্তগত হইয়া গিয়াছিল, শিবচন্দ্র এইবার সে-সমুদয়ের পুনরুদ্ধারের জন্য বদ্ধপরিকর হইলেন। বুদ্ধি, শ্রম ও স্বোপার্জিত অর্থ দ্বারা তিনি ক্রমে ক্রমে হৃত সম্পত্তি-সমূহের অধিকাংশই স্বাধিকারে আনিতে সমর্থ হইলেন। তাঁহার অদম্য চেষ্টায় অত্যল্পকালের মধ্যেই হিমাইতপুরের সংসারের প্রভূত উন্নতি সাধিত হইল। তৎকালে তিনি প্রায় শতাধিক বিঘা খামারজমি এবং বহু প্রজাবিলি সম্পত্তির মালিক হইয়াছিলেন। আপন সংসারের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি দেখিয়া এবং সর্বক্ষণ জামাতার অপরিসীম সশ্রদ্ধ সেবাযত্ন পাইয়া কৃষ্ণসুন্দরী পরম সুখে ও শান্তিতে কাল কাটাইতে লাগিলেন।

জ্যেষ্ঠপুত্র অনুকূলচন্দ্রের চারি-পাঁচ বৎসর বয়ঃক্রমকালে শিবচন্দ্র একবার কঠিন রোগে আক্রান্ত হইয়া একাদিক্রমে কয়েক বৎসর শয্যাগত অসুস্থ ছিলেন। এই অবস্থায় অর্থোপার্জনে সম্পূর্ণ অশক্ত হইয়া পড়িলে, সংসারের অভাব-অনটন এবং তদুপরি সরিকগণের দুরভিসন্ধিমূলক মামলা-মোকদ্দমার চাপে পরিবার-পরিজন লইয়া তিনি বড়ই বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন। দৈবানুগ্রহে দুর্দৈবের অবসান ঘটিলে, শিবচন্দ্র পুনরায় পূর্ণ উদ্যমে কর্ম করিয়া অচিরকাল মধ্যেই সংসারের সর্বপ্রকার শ্রীবৃদ্ধি-সাধন ও শান্তি-শৃঙ্খলা বিধানে সমর্থ হইয়াছিলেন।

শিবচন্দ্রের চাকুরি-জীবনের কথা। ময়মনসিংহ-গোলকপুরের জমিদার-পত্নী রানী অমৃতসুন্দরী দেবী আত্মীয়তা-সূত্রে মনোমোহিনী দেবীর পিতৃষ্বসা ছিলেন। তাঁহারই স্টেটে শিবচন্দ্র নানাস্থানে ম্যানেজারের পদে বহুকাল কার্য করিয়াছিলেন। ১৩০১ বঙ্গাব্দে তিনি সর্বপ্রথম উক্ত স্টেটের ময়মনসিংহ সদর-কাছারির ভার গ্রহণ করেন। ময়মনসিংহ হইতে তিনি সুন্দরপুর এবং পরে সুন্দরপুর হইতে ১৩০৩ বঙ্গাব্দে ঢাকা জিলার অমিরাবাদ-কাছারিতে বদলি হন। অমিরাবাদে তিনি একাদিক্রমে প্রায় বার বৎসর কাল কাজ করিয়াছিলেন। তাঁহার সুদক্ষ পরিচালনায় এই কাছারির প্রভূত উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। এজন্য তদঞ্চলের সর্বত্র তাঁহার সুখ্যাতি ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। প্রজাগণ তাঁহার নিকট পিতৃসুলভ অপার স্নেহমমতা লাভ করিয়া পরম সুখে বাস করিত। তাঁহার সদয় ব্যবহারের জন্য সকলে তাঁহাকে অন্তরের সহিত শ্রদ্ধাভক্তি করিত। মনোমোহিনী

দেবীর নিকট শুনিয়াছি, তাঁহারা যখই উক্ত কাছারিতে উপস্থিত হইতেন, প্রতিবারই প্রজাগণ তাঁহাদের অভ্যর্থনার জন্য বিপুল আয়োজন করিত। এই উপলক্ষে শত শত লোক ঢাল, তলোয়ার, বন্দুক ও লগুড় হস্তে স্টীমার-ঘাটে শ্রেণীবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান থাকিয়া দামামা-বাদ্য ও জয়ধ্বনি সহকারে তাঁহাদিগকে স্বাগত জানাইত এবং তীরে অবতরণমাত্র প্রজাগণ তাঁহাদের উভয়কে প্রণামী প্রদান করিত। শিবচন্দ্র যতদিন এই কাছারিতে কার্য করিয়াছিলেন, প্রজাগণ প্রায়শই নানা উপলক্ষে তাঁহাকে বহু নগদ অর্থ ও মূল্যবান দ্রব্যাদি উপঢৌকন দিয়া তাহাদের আন্তরিক শ্রদ্ধা নিবেদন করিত। কথিত আছে, একবার প্রজাগণ দেড়হাজার টাকার একটি তোড়া সেলামি দিয়া শিবচন্দ্রকে বিশেষভাবে অভিনন্দিত করিয়াছিল।

শিবচন্দ্র অতীব বিচক্ষণ ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার বিষয়-বুদ্ধি কিরূপ তীক্ষ্ণ ও প্রখর ছিল, কুচক্রী সরিকগণের সহিত তিনি যেভাবে মামলা-মোকদ্দমায় জয়লাভ করিয়াছিলেন, তাহাতেই বেশ বুঝিতে পারা যায়। এ সম্পর্কে একটি ঘটনার উল্লেখ করা যাইতে পারে। শিবচন্দ্রের সরিকগণ তাঁহার ভদ্রাসন-বাটীর কতক জমি বহুকাল বেদখল করিয়া রাখিয়াছিলেন। এজন্য বহির্বাটী হইতে তাঁহার অন্দরমহলে যাইতে বেশ কিছুটা দীর্ঘ ঘোরাল পথ অতিক্রম করিতে হইত। তাহা ছাড়া, তাঁহাকে নানাভাবে আরও বহু অসুবিধা ভোগ করিতে হইত। শিবচন্দ্র কোনদিনই পরাজয় স্বীকার করিবার পাত্র ছিলেন না। এই বেদখলী ভূমিতে স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য শিবচন্দ্র বহু অর্থ ব্যয়ে দীর্ঘকাল ধরিয়া বাটোয়ারা মামলা চালাইয়া ছিলেন। এজন্য তিনি বৃদ্ধবয়সেও অনেক সময় দীর্ঘ আড়াই মাইল পথ পদব্রজে পাবনায় গিয়া স্বয়ং মোকদ্দমার তদ্বির করিতেন। পরাক্রান্ত সরিকগণের অত্যাচার নীরবে সহ্য করতঃ দীর্ঘকাল ধরিয়া মোকদ্দমা পরিচালনা করিয়া তিনি অবশেষে তাহাতে জয়লাভ করিয়াছিলেন। উক্ত বেদখলী ভূমি ফিরিয়া পাওয়ায়, তাঁহার ভদ্রাসন বাটীখানা পদ্মাতীর পর্যন্ত বহুদূর প্রসারিত হইয়া এক বিরাট কলেবর ধারণ করিয়াছিল। আপন বসতবাটীর এই সুবিস্তৃত ও সুরম্য ভূমিখণ্ডের উপরেই ঠাকুর অনুকূলচন্দ্র পরবর্তীকালে তাঁহার সাধের সৎসঙ্গ প্রতিষ্ঠানটির পত্তন করিয়াছিলেন।

লোকের মনোবৃত্তি বুঝিয়া চলিবার অসাধারণ ক্ষমতা ছিল শিবচন্দ্রের। দুষ্ট প্রকৃতির লোকেরা যাহাতে তাঁহার কোন অনিষ্ট করিতে না পারে, সেজন্য তিনি সর্বদা সবিশেষ সতর্ক থাকিতেন এবং সে সম্বন্ধে পূর্ব হইতেই উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বনে তৎপর হইতেন। বৈষয়িক ব্যাপারে অন্য কাহাকে পরামর্শ প্রদান করিবার কালেও তিনি বলিতেন,—"দেখ, মানুষের উপকার করা খুবই ভাল, কিন্তু লক্ষ্য রাখতে হয়, উপকৃত ব্যক্তি যেন তোমাকে ছোবল মারতে না পারে ;—অর্থাৎ, এমনভাবে উপকার করতে হয়, যাতে সেই উপকারটাই নিজের

উপর ক্ষতি টেনে আনার কারণ না হয়।" এই সম্পর্কে সৎসঙ্গভ্রাতা রাধারমণ জোয়ারদার তাঁহার স্বকীয় জীবনের একটি ঘটনা বিবৃত করিয়াছেন—

"ইষ্টভ্রাতা পূর্ণচন্দ্র সাহা মহাশয় একবার 'কমার্স এণ্ড্ কাল্চার' কোম্পানীর বিশেষ প্রয়োজনে আমার নিকট হইতে 'হ্যাণ্ডনোট' যোগে দুই হাজার টাকা কর্জ নিয়াছিলেন। দুঃখের বিষয়, সবিশেষ অনুরোধ সত্ত্বেও দীর্ঘ তিন বৎসরের মধ্যে তিনি পাওনা টাকা মধ্যে কিছুই উসুল দেন নাই। 'হ্যাণ্ডনোট'-খানার মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার তারিখ অতীব নিকটবর্তী হইয়া পড়িলে, ইষ্টভ্রাতার নামে নালিশ রুজু করা উচিত হইবে কিনা, চিন্তা করিয়া আমি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িলাম। অবশেষে এ সম্বন্ধে যথাকর্তব্য স্থির করিবার জন্য একদিন আমি কর্তাঠাকুরের* শরণাপন্ন হইলাম। সে দিনটি ছিল, 'হ্যাণ্ডনোট' দলিলের তামাদির শেষ তারিখ। আমার নিকট সকল বৃত্তান্ত শুনিয়া কর্তা আমাকে এই উপদেশ দিলেন,—'আমি বলি, তোমার এক্ষুণি কুষ্টিয়া গিয়ে পাওনা টাকার জন্য নালিশ দায়ের করা কর্তব্য। তুমি যদি আইন-সঙ্গত দাবি ছেড়ে দাও, তোমাকে অপর পক্ষের অনুগ্রহ-ভিখারী হ'য়ে থাক্তে হবে। সে যদি স্বেচ্ছায় দেনা পরিশোধ না করে, তবে তোমার এই টাকা আদায় করবার আর কোনই উপায় থাক্বে না। কিন্তু আদালতে একবার দাবি উপস্থিত ক'রে রাখলে, লোকসানের আর কোন ভয় থাকে না। পরে প্রয়োজনবোধে তুমি আপন খুশীমত তোমার পাওনা আংশিক, এমন কি, পুরোপুরিও ছেড়ে দিতে পারবে। দান করা ভাল, কিন্তু কেহ তোমাকে ঠকিয়ে খাবে সেটা বরদাস্ত করা উচিত হবে না।' কর্তাঠাকুরের উপদেশ মত আমি সেইদিনই কুষ্টিয়া যাইয়া আদালতে নালিশ রুজু করতঃ উক্ত কোম্পানীর দোকানটি ক্রোকাবদ্ধ করিলাম। সৌভাগ্যের বিষয়, অতঃপর কিছুদিনের মধ্যেই কর্তাঠাকুরের মধ্যস্থতায় আপোসে ব্যাপারটির সুন্দর মীমাংসা হইয়া যায়।"

তীক্ষ্ণ বিষয়বুদ্ধিসম্পন্ন হইলেও শিবচন্দ্র অতীব উদার, 'ক্ষমাশীল' এবং পরোপকারী ছিলেন। কেহ তাঁহার কোন অনিষ্ট করিলেও তিনি কাহারও ক্ষতি করিতে চাহিতেন না, বরং সহানুভূতি ও দরদের সহিত অন্যায়কারীর অপরাধের কারণ অনুসন্ধান করিয়া লইয়া তাহাকে দোষমুক্ত করিবার জন্য সচেষ্ট হইতেন। এ সম্বন্ধে নিম্নে একটি ঘটনার উল্লেখ করিতেছি।

একদিন শিবচন্দ্রের শরীরটা বিশেষ ভাল না থাকায়, তিনি পত্নীর নিকট মুগডাইলের খিচুড়ি খাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। মনোমোহিনী দেবী তাহা শুনিয়া পরম যত্নসহকারে স্বামীর রুচিমত খিচুড়ি প্রস্তুত করিলেন। এদিকে শিবচন্দ্র বহির্বাটীতে লোকজনের সহিত আলাপ-আলোচনায় ব্যাপৃত থাকায়, আহারার্থ অন্তঃপুরে আসিতে তাঁহার কিছু বিলম্ব হইতে পারে, মনে করিয়া,

* অঞ্চলবাসিগণ 'কর্তা' সম্বোধনে শিবচন্দ্রকে অন্তরের শ্রদ্ধা নিবেদন করিতেন।

মনোমোহিনী দেবী কিছুক্ষণের জন্য কার্য-ব্যপদেশে পাকশালা হইতে অন্যত্র গিয়াছিলেন। এই সুযোগে এক ব্যক্তি গোপনে রন্ধনগৃহে প্রবেশপূর্বক পাত্রস্থিত সবটুকু খিচুড়িই উদরসাৎ করিয়া পলায়ন করে। কিয়ৎকাল পরে শিবচন্দ্র অন্দর-মহলে আসিয়া আহার করিতে বসিলে, মনোমোহিনী দেবী আহার্য পরিবেশন করিতে গিয়া দেখিলেন, হাঁড়িতে খিচুড়ির এক কণিকাও অবশিষ্ট নাই। কাহারও তখন বুঝিতে বাকী রহিল না যে, নিশ্চয়ই কোন দুষ্ট ব্যক্তি এই অপকর্ম করিয়াছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই অপরাধীর সন্ধান পাইয়া বাড়ীর সকলে তাহাকে ধরিয়া আনিল এবং প্রহার করিতে উদ্যত হইল। এই সময় সংবাদ পাইয়া শিবচন্দ্র তাড়াতাড়ি সেস্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং লোকটির উপর হাত তুলিতে সকলকে পুনঃ পুনঃ নিষেধ করিতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন,—'লোকটি নিশ্চয়ই খুব অভাবগ্রস্ত, ক্ষুধার তাড়নায়ই সে এরূপ অন্যায় কার্য করে বসেছে। এ অবস্থায় তাকে কোনরূপ শাস্তি না দিয়ে বরং তার পেটের ভাতের যোগাড় করে দেওয়ার চেষ্টা করাই কর্তব্য।' এই বলিয়া লোকটিকে তিনি খুশীমনে ছাড়িয়া দিলেন। এদিকে মনোমোহিনী দেবী স্বামীর আহারের জন্য তাড়াতাড়ি কয়েকখানা রুটি প্রস্তুত করিয়া আনিলেন। শিবচন্দ্র তখন হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—'দেখ, ভগবান আমার জন্য আজ খিচুড়ি মাপেন নাই, তাই তা আমার ভাগ্যে জুটে নাই। তিনি যা করেন সবই মঙ্গলের জন্য।'

উক্ত লোকটির কথা শিবচন্দ্র ভুলিতে পারেন নাই। সে নিকটবর্তী পল্লীতেই বাস করিত। তাহার ছুতোর-মিস্ত্রীর কাজ জানা ছিল। শিবচন্দ্র পরদিবসই লোকটিকে ডাকাইয়া আনিয়া তাহাকে নিজ বাড়ীর কাজে নিযুক্ত করিলেন এবং গ্রামের অন্য কয়েকজনের বাড়ীতেও তাহার কাজের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। এইভাবে স্বকীয় শ্রমে অর্থোপার্জনে সমর্থ হওয়ায় সে অচিরেই সদ্‌ভাবে জীবন-যাপনে অভ্যস্ত হইয়া উঠিল।

শিবচন্দ্র ছিলেন বড়ই কোমল-প্রাণ। অপরের দুঃখ তাঁহার নিকট অসহ্য বোধ হইত। কাহারও কোন কষ্ট দেখিলে তাহা নিরাকরণের জন্য তিনি অস্থির হইয়া পড়িতেন। এজন্য তাঁহার গোপন দানেরও অন্ত ছিল না। তাঁহার পরদুঃখকাতরতার কয়েকটি কাহিনী নিম্নে উল্লেখ করা যাইতেছে।

একদিন মধ্যাহ্নকালে স্নানের পূর্বে শিবচন্দ্র আপন বৈঠকখানায় বসিয়া তৈল মাখিতেছেন, এমন সময় প্রতিবেশী কেশবচন্দ্র চৌধুরী মহাশয় তাঁহার কাছে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। শিবচন্দ্র তাঁহাকে সে বেলা তাঁহার গৃহেই স্নানাহার সারিয়া যাইবার জন্য সবিশেষ অনুরোধ জানাইলেন। চৌধুরী মহাশয় তখন ব্যস্ততার সহিত কাতরকণ্ঠে বলিলেন,—'দেখুন, বড়ই বিপদে পড়ে আপনার কাছে এসেছি। আমার একটা কথা আছে। আপনি যদি দয়া করে তা রক্ষা করবার

প্রতিশ্রুতি দেন, তবেই আমি 'আপনার অনুরোধ রাখতে পারি।' চৌধুরী মহাশয়ের কথা শুনিবামাত্র শিবচন্দ্র দৃঢ়কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন,—'নিশ্চয়ই, আপনার কথা রক্ষা করতে আমি প্রাণপণ চেষ্টা করব।' চৌধুরী মহাশয় তখন বলিলেন,—'এক্ষুণি আমাকে কুঁড়িটি টাকা না দিলে আমার মান থাকে না। শিবচন্দ্রের হস্তে তখন অর্থ ছিল না। তিনি তৎক্ষণাৎ উঠিয়া পড়িলেন এবং অতিকষ্টে অবিলম্বে কুঁড়িটি টাকা সংগ্রহ করিয়া আনিয়া চৌধুরী মহাশয়ের হাতে দিয়া তাঁহাকে নিশ্চিন্ত করিলেন।

শুনিয়াছি শিবচন্দ্রের চাউলের কারবার ছিল। গ্রামবাসী বহু দরিদ্র লোক তাঁহার নিকট হইতে সময়ে অসময়ে ধারে মাল লইয়া যাইত এবং নিজেদের সুবিধা-মত মূল্যের টাকা শোধ দিত। অনেকেই দেনা পরিশোধ করিতে অপারগ হইয়া শিবচন্দ্রকে তাঁহার পাওনা টাকার জন্য 'হ্যাণ্ডনোট' দিয়া যাইত। শিবচন্দ্র কাহাকেও কখনো দেনা শোধের জন্য বিশেষ তাগিদ দিতেন না। সে কারণ, বহু লোকের 'হ্যাণ্ডনোট' তাঁহার নিকট জমা পড়িয়া থাকিত। শিবচন্দ্রের পরলোকগমনের পর দেখা গেল, মৃত্যুর পূর্বে অসুস্থ থাকাকালীন তিনি ঐ 'হ্যাণ্ডনোট'গুলি সবই আপন বাক্সে ছিঁড়িয়া রাখিয়া বহু দরিদ্র প্রতিবেশীকে ঋণমুক্ত করিয়া গিয়াছেন।

প্রতিবেশী বসুমা-র একমাত্র সন্তান কন্যাটির অকাল মৃত্যু ঘটিলে শোকার্তা জননী মনোদুঃখে অহর্নিশ আর্তনাদ করেন, আর উন্মত্তের মত পথে-ঘাটে ছুটাছুটি করেন। মনোমোহিনী দেবীর নিকট স্ত্রীলোকটির নিদারুণ দুঃখ-কাহিনী শুনিয়া শিবচন্দ্র বড়ই ব্যথিত হইলেন। একদিন রমণীটিকে কাছে ডাকিয়া তিনি বলিলেন,—'দ্যাখ্ মা, তোর যে সর্বনাশ হয়েছে, ঘরে ঘরে তেমন দুর্ঘটনার অভাব নেই। যে চলে গ্যাছে, তাকে তো আর ফিরিয়ে আনা যাবে না। ধৈর্য ধরে মন স্থির করার চেষ্টা কর, মঙ্গলময় ভগবানের নাম কর। তাঁকে ডাকা ছাড়া আর কি উপায় আছে মা?' শিবচন্দ্রের এইরূপ স্নিগ্ধ মধুর সান্ত্বনা-বাক্যেও শোকাতুরা মাতার অন্তর্দাহ বিন্দুমাত্র প্রশমিত হইল না। সে বলিল,—'বাবা, আমার অন্তরটা সব সময় জ্বলে যায়, আমি মনকে কিছুতেই শান্ত করতে পারি না।' শিবচন্দ্র তখন আপনার ক্রীড়ারত সন্তানদের দেখাইয়া বলিলেন,—'কেঁদে-কেটে আর কি করবি মা। মনে কর এরাই তোর সন্তান, এদের লালন-পালন করে প্রাণে শান্তি আনবার চেষ্টা কর্।' শিবচন্দ্রের ঈদৃশ দরদভরা বচনেও শোকাকুলা জননী একটু প্রবোধ পাইলেন না, শুধু অবিরল ধারায় অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিলেন শিবচন্দ্র তখন অতীব বিচলিত হইয়া জ্যেষ্ঠপুত্র অনুকূলচন্দ্রকে ডাকিয়া আনিয়া শোকার্তা জননীর ক্রোড়ে নিক্ষেপ করতঃ আবেগপূর্ণ কণ্ঠে বলিলেন,—'মা, আজ থেকে এ-ই তোর সন্তান হ'লো। এ-কে আমি তোকেই দিয়ে দিলাম। আপন সন্তান ভেবে ও-কে তুই কোলে-পিঠে করে মানুষ কর্, তোর কোনই দুঃখ থাকবে

না।' বড়ই আশ্চর্যের বিষয়, প্রবল বারি-বর্ষণের ফলে প্রজ্বলিত অগ্নিরাশি যেমন মুহূর্ত মধ্যে নির্বাপিত হইয়া শীতল হয়, বালক অনুকূলচন্দ্রকে ক্রোড়ে পাওয়ামাত্র শোকাকুলা মাতার শোচনীয় অবস্থারও তেমনি সহসা অদ্ভুত পরিবর্তন ঘটিল—তাঁহার মর্মন্তুদ জ্বালা-যন্ত্রণার অকস্মাৎ চির অবসান ঘটিল। সেদিন হইতে তিনি অন্তরের স্বত-উৎসারিত স্নেহ-নিষেকে অনুকূলচন্দ্রের পরিচর্যায় রত হইলেন। অধুনা জরাদশা পর্যন্ত সারাটা জীবন তিনি তাঁহাকে লইয়াই আনন্দ-প্রাচুর্যে মসগুল হইয়া আছেন।

অতিথি-অভ্যাগতের সেবা সম্বর্ধনায় অসীম তৃপ্তিবোধ শিবচন্দ্রের চরিত্রের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল। তাঁহার শেষ বয়সের কথা। অনুকূলচন্দ্রের বহু শিষ্য-সেবক তখন প্রায়শ তাঁহার বাড়ীতে উপস্থিত থাকিতেন। শিবচন্দ্র তাঁহাদের আদর-আপ্যায়নের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিতেন। কিন্তু সব সময় সকল বিষয়ে নিজের মনোমত করিয়া তাঁহাদের সুখ-সুবিধার ব্যবস্থা করিয়া উঠিতে পারিতেন না বলিয়া তিনি খুবই অস্বস্তি বোধ করিতেন। আগন্তুকগণের সহিত কথাবার্তায় অনেক সময়ই তাঁহার সে মনোদুঃখ প্রকাশ পাইত। তিনি তাঁহাদিগকে প্রায়শই বলিতেন,—'দেখ বাপু তোমরা সবাই ভদ্রসন্তান, দুঃখ-কষ্ট সহ্য করতে তোমরা মোটেই অভ্যস্ত নও। এখানে তোমাদের দুর্ভোগের অন্ত নাই। তোমরা না পাও একটু শোবার জায়গা, না পাও পেটভরে দু'মুঠো খেতে। আমার ছেলে তো একটা আপনভোলা-পাগল। ওতে কি দেখে তোমরা তাকে ভগবান বলে পূজা কর, তাও বুঝি না। বলি বাপু, ভগবান কি আর কোথাও জায়গা পেলেন না, অথশেষে শিব চক্কত্তীর ঘরে এসে ঢুকলেন!* তা বাপু, তোমরা যাই ভাব, আর যাই কর, তোমাদের এত সব দুঃখ-কষ্ট কিন্তু মোটেই আমার সহ্য হয় না।' শিবচন্দ্রের ঈদৃশ অকৃত্রিম স্নেহমমতা ও সহৃদয়তায় মুগ্ধ হইয়া ভক্তবৃন্দ নিজেদের মনোভাব সানন্দে মুক্তকণ্ঠে প্রকাশ করিয়া বলিতেন,—'বাবা, আপনার বাড়ীতে আমরা পরম সুখে থাকি। মা আমাদের যা খেতে দেন তা অমৃততুল্য। এখানে আমরা কোন বিষয়েই বিন্দুমাত্র অসুবিধা বোধ করি না, বরং এত তৃপ্তি ও শান্তি পাই যে, একবার এখানে আসতে পারলে, আমাদের আর যেতে ইচ্ছা হয় না।' শত জনের এরূপ শত কথায়ও শিবচন্দ্রের মানসিক অশান্তির বিন্দুমাত্র লাঘব হইত না। স্বেচ্ছামত সকলের সেবাযত্ন করিতে পারেন না বলিয়া তিনি সর্বদাই গভীর মনোদুঃখে কাল কাটাইতেন। পুত্র অনুকূলচন্দ্রকে প্রায়শই কাছে ডাকিয়া তিনি বলিতেন,—'দেখ বাবা, ভদ্রলোকের ছেলেরা যে তোমার কাছে আসে, সে তো

---

* একথা অবশ্য উল্লেখযোগ্য যে, শিবচন্দ্র আপন জীবদ্দশায়ই দেশবাসীর অন্তরে অনুকূলচন্দ্রের ক্রমবর্ধমান প্রতিষ্ঠার পরিচয় পাইয়া অতীব প্রীতি লাভ করিয়াছিলেন। পুত্রের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে দৃঢ়প্রত্যয়ী হইয়া তিনি পত্নী মনোমোহিনী দেবীকে বলিতেন,—'তোমার এ ছেলে কালে খুব বড় হবে, ওর খুব যত্ন নিও এবং তার লোকসেবার কাজে তাকে প্রাণপণ সাহায্য করো।'

খুব ভাল কথা। তাদের সুখ-সুবিধার দিকে একটু নজর দেওয়া কি তোমার উচিত নয়। আমি বলি, মন দিয়ে ডাক্তারী কর বাবা, ভাল রোজগার কর, আর এরা সবাই এখানে এসে যাতে একটু ভালভাবে থেকে-খেয়ে যেতে পারে, সেদিকে মন দাও।'

পরবর্তীকালের কথা। ঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের প্রতিষ্ঠিত সৎসঙ্গ-আশ্রমে তখন তাঁহার শত শত শিষ্যসেবক সপরিবারে নিরন্তরূপে বাস করেন। ঠাকুর-পরিবারের সঙ্গেই তাঁহাদের সকলের আহারাদি হয়। সাধারণ মধ্যবিত্ত গৃহস্থের পক্ষে প্রত্যহ এ বিপুল ব্যয়ভার বহন করা নিতান্ত সহজসাধ্য ব্যাপার নয়। সুতরাং সকলকে তখন যথেষ্ট কষ্ট করিয়াই থাকিতে হইত। এই সময় বার্ধক্য-জনিত স্বাস্থ্যা-ভাবের দরুন সকলেই শিবচন্দ্রকে সংসারের নানা ঝামেলার বাহিরে নির্জনে একটু পৃথকভাবে যথাসম্ভব স্বাচ্ছন্দ্য, বিশ্রাম ও আহারাদির যথাযথ নিয়মাদি-প্রতি-পালনের মধ্যে রাখিতে চেষ্টা করিতেন। কিন্তু তিনি তাহা মোটেই পছন্দ করিতেন না। এই অবস্থায় আশ্রমবাসী কাহারও সঙ্গে দেখা-সাক্ষাতের সুযোগ ঘটিলেই তিনি তাহাদের সহিত দৈনন্দিন থাকা-খাওয়া এবং ব্যক্তিগত প্রয়োজন প্রভৃতি নানা প্রসঙ্গে আলাপ-আলোচনায় প্রবৃত্ত না হইয়া কিছুতেই থাকিতে পারিতেন না। এই সুযোগে স্বীয় দরদী প্রাণের স্বভাবসুলভ আগ্রহ ও ঔৎসুক্য-বশতঃ তিনি বিশেষভাবে তাঁহাদের নিকট নিত্যকার আহারাদি সম্বন্ধে অসংখ্য রকম প্রশ্নের অবতারণা করিতেন। প্রত্যহ নিয়মিত সময়ে তাহাদের খাওয়া-দাওয়া হয় কিনা, আহারের আয়োজন কোন্‌দিন কেমন হয়, রোজ তরকারী কয় প্রকারের হয়, ডালের সঙ্গে ভাজা থাকে কিনা, দধির সহিত কলা দেওয়া হয় কিনা, আমের সময় কয়দিন তাহাদের জন্য আম-দুধের ব্যবস্থা হইয়া থাকে, মাঝে মাঝে পায়স-পিঠা খাওয়ানো হয় কিনা......ইত্যাদি কত কথা অধীর আগ্রহ সহকারে খুঁটিনাটি করিয়া জিজ্ঞাসা করতঃ তিনি সকল সংবাদ সংগ্রহ করিতেন। বলা বাহুল্য কোন-বিষয়ে নিজের মনোমত উত্তর না পাইলে তিনি স্ত্রীর উপর অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইতেন।

একদিন মধ্যাহ্নে আহারাদির পর শিবচন্দ্র তাঁহার বাসগৃহের আঙিনায় বিশ্রাম করিতেছেন, এমন সময় জনৈক আশ্রমবাসীর সহিত কথাবার্তায় তিনি জানিতে পারিলেন যে, তখনও পর্যন্ত তাহাদের কাহারও খাওয়া-দাওয়া হয় নাই। ইহাতে অতীব দুঃখিত হইয়া তিনি তৎক্ষণাৎ স্ত্রীকে ডাকিয়া পাঠাইলেন এবং তখন হইতে আশ্রমবাসী সকলের সঙ্গে একই সময়ে একই ভাবে তাঁহারও আহারাদির ব্যবস্থা করিতে তাঁহার উপর জিদ্‌ করিয়া বসিলেন। বলিতে কি, মনোমোহিনী দেবীও আশ্রমবাসী শত শত শিষ্যপরিবারের প্রত্যেককে আপন সন্তানতুল্যই যত্ন করিতেন। শত অভাবের মধ্যেও নিজ পরিবারস্থ আপনজনের মতই তিনি তাহাদের সকলের অভাব-অভিযোগ নিরাকরণে ও স্বস্তি-বিধানে সর্বপ্রযত্নে সচেষ্ট থাকিতেন।

শুনিয়াছি, শিবচন্দ্রকে বিশেষভাবে খুশী করিবার উদ্দেশ্যে একবার মহারাজ অনন্তনাথ, ডাক্তার কিশোরীমোহন ও সতীশচন্দ্র গোস্বামী প্রভৃতি অনুকূলচন্দ্রের প্রিয় পার্ষদগণ মনোমোহিনী দেবীর সঙ্গে পরামর্শক্রমে একদিন বাড়িতে এক বিরাট ভোজের আয়োজন করিয়াছিলেন। এই উপলক্ষে মণ দুই দুগ্ধ, রাশি রাশি তরি তরকারী, প্রচুর পরিমাণ চাল,ডাল, ঘৃত, তৈল ও মিষ্টদ্রব্য প্রভৃতি নানাপ্রকার উৎকৃষ্ট ভোজ্যোপকরণ সংগৃহীত হইয়াছিল। শিবচন্দ্রের জ্যেষ্ঠ পুত্রবধূ পূজনীয়া সরসীবালা দেবী সেদিন নানাবিধ খাদ্যসামগ্রী প্রস্তুত করতঃ আশ্রমবাসী সকলকে স্বহস্তে পরিবেষণপূর্বক পরিতোষ সহকারে ভোজন করাইয়াছিলেন। সকলে একসঙ্গে পঙ্‌ক্তি-ভোজনে বসিলে, শিবচন্দ্র স্বয়ং সেখানে উপস্থিত থাকিয়া প্রত্যেককে ভূরিভোজনে পরিতৃপ্ত দেখিয়া অসীম আনন্দ অনুভব করিলেন।

শিবচন্দ্রের চরিত্রটি যেমনই অপরিসীম কোমলতায় অতুলনীয়, তেমনই অনমনীয় দৃঢ়তায় অসাধারণ ছিল। নিজের বিবেক-বুদ্ধি মত চলিতে গিয়া তিনি শত জনের শত বিরোধিতাকে তৃণবৎ তুচ্ছ মনে করিতেন। বলিতে কি, তাঁহার মত বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন পুরুষ কদাচিৎই দৃষ্টিগোচর হয়। জীবনে বহু ব্যাপারে তিনি তাঁহার দৃঢ় সংকল্প ও নির্ভীক চিত্তের যথেষ্ট পরিচয় দিয়াছেন। এ সম্বন্ধে নিম্নে একটি ঘটনার উল্লেখ করা যাইতেছে।

শিবচন্দ্র তাঁহার মধ্যমপুত্র প্রভাসচন্দ্রের বিবাহ-অনুষ্ঠানে নববধূর হস্তস্পর্শ উপলক্ষে প্রতিবেশী জ্ঞাতি ও আত্মীয়স্বজনকে আপন গৃহে ভোজনের নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। দুঃখের বিষয়, ইঁহারা সে উৎসব-দিবসে শিবচন্দ্রের বাড়িতে উপস্থিত হইয়া এক অতি অপ্রীতিকর ব্যাপারের সৃষ্টি করিলেন। তাঁহারা পরস্পরে গোপন ষড়যন্ত্র করতঃ শিবচন্দ্রকে জানাইলেন যে, যেহেতু তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র অনুকূলচন্দ্র গ্রামের অস্পৃশ্যদের হস্তে পানীয় জল ব্যবহার করেন, সে কারণ তাঁহারা তাঁহার গৃহে অন্ন গ্রহণ করিতে পারেন না। অনুষ্ঠানটি পণ্ড করিয়া দিয়া শিবচন্দ্রকে জব্দ করিবেন, মনে মনে এইরূপ দুরভিসন্ধি লইয়া ইঁহারা নানা কুতর্কের অবতারণা করতঃ সারাটা দিন ভীষণ জটলা করিয়া কাটাইলেন। শিবচন্দ্রের যথেষ্ট অনুনয়-বিনয় সত্ত্বেও ইঁহারা নিজেদের নীচ কূটবুদ্ধি পরিত্যাগ করিলেন না, কেহই ভোজন করিতে রাজী হইলেন না। পরমাত্মীয় অভ্যাগতগণের ঈদৃশ জঘন্য আচরণে অতিষ্ঠ হইয়া শিবচন্দ্র অবশেষে আপন জ্যেষ্ঠপুত্র অনুকূল-চন্দ্রকে ডাকিয়া সর্বসমক্ষেই তেজোদৃপ্তকণ্ঠে বলিলেন,—'আয় অনুকূল, আমরাই আজ বৌমার হস্তস্পর্শ করব। যেখানে চরিত্র-সম্পদের বালাই নাই, সে-বেলায় যে যা-খুশী করতে পারে, তাতে কোন দোষ হয় না, আর যত দোষ হয় জল ছোঁয়া নিয়ে। এমন হীন সমাজের কেউ আমার বাড়িতে থাক আর না থাক, তাতে আমার কিছুই যায় আসে না। এ হেন নীচাশয়দের সংস্রবে আমাদের পবিত্র অনুষ্ঠানটি যে কলুষিত হয়নি, তাই আমাদের পরম সৌভাগ্য।' নিমন্ত্রিতবর্গের



জনক শিবচন্দ্র চক্রবর্তী

সম্মুখে আপন মনোভাব এইরূপ সুস্পষ্টভাবে দৃঢ়স্বরে ব্যক্ত করিয়া শিবচন্দ্র সভাস্থল পরিত্যাগ করিলেন এবং অন্দর-মহলে গিয়া নিজের পরিবারবর্গ লইয়াই অনুষ্ঠানটি যথারীতি সম্পন্ন করিলেন।

শিবচন্দ্র লোকসঙ্গ বড়ই ভালবাসিতেন। আশ্রমবাসী স্ত্রী-পুরুষ বাল-বৃদ্ধ-যুবা সকলের সহিত অবসরকালে গল্পগুজবে সময় কাটাইতে তিনি খুব আনন্দ পাইতেন। বিশেষ, সরলপ্রাণ শিশুদের সঙ্গে মেলামেশা করিতে তাঁহার আহ্লাদের সীমা থাকিত না। ছোটদের দেখিলেই তিনি তাহাদিগকে নিকটে ডাকিয়া লইতেন এবং হাসি-তামাশার কত গল্প করিয়া তাহাদের চিত্তবিনোদন করিতেন। শিশুরাও খেয়াল-খুশীমত তাঁহার গৃহে উপস্থিত হইয়া বালসুলভ চাপল্যে তাঁহাকে অস্থির করিয়া তুলিত। তাহারা এমন কি তাঁহার ঘরের জিনিষপত্রাদি পর্যন্ত ভাঙ্গিয়া চুরিয়া তছ্‌নছ্‌ করিয়া নষ্ট করিত। ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের এসকল দুরন্তপনায় শিবচন্দ্র কখনও বিন্দুমাত্র বিরক্ত হইতেন না, বরং আনন্দিত মনে তাহাদের যত-কিছু আবদার মিটাইয়া তাহাদিগকে খুশী করিবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিতেন।

শিবচন্দ্র ছিলেন উদার-প্রাণ দরদী পল্লীসন্তান। তাঁহার সারা জীবনের কর্মক্ষেত্র হিমাইতপুর গ্রামটিকে তিনি সর্বাধিক ভালবাসিতেন। বস্তুতই হিমাইতপুরের চেয়ে অধিকতর প্রিয়বস্তু তাঁহার কাছে যেন আর কিছুই ছিল না। এই হিমাইতপুরের প্রতি তাঁহার এমনই গভীর টান ছিল যে, হিমাইতপুর ছাড়িয়া অন্য কোন তীর্থস্থানে পর্যন্ত যাইতে তাঁহার কখনও ইচ্ছা হইত না। নিজের এই সহজ মনোভাবটি অকপটে ব্যক্ত করিয়া অনেক সময়ই তিনি বলিতেন,—'হিমাইতপুর পল্লীই আমার কাশী, হিমাইতপুরের পদ্মাই আমার গঙ্গা।'

অভ্যাস-ব্যবহারে শিবচন্দ্র খুবই সুরুচিসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা এবং মিতব্যয়িতার সঙ্গে সহজ সরল অনাড়ম্বর জীবন-যাপন তিনি যেমন খুবই পছন্দ করিতেন, বিলাসিতা, জাঁকজমক ও যথেচ্ছাচারিতা তেমনই অন্তরের সহিত ঘৃণা করিতেন। মৃদুস্বরে মিষ্ট ও সংযত ভাষায় আলাপনে তিনি স্বভাবতই অভ্যস্ত ছিলেন। বিদ্যাচর্চা, স্বাধীনভাবে জীবিকার্জন এবং মনুষ্যত্ব লাভের সর্বপ্রকার প্রচেষ্টার তিনি খুবই অনুরাগী ছিলেন।

শিবচন্দ্রের চরিত্রে ধর্মের গোঁড়ামি ছিল না। তিনি ছিলেন অন্তরে ধর্মাশ্রয়ী ও ভগবদ্‌বিশ্বাসী, আচরণে সত্যনিষ্ঠ এবং বাস্তব জীবনযাত্রায় আদর্শ কর্মযোগী পুরুষ। সুখে দুঃখে, সম্পদে বিপদে, ক্ষুদ্র বৃহৎ সকল কার্যে যে চরিত্রবৈভবের প্রত্যক্ষ পরিচয় তিনি দিয়া গিয়াছেন তাহা সংসারে বিরল।

পরিবারের কল্যাণসাধনে অবিরাম কঠোর শ্রমের ফলে শিবচন্দ্রের স্বাস্থ্য ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল। শেষজীবনে তিনি কঠিন উদরাময়-রোগের আক্রমণে শয্যা-

গত অসুস্থ হইয়া পড়েন। দুর্ভাগ্যের বিষয়, যথেষ্ট চিকিৎসা ও শুশ্রূষা সত্ত্বেও পীড়ার কোনও উপশম হইল না। রোগ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাওয়ায় তাঁহার প্রাণশক্তি ক্রমশই নিস্তেজ হইয়া আসিতেছিল। অবশেষে বঙ্গাব্দ ১৩৩০ সনের ২৪শে অগ্রহায়ণ তাঁহার মহাযাত্রার ডাক আসিয়া পড়িল। অন্তিমকাল আসন্ন বুঝিয়া শিবচন্দ্র পত্নী মনোমোহিনী দেবীকে কাছে ডাকিয়া তাঁহার হাতের সোনার বালা ও গলার হারটি দেখাইয়া বলিলেন,—"আমার একটা কথা, তুমি কিন্তু এগুলো খুলো না যেন। ছেলেরা তোমার সন্ন্যাসিনীর বেশ দেখলে সহ্য করতে পারবে না......।" ইহার পরেই পরিবারবর্গ, আত্মীয়স্বজন, আশ্রমবাসী, প্রতিবেশী ও নানাস্থানের গুণমুগ্ধ অগণিত নরনারীকে শোকসাগরে ভাসাইয়া শিবচন্দ্র মহাপ্রয়াণ করিলেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স হইয়াছিল আটষট্টি বৎসর।

পিতৃদেবের মহাপ্রস্থান-মুহূর্তের অব্যবহিত পূর্বে অনুকূলচন্দ্র পিতার কক্ষ হইতে ক্ষণকালের জন্য পাশেই মায়ের ঘরে গিয়াছিলেন। সেখানে দুঃসংবাদটি তাঁহার কর্ণগোচর হওয়ামাত্র তিনি 'বাবা আমার', 'বাবা আমার' বলিয়া আর্তনাদ করিতে করিতে পাগলের মত ছুটিয়া আসিয়া পিতৃদেবের নিষ্প্রাণ অসাড় দেহখানা জড়াইয়া ধরিলেন, তার অবিরল অশ্রুধারায় বক্ষ ভাসাইয়া উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। দীর্ঘসময় অতিবাহিত হইয়া চলিল, কিন্তু তাঁহার সেই মর্মভেদী বুকফাটা কান্না আর কিছুতেই থামে না। ইহাতে উপস্থিত সকলে অতীব শঙ্কাকুল হইয়া পড়িলেন। শোকোন্মত্ত পুত্রের ঈদৃশ শোচনীয় অবস্থা দর্শনে একান্ত বিচলিত হইয়া অনাথিনী জননী দেবী সদ্যঃপতিবিয়োগের দুঃসহ জ্বালা দারুণ কষ্টে আপন বক্ষে চাপিয়া রাখিয়া পুত্রকে শান্ত করিবার জন্য সচেষ্ট হইলেন। অতঃপর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ান্তে অনুকূলচন্দ্র গৃহে ফিরিয়া যখন মাতৃদেবীকে করুণমূর্তি বিধবার বেশে দেখিতে পাইলেন, তাঁহার শোকসিন্ধু যেন শতগুণে উছলিয়া উঠিল। তিনি তখন 'মা, তুই এ কি করলি, এ কি করলি' বলিতে বলিতে নিরাশ্রয় অবুঝ শিশুর মত আর্তকণ্ঠে কেবলই অঝোরে রোদন করিতে লাগিলেন।

পিতৃবিয়োগের পর অনুকূলচন্দ্র ভ্রাতৃগণসহ বিধিমত অশৌচপালনপূর্বক যথাকালে যথাশাস্ত্র স্বর্গত পিতৃদেবের শ্রাদ্ধকার্য নিষ্পন্ন করিলেন। বৃষোৎসর্গ-শ্রাদ্ধবাসরে কয়েক সহস্র টাকা মূল্যের নানাবিধ উৎকৃষ্ট দানসামগ্রী সমাহৃত হইয়াছিল। শাস্ত্রজ্ঞ বিশিষ্ট পণ্ডিতগণ কেহ গীতা, কেহ বিরাট, কেহ বা বেদপাঠে নিরত এবং আরও অনেক নানা ক্রিয়ানুষ্ঠানে ব্রতী থাকিয়া স্ব-স্ব কর্তব্য যথারীতি নিষ্ঠার সঙ্গে সম্পন্ন করিয়াছিলেন। পাবনার তদানীন্তন সর্বজনবরেণ্য পণ্ডিত তারানাথ সপ্ততীর্থ মহোদয় শাস্ত্রনির্দিষ্ট ক্রিয়াকলাপের যথাযথ তত্ত্বাবধানপূর্বক সুষ্ঠুরূপে শ্রাদ্ধকৃত্য নিষ্পন্ন করাইয়াছিলেন। শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে যোগদানের জন্য সমগ্র পাবনা জিলা ও রাজসাহীর ব্রাহ্মণসমাজের গণ্যমান্য সকলকেই যথাযোগ্য

আমন্ত্রণ জানানো হইয়াছিল। বহু বিশিষ্ট পণ্ডিতের সমাগমে ও সহযোগিতায় উক্ত অনুষ্ঠান বিশেষরূপে সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছিল। পণ্ডিতগণকে মর্যাদাদানের ব্যাপারে শাস্ত্রবেত্তা সমাজপতিগণ যে নির্দেশ দিয়াছিলেন, অনুকূলচন্দ্র সশ্রদ্ধচিত্তে তাহাই পালন করিয়াছিলেন। এই দক্ষিণাদানের নগদ অর্থের পরিমাণ ছিল মাথাপিছু পাঁচ টাকা হইতে একশত টাকা পর্যন্ত; তদুপরি প্রত্যেককে পাথেয় এবং তৎসহ গরদের ধুতি, শীতের চাদর ও তৈজসাদি দ্বারা উপযুক্তরূপে সম্মানিত করা হইয়াছিল। সমাগত ব্রাহ্মণগণকে অনুকূলচন্দ্র স্বহস্তে পদপ্রক্ষালনপূর্বক শ্রদ্ধাভিষিক্ত অভ্যর্থনা নিবেদন করিয়াছিলেন। শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে নিমন্ত্রিত নানা-শ্রেণীর বহু লোকের ভূরিভোজনেরও উত্তম ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। প্রায় আট মণ ময়দার লুচি এবং তদনুপাতিক নানাপ্রকার ব্যঞ্জনাদি, দধি ও মিষ্টদ্রব্যের প্রচুর আয়োজন করা হইয়াছিল। অনুষ্ঠানটির সর্বাঙ্গীণ সাফল্যে সমবেত সকলেই নিরতিশয় তৃপ্ত ও আহ্লাদিত হইয়াছিলেন এবং সকলেই একবাক্যে এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, এরূপ বিপুল আয়োজনের সহিত এমন শ্রদ্ধামণ্ডিত সাদর আপ্যায়ন ও উদার অর্ঘ্যনিবেদন তাঁহারা ইতঃপূর্বে আর কোথায়ও প্রত্যক্ষ করেন নাই।

তৃতীয় অধ্যায়

জননী মনোমোহিনী

পাবনা জিলার হিমাইতপুর গ্রামের বিখ্যাত চৌধুরী পরিবারে বঙ্গাব্দ ১২৭৭ সালের ১৮ই জ্যৈষ্ঠ মনোমোহিনী দেবীর জন্ম হয়। পিতা রামেন্দ্রনারায়ণ মনোমোহিনীকে সর্বাধিক স্নেহ করিতেন। কন্যাকে বসন-ভূষণে সজ্জিত রাখিতে তিনি যেমনই ভালবাসিতেন, তাহাকে সর্বপ্রকারে সুশিক্ষিত করিয়া তুলিতে তেমনই অশেষ যত্ন লইতেন। যাহাতে বাল্যকাল হইতেই বালিকার তরুণ মনে শ্রদ্ধা ভক্তি দয়া মমতা ত্যাগ নিষ্ঠা প্রভৃতি সদগুণ সহজেই বিকশিত হইয়া উঠে, সেজন্য তিনি সবিশেষ চেষ্টা করিতেন। তাঁহার সৎশিক্ষায় অতিবাল্য হইতেই উচ্চাদর্শের প্রতি বালিকার যে গভীর অনুরাগ জন্মিয়াছিল, বহু ঘটনায় তাহার সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়।

ছোটবেলায় মনোমোহিনী দেবী একদিন তাঁহার পিতাঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,—'বাবা, কি কি সদ্‌গুণ থাকলে মানুষ বড় হয়?' উত্তরে রামেন্দ্রনারায়ণ কন্যাকে বলিয়াছিলেন —'যারা সত্য কথা বলে, পরের দ্রব্যে লোভ করে না, গুরুজনকে মান্য করে, দীনদুঃখীর সেবা করে এবং সর্বোপরি ঈশ্বরে বিশ্বাস-ভক্তি রেখে চলে, তাদেরই লোকে মহৎ ব'লে পূজা করে, ভগবানও তাদের উপর সন্তুষ্ট থাকেন।' পিতৃদেবের কথিত সদ্‌গুণরাজি মনোমোহিনী দেবীর চরিত্রে যথাকালে অংকুরিত ও বিকশিত হইয়া উত্তর-জীবনে তাঁহাকে মহীয়সী করিয়া তুলিয়াছিল।

বালিকা মনোমোহিনীর চরিত্রগঠনে তাঁহার মাতামহী কৃপাময়ী দেবীর অকলঙ্ক ইষ্টনিষ্ঠা সবিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। মনোমোহিনী দেবী তাঁহার আত্মজীবনীতে মাতামহী ও পিতৃদেব সম্বন্ধে উল্লেখ করিয়াছেন,—"সবাই আমাকে ছোটকালে আদর করিয়া 'মনু' বলিয়া ডাকিত। আমি আমার দিদিমার সঙ্গে থাইতাম, তাঁহার কাছেই রাত্রে শুইতাম। দিদিমা হরিনাম জপ করিতেন, হরিনাম গাহিতেন, আমিও তাঁহার সঙ্গে গান করিতাম, তাঁহারই মত হাসিতাম, কাঁদিতাম। দিদিমার কাছে হরিকথা শুনিয়া আমার মন শিশুকাল হইতেই উদাস হইয়া উঠিত। আমি দিদিমার পূজার জন্য ফুল তুলিয়া আনিতাম! আমার মনে হইত, বাবাই আমাকে সর্বাধিক ভালবাসিতেন। সকালবেলা বাবার কাছে চড়িয়া আসিতাম। তিনি আমাকে আপ্রাণ যত্ন করিয়া লেখাপড়া শিখাইতেন এবং যাহাতে আমার সৎশিক্ষা হয় তাহারই চেষ্টা করিতেন।"

আদর্শ-শিক্ষায় বালিকার স্বভাবটি সর্বাঙ্গসুন্দর করিয়া গড়িয়া তুলিতে মাতা কৃষ্ণসুন্দরীরও চেষ্টার অবধি ছিল না। ধর্মপ্রাণ বাবা, মা ও দিদিমার

নিয়ত সস্নেহ সেবাযত্নের মধ্যে মনোমোহিনী দেবীর বাল্যজীবন অতিবাহিত হওয়ায়, জীবনারম্ভ হইতেই তিনি অতীব ধর্মানুরাগিণী হইয়া উঠিয়াছিলেন। তাঁহার বালিকাবয়সের অটুট নিষ্ঠাভক্তির অত্যুজ্জ্বল দৃষ্টান্তের একটি কাহিনী উল্লেখ করিতেছি।—

ছোটবেলা হইতেই মনোমোহিনী দেবী ঠাকুরদেবতার পূজার্চনায় অত্যন্ত আনন্দ পাইতেন। পিতৃদেব রামেন্দ্রনারায়ণ প্রতিদিন ভক্তিপূর্বক মন্ত্রোচ্চারণ করতঃ নিষ্ঠার সহিত গৃহদেবতা রাধামদনমোহন-বিগ্রহের পূজা করিতেন। বালিকা প্রত্যহ ঐ সময় তাঁহার ছোট ভাই লোহাকে সঙ্গে লইয়া ঠাকুরঘরে গিয়া বসিয়া থাকিতেন এবং তন্ময়চিত্তে প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত বাবার পূজা দেখিতেন। এদিকে দিদিমা কৃপাময়ী ব্রতপূজা-পার্বণাদির নানা অনুষ্ঠান লইয়া দিন কাটাইতেন। তাঁহার এই সকল পূজাকর্মে বালিকা আনন্দের সঙ্গে যোগ দিতেন এবং নিজ হইতেই তাঁহাকে নানাভাবে সাহায্য করিতেন। পিতৃদেব ও দিদিমা উভয়কেই এইভাবে সারাদিন পূজার্চনায় ব্যাপৃত থাকিতে দেখিয়া বালিকা মনোমোহিনী দেবীরও ঠাকুরপূজা করিবার সাধ হইত।

যতই দিন যাইতে লাগিল, বাবা ও দিদিমার মত প্রাণের আকাঙ্ক্ষা মিটাইয়া ঠাকুরের নিত্য-সেবাপূজা নিজেই স্বহস্তে সম্পাদন করিবার জন্য বালিকা অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। এজন্য পিতাঠাকুরের আদেশ ও নির্দেশ পাওয়ার আশায় তিনি তাঁহাকে দিবারাত্র তাগিদ দিয়া অস্থির করিয়া তুলিলেন। প্রাণাধিকা কন্যার ঐকান্তিক আগ্রহ পরিপূরণের কোনই উপায় খুঁজিয়া না পাইয়া, তাঁহাকে প্রবোধ-বাক্যে কোনরকমে শান্ত করিবার মানসে, অবশেষে পিতৃদেব একদিন তাঁহাকে বলিলেন,—"মনু, লক্ষ্মী আমার, মন্ত্র না শিখলে যে ঠাকুরপূজো করা যায় না মা!" পিতৃদেবের মুখে এই কথা শুনিয়া অবধি বালিকা মন্ত্র পাওয়ার জন্য অত্যন্ত উতলা হইয়া উঠিলেন এবং তখন হইতে তাঁহাকে মন্ত্র শিখাইয়া দিবার জন্য পিতাঠাকুরকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিলেন। পিতৃদেবও মহাসংকটে পড়িলেন। অন্য কোনও উপায়ে বালিকার কৌতূহল নিবৃত্ত করিতে না পারিয়া, পরিশেষে তিনি একদিন কন্যাকে বুঝাইয়া বলিলেন,—"মা, আমি বলি, আজ থেকে তুমি রোজ ঠাকুরঘরে বসে মনে-প্রাণে তাঁর চরণে প্রার্থনা করতে থাক, দয়াল ঠাকুর অবশ্য তোমার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করবেন। তিনি তোমাকে মন্ত্র শিখিয়ে দেবেন।"

পিতার কথায় আশ্বস্ত হইয়া বালিকা সেইদিন হইতে, পিতৃদেব পূজা সারিয়া চলিয়া গেলে, লোহাকে লইয়া প্রত্যহ গোপনে ঠাকুরঘরে প্রবেশ করিতেন এবং 'ঠাকুর, বাবাকে তুমি মন্ত্র বলে দিয়েছ, আমাদেরও মন্ত্র শিখিয়ে দাও'—বলিয়া রাধা-মদনমোহনের চরণে প্রাণের কাতর প্রার্থনা নিবেদন করিতেন। এইভাবে তিনি দিনের পর দিন বিগ্রহদেবতার সম্মুখে ধ্যানস্থ হইয়া সাশ্রুনেত্রে কাতর কণ্ঠে কত ডাকিলেন! কিন্তু দুঃখের বিষয়, মন্ত্র পাওয়ার সৌভাগ্য ঘটিল না।

বালিকা অস্থির হইয়া পড়িলেন। রোদনের কোন ফল না হওয়ায় সরল শিশুমন এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইল যে,—পিতৃদেব ভোগরাগাদির পর ঠাকুরকে সিংহাসনে 'শয়ান' দিয়া যান, ঠাকুর তখন ঘুমাইয়া থাকেন, আর সেইজন্য তিনি তাহাদের প্রার্থনা শুনিতে পান না। সুতরাং এখন হইতে তাহারা ঠাকুরকে সিংহাসনের উপর দণ্ডায়মান রাখিয়া প্রার্থনা জানাইবে।

পরদিন রামেন্দ্রনারায়ণ অন্যদিনের মত পূজা সারিয়া বিগ্রহকে 'শয়ান' দিয়া চলিয়া গেলে, ভাইবোনে ঠাকুরঘরে গিয়া প্রবেশ করিলেন এবং বিগ্রহকে উঠাইয়া সিংহাসনের উপর দাঁড় করাইয়া কত না আবদার ও আগ্রহের সঙ্গে বলিতে লাগিলেন,—"ঠাকুর, এতদিন তুমি ঘুমিয়ে থাকতে বলে' আমাদের প্রার্থনা শুনতে পাওনি, আজ তুমি জেগে আছ, আজ কিন্তু আমাদের মন্ত্র শিখিয়ে দিতে হবে।" বালিকা বিগ্রহ-চরণে অন্তরের আকুল আকুতি নিবেদন করিতেছেন, আর অঝোরে অশ্রু বর্ষণ করিয়া বক্ষ ভাসাইতেছেন। সেদিন দীর্ঘ সময় ধরিয়া এইভাবে একান্তমনে প্রার্থনা করিতে করিতে তিনি গভীরভাবে তন্ময় হইয়া পড়িলেন।

সরলা বালিকার এই ব্যাকুল ক্রন্দন নিষ্ফল হইল না। দয়াময় সদয় হইলেন। ঐ সময় মনোমোহিনী দেবী দেখিতে পাইলেন, ঠাকুরঘরখানা অত্যুজ্জ্বল আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে, ঠাকুরের সিংহাসন হইতে বিগ্রহ-দেবতার পিত্তলমূর্তিটি সহসা কোথায় অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে, ও সুবেশভূষিত উন্নতবপু দীর্ঘ-শ্মশ্রুগুম্ফ-বিশিষ্ট গৌরকান্তি সস্মিতবদন এক জীবন্ত দিব্যপুরুষমূর্তি সেখানে উপবিষ্ট রহিয়াছেন এবং তাঁহার পদতলে গলিতকাঞ্চনতুল্য অত্যুজ্জ্বল 'রা' 'ধা' 'স্বা' 'মী' এই অক্ষর চারিটি জ্বল্-জ্বল্ করিয়া দীপ্তি পাইতেছে। এই অভূতপূর্ব অলৌকিক দৃশ্য প্রত্যক্ষ করিয়া বালিকা স্তম্ভিত হইয়া পড়িলেন, তাঁহার বক্ষঃস্থল কম্পিত হইতে লাগিল, ভয়ে ও বিস্ময়ে তিনি চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ফেলিলেন। কিয়ৎকাল পরে চক্ষু মেলিয়া তিনি দেখিতে পাইলেন, সে উজ্জ্বল আলোও নাই, সে অপূর্ব দেবমূর্তিও নাই, আর সেই সুস্পষ্ট জ্বলন্ত অক্ষরগুলিও নাই।............ সেইদিন হইতে প্রত্যক্ষদৃষ্ট সেই বিরাট পুরুষের শান্ত সৌম্য প্রসন্ন মূর্তিখানি মনোমোহিনী দেবীর মানসপটে চিরতরে সুদৃঢ়রূপে মুদ্রিত হইয়া রহিল এবং স্থূলকলেবর উদ্ভাস্বর অক্ষর চতুষ্টয়ের সেই নামটি তাঁহার অন্তরে প্রতিনিয়ত ধ্বনিত হইতে লাগিল।

বালিকা পিতৃদেবকে এই সকল ব্যাপার সবিস্তারে বলিলেন। এরূপ অভূতপূর্ব ঘটনায় অতীব বিস্মিত ও কৌতূহলাবিষ্ট হইয়া রামেন্দ্রনারায়ণ এ সম্বন্ধে কতিপয় প্রাজ্ঞ পণ্ডিত ব্যক্তির সঙ্গে বিশেষভাবে আলোচনা করিলেন। সমুদয় বৃত্তান্ত অবগত হইয়া তাঁহারা সকলে একবাক্যে এই অভিমত ব্যক্ত করিলেন যে, যদিও ইহা কোন শাস্ত্রীয় মন্ত্র নয়, তথাপি বালিকা যখন স্বয়ং এই মূর্তি ও নাম এমন

অত্যাশ্চর্যরূপে প্রত্যক্ষভাবে পাইয়াছে, তখন তাহার পক্ষে উহাই ধ্যান ও জপ করা উচিত হইবে, ইহাতে বাধা প্রদান করা কিছুতেই সঙ্গত হইবে না, কারণ ইহা এক অতীব অপূর্ব দৈব ব্যাপার। রামেন্দ্রনারায়ণ তখন মনোমোহিনী দেবীকে ডাকিয়া, শ্রদ্ধার সহিত এই মূর্তি ধ্যান ও এই মন্ত্র জপ করিতে বিশেষভাবে বলিয়া দিলেন। অষ্টমবর্ষীয়া বালিকা মনোমোহিনী দেবী তদবধি একান্ত নিষ্ঠা ও আগ্রহের সহিত তাঁহার ধ্যানলব্ধ সেই ইষ্টমূর্তির উপাসনায় ও সৎনামের সাধনায় অহর্নিশ বিভোর থাকিয়া পরমানন্দে কাল কাটাইতে লাগিলেন। ফলে অত্যল্পকাল মধ্যেই তাঁহার অধ্যাত্ম-রাজ্যের নানা অনির্বচনীয় অনুভূতিলাভ ঘটিতে লাগিল। এই সময় নবমবর্ষ বয়ঃক্রমকালে তাঁহার শুভপরিণয়কার্য নিষ্পন্ন হয়।

বিবাহের অব্যবহিত পরেই একটি বিশেষ ঘটনা ঘটে। মনোমোহিনী দেবীর পিতৃদেবের পার্শ্ববর্তী জ্ঞাতি প্রতিবেশী নবকৃষ্ণ চৌধুরী মহাশয়ের গৃহে একবার তাঁহার জামাতা ঈশ্বরচন্দ্র চক্রবর্তী বি. এ.* মহাশয় কিছুদিনের জন্য সস্ত্রীক বেড়াইতে আসিয়াছিলেন। মনোমোহিনী দেবী লক্ষ্য করিতেন, ঈশ্বরচন্দ্র প্রত্যহ স্নানান্তে একখানা গ্রন্থের কিয়দংশ অধ্যয়ন করিয়া পরম ভক্তিসহকারে একটি পটমূর্তির পূজা সমাধা করেন এবং অতঃপর সেই গ্রন্থ ও পটখানা সযত্নে বাক্সের ভিতর তুলিয়া রাখেন। ধর্মপ্রাণা বালিকাবধূর মনে ইহার রহস্য জানিবার প্রবল আগ্রহ জন্মিল। ঈশ্বরবাবুর সহিত মনোমোহিনী দেবীর বিশেষ আলাপ-পরিচয় ছিল না। সে কারণ, একদিন মধ্যাহ্ন সময়ে ঈশ্বরচন্দ্র স্নানার্থ নিকটবর্তী পদ্মানদীতে গমন করিলে, মনোমোহিনী দেবী তাঁহার স্ত্রীর সহায়তায় বাক্স হইতে পটখানি বাহির করিয়া দেখিতে পাইলেন, উহা তাঁহারই ধ্যানদৃষ্ট পূর্বোক্ত মহাপুরুষের অবিকল প্রতিচ্ছবি। ইহা দেখিবামাত্র বিস্ময় ও আনন্দের আধিক্যে মনোমোহিনী দেবীর সর্বশরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল এবং সঙ্গে সঙ্গে তিনি বাহ্যজ্ঞানশূন্য অবস্থায় ভূতলে পড়িয়া গেলেন। ঈশ্বরচন্দ্র স্নানান্তে গৃহে প্রত্যাবর্তন করিয়া সকল ব্যাপার বিস্তারিত জ্ঞাত হইলেন।

অতঃপর মনোমোহিনী দেবী কিঞ্চিৎ সুস্থ হইলে, ঈশ্বরচন্দ্র তাঁহাকে পটমূর্তিখানার পরিচয় প্রদানপূর্বক কহিলেন,—'ইহা আগ্রা-সৎসঙ্গের সন্ত সদ্‌গুরু মহাত্মা শ্রীশ্রীহুজুর মহারাজের (রায় সালিগ্রাম সিংহ বাহাদুরের) প্রতিমূর্তি। এই মহাপুরুষ এখনও সশরীরের বর্তমান আছেন। রাধাস্বামী-মতের আদিগুরু শ্রীশ্রীস্বামিজী মহারাজের তিরোধানের পর ইনিই অধুনা 'আগ্রা-সৎসঙ্গ' পরিচালনা করিতেছেন।' ঈশ্বরচন্দ্র তখন তাঁহার নিত্যপাঠ্য পুস্তকখানিও

---

* ইনি দৌলতপুর উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব স্বনামধন্য প্রধান শিক্ষক। ইঁহার পিতার নাম গোবিন্দচন্দ্র চক্রবর্তী, নিবাস পাবনা জিলার অন্তর্গত মথুরা পোস্টাফিসের অধীন খোপাকলা গ্রাম। আত্মীয়তা-সম্পর্কে ঈশ্বরচন্দ্র শিবচন্দ্রের মাসতুতো ভ্রাতুষ্পুত্র।

মনোমোহিনী দেবীকে দেখাইলেন এবং উহাতে ও অন্যান্য হিন্দীগ্রন্থে 'সদ্‌গুরু' ও 'সৎনাম' (যাহা মনোমোহিনী দেবী পূর্বেই ধ্যানযোগে জানিতে পারিয়াছিলেন)-সম্বন্ধে লিখিত বিষয়সমূহেরও সংক্ষেপে কিছু কিছু আলোচনা করিলেন। ঈশ্বরচন্দ্রের নিকট এইভাবে আপন ধ্যানলব্ধ সদ্‌গুরু ও সৎনামের প্রকৃষ্ট পরিচয় পাইয়া মনোমোহিনী দেবী প্রাণে অপূর্ব শান্তি লাভ করিলেন। সন্ত সদ্‌গুরুগণের উপদেশাবলী হিন্দী ভাষায় লিপিবদ্ধ আছে জানিতে পারিয়া মনোমোহিনী দেবী তখন হইতে এই ভাষা শিক্ষা করিতে সবিশেষ মনোযোগী হইলেন। অতঃপর অত্যল্পকাল মধ্যেই তিনি হিন্দী ভাষা আয়ত্ত করিয়া লইয়া কয়েকখানা বিশিষ্ট হিন্দী ধর্মগ্রন্থের পাঠ সমাপ্ত করিলেন। এই সকল গ্রন্থে বর্ণিত সদ্‌গুরু, সৎসঙ্গ ও সৎনামের মাহাত্ম্যের কথা সবিশেষ জ্ঞাত হইয়া তিনি নিজেও জীবন্ত সদ্‌গুরুর শ্রীচরণাশ্রয়ে স্বীয় জীবন যাপনের সংকল্প গ্রহণ করিলেন। এইবার মনোমোহিনী দেবী তাঁহার ধ্যানযোগে সদ্‌গুরু ও সৎনাম প্রাপ্তির পূর্বোক্ত সকল বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করতঃ গুরুদেব শ্রীশ্রীহুজুর মহারাজের শ্রীচরণে একখানি পত্র লিখিয়া তাঁহাকে দীক্ষাদানে ধন্য করিতে সনির্বন্ধ প্রার্থনা জানাইলেন। লিপিখানা পাওয়ামাত্রই গুরুদেব শ্রীশ্রীহুজুর মহারাজ মনোমোহিনী দেবীকে পত্রযোগে দীক্ষাদান করিলেন এবং তৎসঙ্গে সাধনপদ্ধতির সকল বিবরণ লিখিয়া জানাইলেন।

এখানে একটি কথা উল্লেখ করা বিশেষ প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। শ্রীশ্রীমার দীক্ষা-গ্রহণের কাহিনীটি আমরা এতকাল যেরূপ শুনিয়াছি, তদ্রূপই উপরে বিবৃত করিয়াছি। সম্প্রতি প্রবীণ ইষ্টপ্রাণ সংঘভ্রাতা কলিকাতা কর্পোরেশনের অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারী শ্রীধীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী বি. এ. মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎকালে, তিনি কথাপ্রসঙ্গে বলিলেন যে, এই ঘটনাটি তিনি স্বয়ং বহুবার শ্রীশ্রীমার শ্রীমুখে শুনিয়াছেন এবং তাহা অদ্যাপি সম্পূর্ণ সুস্পষ্টরূপেই তাঁহার স্মরণে রহিয়াছে। এই অবস্থায় আমরা তাঁহার প্রদত্ত বিবৃতির সারাংশটুকুও এই সঙ্গে নিম্নে লিপিবদ্ধ করিলাম। যথা—

মনোমোহিনী দেবী তাঁহার বিবাহের পর একবার কোন উপনয়ন উৎসব উপলক্ষে ঈশ্বরচন্দ্র চক্রবর্তী মহাশয়ের মেদিনীপুরের বাসায় বেড়াইতে গিয়াছিলেন। তথায় অবস্থান-কালে তিনি দেখিতেন, ঈশ্বরচন্দ্র প্রতিদিন প্রাতে ও সন্ধ্যায় পরম ভক্তিসহকারে একখানি পটমূর্তির পূজা করেন এবং পূজাশেষে যত্নপূর্বক তাহা বাক্সের ভিতর তুলিয়া রাখেন। ঈশ্বরবাবুর পূজার গোপন তথ্যটি জানিবার জন্য মনোমোহিনী দেবীর একান্ত আগ্রহ হইল। মনোমোহিনী দেবী ও ঈশ্বরবাবুর পত্নী বিপদনাশিনী দেবীর মধ্যে গভীর প্রীতিপ্রণয় ছিল। মনোমোহিনী দেবী বিপদনাশিনী দেবীকে সেই পটমূর্তিখানা দেখিবার জন্য তাঁহার একান্ত বাসনার কথা জানাইলে তিনি ঐ মূর্তি সম্বন্ধে কিছু কিছু বিবরণ

দিলেন। ইহাতে মনোমোহিনী দেবীর উহা দেখিবার আগ্রহ আরও শতগুণ বৃদ্ধি পাইল। অবশেষে মনোমোহিনী দেবী নিজেই একদিন ঈশ্বরবাবুর কক্ষে প্রবেশ করিয়া তাঁহার অজ্ঞাতসারে চাবি দ্বারা বাক্স খুলিয়া সেই ছবিখানা বাহির করিলেন। উহাতে দৃষ্টিপাতমাত্র তিনি চমকিত হইয়া উঠিলেন। কি আশ্চর্য! ইহা যে তাঁহার ধ্যানে-পাওয়া সেই মহাপুরুষেরই অবিকল প্রতিচ্ছবি! বিস্ময়ে ও আনন্দে তাঁহার সর্বশরীর শিহরিয়া উঠিল এবং সঙ্গে সঙ্গে তিনি সংজ্ঞাহারা হইয়া পড়িলেন। সকলের সেবাযত্নে কিছুকালের মধ্যেই তিনি সুস্থ হইয়া উঠিলেন।

ঈশ্বরবাবু অতঃপর মনোমোহিনী দেবীকে একান্তে ডাকিয়া লইয়া সস্নেহে তাঁহার হঠাৎ এরূপ অদ্ভুত অবস্থা ঘটিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। মনোমোহিনী দেবী তখন ঈশ্বরবাবুর নিকট তাঁহার ধ্যানকালে মূর্তি-দর্শন ও নাম পাওয়ার সকল কথা আদ্যন্ত বর্ণনা করিলেন এবং ঐ মহাপুরুষকে স্বচক্ষে দর্শন করিবার তাঁহার ঐকান্তিক আকাঙ্ক্ষার কথাও জানাইলেন।

দৈবের কি অপূর্ব সংঘটন! ঈশ্বরবাবু ছিলেন এই মহাপুরুষেরই কৃপাধন্য একজন মন্ত্র-শিষ্য। তিনি তখন মনোমোহিনী দেবীকে তাঁহার আরাধ্য গুরুদেবের পরিচয় প্রদানপূর্বক কহিলেন,—"উনি আগ্রা-সৎসঙ্গের বর্তমান কেন্দ্র-পুরুষ, রাধাস্বামী-মতের দ্বিতীয় সন্ত সদ্‌গুরু শ্রীশ্রীহুজুর মহারাজ (রায় সালিগ্রাম সিংহ বাহাদুর)। বড়ই সৌভাগ্যের বিষয়, সম্প্রতি কিছুদিন হইল, তিনি কলিকাতায় শুভাগমন করিয়াছেন। আমি আগামী শনিবার তাঁহার শ্রীপাদপদ্ম দর্শন করিতে যাইব মনস্থ করিয়াছি, তৎকালে আপনাকেও সঙ্গে লইয়া যাইব।" ঈশ্বরবাবুর এইরূপ আশ্বাসবাক্যে মনোমোহিনী দেবী অশেষ স্বস্তি লাভ করিলেন।

মনোমোহিনী দেবী অতঃপর যথাকালে ঈশ্বরবাবুর সঙ্গে যাত্রা করিয়া কলিকাতায় শ্রীশ্রীগুরুদেব হুজুর মহারাজের শ্রীচরণে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার তৎকালীন মানসিক অবস্থা অবর্ণনীয়। ধ্যানের মূর্তিকে এতদিনে সশরীরে সম্মুখে দেখিতে পাইয়া ভাববিহ্বলাবস্থায় তিনি তাঁহার রাতুল চরণে লুটাইয়া পড়িলেন। শ্রীশ্রীগুরুদেব তাঁহাকে স্মিতমুখে মধুরকণ্ঠে স্বাগত জানাইয়া বলিলেন,—"আও বেটী, তুম্‌হারাওয়াস্তে হম্‌ কল্‌কত্তা আয়া।" গুরুদেব তখন মনোমোহিনী দেবীকে আদর করিয়া কত কথা বলিলেন, সস্নেহে মাথায় হাত বুলাইয়া কত আশীর্বাদ করিলেন। মনোমোহিনী দেবীর তৃষিত পরাণ এতদিনে শান্ত হইল। জীবন্ত সদ্‌গুরুর সাক্ষাৎ দর্শনলাভে তিনি ধন্য হইলেন। এই সময় শ্রীশ্রীহুজুর মহারাজ মনোমোহিনী দেবীকে যথারীতি সৎমন্ত্রে দীক্ষিত করিলেন। তাঁহার ধ্যানলব্ধ দীক্ষা শ্রীশ্রীগুরুকৃপায় আজ সার্থক হইল।

দীক্ষাগ্রহণের পর হইতে গুরু-শিষ্যার মধ্যে নিয়মিত পত্রালাপ চলিতে থাকে। গুরুদেব মনোমোহিনী দেবীকে 'সুশীলে' বলিয়া সম্বোধন করিতেন। তিনি তাঁহাকে তাঁহার নিকট বাংলা-ভাষায় পত্রাদি লিখিতে নির্দেশ দিলেন। মনোমোহিনী দেবী প্রায়শই তাঁহার সাংসারিক ও পারমার্থিক ব্যাপারাদি গুরুদেবের চরণে নিবেদন করিতেন, গুরুদেবও তাঁহাকে সকল বিষয়ে যথাযোগ্য উপদেশ, নির্দেশ ও সাহায্যদানে অনুগৃহীত করিতেন।

প্রথম জীবনে মনোমোহিনী দেবী একবার খুব অভাবে পড়িয়াছিলেন। এই সংবাদ জানিতে পারিয়া গুরুদেব তাঁহাকে অর্থ সাহায্য করিতে চাহিলে, মনোমোহিনী দেবী তাঁহাকে জানাইয়াছিলেন—"গুরুদেবকে দিয়াই শিষ্য ধন্য হয়, শিষ্যের পক্ষে গুরুর দান গ্রহণ করা মহাপাপের কারণ। প্রাণান্তেও আমি আপনার দান লইতে পারি না।" তদুত্তরে গুরুদেব লিখিলেন,—"আমাকে তুমি পর ভাবিও না। আমার অর্থ তোমারই, তোমার অর্থও আমারই। এখন তোমার অভাবের সময়, আমার সাহায্য তুমি লও। পরমপিতার দয়ায় শীঘ্রই তোমার বিপদ কাটিয়া যাইবে। তোমার সুদিন আসিলে তুমি আমাকে দিও।" গুরুদেব হুজুর মহারাজ ও শিষ্যা মনোমোহিনী দেবীর মধ্যে গভীর শ্রদ্ধা-প্রীতির কিরূপ নিবিড় মধুর সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল উপরিবর্ণিত ঘটনায় তাহার সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়।

গুরুদেবের পূজার্চনা লইয়াই মনোমোহিনী দেবী দিবসের অধিকাংশ সময় ব্যাপৃত থাকিতেন। সাধন-ভজনের সুবিধার জন্য তিনি স্বীয় বাসভবনে পদ্মাতীরে নিম্ববৃক্ষতলে একটি সুন্দর মন্দির নির্মাণ করাইয়াছিলেন এবং তাহাতে গুরুদেবের একখানি পূর্ণাবয়ব বৃহদায়তন প্রতিকৃতি স্থাপনকরতঃ ত্রিসন্ধ্যা নামধ্যান ও উপাসনায় অতিবাহিত করিতেন। প্রতিদিন অপরাহ্ণে আশ্রম ও পল্লীর অধিবাসীদের লইয়া সদ্‌গ্রন্থপাঠে এবং সদ্‌গুরু ও সৎনামের মাহাত্ম্য-আলোচনায় সময়-যাপন তাঁহার অন্যতম নিত্যকর্ম ছিল। গুরুদেবের জন্মতিথি এবং অন্যান্য পূজা, পার্বণ উপলক্ষে তিনি বিপুল সমারোহ গুরু-পূজার আয়োজন করিতেন। গুরুদেবের ইচ্ছা-পূরণ এবং তাঁহার প্রীত্যর্থে কর্তব্য সম্পাদনের জন্য তিনি সর্বক্ষণ উন্মুখ থাকিতেন। রাধাস্বামী-মতের তৎকালীন ও তৎপূর্বতন গুরুগণের পুণ্য লীলাভূমি—কাশী, আগ্রা, এলাহাবাদ প্রভৃতি স্থানে প্রায়শ তীর্থ-পর্যটনে গমন করিয়া তিনি অন্তরে প্রভূত আনন্দ ও শান্তি লাভ করিতেন।

গুরুদেবের প্রতি মনোমোহিনী দেবীর কিরূপ প্রগাঢ় শ্রদ্ধা-ভক্তি ছিল, তাহার পরিচিতি-স্বরূপ নিম্নে তাঁহার স্বরচিত কয়েকটি বন্দনা-গীতি উদ্ধৃত হইল।

১

দয়া কর গুরুদেব আঁধার অবনী'পরে
বিতরি করুণা-কণা জাগাও নিদ্রিত নরে।
করিবে দয়া যখনি
জাগিবে সকল প্রাণী
পালাবে সংশয় যত
তব আগমন হেরে ॥
তুমি হে পরমপিতা
তুমি সর্বসুখদাতা
তব প্রেমে কত মধু
বুঝাও যতন করে ॥
পাইলে তব আস্বাদ
ঘুচিবে সব অবসাদ
দূরে যাবে সব পরমাদ
নাচিবে আনন্দ ভরে ॥

২

আমি জনম অবধি
কাঁদি নিরবধি
ভাবি কত মনে মনে ॥
(আমি) বিরলে বসিয়া
তোমারে ভাবিব
মিশিব তোমার সনে ॥
আমার দুখের বোঝা
বহিয়া বহিয়া জীবন হয়েছে কালি ॥
ভেবেছিনু মনে
তোমারি চরণে
সুখদুখ দিব ডালি ॥
আমার সাধন-সম্বল
কিছু নাহি হ'লো
চিরভিখারিণী আমি।
অনন্ত অপার তুমি হে মূলাধার
শুন হে জগৎস্বামী ॥

৩

গুরু ভরসা সৎসঙ্গ, পাবনা
২৩শে শ্রাবণ, ১৩৪৪

তুমি আসিয়াছ নাথ তোমারি আলয়ে
আমি শুধু আছি কেবল চাহিয়া।
ঐ রূপের নেশায় বেঁধেছো আমায়
তাই নীরবে রয়েছি বসিয়া॥
সাধন ভজন জানি নাকো কভু
নাহি জানি ধ্যান-ধারণা।
বুঝে মন মম ও রূপমোহন
মোহিত না করি ছাড়ে না॥
তাই মনে হয় রূপের সাগরে
যাই যেন সদা ডুবিয়া।
ফুরাইবে জ্বালা শীতল হইব
তোমার পরশ পাইয়া॥

নিয়ত গুরুদেবের দিব্যমূর্তি-ধ্যান, তাঁহার পুণ্যনাম-কীর্তন, তাঁহার পূতচরিত-কথন এবং প্রায়শ তাঁহার পবিত্র সান্নিধ্যসম্ভোগের অমিয় প্রভাবে ভক্তিমতী মনোমোহিনী দেবী কালক্রমে তাঁহার বিশেষ অন্তরঙ্গ ও অনুরাগিণী এবং সাধন মার্গের একজন উন্নত সাধিকা হইয়া উঠিয়াছিলেন। আপন গুরুদেবেরই মত ঈশ্বর-প্রেমিক লোকপালক আদর্শচরিত্র একটি সুসন্তানের জননী হইয়া নারীজন্ম সার্থক করিবার এক প্রবল বাসনা তাঁহাকে এক সময় এমনই পাগল করিয়া তুলিয়াছিল যে, সে-কথা তিনি তাঁহার জীবনসর্বস্ব প্রিয়পরমের শ্রীপদে নিবেদন না করিয়া পারেন নাই। প্রিয় শিষ্যার এরূপ সদভিলাষে একান্ত প্রীত হইয়া, গুরুদেব তাঁহাকে আশীর্বাদ করিয়াছিলেন,—"তুমি ভাবিও না। পরমপিতার ইচ্ছায় তোমার প্রথম সন্তান একজন মহাপুরুষ হইবে, সে তোমাকে পূর্ণানন্দ দান করিবে।" গুরুদেবের শ্রীচরণে মনোমোহিনী দেবী আর একদিন কাতর-কণ্ঠে নিবেদন করিয়াছিলেন,—"বাবা, আমি থাকি বাংলার এক নিভৃত পল্লীতে। সেখানে কোন গুরুভাই নাই যে, একটু সৎসঙ্গ করব।" গুরুদেব সেদিন তাঁহাকে আশীর্বাদ করিয়াছিলেন—"বেটী, দুঃখ করিস না, তোর এমন দিন আসছে যে, সৎসঙ্গীতে তোর বাড়ী ভরে যাবে।"

যেমনই গুরুভক্তি তেমনই পাতিব্রত্যের অমল দীপ্তিতে মনোমোহিনী দেবীর চরিত্রটি ছিল চিরসমুজ্জ্বল। পতিদেবতার স্বার্থ, প্রতিষ্ঠা ও প্রীতির জন্য কায়মনোবাক্যে কর্তব্যসাধনই ছিল তাঁহার গার্হস্থ্যজীবনের একমাত্র তপস্যা।

পিতৃদেব রামেন্দ্রনারায়ণের তিরোধানে তাঁহার পরিত্যক্ত সংসারের বিপুল দায়িত্ব-ভার লইয়া স্বামী শিবচন্দ্র যখন খুবই বিব্রত হইয়া পড়িয়াছিলেন, তখন একসময় মনোমোহিনী দেবীই ছিলেন তাঁহার সাহায্য, বল, ভরসা ও প্রেরণার একমাত্র উৎস। তখন স্বামীর সঙ্গে সকল ব্যাপারে আপ্রাণ সহযোগিতা করিয়া তিনি যথার্থই আদর্শ সহধর্মিণীর দায়িত্ব পালন করিয়াছিলেন। এই সময় তিনি সংসারের সকল কার্য সুষ্ঠুরূপে সম্পাদনের সঙ্গে প্রজাগণের নিকট হইতে খাজনাপত্রাদি আদায়, বিষয়-সম্পত্তির তত্ত্বাবধান, মামলা-মোকদ্দমাদির পরিচালনে পরামর্শদান প্রভৃতি প্রতিটি দায়িত্বপূর্ণ কার্যে স্বামীকে বাস্তবভাবে সাহায্য করিতেন। বিপদ-আপদ, অভাব-অসুবিধার আঘাতে স্বামী যাহাতে কোন অবস্থায়ই নিজেকে কখনও বিন্দুমাত্র বিপন্ন বোধ না করেন, সেজন্য সাধ্বী পত্নী অসীম ধৈর্য, প্রখর বুদ্ধিমত্তা ও তীব্র কর্মতৎপরতার সঙ্গে সকল ব্যাপারের সম্যক ব্যবস্থাপনা দ্বারা তাঁহাকে সর্বক্ষণ স্বস্থ রাখিতে আপ্রাণ চেষ্টা করিতেন।

একবার শিবচন্দ্র একাদিক্রমে কয়েক বৎসর শয্যাগত অসুস্থ ছিলেন। সংসারে অর্থাগম তখন প্রায় বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। এই মহাসংকটকালে মনোমোহিনী দেবী যেরূপ অপূর্ব আত্মবিশ্বাস, অটুট ধৈর্য, অসীম ত্যাগ ও অদ্ভুত বুদ্ধি-কৌশলে নিমজ্জমান সংসার-তরণীটিকে রক্ষা করিয়াছিলেন, তাহা কল্পনারও অতীত। সেই নিদারুণ অভাবের সময়েও সংসার-পরিচালনার কোন ব্যাপারে তিনি বিন্দুমাত্র ত্রুটি ঘটিতে দিতেন না। গুরুদেবের প্রতি জ্বলন্ত বিশ্বাসের বলে তিনি নিত্য নূতন উপায় উদ্ভাবন করতঃ পরিবারের অন্নবস্ত্রের ব্যবস্থা, স্বামীর চিকিৎসা, সন্তানগণের শিক্ষা, বিষয়সম্পত্তির সংরক্ষণ, চিরাচরিত পূজাপার্বণাদির অনুষ্ঠান, দীনদুঃখীকে সাহায্যদান, অতিথি-সৎকার প্রভৃতি অবশ্যকরণীয় সকল কর্তব্য বিশেষ নিষ্ঠার সহিত প্রতিপালন করিতেন; আবার, তৎসঙ্গে অনুসন্ধিৎসু সেবায় স্বামীর মনোরঞ্জনেও সর্বদা তৎপর থাকিতেন। স্বামী যখন যাহা খাইতে চাহিতেন, যাহা পরিতে ভালবাসিতেন, যখন যে কাজ যেভাবে সম্পাদনের ইচ্ছা প্রকাশ করিতেন, শত অসুবিধার মধ্যেও তিনি তাহার যথাযথ সুব্যবস্থা করিয়া তাঁহার চিত্ত-প্রসাদনে যত্নবতী হইতেন। তাঁহার ঈদৃশ পতিনিষ্ঠার উদাহরণ স্বরূপ বহু ঘটনার একটি নিম্নে বিবৃত করা গেল।

একদিন শিবচন্দ্রের জনৈক ঘনিষ্ঠ আত্মীয় তাঁহাদের বাড়ীতে বেড়াইতে আসিয়াছিলেন। ভদ্রলোকের গায় পাঁচ-ছয় টাকা মূল্যের একখানা সুন্দর চাদর ছিল। এইরূপ একখানা চাদর পরিবার শিবচন্দ্রের বড়ই সাধ হইল। বাড়ী গিয়াই তাঁহার জন্য একখানা চাদর পাঠাইয়া দিতে তিনি ভদ্রলোকটিকে বিশেষ-ভাবে বলিয়া দিলেন। আত্মীয়টিও তাঁহার অনুরোধ অবশ্যই রক্ষা করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিয়া গেলেন, কিন্তু তাহা পালন করিলেন না। এদিকে আবার তিনি শিবচন্দ্রেরই প্রতিবেশী তাঁহার (ভদ্রলোকটির) অপর এক আত্মীয়ের

নিকট উক্তরূপ একখানা চাদর অনতিবিলম্বে প্রেরণ করিলেন। আত্মীয়জনের ঈদৃশ অবজ্ঞাসূচক আচরণে শিবচন্দ্র খুবই ব্যথিত হইলেন। পতিপ্রাণা মনোমোহিনী দেবী স্বামীকে প্রবোধ দিয়া বলিলেন,—"দুঃসময়ে আপনজনই অধিক বিরূপ হয়। ইহাই সংসারের নিয়ম। ইহাতে দুঃখ করিবার কিছুই নাই। আমি যেরূপেই পারি আপনাকে আরও ভাল একখানা চাদর আনিয়া দিব।" সাধ্বী পত্নী অতিকষ্টে অর্থসংগ্রহ করতঃ স্বামীর জন্য অতিসত্বর একখানা উৎকৃষ্ট চাদর খরিদ করিয়া আনিলেন এবং স্বামীকে তাহা পরাইয়া অন্তরে অপার আনন্দ লাভ করিলেন।

স্বামীর অতুলনীয় মহত্ত্ব ও উদারতায় মুগ্ধ থাকিয়া মনোমোহিনী দেবী আজীবন তাঁহাকে দেবতার মতই সেবাপূজা ও ভক্তি-শ্রদ্ধা করিতেন। বলিতে কি, শিবচন্দ্রও স্ত্রীর মহনীয় চরিত্র-মাধুর্যে প্রীত হইয়া চিরদিনই তাঁহার প্রতি অত্যন্ত স্নেহশীল ছিলেন। তাঁহাদের স্বামী-স্ত্রী উভয়ের সে মধুর সম্পর্কের এক সুন্দর পরিচয় পাওয়া যায় মনোমোহিনী দেবীর কয়েকটি কথায়। কথাপ্রসঙ্গে একদিন তিনি বলিতেছিলেন,—

"পিসীমা (গোলকপুরের রানীমা) একবার আমাদের সঙ্গে নিয়ে কাশী গিয়েছিলেন। সেখানে থাকতে প্রায় প্রত্যহই আমি গুরুদেবের শ্রীচরণদর্শনে যাবার সুযোগ পেতাম। রোজই রাত্রি গভীর হতো বাড়ী ফিরতে। তখন আমার উঠ্‌তি বয়স—ভরা যৌবন। রাত্রিবেলায়ও আমি একাকীই যাতায়াত করতাম। কিন্তু, বলতে কি, কর্তা একদিনও আমার ইচ্ছাপূরণের বিরুদ্ধাচরণ করেন নি, কিংবা এজন্য আমার উপর বিন্দুমাত্র অসন্তুষ্ট হন নি। তিনি আমার এই পাগলামীকে প্রশ্রয় দিয়েও আমাকে বরং আরও উৎসাহিতই করেছেন। তাঁর এই মধুর ও মহৎ আচরণ এবং আমার প্রতি তাঁর অগাধ ভালবাসা আমাকে চিরঋণী করে রেখেছে তাঁর চরণে। তাঁর প্রেরণাই আমাকে আরও নিবিড়ভাবে ইষ্টমুখী করে তুলেছে। পরমপিতার অশেষ করুণা, তাই এমন স্বামী পেয়েছি।"

মনোমোহিনী দেবী নয়টি সন্তানের জননী ছিলেন। দুর্ভাগ্যের বিষয়, তাঁহার পাঁচটি সন্তানই অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এই দুঃসহ শোকজ্বালা বক্ষে চাপিয়া অবিচলিত নিষ্ঠার সহিত তিনি সারাজীবন সংসার-ধর্ম পালন করিয়া গিয়াছেন। সন্তানের পরিপালনে ও উন্নতিসাধনে তাঁহার যত্ন ও শ্রমের অন্ত ছিল না। যেমনই বাল্যকালে লেখাপড়ার ব্যাপারে তেমনই যৌবনে যশোবৃদ্ধির জন্য স্নেহময়ী জননীর কি উদগ্র আগ্রহ ছিল, নিম্নোদ্ধৃত লিপি দুইখানিতে তাহার প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়।

বালক অনুকূলচন্দ্র যখন পিতৃদেবের সঙ্গে ঢাকা-জিলায় আমিরাবাদে থাকিয়া রাইপুরা-হাইস্কুলে অধ্যয়ন করিতেছিলেন, জননী মনোমোহিনী দেবী তাঁহাকে হিমাইতপুর হইতে লিখিতেছেন,—

গুরু সহায়

হিমাইতপুর

কল্যাণবরেষু,

অনুকূল, তোমার পত্র পাইয়া আমি সুস্থির হইলাম। তোমরা বুঝিতে পার না, পত্র না দিলে আমি কতখানি ব্যস্ত থাকি। প্রতিদিন একখানা করিয়া পত্রের আশা করি।

তুমি সতত সাবধানে থাকিয়া মনোযোগপূর্বক লেখাপড়া করিবে। কাহারও জন্য কোন চিন্তা করিবে না। যাহাতে আগামী বর্ষে পাশ করিতে পার, তাহাই করিবা। আমার চির আশীর্বাদ ও চির আকিঞ্চন যে, তুমি দীর্ঘজীবী হইয়া বিদ্যাবানের ও জ্ঞানিগণের শীর্ষস্থান অধিকার কর। গুরুদেব এই আশীর্বাদ প্রদান করুন।

দেখ অনুকূল। আমি তোমাকে চোখের আড়াল করিতে পারি না। কাহারও নিকট রাখিতে সাহস পাই না। এখানে আসিয়া পড়িলে ভাল হইত। কর্তার শরীর কেমন? ইতি—

নিত্য আশীর্বাদিকা
তোমার মাতা

অনুকূলচন্দ্র প্রৌঢ়দশায় উপনীত হইলে, তাঁহার যশ দেশময় ছড়াইয়া পড়ে। মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিণী জননী দেবীর তখনও পুত্রের উন্নতির জন্য আকুল প্রার্থনার বিরাম নাই। পুত্রকে তিনি লিখিতেছেন,—

গুরু সহায়

কলিকাতা, মঙ্গলবার
২৩।২।৩৮ (বাং)

পরম কল্যাণবরেষু,

অনুকূল, প্রার্থনা করি পরমপিতা তোমাকে সুদীর্ঘ জীবন দান করুন এবং বিশ্ববিজয়ী করিয়া তুলুন। তাহা হইলে আমার মানুষ-জীবন সার্থক হয়। আমি তাঁহার অধমা অযোগ্যা সন্তান। পরমপিতা যখন দয়া করিয়া এতখানি করিয়া তুলিয়াছেন, তখন নিশ্চয়ই এ দীনার প্রার্থনা মঞ্জুর করিবেন। ইতি—

আশীর্বাদিকা
মা

অপরের বিপদ-আপদ, দুঃখ-দৈন্য ও রোগ-শোকে মনোমোহিনী দেবীর কোমল হৃদয় সহজেই বিগলিত হইত। বিপন্ন ব্যক্তিকে সময়োচিত সাহায্য-প্রদানে স্বস্থ করিয়া তুলিবার জন্য তিনি স্বভাবতই অস্থির হইয়া পড়িতেন। যত ক্ষণ না আর্তের দুঃখ-মোচনে সমর্থ হইতেন, তাঁহার মন অশান্ত থাকিত। করুণা-

বিতরণে তাঁহার কোন ভেদ-বিচার ছিল না। ধনী-দরিদ্র, শত্রু-মিত্র, স্ত্রী-পুরুষ কতজনে কতভাবে যে তাঁহার সাহায্য, সহযোগিতা ও সহানুভূতি লাভে উপকৃত হইয়াছে তাহার অবধি নাই। কাহারও কোন অভাব-অভিযোগ বা অসুখ-অসুবিধার সংবাদ পাইলে তিনি তৎক্ষণাৎ ছুটিয়া গিয়া তাহা নিরাকরণের ব্যবস্থা করিতেন। গ্রামে কলেরা ও বসন্তরোগের প্রাদুর্ভাব হইলে, তিনি বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়া সকলের খোঁজখবর লইতেন এবং অনেক সময় সংকটাপন্ন রোগীর সেবা-শুশ্রূষার দায়িত্ব নিজহস্তে গ্রহণ করিতেন। কোন রমণীর প্রসব-বেদনা উপস্থিত হইয়াছে জানিতে পারিলে, তিনি তন্মুহূর্তে সেখানে যাইয়া তৎকালীন তাবৎ কর্তব্যের সুসম্পাদনে প্রাণপণ সাহায্য করিতেন। কোনও বাড়ীতে কাহারও মৃত্যু ঘটিলে, তিনি অবিলম্বে সেখানে উপস্থিত হইয়া শোকার্ত পরিবারকে সান্ত্বনা দান ও সেবা-শুশ্রূষা করিতেন এবং মৃতের সৎকারের যথাযথ ব্যবস্থা করিতেন।

করুণাময়ী মনোমোহিনী দেবীর পূতজীবনে পরদুঃখকাতরতার দৃষ্টান্তের অভাব নাই। আমরা নিম্নে সে সমুদয় অসংখ্য কাহিনীর মাত্র কয়েকটি উল্লেখ করিতেছি।

মনোমোহিনী দেবীর তখন চরম আর্থিক দুরবস্থা। একদিন আদালতের পিয়ন ডিক্রীজারীর ক্রোকী পরওয়ানা লইয়া শিবচন্দ্রের গৃহে উপস্থিত হইল। সেদিন মনোমোহিনী দেবীর হস্তে একটি কপর্দকও ছিল না। বিপদের উপর বিপদ। সেই মুহূর্তেই গ্রামবাসী হরিবোলা ভূঁইমালী ছুটিয়া আসিয়া তাঁহার পদতলে পড়িয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল,—"মা ঠাকরুণ, আমি মহা সংকটে পড়েছি। ঋণের দায়ে আমার যথাসর্বস্ব যেতে বসেছে। এক্ষুণি মহাজনকে একশত টাকা না দিলে, আমার ভিটে-মাটি সব উৎসন্ন যাবে, বাঁচবার আর কোন উপায় থাকবে না।" হরিবোলার দুর্দশার কথা শুনিয়া দয়াবতী মনোমোহিনী দেবীর কোমল প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল, হরিবোলাকে রক্ষা করিবার জন্য তিনি অস্থির হইয়া পড়িলেন। তখন স্বল্প সময়ের মধ্যে অর্থ সংগ্রহের অন্য কোন উপায় না পাইয়া তিনি আপন শিশুপুত্র অনুকূলচন্দ্রের হাতের সোনার বালাজোড়া ও গলার হারগাছি গ্রামের স্বর্ণকারের কাছে গচ্ছিত রাখিয়া একশত টাকা ধার লইলেন এবং তদ্দ্বারা হরিবোলার দায় মিটাইয়া স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিলেন।

মনোমোহিনী দেবীর মধ্যমপুত্র প্রভাসচন্দ্র একবার শৈশবকালে কঠিন কৃমি-বিকারে খুবই অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাঁহার চিকিৎসার জন্য মনোমোহিনী দেবী যথেষ্ট অর্থব্যয়ে সহর হইতে একজন অভিজ্ঞ ডাক্তার আনাইয়াছিলেন। এই সময় তিনি সংবাদ পাইলেন, পল্লীর এক দীন-দরিদ্রা রমণীর একমাত্র পুত্রটিও এই ব্যাধিতে ভীষণ কষ্ট পাইতেছে, চিকিৎসার অভাবে তাহার অবস্থা অতীব সংকটাপন্ন হইয়া উঠিয়াছে। ছেলেটির জন্য মনোমোহিনী দেবী অত্যন্ত অস্থির



জননী মনোমোহিনী দেবী

হইয়া পড়িলেন। তিনি কালবিলম্ব না করিয়া উক্ত ডাক্তারবাবুকে সঙ্গে লইয়া বিপন্না নারীর সাহায্যের জন্য তাঁহার বাড়ীতে গিয়া উপস্থিত হইলেন এবং ডাক্তারের জন্য ভিজিট, ঔষধ ও পথ্যাদির মূল্য নিজ হইতে দিয়া রুগ্ন বালকের চিকিৎসাপত্রের যথোচিত সুব্যবস্থা করিয়া বাড়ী ফিরিলেন।

একদিন মনোমোহিনী দেবী সংসারের হিসাবপত্রাদি লেখার কাজে ব্যস্ত আছেন। ইষ্টভ্রাতা অবিনাশচন্দ্র অধিকারী এম. এ, বি. এল. (আকুদা) তখন সেখানে তাঁহার কাছে উপস্থিত ছিলেন। এই সময় জনৈক গ্রামবাসী তথায় আসিয়া মনোমোহিনী দেবীকে কাতরকণ্ঠে বলিলেন,—"মা দীর্ঘদিন ধরে' আমি অসুখে ভুগছি, রোজগার-পত্র কিছুই নেই, বাড়ীসুদ্ধ সকলের অনাহারে দিন কাটছে। ছোট ছেলেটার আবার ভীষণ জ্বর হয়েছে। তাকে একটু বার্লিও কিনে এনে দিতে পারি না। বড়ই বিপন্ন হয়ে আজ আপনার কাছে এসেছি। আমাকে কিছু সাহায্য না করলে ছেলেপিলে নিয়ে একদম মারা পড়ব।" মনোমোহিনী দেবী সব শুনিয়া লোকটিকে বৈঠকখানা ঘরে গিয়া একটু অপেক্ষা করিতে বলিলেন। এই সময় অবিনাশচন্দ্র তাঁহাকে গোপনে বলিলেন,—"মা, আপনি জানেন না, এই লোকটি আপনাদের ঘোর শত্রু। একে সাহায্য করা কখনো উচিত হবে না।" তাঁহার কথা শুনিয়া মনোমোহিনী দেবী অতীব ব্যথার সুরে বলিলেন,—"আকু, তুই তো কোনদিন দারিদ্র্যের কষাঘাত সহ্য করিস নি। অনাহারের কষ্ট তোরা কি বুঝবি! ছেলেপিলেগুলো না খেতে পেয়ে ছটফট কচ্ছে, তাদের মা নিরুপায় হ'য়ে তাই তাকিয়ে দেখছে, আর তার দুই চোখ জলে ভরে উঠছে, সে যে কি দুঃখ, তোকে কি ক'রে বুঝাবো ? আমি না খেয়েও ওকে সাহায্য করবো।" বলিতে বলিতে তিনি কাঁদিয়া ফেলিলেন। অবিনাশচন্দ্র তখন লজ্জায় ম্রিয়মাণ হইয়া বলিলেন, - "মা, আমার অপরাধ হয়েছে। আমি অতি নীচ, তাই আপনার এত বড় প্রাণে আঘাত দিয়েছি, আমার খুব শিক্ষা হ'ল। আমায় ক্ষমা করুন।" মনোমোহিনী দেবী অতঃপর ঐ লোকটিকে ডাকিয়া আনিয়া তাহাকে যথাশক্তি অর্থসাহায্য এবং ভবিষ্যতের জন্যও যথেষ্ট আশ্বাস-ভরসা দান করিয়া বিদায় দিলেন।

একবার শারদপূজার সময় মনোমোহিনী দেবী নিজ পরিবারবর্গ, আশ্রমবাসী এবং দুঃস্থ গ্রামবাসীদের প্রয়োজনপূরণের উদ্দেশ্যে অতিকষ্টে বহু অর্থব্যয়ে অনেকগুলি কাপড়-চোপড় এবং বেশ-কিছু অধিক-পরিমাণ চাল-ডাল সংগ্রহ করিয়াছিলেন। দুঃখের বিষয়, একদিন রাত্রিবেলায় এই সকল জিনিসপত্র সমুদয়ই চুরি হইয়া যায়। অতঃপর অনুসন্ধানে জানা গেল, আশ্রমের কাজে নিযুক্ত গ্রামের দীন-দরিদ্র মজুরেরাই এই দুষ্কর্ম করিয়াছে। বলিতে কি, মনোমোহিনী দেবী তাহাদের উপর বিন্দুমাত্র বিরক্ত বা ক্রুদ্ধ হইলেন না, বরং তিনি আপন মনে এই বলিয়া প্রবোধ নিলেন যে, অভাবের তাড়নায়ই তাহারা এরূপ অপকর্ম

করিতে বাধ্য হইয়াছে ; বিশেষ, নিজেকেই তাহাদের দুরবস্থার জন্য দায়ী মনে করিয়া তিনি তাহাদের দুঃখ-লাঘবের জন্য চেষ্টিত হইলেন। তখন হইতে তিনি উঁহাদের দৈনিক মজুরীর হার কিছুটা বাড়াইয়া দিলেন এবং তাহাদিগকে নির্দিষ্ট কার্যকালের অধিক সময় কাজ করিবার সুযোগ দিয়া তাহাদের জন্য অতিরিক্ত পারিশ্রমিকের ব্যবস্থা করিলেন।

এক সময় মনোমোহিনী দেবী কলিকাতার গোয়াবাগান-অঞ্চলে ঈশ্বর মিল বাই-লেনের এক বাড়ীতে কিছুকাল বাস করিয়াছিলেন। এই বাড়ীরই অপরাংশে 'সৎসঙ্গে'র ভূতপূর্ব সম্পাদক ৺শ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায় এম-এস-সি মহাশয়ের (তখন তাঁহার বাল্যাবস্থা) মা ও দুই মাসীমা থাকিতেন। ইহা তাঁহাদেরই পৈতৃক বাটী। তখন অল্পদিন গত হইয়াছে তিন ভগিনীরই অকাল বৈধব্যদশা ঘটিয়াছে। পরিবারটির অতীব শোচনীয় অবস্থা। গৃহিণীরা সবাই শোকার্তা, সর্বক্ষণ কান্নাকাটি, রান্নাখাওয়া নাই, পরিচর্যার অভাবে শিশুরা শ্রীহীন। শোকাকুলা ভগিনীদের করুণ ক্রন্দন পার্শ্ববর্তিনী মনোমোহিনী দেবীর কর্ণকুহরে নিয়তই ধ্বনিত হইত। বাল্যবিধবাদের মর্মন্তুদ ব্যথার আঘাতে তাঁহার বক্ষপঞ্জর বিদীর্ণ হইয়া যাইত. তিনি কিছুতেই স্থির থাকিতে পারিতেন না। তাঁহাদের সে দুঃসহ বেদনা প্রশমনের আকুল আগ্রহে একদিন তিনি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়াই তাঁহাদের গৃহে গিয়া উপস্থিত হইলেন এবং দরদী আত্মীয়ের মত তাঁহাদিগকে সান্ত্বনাদানের যথাসাধ্য চেষ্টা করিলেন। অবশেষে অত্যন্ত আদরের সহিত আব্দারের সুরে তিনি তাঁহাদিগকে বলিলেন,—"দ্যাখ, আমার বড় খিদে পেয়েছে, তোরা তাড়াতাড়ি দু'টো রান্নার যোগাড় কর, ছেলেপিলেদের খেতে দে, তোরা খা, আমিও তোদের সাথে এক মুঠো খাব।"

শোকসন্তপ্তা ভগিনীদের তৎকালীন মানসিক অবস্থা অবর্ণনীয়। অশান্তির আগুনে তাঁহাদের অন্তর দাউ দাউ করিয়া জ্বলিতেছে। এদিকে গৃহে এক বিশিষ্ট অতিথি উপস্থিত। তাঁহাকে তো কিছুতেই অভুক্ত রাখা যায় না! মহা সমস্যায় পড়িলেন তাঁহারা। কি করেন, অগত্যা অতিথিসৎকারের বিশেষ কর্তব্যপালনের প্রয়োজনে তাঁহারা কোনমতে কিছু অন্নব্যঞ্জনের আয়োজন করিলেন। মনোমোহিনী দেবী নিজেই যাইয়া রন্ধন-কার্য সমাপ্ত করিলেন। নিজেই ছেলেপিলেদের ডাকিয়া স্নান করাইয়া খাওয়াইয়া দিলেন। অতঃপর তিনি ভগিনী তিনজনকে লইয়া স্নান করিলেন এবং তাঁহাদের সঙ্গে আহার করিলেন। তদবধি তিনি প্রায়শ তাঁহাদের বাড়ীতে যাতায়াত করিতেন, সকলের সেবা-পরিচর্যা করিতেন। আপন সহোদরা ভগিনীরই মত তিনি তাহাদিগকে ভালবাসিতেন এবং তাঁহাদের অন্তরে শান্তির প্রলেপ দিতে কত না চেষ্টা করিতেন। তিনি তাঁহাদিগকে নানা সদ্‌গ্রন্থ পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়া শুনাইতেন, তাঁহাদের নিকট সদ্‌গুরু ও সৎনামের মহিমা কীর্তন করিতেন। মনোমোহিনী দেবীর ঈদৃশ সস্নেহ সযত্ন পরিচর্যায় ভগিনীদের

অশান্ত অন্তরের উদ্বেল শোকাবেগ ধীরে ধীরে প্রশমিত হইতে লাগিল। এইভাবে কিছুকালের মধ্যেই মনোমোহিনী দেবীর সহিত ভগিনীগণ গভীর শ্রদ্ধা ও প্রীতির সুনিবিড় বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া পড়িলেন। ভগিনীগণ তখন হইতে প্রাণের সহজ টানে মনোমোহিনী দেবীকে 'দিদি' বলিয়া সম্বোধন করিতেন, তাঁহাদের ছেলেপিলেরাও তাঁহাকে 'মাসীমা' ডাকিত।

একদিন মনোমোহিনী দেবী ভগিনীদের সহিত আলাপ-আলোচনাকালে আপন পুত্র অনুকূলচন্দ্রের কথা তুলিয়া বলিলেন,—"দ্যাখ, আমার এক ছেলে আছে, সবারই জন্য তার এমনি প্রাণকাড়া টান যে, তার আপন-ভোলা মধুর ব্যবহারে বহুলোক তাহার সঙ্গসুখ লাভের আকাঙ্ক্ষা করে, তাকে অন্তর দিয়ে ভালবাসে ও একান্ত শ্রদ্ধা-ভক্তি করে। তাকে বিয়ে দিয়েছি, সন্তানও হয়েছে। তাকে তোরা একবার দেখবি? আমার মনে হয়, তার সঙ্গে কথাবার্তা বললে তোরাও খুব শান্তি পাবি।" মনোমোহিনী দেবীর কথা শুনিয়া ভগিনীরা সকলেই অনুকূলচন্দ্রকে দেখিবার জন্য একান্ত উতলা হইয়া উঠিলেন। মনোমোহিনী দেবী অতঃপর একদিন পুত্রকে সঙ্গে লইয়া গিয়া তাঁহাদের সহিত পরিচয় করাইয়া দিলেন। কমনীয়কান্তি সহাস্যবদন অনুকূলচন্দ্রের সহিত আলাপ-আলাপনে এবং তাঁহার প্রাণজুড়ানো অমিয়মধুর ব্যবহারে শোকার্তা ভগিনীগণের তাপিত প্রাণ শীতল হইল। তাঁহার শ্রীমুখোচ্চারিত পুণ্য ভাগবতপ্রসঙ্গ শ্রবণে, অমৃতলোকের দিব্য প্রেরণায় তাঁহাদের অন্তর উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল, দুঃসহ শোকজ্বালা বিস্মৃত হইয়া তাঁহারা পরম শান্তির অধিকারী হইলেন। এই অবস্থায় ভগিনীত্রয় অনুকূলচন্দ্রের শ্রীপদে আত্মসমর্পণপূর্বক সৎনামে দীক্ষা গ্রহণ করিয়া ধন্য হইলেন। মনোমোহিনী দেবী অতঃপর পরিজন সহ ভগিনীদিগকে সঙ্গে লইয়া হিমাইতপুর নিজ বাড়ীতে চলিয়া আসেন। তাঁহারা তদবধি তথায় মনোমোহিনী দেবীর পরিবারভুক্ত হইয়া বাস করিতে থাকেন।

বর্তমান প্রসঙ্গে আমার নিজ জীবনের দুই-একটি ঘটনার উল্লেখ করিতেছি।

আমার পুত্র রজতবরণের বয়স তখন পাঁচ-ছয় বৎসর। পেটের ব্যথায় শ্রীমান একবার খুব অসুস্থ হইয়া পড়ে। রোগবৃদ্ধির ফলে একদিন তাহার অবস্থা অতীব সংকটাপন্ন হইয়া উঠে। এই অবস্থায় শ্রীশ্রীমা মনোমোহিনী দেবী তাহার শয্যাপার্শ্বে বসিয়া কখনও তাহার সর্বাঙ্গে হাত বুলাইয়া দিতেছেন, কখনও তাহাকে ঔষধ সেবন করাইতেছেন, কখনও তাহার তলপেটে প্রলেপ দিতেছেন। কিছুতেই তীব্র যন্ত্রণার বিন্দুমাত্র উপশম হইতেছে না বরং উত্তরোত্তর বৃদ্ধিই পাইতেছে। শ্রীশ্রীঠাকুর অস্থির হইয়া তাড়াতাড়ি ডাক্তার আনিবার জন্য পাবনায় লোক পাঠাইয়াছেন। অবস্থা গুরুতর দেখিয়া শ্রীশ্রীমা পাগলের মত ছুটাছুটি করিতেছেন। একবার তিনি রোগীর কাছে গিয়া তাহার নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসক্রিয়া পরীক্ষা করিতেছেন, পরক্ষণেই ব্যাকুল হইয়া ঘরের বাহিরে আসিতেছেন। তাঁহার

মুখমণ্ডল মলিন বিবর্ণ, নেত্রদ্বয় অশ্রুভারে ছলছল। এই অবস্থায় একবার তিনি হঠাৎ ছুটিয়া আসিয়া উচ্চৈঃস্বরে আমার স্ত্রীর নাম ধরিয়া ডাকিয়া বলিয়া উঠিলেন,—"প্রিয়লতা, ওকে পাথরকুচি পাতার খানিকটা রস গোলমরিচ দিয়ে খাইয়ে দে দিকিন, পরমপিতার দয়ায় হয়ত সেরে যেতে পারে।" শ্রীশ্রীমা তৎক্ষণাৎ নিজেই ছুটিয়া গিয়া পাথরকুচি পাতা আনিলেন এবং রস করিয়া রোগীকে কিছুটা সেবন করাইলেন। আশ্চর্যের বিষয়, উহা সেবনের সঙ্গে সঙ্গে মন্ত্র শক্তির মত ক্রিয়া করিল, যন্ত্রণার অনেকটা লাঘব হইল, রোগী চক্ষু মেলিয়া চাহিল এবং ক্রমশ সারিয়া উঠিতে লাগিল। সেদিন শ্রীশ্রীমার যে আকুলি-বিকুলি, যে ছটফটানি স্বচক্ষে দেখিয়াছি, প্রাণের কতখানি টান ও দরদ থাকিলে যে এমনটি সম্ভব হয়, তাহাই ভাবিয়া বিস্মিত হই।

আর একটি ঘটনা। আশ্রমের কোন বিশেষ জরুরী কাজে একবার আমি রাত্রিকালে কলিকাতার পথে 'বাস্'-গাড়ীতে ঈশ্বরদি-রেলষ্টেশনে যাইতেছি। সে সময় হিমাইতপুরআশ্রম পর্যন্ত 'বাস্' চলিত না। বাজিতপুর ঘাটে গিয়া 'বাস' ধরিতে হইত। ঈশ্বরদিগামী দুইখানি 'বাস্' সেদিন ঘাটে অপেক্ষা করিতেছিল। আমি প্রথমতঃ একখানা 'বাসে' উঠিয়া তাহাতে যাত্রীর ভিড় দেখিয়া নামিয়া পড়িলাম এবং অন্য 'বাস্'খানায় গিয়া উঠিয়া বসিলাম। আমাদের 'বাস্'টিই আগে ছাড়িল। অল্পক্ষণের মধ্যেই অপর 'বাস্'টিও ছাড়িয়া দিল এবং একসঙ্গেই আমাদের পিছনে সামান্য ব্যবধানে চলিতে লাগিল। যাত্রাশেষে আমাদের 'বাস্'খানা রেললাইন পার হইয়া 'ওভার ব্রীজের গোড়ায় আসিয়া দাঁড়াইল। আমরা তাহা অতিক্রম করিয়া সবেমাত্র ষ্টেশন-প্ল্যাটফর্মে আসিয়া নামিয়াছি, অমনই লক্ষ্য করিলাম, সেখানে একটা মহা হুলস্থুল পড়িয়া গিয়াছে, ষ্টেশনমাষ্টার ও অন্যান্য রেলকর্মচারীরা মহা ব্যস্ততার সঙ্গে 'লেভেল-ক্রশিং'-এর দিকে দৌড়াইতেছেন। কিছুক্ষণ পরে জানিতে পারিলাম, আমাদের সহযাত্রী 'বাস্'টি রেললাইন অতিক্রম করিবার সময় একটি 'সান্টিং ইঞ্জিনে'র সঙ্গে ধাক্কা লাগিয়া চুরমার হইয়া গিয়াছে এবং এই সংঘর্ষের ফলে বহু যাত্রী হতাহত হইয়াছে। এই অবসরে আমাদের ট্রেণ আসিয়া পড়িল; আমি তাহাতে উঠিয়া পড়িলাম এবং পরদিন প্রত্যূষে কলিকাতায় পৌঁছিলাম।

এদিকে কলিকাতা হইতে রাত্রির ট্রেণে আগত কতিপয় যাত্রী পরদিবস ভোর-বেলা আশ্রমে পৌঁছিয়াই ঈশ্বরদি ষ্টেশনের পূর্বরাত্রির 'বাস্'-দুর্ঘটনার সংবাদ শ্রীশ্রীমা ও শ্রীশ্রীঠাকুরকে জানাইলেন। শুনিবামাত্র তাঁহারা উভয়েই আমার জন্য মহা চিন্তাকুল হইয়া পড়িলেন। এই অবস্থায় শ্রীশ্রীঠাকুর আমার সংবাদ জানিবার জন্য ঈশ্বরদি ষ্টেশন ও পাবনার হাসপাতালে লোকের পর লোক পাঠাইতে লাগিলেন এবং আমার কাছেও কলিকাতার ঠিকানায় একখানা জরুরী তারবার্তা প্রেরণ করিলেন। এদিকে শ্রীশ্রীমা ব্যাকুল হইয়া আর্তকণ্ঠে বিলাপ করিতে

লাগিলেন,—'হায় ! একি হলো ? পরমপিতার চরণে আমি কী অপরাধ করেছি যে আমার এমন সর্বনাশ ঘটতে পারে, আমি ব্রজগোপালকে অকালে হারাবো...... ।'

দুপুর উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। তখনও আমার সম্বন্ধে কোন সঠিক সংবাদ জানা যায় নাই। শ্রীশ্রীমা গৃহদ্বার রুদ্ধ করিয়া ভূমিশয্যায় রোরুদ্যমানা, শ্রীশ্রীঠাকুর পদ্মার ধারে বাবলাতলায় বিষাদমলিন বদনে নীরবে উদাস দৃষ্টিতে উপবিষ্ট, সমগ্র আশ্রম-বাটিকা নিস্তব্ধ, আনন্দবাজার (আশ্রমবাসীদের ভোজনাগার) তালাবন্ধ—শ্রীশ্রীঠাকুরের সহিত সকলেই অভুক্ত। অবশেষে বেলা সাড়ে তিনটার সময় আমার নিরাপদে কলিকাতা পৌঁছার তারবার্তা আসিয়া উপস্থিত হইল। শ্রীশ্রীঠাকুর নিশ্চিন্ত হইলেন, শ্রীশ্রীমাও স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া ঘরের বাহিরে আসিলেন।

পররতীকালে আমার স্ত্রীর নিকট সেদিনের বৃত্তান্ত শুনিয়া অন্তরে এই আত্মপ্রসাদ অনুভব করিয়া ধন্য হইয়াছিলাম—যদিও শৈশবাবধি আমি মাতৃহারা, তবু তাঁর দয়ায় এখনও আমি পরম স্নেহময়ী মায়ের কোলেই আছি।

অতিথি-অভ্যাগতের জন্য দয়াবতী মনোমোহিনী দেবীর গৃহদ্বার অহর্নিশ উন্মুক্ত থাকিত। বলিতে কি, অতিথি-সৎকারের ব্যাপারে যে কোন রূপ দুঃখ-কষ্ট সহ্য করিতে তিনি বিন্দুমাত্র কুণ্ঠা বোধ করিতেন না। নিজের নিদারুণ অভাব-অনটনের সময়েও গৃহাগতকে তিনি কোনদিন বিমুখ করেন নাই। অনেক সময় ধারকর্জ করিয়া, কখনও কখনও নিজে উপবাসী থাকিয়াও আতিথেয়তার পুণ্যব্রত তিনি আজীবন পরম শ্রদ্ধার সহিত পালন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার এই সর্বজনবিদিত পুণ্যকীর্তির কত না কাহিনী! নিম্নে কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ করা যাইতেছে।

একদিন সন্ধ্যাকালে আজুদিয়ার খেয়া পার হইয়া প্রায় চল্লিশ জন লোক মনোমোহিনী দেবীর গৃহে আসিয়া রাত্রিবাসের জন্য প্রার্থনা জানায়। সেদিন তাঁহার গৃহে আহার্য-সামগ্রী বিশেষ কিছুই সঞ্চিত ছিল না। এরূপ অসময়ে এতগুলি লোকের খাদ্য-সংগ্রহের চিন্তায় তিনি খুবই বিচলিত হইলেন। পুত্র অনুকূলচন্দ্রকে এ বিষয় জানাইলে তিনি হাসিতে হাসিতে জননীদেবীকে বলিলেন,—"মা, তুই এত ভয় পাচ্ছিস্ কেন ? এখনো তো তোর ঘরের চালে টিন আছে।" —এই বলিয়াই তিনি আগন্তুকদের লইয়া নানা সদালোচনায় মত্ত হইয়া পড়িলেন। মনোমোহিনী দেবী আর কি করিবেন। শ্রীগুরুর কৃপাই তাঁহার একমাত্র সম্বল। অনন্যোপায় হইয়া তিনি বহির্বাটীতে নদীতীরে বসিয়া একমনে ইষ্টনাম জপ করিতে লাগিলেন। এমন সময় তিনি দেখিতে পাইলেন, সম্মুখেই নদী দিয়া একখানি ডিঙ্গী-নৌকা ভাটিয়া যাইতেছে। নৌকার মাঝিরা কিঞ্চিৎ দূর হইতে তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া, ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"মা ঠাকরুণ, দুই বস্তা চাল

আছে, রাখবেন কি ?" উত্তরে তিনি বলিলেন,—"নারে বাপু, চালের খুবই দরকার আছে, কিন্তু তা রাখবার উপায় নেই, আমার হাতে এখন একেবারেই খালি।" তাঁহার সহিত কথা বলিতে বলিতে মাঝিরা তীরের দিকে অগ্রসর হইয়া নৌকা ভিড়াইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল,— "মা, আপনি কবে টাকা দিতে পারবেন ?" তিনি উত্তর করিলেন,—"চার-পাঁচ দিন পরে সম্ভবতঃ দিতে পারব।" তদুত্তরে মাঝিরা বলিল,—"মা ঠাকুরুণ, আপনাকে আমরা জানি, আপনাকে মাল দিতে আমাদের কোন আপত্তি নেই, আপনি আপনার সুবিধা মত টাকা দিবেন।" এই বলিয়া মাঝিরা চালের বস্তা দুইটি নিজেরাই তাঁহার ঘরে উঠাইয়া দিয়া বাড়ী চলিয়া গেল। মনোমোহিনীর দুর্ভাবনা দূর হইল। তিনি তখন সত্বর রন্ধনকার্য সমাপ্ত করিয়া অতিথিদিগকে পরিতোষ সহকারে ভোজন করাইলেন।

অন্য একদিন কোন দূরবর্তী তীর্থমেলা হইতে বাড়ী ফিরিবার পথে শতাধিক যাত্রী বিশেষ বিপন্ন হইয়া মনোমোহিনী দেবীর ভবনে আশ্রয়প্রার্থী হইলেন। তখন রাত্রি অধিক হইয়াছে। অতিথিসেবার কর্তব্য-পালনে সেদিনও তিনি অতি কঠিন অগ্নিপরীক্ষার সম্মুখীন হইয়াছিলেন। এতগুলি লোকের আহার্য-সংগ্রহের চিন্তায় তিনি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িলেন। এই অবস্থায় একান্তমনে শ্রীগুরুর চরণে প্রার্থনা জানাইয়া তিনি অন্তরে শক্তি সঞ্চয় করিয়া লইলেন। এরূপ অসময়ে এমন বৃহৎ ব্যাপার সামলাইবার অন্য কোন উপায় খুঁজিয়া না পাইয়া তিনি নিজের গলার সোনার হারগাছি জনৈক ধনবান প্রতিবেশীর নিকট বন্ধক রাখিয়া প্রয়োজনীয় অর্থ ধার করিলেন এবং তদ্দ্বারা খাদ্যসামগ্রী খরিদ করিয়া আনিয়া অতিথিগণের পর্যাপ্ত ভোজনের ব্যবস্থা করিলেন।

একদা মধ্যরাত্রিতে বহুদূরবর্তী স্থান হইতে পনর-কুড়ি জনের একদল লোক মনোমোহিনী দেবীর গৃহে আসিয়া অতিথি হইলেন। তাঁহার ভাণ্ডারে তখন অতি সামান্য পরিমাণ চাল-ডাল ছিল। এই অবস্থায় তিনি বড়ই দুর্ভাবনায় পড়িলেন। উপায়ান্তর না দেখিয়া তিনি পল্লীবাসী প্রতিবেশীদের নিকট হইতে প্রয়োজনীয় খাদ্যসামগ্রী সংগ্রহ করিয়া আনিবার সংকল্প করিলেন। শ্রীগুরুর নাম লইয়া তিনি গভীর রাত্রিতে একাকী ঘরের বাহির হইয়া পড়িলেন এবং পল্লীর নিদ্রিতা গৃহিণীগণকে সজাগ করিয়া প্রতি বাড়ী হইতে কিছু কিছু করিয়া চাল-ডাল লইয়া বাড়ী ফিরিলেন। অতঃপর তিনি স্বহস্তে রন্ধন করিয়া অভ্যাগতগণকে পরিতৃপ্তি সহকারে ভোজন করাইলেন।

মনোমোহিনী দেবীর আত্মমর্যাদাবোধ ছিল সদা জাগ্রত। আপন আভিজাত্য সম্বন্ধে সর্বক্ষণ সচেতন থাকিয়াও তিনি সহজেই পরের সেবায় নিজেকে বিলাইয়া দিতে পারিতেন। দৈনন্দিন জীবনের বহু ঘটনায় তাঁহার এই চরিত্র-বৈশিষ্ট্যের অত্যুজ্জ্বল পরিচয় পাওয়া যায়। এ বিষয়ে একটি কাহিনী নিম্নে উল্লেখ করিতেছি ঃ

মনোমোহিনী দেবী একদিন জনৈকা প্রতিবেশিনী ব্রাহ্মণ রমণীর প্রসব-বেদনায়

সংবাদ পাইয়া স্বীয় স্বভাবসুলভ সেবাবৃত্তির প্রেরণায় তৎক্ষণাৎ তাঁহার গৃহে গিয়া উপস্থিত হইলেন। এই উপলক্ষে উপর্যুপরি কয়েকদিন তাঁহাকে সে বাড়ীতে প্রায়শ যাতায়াত করিতে হইয়াছিল। দুঃখের বিষয়, সে সময় একদিন তাঁহার আর্থিক অস্বচ্ছলতা সম্বন্ধে ঐ পরিবারের কর্তাব্যক্তির কোন বিদ্রূপাত্মক উক্তি তাঁহার কর্ণগোচর হয়। ভদ্রলোকের ঈদৃশ অবাঞ্ছনীয় আচরণে তিনি অন্তরে খুবই ব্যথা পাইলেন। কিন্তু বলিতে কি, সেজন্য তাঁহার স্বেচ্ছাবৃত দায়িত্ব-পালনে তিনি বিন্দুমাত্র ত্রুটি করিলেন না। এমন কি তৎপরবর্তীকালেও যখনই এই পরিবারের কোন বিপদ-আপদ উপস্থিত হইয়াছে, সর্বদাই স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া তিনি তাঁহাদিগকে বিপন্মুক্ত করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছেন। তবে একটি বিষয়ে তিনি সর্বদাই সবিশেষ সচেতন থাকিতেন, নিজের কোন প্রয়োজনে তিনি কদাপি তাঁহাদের সাহায্যপ্রার্থী হন নাই এবং এমন কি কোনদিন শত অনুরোধেও তাঁহারা তাঁহাকে তাঁহাদের বাড়ীতে একবিন্দু জল পর্যন্ত স্পর্শ করাইতে পারেন নাই।

মনোমোহিনী দেবীর চরিত্রে নারীসুলভ কোমলতার সহিত পুরুষোচিত তেজস্বিতা ও কর্মদক্ষতার এক অপূর্ব মিলন ঘটিয়াছিল। তাঁহার অপূর্ব তেজস্বিতার দৃষ্টান্তস্বরূপ নিম্নে দুইটি ঘটনা বিবৃত করা হইল।

একদা হিমাইতপুরের অন্তর্গত সাহাপাড়ার একদল গুন্ডা চরের ২০।২৫ জন লাঠিয়াল সহ গ্রামের দ্বারিকা কবিরাজের গৃহ আক্রমণ করে। এদিকে কবিরাজ মহাশয় পূর্ব হইতেই এ বিষয় জানিতে পারিয়া আত্মরক্ষার্থ কতকগুলি নামজাদা লাঠিয়াল সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিলেন। এই দুই দুর্ধর্ষ গুণ্ডার দল অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত হইয়া সেদিন এক ভীষণ হাঙ্গামা বাধাইয়া দিল। ইহাদিগকে শান্ত করিবার মত শক্তি-সাহস স্থানীয় লোকদের কাহারও ছিল না। না-জানি কখন কি অঘটন ঘটিয়া যায় সেজন্য সকলে সন্ত্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিল। এই ভয়াবহ দুর্ঘটনার সংবাদ সহসা মনোমোহিনী দেবীর কর্ণগোচর হইল। তিনি তখন একটি শিশুসন্তানকে ক্রোড়ে লইয়া বহির্বাটীর প্রাঙ্গণে পাদচারণ করিতেছিলেন। তদবস্থায়ই তিনি ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া ঘটনাস্থলে গিয়া উপস্থিত হইলেন। মুহূর্ত-কালও বিলম্ব না করিয়া, অদূরে দণ্ডায়মানা জনৈকা প্রতিবেশিনীর নিকট আপন ক্রোড়স্থ শিশুটিকে নিক্ষেপপূর্বক তিনি ভীমবেগে সেই প্রচণ্ড সংগ্রামের মধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন এবং গুন্ডাদের ঈদৃশ নৃশংস জঘন্য দুষ্কার্য হইতে বিরত হইতে দৃপ্তকণ্ঠে পুনঃ পুনঃ নির্দেশ দিতে লাগিলেন। তাঁহার তৎকালীন সেই তেজোদৃপ্ত ভীষণ মূর্তি দর্শন করিয়া ও বজ্রগম্ভীর বাণী শ্রবণ করিয়া গুন্ডাদের কেহ কেহ ভীত-চকিত চিত্তে তৎক্ষণাৎ পলায়ন করিল, অনেকে অস্ত্র-শস্ত্র সংবরণপূর্বক বিমূঢ়াবস্থায় স্থ-স্থ নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল এবং অন্যেরা আত্মসম্বিৎ ফিরিয়া পাইয়া ভাববিহ্বল অন্তরে ছুটিয়া আসিয়া তাঁহার

পদতলে লুটাইয়া পড়িল। মনোমোহিনী দেবী তখন সকলকে ডাকিয়া আনিয়া দরদের সহিত তাহাদের হীন মনোবৃত্তির বিষয় বুঝাইয়া দিলেন এবং তাহাদিগকে সদ্ভাবে জীবন-যাপনের জন্য উদ্বুদ্ধ করিলেন। সকলে তখন অনুতপ্ত হৃদয়ে তাহাদের দুষ্কার্যের জন্য তাঁহার নিকট ক্ষমাভিক্ষা চাহিল এবং পরস্পরে প্রীতির আলিঙ্গনে আবদ্ধ হইয়া সেস্থান পরিত্যাগ করিল।

কতকগুলি দুষ্ট প্রকৃতির লোক একবার হিমাইতপুর অঞ্চলে গ্রামবাসীদের উপর এমন ভীষণ অত্যাচার সুরু করিয়াছিল যে কেহ ভয়ে দিনের বেলায়ও রাস্তায় বাহির হইতে সাহস পাইত না। এই নিদারুণ দুর্দৈবের সময় মনোমোহিনী দেবী যেরূপ অপূর্ব সাহস, উদারতা ও দৃঢ়তার সহিত সেই ভয়াবহ অবস্থা আয়ত্তে আনিয়াছিলেন তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। ঐ সময় তিনি এক হাতে একখানি ছোট লাঠি ও অপর হাতে একটি টর্চ লইয়া সমগ্র আশ্রমবাটিকা এবং নিকটবর্তী পল্লীগুলিতে সারারাত্রি একাকী প্রহরা দিতেন এবং প্রতি বাড়ীতে যাইয়া প্রত্যেককে বল, ভরসা ও সাহস প্রদানে নিশ্চিন্ত করিতেন। প্রত্যহ গভীর রাত্রে তিনি দুর্বৃত্তদের আড্ডায় গিয়া হাজির হইতেন এবং তাহাদিগকে শান্ত ও প্রকৃতিস্থ হইতে কত ভাবে কত উপদেশ দিতেন। আশ্চর্যের বিষয়, তাঁহার অমায়িক ব্যবহার, মধুর বাক্যালাপ এবং অসাধারণ ব্যক্তিত্বের প্রভাবে গুন্ডাদের মনের অদ্ভুত পরিবর্তন ঘটিল, অনুতপ্ত হৃদয়ে তাহারা অকপটে নিজেদের দোষ স্বীকার করিল এবং ভবিষ্যৎ সত্যপথে থাকিয়া জীবন চালাইবার জন্য উদ্গ্রীব হইয়া উঠিল।

এইবার আমরা মনোমোহিনী দেবীর অপূর্ব কর্মদক্ষতার সম্বন্ধে বহু ঘটনার একটি উল্লেখ করিতেছি।

একদা হিমাইতপুরের পার্শ্ববর্তী কাশীপুর গ্রামে ঝালমাল সম্প্রদায়ের এক বিরাট জনসভা হইয়াছিল। কাশিমবাজারের মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী প্রমুখ বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি এবং বাংলাদেশের নানা স্থানের প্রায় চারি সহস্র বিশিষ্ট অতিথি তাহাতে যোগদান করিয়াছিলেন। সভায় যে এত অধিক লোকসমাগম হইবে অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তাগণ পূর্বে তাহা ধারণা করিতে পারেন নাই। এই উপলক্ষে তাঁহারা মাত্র এক হাজার লোকের আহারাদির ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। এই অবস্থায় কর্তৃপক্ষীয় সকলে বড়ই বিপন্ন হইয়া পড়িলেন। বিদেশীয় এতগুলি লোক অভুক্তাবস্থায় চলিয়া গেলে গ্রামবাসীর দুর্নামের অবধি থাকিবে না, এই দুশ্চিন্তায় সকলের মুখ শুকাইয়া গেল। পুত্র অনুকূলচন্দ্রের সহিত মনোমোহিনী দেবীও সেদিন এই সভায় উপস্থিত ছিলেন। এই মহা বিপদে কর্মকর্তা ব্যক্তিগণ কিংকর্তব্য-বিমূঢ় হইয়া মনোমোহিনী দেবীর শরণাপন্ন হইলেন। এই সংকট-মুহূর্তে আপন দেশবাসীর সম্মান-রক্ষার জন্য যথোচিত ব্যবস্থা করিতে সকলে তাঁহাকে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাইলেন। বিষয়ের গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া মনোমোহিনী দেবীও

তন্মুহূর্তে কর্মতৎপর হইয়া উঠিলেন এবং যথাকর্তব্য সম্পাদনে আত্মনিয়োগ করিলেন। জনকয়েক লোক সঙ্গে লইয়া তিনি স্বয়ং প্রতি পল্লীতে গিয়া বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়া অত্যল্পকালের মধ্যেই প্রচুর পরিমাণ চাল, ডাল, ঘৃত, তৈল, তরিতরকারী, জ্বালানীকাষ্ঠ প্রভৃতি সকল প্রয়োজনীয় রন্ধন-সামগ্রী ও কিছু টাকাকড়ি সংগ্রহ করিয়া আনিলেন এবং তদ্দ্বারা অতিথিভোজনের সুন্দর আয়োজন করিলেন। আপন পুত্রবধূর তত্ত্বাবধানায় তিনি এই বৃহৎ ব্যাপারের রন্ধন ও পরিবেশন কার্যাদিও সুচারুরূপে সম্পন্ন করাইলেন। সেদিন মনোমোহিনী দেবীর পরিচালনায় এই বিরাট ব্যাপার যেরূপ শৃঙ্খলার সহিত সুসম্পন্ন হইয়াছিল, তাহাতে সমাগত বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ সকলেই তাঁহার অপূর্ব কর্মকুশলতার জন্য শতমুখে তাঁহাকে সাধুবাদ প্রদান করিয়াছিলেন।

কথাবার্তা, চালচলন ও অভ্যাস-ব্যবহারে মনোমোহিনী দেবী ছিলেন অতিশয় সাদাসিধা ও সহজ-সরল। পোষাক-পরিচ্ছদ ও আভরণাদির প্রাচুর্য ও ঐশ্বর্য তিনি মোটেই পছন্দ করিতেন না। তাঁহাকে কেহ কখনও উত্তম বস্ত্রালঙ্কার পরিবার জন্য বিশেষ পীড়াপীড়ি করিলে, তিনি আপন সহজ মনোভাব ব্যক্ত করিয়া বলিতেন,—"পল্লীবাসী জনসাধারণের দুর্দশা দেখে আমি প্রাণে শান্তি পাই না। কত লোকের পেটে অন্ন নাই, পরিধানে বস্ত্র নাই, রোগযন্ত্রণায় কত জনে কত কষ্ট পায়। তাদের এরূপ দুর্গতি দেখে আমার নিজের ভাল খাওয়া-পরার সাধ হয় না।" সধবাবস্থায় তাঁহার কি সুন্দর পবিত্র অনাড়ম্বর বেশভূষা দেখিয়াছি। পরণে একখানা লালপাড় শাড়ি, কানে ফুল, হাতে শঙ্খ, গলায় একগাছা চিকণ হার, কপালে ও সিঁথিতে সিন্দুর। ঋজু দীর্ঘায়ত গৌরবর্ণ সবল সুঠাম দেহ সে কি মধুর্যমণ্ডিত দিব্যমূর্তি! শুদ্ধ-শান্ত-সৌম্যদর্শনা কল্যাণরূপিণী সে দেবীপ্রতিমার কথা কোনদিন ভুলিতে পারিব না।

বাল্যকাল হইতেই মনোমোহিনী দেবীর বিদ্যানুরাগ ও সাহিত্য-প্রীতির পরিচয় পাওয়া যায়। গ্রন্থাদির অধ্যয়নে তিনি সমধিক আনন্দ লাভ করিতেন। দেখিয়াছি, পরিণত বয়সেও সারাদিনের কঠোর কর্মব্যস্ততার পর অপরাহ্নে যখনই তিনি একটু অবসর পাইয়াছেন, পল্লীর মহিলাদের লইয়া রামায়ণ, মহাভারত, ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ প্রভৃতি গ্রন্থপাঠে তাহার সদ্ব্যবহার করিয়াছেন। ছোটবেলায় দীক্ষাগ্রহণের পর স্বল্পকালের মধ্যেই হিন্দীভাষা শিক্ষা করিয়া কবীর সাহেব, তুলসীদাস, স্বামীজী মহারাজ, হুজুর মহারাজ প্রভৃতি মহাপুরুষগণের জীবনী, বাণী ও দোহা প্রভৃতি তিনি প্রত্যহ সশ্রদ্ধচিত্তে পাঠ করিতেন। বাংলা ও সংস্কৃত-ভাষায় রচিত ধর্ম ও নীতিমূলক বহু শাস্ত্রগ্রন্থাদি অধ্যয়ন করিয়াও তিনি যথেষ্ট জ্ঞান অর্জন করিয়াছিলেন। শাস্ত্রাদির অন্তর্নিহিত তত্ত্ব অনুধাবনে তাঁহার ছিল সুধীজনসুলভ অশেষ আগ্রহ। বলাবাহুল্য, কোন রচনার শুধু বাচ্যার্থজ্ঞান-লাভে তিনি কোনদিনই তৃপ্ত থাকিতে পারিতেন না।

ছোটবেলা হইতেই মনোমোহিনী দেবী 'সদ্ভাবশতক' কবিতা-পুস্তকখানা পড়িতে খুবই ভালবাসিতেন। ইহার অনেকগুলি কবিতা তাঁহার কণ্ঠস্থ হইয়া গিয়াছিল। তিনি বলিতেন,—"সদ্ভাবশতকের উপদেশমালা সদ্‌গুরুর মতই আমাকে জীবন-সংগ্রামে পথ দেখিয়ে সাহায্য করেছে।" এ সম্বন্ধে সময় সময় তাঁহার নিকট যেরূপ শুনিয়াছি, নিম্নে তাহারই কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

কেহ তাঁহার অন্তরের ব্যথা-বেদনার কথা সহানুভূতির সহিত হৃদয়ঙ্গম না করিলে, মনোমোহিনী দেবী সেজন্য কখনও দুঃখবোধ করিতেন না। এই অবস্থায়—

"চিরসুখী জন ভ্রমে কি কখন
ব্যথিত-বেদন বুঝিতে পারে ?
কি যাতনা বিষে বুঝিবে সে কিসে
কভু আশীবিষে দংশেনি যারে।"—এই কবিতাস্তবকটি আবৃত্তি করিয়া তিনি প্রবোধ লইতেন। আবার,

"না থাকে যদ্যপি দোষ কারে তব ভয় ?
আছাড়ে রজক ম্লান বসন-নিচয়।"

* * *

"যে জন দিবসে মনের হরষে
জ্বালায় মোমের বাতি
আশু গৃহে তার দেখিবে না আর
নিশীথে প্রদীপ-ভাতি।"

* * *

"যেখানে দেখিবে ছাই উড়াইয়া দেখ তাই
মিলিলেও মিলিতে পারে অমূল্য রতন"......প্রভৃতি নীতি কথাগুলির অনুশীলনক্রমে আত্মজীবন গঠন করিতে তিনি সর্বদা সচেতন থাকিতেন।

পিতৃদেবের মৃত্যুর পর দুষ্ট সরিকগণের চক্রান্তমূলক নানা মামলা-মোকদ্দমার চাপে যখন মনোমোহিনী দেবীকে পরিবার-পরিজন লইয়া অশেষ দুঃখকষ্ট সহ্য করিতে হইয়াছিল, তখন তিনি নিম্নোক্ত ভক্তিমূলক কবিতাংশটি প্রায়শ মনে মনে আবৃত্তি করিয়া জীবন-চলনার পথে মনোবল সংগ্রহ করিতেন।—

"যদ্যপি যতন করে শতজন
জীবন হরিতে ছলে,
তুমি সখা যার বল হে তাহার
কি ভয় জগতী-তলে ?

তব প্রেমসুধা পিয়ে ক্ষোভ ক্ষুধা
যে জন হরিতে পারে,
বল, প্রিয় বল জঠর-অনল
কি দুঃখ দিবে তাহারে ?
তব প্রেম-ধনে ধনী যে অধনে
কে দীন তাহারে বলে ?
প্রমত্ত সে নয় প্রমত্ত যে হয়
তব প্রেম-সুধা-বলে।
প্রণয়ের তানে প্রেমগুণগানে
মানস মোহিত যার
কোকিল-নিঃস্বন অখিল-গুঞ্জন
হয় কি রঞ্জন তার ?
প্রেম কুতূহলে তব প্রেমজলে
যে জন দিয়েছে ঝাঁপ
কহ প্রেমাধার কি করিবে তার
বিরহতপনতাপ ?"

সাহিত্যের ন্যায় সঙ্গীতের প্রতিও মনোমোহিনী দেবীর প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল। ভজন ও কীর্তনগান তিনি খুবই ভালবাসিতেন। প্রায়শ আশ্রম-প্রাঙ্গণে ধর্মসঙ্গীতানুষ্ঠানের আয়োজন করতঃ তন্ময়চিত্তে তাহার রসমাধুর্য উপভোগে তিনি অপার তৃপ্তি লাভ করিতেন। সাহিত্য ও সঙ্গীত চর্চায় তাঁহার তেমন কোন বিশেষ খ্যাতি না থাকিলেও, দৈনন্দিন জীবনে তিনি সময় সময় নানাজনের নিকট যেসকল চিঠিপত্রাদি লিখিয়াছেন এবং সঙ্গীতাবলী রচনা করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার উন্নত আদর্শ, মার্জিত রুচি এবং সহজ সাবলীল রচনা-শৈলীর অতি সুন্দর পরিচয় পাওয়া যায়। আমরা এখানে তাহার সামান্য কিছু উদ্ধৃত করিলাম।

পতিবিরহে শোকাতুরা জনৈকা মহিলাকে সান্ত্বনা দিবার জন্য এক সময় মনোমোহিনী দেবী নিম্নের ভাবগম্ভীর তত্ত্বপূর্ণ কবিতাখানি লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন।—

কল্যাণীয়া ব্রজবালা, *

উদাস পরাণে কেন নীরবে বসিয়া আর,
ছিল, আছে, হবে—বল কোন্ দ্রব্যে অধিকার ?
বিশাল জগতীতলে প্রতি পলে অনুপলে
কীট হতে গ্রহরাশি জন্মে মরে শতবার।

* ইনি কলিকাতার বিখ্যাত পাট-ব্যবসায়ী স্বর্গত অবিনাশচন্দ্র পাল (এ. সি. পাল) মহাশয়ের সহধর্মিণী ব্রজবালা দেবী।

কোন্ বিধানে জন্মে মরে বাঁচে বা সে কি প্রকারে
জানে বা কে, বোঝে বা কে, রোধে বা কে, সাধ্য কার ?
আজ্ঞা কর সমীরণে, স্থির হয়ে সে কি শোনে ?
চাঁদে রৌদ্র সূর্যে সুধা, কিংশুকে সৌরভভার
—শুধু ভ্রান্তি এ মমত্ব, কোথায় নিগূঢ় সত্য ?
ছায়াতে বস্তুত্বজ্ঞান—এ নহে পুরুষকার
একা আসে, যায় একা, পথে পাঁথকের দেখা—
যার ধন সেই লয়, তবে কেন হাহাকার ?
মুছিয়া সজল নেত্র হের তব কর্মক্ষেত্র
কেন হবে লক্ষ্যহারা, তুমি কার কে তোমার ?

সৎসঙ্গ-প্রতিষ্ঠানের মুখপত্র 'সৎসঙ্গী' নামক পাক্ষিক পত্রিকাখানি বঙ্গাব্দ ১৩৩৭ সালের আশ্বিন মাসে তৃতীয় বর্ষে পদার্পণ করিলে মনোমোহিনী দেবী উক্ত পত্রিকার সম্পাদক সংঘভ্রাতা অবিনাশচন্দ্র অধিকারী এম্. এ. বি. এল্. মহাশয়ের নিকট নিম্নোদ্ধৃত আশীর্বাণীটি পাঠাইয়া কর্মিবৃন্দকে আদর্শানুসরণে উৎসাহিত করেন।—

অবিনাশ,

আজ বিজয়ার শুভদিনে তোমাদের নববর্ষে আমি প্রাণমনে আশীর্বাদ করিতেছি, তোমাদের আদর্শের প্রতি দিন দিন যেন একাগ্রতা বৃদ্ধি পায়। তোমরা ধর্মে ও কর্মে সমস্ত পৃথিবীর মধ্যে শীর্ষস্থান অধিকার কর। তোমাদের নব প্রাণধারা যেন বিশ্ববাসী নরনারীর জাগরণ আনিয়া দেয়। তোমরা যা কিছু করিয়াছ এবং করিতে মনঃস্থ করিয়াছ, সেই সকল প্রতিষ্ঠানগুলি যেন ধরণীমণ্ডলে শ্রেষ্ঠ আসন গ্রহণ করে। তোমাদের ঠাকুরের সহিত তোমরা সকলে দীর্ঘজীবন, স্বাস্থ্য, মান, যশ, ধর্ম, কর্ম ও প্রতিষ্ঠায় প্রতিপত্তি লাভ কর। তোমাদের লেখনী একচ্ছত্র আধিপত্য লাভ করুক,—'সৎসঙ্গী' বিশ্ববাসী নরনারীর প্রাণস্বরূপ হইয়া উঠুক, ইহাই আমার পরমপিতার চরণে বিনীত ও আন্তরিক প্রার্থনা। আশীর্বাদ জানিবে। ইতি—

আশীর্বাদিকা

তোমাদের মা

মনোমোহিনী দেবীর রচিত সঙ্গীতগুলির মধ্যে নিম্নলিখিত উষাকীর্তনটি সর্বাধিক জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছে। ভাবসম্পদ ও রচনা-মাধুর্যে বাস্তবিকই ইহা অতীব উপভোগ্য। সঙ্গীতটি যথা—

প্রভাত যামিনী উদিত দিনমণি
উষারানী হাসিমুখে চায় রে।
জাগি বিহঙ্গ সব তুলি নানা কলরব
রাধা রাধা রাধাস্বামী গায় রে॥

নবীন বৃন্দাবনে তুলসী কাননে
ভ্রমরী রাধাস্বামী গায় রে ॥
সেই সে মধুর গান বাঁশিতে তুলিয়ে তান
আপনি যে রাধাস্বামী গায় রে ॥
যে নামে নন্দের কানু সেধেছিল মোহন-বেণু
সেই রাধা রাধা নাম গাও রে ॥
আজি মধু জাগরণ শুনে সবে নরগণ
জয় রাধা রাধাস্বামী গাও রে ॥
মথিয়া সকল তন্ত্র রাধাস্বামী-মহামন্ত্র
আদিগুরু জগতে বিলায় রে ॥
রাধাস্বামী গুণগানে আনন্দ বাড়িবে প্রাণে
চরমে পরম গতি হয় রে ॥
রোগ শোক ব্যাধি জরা দূরে পালাবে তারা
আনন্দে রাধাস্বামী গাও রে ॥
জয় রাধাস্বামী জয় রাধাস্বামী
জয় জয় রাধাস্বামী গাও রে ॥

নারীত্বের মহনীয় ঐশ্বর্যে মনোমোহিনী দেবীর দিব্যজীবন চিরসমুজ্জ্বল। শৈশবে ও বাল্যে পিতৃভবনে নিষ্ঠাপূত সরল জীবন-যাপনে এবং বিবাহিত জীবনে স্বামিগৃহে সংসারের বিপুল দায়িত্ব-পালনে তিনি যেমনই যশস্বী হইয়াছিলেন, মধ্য ও শেষ বয়সে পুত্র অনুকুলচন্দ্রের প্রতিষ্ঠিত বিরাট সৎসঙ্গ প্রতিষ্ঠানের কর্মপরিচালনা এবং তাঁহার উদার ভাবরাজির সার্থক রূপায়ণের মহতী প্রচেষ্টায়ও তিনি তেমনই দেশবাসী জনসাধারণের আন্তরিক অশেষ শ্রদ্ধাভক্তি অর্জন করিয়াছিলেন। বস্তুতই এ বিষয়ে তাঁহার অদম্য উৎসাহ, অপূর্ব নিষ্ঠা, অক্লান্ত শ্রম ও অসীম আত্মত্যাগের তুলনা হয় না।

কত দেশের কত অসংখ্য নরনারী তৎকালে নিয়তরূপে সৎসঙ্গ আশ্রমে বসবাস করিতেন। মনোমোহিনী দেবী তাঁহাদের সকলের অভাব-অভিযোগ, বিপদ-আপদ প্রভৃতি সর্ববিষয়ে সর্বক্ষণ সতর্ক দৃষ্টি রাখিতেন। তাঁহার প্রাণঢালা ভালবাসা ও অপরিসীম সেবাযত্নে তাঁহারা এমনই আনন্দে থাকিতেন যে, সকলেই মনে করিতেন, তাঁহারা আপন মায়েরই স্নেহশীতল ক্রোড়ে অপার সুখশান্তিতে পরম নিরাপদে দিন কাটাইতেছেন। সেকালে নিদারুণ অর্থাভাব হেতু আশ্রম-বাসীদের এক বেলার বেশী আহার জুটিত না। রন্ধনকার্য নিষ্পন্ন হইতে অনেকদিনই অপরাহ্ন উত্তীর্ণ হইয়া যাইত। আশ্রমবাসী সন্তানগণের সহিত করুণাময়ী জননী মনোমোহিনী দেবীও সেই সুদীর্ঘ দিবা অভুক্তাবস্থায় কাটাইতেন।

আশ্রমবাসীরা কত জনে কত সময় কত অন্যায়-অপরাধ করিত, অনেকে নানাভাবে আপন গুণপনারও কত পরিচয় দিত। অন্যায়কারীকে তাহার দোষত্রুটি সম্বন্ধে সচেতন করিয়া স্নেহের সঙ্গে শাসন করিতে এবং সৎকর্মীকে যথোচিত প্রশংসাবাদে সমাদর করিতে তিনি তুল্যরূপে অভ্যস্ত ছিলেন। কর্মীরা কখনও পরস্পরে ঝগড়া-বিবাদ করিলে তিনি তাহাদের দোষগুণের যথাযথ বিচার করিয়া বিরোধ মিটাইয়া দিতেন, তাঁহার সুযুক্তি ও সদুপদেশপূর্ণ মীমাংসায় কাহারও মনে কোন ক্ষোভ থাকিত না, সঙ্গে সঙ্গেই তাহাদের মধ্যে আবার সহজ প্রীতির মধুর সম্পর্ক স্থাপিত হইত। তাঁহার স্বভাবসুলভ গাম্ভীর্যপূর্ণ অথচ বাৎসল্যমাখা অপূর্ব আচরণের ফলে আশ্রমবাসী আবালবৃদ্ধবনিতা সকলে তাঁহাকে যেমনই সম্ভ্রমের চক্ষে দেখিত তেমনই অন্তরের সহিত শ্রদ্ধাভক্তি করিত। এইভাবে মহীয়সী মনোমোহিনী দেবী তাঁহার স্নেহাশ্রিত শত শত সন্তানদের লইয়া যে বৃহৎ আদর্শ পরিবারগোষ্ঠী রচনা করিয়াছিলেন কল্যাণময়ী অভিভাবিকারূপে তিনি আজীবন সোহাগে শাসনে, লালনে পালনে তাহাদের স্বভাব-চরিত্র, জ্ঞান-বুদ্ধি ও কর্মদক্ষতার উৎকর্ষের জন্য সর্বপ্রযত্নে পরিচর্যাপরায়ণ ছিলেন।

আনন্দবাজার (আশ্রমবাসীর সাধারণ ভোজনাগার), কেমিক্যাল্ ওয়ার্ক্স্, তপোবন বিদ্যালয়, বিশ্ববিজ্ঞান কেন্দ্র, প্রেস, পাব্লিশিং হাউস্, কলাকেন্দ্র, কুটীর শিল্পাগার প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন কর্মকেন্দ্রগুলি মনোমোহিনী দেবী প্রত্যহ দুইবেলা পুত্র অনুকূলচন্দ্রের সহিত নিয়মিতরূপে পরিদর্শন করিতেন এবং কর্মীদিগকে নানাভাবে উপদেশ ও সাহায্য দিয়া কার্যসম্পাদনে উৎসাহিত করিতেন। সংঘের নানা বিভাগের কর্মপরিচালনা ও তাহার উন্নতিসাধন বিষয়ে পুত্র অনুকূলচন্দ্রের সহিত দিবারাত্রই তাঁহার কত গভীর আলাপ-আলোচনা ও যুক্তি-পরামর্শ চলিত, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। 'সৎসঙ্গ-কাউন্সিল'-এর মনোমোহিনী দেবীই ছিলেন প্রতিষ্ঠাতা অনুকূলচন্দ্রের মনোনীত সর্বপ্রথম সভানেত্রী। যতদিন তিনি জীবিত ছিলেন, প্রখর বুদ্ধিমত্তা, অপূর্ব নিষ্ঠা ও অসাধারণ ব্যক্তিত্বের প্রভাবে এই পদের গুরুদায়িত্ব তিনি সার্থকরূপে সম্পাদন করিয়া গিয়াছেন।

ঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ করিবার এবং তাঁহার স্থাপিত বিচিত্র কর্মপ্রতিষ্ঠানগুলি স্বচক্ষে দেখিবার জন্য তৎকালে দেশ-বিদেশের বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি প্রায়শ সৎসঙ্গ-আশ্রমে আগমন করিতেন। ইঁহাদের সহিত অনুকূলচন্দ্রের উদার মতবাদ ও তাঁহার জনমঙ্গলকর কার্যাবলী সম্বন্ধে আলাপ-আলোচনায় মনোমোহিনী দেবী স্বীয় আদর্শপ্রাণতা, বুদ্ধিমত্তা, সৌজন্য ও কর্মনৈপুণ্যের প্রকৃষ্ট পরিচয় দানে সকলকে মুগ্ধ করিতেন।

একবার মহাত্মা গান্ধী সৎসঙ্গ-আশ্রমে আগমন করেন। কুশল-প্রশ্নাদি

আদান-প্রদানের পর মনোমোহিনী দেবী তাঁহাকে বাহুবন্ধনে আলিঙ্গনপূর্বক সঙ্গে লইয়া আশ্রমের প্রতিটি কর্মকেন্দ্রে গিয়া তথাকার কার্যধারার বৈশিষ্ট্য বুঝাইয়া দেন এবং তাঁহার সহিত ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত সৎসঙ্গের আদর্শ, উদ্দেশ্য ও কর্মপদ্ধতি সম্বন্ধে বিশদভাবে আলোচনা করেন। তৎকালে কথাপ্রসঙ্গে তিনি মাতৃসুলভ আদরে মহাত্মাজীর গলা জড়াইয়া ধরিয়া সস্নেহে আব্দারের সুরে বলিয়াছিলেন,—"পরমপিতার আশীর্বাদে তুমি দেশের শ্রেষ্ঠ নেতা বটে, কিন্তু তুমি তো আমার ছেলে " মহাত্মাজীও মনোমোহিনী দেবীর ঈদৃশ অপূর্ব সন্তান-বাৎসল্যের প্রভাবে আহ্লাদে গদগদ হইয়া সহাস্যবদনে বিনয়নম্র বচনে উত্তর করিয়াছিলেন,—"হাঁ, মা। সত্যিই তাই, আমি তো আপনার ছেলেই।" মনোমোহিনী দেবীর মধুর আদর-আপ্যায়ন ও বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বের পরিচয় পাইয়া মহাত্মাজী এমনই প্রীত ও মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, অতঃপর যখনই তিনি ভারতের যেখানেই যাইতেন. দেশের নেতৃবৃন্দের সহিত জাতীয় উন্নতিসাধনের জন্য জনসেবার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে আলোচনাকালে সৎসঙ্গ-প্রতিষ্ঠানের উন্নত আদর্শ ও বিচিত্র কর্মধারার কথা সানন্দে উল্লেখ করিতেন এবং তৎসঙ্গে মনোমোহিনী দেবীর ভূয়সী প্রশংসা করিয়া বলিতেন,—"I have never seen a masterly woman of such wonderful personality in my life "

দেবী মনোমোহিনীর চরিত্রের মাধুর্যমণ্ডিত দৃঢ়তা মহাপ্রাণ দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনকেও মুগ্ধ করিয়াছিল। তাঁহারই নিকট সৎনামে দীক্ষাগ্রহণ করিয়া তিনি ঠাকুর অনুকূলচন্দ্রকে শ্রীগুরুপদে বরণ করিয়া ধন্য হইয়াছিলেন। মাননীয়া সরলা দেবী একসময় কিছুকাল সৎসঙ্গ-আশ্রমে বাস করিয়াছিলেন। মনোমোহিনী দেবীর অপূর্ব মাতৃত্বে একান্ত প্রীত হইয়া তিনি তাঁহাকে একদিন কথাপ্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন—"বয়সে হয়তো আমি আপনার চেয়ে কিছু বড়ই হব। কিন্তু বলতে কি, আপনার মাতৃসুলভ প্রাণঢালা স্নেহমমতার কথা ভেবে বিস্মিত হয়ে পড়ি, আমারও আপনাকে 'মা' ডাকতে ইচ্ছা করে,—আপনি আমারও মা।" কাশিমবাজারের স্বনামধন্য দানবীর মাননীয় মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী মহোদয় একবার সৎসঙ্গ-আশ্রমে আসিয়াছিলেন। আশ্রমে অবস্থানকালে দেবী মনোমোহিনীর সযত্ন খাদ্য-পরিবেষণ তাঁহার সাদর আপ্যায়ন ও তাঁহার মধুর আলাপনে তিনি এমনই প্রীত হইয়াছিলেন যে, বিদায়কালে আবেগ-উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে জননীদেবীকে বলিয়াছিলেন,—"মা, মাতৃহারা হয়েও আজ আপনার কাছে মায়ের স্নেহ পেয়ে আমি ধন্য হলাম।" কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তদানীন্তন খ্যাতনামা উপাচার্য মাননীয় রেঃ ডাঃ আরকুহার্ট মহাশয় আশ্রমে আসিলে, জননীদেবী তাঁহার কাছে বসিয়া ফলমূলাদি খাঁটি দিয়া ছাড়াইয়া পরিবেষণ করিতে করিতে স্নেহকোমলকণ্ঠে নানা গল্প করিয়া তাঁহাকে ভোজন করাইয়াছিলেন। জননীদেবীর প্রাণঢালা আদরযত্নে সম্মানিত বিদেশীয় অতিথি মহোদয় অত্যন্ত মুগ্ধ ও অভিভূত হইয়া

বলিয়াছিলেন,—"এই সুদূর ভারতে এসে আজ আমি আমার মায়ের স্নেহ পাইলাম।" বাংলার তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী মৌলভী এ. কে. ফজলুল হক, এড্‌ভোকেট মৌলভী ওয়াহেদ হুসেন প্রভৃতি অনেকেই জননীদেবীর স্বহস্তে সযত্ন খাদ্যপরিবেষণ, মধুর আচরণ এবং সৎসঙ্গের ভাবধারা সম্বন্ধে তাঁহার শ্রীমুখের সারগর্ভ আলাপ-আলোচনায় মুগ্ধ হইয়া উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে তাঁহাদের অন্তরের শ্রদ্ধাভক্তি নিবেদন করিয়া গিয়াছেন। এইরূপ দেশবরেণ্য যিনিই যখন সৎসঙ্গে আগমন করিয়াছেন, প্রত্যেকেই তাঁহার অনন্যসাধারণ চরিত্র-মাধুর্যে অতীব প্রীত ও মুগ্ধ হইয়াছেন, তাঁহাকে 'মা' ডাকিয়া সকলেই নিজেদের ধন্য মনে করিয়াছেন।

মনোমোহিনী দেবী চিরদিনই অটুট স্বাস্থ্যের অধিকারিণী ছিলেন। স্বহস্তে সকল কার্য নিষ্পন্ন করিতে তিনি আজীবন সমর্থ ছিলেন। দুঃখের বিষয়, শেষ বয়সে তাঁহার চির-নীরোগ দেহখানা হঠাৎ ভাঙ্গিয়া পড়ে, যকৃতের পীড়ায় তিনি গুরুতর অসুস্থ হইয়া পড়েন। দুর্ভাগ্যের কথা, যথোচিত সেবাশুশ্রূষা ও চিকিৎসাদিতেও রোগের কোনই উপশম হইল না। পীড়া উত্তরোত্তর কেবলই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। অবশেষে বঙ্গাব্দ ১৩৫৪ সনের ৬ই চৈত্র রবিবার বেলা ১১টা ৪৫ মিনিটে ৬৮ বৎসর বয়সে তাঁহার কর্মময় মহাজীবনের অবসান ঘটিল। প্রাণাধিক পুত্রকন্যা, পরিবার পরিজন এবং স্নেহাশ্রিত অগণিত নরনারীকে শোকসাগরে ভাসাইয়া মহীয়সী মনোমোহিনী দেবী মর্ত্যধাম হইতে মহাপ্রয়াণ করেন।

অনুকুলচন্দ্রের প্রাণাধিক জীবন-সর্বস্ব—তাঁহার এ দুনিয়ার ধ্যান-ধারণার যাহা কিছু—সেই মাতৃদেবীকে হারাইয়া তাঁহার যে শোচনীয় প্রাণান্তকর অবস্থা ঘটিয়াছিল তাহা প্রকাশ করিবার শক্তি আমার নাই। তাঁহার সেই করুণ বিলাপ—'নিরাশ্রয়', 'নিরাশ্রয়' বলিয়া শিরে করাঘাত—'দয়াল', 'দয়াল' বলিয়া মুহুর্মুহুঃ আর্তনাদ —'কোথায় মা আমার', 'কোথায় মা আমার' বলিয়া করুণ রোদন—মায়ের শয়নগৃহে প্রবেশ করিয়া তাঁহার ব্যবহৃত শয্যা আঘ্রাণ—তাঁহার মস্তকের বালিশটি বুকে জড়াইয়া ধরিয়া ব্যাকুল ক্রন্দনে বক্ষ ভাসান—মায়ের কত স্মৃতির কথা উল্লেখ করিয়া শোকপ্রকাশ—কতবার শ্মশানের দিকে তাকাইয়া 'মা, তুই এলি না', 'মা, তুই এলি না' বলিয়া আকুল আহ্বান—হৃদয়বিদারী সে-দৃশ্য ও মর্মন্তুদ সেই ব্যাকুল উচ্ছ্বাস যে দেখিয়াছে সেই জানে।

ঠাকুর অনুকুলচন্দ্র ভ্রাতৃগণ সহ বিধিমত অশৌচ পালনপূর্বক আচারনিষ্ঠ ক্রিয়াবান বেদজ্ঞ সুপণ্ডিত পাঁচজন বিশিষ্ট ব্রাহ্মণকে পাদ্যার্ঘদানে পৌরোহিত্যে বরণ করতঃ যথাকালে লোকালয় হইতে দূরে নির্জন নদীসৈকতে পরমারাধ্যা মাতৃদেবীর শ্রাদ্ধকার্য যথাশাস্ত্র নিষ্পন্ন করেন। নানা স্থানের সৎসঙ্গভ্রাতৃগণও আশ্রম-অঙ্গনে সমবেত হইয়া ঐ দিবস তাঁহার পুণ্যস্মৃতির উদ্দেশে যথোচিত

আয়োজনে আন্তরিক শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেন। এই অনুষ্ঠানে যোগদানের জন্য সৎসঙ্গ আশ্রম হইতে তাঁহাদের নিকট যে লিপিখানা প্রেরিত হইয়াছিল, এইবার আমরা তাহা উদ্ধৃত করিয়া বর্তমান অধ্যায়টি সমাপ্ত করিব। যথা—

রাধাস্বামী

মা, দাদা,

বিশ্বের মা চ'লে গেছেন, গেল রবিবার, ৬ই চৈত্র (২০শে মার্চ) দুপুরবেলা —বিশ্বনাথকে কি কাঁদনে কাঁদিয়ে, ফাঁকি দিয়ে, এখানকার প্রতি অণুপরমাণুতে, প্রতি হৃদয়ের পরতে পরতে তাঁর স্মৃতির আগুন জ্বালিয়ে, আমাদের সবাইকে মাতৃহারা ক'রে।

মাতৃহারার স্মৃতি-হোমানলে আহুতি দিয়ে, আজ তাঁর দুঃখভার কমাবার কে আছিস্ কোথায় ছুটে আয়—চীৎকার ক'রে ছুটে আয়—আকাশ-মাটি ফাটিয়ে ছুটে আয়।

আমাদের মাতৃশ্রাদ্ধের মহাদিন তো এলো ঐ—আগামী বুধবার ১৬ই চৈত্র (৩০শে মার্চ)।

ঐ দিনে কি ভাই তোরা সব তাঁর স্মৃতির আগুন জ্বালিয়ে, তাঁর স্মৃতি-তর্পণে শ্রদ্ধার দানে সবাইকে তৃপ্ত ক'রে—তাঁর বিদ্যুৎভরা প্রাণ প্রত্যেক মহাপ্রাণে জাগিয়ে মাতৃহারার শোকভার একটু বইতে পারবি না ?

কোথায় সব মাতৃহারা ছুটে আয় এ আকুল ডাকে—আপন প্রাণের টানে চলে আয় ঐ শ্রাদ্ধ-তর্পণ-বাসরে সে মহাক্ষণে যা-কিছু সব উজাড় করে দিতে, যা সম্বল সাধ তাই নিয়ে, মাতৃহারা শ্রীশ্রীঠাকুরের শতধাবিদীর্ণ প্রেমময় স্নেহনীড়ে। নিবেদন ইতি—

সৎসঙ্গ, পাবনা	আপনাদেরই
৮ই চৈত্র, বঙ্গাব্দ ১৩৪৪ সাল	মাতৃহারা চিরকাঙাল ভাইসব।

চতুর্থ অধ্যায়

জন্মস্থান

কলিকাতা হইতে রেলপথে পূর্বপাকিস্তানের (অধুনা বাংলাদেশ) মধ্য দিয়া উত্তরাভিমুখে যাইতে পদ্মানদীর উপরিস্থ সুবিখ্যাত 'হার্ডিঞ্জ ব্রীজ' (সারা সেতু) অতিক্রম করিয়া 'ঈশ্বরদি-জংসন' রেলষ্টেশনে পৌঁছিতে হয়। কলিকাতা হইতে ঈশ্বরদির দূরত্ব একশত পঁচিশ মাইল। পূর্বে ঈশ্বরদি একটি ক্ষুদ্র গ্রামমাত্র ছিল। রেলপথের কল্যাণে ইহা কালক্রমে এক বৃহৎ ব্যবসায়-কেন্দ্রে পরিণত হইয়াছে।

ঈশ্বরদির আঠার মাইল পূর্বে রাজসাহী বিভাগের অন্তর্গত পাবনা জিলার সদর পাবনা। সহরটি ইছামতী নদীর পূর্বতীরে অবস্থিত। পাবনা সহরের উপকণ্ঠে প্রায় আড়াই মাইল পশ্চিমে পদ্মার উত্তর তীরে হিমাইতপুর গ্রাম।

হিমাইতপুর-নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে অনেকে বলেন, ইহা 'হিম্মৎপুর' শব্দের অপভ্রংশ। প্রচলিত জনপ্রবাদ, দিল্লী-সম্রাট আকবরের প্রধান রাজপুত সেনাপতি রাজা মানসিংহ বিদ্রোহ-দমনের নিমিত্ত বঙ্গদেশে আগমন করিলে, তাঁহার সামরিক অবস্থানের জন্য তদীয় সৈন্যাধ্যক্ষ হিম্মৎ খাঁ এখানে একটি সেনানিবাস (ছাউনী) স্থাপন করিয়াছিলেন। হিম্মৎখাঁর নামানুসারে এই স্থানের নাম 'হিম্মৎপুর' এবং 'ছাউনী' শব্দের অনুকরণে পার্শ্ববর্তী গ্রামটির নাম 'ছাতুনি' হইয়াছে।

ছাতুনি ও হিমাইতপুর গ্রামের দক্ষিণ দিকে বহুকাল পূর্বে একটি বাঁওড় ছিল। শোনা যায়, পূর্বে পদ্মানদী এই পথেই প্রবাহিত হইত। ইহার দক্ষিণে প্রতাপপুর গ্রাম, প্রতাপপুরের পূর্বে প্রতাপপুর মাঝিপাড়া, ইহার নিকটেই এককালে রাজা মানসিংহের কালীবাড়ী ও তাঁহার হাতি-বাঁধার বটগাছটি অবস্থিত ছিল। বিস্তীর্ণ জঙ্গলের মধ্যে উক্ত সেনা-নিবাস ও কালীবাড়ীর ধ্বংসাবশেষের চিহ্ন অদ্যাপি বিদ্যমান আছে। তদঞ্চলে ইহা 'রাজা মানসিংহের বাড়ী' বলিয়া পরিচিত।

কেহ কেহ আবার বলেন, রাজা মানসিংহ বাংলার শাসনকর্তা-পদে অধিষ্ঠিত থাকাকালে এই স্থানেই তিনি স্বীয় বাসভবন নির্মাণপূর্বক দীর্ঘকাল অবস্থান করিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র হিম্মৎ সিংহের নামানুসারে স্থানটির নাম হিমাইতপুর হইয়াছিল এবং ইহার পার্শ্ববর্তী গ্রামে রাজার নাজির ও উজিরগণ বাস করিতেন বলিয়া উহা নাজিরপুর নামে আখ্যাত হইয়াছিল।

হিমাইতপুরের চতুষ্পার্শ্বে কাশীপুর, ছাতুনি, প্রতাপপুর, প্রতাপপুর মাঝিপাড়া, নাজিরপুর, পৈলানপুর প্রভৃতি গ্রামগুলি অবস্থিত। হিমাইতপুরের

উত্তর-পশ্চিমে নাজিরপুর, নাজিরপুরের পশ্চিমে টিকুরি, তৎপশ্চিমে প্রসিদ্ধ দাপুনিয়ার হাট। হিমাইতপুরের পূর্বে ছাতুনি, ছাতুনির পূর্বে সাধুপাড়া ও বিষ্ণুপুর, তৎপূর্বে ইছামতী নদী এবং উহার পূর্বে পাবনা সহরটি অবস্থিত। পাবনা সহর হইতে পৈলানপুর, গোবিন্দা, ছাতুনি, হিমাইতপুর ও নাজিরপুর প্রভৃতি গ্রাম হইয়া একটি কাঁচা রাস্তা রাজসাহী পর্যন্ত গিয়াছে। এই রাস্তাটির নাম 'হিমাইতপুর রাজসাহী সড়ক'। পাবনা সহর হইতে হিমাইতপুর গ্রাম পর্যন্তও একটি পাকা রাস্তা রহিয়াছে।

হিমাইতপুর একটি ক্ষুদ্র প্রাচীন গ্রাম। ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বৎসর পূর্বেও বিশাল পদ্মানদী এই গ্রামের পার্শ্ব দিয়া খরবেগে প্রবাহিত হইত। দূরদূরান্তের যাত্রী ও মালবাহী কত বিচিত্র জলযান তখন দিবারাত্র এই নদীপথে গমনা-গমন করিত। তৎকালে এই নদীপথ দিয়াই নানাস্থান হইতে স্টীমার যোগে কুষ্টিয়া ও পাকসী হইয়া পাবনা যাতায়াত করিতে হইত। সেকালে এই হিমাইতপুর গ্রামটি ছিল হিংস্রশ্বাপদসংকুল অরণ্যরাজিতে পরিপূর্ণ, আর ইহার নিকটেই ছিল পাবনার স্টীমার-ষ্টেশন 'বাজিতপুর ঘাট'। পদ্মানদী বহু দূরে সরিয়া যাওয়ায়, অধুনা গ্রামখানির সম্মুখে এক দিগন্তবিস্তৃত প্রান্তর পড়িয়া আছে। এই প্রান্তরের মধ্যে যে নদীখাত রহিয়াছে তাহাতে কোথায়ও অনতিগভীর তোয়ধারা মৃদুমন্দস্বনে মন্থরগতিতে কিয়দ্দূর বহিয়া থামিয়া গিয়াছে, কোথায়ও বা জলরাশি সঞ্চিত হইয়া ক্ষুদ্রকায় হ্রদের সৃষ্টি করিয়াছে। এখনও এই বিশাল প্রান্তর বর্ষাকালে জলপূর্ণ হইয়া উন্মাদিনী পদ্মার ন্যায় প্রতীয়মান হয়, আবার বর্ষাপগমের সঙ্গে সঙ্গে জলরাশি সরিয়া যায়। তখন সুদূরপ্রসারী শূন্য মাঠ গ্রামের সম্মুখে পড়িয়া থাকে। পল্লীটি এখনও জনবিরল, ঝোপ-ঝাড়-জঙ্গলে পরিপূর্ণ। এই হিমাইতপুর গ্রামই শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের জন্মভূমি।

পঞ্চম অধ্যায়

জন্মকথা

বহুকাল পূর্বের কথা। একদা মধ্যাহ্নকালে দীর্ঘকায় সৌম্যকান্তি জটাজুটধারী এক প্রবীণ সন্ন্যাসী আসিয়া শিবচন্দ্রের গৃহে অতিথি হইলেন। বাড়ীতে প্রবেশ করিয়াই তিনি বালিকা-বধূ মনোমোহিনী দেবীর হস্তে সেবাগ্রহণের ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। মনোমোহিনী দেবীর সশ্রদ্ধ সেবাযত্নে পরম পরিতোষ লাভ করিয়া সন্ন্যাসী ঠাকুর বিদায় হইলেন। যাত্রাকালে তিনি আভাসে বলিয়া গেলেন,—এই পরিবারে একমাত্র পুত্রের মৃত্যু হবে ও এমন এক শক্তিমান পুরুষের জন্ম হবে, যিনি নিজ চরিত্রবলে বহু লোকের অধীশ্বর হবেন ও জগতের মহামঙ্গল সাধন করবেন।

সন্ন্যাসী ঠাকুরের এই ভবিষ্যদ্বাণী লইয়া পড়া-প্রতিবেশী সকলে নানা জল্পনা-কল্পনা করিলেন। কৃষ্ণসুন্দরী দেবীর ষোড়শবর্ষীয় একমাত্র পুত্র যোগেন্দ্রনারায়ণ তখন জীবিত ছিলেন। অনেকে আশঙ্কা করিলেন, পাছে যোগেন্দ্রেরই বা কোন অকল্যাণ হয়। এরূপ অশুভ ভাবনার প্রতিবাদে অনেকেই সন্ন্যাসী সম্বন্ধে অবজ্ঞার সুরে মন্তব্য করিলেন,—"ভিক্ষালুব্ধ ভবঘুরে সন্ন্যাসীরা এমন কতকিছুই বলে থাকে, এদের কথা কে বিশ্বাস করে?" কেহ কেহ আবার সন্ন্যাসীঠাকুরের উন্নত বপু, উদাস দৃষ্টি, উদার মনোভাব প্রভৃতি সাত্ত্বিক লক্ষণাদির উল্লেখ করিয়া কহিলেন,—"এঁকে সাধারণ সন্ন্যাসী ব'লে মনে হয় না। নিশ্চয়ই ইনি কোন মহাত্মা হবেন। এঁর কথা কখনও মিথ্যা হ'তে পারে না। মনুর গর্ভে সত্য সত্যই কোন মহাপুরুষের জন্ম হবে।" এই সময় মনোমোহিনী দেবী অন্তঃসত্ত্বা ছিলেন। তখন তাঁহার বয়ঃক্রম আঠার বৎসর।

মনোমোহিনী দেবীর অধিকাংশ সময় এখন গুরুদেবের পূজার্চনাতেই অতিবাহিত হয়। ত্রিসন্ধ্যা মন্ত্রসাধন এবং অষ্টপ্রহর নামজপ লইয়াই তিনি বিভোর থাকেন। গৃহাঙ্গনাদি মার্জন ও লেপন, ভোজ্যদ্রব্য রন্ধন ও পরিবেষণ এবং পরিজনের সেবা-পরিচর্যাদি পরিবারের প্রাত্যহিক প্রতিটি কর্মের সঙ্গে অবিরাম চলিতেছে তাঁহার নাম আর ধ্যান। দেখিতে দেখিতে তাঁহার গর্ভের নবম ও দশম মাস পূর্ণ হইয়া গেল। ক্রমে একাদশ মাসও উত্তীর্ণ হইতে চলিল, কিন্তু শীঘ্র সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার কোন লক্ষণই প্রকাশ পাইল না।

কৃষ্ণসুন্দরী দেবী ইহাতে বড়ই বিচলিত হইয়া পড়িলেন। এদিকে আবার একী ভীষণ দৈব-বিড়ম্বনা। কন্যার গর্ভের একাদশ মাস পূর্ণ হইলে যোগেন্দ্রনারায়ণ হঠাৎ অসুস্থ হইয়া পড়িলেন এবং কয়েকদিন রোগভোগের পর

সকলকে শোকসাগরে ভাসাইয়া পরলোক গমন করিলেন।* বংশপ্রদীপ একমাত্র পুত্রের অকালমৃত্যুতে মর্মান্তিক শোকে কৃষ্ণসুন্দরীর দেহমন ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল, তাহাতে কন্যার সন্তান-প্রসবের অস্বাভাবিক কালবিলম্বে নানা অমঙ্গল-আশঙ্কায় তিনি উন্মাদিনীপ্রায় হইয়া উঠিলেন।

সহৃদয় পল্লীবাসীদেরও দুশ্চিন্তার অবধি ছিল না। তাঁহারা সকলেই অত্যন্ত চিন্তিত হইয়া পড়িলেন এবং পরস্পরে নানা কথা বলাবলি করিতে লাগিলেন। কেহ কহিলেন,—"গর্ভের দিন গণনায় ভুল হয়নি তো?" কেহ মন্তব্য করিলেন,—"হঠাৎ যোগেন্দ্র মারা গেল, এতদিনেও মনুর সন্তান প্রসব হলো না, ব্যাপারটা কিন্তু নেহাৎ সামান্য বলে মনে হয় না। তবে বা সেই সন্ন্যাসী ঠাকুরের কথাই সত্য হয়। মনুর গর্ভে খুব সম্ভব কোন মহাপুরুষেরই আগমন হবে।" ইহাতে কেহ কেহ বিরূপ মনোভাব ব্যক্ত করিয়া বলিলেন,—"সে কি কথা! এই নগণ্য পল্লীর এক সাধারণ গৃহস্থ-ঘরে, এই আমাদের মনুর পেটে একজন মহাপুরুষ এসে জন্ম নেবেন, এ-ও কি কখনও সম্ভব?" তদুত্তরে অনেকে বিশেষ দৃঢ়তার সঙ্গে উক্তি করিলেন,—"কেন, এই চৌধুরী-পরিবার কি সামান্য? মনুর দিদিমা কৃপাময়ীর অপূর্ব শ্রদ্ধাভক্তির কথা কে না জানে? পিতা রামেন্দ্রনারায়ণের মত ভক্তিমান, পরোপকারী ও খ্যাতিমান পুরুষ কয়জন হয়! মাতা কৃষ্ণসুন্দরীর কেমন সরল স্বভাব ও উদার মন! আর স্বামী শিবচন্দ্র তো একজন দেবতুল্য মানুষ। মনুর কথা! তার মত মেয়ে সংসারে দুর্লভ! সবারই প্রতি তার কেমন দরদ, কি তার পতিসেবা, আর কি অসাধারণ তার গুরুভক্তি! আট বছরের কাঁচ মেয়ে কঠোর সাধনায় নাম পেয়ে ধন্য হ'লো। মহাপুরুষের জন্ম নেবার এইতো যোগ্য স্থান।"

কন্যার জন্য নিদারুণ দুর্ভাবনায় কৃষ্ণসুন্দরীর আহারনিদ্রা ত্যাগ হইয়াছে। এ দুর্দিনে রাধামদনমোহনের কৃপাই তাঁহার একমাত্র সম্বল। শোকাকুলা মাতা ঠাকুরঘরে পড়িয়া অহর্নিশ অঝোরে ক্রন্দন করেন, আর বিগ্রহ-দেবতার চরণে অন্তরের কাতর প্রার্থনা নিবেদন করেন। ভক্তের টানে অবশেষে ভগবানের আসন টলিল। বিপদ্‌ভঞ্জন শ্রীমধুসূদন সদয় হইলেন। দুঃখরজনীর ঘনান্ধকারের অবসানে কৃষ্ণসুন্দরীর ভাগ্যাকাশে সুখ-সূর্যোদয়ের শুভ সূচনা দেখা দিল।

ঊষা আগতপ্রায়। মনোমোহিনী দেবী শারীরিক অবস্থার মুহুর্মুহুঃ পরিবর্তন অনুভব করিতেছেন। প্রসব-কাল আসন্ন বুঝিতে পারিয়া জননী দেবী কন্যাকে সূতিকাগারে লইয়া গেলেন এবং সত্বর ধাত্রীকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। ধাত্রীও অবিলম্বেই আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং নিবিষ্ট মনে প্রসূতির অবস্থাদি পর্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। প্রসূতির মাতৃদেবী ও কনিষ্ঠা

---

* মৃত্যু-তারিখ—১২৯৫ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ-সংক্রান্তি।

ভগিনী গোবিন্দমণি সূতিকাগৃহে রহিলেন এবং অপর রমণীগণ অধীর উৎকণ্ঠায় অলিন্দে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

বড়ই আশ্চর্যের বিষয়, মনোমোহিনী দেবীর প্রসবকালোচিত কোনরূপ যন্ত্রণাবোধ ছিল না। এই সময় তিনি নিজে, মাতা, ভগিনী ও ধাত্রী—সূতিকাঘরের সকলেই হঠাৎ একবার তন্দ্রাবিষ্ট হইয়া পড়িয়াছিলেন। কিন্তু নিমেষকাল মধ্যেই অগ্নিচ্ছটাতুল্য এক অত্যুজ্জ্বল আলোকপাতে তাঁহাদের সে তন্দ্রাঘোর কাটিয়া যায়। সকলে তখন পুলকিত বিস্ময়ে দেখিতে পাইলেন, তাঁহাদের অজ্ঞাতে অপূর্ব জ্যোতিঃসম্পন্ন গৌরকান্তি মুণ্ডিতমস্তক এক শিশু ভূমিষ্ঠ হইয়া আছেন এবং তাঁহার ভাস্বররূপে গৃহখানি উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে।

এই শিশুটিই শিবচন্দ্র ও মনোমোহিনী দেবীর জ্যেষ্ঠ সন্তান, আমাদের শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র। তাঁহার শুভাবির্ভাবলগ্নটি ছিল—১৮১০ শকাব্দ; বঙ্গাব্দ ১২৯৫ সালের ৩০শে ভাদ্র, শুক্রবার, সংক্রান্তি-দিবস, তালনবমী তিথি, দিবা চারি দণ্ড বিশ পল; খৃস্টাব্দ ১৮৮৮ সালের ১৪ই সেপ্টেম্বর, সকাল সাত ঘটিকা আটাশ মিনিট। রমণীয় শারদ প্রাতে তখন পূর্বাশা বালার্কপ্রভায় রঞ্জিত—পল্লীবাসিগণ দিবারম্ভে স্ব-স্ব ধর্মকর্মে সদ্যঃপ্রবৃত্ত।

কুললনাগণ পাঁচবার হুলুধ্বনি দিয়া চিরাচরিত প্রথায় নবজাতকের শুভাগমন-বার্তা ঘোষণা করিলেন। মনোমোহিনী দেবীর পুত্র-প্রসবের এই বহু-আকাঙ্ক্ষিত সুসংবাদটি শ্রবণমাত্র চারিদিক হইতে আগ্রহাকুল নরনারী আহ্লাদিত অন্তরে কৃষ্ণসুন্দরীর গৃহে ছুটিয়া আসিলেন। রূপলাবণ্যময় দেবোপম শিশুটির অনিন্দ্য দেহকান্তি দর্শনে সকলে অপরিসীম আনন্দ লাভ করিলেন।

শিশুমাত্রেই জন্মগ্রহণের পর ক্রন্দন করিয়া থাকে, কিন্তু সকলে সবিশেষ বিস্ময়ের সহিত লক্ষ্য করিলেন, এ শিশু ভূমিষ্ঠ হইয়া একটুও কাঁদিলেন না, বরং প্রশান্ত বদনে মৃদু মৃদু হাসা করতঃ বিস্ফারিত নেত্রে চতুর্দিক নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। এই অপূর্ব ঘটনায় অনেকেরই মনে পূর্বোক্ত সন্ন্যাসী ঠাকুরের কথা উদিত হইল, তাঁহার ভবিষ্যদ্বাণীর যথার্থতা সম্বন্ধেও তাঁহারা এইবার পূর্বাপেক্ষা আরও অধিক আস্থাবান হইলেন এবং মনে মনে ভাবিলেন,—তাহ'লে এ শিশু নিশ্চয়ই সামান্য নহেন।

যোগেন্দ্রনারায়ণের শোচনীয় মৃত্যুতে পরিবারে যে শোকের ঝড় বহিয়াছিল, দৈবানুগ্রহে মনোমোহিনী দেবীর অঙ্কে এই অনুপম অপত্যটির শুভাবির্ভাবে তাহা প্রভূত পরিমাণে প্রশমিত হইল। নবজাত দৌহিত্রের প্রফুল্ল বদনকমল সন্দর্শনে শোকাতুরা কৃষ্ণসুন্দরীর তাপিত প্রাণ শীতল হইল।

ষষ্ঠ অধ্যায়

শৈশব ও বাল্যকাল

দিন যাইতে লাগিল। মনোমোহিনী দেবীর নবজাত শিশুটি মা ও দিদিমার স্নেহনীড়ে দিন দিন বাড়িয়া উঠিতে লাগিলেন।

কৃষ্ণসুন্দরী দেবী শাস্ত্রবিধি অনুসারে নবম মাসে মহা ধুমধামের সহিত দৌহিত্রের শুভ অন্নপ্রাশন উৎসব সম্পন্ন করিলেন। এই অনুষ্ঠানে প্রচলিত প্রথামত শিশুর সম্মুখে ধান্য, মৃত্তিকা, অর্থ ও পুস্তকাদি রাখা হইলে, শিশু অন্য কিছু স্পর্শ না করিয়া পরম আগ্রহে মৃত্তিকা ও পুস্তক হাতে লইয়াছিলেন। ইহাতে উপস্থিত সকলে মন্তব্য করিয়াছিলেন,—"শিশু ভবিষ্যৎ জীবনে ভূস্বামী ও বিদ্বান হইবেন।" অন্নপ্রাশন উৎসবে শিশুকে শোভাযাত্রা সহ 'গ্রামগস্ত' দেওয়া হইলে, সকলে ইহা লক্ষ্য করিয়া বিস্মিত হইয়াছিলেন যে, শিশু জনতার মধ্যে তাঁহার কোন পরিচিত লোক দেখিলেই পাল্কী হইতে মুখ বাড়াইয়া তাহার দিকে তাকাইয়া হাসিয়া উঠিয়াছিলেন।

উক্ত অন্নপ্রাশন-অনুষ্ঠানে জননী মনোমোহিনী দেবী নিম্নোদ্ধৃত উপদেশগর্ভ তাৎপর্যপূর্ণ কবিতাপঙ্‌ক্তি-চতুষ্টয়ে পুত্রের 'অনুকূল' নামকরণ নিষ্পন্ন করিয়া তাঁহাকে আশীর্বাদ করিয়াছিলেন।*

"অকূলে পড়িলে দীন হীন জনে
নুয়াইও শির, কহিও কথা।
কূল দিতে তারে সেধো প্রাণপণে
লক্ষ্য করি তার নাশিও ব্যথা।।"

শৈশবকালে অনুকূলচন্দ্রের চালচলন হাবভাব একটু অদ্ভুত প্রকৃতির ছিল। প্রাণশক্তির অপূর্ব প্রকাশ তাঁহার প্রতি কার্যে লক্ষিত হইত। সাধারণ শিশুদের অপেক্ষা বহু কম সময়ে—সাত-আট মাস বয়সেই তিনি হাঁটিতে ও কথা বলিতে শিখিয়াছিলেন। তাঁহার শৈশব-চাঞ্চল্যের কত-না কাহিনী! বহু ঘটনার একটি মাত্র আমরা এখানে উল্লেখ করিব। শিশুর বয়ঃক্রম যখন প্রায় দশ মাস, জননীদেবী তাঁহাকে লইয়া 'হরিপুর' গ্রামে আত্মীয় উমেশচন্দ্র লাহিড়ী মহাশয়ের বাড়ীতে কিছুকাল বাস করিয়াছিলেন। ঘটনাটি তৎকালে সেখানেই ঘটে। আমরা জননীদেবীর শ্রীমুখে ইহার যে বিবরণ শুনিয়াছি, নিম্নে তাহা বিবৃত করিলাম।—

---

*উদ্ধৃত কবিতাটি সম্বন্ধে লক্ষণীয় বিষয় এই যে, ইহার চারিটি চরণের আদ্য অক্ষরগুলি পর পর সংযোগ করিলে 'অনুকূল' নামটি পাওয়া যায়।

উমেশচন্দ্র ছিলেন একজন অতি নিষ্ঠাবান সাত্ত্বিক প্রকৃতির ব্রাহ্মণ। প্রত্যহ প্রাতঃকালে স্নানান্তে তিনি ঠাকুরপূজার জন্য নিজহস্তে পুষ্পচয়ন করিতেন, নিত্য নিয়মিতভাবে নিষ্ঠার সহিত গৃহদেবতা শ্রীশ্রীগোপালদেব-বিগ্রহের পূজা করিতেন। ঠাকুরের সেবাপূজা ও ভোগরাগাদি সমাপন না করিয়া তিনি কোনদিন জলগ্রহণ করিতেন না।

একদিনের কথা। উমেশচন্দ্র পরম শ্রদ্ধা সহকারে ঠাকুরের পূজাপাঠ সমাপনপূর্বক ভক্তিভরে ভোগরাগ নিবেদন করিয়া নিমীলিতনেত্রে ঠাকুরের ভোগগ্রহণের মানসচিন্তায় ধ্যানমগ্ন রহিয়াছেন, এমন সময় অকস্মাৎ একটা ঠুং-শব্দে চমকিত হইয়া চক্ষু মেলিয়া চাহিয়া দেখিলেন,—শ্রীশ্রীগোপালদেব বিগ্রহ-ঠাকুরের পিত্তল-মূর্তিটি মাটির উপর গড়াইতেছে, আর মনোমোহিনী দেবীর শিশুপুত্র অনুকুলচন্দ্র ঠাকুরের সিংহাসনে বসিয়া মৃদু মৃদু হাস্য করিতেছে। উমেশচন্দ্র তখন মনোমোহিনী দেবীকে ডাকিয়া আনিয়া শিশুর ঈদৃশ অদ্ভুত কাণ্ডের দৃশ্যটি দেখাইলেন। জননীদেবী অপ্রস্তুত হইয়া শিশুকে লইয়া তাড়াতাড়ি অন্তঃপুরে চলিয়া গেলেন।

স্পর্শদোষে বিগ্রহমূর্তি অপবিত্র হইয়াছেন। সুতরাং উমেশচন্দ্র পঞ্চগব্যাদি সংগ্রহ করিয়া যথাবিধি ক্রিয়াচারে তাঁহারে শোধন করিয়া লইয়া পুনরায় পূজায় বসিলেন। পূজাশেষে ভোগরাগ নিবেদনপূর্বক যেমনই ধ্যানমগ্ন হইয়াছেন, ঠুং-শব্দে সচকিত হইয়া তিনি দেখিতে পাইলেন, পূর্ববৎ এবারেও বিগ্রহমূর্তি ভূমিতে লুণ্ঠিত এবং সহাস্যবদন শিশু সিংহাসনে উপবিষ্ট।

বেলা অধিক হইয়াছে। আবার কখন ঠাকুরের শোধন করিবেন, কখনই বা তাঁহার সেবাপূজা ও ভোগরাগ নিবেদন করিবেন, এই চিন্তায় উমেশচন্দ্র অস্থির হইয়া পড়িলেন। অভুক্ত ব্রাহ্মণ এই অবস্থায় একটু কুপিত হইয়াই মনোমোহিনী দেবীকে ডাকিয়া, শিশুকে কোনও একটি ঘরে শিকলীবদ্ধ করিয়া আটকাইয়া রাখিতে এবং দারোয়ানকেও শিশু যাহাতে ঠাকুরঘরে প্রবেশ করিতে না পারে, সে বিষয়ে সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে আদেশ দিলেন। মনোমোহিনী দেবী ও দারোয়ান উভয়েই তাঁহার নির্দেশমত যথাযথভাবে স্ব-স্ব কর্তব্য-পালনে সবিশেষ সচেতন রহিলেন।

পঞ্চগব্য দ্বারা বিগ্রহদেবতার শোধন করিয়া লইয়া উমেশচন্দ্র পুনরায় নূতনভাবে পূজাকার্যে রত হইলেন। কিন্তু কি আশ্চর্য! এবারেও পূজান্তে ভোগনিবেদনকালে সেই ঠুং-শব্দে ধ্যানভঙ্গ হওয়ায়, পূর্বপূর্ব বারের মত সেই একই নাট্যের পুনরাভিনয় প্রত্যক্ষ করিয়া তিনি স্তম্ভিত হইলেন—বিগ্রহমূর্তি ভূতলে পড়িয়া আছে, শিশু অনুকুলচন্দ্র সিংহাসনে বসিয়া হাসিতেছে। না জানি কখন কাহার কোন্ মুহূর্তের অসতর্কতার সুযোগ লইয়া শিশু এবারেও ছুটিয়া আসিয়াছে। ক্ষোভে দুঃখে উমেশচন্দ্র উচ্চকণ্ঠে বিলাপ করিতে

লাগিলেন। বাড়ীসুদ্ধ সকলে তখন সেখানে দৌড়াইয়া আসিলেন। পুনঃ পুনঃ এইরূপে ঠাকুরপূজার বিঘ্ন করায় জননীদেবী অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া শিশুকে ধরিয়া আনিলেন এবং তাহার কোমল কপোলে সজোরে এক চপেটাঘাত করিয়া বলিলেন,—"তুই কেন বার বার এসে এভাবে পূজো পণ্ড করিস?" শিশু তখন কাঁদিতে কাঁদিতে অর্ধ-স্ফুট স্বরে বলিলেন,—"ও আমায় ডাকে কেন?"

শিশুর মুখে এই কথা কয়টি শুনিবামাত্র উমেশচন্দ্র ভাবাবেগে আত্মহারা হইয়া, মাতৃক্রোড় হইতে শিশুকে টানিয়া লইয়া আপন বক্ষে চাপিয়া ধরিলেন, আর উন্মত্তের মত কত-কি বলিয়া যাইতে লাগিলেন,—"মনু, মনু, খোকা কি বললে?—আমায় ডাকে কেন?—আমায় ডাকে কেন?......তুমি আমার ডাক শুনেছ খোকা?" শিশুকে কোলে লইয়া উমেশচন্দ্র আনন্দে নৃত্য করিতেছেন, তাঁহার দুই চক্ষু বাহিয়া অঝোরে অশ্রু ঝরিতেছে। নিবেদিত যত-কিছু ভোগ-নৈবেদ্য তিনি শিশুর কচিমুখে তুলিয়া দিতেছেন, আর ভাববিভোর হইয়া বলিতেছেন,—"আমার এতদিনের পূজারাধনা আজ সার্থক হল, আমি ধন্য। আয়, তোরা কে কোথায় আছিস—শিগ্‌গির আয়—আমার গোপালের প্রসাদ নিয়ে যা।"

অতঃপর সহজ স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়া আসিলে, উমেশচন্দ্র বলিলেন,—"মনু, কি আশ্চর্য! এইটুকু ছেলে এতসব কড়া প্রহরা এড়িয়ে এখানে এলোই বা কি ক'রে, আর এমন উঁচু সিংহাসনে উঠলোই বা কি ক'রে!"

অনুকূলচন্দ্র শৈশবকালে সর্বদাই একখানা লাঠি-হাতে লইয়া খেলা করিতে বড় ভালবাসিতেন। লাঠি তাঁহার এতই প্রিয় ছিল যে, কেহ কখনও ক্ষণিকের জন্য উহা তাঁহার হাতছাড়া করিতে পারিত না। বাড়ীর উঠানের প্রান্তে ছিল একটা শিউলী গাছ। শিশু লাঠি হাতে হামাগুড়ি দিয়া সেই গাছটির নিকটে যাইয়া উহা ধরিয়া নিজে নিজেই দাঁড়াইতে চেষ্টা করিতেন, বারংবার বিফলমনোরথ হইলেও চেষ্টা ছাড়িতেন না। শিশুর হাতে সর্বক্ষণই একখানা লাঠি থাকিত বলিয়া পাড়াপ্রতিবেশী সকলে তাঁহাকে আদর করিয়া 'গাড়োয়ান' 'গ্যাড়োয়ান' বলিয়া ডাকিতেন।

শিশুর বয়ঃক্রম ক্রমশ বাড়িয়া চলিল। তাঁহার চঞ্চলতা ও দুরন্তপনার আর এখন অবধি নাই। সারাদিন তিনি ছুটাছুটি করিয়া সকলকে অস্থির করিয়া তুলেন। এই মুহূর্তে মায়ের কাছে বসিয়া আছেন, পরক্ষণেই আর সেখানে নাই; দেখা গেল, নিমেষের মধ্যে পার্শ্ববর্তী বসুদের বাগানে ঢুকিয়া গাছ-পালা সব তছনছ করিয়া আসিয়াছেন। খেয়াল হইল, প্রতিবেশীর পূজামণ্ডপে প্রবেশ করিয়া বিগ্রহ-গাত্রের চন্দনাদি লইয়া নিজ অঙ্গে লেপন করিলেন, কখনও কাহারও নারায়ণ-শিলা লইয়া গিয়া বাঁশ-ঝাড়ের নীচে পত্রাচ্ছাদনে বা পুকুরে কাদার মধ্যে লুকাইয়া রাখিলেন। লোকের বাড়ীর গোয়ালে ঢুকিয়া কাহারও গরু, কাহারও

বাছুর ছাড়িয়া দিয়া আসিলেন। পাড়ার কবিরাজ মহাশয় বিষবটিকা রৌদ্রে শুকাইতে দিয়া স্বয়ং প্রহরা দিতেছেন, তাঁহার ক্ষণিক অনুপস্থিতির অবকাশে বালক কোথা হইতে ছুটিয়া আসিয়া উহার এক মুষ্টি লইয়া খাইয়া ফেলিলেন, আর তৎক্ষণাৎ দৌড়াইয়া পলায়ন করিলেন। দুশ্চিন্তায় সকলের মুখ শুকাইয়া গেল, পাড়াসুদ্ধ হুলস্থুল পড়িয়া গেল।

বালকের এইরূপ অসংখ্য রকমের দৌরাত্ম্যে প্রতিবেশীরা সর্বক্ষণ অতিষ্ঠ থাকিতেন। তাঁহাদের নিরত নালিশ জননীদেবীর পক্ষে অসহ্য হইয়া উঠিত। তবে বড়ই আশ্চর্যের বিষয় এই যে, বালক যখনই যাহা করিতেন, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করামাত্র তিনি অম্লানবদনে তাহা স্বীকার করিতেন, কখনও কিছু গোপন করিতেন না। তাঁহার এইরূপ সহজ সারল্যের জন্য হাজার অন্যায় করিলেও তাঁহাকে কাহারও শাস্তি দিবার ইচ্ছা হইত না, বিশেষ, তাঁহার প্রাণজুড়ানো মধুর বচনে সকলের মন গলিয়া যাইত, সেইজন্য পল্লীবাসী নরনারী প্রত্যেকে তাঁহাকে প্রাণ দিয়া ভালবাসিত।

শিশুর সম্বন্ধে আর একটি অদ্ভুত ব্যাপার লক্ষ্য করিয়া সকলে বিস্মিত হইতেন। তাঁহার মুখের বাণী আশ্চর্যরূপে ফলিয়া যাইত। নিম্নে কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ করা যাইতেছে।

একবার জননীদেবী ও কর্তামা (দিদিমা কৃষ্ণসুন্দরী দেবী) শিশু অনুকূলচন্দ্রকে লইয়া নৌকাযোগে কুষ্টিয়া হইতে হিমাইতপুরে আসিতেছিলেন। খরস্রোতা পদ্মানদীতে নৌকা-চালানো একেই অতি কঠিন কার্য, তাহাতে সেদিন দৈবক্রমে কালবৈশাখীর ঝড় উঠিয়াছিল। পদ্মাবক্ষে প্রকৃতির সে তাণ্ডবলীলা অবর্ণনীয়। মাঝিরা নিরুপায় হইয়া প্রাণভয়ে নদীজলে লাফাইয়া পড়িল; সন্তরণের সাহায্যে জীবনরক্ষার প্রয়াসে ব্যর্থ হইয়া তাহারা স্রোতজলে কে কোথায় ভাসিয়া গেল। কাণ্ডারী-বিহীন বিপন্ন তরণীখানি কোন্ মুহূর্তে যে সলিলসমাধি প্রাপ্ত হয় তাহার কোনই স্থিরতা নাই। এই মহা সংকটকালে জননীদেবী প্রাণপণে ইষ্টনাম জপিতেছেন, কর্তামা শ্রীশ্রীরাধামদনমোহনের উদ্দেশে অন্তরের আকুল প্রার্থনা জানাইতেছেন। এমন সময় শিশুকণ্ঠের "মা, ছিগ্‌গির নাম্"—এই অর্ধস্ফুট অস্পষ্ট কথা কয়টি দৈববাণীর মত জননীদেবীর কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল। শ্রবণ-মাত্র তিনি যেন অকূলে কূল পাইলেন। এই অবস্থায় কোন্ এক অজ্ঞাত ঐশী শক্তির প্রেরণায় বলীয়ান হইয়া তিনি এক হস্তে শিশুকে কোলে লইয়া এবং অপর হস্তে কর্তামার হাত ধরিয়া তৎক্ষণাৎ ঝঞ্ঝা-বিক্ষুব্ধ নদী-বক্ষে নামিয়া পড়িলেন। আশ্চর্যের বিষয়, অবতরণমাত্র তাঁহারা তলায় ভূমিস্পর্শ অনুভব করিলেন। অতঃপর যতই তাঁহারা অগ্রসর হইতে লাগিলেন, কোথায়ও হাঁটুর উপর জল উঠিল না। চলিতে চলিতে তাঁহারা এক চর-ভূমিতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এই অবসরে ঝড় থামিয়া গেল,

প্রকৃতিও শান্ত হইল। তাঁহারা তখন অন্য এক নৌকায় বাড়ীর দিকে যাত্রা করিলেন।

অনুকূলচন্দ্রের তিন বৎসর বয়সের একটি ঘটনা। জনৈক প্রতিবেশীর গৃহে একটি শিশুসন্তান জন্মগ্রহণের সংবাদ পাইয়া তাহাকে দেখিবার ইচ্ছায় জননীদেবী পুত্রকে বলিলেন,—"অনুকূল, ও বাড়ীতে একটি ছেলে হয়েছে, চল্ যাই তাকে একটু দেখে আসি।" মার কথা শ্রবণ-মাত্র শিশু বলিয়া উঠিলেন,—'না মা, যাব না। ওকে দেখে কি হবে? ও তো আঠার দিনের বেশী বাঁচবে না।' পরম বিস্ময় ও দুঃখের কথা, আঠার দিনেই সেই শিশুটির মৃত্যু ঘটিয়াছিল।

বালকের চারি বৎসর বয়ঃক্রম-কালের আর একটি ঘটনা। প্রতিবেশী মুকুন্দলাল বসুর ভ্রাতুষ্পুত্র হেমেন্দ্র একটি সুন্দর পুষ্পোদ্যান করিয়াছিলেন। বাগানটির তিনি খুবই যত্ন লইতেন এবং শক্ত বেড়া দিয়া উহা রক্ষা করিতেন। বালক না-জানি কিভাবে প্রায়শই উদ্যানে প্রবেশ করিয়া তাঁহার অতি সাধের ফুলগাছগুলি উপড়াইয়া ফেলিতেন। এজন্য হেমেন্দ্র মনোদুঃখে কত কান্নাকাটি করিতেন। বালক একদিন হেমেন্দ্রকে বলিলেন,—"দেখ, তোমার বাগানের গাছগুলি আমিই নষ্ট করি। জেনো, যতবারই তুমি বাগান করবে, আমি তা তছনছ না ক'রে ছাড়ব না। তোমার এখানে দু'দিনের বাগান ক'রে কি হবে, এখানে তো তুমি থাকবে না।"—এই বলিয়া বালক আকাশের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশপূর্বক কহিলেন,—"তোমার জন্য ঐখানে সুন্দর বাগান করা আছে। সে বাগান এ বাগানের চেয়ে অনেক ভাল।" কি আশ্চর্য! শিশুমুখের তাৎপর্যপূর্ণ কথা কয়টি অচিরেই কঠোর সত্যে পরিণত হইল। কিছুকালের মধ্যেই হেমেন্দ্র কঠিন যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হইয়া অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন।

শুনিতে পাওয়া যায়, শৈশবকালে অনুকূলচন্দ্রের মধ্যে অসাধারণত্ব লক্ষ্য করিয়া সাধু-সন্ন্যাসী অনেকেই তাঁহার উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নানা উক্তি করিতেন। এ সম্বন্ধে নিম্নে কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ করা যাইতেছে।

একবার শিশুর খুব কঠিন পীড়ার সময় শিবচন্দ্রের গৃহে এক সন্ন্যাসীর আগমন হয়। তিনি জননীদেবীকে শিশুর রোগমুক্তির জন্য কয়েকটি প্রক্রিয়ার কথা বলিয়া যান এবং ভবিষ্যদ্বাণী করেন,—"এ শিশু মরবে না, এ সামান্য শিশু নয়।"

একদা এক প্রবীণ সন্ন্যাসী আসিয়া শিবচন্দ্রের গৃহে কিছুকাল বাস করিয়াছিলেন। শিশুর সঙ্গসুখ উপভোগ করিয়া তিনি বড়ই আনন্দ পাইতেন। তিনি শিশুকে আদর করিয়া কাছে বসাইয়া নানা মিষ্টদ্রব্য ভোজন করাইতেন এবং নিজে তাঁহার ভুক্তাবশেষ প্রসাদ-স্বরূপে গ্রহণ করিয়া কৃতার্থ বোধ করিতেন। তিনি বলিতেন,—"এ শিশু ভগবানের সাক্ষাৎ অবতার।"

বাছুর ছাড়িয়া দিয়া আসিলেন। পাড়ার কবিরাজ মহাশয় বিষবটিকা রৌদ্রে শুকাইতে দিয়া স্বয়ং প্রহরা দিতেছেন, তাঁহার ক্ষণিক অনুপস্থিতির অবকাশে বালক কোথা হইতে ছুটিয়া আসিয়া উহার এক মুষ্টি লইয়া খাইয়া ফেলিলেন, আর তৎক্ষণাৎ দৌড়াইয়া পলায়ন করিলেন। দুশ্চিন্তায় সকলের মুখ শুকাইয়া গেল, পাড়াসুদ্ধ হুলস্থুল পড়িয়া গেল।

বালকের এইরূপে অসংখ্য রকমের দৌরাত্ম্যে প্রতিবেশীরা সর্বক্ষণ অতিষ্ঠ থাকিতেন। তাঁহাদের নিয়ত নালিশ জননীদেবীর পক্ষে অসহ্য হইয়া উঠিত। তবে বড়ই আশ্চর্যের বিষয় এই যে, বালক যখনই যাহা করিতেন, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করামাত্র তিনি অম্লানবদনে তাহা স্বীকার করিতেন, কখনও কিছু গোপন করিতেন না। তাঁহার এইরূপ সহজ সারল্যের জন্য হাজার অন্যায় করিলেও তাঁহাকে কাহারও শাস্তি দিবার ইচ্ছা হইত না, বিশেষ, তাঁহার প্রাণজুড়ানো মধুর বচনে সকলের মন গলিয়া যাইত, সেইজন্য পল্লীবাসী নরনারী প্রত্যেকে তাঁহাকে প্রাণ দিয়া ভালবাসিত।

শিশুর সম্বন্ধে আর একটি অদ্ভুত ব্যাপার লক্ষ্য করিয়া সকলে বিস্মিত হইতেন। তাঁহার মুখের বাণী আশ্চর্যরূপে ফলিয়া যাইত। নিম্নে কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ করা যাইতেছে।

একবার জননীদেবী ও কর্তামা (দিদিমা কৃষ্ণসুন্দরী দেবী) শিশু অনুকূলচন্দ্রকে লইয়া নৌকাযোগে কুষ্টিয়া হইতে হিমাইতপুরে আসিতেছিলেন। খরস্রোতা পদ্মানদীতে নৌকা-চালানো একেই অতি কঠিন কার্য, তাহাতে সেদিন দৈবক্রমে কালবৈশাখীর ঝড় উঠিয়াছিল। পদ্মাবক্ষে প্রকৃতির সে তাণ্ডবলীলা অবর্ণনীয়। মাঝিরা নিরুপায় হইয়া প্রাণভয়ে নদীজলে লাফাইয়া পড়িল; সন্তরণের সাহায্যে জীবনরক্ষার প্রয়াসে ব্যর্থ হইয়া তাহারা স্রোতজলে কে কোথায় ভাসিয়া গেল। কাণ্ডারী-বিহীন বিপন্ন তরণীখানি কোন্ মুহূর্তে যে সলিলসমাধি প্রাপ্ত হয় তাহার কোনই স্থিরতা নাই। এই মহা সংকটকালে জননীদেবী প্রাণপণে ইষ্টনাম জপিতেছেন, কর্তামা শ্রীশ্রীরাধামদনমোহনের উদ্দেশে অন্তরের আকুল প্রার্থনা জানাইতেছেন। এমন সময় শিশুকণ্ঠের "মা, ছিগ্‌গির নাম্"—এই অর্ধস্ফুট অস্পষ্ট কথা কয়টি দৈববাণীর মত জননীদেবীর কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল। শ্রবণ-মাত্র তিনি যেন অকূলে কূল পাইলেন। এই অবস্থায় কোন্ এক অজ্ঞাত ঐশী শক্তির প্রেরণায় বলীয়ান হইয়া তিনি এক হস্তে শিশুকে কোলে লইয়া এবং অপর হস্তে কর্তামার হাত ধরিয়া তৎক্ষণাৎ ঝঞ্ঝা-বিক্ষুব্ধ নদী-বক্ষে নামিয়া পড়িলেন। আশ্চর্যের বিষয়, অবতরণমাত্র তাঁহারা তথায় ভূমিস্পর্শ অনুভব করিলেন। অতঃপর যতই তাঁহারা অগ্রসর হইতে লাগিলেন, কোথায়ও হাঁটুর উপর জল উঠিল না। চলিতে চলিতে তাঁহারা এক চর-ভূমিতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এই অবসরে ঝড় থামিয়া গেল,

করা পর্যন্ত তিনি শান্তি পাইতেন না। তাঁহার গুণপনায় মুগ্ধ হইয়া সঙ্গীরা সকলে খুশীমনে তাঁহাকে তাহাদের দলের সর্বাধিনায়ক প্রভু বলিয়া মানা করিত। অনুকূলচন্দ্রও তাঁহার এই সকল প্রিয় সাথীদের লইয়া সারাদিন খেলাধুলায় মগ্ন থাকিতেন এবং নানা দুরন্তপনায় কাল কাটাইতেন। তাঁহার বালক-কালের সে-সকল কাহিনীর অন্ত নাই। নিম্নে কয়েকটি ঘটনার কথা বলা যাইতেছে।

একদিন নিরালা মধ্যাহ্নে বাড়ীসুদ্ধ সকলে যখন বিশ্রামরত, অনুকূলচন্দ্র সঙ্গীদের লইয়া অতিশয় সংগোপনে তাঁহাদের ভিতর-বাড়ীতে প্রবেশ করিলেন এবং মায়ের তালা-বন্ধ রান্নাঘরের বেড়ার ছিদ্রপথে পাটকাঠির নল ঢুকাইয়া দিয়া তাঁহার দলের সকলকে দুগ্ধভাণ্ড হইতে চুষিয়া দুগ্ধ পান করাইলেন। অপরাহ্ণকালে জননীদেবীর নজরে পড়িল, উননের উপর দুগ্ধ-পাত্রে পুরু সর সবটুকু যেমন থাকিবার ঠিক তেমনই রহিয়াছে, কিন্তু তাহাতে দুধ এক ফোঁটাও নাই। তাঁহার বুঝিতে বাকী রহিল না যে, ইহা তাঁহার অনুকূলচন্দ্রেরই কাণ্ড। বলা বাহুল্য, বালককে ডাকিয়া এ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি সকল ঘটনা সরল মনে আদ্যন্ত বিবৃত করিলেন।

প্রাচীনেরা গল্প করেন, পাড়ার এক বৃদ্ধার বাড়ীতে বহু আমগাছ ছিল, তাহাতে প্রতিবৎসর প্রচুর আম হইত। দুঃখের বিষয়, বৃদ্ধা পল্লীর ছেলেমেয়েদের একটি আমও খাইতে দিতেন না। অনুকূলচন্দ্র একদিন তাঁহার সঙ্গীদের লইয়া বৃদ্ধার বাড়ীতে গিয়া উপস্থিত হইলেন এবং গাছে উঠিয়া অসংখ্য আম পাড়িয়া সকলকে পরিতোষ সহকারে ভোজন করাইলেন। বৃদ্ধা প্রতিবাদ করিলে তিনি তাঁহাকে বুঝাইয়া বলিলেন,—"মা, তুমি গাছের এতগুলি আম পচিয়ে নষ্ট ক'রে ফেলবে, আর আমরা বুঝি একটি আমও খেতে পাব না! তুমি না দিলে আমরা কোথায় পাব?" এমনই মধুর বচনে আব্দারের সুরে তিনি কথাগুলি বলিলেন যে, বৃদ্ধার মন গলিয়া গেল, তিনি আহ্লাদে আটখানা হইলেন। তখন হইতে বৃদ্ধা ছেলেপেলেদের আর আম পাড়িতে নিষেধ করিতেন না, বরং তিনি নিজেই তাহাদের ডাকিয়া আনিয়া আম খাওয়াইয়া অপার আনন্দ অনুভব করিতেন।

উক্তরূপ আর একটি বৃদ্ধার কাহিনী। অনুকূলচন্দ্রের বাড়ীর নিকটেই তাঁহার বাড়ী ছিল। অনুকূলচন্দ্র মাঝে মাঝে এই বৃদ্ধার বাড়ীতে বেড়াইতে যাইতেন। বৃদ্ধা তাঁহাকে আপন সন্তানের মত আদরযত্ন করিতেন। সংসারে আপনার বলিতে বৃদ্ধার আর কেহ ছিল না। অনুকূলচন্দ্রও তাঁহাকে খুব ভালবাসিতেন এবং আদর করিয়া 'ভাল মা' বলিয়া ডাকিতেন। এই বৃদ্ধার বাড়ীতেও যথেষ্ট আম হইত, কিন্তু কোনদিন কাহারও হাতে একটি আম তুলিয়া দিতে তাঁহার প্রাণে ধরিত না।

একদিনের কথা। তখন মধ্যাহ্ন কাল। বৃদ্ধা গাছ হইতে অনেকগুলি

আম পাড়াইয়াছেন। এই সময় অনুকুলচন্দ্র সেখানে গিয়া উপস্থিত হইলেন। বৃদ্ধা তাঁহাকে আমগুলির প্রহরায় নিযুক্ত রাখিয়া পদ্মায় স্নান করিতে গেলেন। এই সুযোগে পাড়ার একদল বালক আসিয়া ঢিল ছুঁড়িয়া বৃদ্ধার গাছের আম পাড়িবার চেষ্টা করে। দুঃখের বিষয়, তাহারা একটি আমও পাড়িতে সমর্থ হইল না। ইহাতে অনুকুলচন্দ্র মনে খুবই ব্যথা পাইলেন। তিনি তখন ছেলেদের ডাকিয়া ঝুড়ির আমগুলি সবই তাহাদের দিয়া দিলেন। ছেলেরা আম পাইয়া মনের আনন্দে তাড়াতাড়ি সেস্থান হইতে চলিয়া গেল। এদিকে স্নান-আহ্নিক সারিয়া বৃদ্ধা বাড়ীতে ফিরিলে অনুকুলচন্দ্রও তাঁহার নিকট বিদায় লইয়া স্বগৃহে গমন করিলেন।

কিছুক্ষণ পরে আমের ঝুড়িটির প্রতি বৃদ্ধার দৃষ্টি পড়িল। তিনি তাহা একেবারে শূন্য দেখিয়া বিস্ময়ে হতভম্ব হইলেন। অনুকুলচন্দ্র আম খাইয়াছেন, বৃদ্ধা অবশ্য তাহা আদৌ বিশ্বাস করেন না, আবার, অন্য কেহ যে খাইয়াছে, চারিদিকে কোথায় তাহারও কোন চিহ্ন দেখিলেন না। এই অবস্থায় রাগে ও দুঃখে ক্ষিপ্ত হইয়া বৃদ্ধা ঘরে-বাহিরে ছুটাছুটি করিতেছেন এবং অজ্ঞাত অপরাধীর উদ্দেশ্যে অজস্র গালিমন্দ বর্ষণ করিতে লাগিলেন।

পার্শ্ববর্তী প্রতিবেশী নবকৃষ্ণ চৌধুরী মহাশয় এতক্ষণ আপন গৃহের বারান্দায় বসিয়া তামাকু সেবন করিতে করিতে সমুদয় ব্যাপার লক্ষ্য করিতেছিলেন। তিনি বৃদ্ধাকে কাছে ডাকিয়া কহিলেন,—"দেখ, এ সবই তোমার আদরের দুলাল অনুকুলচন্দ্রের কাণ্ড। তুমি স্নানে গেলে সে-ই পাড়ার ছেলেদের ডেকে আমগুলি সব বিলিয়ে দিয়েছে। অনুকুলকে তুমি চেনো না, সে যেমনই ন্যায়বান তেমনই কোমলপ্রাণ। কারও এতটুকু অন্যায় বা বিন্দুমাত্র দুঃখ সে মোটেই সহ্য করতে পারে না, আর তার প্রতিকার না ক'রেও ছাড়ে না। তোমাকে সে খুবই ভালবাসে, তাই তোমাকে সমুচিত শিক্ষা দিবার জন্য ইচ্ছাপূর্বক সে এরূপ কাজ করেছে।" এইবার বৃদ্ধার জ্ঞানচক্ষু খুলিল। তিনি আত্মদোষ সম্বন্ধে সচেতন হইলেন। বিশেষ, সেইদিন হইতে অনুকুলচন্দ্রের প্রতি তাঁহার সহজ ভালবাসার টানটি আরও গভীর ও নিবিড় হইয়া উঠিল।

জননীদেবীর নিকট শুনিয়াছি, শিবচন্দ্র যখন সপরিবারে গোলকপুরের (ময়মনসিংহ) রানী অমৃতসুন্দরীর সদর কাছারী-বাড়ীতে থাকিতেন, বালক অনুকুলচন্দ্র প্রায়শ তাঁহার সঙ্গীদের লইয়া রানীমার সুসজ্জিত মনোরম পুষ্পোদ্যানে বলপূর্বক প্রবেশ করতঃ গাছপালা সব লণ্ডভণ্ড করিয়া ফেলিতেন। বালকের অপূর্ব হাবভাব দেখিয়া তাঁহাকে বাধা প্রদান করিতে সকলেই দ্বিধা বোধ করিতেন। অবশেষে রানীমা একদিন তাঁহাকে ডাকিয়া মিষ্ট ভাষায় আদরের সঙ্গে এইরূপ অনিষ্ট করিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, বালক হাসিমুখে মধুর বচনে বলিলেন,—"আমরা যে ফুল বড় ভালবাসি! আমরা যদি খুশীমত

বাগানে ঢুকতে পারি তবে আর কোন ক্ষতি করব না।" বালকের কথায় বিশ্বাস করিয়া সেইদিন হইতে ছেলেদের বাগানে প্রবেশের অবাধ অধিকার দেওয়া হইল। বড়ই আশ্চর্যের বিষয়, দেখা গেল, তাহারা অতঃপর বাগানের আর কোন অনিষ্ট করে নাই।

অনুকূলচন্দ্রের অন্তরখানি ছিল কোমলতায় ভরা। কোন প্রাণীর কষ্ট দেখিলে তাঁহার প্রাণ অস্থির হইয়া উঠিত। যতক্ষণ পর্যন্ত তিনি তাহার দুঃখ দূর করিতে না পারিতেন, তাঁহার ছটফটানির অন্ত থাকিত না। বালকের এই সহজ পরদুঃখকাতরতার কত অসংখ্য কাহিনী। নিম্নে দুটি-কয়েক ঘটনার উল্লেখ করা যাইতেছে।

অনুকূলচন্দ্র যখন পাঁচ-ছয় বৎসরের বালক, খেলার সাথীদের অনুরোধে তিনি একদিন বাড়ীর নিকটে পদ্মা নদীতে মাছ ধরিতে গিয়াছিলেন। তাঁহার বড়শীতে সেদিন বেশ একটি বড় মাছ ধরা পড়িয়াছিল। মাছটিকে তিনি কিছুতেই একাকী টানিয়া তুলিতে পারিতেছিলেন না। সঙ্গীরা সকলে মিলিয়া তখন উহাকে তীরে উঠাইয়া দিল। মাটিতে পড়িয়া মাছটি আসন্ন মৃত্যু-যন্ত্রণায় ছটফট করিতে লাগিল। এই মর্মান্তিক দৃশ্য দেখিয়া অনুকূলচন্দ্র নিদারুণ দুঃখে অভিভূত হইলেন এবং ইহার প্রাণরক্ষার সাহায্যের জন্য আর্তকণ্ঠে চীৎকার করিতে লাগিলেন। তাঁহার করুণ ক্রন্দন শুনিয়া চারিপাশের লোকেরা ছুটিয়া আসিল এবং তাঁহার সনির্বন্ধ কাতর অনুরোধে মাছটিকে বড়শী-মুক্ত করিয়া নদীর জলে ফেলিয়া দিল। বালক তখন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া আনন্দিত মনে গৃহে গমন করিলেন।

উক্তরূপ আর একটি ঘটনা। অনুকূলচন্দ্রের বাড়ীর নিকটেই একটি বড় বিল ছিল। জেলেরা এই বিলে আসিয়া মাছ ধরিত। বালক একদিন প্রাতঃকালে তথায় বেড়াইতে গিয়া দেখিতে পাইলেন, জেলেদের নৌকায় জালে-ধরা মাছগুলি শ্বাস-কষ্টে মৃতপ্রায় অবস্থায় হাবুডুবু খাইতেছে। মাছগুলির দুর্দশা দেখিয়া তাঁহার কোমলপ্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। কিভাবে ইহাদের প্রাণ বাঁচানো যায়, এই চিন্তায় তিনি অস্থির হইয়া উঠিলেন। জেলেদের সহিত কথাবার্তায় তিনি জানিতে পারিলেন, মাছগুলি হাটে বিক্রয় করিয়া তাহারা টাকা দুই রোজগার করিবে। জেলেদের কথা শুনিয়া তিনি ছুটিয়া বাড়ীতে মাতৃদেবীর কাছে গিয়া উপস্থিত হইলেন এবং দুইটি টাকার জন্য তাঁহাকে খুবই পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন। বালকের অজস্র অনুরোধ আব্দারেও জননীদেবী কিছুতেই সাড়া দিতেছেন না। অনুকূলচন্দ্রও ছাড়িবার পাত্র নহেন। অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য তিনি নাছোড়বান্দা হইয়া লাগিলেন। অবশেষে মাকে জড়াইয়া ধরিয়া ভীষণ কান্নাকাটি জুড়িয়া দিলেন। অতঃপর জননীদেবী অতিষ্ঠ হইয়া তাঁহার হাতে দুইটি টাকা দিয়া নিষ্কৃতি লাভ করিলেন। অনুকূলচন্দ্র টাকা দুইটি পাইয়াই

এক-দৌড়ে জেলেদের কাছে গিয়া হাজির হইলেন এবং মিনতিভরা সুরে তাহাদিগকে বলিলেন,—"ভাই, এই টাকা দু'টো নাও। মাছগুলোকে আর কষ্ট দিও না। ওদের ছেড়ে দাও।" বালকের এইরূপ অপূর্ব সদাশয়তার পরিচয়ে বিস্ময়-বিমুগ্ধ হইয়া জেলেরা তাঁহার নির্দেশমত মাছগুলিকে বিলের জলে ফেলিয়া দিয়া চলিয়া গেল।

এই অবস্থায় বালক উপস্থিত কিছুটা স্বস্তি লাভ করিলেন সত্য, কিন্তু তিনি চিরতরে নিশ্চিন্ত হইতে পারিলেন না। ভবিষ্যতে জেলেরা তো আবার এখানে মাছ ধরিতে আসিতে পারে, এই আশঙ্কায় তাঁহার দরদী মন ভীষণ চিন্তাকুল হইয়া উঠিল। ভাবী দুর্দৈব প্রতিরোধের অন্য কোন উপায় খুঁজিয়া না পাইয়া, কোমলপ্রাণ ক্ষুদ্র বালক অবশেষে করুণাময় শ্রীভগবানের চরণে আপন সরল শিশুমনের কাতর প্রার্থনা নিবেদন করিয়া বলিলেন,—'হে দয়াল ঠাকুর, বিলটা যেন তোমার কৃপায় সত্বরই শুকিয়ে যায়। জেলেরা যেন এখানে আর মাছ ধরতে না পারে।" এরূপ জনশ্রুতি যে, বালকের এই মনস্কামনা সিদ্ধ হইয়াছিল। তখন হইতেই নাকি বিলটা শুকাইতে আরম্ভ করে এবং অচিরেই তাহা একেবারে জলশূন্য হইয়া শুষ্ক কৃষিভূমিতে পরিণত হইয়াছিল।

অতিবাল্য হইতেই অনুকূলচন্দ্রের অপূর্ব পিতৃভক্তি ও মাতৃনিষ্ঠার পরিচয় পাওয়া যায়। বালকের চারি-পাঁচ বৎসর বয়ঃক্রমকালে পিতৃদেব একবার দীর্ঘ পাঁচ বৎসর শয্যাগত অসুস্থ ছিলেন। অর্থাভাবে তখন সংসারের বড়ই শোচনীয় দশা ঘটিয়াছিল। এই অবস্থায় মনোমোহিনী দেবী যে কত কষ্টে পরিবারের বিপুল ব্যয়ভার নির্বাহ করিতেন, তাহা বলিবার নয়। শিশুসন্তান অনুকূলচন্দ্র ভিন্ন সেই দুর্দিনে তাঁহাকে সাহায্য করিবার আর কেহ ছিল না রুগ্ন পিতার জন্য ঔষধ আনিতে এই ক্ষুদ্র বালককেই প্রতিদিন দীর্ঘ তিন মাইল নির্জন পথ পায় হাঁটিয়া পাবনা সহরে যাইতে হইত। একদিন পথিমধ্যে খেয়া-নৌকায় ইছামতী নদী পার হইবার সময় তাঁহার ছাতাটি হারাইয়া যায়। এজন্য জননীদেবী দুঃখ প্রকাশ করিলে, বালক বলিয়াছিলেন,—"মা, তুই মোটেই ভাবিস্‌নে, আমার ছাতা লাগবে না, ছাতা ছাড়াই আমি যেতে পারবো।"

পরিবারের দুঃখ-কষ্ট শিশুপুত্রের নিকট গোপন রাখিতে জননীদেবী সর্বদাই যথেষ্ট সচেষ্ট থাকিতেন, কিন্তু মাতৃভক্ত বুদ্ধিমান বালক সহজেই তাহা বুঝিয়া লইতেন এবং মাকে সান্ত্বনা দান ও সাহায্য করিতে নানাভাবে চেষ্টা করিতেন। মা যখন মুড়ি ভাজিতেন, বালক কাছে বসিয়া তাঁহাকে ভরসা ও উৎসাহ দিবার অভিপ্রায়ে বলিতেন,—"মা, ভয় করিসনে, তুই খুব মুড়ি ভাজবি আর আমি বেচবো, দেখিস্‌ তখন তোর কত টাকা হবে।" বালক সারাদিন কর্মব্যস্ত মাতৃদেবীর সঙ্গে সঙ্গে থাকিতেন। যখন যে-কাজে তাঁহার সাহায্যের প্রয়োজন হইত, ক্ষুদ্র বালক নিজ বুদ্ধিবলে সহজেই তাহা বুঝিয়া লইয়া পূরণ করিতে প্রবৃত্ত



শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র (বাল্যে)

হইতেন। ছোট-ছোট ভাইবোনেরা কান্নাকাটি বা গোলমাল করিয়া পাছে মাতৃদেবীকে আহ্নিকের সময় বিরক্ত করে, সেজন্য তিনি নানা কৌশলে তাহাদিগকে সামলাইয়া রাখিতেন। এইভাবে গৃহস্থালীর নানা কাজে যথাশক্তি সহায়তা করিয়া জননীদেবীকে খুশী করার জন্য তিনি সর্বক্ষণ উন্মুখ থাকিতেন।

এই সহজ মাতৃনিষ্ঠার পরিচয় বালকের দৈনন্দিন জীবনের খুঁটিনাটি বহু ঘটনায়ই পরিস্ফুট হইত। একদিনের কথা।—জননীদেবী কোন কারণে বালকের উপর অসন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে শাস্তি দিবার মানসে একখানা বাঁশের কঞ্চি লইয়া তাঁহাকে ধাওয়া করেন। তখন মধ্যাহ্নকাল। প্রাণপণ দৌড়াইয়াও জননীদেবী ক্ষিপ্র বালককে কিছুতেই ধরিতে পারিতেছেন না। এমন সময় বালক হঠাৎ পিছন ফিরিয়া মায়ের দিকে তাকাইয়া দেখিতে পাইলেন, খররৌদ্রতাপে ছুটিতে ছুটিতে মা হাঁপাইয়া পড়িয়াছেন, তাঁহার সর্বাঙ্গ বহিয়া অবিরল ধারায় ঘর্ম ঝরিতেছে মায়ের এই নিদারুণ ক্লেশ তাঁহার অসহ্য বোধ হইল, তিনি আর পলাইতে চেষ্টা করিলেন না, তন্মুহূর্তে সবেগে দৌড়াইয়া মায়ের কাছে গিয়া তাঁহাকে বাহুপাশে জড়াইয়া ধরিলেন।

কথাপ্রসঙ্গে জননীদেবীকে প্রায়শই বলিতে শুনিয়াছি,—"অনুকূল বাল্যবয়সে বড়ই দুরন্ত ছিল। তার সে দুরন্তপনার কথা ব'লে শেষ করা যায় না। পাড়া-পড়শী সকলে তার দৌরাত্ম্যে অস্থির থাকতো, আর তাদের নিয়ত নালিশ আমাকে অতিষ্ঠ ক'রে তুলতো। তবে তার সরলতায় সবাই খুব মুগ্ধ ছিল। তার সম্বন্ধে একটা জিনিষ সব সময়ই লক্ষ্য করেছি, সে কখনও আমার কোন আদেশ অমান্য করত না, আর আমার শাসন যত কঠোরই হোক, অম্লানবদনে সহ্য করত ; আরও দেখতাম, আমার জন্য তার ছিল বড় দরদ।"

মাতৃদেবীর প্রতি বালক অনুকূলচন্দ্রের কিরূপ গভীর শ্রদ্ধা ছিল, তাহার একটি মধুর পরিচয় পাওয়া যায় অনুকূলচন্দ্রেরই কথিত পরবর্তীকালের একটি বিবরণে। বাল্যস্মৃতি আলোচনাকালে একদিন তিনি আবেগভরে বলিতেছিলেন,—"বেলা দুপুর গড়িয়ে গেল, তখনো রান্নাবাড়ার কোন আয়োজন নেই, আমরা তো ক্ষুধায় কাতর। মা তখন আমাদের নিয়ে গল্প করতে সুরু ক'রে দিলেন। মায়ের মুখে গল্প শুনতে শুনতে কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছি মনেও নেই। যখন ঘুম ভাঙ্গলো, তখন দেখি মা কোথা থেকে ক্ষুদ যোগাড় ক'রে তাই ফ্যানশুদ্ধ থালা ক'রে খেতে দিয়েছেন। কি মিষ্টি যে লাগতো, তা আর কি বলব! মায়ের যেন সবই মিষ্টি। মা যখন নাম করতে বসতেন, আমার বড় ভাল লাগত। আবার যখন সারাদিন পরিশ্রম ক'রে প্রার্থনায় বসতেন, তখন মায়ের পায়ের উপর পড়ে' বার বার প্রণাম করতে ইচ্ছা হোত।"

এইবার আমরা অনুকূলচন্দ্রের ছেলেবেলার কথাপ্রসঙ্গে তাঁহার অন্যতম বাল্যসঙ্গী অবসরপ্রাপ্ত ম্যাজিষ্ট্রেট কৃষ্ণকমল দত্ত (অনুকূলচন্দ্র তাঁহাকে বাল্যকালে

আদর করিয়া 'ভাসুনা' বলিয়া ডাকিতেন) মহাশয় যে বিবৃতি দিয়াছেন, নিম্নে উদ্ধৃত করতঃ বর্ত্তমান অধ্যায়টি সমাপ্ত করিব।

"আমি অনুকূলের বাল্যসঙ্গী ও খেলার সাথী ছিলাম। এক গ্রামেই আমাদের বাস ছিল। অনুকূলদের বাড়ীর দু'খানা বাড়ী পরেই ছিল আমাদের পৈতৃকবাটী।

"বাল্যকাল থেকেই অনুকূলের ছিল অতীব নম্র স্বভাব। তাহার চরিত্রের simplicity ছিল অতুলনীয়। আমরা অল্প বয়সে একসঙ্গে গ্রাম্য গলির মধ্যে খেলা করিয়াছি, মার-ধর করিয়াছি, দৌড়াইয়াছি, গাবগাছে উঠিয়া গাব পাড়িয়া খাইয়াছি। আমরা সঙ্গীসাথীরা কেহ কোনদিন অনুকূলকে রাগ করিতে দেখি নাই। তাহার সুঠাম সুন্দর চেহারা ও হাসিমাখা মুখখানি আমাদের খুবই আনন্দ দিত। তাহার আপনভোলা ব্যবহার ও কথাবার্তা আমাদের বড়ই ভাল লাগিত।

"অনুকূলের 'Quick grasping of things'—শক্তিটা ছিল খুবই wonderful, আর তার মাতৃভক্তি! ইহাও আমার মনে খুব দৃঢ়ভাবে অঙ্কিত হইয়া রহিয়াছে। অনুকূলদের বাড়ীর সম্মুখেই ছিল একটা বড় ভাটিবন। এই স্থানেই পরে প্রসিদ্ধ সৎসঙ্গ-প্রতিষ্ঠানের পত্তন হইয়াছিল। ভাটিবনের মধ্য দিয়া পাড়ার মায়েদের ও মেয়েদের পদ্মায় স্নান করিতে যাইতে হইত। দুইধারে ছিল বন আর মাঝখানে ছিল সরু রাস্তা। একদিন দেখি, পিসীমা (অনুকূলের মাতৃদেবী) কলসী-কাঁখে পদ্মায় স্নান করিতে যাইতেছেন, পিছনে অনুকূল, আমিও কিছুদূরে। আমি দেখিলাম, পাছে মায়ের কষ্ট হয়, এজন্য অনুকূল তাড়াতাড়ি মায়ের কাছে গিয়া, তাঁহার নিকট হইতে কলসীটি লইয়া নিজেই ঘাড়ে করিয়া জল আনিতে চলিল মায়ের পিছনে পিছনে। সে দৃশ্য এখনও আমার বেশ মনে আছে।"

সপ্তম অধ্যায়

ছাত্রজীবন

বঙ্গাব্দ ১৩০০ সালে পণ্ডিত সূর্যকুমার শাস্ত্রী ও ভগবানচন্দ্র শিরোমণি যথাশাস্ত্র অনুকুলচন্দ্রের হাতেখড়ি দেন। বালকের বয়ঃক্রম তখন পাঁচ বৎসর। এই সময় বাড়ীর সন্নিকটেই কাশীপুর-হাটে কৃষ্ণচন্দ্র বৈরাগী নামক জনৈক গুরুমহাশয়ের পাঠশালায় তাঁহার বিদ্যারম্ভ হয়। এই বিদ্যালয়ে দুই বৎসর অধ্যয়নের পর তিনি কাশীপুর গ্রামের ব্রজনাথ কর্মকার ও ভবানীচরণ পাল, দুই প্রবীণ শিক্ষক মহাশয়ের নিকট কিছুকাল বিদ্যাভ্যাস করেন। অতঃপর অনুকুলচন্দ্রকে ১৩০৫ সালে পাবনা সহরে অধ্যক্ষ গোপাল লাহিড়ী মহাশয়ের 'পাবনা ইন্‌ষ্টিটিউসন' নামক উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে ভর্তি করিয়া দেওয়া হয়। কাশীপুর, প্রতাপপুর, নাজিরপুর প্রভৃতি হিমাইতপুরের পার্শ্ববর্তী গ্রামের ছাত্রদের সহিত অনুকুলচন্দ্রও তখন প্রত্যহ পদব্রজে বাড়ী হইতে পাবনা যাতায়াত করিয়া পড়াশোনা করিতেন। এই সময় ১৩০৬ বঙ্গাব্দে এগার বৎসর বয়সে যথাশাস্ত্র তাঁহার শুভ উপনয়ন-সংস্কার নিষ্পন্ন হয়।

পিতামাতার প্রথম সন্তান এবং দিদিমার অতিশয় আদরের দুলাল ছিলেন বলিয়া অল্প বয়সেই অনুকুলচন্দ্রকে বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হইতে হইয়াছিল। 'পাবনা ইন্‌ষ্টিটিউসনে' তৃতীয় শ্রেণীতে (অষ্টম মানে) অধ্যয়নকালে বঙ্গাব্দ ১৩১৩ সালের ২৮শে শ্রাবণ আঠার বৎসর বয়সে পাবনা জিলার সিরাজগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত ধোপাদহ-গ্রাম-নিবাসী রামগোপাল ভট্টাচার্য মহাশয়ের প্রথমা কন্যা দ্বাদশ-বর্ষীয়া সরসীবালা দেবীর সহিত তাঁহার শুভপরিণয়-কার্য নিষ্পন্ন হয়। এই উপলক্ষে কৃষ্ণসুন্দরী দেবী নিম্নোদ্ধৃত-রূপ নিমন্ত্রণ পত্রদ্বারা আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধবগণকে শুভানুষ্ঠানে যোগদানের জন্য আমন্ত্রণ জানাইয়াছিলেন।—

ওঁ নমঃ প্রজাপতয়ে

বর্তমান মাসের ২৮শে তারিখ সোমবার আমার দৌহিত্র শ্রীমান অনুকুলচন্দ্র চক্রবর্তীর শুভ বিবাহ ধোপাদহ-নিবাসী শ্রীযুক্ত রামগোপাল ভট্টাচার্য মহাশয়ের কন্যা শ্রীমতী সরসীবালা দেবীর সহিত হিমাইতপুর মোকামে হইবে। পত্রদ্বারা নিমন্ত্রণ করিলাম। মহাশয় সবান্ধবে আমার হিমাইতপুর বাসস্থলীতে আগমন করতঃ শুভকার্য সৌষ্ঠবাদি করিয়া বাধিত করিবেন। নিবেদন ইতি—

হিমাইতপুর
২০শে শ্রাবণ, ১৩১৩

শ্রীকৃষ্ণসুন্দরী দেব্যা

অনুকূলচন্দ্র ছিলেন গ্রামবাসী সবারই নিতান্ত আপন জন, অতি আদরের পাত্র। সে কারণ, তাঁহার বিবাহ-সম্বন্ধটি সকলের বিশেষ অনুমোদনক্রমে স্থির করা হইয়াছিল। নানা স্থানের আত্মীয়-স্বজন, পল্লীর আবালবৃদ্ধবনিতা, অনুকূলচন্দ্রের বাল্যবন্ধু ও সহপাঠিগণের সানন্দ যোগদানে সপ্তাহকাল ব্যাপিয়া বিবাহ-ব্যাপারের বিপুল আনন্দোৎসব চলিয়াছিল। এই উপলক্ষে গীতবাদ্যাদি, নানা আমোদ-প্রমোদ ও ভূরিভোজনে অভ্যাগতগণকে আপ্যায়িত করা হইয়াছিল। একদা বালক অনুকূলচন্দ্রের রোগমুক্তি-কামনায় তাঁহার দেহের সমান ওজনের বাতাসা দিয়া কৃষ্ণসুন্দরী দেবী এক 'হরিলুঠ' দেওয়ার মানত করিয়াছিলেন। এই বিশেষ 'হরিলুঠ'-অনুষ্ঠানটিও উক্ত বিবাহোৎসবের সঙ্গেই নিষ্পন্ন করা হইয়াছিল।

বিবাহের পর কিছুকাল 'পাবনা জিলা স্কুলে' অধ্যয়ন করিয়া অনুকূলচন্দ্র পিতৃদেবের সহিত তাঁহার চাকুরীস্থল ঢাকা জিলার অন্তর্গত আমিরাবাদে গমন করেন। তথায় তাঁহাকে নিকটবর্তী 'রাইপুরা হাইস্কুলে' ভর্তি করিয়া দেওয়া হয়। আমিরাবাদে শিবচন্দ্র আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্যে বেশ সুখেই ছিলেন। কিন্তু তথায় অবস্থানকালে তাঁহার দুইটি শিশুসন্তানের অকালমৃত্যু ঘটায় এবং মধ্যম পুত্র প্রভাসচন্দ্র গুরুতর অসুস্থ হইয়া পড়ায়, তিনি আমিরাবাদের চাকুরী ছাড়িয়া দিয়া সপরিবারে হিমাইতপুরস্থ নিজ বাড়ীতে বাস করিতে থাকেন। এই অবস্থায় অনুকূলচন্দ্র বঙ্গাব্দ ১৩১৫ সালে নৈহাটি সহরে তাঁহার মাসতুতো ভগ্নীপতি শশিভূষণ চক্রবর্তী মহাশয়ের বাড়ীতে থাকিয়া স্থানীয় উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন আরম্ভ করেন। এই স্কুল হইতে তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষার জন্য নির্বাচিত হইয়াছিলেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত উক্ত পরীক্ষায় উপস্থিত হওয়া তাঁহার ভাগ্যে ঘটিল না।* এই পরীক্ষার জন্য তিনি আর প্রস্তুত হন নাই।

এইবার অনুকূলচন্দ্র অভিভাবকগণের নির্দেশে অর্থকরী বিদ্যা অর্জনের জন্য কলিকাতায় গমন করেন। সেখানে বঙ্গাব্দ ১৩১৭-১৮ সালে তিনি বৌবাজার স্ট্রীটে বাবু শরৎচন্দ্র মল্লিকের স্থাপিত 'ন্যাশন্যাল মেডিক্যাল স্কুলে'** ভর্তি হন। প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছিলেন না বলিয়া কর্তৃপক্ষ প্রথমতঃ তাঁহাকে ভর্তি করিতে আপত্তি তুলিয়াছিলেন। অবশেষে অনুকূলচন্দ্রের আবেদনক্রমে স্কুলের অধ্যক্ষ মহোদয় তাঁহার যোগ্যতার পরীক্ষা লইয়া তাঁহাকে যথারীতি বিদ্যালয়ে ভর্তি করিয়া লন।

অসংখ্য বাধাবিপত্তি ও কঠোর দারিদ্র্যের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া অনুকূলচন্দ্রকে ডাক্তারী স্কুলের পড়াশোনা চালাইতে হইত। পরমুখাপেক্ষিতার উপর ছিল তাঁহার

---

* অনুকূলচন্দ্রের প্রবেশিকা পরীক্ষা না দেওয়ার কারণ সম্পর্কে এই অধ্যায়ে পরে আলোচনা করা হইয়াছে।

**'ন্যাশন্যাল মেডিক্যাল স্কুল'টি ১৩১৭-১৮ বঙ্গাব্দে স্থাপিত হয়। অনুকূলচন্দ্র এই স্কুলের সর্বপ্রথম ছাত্রদের অন্যতম ছিলেন।

অগাধ বিশ্বাস। ধৈর্য ও সহ্যের সঙ্গে তিনি সকল বিপদের সম্মুখীন হইতেন। এই স্কুলে ভর্তি হওয়ার পর তিনি প্রথমতঃ কিছুকাল সহপাঠী বন্ধুদের সাধারণ আবাসে অতিথিরূপে অবস্থান করেন। সকলেই নিরতিশয় আদর-যত্নের সঙ্গে তাঁহাকে রাখিতে চাহিতেন, কিন্তু তিনি কাহারও কাছে একবেলার বেশী থাকিতে সম্মত হইতেন না। অবশেষে তিনি গ্রে স্ট্রীটের এক কয়লার গুদামে কোনমতে নিজের জন্য একটু আস্তানা করিয়া লইলেন। তাঁহাকে স্থানাভাবে অনেক সময় রাস্তার 'ফুটপাথ'-এর উপর শয়ন করিয়া রাত্রি যাপন করিতে হইত। শিয়ালদহ রেলষ্টেশনের শানবাঁধানো প্রাঙ্গণের উপরেও তিনি রাত্রি কাটাইয়াছেন। বিছানাপত্রের অভাবে 'হিতবাদী' সংবাদপত্রের একখানি নিচে প্যাতিয়া ও অন্য একখণ্ড গায় জড়াইয়া তিনি বহু দুঃসহ শীতের রাত্রি অতিবাহিত করিয়াছেন। রাত্রিতে অনেক দিনই আলোটুকু জ্বালিবার ব্যবস্থাও তিনি করিয়া উঠিতে পারিতেন না। তাঁহাকে তখন রাস্তার আলোর সাহায্যে পাঠাভ্যাস করিতে হইত।

সারাদিন অর্ধাহারে বা একরূপ অনাহারে থাকিয়া ক্লান্ত দেহে লেখাপড়া সারিয়া অনুকূলচন্দ্র যখন শীতের রাত্রে শয়ন করিতে যাইতেন, তাঁহার সর্ব শরীর কাঁপিতে থাকিত। এই অবস্থায় তিনি নাম-জপে বিভোর থাকিয়া বিনিদ্র রজনী যাপন করিতেন। প্রয়োজনীয় বস্ত্রাদির একান্ত অভাব-হেতু, তিনি প্রত্যহ শয়নকালে তাঁহার একমাত্র জামাটি পরদিবসের জন্য সযত্নে তুলিয়া রাখিতেন। অন্ধকারময় কয়লার গুদামে বাস করিবার কালে তাঁহার পরিধেয় বস্ত্রাদি এমন বিশ্রী ময়লা হইয়া যাইত যে, অঙ্গুলি-স্পর্শে তাহা হইতে অজস্র ধূলিকণা নির্গত হইত। একটু সাবান কিনিয়া যে ময়লা কাপড়-চোপড়গুলি একটু পরিষ্কার করিয়া লইবেন, সে সঙ্গতিও তাঁহার ছিল না। তৈলাভাবে তাঁহার মাথার চুলগুলি সর্বক্ষণ রুক্ষশুষ্ক থাকিত, পাদুকা না থাকায়* খালি পায়েই তাঁহাকে পথ চলিতে হইত। এইরূপ অপরিচ্ছন্নভাবে স্কুলে যাতায়াত করিতেন বলিয়া জনৈক শিক্ষক মহাশয় অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে একদিন ক্লাস হইতে বাহির করিয়া দিয়াছিলেন। তাঁহার ঈদৃশ দুরবস্থা দর্শনে সহপাঠীরা অনেক সময় তাঁহাকে বলিত,—"আচ্ছা অনুকূল, তুই এমন filthy থাকিস্ কেন রে?" বন্ধুদের কথা শুনিয়া অনুকূলচন্দ্র মনে মনে হাসিতেন।

---

*সামান্য মূল্যের একজোড়া জুতো কিনিবার ক্ষমতাও যে তখন অনুকূলচন্দ্রের ছিল না, তাহারই আভাস পাওয়া যায়, পরবর্তীকালের তাঁহারই কথিত একদিনের অভিজ্ঞতার কয়েকটি কথায়। তিনি বলিয়াছিলেন,—"দোকানে জুতো কিনতে গেলাম। আমার কাছে যে সামান্য পয়সা ছিল, তাই দোকানদারের হাতে দিয়ে বললাম—'ভাই, এক জোড়া চটি জুতো দাও'। দোকানদার আমাকে জুতো দেখালো। সস্তা কাঁচা চামড়ার তৈরী সে জুতোর কি দুর্গন্ধ! আমি বললাম,—'এ জুতো নেব না'। তখন দোকানদার জুতো তো দিলই না, পয়সাও ফেরত দিল না, বরং ঠাট্টা করে' আরও বলল,—'ঐ ক'আনা পয়সায় কি আর বাবু জুতো কেনা যায়'।"

মেডিক্যাল স্কুলে অধ্যয়নকালে অনুকূলচন্দ্রকে প্রত্যহ সুদীর্ঘ পথ পথব্রজে যাতায়াত করিতে হইত। গ্রে-স্ট্রীটের বাসা হইতে তিনি বৌবাজারে গিয়া ক্লাস করিতেন, 'ডিসেক্‌সন্' করিবার জন্য তাঁহাকে যাইতে হইত মানিকতলার মুরারিপুকুরে। আবার রাত্রিতে স্কুল-সংলগ্ন হাসপাতালে যাইয়া রোগীদের সেবাশুশ্রূষার কার্য সমাপ্ত করিয়া ক্লান্ত দেহে অধিক রাত্রে তিনি বাড়ী ফিরিতেন। এইভাবে তাঁহাকে দৈনিক অন্ততঃ দশ-বার মাইল পথ হাঁটিতে হইত। ট্রামে চড়িবার পয়সা তাঁহার জুটিত না। ট্রামগুলি যখন লোকজন লইয়া রাস্তা দিয়া চলিত, তিনি সতৃষ্ণ নয়নে যাত্রীদের দিকে চাহিয়া থাকিতেন, আর ভাবিতেন,—এঁরা কি ভাগ্যবান!

শিবচন্দ্রের আর্থিক অবস্থা তখন স্বচ্ছল ছিল না। তাঁহার দূর-সম্পর্কীয় কলিকাতা নিবাসী জনৈক আত্মীয় এককালে তাঁহার নিকট হইতে কিছু টাকা ধার নিয়াছিলেন। উক্ত টাকা পরিশোধের জন্য ভদ্রলোকটি তাঁহার সহিত এইরূপ বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন যে, তিনি অনুকূলচন্দ্রকে প্রতিমাসে দশ টাকা করিয়া দিবেন। এই সামান্য অর্থ দ্বারাই অনুকূলচন্দ্রকে তাঁহার লেখাপড়ার সকল ব্যয় নির্বাহ করিতে হইত। সুতরাং আহারাদির যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করা তাঁহার পক্ষে মোটেই সম্ভবপর ছিল না। এক হোটেলে তিনি মাসিক মাত্র চারি টাকা হারে কোনরকমে তাঁহার খোরাকীর ব্যবস্থা করিয়া লইয়াছিলেন। ঐ হোটেলে যে জায়গাটায় তাঁহাকে আহার করিতে দেওয়া হইত, সেখানে ছিল এক পাল ছাগলের আড্ডা। ইহাদের গায়ের লোম ও মলমূত্র এবং লোকজনের কফ ইত্যাদি সেস্থানে প্রচুর পরিমাণে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত থাকিত। একদিন অনুকূলচন্দ্র আহারে বসিয়াছেন, থালা সরাইবার সময় তাঁহার হাতে খানিকটা সিক্‌নি লাগিয়া যায়। কি করেন, উত্তমরূপে থালার কাঁধাটা পরিষ্কার করিয়া লইয়া ও হাতমুখ ধুইয়া নিতান্ত অনিচ্ছার সহিত তিনি সেদিন কোনমতে কয়েক গ্রাস অন্ন গলাধঃকরণ করিলেন। হোটেলের অল্পহারের খরিদ্দার ছিলেন বলিয়া তাঁহাকে অত্যন্ত নিকৃষ্ট শ্রেণীর খাদ্য পরিবেশন করা হইত। কোনদিন কাঁচকলার সামান্য একটু ঝোল, কোনদিন বা অল্প একটু পাতলা ডাল তাঁহার ভাগ্যে জুটিত। তাঁহার জন্য খাদ্য-দ্রব্যাদি অনেক সময়ই অপরিচ্ছন্ন স্থানে অনাবৃত অবস্থায় ফেলিয়া রাখা হইত। এইরূপ অপবিত্র পরিবেশে কদর্য নিকৃষ্ট আহার্য গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে দিনের পর দিন মাসের পর মাস কাটাইতে হইত।

পূর্বোক্ত ভদ্রলোকটির প্রদত্ত যে সামান্য দশটি টাকার সাহায্যে অনুকূলচন্দ্র কোনমতে দুঃখে-কষ্টে চলিতেছিলেন, দুর্ভাগ্যবশতঃ কিছুদিনের মধ্যে তাহাও বন্ধ হইয়া গেল, ভদ্রলোকটি আর টাকা পাঠাইলেন না। এই অবস্থায় তিনি চরম দুর্দশার সম্মুখীন হইয়া পড়িলেন, তাঁহার অন্ন-সংগ্রহেরই আর কোন উপায় রহিল না। এই সময় প্রায়শ উপবাসে তাঁহার দিন কাটিতে লাগিল। একদিন এমন হইল, তাঁহার হাতে মাত্র ছয় আনার পয়সা আছে। তিনি মনে মনে স্থির করিলেন, এই পয়সা দিয়া এক বেলা মুড়ি নারিকেল খাইয়া এবং আর এক

বেলা কলের জল পান করিয়া তিনি কোনরকমে কয়েকদিন চালাইয়া দিবেন। কিন্তু দৈবের কি বিধান, ঠিক সেই সময় অনুকূলচন্দ্রের এক বন্ধু বিশেষ বিপন্ন হইয়া কিঞ্চিৎ সাহায্য প্রাপ্তির আশায় তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন। তিনি কাতরভাবে অনুকূলচন্দ্রকে জানাইলেন যে, সেই মুহূর্তেই তাঁহাকে অন্ততঃ আট আনার পয়সা না দিলে, তাঁহার কষ্টের সীমা থাকিবে না। এই কথা শ্রবণমাত্র বন্ধুবৎসল অনুকূলচন্দ্র নিজহস্তস্থিত ছয় আনার পয়সা সবই বন্ধুবরকে সানন্দে দান করিলেন। এখন কপর্দকশূন্য হইয়া তিনি রাস্তার কলের জলে উদর-পূর্তি করতঃ ক্ষুৎ-পিপাসা নিবৃত্তির চেষ্টা করিলেন। বলা-বাহুল্য, ঈদৃশ বিপন্ন অবস্থায়ও তিনি পূর্ববৎ সুদীর্ঘ পথ হাঁটিয়া নিত্য নিয়মিত স্কুলে যাইয়া যথারীতি অধ্যয়নকার্য চালাইতেন। এইভাবে অতিকষ্টে তিন দিবস অতিবাহিত হইল। দীর্ঘ সময় অনাহারে থাকিবার দরুণ উদরে বায়ু সঞ্চিত হওয়ায়, অনুকূলচন্দ্র পেটে অসহ্য যন্ত্রণা বোধ করিতে লাগিলেন এবং সময় সময় অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন। রোগ-মুক্তির জন্য চিকিৎসকের শরণাপন্ন হইলে, তিনি যে ঔষধের ব্যবস্থা করিলেন, অর্থাভাব বশতঃ তাহা সংগ্রহ করা সম্ভবপর হইল না। অবশেষে চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীর জনৈক ছাত্রবন্ধু এক পয়সার 'সোডি-বাই-কার্ব' কিনিয়া আনিয়া তাহারই দুই তিন মাত্রা তাঁহাকে খাইতে দিলেন। সৌভাগ্যের বিষয়, উহাতে মন্ত্রশক্তির মত কার্য করিল, তিনি অনেকটা সুস্থ হইলেন।

এই মহাসঙ্কটাবস্থায় অনন্যোপায় হইয়া অনুকূলচন্দ্র একদিন বিনা-টিকিটে ট্রেণযোগে নৈহাটী সহরে তাঁহার ভগ্নী-পতির গৃহাভিমুখে যাত্রা করিলেন। তাঁহার সেদিনের অভিজ্ঞতার কথা গল্প করিতে গিয়া একদিন কথাপ্রসঙ্গে বলিতেছিলেন,—"গাড়ীতে চেকার উঠ্‌ল। আমার পাশের লোকটির টিকিট দেখ্‌ল, আমাকে বাদ দিয়ে আমার পরের লোকটিরও টিকিট দেখ্‌ল, তারপর নেমে পড়ল। পরমপিতা এইভাবে আমাকে সে যাত্রা রক্ষা করলেন।.................।"

এইরূপে নিদারুণ বিপন্ন দশায় পতিত হইয়াও অনুকূলচন্দ্র পিতামাতাকে আপন দুর্দৈবের বিষয়ে কিছুই সংবাদ দেন নাই। কলিকাতা সহরে তাঁহার আত্মীয়স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবের অভাব ছিল না। ইচ্ছা করিলে ইঁহাদের প্রত্যেকের বাড়ীতে দুই-একদিন করিয়া অবস্থান করিলেও বেশ কিছুকাল তিনি নির্ভাবনায় কাটাইয়া দিতে পারিতেন, কিন্তু আভিজাত্যের পূজারী স্বাবলম্বন-প্রয়াসী অনুকূলচন্দ্র তাহা পছন্দ করিলেন না। পারিপার্শ্বিকের অনুসন্ধিৎসু সেবায় আপনার অভাব আপনিই পূরণ করিয়া লইবেন, এই দৃঢ় সংকল্প তিনি তখন হইতে অন্তরে পোষণ করিতে লাগিলেন।

কলিকাতায় অবস্থানকালে দীর্ঘকাল ধরিয়া বাসস্থান ও আহারাদির নানারূপ অনিয়ম ও নিদারুণ দুঃখ-কষ্ট সহ্য করিবার ফলে অনুকূলচন্দ্রের নিটোল স্বাস্থ্যটি দিন-দিনই ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল। স্কুল-ছুটির অবকাশে বাড়ীতে গিয়া মাতাপিতার আদর-যত্ন, ভাইবোনের প্রীতি-সোহাগ, একটু ভাল খাওয়া-দাওয়া,

বিশ্রাম ও মনের আনন্দ পাইবেন, সে উপায়ও তাঁহার ছিল না। অনুকূলচন্দ্র ছুটি উপলক্ষে বাড়ী গেলেই, পাড়ার মুরুব্বী-স্থানীয় ব্যক্তিগণ আসিয়া তাঁহার জননীদেবীকে বলিতেন যে, তিনি নববধূর টানে বাড়ী চলিয়া আসেন, ইহা তাঁহার পড়াশুনোর পক্ষে যথেষ্ট ক্ষতির কারণ। ইঁহাদের কথা শুনিয়া জননীদেবী ও কর্তামা সন্তানের মঙ্গলকামনায় তাঁহার অধিক দিন বাড়ীতে থাকা মোটেই পছন্দ করিতেন না; ছুটির দিন-কয়েক অতীত হইতে না হইতেই অনুকূলচন্দ্রকে কলিকাতায় পাঠাইয়া দিবার জন্য তাঁহারা অস্থির হইয়া পড়িতেন। এই অবস্থায় অনুকূলচন্দ্রকে বাধ্য হইয়া অবসন্ন দেহমন লইয়াই সত্বর কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিতে হইত।

ডাক্তারী স্কুলে অধ্যয়নকালে এইরূপ আরও কতভাবে কত অসুবিধাই যে অনুকূলচন্দ্রকে ভোগ করিতে হইয়াছে, তাহা বলিবার নয়। বলবতী জ্ঞান-পিপাসা থাকা সত্ত্বেও সাধ মিটাইয়া পড়াশুনা করিবার সুযোগ তিনি কোনদিনই পান নাই। অর্থাভাবে প্রয়োজনীয় পুস্তকাদি খরিদ করিতে না পারায়, নিয়মিতরূপে পাঠকার্য চালাইতে তাঁহাকে যথেষ্ট বেগ পাইতে হইত। ডাক্তারী-গ্রন্থাদির দুর্মূল্যতা সম্বন্ধে সেকালের গ্রাম্য অভিভাবকগণের মোটেই কোন অভিজ্ঞতা ছিল না। অনুকূলচন্দ্র পুস্তক খরিদের জন্য মাতৃদেবীর নিকট কখনও অর্থের প্রয়োজন জানাইলে, পল্লীর প্রবীণ প্রতিবেশিগণ টাকার অঙ্ক শুনিয়া আঁৎকাইয়া উঠিতেন। তাঁহারা এ-সম্বন্ধে জননীদেবীর কাছে কথাপ্রসঙ্গে মন্তব্য করিতেন—, "যেখানে বাজারে দেড়-টাকা দুই-টাকা মূল্যে এক-এক খানা প্রকাণ্ড রামায়ণ মহাভারত কিনিতে পাওয়া যায়, সেখানে কোন পুস্তকেরই মূল্য এত অধিক হইতে পারে না।" তাঁহারা আরও বলিতেন,—"কলিকাতা সহর বড়ই প্রলোভনের স্থান সেখানে কোন যুবক ছেলের নিকট কখনও এত বেশী টাকা পাঠানো উচিত নয়, তাহাতে ছেলের অনিষ্ট হওয়ার যথেষ্ট আশঙ্কা আছে। হিতৈষিগণের এইসব সৎপরামর্শের ফলে মাতৃদেবীর নিকট হইতে গ্রন্থক্রয়ের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থপ্রাপ্তি অনুকূলচন্দ্রের ভাগ্যে আর ঘটিয়া উঠিত না।

ডাক্তারী স্কুলে তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে অধ্যয়নকালে অনুকূলচন্দ্র এক সময় গ্রে-স্ট্রীটের কয়লার গুদামের বাসস্থান তুলিয়া দিয়া স্কুলের সন্নিকটে ১৫০বি, আমহার্স্ট স্ট্রীটে এক মেসে আসিয়া ভর্তি হইলেন। অর্থাভাবে সেখানেও রীতিমত 'সীটরেন্ট' ও 'মেস্-চার্জ' পরিশোধ করা তাঁহার পক্ষে সম্ভব হইত না। সেজন্য অনেক সময় তাঁহাকে ম্যানেজারের তীব্র ভর্ৎসনা সহ্য করিতে হইত। একবার তাঁহার এক মাসের 'সীট-রেন্ট' বাকী পড়ে। পুজো উপলক্ষে তখন স্কুলও ছুটি হইয়া যায়। বাড়ী হইতে ফিরিয়া আসিয়া সমুদয় দেনা শোধ করিবেন, এরূপ ম্যানেজারকে বলিয়া, অনুকূলচন্দ্র গৃহে গমন করিলেন। ছুটির পর মেসে উপস্থিত হইয়া তিনি দেখিতে পাইলেন, তাঁহার ব্যবহারের তক্তপোষখানা ঘর হইতে বারান্দায় সরাইয়া রাখা হইয়াছে, বিছানাপত্র কোথায় উধাও হইয়া



শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র (ছাত্রজীবনে)

গিয়াছে, বই-খাতাপত্র সমেত ট্রাঙ্কটারও কোন সন্ধান নাই। ম্যানেজারকে এ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি উত্তরে বলিলেন,—"টাকা না দিয়ে গেলে এইরূপ হয়।" অনুকূলচন্দ্রের তখন এরূপে সঙ্গতি ছিল না যে জিনিষগুলি আবার খরিদ করিয়া অভাব পূরণ করিয়া লইবেন। কাজেই এই অবস্থায় তাঁহার দুর্গতি ভোগের অন্ত রহিল না।*

উক্ত নানা প্রকার দুরূপনের অসুবিধা সত্ত্বেও বিপুল আত্মবিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়া অনুকূলচন্দ্র অসীম ধৈর্য ও অটুট অধ্যবসায়ের শক্তিতে আপন কর্তব্য যথাযথ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করিবার জন্য অবিরাম চেষ্টা করিয়া যাইতেন, ফলে পাঠ্য বিষয় সমূহে তিনি যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। শেষ পরীক্ষার প্রতিটি উত্তর-পত্রে অধ্যাপকগণও তাহার প্রকৃষ্ট পরিচয় পাইয়া অতীব মুগ্ধ হইয়াছিলেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ ধাত্রীবিদ্যার মৌখিক পরীক্ষাকালে কোন বিশেষ ঘটনায় (যদিও ইহাতে তাঁহার নিজের কোন দোষ ছিল না) ভাল ফল করিবার পক্ষে ব্যাঘাত সৃষ্টি করিয়াছিল।

বলাবাহুল্য, অনুকূলচন্দ্রের ছাত্রজীবন আগাগোড়াই নানা বিশৃঙ্খলা ও বাধাবিপত্তির মধ্য দিয়া অতিবাহিত হইয়াছিল। নিয়মিত পড়াশুনো করিবার সুযোগ লাভ তাঁহার ভাগ্যে কখনও ঘটে নাই। হাইস্কুলে পড়িবার সময় বারংবার বিদ্যালয় পরিবর্তন তাঁহার অধ্যয়ন কার্যে প্রভূত বিঘ্ন সৃষ্টি করিয়াছিল। বিশেষ, তরুণ বয়সে বিদ্যাভ্যাসের সময় কোন কোন শিক্ষকের দরদশূন্য কঠোর শাসন এবং অবসাদকর তীব্র কটূক্তি তাঁহার কোমল মনের উপর যে আঘাত হানিয়াছিল, তাহাতে বিদ্যার প্রতি যথেষ্ট অনুরাগ সত্ত্বেও বিদ্যালয়ের পাঠাভ্যাসে তিনি মন বসাইতে পারিতেন না, এমন কি স্কুল যাইতেও অবশেষে তাঁহার আর ভাল লাগিত না। ছাত্রজীবনের সে-সকল করুণ কাহিনী এখনও তিনি মনোদুঃখে কতসময় কতভাবে কথাপ্রসঙ্গে ব্যক্ত করিয়া থাকেন। একদিন বলিতেছিলেন,—"………ভগবান্ আমাকে লেখাপড়া শিখতে দেননি। পড়লে যে পারতাম না তা নয়, মেরেই কাম সেরেছে।" আর একদিন বলিয়াছিলেন,—"………এখন সংস্কৃতও বলি, অঙ্কও বুঝি। এইসব tastes and possiblities তখনো ছিল, কিন্তু tackled হয়নি বলে' ফুট্তে পারেনি। অন্য একদিন বলিতেছিলেন,—"স্কুলে মাষ্টারদের কাছে মারও কম খাইনি। আমার অঙ্কের শিক্ষক যখন ক্লাসে বল্লেন,—এক আর এক দুই—তখন আমি বল্লাম,—একটার মত আর একটা তো হয় না, তবে এক আর এক দুই হবে কি ক'রে?—এই বলতেই, শিক্ষক মহাশয় বল্লেন,—'ডেঁপো

---

*প্রসঙ্গত ইহা উল্লেখযোগ্য যে, অনুকূলচন্দ্রের এরূপ আর্থিক দুরবস্থার সংবাদ পাইয়া অনন্তনাথ রায় সত্বর কলিকাতায় চলিয়া আসেন এবং শিয়ালদহের নিকট White Hall Pharmacy নামক ঔষধের দোকানে কম্পাউণ্ডারের চাকুরী গ্রহণ করেন। এই সময় তিনি অনুকূলচন্দ্রকে যথাসাধ্য অর্থ সাহায্য করিয়া অকৃত্রিম বন্ধুত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন।

ছেলে' !—আর এই বলেই কি মার !* এই যে মার খেলাম, সেই থেকে অঙ্কের প্রতি আমার যেন কেমন একটা ভয় হ'য়ে গেল। তখন থেকে অঙ্কেতে ফেল ক'রে ক'রে উপরে উঠেছি। প্রমোশন যে পেয়েছি, সে পাশ ক'রে পাইনি ; মাষ্টার মহাশয়দের খুশী ক'রে পেয়েছি। কখনও আম পেড়ে দিয়েছি, কখনও একটা জিনিষ নিয়ে দিয়েছি, এইভাবে ধ'রে-প'ড়ে কোনমতে প্রমোশন পেয়েছি। ছেলেদের পড়াশুনার ব্যাপারে মার-ধোর করলে তাদের মনে যে একটা ভীতি এসে যায়, সেটা আমার নিজের জীবনে আমি মর্মে মর্মে অনুভব করেছি।"

বাল্য হইতেই বিদ্যার্জনে নানাভাবে ব্যাঘাত ঘটায়, গ্রন্থপাঠে সাধারণতঃ লোকে যেরূপ জ্ঞানলাভের সুযোগ পায়, অনুকূলচন্দ্রের পক্ষে তাহা কদাচ সম্ভব হয় নাই। এ সম্বন্ধে তাঁহার নিজের মুখেই একদিন শুনিয়াছি যে, শ্রীপাঁচকড়ি দের লিখিত 'মায়াবিনী' ডিটেক্‌টিভ্ উপন্যাসখানি ছাড়া তিনি নাকি জীবনে আর কোন বই-ই আদ্যন্ত পাঠ করেন নাই। গ্রন্থ হইতে বিদ্যার্জনের পর্য্যাপ্ত সুযোগ না পাইলেও, মনুষ্য-সমাজ ও বাহ্য-জগৎ হইতে জ্ঞানাহরণের সাধনায় তিনি কখনও বিরত থাকিতেন না। সূক্ষ্ম আত্ম-বিশ্লেষণ ও গভীর অন্তর্দৃষ্টির বলে বাল্য হইতেই তিনি কত যে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও বোধ-বিবেচনার অধিকারী হইয়াছিলেন, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। এ সম্বন্ধে কথাপ্রসঙ্গে তিনি একদিন বলিতেছিলেন,—"আমি যা-কিছু বলি, তা কিন্তু আমার প্রত্যক্ষ বোধের উপর দাঁড়িয়ে। আমি বই-টই পড়িনি। কিন্তু নিজের জীবনে যা অনুভব করেছি, সেই দাঁড়ায় ফেলে সব কিছুর মূলে স্পন্দনটা যেন ঠাহর করতে পারি। পড়াশুনা করলে বইয়ের ভিতর দিয়েই দেখতাম, তাতে দর্শন ও অনুভূতির উপর এমন ক'রে দাঁড়াতে পারতাম না। আমার নিজের উপর দাঁড়িয়েছি বলে' complex ও clumsy বলে' কিছু নেই।"

বাল্য, কৈশোর ও যৌবনারম্ভ-কালের নানা ঘটনায় ছাত্র অনুকূলচন্দ্রের যে গুণসম্পদ ও চরিত্র-বৈশিষ্ট্যের পরিচয় পাওয়া যায় এইবার আমরা তৎসম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

ছাত্রজীবনে সচ্চরিত্র ও সুশীল বালক বলিয়া অনুকূলচন্দ্রকে সকলেই যথেষ্ট ভালবাসিতেন। বিদ্যার প্রতি তাঁহার গভীর অনুরাগ ছিল, এজন্য পাঠশালায় অধ্যয়নকালে গুরু মহাশয়গণ তাঁহাকে বিশেষ স্নেহ করিতেন। কোন কোন ব্যাপারে তাঁহারা বালকের অপূর্ব্ব চরিত্র ও বুদ্ধিবলের পরিচয় পাইয়া অতীব মুগ্ধ ছিলেন এবং তাহার সম্বন্ধে অতি উচ্চ ধারণা পোষণ করিতেন। উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে এবং মেডিক্যাল স্কুলে অধ্যয়নকালেও চরিত্রবান ও মেধাবী ছাত্র বলিয়া অনুকূলচন্দ্রের খ্যাতি ছিল। বিদ্যাশিক্ষায় তাঁহার কিরূপ আগ্রহ ও নিষ্ঠা ছিল, তাহার সুন্দর একটু পরিচয় পাওয়া যায় তাঁহার ডাক্তারী অধ্যয়ন কালের একটি সাধারণ ঘটনার বিবৃতি হইতে। একদিন তিনি কৌতুক

*এই অধ্যায়ে পরে ঘটনাটির বিস্তারিত আলোচনা করা হইয়াছে।

করিয়া বলিতেছিলেন,—"হাসপাতালে আমাদের duty allotted থাক্‌ত। সেখানে nurse-রা অনেক সময় আমাকে ভজায়ে ভজায়ে রেখে, নিজেরা বাইরে বেড়াতে যেত। তারা ভাবত, এ বেটা খুব বেকুব আছে, খাটায়ে নিই। কিন্তু তাতে আমার সুবিধাই হ'তো। হাতে-কলমে কাজ করার সুযোগ পেতাম অনেকখানি।"

বালক অনুকূলচন্দ্রের গুরুভক্তি ছিল অসাধারণ। শিক্ষকগণ তাঁহাকে যখন যেরূপ আদেশ দিতেন, তাহা অক্ষরে অক্ষরে পালন করিবার জন্য তিনি অস্থির হইয়া পড়িতেন। তাঁহার মনে এইরূপ ধারণা বদ্ধমূল ছিল যে, গুরুমহাশয়ের কোন আদেশ পালনে বিন্দুমাত্রও অন্যথাচরণ করিলে, তাঁহার মহাপাপ হইবে। একদিনের কথা। 'পাবনা ইন্‌ষ্টিটিউসনে' পড়িবার সময় জনৈক শিক্ষক মহাশয় একদিন ক্লাসে কথাপ্রসঙ্গে বালকগণকে প্রত্যহ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন বেশে বিদ্যালয়ে উপস্থিত হইতে উপদেশ দিয়াছিলেন। শিক্ষক মহাশয়ের কথা শুনিয়া অনুকূলচন্দ্র তাঁহাকে সবিনয়ে বলিলেন,—"স্যার, অপনার কথা মেনে চলতে সব সময়ই আপ্রাণ চেষ্টা করব, কিন্তু হঠাৎ যদি কখনও এমন ঘটে যে, ভুল বা অসুবিধাবশতঃ সেদিন পরিষ্কার জামা-কাপড় পরে' না আস্‌তে পারি?" সমস্যাটির সমাধান বলিয়া দিবার জন্য সরল প্রাণ বালক শিক্ষক মহাশয়কে বারংবার সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাইতে লাগিলেন। অবশেষে শিক্ষক মহাশয় তাঁহাকে এই বলিয়া প্রবোধ দিলেন যে, ঐরূপ অবস্থায় তাঁহার কোন দোষ হইবে না।

অনুকূলচন্দ্রের 'রাইপুরা হাইস্কুলে' পড়িবার সময়ের একটি ঘটনা। এই বিদ্যালয়ের জনৈক শিক্ষক মহাশয়ের চরিত্র-দোষ ছিল। অনুকূলচন্দ্র তাহা জানিতে পারিয়া মনে মনে বড়ই দুঃখ বোধ করিতে লাগিলেন। তিনি মনে করিতেন, ছাত্র-শিক্ষক পরস্পরে পরমাত্মীয়তার অতি মধুর পবিত্র বন্ধনে আবদ্ধ। সুতরাং বিপথগামী শিক্ষক মহাশয়কে পাপপথ হইতে ফিরাইয়া আনার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করা তাঁহার অন্যতম প্রধান কর্তব্য। কিভাবে স্বীয় দায়িত্ব পালন করিতে পারেন, সেজন্য তিনি সর্বদা সচেষ্ট রহিলেন। এক-দিন স্কুল-ছুটির পর উক্ত শিক্ষক মহাশয় কুস্থানে যাইবার মতলবে বাহির হইলে, অনুকূলচন্দ্র বাড়ী না ফিরিয়া, গোপনে তাঁহার অনুসরণ করিয়া চলিলেন। পথ চলিতে চলিতে বালক একাগ্রচিত্তে 'নাম' জপ করিতেছেন এবং তাঁহার পূজনীয় শিক্ষক মহাশয়কে সুমতি-দানের জন্য শ্রীভগবানের চরণে ব্যাকুল অন্তরে প্রার্থনা জানাইতেছেন। কিয়দ্দূর অগ্রসর হওয়ার পর বালক সৎসাহসে বুক বাঁধিয়া শিক্ষক মহাশয়ের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া তাঁহার চরণে লুটাইয়া পড়িলেন এবং আবেগ-উদ্বেল কণ্ঠে আপন মর্মবেদনা ব্যক্ত করিতে লাগিলেন। বালকের শ্রদ্ধামণ্ডিত বিনম্র আচরণ ও তেজোদীপ্ত অমিয়মধুর বচনে শিক্ষক মহাশয়ের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হইল, তাঁহার কলুষিত চিত্ত অনুতাপানলে পরিশুদ্ধ হইল।

আত্মসম্বিৎ ফিরিয়া পাইয়া তিনি চিরজীবনের মত নিজ কুপ্রবৃত্তি দমনে দৃঢ়সংকল্প হইলেন। অসৎ-নিরোধী চিত্তবৃত্তির সুষ্ঠু পরিচালনায় বালক সেদিন মহৎ অকল্যাণকে পরম মঙ্গলে নিয়ন্ত্রণ করিলেন।

বালকের স্বভাবসিদ্ধ গুরুভক্তি বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে উত্তরোত্তর বাড়িয়াই চলিয়াছিল। মেডিক্যাল স্কুলে অধ্যয়নকালেও অধ্যাপকগণ* নানা ব্যাপারে তাঁহার অকৃত্রিম শ্রদ্ধাভক্তির পরিচয় পাইয়া তাঁহার ভূয়সী প্রশংসা করিতেন। বস্তুতঃ পূজনীয় ও মাননীয় গুরুজনদের প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধাভক্তি নিবেদনের ব্যাপারে তাঁহার আগ্রহ-উন্মাদনার অন্ত থাকিত না। এ সম্বন্ধে নিম্নে একটি ঘটনার উল্লেখ করিতেছি।

বঙ্গাব্দ ১৩১৯ সালে 'করোনেশন্' উপলক্ষে কলিকাতা মহানগরীতে তদানীন্তন ভারত-সম্রাট পঞ্চম জর্জের শুভাগমন ঘটিয়াছিল। অনুকূলচন্দ্র তখন মেডিক্যাল স্কুলের ছাত্র। মহামান্য সম্রাটকে দর্শন করতঃ তাঁহাকে অন্তরের শ্রদ্ধা নিবেদন করিবার জন্য তাঁহার কি আকুল আগ্রহ! সম্রাটের আগমন-প্রতীক্ষায় তিনি নির্দিষ্টকালে মধ্যাহ্নের প্রচণ্ড রৌদ্র মাথায় লইয়া গড়ের মাঠের পাশে 'রেড্ রোডের' মোড়ে ('গভর্ণর হাউসে'র দক্ষিণে) বিশাল জনসমুদ্রের মধ্যে দাঁড়াইয়া আছেন, এমন সময় এক সিপাহী আসিয়া অপেক্ষামাণ জনতার উপর অকারণে বলপ্রয়োগ করিতে থাকে এবং নিরপরাধ অনুকূলচন্দ্রকে 'ব্যাটন' দ্বারা সজোরে

---

*অনুকূলচন্দ্রের 'ন্যাশনাল মেডিক্যাল স্কুলে' অধ্যয়নকালে কলিকাতার বৌবাজার-নিবাসী ডাক্তার শশিভূষণ মিত্র এল্. এম্. এস্. মহোদয় তাঁহার অন্যতম অধ্যাপক ছিলেন। এই সুযোগে আমরা ছাত্র অনুকূলচন্দ্রের সহিত শশিভূষণের পরবর্তীকালের একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য সম্পর্কের কথা বলিব।

ডাক্তারী স্কুলের অধ্যয়ন সমাপনের কয়েক বৎসর পর বঙ্গাব্দ ১৩২৬ সালের ১৫ই মাঘ অনুকূলচন্দ্র একবার কলিকাতার পটলডাঙ্গানিবাসী কেদারনাথ দত্ত বি-এল্ মহাশয়ের বাড়ীতে বিশেষভাবে আমন্ত্রিত হইয়া আসিয়াছিলেন। ঐ সময় তথায় পূর্ণচন্দ্র পাল মহাশয়ের বাড়ীতেও তাঁহার শুভাগমন হইয়াছিল। অনুকূলচন্দ্রের নাম-যশ তৎকালে দেশবিদেশে ছড়াইয়া পড়িয়াছে, বহুলোক তাঁহাকে শ্রীগুরুপদে বরণ করিয়া ধন্য হইয়াছেন। ডাঃ শশিভূষণও ইতঃপূর্বেই নানাভাবে তাঁহার অপূর্ব চরিত্রমাহাত্ম্য ও জনকল্যাণকর ভাবধারার বিশেষ পরিচয় পাইয়া তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পড়িয়াছিলেন। ঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের সাক্ষাৎ দর্শন লাভ করিবার আকাঙ্ক্ষায় তিনিও সেদিন পূর্ণবাবুর বাড়ীতে উপস্থিত হইয়াছিলেন। ঐ সময় ডাঃ শশিভূষণ ঠাকুর অনুকূলচন্দ্রকে শ্রীগুরুপদে বরণ করিয়া কৃতার্থ হন। অনুকূলচন্দ্র যে তাঁহার অন্যতম প্রাক্তন ছাত্র, এ বিষয় শশিভূষণ তখনও জানিতেন না। ঐদিন দীক্ষান্তিক আলাপ-আলোচনায় তাঁহাদের পূর্বতন ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্কটির কথা উভয়েরই স্মরণে পড়ে। দৈবনির্বন্ধে সেদিন গুরু আপন শিক্ষককে শিষ্যরূপে গ্রহণ করিলেন এবং শিক্ষক নিজ ছাত্রের গুরুপদে আসীন হইলেন। তদবধি অনুকূলচন্দ্র শশিভূষণকে পূর্বের মতই 'স্যার' বলিয়া সম্বোধন করিতেন এবং তাঁহাকে সর্বক্ষেত্রে মান্য করিয়া চলিতেন, এবং শশিভূষণ অনুকূলচন্দ্রকে 'বাবা' বলিয়া ডাকিতেন এবং আপন ইষ্টদেবতা জ্ঞানে সর্ব অন্তঃকরণে শ্রদ্ধাভক্তি করিতেন। বহু বৎসর ইঁহাদের উভয়ের পারস্পরিক গুরুশিষ্যসম্বন্ধের অপূর্ব মহত্ত্ব ও মাধুর্য উপভোগ করিয়া ধন্য হইয়াছি।

আঘাত করে। সিপাহীর অত্যাচার এবং বিপুল জনতার চাপ অতিকষ্টে সহ্য করিয়া অনুকূলচন্দ্র তথায় স্থিরভাবে দণ্ডায়মান রহিলেন এবং স্বীয় অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য শ্রীভগবানের চরণে একান্তমনে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। এদিকে কর্তব্য-নিরত জনৈক উচ্চপদস্থ গোরাসার্জন দূর হইতে দুর্নীত সিপাহীটির উক্তরূপ দৌরাত্ম্য লক্ষ্য করতঃ ছুটিয়া আসিয়া তাহাকে সবুট সবলে পদাঘাত করেন। ইহাতে সে গুরুতর আঘাত পাইয়া রাস্তার উপর পড়িয়া যায়। সিপাহীটির দুর্দশা দর্শনে ব্যথিত হইয়া অনুকূলচন্দ্র আর্তকণ্ঠে চীৎকার করিতে থাকেন। ইতিমধ্যে মহামান্য সম্রাটের সুসজ্জিত শকটখানি তাঁহার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল। সৌভাগ্যের বিষয়, গাড়ীখানা সেখানে বেশ কিছু সময়ের জন্য দাঁড়াইয়া ছিল। এই সুযোগে অনুকূলচন্দ্র সম্রাট মহোদয়কে প্রাণভরিয়া দেখিবার সাধ মিটাইলেন এবং তাঁহার উদ্দেশে অন্তরের শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদনপূর্বক গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন।

বাল্যকাল হইতেই অনুকূলচন্দ্র স্বাস্থ্যবান ও সবলকায় ছিলেন। শারীরিক শক্তি অর্জনের জন্য ব্যায়াম-চর্চায় তিনি বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন না। গৃহস্থালীর নানা কাজে জননী-দেবীকে সাহায্যপ্রদান, পিতৃদেবের প্রয়োজন-পূরণে তাঁহার আদেশ পালন, বন্ধুগণের সহিত খেলাধূলা ও ভ্রমণ ইত্যাদি নির্দোষ আমোদ-প্রমোদে অবসর সময় যাপন প্রভৃতি দৈনন্দিন জীবনের সাধারণ কাজ-কর্ম সম্পাদনের মধ্য দিয়াই তিনি নিটোল স্বাস্থ্যের অধিকারী হইয়াছিলেন। তাঁহার বাল্যকালের দৈহিক বলের কথা উল্লেখ করিয়া একদিন তিনি বলিতেছিলেন— "ছোটবেলায় আমি 'রেল্' 'রেল্' খেল্তাম। স্টীমার ঘাটে joint প'ড়ে থাক্তো। তারই দু'টো দুই হাতে তুলে নিয়ে দৌড় মারতাম। যদিও আমি কোনদিন ব্যায়াম করিনি, তবু আমার গায় খুব জোর ছিল। যে তা দেখে নাই, সে বিশ্বাস কর্‌বে না।"

তরুণ বয়সেই অনুকূলচন্দ্রের সহনশক্তি ছিল অসাধারণ। বাড়ীর নিচেই ছিল পদ্মানদীর বিস্তৃত চরভূমি। গ্রীষ্মের প্রখর রৌদ্রতাপে তাহা অগ্নিতুল্য উত্তপ্ত হইয়া উঠিত। অনাবৃত পদে সেখানে পদ-সঞ্চারণ করা এক কল্পনাতীত ব্যাপার। আশ্চর্যের বিষয়, বালক অনুকূলচন্দ্র খালি পায়েই মরুভূমি সদৃশ সেই অত্যুষ্ণ বালুকারাশির উপর স্বচ্ছন্দে বিচরণ করিতেন।

ক্ষিপ্রতার সহিত কার্য-সম্পাদনের সদভ্যাসটিও অতি বাল্য হইতেই অনুকূলচন্দ্রের চরিত্রগত ছিল। দীর্ঘসূত্রতা তিনি মোটেই পছন্দ করিতেন না। যাহা যে সময়ে করণীয় তাহা তড়িদ্‌বেগে তৎক্ষণাৎ নিখুঁতভাবে সম্পাদন করিতে তিনি বিশেষ অভ্যস্ত ছিলেন। বালক কখনও ধীর-মন্থর গতিতে চলিতে জানিতেন না। অতি দ্রুতবেগে এবং অন্যের তুলনায় একরূপ দৌড়াইয়াই তিনি সাধারণতঃ চলাফেরা করিতেন। এ সম্বন্ধে বাল্যস্মৃতির আলোচনা-প্রসঙ্গে তিনি

একদিন বলিতেছিলেন,—"ছোটবেলা থেকেই আমি দ্রুত চলনে অভ্যস্ত ছিলাম। রাস্তায় চলবার সময় আমার মনে হ'তো গুরুদেব হুজুর মহারাজ* যেন আমার মাথায় থেকে আমায় চালিয়ে নিচ্ছেন।"

অনুকূলচন্দ্র অত্যন্ত লোকসঙ্গপ্রিয় এবং নির্দোষ আমোদ-প্রমোদে একান্ত অনুরাগী ছিলেন। বিদ্যালয়ে অধ্যয়নকালে ছুটির দিনে তিনি প্রায়শই বন্ধুগণকে লইয়া গীতবাদ্যের আসর জমাইতেন। নিজেই যাত্রা-থিয়েটারের পালা রচনা করিতেন, নিজেই তাহার প্রধান-প্রধান ভূমিকায় অভিনয় করিতেন এবং দলের অপর সকলকে সযত্নে অভিনয়-কৌশল শিক্ষা দিতেন। 'পাবনা ইন্‌ষ্টিটিউসনে' চতুর্থ শ্রেণীতে (সপ্তম মানে) অধ্যয়ন করিবার সময় তিনি অমিত্রছন্দে দেবযানী-নামক একখানি যষ্ঠাঙ্ক নাটক রচনা করতঃ বন্ধুগণকে লইয়া তাহার অভিনয় করিয়াছিলেন। গ্রামবাসিগণ এই অভিনয় দর্শনে অতীব প্রীত হইয়া তাঁহার খুবই সুখ্যাতি করিয়াছিলেন। নাট্যকলার ন্যায় সঙ্গীতশিল্পেও তাঁহার অধিকার ছিল। সুমধুর কণ্ঠ-সঙ্গীতের জন্য তিনি সকলের বিশেষ প্রশংসা-ভাজন ছিলেন।

বালক অনুকূলচন্দ্রের কাব্যানুরাগও কম ছিল না। বিদ্যালয়-জীবনের কতিপয় বৎসরের মধ্যে তিনি বহু কবিতা ও সঙ্গীত এবং কয়েকটি নাটক রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার বাল্যরচনার সমগ্র পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করা সম্ভব হয় নাই। বহু চেষ্টায় স্বহস্ত-লিখিত যে একখানি পাণ্ডুলিপির সন্ধান পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে বাইশটি কবিতা, ঊনত্রিশটি সঙ্গীত, 'দেবযানী'-নামক একখানি পূর্ণাঙ্গ নাটক ও অপর আর একটি নাটকের কিয়দংশ লিপিবদ্ধ আছে। উক্ত পাণ্ডুলিপি স্থানে স্থানে "7th May, 1905" এই তারিখটি রবার-ষ্ট্যাম্পে মুদ্রিত রহিয়াছে। কোন কোন কবিতা ও সঙ্গীতের শীর্ষস্থানে রচনার বিষয়বস্তু এবং পাদদেশে লেখক অনুকূলচন্দ্রের পূর্ণ নামটি ইংরাজীতে লিখিত আছে। এই অধ্যায়ের নানাস্থানে প্রসঙ্গক্রমে তাঁহার রচিত কয়েকটি কবিতা ও সঙ্গীত উদ্ধৃত করা হইয়াছে, অবশিষ্ট রচনাবলীর কিয়দংশ গ্রন্থ-পরিশিষ্টে সন্নিবিষ্ট করা হইল।

বালক অনুকূলচন্দ্রের আর একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যের কথা। কোন বিষয়ের অন্তর্নিহিত কারণকে জানিবার একটা প্রবল আগ্রহ স্বতঃই তাঁহার তরুণ মনে জাগিয়া উঠিত এবং অদ্ভুত মননশক্তির বলে তিনি নিজেই আপন মনের সকল জিজ্ঞাসার সমাধান করিয়া লইতেন। তাঁহার সুতীক্ষ্ন সন্ধানী দৃষ্টির নিকট বস্তুর স্বরূপ ও সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম সত্যগুলি অতি সহজেই ধরা পড়িত। এ সম্বন্ধে নিম্নে কয়েকটি ঘটনা বিবৃত করা হইল।

অনুকূলচন্দ্র একদিন ভাটগাছের পাতা চিবাইয়া জিহ্বায় অত্যন্ত তিক্ত স্বাদ ও পাকস্থলীতে তীব্র বেদনা অনুভব করিলেন, পাতাগুলি চর্বণের সঙ্গে-সঙ্গে তাঁহার মুখে প্রচুর জলও উঠিল। কিছুদিন পরের কথা। তাঁহার এক বন্ধুর

*ইনি অনুকূলচন্দ্রের জননীদেবীর গুরুদেব,—রাধাস্বামী মতের দ্বিতীয় সন্ত সদ্গুরু।

পেটের অসুখ করিয়াছিল। রুগ্ন বালকটিরও জিহ্বায় তিক্ত স্বাদ, পাকস্থলীতে বেদনা-বোধ ও মুখে জল-উঠা প্রভৃতি লক্ষণগুলি দেখা দিয়াছিল। এই অবস্থায় অনুকূলচন্দ্রের মনে ভাটপাতা চর্বণের সকল স্মৃতি উদিত হইল। তিনি কৌতুহল-পরবশ হইয়া বন্ধুটিকে ভাটপাতার কিছুটা রস পান করিতে দেন। বড়ই আশ্চর্যের বিষয়, উক্ত ব্যবস্থায় ছেলেটির অসুখ সারিয়া যায়। এই ঘটনায় বালকের মনে এই প্রত্যয় জন্মিল যে, সুস্থ অবস্থায় শরীর-বিধানে কোন দ্রব্য যে-যে-প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে, রোগাক্রান্ত দেহে তদ্রূপ লক্ষণাদি প্রকাশ পাইলে, সেই দ্রব্যের প্রয়োগে অবশ্যই রোগের আরাম হইবে। এইভাবে আরও কয়েকটি উদ্ভিদের গুণাগুণ পরীক্ষা করিয়াও তিনি ঐ একই সত্যে উপনীত হইলেন। মহাত্মা হ্যানিম্যান-আবিষ্কৃত হোমিওপ্যাথী চিকিৎসাতন্ত্রের বিষয় যদিও তখনও পর্যন্ত বিন্দুবিসর্গ তাঁহার জানা ছিল না, তথাপি উক্ত শাস্ত্রের মূল সূত্র—'Similia similibus curanta' (সমঃ সমং শময়তি) এই মহাসত্যটি বালক তাঁহার নিরীক্ষণ ও মনন-শক্তির বলে কেমন সহজেই ধরিয়া লইতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

পাবনা-স্কুলে পড়িবার সময় হঠাৎ একদিন অনুকূলচন্দ্রের মনে খেয়াল হইল, —দোয়াত লইয়া স্কুলে যাইতে অসুবিধা হয়, কলমের ভিতর কালি ভরিয়া লইলে কেমন হয়! যেমন ভাবা, অমনই কাজে লাগিয়া যাওয়া। একটি সরু খাগের নলে কালি ভরিয়া ও তাহাতে একটি নিব্ লাগাইয়া তিনি একটি কলম প্রস্তুত করিলেন। লিখিতে গিয়া দেখিলেন, নিবে কালি আসে না। তৎক্ষণাৎ তাঁহার মাথায় এই বুদ্ধি আসিল,—কলমের উপর দিকটা বন্ধ রহিয়াছে, সেখানে একটা ছিদ্র করিয়া দেওয়া প্রয়োজন। পিন্ দিয়া একটা সরু ছিদ্র করিয়া দেওয়ায় কালি আসিতে লাগিল বটে, কিন্তু তাহার পরিমাণ এত বেশী যে, তিনি আর এক নূতন সমস্যায় পড়িলেন। এইবার চিন্তা করিয়া ছিদ্রপথে একটি আলপিন্ বসাইয়া তাহা নাড়িয়া চাড়িয়া কালির প্রবাহ নিয়মিত করিবার ব্যবস্থা করিলেন। এইরূপ নানাভাবে কিছুকাল চেষ্টার ফলে তিনি অবশেষে কাজ-চলার উপযোগী একটি সুন্দর কলম তৈয়ার করিয়া ফেলিলেন। কতকাল পূর্বের কথা, তখন 'ফাউন্টেন্ পেন' তিনি চক্ষেও দেখেন নাই; কিন্তু ঐরূপ একটি কলম নির্মাণের কৌশল কত সহজে তাঁহার বুদ্ধির কাছে ধরা পড়িয়াছিল।

অনুকূলচন্দ্রের বয়ঃক্রম তখন দশ বৎসর। একবার পিতার সহিত আমিরাবাদ (ঢাকা) যাত্রাকালে কিছু পথ তাঁহাকে স্টীমার-যোগে গমন করিতে হইয়াছিল। ঐ সময় চলন্ত স্টীমারের ইঞ্জিনটির প্রতি বালকের কৌতুহলী দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল। তিনি বহুক্ষণ ধরিয়া ইঞ্জিনের প্রতিটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ এবং তাহার গতিবিধি, গঠন-বৈশিষ্ট্য ও কার্যপ্রণালী প্রভৃতি সকল ব্যাপার নিবিষ্টমনে পর্যবেক্ষণ করিলেন। বলিতে কি, সঙ্গে সঙ্গেই ঐরূপ একটি ইঞ্জিন তৈয়ার করিবার প্রবল আগ্রহ তাঁহার

মনে জাগিয়া উঠিল। গন্তব্যস্থানে পৌঁছিয়াই তিনি পিতাকে বলিয়া একজন কর্মকার-কারিগর ডাকাইয়া আনিলেন এবং ইঞ্জিনের কলকব্জা যেমন যেমন দেখিয়া আসিয়াছেন, লোকটিকে তৎসমুদয়ের পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বুঝাইয়া দিলেন। বালক অতঃপর ঐ লোকটির সঙ্গে থাকিয়া তাহার সাহায্যে নিজ প্রয়োজনমত কতকগুলি অংশ তৈয়ার করাইয়া লইলেন। অবশেষে ঐ সমুদয় অংশ এবং নিজ-গৃহের কতিপয় দ্রব্যাদির সাহায্যে তিনি একটি ইঞ্জিনের নির্মাণকার্য সম্পন্ন করিলেন এবং অগ্নিসংযোগ করতঃ তাহা চালাইবার চেষ্টা করিলেন। ইঞ্জিনটি প্রথমতঃ কিছুক্ষণ চলিল না, কিন্তু কিয়ৎকাল পরেই ইহার চাকাগুলি ভীষণ বেগে সশব্দে ঘুরিতে লাগিল, 'বয়লার' হইতেও প্রচুর পরিমাণে বাষ্প নির্গত হইতে লাগিল। এমন সময় কি জানি কেন, হঠাৎ যন্ত্রটির নির্মাণ-কার্যের কোন বিশেষ ত্রুটির কথা তাঁহার মনে পড়িয়া গেল। এই অবস্থায় নিশ্চিত বিপদের আশঙ্কায় তিনি তৎক্ষণাৎ কারিগরটিকে লইয়া দূরে সরিয়া দাঁড়াইলেন। দেখিতে দেখিতে ইঞ্জিনটি ফাটিয়া চুরমার হইয়া গেল।

বাল্যসুলভ কৌতূহলের বশবর্তী হইয়া অনুকূলচন্দ্র নিজ বুদ্ধিবলে একবার একটি গ্রামোফনের 'সাউণ্ড বক্স' তৈয়ার করিয়াছিলেন। বাবলাগাছের কাঁটা এই যন্ত্রটির পিনের কার্য করিত। আশ্চর্যের বিষয়, ইহার সাহায্যে গ্রামোফন-রেকর্ড বেশ সুন্দররূপেই বাজানো চলিত।

আর একটি ঘটনার কথা অনুকূলচন্দ্র নিজেই নিম্নোদ্ধৃত বিবরণী দুইটিতে বিবৃত করিয়াছেন। যথা ঃ—

"ছোটবেলা থেকে দেখতাম, পৃথিবীতে নানা রকমের গাছ। মনে হ'তো, এক মাটি থেকে এতগুলো গাছ হ'লো কি ক'রে? এই নিয়ে জঙ্গলের ভিতর ব'সে কেবল চিন্তা করতাম। কিছু মীমাংসা করতে না পেরে মাঝে মাঝে কেঁদে ফেলে দিতাম, আর কেবল নাম ক'রে যেতাম। মনে হ'তো যদি কোন দেবতা এসে আমার প্রশ্নের মীমাংসা ক'রে দেন। মাটি খুঁড়ে মূল তুলে, ফুল, পাতা, ডাল—গাছের প্রত্যেকটি অংশ তন্ন তন্ন ক'রে কারণ অনুসন্ধান করতাম, আর নাম করতাম। হঠাৎ আমার বোধে এলো, তাই তো, বীজগুলি যে স্বতন্ত্র, তাই গাছগুলোও পৃথক পৃথক রকমের হয়েছে"

* * * * *

"ছোটবেলা থেকে আমার দৃষ্টিটা বড় সন্ধানী দৃষ্টি। যা দেখব, শুনব, বুঝব, তা পুরোপুরি না দেখলে, না শুনলে, না বুঝলে আমার কিছুতেই তৃপ্তি হয় না। ছেলে-বেলায় বাগানে দেখি কত রকমের গাছ—এ সম্ভব হয় কি ক'রে? ভেবে আর কিনারা পাই না। শেষটা একদিন বাগানে যেয়ে ছোট-ছোট অনেক গাছপালা উপড়ে উপড়ে দেখলাম। পরে বুঝলাম, মাটি এক হ'লেও বীজ আলাদা, তাই এক মাটি হ'লেও গাছের চেহারা আলাদা হয়, ফল আলাদা হয়। আর বীজগুলিও হয় যে বীজ থেকে, ঐ গাছ হয়েছে ঐ বীজেরই মতন,

যদিও মাটির প্রকৃতি অনুযায়ী গাছের species-এর উৎকর্ষ অপকর্ষ হ'তে পারে। মানুষগুলিও ঐ রকম। একই পরিবেশে বহু মানুষকে জন্মাতে ও বাস করতে দেখা যায়, কিন্তু বীজ অনুযায়ী আকৃতি-প্রকৃতির পার্থক্য হয়, আবার তারা যে বীজবাহী হয়, সে বীজও তারা যে বীজ হ'তে উদ্গত হয়েছে তারই অনুরূপ, পুরুষ পরম্পরায় এমন ক'রেই চলে, তাই বর্ণধারা ও বংশধারা না মেনে উপায় নেই।''......আলোচনা-প্রসঙ্গে, ৩য় খণ্ড।

এইরূপ যখনই যাহা কিছু বালকের দৃষ্টিপথে পতিত হইত বা তাঁহার মনে উদিত হইত, তৎক্ষণাৎ সে সম্বন্ধে তাঁহার অন্তরে প্রবল অনুসন্ধিৎসার এক তীব্র প্রেরণা জাগিয়া উঠিত, আর অনতিবিলম্বে তাহা বাস্তবে রূপায়িত করিয়া তুলিবার জন্য তিনি সর্বপ্রযত্নে কর্মতৎপর হইতেন।

জিজ্ঞাসা ও অনুসন্ধিৎসা সহকারে সত্য নির্ধারণের জন্য কর্মসাধনের প্রয়োজন সম্বন্ধে অনুকুলচন্দ্রের পরবর্তীকালের-একটি বিবৃতি নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল। তিনি ভূত দেখিয়াছেন কি না—এই প্রশ্নের উত্তরে কথাগুলি উক্ত হইয়াছিল।

''ভূত কাকে কয় তা' তো জানি না। তবে প্রসন্ন সিংহের বাড়ীর ওদিকে একটা সড়াগাছ ছিল, সেই সড়াগাছের ওখানে ভূতের ভয় ছিল ব'লে শুনেছি। একদিন দিনের বেলায় তিনটে চারটের সময় আমরা কয়েকজন ছেলেপেলে মিলে ঐ সড়াগাছটাকে খুব ল্যাঠিপেটা করলাম, হঠাৎ উপর থেকে এক চাঙ্গাড় ঢিল এসে পড়ল। একটু পরে অন্য দিক থেকে আর একটা ঢিল এসে পড়ল গায়ের কাছে, কিন্তু গায় লাগল না। কোথায় থেকে যে ঢিল দুটো আসলো, কে যে ঢিল দুটো ছুঁড়লো, কিছুই ঠাওর করতে পারলাম না। চারিদিক লক্ষ্য ক'রে দেখলাম, কোন মানুষ যে ঐ ঢিল ছুঁড়েছিল, তা মনে হয় না। তখন আমার মনে হয়েছি, ভূত ব'লে যদি কিছু থাকে এটা তার কাজ হ'তে পারে। আর একদিন সন্ধ্যাবেলায় কেমিক্যালের মাঠে ব'সে আছি। তখন বাদল বৈরাগীর বাড়ীতে খুব ভূতের উৎপাত। সেই সম্বন্ধে কথা হ'চ্ছে। হঠাৎ ঐদিক থেকে একটা খোয়া এসে পড়লো। আমাদের জীবনের ফাঁকে ফাঁকে অনেক কাণ্ড ঘটে যায়, সে সবগুলি ঠিকমত pursue করতে পারি না, observe করতে পারি না, তাই বহু রহস্য আমাদের অনুদ্ঘাটিত থেকে যায়। গাছ থেকে মাটিতে আপেল পড়তে তো কত লোক দেখেছে, কিন্তু নিউটনের চোখে ঐটে একটা প্রশ্ন হ'য়ে দেখা দিল। তিনি এই নিয়ে গবেষণা করলেন, তার ফলে আবিষ্কৃত হ'লো মাধ্যাকর্ষণ-শক্তির অস্তিত্ব।'' ......আলোচনা প্রসঙ্গে, ৩য় খণ্ড

ছোটবেলা হইতেই ইন্দ্রিয়গ্রামের সূক্ষ্ম বোধশক্তি কেমন সহজভাবে অনুকুলচন্দ্রের সত্তাগ্রথিত হইয়াছিল, তাহারই প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায় তাঁহার বাল্যকালের কয়েকটি ঘটনায়। পরবর্তীকালে একদিন তিনি কথাপ্রসঙ্গে বলিতেছিলেন,—

"যা' আমরা চোখে দেখি না, কানে শুনি না, ইন্দ্রিয় দিয়ে বোধ করি না, তা' যে নেই, তা' নয়। আমাদের ইন্দ্রিয়গুলির শক্তি সীমাবদ্ধ, তাই তার উপরে যা', তা' আমাদের কাছে না-থাকা হ'য়ে আছে। কিন্তু এই ইন্দ্রিয় ও মস্তিষ্কের শক্তি অনুশীলনের সাহায্যে অযুতগুণভাবে বাড়ান যায়, তখন আমাদের অনুভবের রাজ্যও অতোখানি বিস্তার লাভ করে। তখন একটা মানুষের বাহ্যে-প্রস্রাব দেখেই হয়ত তার চরিত্র ও চেহারা পর্যন্ত ব'লে দিতে পারবে। আমি একবার ছেলেবেলায় একজনের গু পাড়িয়েছিলাম। পাড়া দিয়েই মনে হ'লো 'এ ভাসার গু', পাড়া দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই যে হেগেছে তার চলন-চরিত্র, চেহারা-প্রকৃতি সবই যেন আমার চোখের সামনে ভেসে উঠলো, আমি নির্ঘাত বুঝলাম, কে হেগেছে। তার কাছে এসে জিজ্ঞাসা করতে সে হাসতে হাসতে বললো—'তুই আবার ওখানে গিছিলি কেন?"

......আলোচনা-প্রসঙ্গে, ২য় খণ্ড

আর একদিন বলিতেছিলেন,—

"বাবা ঢাকায় আমিরাবাদের কাছারীতে বদলী হ'লে, আমিও সেখানে থেকে পড়াশোনা করব ব'লে, তাঁর সঙ্গে গেলাম। আমরা কাছারীতে পৌঁছিলে, কর্মচারীরা পূর্বে থেকেই আমাদের জন্য যে বাড়ী ঠিক ক'রে রেখেছিলেন, আমাদের সেখানে নিয়ে গেলেন। বাবার সঙ্গে শোবার ঘরটায় ঢুকে দেখলাম, ঘরখানি বেশ বড়, আলো-হাওয়া প্রচুর, বালিশ-বিছানাও খুব সুন্দর। কিন্তু ঐ ঘরে প্রবেশমাত্র দেখলাম, এক বীভৎস অশরীরী আত্মা ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে। আমি তখন বাবাকে বললাম,—'বাবা, এ বাড়ীতে থাকা হবে না'। বাবা বললেন,—'কেন? তুই হাতমুখ ধুয়ে, খাওয়া-দাওয়া ক'রে শুয়ে পড়'। কি আর করি! তাঁর কথামত আমি শুয়ে পড়লাম। বাবাও আমার কাছে শুলেন। গভীর রাত্রে বাবার কাতরকণ্ঠে আমার ঘুম ভেঙ্গে গেল। দেখি, বাবার ভীষণ জ্বর। জ্বরের প্রকোপে তিনি গোঙাচ্ছেন আর প্রলাপ বকছেন। পরদিন বাবার জ্বরের কথা শুনে সবাই এসে উপস্থিত হলেন, ডাক্তারবাবু ঔষধপত্রের ব্যবস্থা করলেন, কিন্তু জ্বর ছাড়লো না, বেড়েই চললো। আমি সকলকে বললাম, আর একটা বাসা দেখতে। কিন্তু আমার কথায় কেউ আমল দিলেন না। দিনের বেলা বাবা একটু প্রকৃতিস্থ ছিলেন, সবাই নিশ্চিন্ত হলেন। কিন্তু যেই রাত্রি হ'ল, বাবা জ্বরে বেহুঁস হ'য়ে পড়লেন, সকলে সেবাশুশ্রূষা করতে লাগলেন। পরদিন সকালে আমি কেঁদে ফেললাম। বাবাকে বললাম, 'বাবা, এ বাড়ী না ছাড়লে তোমার মারাত্মক অসুখ হবে।' ছেলে মানুষের কান্না দেখেই হোক, আর আচম্বিতে জ্বরভোগের দরুণই হোক, বাবা তখন বাসা-পরিবর্তনে মত দিলেন। তক্ষুণি আর একটা বাড়ী ঠিক করা হ'লো। সে বাড়ী অত্যন্ত ছোট ও পুরোণো হ'লেও কি আর হবে, সে বাড়ীতেই যাওয়া হ'লো। সেদিন থেকে বাবার আর জ্বর হ'লো না। দিন কয়েকের মধ্যেই বেশ সুস্থ হ'য়ে উঠলেন।

অশরীরী আত্মার কথা আর কাউকে বল্লাম না, বললে হয়ত কেউ বিশ্বাস করতো না। যাক্, ফল তো ভাল হ'লো ?"

অনুকূলচন্দ্রের বাল্যজীবনের বহু ঘটনায় তাঁহার নিপুণ বোধ ও স্বাধীন বিবেচনা-শক্তির সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। এই সম্বন্ধে নিম্নে কয়েকটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিতেছি।

একদিন অঙ্কের ক্লাসে শিক্ষক মহাশয় বলিতেছিলেন,—'এক আর এক দুই'। শিক্ষক মহাশয়ের এই উক্তি শুনিবামাত্র বালকের মনে এক গভীর সন্দেহের উদয় হইল। তিনি মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন,—"তাই কি ? এ কিরূপে সম্ভব ? জগতে যত বস্তুই দেখি, সবই তো পরস্পর পৃথক, কোন একটির সঙ্গে আর একটির তো পুরোপুরি মিল কোথায়ও নেই। ঠিক একই রকমের দু'টো জিনিষ যখন এ দুনিয়ায় কোথায়ও দেখতে পাওয়া যায় না—সবই যখন পরস্পর অসমান, তখন একের সঙ্গে কেমন ক'রে একের যোগ হ'য়ে দুই হবে!" সন্দিগ্ধমনা বালক উৎসুক অন্তরে শিক্ষকমহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"স্যার কোন দু'টো জিনিস তো কোথায়ও এক রকম দেখি না, তবে এক আর এক দুই হ'লো কি ক'রে ?" শিক্ষক মহাশয় বালকের প্রশ্নের গূঢ় মর্মার্থ ও প্রকৃত তাৎপর্য এবং তাহার সন্দেহ ও সমস্যার যথার্থ গুরুত্ব উপলব্ধি করিবার চেষ্টা করিলেন না। অনুকূলচন্দ্র তাঁহার এই অতি সহজ সরল কথাটা না-বোঝার ভান করিয়া তাঁহাকে বিদ্রূপ করিবার জন্য অবান্তর কথা বলিতেছেন, এইরূপ মনে করিয়া শিক্ষক মহাশয় বালককে রূঢ় ভাষায় ভৎসনা করতঃ নির্মমভাবে প্রহার করিতে লাগিলেন।

উক্ত ঘটনাটি সম্পর্কে অনুকূলচন্দ্র পরবর্তীকালে একদিন কথাপ্রসঙ্গে নিজেই বলিতেছিলেন,—"একবার এক আর এক দুই হয় কি ক'রে, এই কথা জিজ্ঞাসা ক'রে তো প্রাণ যায় আর কি! মাষ্টার মহাশয় ভাবলেন—আমি তাঁকে ঠকাবার জন্য না-বোঝার ভান করছি, কিন্তু আমি যে বুঝতেছি না সেটা কেমন ক'রে বোঝাব ? আমার কাছে সমস্যা দাঁড়ালো, কোন দুটো জিনিষ তো এক রকম দেখি না। এমন অবস্থায় এক আর এক দু'টো এক হ'লো, এ বরং বলা যায়, কিন্তু দুই হ'লো এ কথা বলি কি ক'রে ? আমার কথা কে শোনে। মারের পর মার, দোয়াড়ে মার।" ......আলোচনা-প্রসঙ্গে, ৩য় খণ্ড

আর একটি ঘটনা। নানা ব্যাপারে বালক লক্ষ্য করিতেন, কোন একইরূপ আচরণ বা কার্যের ফল সময় ও অবস্থাভেদে কখনও ভাল, কখনও বা মন্দ হইয়া দাঁড়ায়। সুতরাং স্থান-কাল-পাত্র-বিবেচনায় কোথায় কখন কাহার সহিত কিরূপ ব্যবহার করা উচিত হইবে, তাহা অনেক সময়ই তিনি সঠিক বুঝিয়া উঠিতে সমর্থ হইতেন না। বাস্তব কর্মক্ষেত্রে কর্তব্যাকর্তব্য নির্ধারণের এই সমস্যা লইয়া বালক এক সময় খুবই বিব্রত হইয়া পড়িয়াছিলেন এবং সেজন্য ভীষণ মানসিক অস্বস্তিতে তাঁহার দিন কাটিতেছিল। এমন সময়

একদিন শিক্ষক মহাশয় 'Instructive Reader' নামক পাঠ্যপুস্তক হইতে "Do unto others as you wish to be done by"—বাক্যটির অর্থ ক্লাসে ছেলেদের নিকট ব্যাখ্যা করিতেছিলেন। শিক্ষক মহাশয়ের আলোচনায় বালক অনকুলচন্দ্র বাক্যটির অন্তর্নিহিত যথার্থ সারমর্মটি—'অপরের প্রতি কর সেই আচরণ, নিজে যাহা পেতে তুমি কর আকিঞ্চন', সর্বমনপ্রাণ দিয়া এমনই সুস্পষ্ট ও নিঃসংশয়িত-রূপে উপলব্ধি করিলেন যে, তাঁহার দীর্ঘদিনের অবসন্ন মন তন্মুহূর্তে সঞ্জীবিত হইয়া উঠিল। যেজন্য তিনি এতকাল উন্মত্তের মত অস্থির চিত্তে কাটাইয়াছেন, সেদিন উক্ত বাক্যটিতে তাঁহার সে সমস্যার অব্যর্থ সমাধান লাভ করিয়া তিনি যেন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিলেন। জীবন-পথে লোকের সুষ্ঠু আচরণের এই সহজ সরল সুন্দর সংকেতটি জানিতে পারিয়া তিনি চিরজীবনের মত নিশ্চিন্ত হইলেন। এ সম্বন্ধে উত্তরকালে একদিন তিনি কথাপ্রসঙ্গে বলিতেছিলেন,—"যে মুহূর্তে ইহা শুনলাম, আমার যেন ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ার মত অবস্থা হ'লো। সব সরল হ'য়ে গেল। তৎক্ষণাৎ আমার সমস্যার একদম মীমাংসা হ'য়ে গেল। সেইদিন থেকে অদ্য পর্যন্ত লোকের সঙ্গে ঠিক এইভাবেই ব্যবহার ক'রে আসছি, অন্যকেও এইভাবে চলবার উপদেশ দিয়ে থাকি। লোক নিয়ে চলতে শেখা জীবনের একটা প্রধান কথা, তাই এটা ধর্মেরও প্রধান কথা ; কারণ, ধর্মের কারবার জীবন নিয়ে।"

আর একটি ঘটনা। বালক মনে করিতেন, নারী ও পুরুষ দুই বিভিন্ন জাতীয় জীব, ইহাদের মধ্যে কোন-বিষয়েই সাদৃশ্য বলিয়া কিছু নাই। এমন-কি, উভয়ের চিন্তাধারা পর্যন্ত সম্পূর্ণ পৃথক। যেমন, পুরুষ লাল বর্ণের কোন বস্তুকে লাল বর্ণেরই দেখে এবং বলেও তাই। কিন্তু স্ত্রীলোকেরা সেই বস্তুকে যথার্থত লাল ভিন্ন অন্য বর্ণের—অর্থাৎ কাল, সাদা, হলুদ বা নীল রং-এর দেখে, তবে বলিবার সময় পুরুষের দেখাদেখি তাহারা উহাকে লাল রং-এরই বলিয়া থাকে। এইরূপ অদ্ভুত চিন্তাধারা লইয়া তিনি অনেক দিন কাটাইলেন। অবশেষে একদিন তিনি সংবাদ পাইলেন যে, তাঁহার পল্লীবাসী জনৈকা রমণী একটি পুত্রসন্তান প্রসব করিয়াছেন। এই ঘটনাটি লইয়া তিনি অনেক ভাবিলেন। অতঃপর তাঁহার বহুকাল-পোষিত উক্ত বদ্ধমূলে ধারণার সম্পূর্ণ পরিবর্তন ঘটিল। সেইদিন হইতে তাঁহার এই বোধ জন্মিল যে, যেহেতু নারীর গর্ভে মানব-শিশুর—স্ত্রী-পুরুষ উভয়েরই জন্ম হয়, সে কারণ, নারী ও পুরুষের জীব-সত্তায় পার্থক্য বলিয়া কিছু থাকিতে পারে না।

বিষয়-বিশেষের মনন ও পর্যবেক্ষণ দ্বারা আত্ম-মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণপূর্বক তৎসম্বন্ধে অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ন ও জ্ঞানাহরণের অপূর্ব ক্ষমতা ছিল অনুকূলচন্দ্রের বাল্যচরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এ সম্বন্ধে নিম্নে কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ করা যাইতেছে।

ছাত্রাবস্থায়ই অনুকূলচন্দ্রের ধূমপানের অভ্যাস ছিল। বলাবাহুল্য, পিতামাতা ও অপর সকল গুরুজনের অগোচরে অতিশয় সংগোপনে তাঁহাকে এই কার্য নিষ্পন্ন করিতে হইত। ঘটনাচক্রে একদিন জননীদেবীর কাছে ধরা পড়িবার ভয়ে তিনি আত্মসম্মান রক্ষার্থ নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বে মিথ্যা-ভাষণের আশ্রয় লইতে বাধ্য হন। জীবনে সেইদিনই সর্বপ্রথম তাঁহার মুখ দিয়া অজ্ঞাতে মিথ্যা কথা উচ্চারিত হয়। অতঃপর মিথ্যা ভাষণের কৌশলটিও তিনি বেশ শিখিয়া ফেলিলেন। কিন্তু মিথ্যা বলিলেও, তজ্জন্য বিবেকের তীব্র দংশন-জ্বালায় বালক সর্বদা ছটফট করিতেন। আত্মকৃত অপরাধের ঈদৃশ মর্মান্তিক যাতনা হইতে কিরূপে মুক্তিলাভ করিবেন সেজন্য দিবারাত্র তাঁহার দুর্ভাবনার অন্ত ছিল না। আত্মশুদ্ধির উপায় চিন্তায় এইভাবে অনুক্ষণ নিমগ্ন থাকিবার ফলে হঠাৎ একদিন তাঁহার চিত্ত সত্যের বিমল দ্যুতিতে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। সর্বমনপ্রাণ দিয়া তিনি সেদিন নিঃসন্দিগ্ধরূপে উপলব্ধি করিলেন যে, মিথ্যা বলার মত নির্বুদ্ধিতার কাজ জগতে আর কিছুই নাই—কারণ, যে উদ্দেশ্য সাধনের জন্য মানুষ সাধারণত মিথ্যার আশ্রয় লইয়া থাকে, সত্যপথ অবলম্বনেই বরং তাহা আরও সহজে ও সুষ্ঠুরূপে নিষ্পন্ন হইতে পারে। অন্তরের এই অনুভূতি ও তাহার বাস্তব অনুশীলন দ্বারা তিনি এইভাবে অতিবাল্যেই সত্যবচনের তত্ত্বটি হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন।

ছোটবেলায় অনুকূলচন্দ্রের পাখী-পোষার এক প্রবল ঝোঁক ছিল। পাখীর ছানা সংগ্রহের জন্য তাঁহার শ্রম ও চেষ্টার অন্ত থাকিত না। একদিন অভীষ্ট সিদ্ধির উদ্দেশ্যে তিনি বাড়ীর নিকটবর্তী একটা বাজে-পোড়া খেজুরগাছের মাথায় উঠিয়া উহার কোটরের মধ্যে হাত ঢুকাইয়া দেন। সেখানে তিনি পাখীর ছানা বলিয়া যে বস্তুটি ধরিলেন, তাহা টানিয়া বাহিরে আনিয়া দেখিতে পাইলেন উহা পাখীর ছানা নয়, একটা প্রকাণ্ড সাপ। দুঃসাহসী বালক এই অবস্থার সাপটিকে তন্মুহূর্তে আলগোছে গর্তের মধ্যে ছাড়িয়া দিয়া বিশেষ ত্রস্ততার সহিত গাছ হইতে নামিয়া পড়িলেন এবং এক দৌড়ে দূরে পদ্মাতীরে গিয়া উপস্থিত হইলেন। সেখানে পৌঁছানোর পর তিনি ভয়ে এমনই অভিভূত হইয়া পড়িলেন যে, তাঁহার আর এক পা-ও নড়িবার সামর্থ রহিল না। এই অবস্থায় তিনি বেশ লক্ষ্য করিলেন যে, বৃক্ষ হইতে অবতরণ এবং পদ্মাতীরে দৌড়ানো পর্যন্ত তাঁহার মনে ভয়ের লেশও ছিল না, কিন্তু সেখানে উপস্থিত হওয়ার পর তিনি ভয়ে একেবারে আড়ষ্ট হইয়া পড়িয়াছিলেন। এই অনুভূত সত্যটিকে তিনি একেবারে উড়াইয়া দিতে পারিলেন না, বরং এ বিষয়ে আরও গভীরভাবে অনুধাবন-পরায়ণ হইলেন। অভিনিবেশ সহকারে সমগ্র ঘটনাটির আনুপূর্বিক বিশ্লেষণে তিনি সেদিন মানুষের কর্ম ও আবেগের প্রকৃত স্বরূপ এবং তাহাদের পারস্পরিক পারম্পর্য বিষয়ক গভীর ও সূক্ষ্ম তত্ত্বের একটা সহজ ও সুস্পষ্ট জ্ঞান লাভ করিলেন।

আর একদিনের একটি ঘটনায় অনুকূলচন্দ্রের ঐ একই অভিজ্ঞতা লাভ হইয়াছিল। সেদিন জ্যোৎস্না-রাত্রিতে কতিপয় বন্ধুর সহিত মাঠে বেড়াইতে

বাহির হইয়া কিয়দ্দূর অগ্রসর হইবার পর তিনি বন্ধুগণ সহ দেখিতে পাইলেন, একটি প্রকাণ্ড সর্প বিস্তৃত ফণা তুলিয়া পথিমধ্যে দাঁড়াইয়া আছে। সাপটিকে দেখিবামাত্র তাঁহারা সকলে উহা লাফ দিয়া পার হইয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিতে লাগিলেন। কিছুকাল দৌড়ানোর পর ভয়ে তাঁহাদের শরীর অবশ হইয়া পড়িল, সকলেই একেবারে চলচ্ছক্তিহীন হইয়া পড়িলেন। এই ব্যাপারটির আদ্যন্ত অনুধাবন করিয়াও তিনি ইহাই বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহারা যখন সাপটা ডিঙাইয়া দৌড়াইতে আরম্ভ করিলেন, তখন কাহারও মনে ভয়ের বিন্দুমাত্র অস্তিত্ব ছিল না, কিন্তু ভয় আসিয়া উপস্থিত হইল বেশ কিছুক্ষণ দৌড়ানোর পর। পূর্বোক্ত এবং বর্তমান উভয় ঘটনার সম্যক্ পর্যালোচনা দ্বারা তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন যে, সব সময়েই মানুষের করাগুলি ঘটে আগে এবং তদনুযায়ী মনের আবেগুলি আসিয়া উপস্থিত হয় কার্যসম্পাদনের কিছুকাল পরে। ইহা হইতে তিনি এই অভিজ্ঞতা লাভ করিলেন যে যেহেতু কর্মের অনুরূপ ভাবের উদ্ভব হয়, অতএব মনে কোন ভাব জাগাইতে হইলে তৎপূর্বে তদনুরূপ কর্ম করা প্রয়োজন।

উপরি-উক্ত ঘটনা দুইটি সম্পর্কে অনুকূলচন্দ্র পরবর্তীকালে একদিন নিজেই কথাপ্রসঙ্গে বলিতেছিলেন—"আমি একবার একটা খেজুরগাছে উঠেছিলাম পাখীর ছানা ধরতে। গাছে উঠে গর্তে হাত দিয়ে হাত বের ক'রে দেখি, ইয়া মোটা কাল মিচ্‌মিচে একটা সাপ, তখন আলগোছে ওটা গর্তের মধ্যে ছেড়ে দিয়ে তাড়াতাড়ি নেমে পড়লাম। নেমে একটা দৌড় মারলাম। খানিক দৌড়ে এসে দেখি, ভয়ে আমার হাত-পা অবশ হ'য়ে এসেছে, আমি যেন আর চলতে পারছি না। এর আগ পর্যন্ত আমি কিন্তু ভয় ব'লে বোধ করিনি। দৌড়ে আসার পরই ভয়টা যেন পেয়ে বসলো। আর একবার রাস্তায় একটা সাপ ফণা তুলেছিল, তার উপর দিয়ে লাফ দিয়ে পার হ'য়ে খানিকটা দৌড়ে এসে ভয়ে জড়সড় হ'য়ে পড়লাম। যখন লাফ দিয়ে পার হয়েছি, তখন কিন্তু ভয় করেনি। বার বার ঐরকম দেখে আমার ধারণা হয়েছে যে, করা অনুযায়ী ভাব আমাদের ভিতর সৃষ্ট হয়। তাই করাটার উপর আমি অতখানি জোর দিই। ভিতরে ইচ্ছা নিয়ে করা, বলা, ভাবাটাকে যদি মক্‌স ক'রে চাগান যায়, অন্তররাজ্যের বিন্যাসও কতকটা তেমনতর হ'য়ে ওঠে।" ......আলোচনা-প্রসঙ্গে, ৩য় খণ্ড।

অপর একটি ঘটনা। ছেলেবেলায় অনুকূলচন্দ্রের রসগোল্লা খাওয়ার একান্ত লোভ ছিল। অর্থাভাবে অনেক সময় তিনি ময়রার দোকানে ধারে মিঠাই খাইতেন। সময়মত পাওনা টাকা না দেওয়ার জন্য দোকানী তাঁহাকে প্রায়শ অপমান করিত। একদিন এমন হইল যে, ময়রা তাঁহার গলায় গামছা দিয়া পাওনা আদায় করিবে বলিয়া তাঁহাকে যথেষ্ট শাসাইল। ইহাতে আত্মসম্মানে যথেষ্ট আঘাত লাগায়, কোনপ্রকারে অর্থ সংগ্রহ করিয়া সেদিন তিনি দোকানীর

প্রাপ্য পরিশোধ করিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে মনে মনে এই প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, জীবনে আর কোনদিন তিনি ধারে মিঠাই খাইবেন না, যেরূপেই হোক লোভ দমন করিয়া চলিবেন। কিন্তু অতঃপরও আর একদিন তাঁহার মনে রসগোল্লা খাওয়ার সেই লোভ প্রবলভাবে জাগিয়া উঠিল। সেদিন তাঁহার হাতে মাত্র সাড়ে পাঁচ আনার পয়সা ছিল। তাহাই লইয়া তিনি ময়রার দোকানের দিকে অগ্রসর হইলেন। এদিকে পথ চলিতে চলিতে পূর্বকৃত প্রতিজ্ঞার কথা স্মরণ হওয়ায় তাঁহার মনোমধ্যে এক ভীষণ দ্বন্দ্ব উপস্থিত হইল।—রসগোল্লা খাওয়ার দারুণ লোভ তাঁহাকে দোকানের দিকে লইয়া যাইতে চাহে, অন্যদিকে শুভ বিবেকবুদ্ধি তাঁহাকে যাইতে বাধা দেয়। এই অবস্থায় বালক অবশেষে রাস্তার ধারে এক অড়হর ক্ষেতে শুইয়া পড়িলেন এবং মনে মনে এই বলিয়া দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিলেন,—আমি কিছুতেই উঠব না, দোকানের দিকে যাব না, দেখি কে আমায় নিয়ে যায়। কিন্তু বলিতে কি, শেষ পর্যন্ত প্রবল লোভ-রিপুরই জয় হইল। তিনি অড়হর ক্ষেত হইতে উঠিয়া দোকানের দিকে যাওয়ার জন্য উদ্যত হইলেন, কিন্তু তন্মুহূর্তেই আবার তাঁহার চিত্তশক্তিও সদিচ্ছা-প্রণোদিত হইয়া সক্রিয় হইয়া উঠিল। এই অবস্থায় তিনি কতকগুলি অড়হর গাছ সজোরে আঁকড়াইয়া ধরিলেন এবং পুনরায় মাটির উপর শুইয়া পড়িলেন। এই সময় প্রবল ইচ্ছাশক্তির প্রভাবে তাঁহার দৈহিক বল এত বৃদ্ধি পাইয়াছিল যে, তাঁহার মুষ্টিবদ্ধ শক্ত অড়রহ গাছগুলি ছিঁড়িয়া গেল। এদিকে প্রবৃত্তির তাড়না ও সংযমের প্রেরণা—এই দুই পরস্পর বিরোধী-শক্তির মধ্যে তুমুল সংগ্রাম চলিতে লাগিল। এইভাবে প্রায় ঘণ্টাকালব্যাপী ধস্তাধস্তির পর তাঁহার মনের সে প্রবল ঝড় কিঞ্চিৎ প্রশমিত হইল, সংযমের বলে তিনি তাঁহার চিত্তকে শান্ত করিলেন—প্রবৃত্তি-জয়ের কৌশলটিও তখন তাঁহার আয়ত্তে আসিল। তিনি বুঝিলেন,—প্রবৃত্তি সক্রিয় হইয়া উঠিলে তৎক্ষণাৎ কার্যান্তরে আবদ্ধ হইয়া তাহাকে নিরস্ত করিতে-হয়।

পরদিবস ঠিক ঐ সময়ে অনুকূলচন্দ্রের মনে আবার সেই বাসনার উদয় হইলে, তিনি কোন অছিলায় তাঁহার জনৈক প্রতিবেশীর সঙ্গে এক বিবাদের সৃষ্টি করিয়া কোনমতে সময়টা কাটাইয়া দিলেন। এইভাবে দিনের পর দিন মাসের পর মাস তিনি প্রবৃত্তি-জয়ের জন্য কঠোর সংগ্রাম চালাইলেন। বলিতে কি, যখনই ঐ প্রবৃত্তি-বেগ আসিয়া তাঁহার মনে উপস্থিত হইত, তিনি তৎক্ষণাৎ কোন একটা কাজের আশ্রয় লইয়া মনটাকে তৎকালের জন্য উক্ত চিন্তা হইতে বিরত রাখিবার চেষ্টা করিতেন। এইরূপে অবিরাম চেষ্টার ফলে তিনি সেই দুর্দমনীয় লোভ-রিপুকে সম্পূর্ণরূপে আপন বশে আনিতে সমর্থ হইলেন। শুনিতে পাই, অতঃপর একাদিক্রমে দীর্ঘ তিন বৎসর তিনি রসগোল্লা আর স্পর্শ করেন নাই। বলা বাহুল্য, সেজন্য কোনদিন তাঁহার মনে কোন ইচ্ছাও আর জাগে নাই। এই ঘটনার অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে অনুকূলচন্দ্র পরবর্তীকালে নিজেও

বাল্যস্মৃতির আলোচনা-প্রসঙ্গে অনেক সময় বলিয়াছেন। প্রবৃত্তি দমনের এই অমোঘ কৌশলটি সম্বন্ধে উপদেশ-প্রসঙ্গে তিনি একদিন বলিতেছিলেন,— "যে-কোন প্রবৃত্তিকেই বশে আনা যায়। প্রবৃত্তির খেয়াল যেই চাপে, সেই মুহূর্তেই অন্য কোন প্রীতিকর সৎকাজে আত্মনিয়োগ ক'রে শরীর-মনকে ও-থেকে দূরে রেখে দিতে হয়, তাহ'লে আস্তে আস্তে ওটা তখনকার মত উবে যায়। যখন ঐ আবেগ পেয়ে বসতে চায়, তখন তখনই ঐ রকম করতে হয়। বার বার ঐ রকম করতে করতে প্রবৃত্তির বন্ধন ঢিলে হ'য়ে পড়ে। ছোট্ট একটু জিনিষ, এইটে তোমরা যদি কাজে লাগাও এবং অন্যকেও শিখিয়ে দাও, তাহ'লে দেখবে প্রবৃত্তি-জয় কত সহজ। আমি অনেককে একথা বলেছি, অনেক মাতাল, অনেক দুশ্চরিত্র এই সামান্য তুকটা প্রয়োগ ক'রে ভাল হ'য়ে গেছে। তবে ইচ্ছা ও অনুশীলন একসঙ্গে দু'টি জিনিষ থাকা চাই।

বাস্তব ঘটনা হইতে অনুকূলচন্দ্রের অভিজ্ঞতা-সংগ্রহের আর একটি কাহিনী। অনুকূলচন্দ্র তখন দ্বাদশ-বর্ষীয় বালক। প্রত্যহ সকাল-সন্ধ্যায় তিনি বাড়ীর নিকটবর্তী বাজিতপুর স্টীমার-ঘাটে বেড়াইতে যাইতেন। বালক লক্ষ্য করিতেন, ঘাটের কুলিরা প্রতিদিন পেটের দায়ে মাথার ঘাম পায় ফেলিয়া দিবারাত্র কি কঠোর হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রমই না করে! কুলিরা কিরূপে জীবন যাপন করে, ভারী ভারী মালগুলি বহিয়া নিতেই বা তাহাদের কিরূপ কষ্ট হয়, স্বয়ং বাস্তব-ভাবে জানিবার জন্য তিনি কিছুদিন ঐ ঘাটে কুলিদের সঙ্গে নিবিড়ভাবে মিশিয়া নিজেও কুলির কার্য করিয়াছিলেন। যাত্রীরা তাহাকে পারিশ্রমিক বাবদ কিছু দিতে চাহিলে, তিনি তাহা প্রত্যাখ্যান করতঃ ছুটিয়া পলাইতেন। কখনও কেহ তাঁহাকে জোর করিয়া কিছু গছাইয়া দিলেও, অন্য কুলিকে তিনি তাহা দিয়া ফেলিতেন। ঘাটে কুলির অভাবে কাহাকেও বিপন্ন দেখিলেই তিনি ছুটিয়া গিয়া তাহার মালপত্র বহনের কার্যে লাগিয়া যাইতেন। অনভ্যাসের দরুণ বোঝাগুলি বহিয়া নিতে তাঁহার প্রাণান্ত কষ্ট হইত, কিন্তু তবু তিনি ছাড়িতেন না। এখনও সময় সময় তাঁহার সেই অভিজ্ঞতার কথা বলিয়া থাকেন,—"এক-একটা ভারী বোঝা নেওয়ার সময় মনে হতো, মাথাটা যেন গলার ভিতর ঢু'কে গেল।" একদিনের ঘটনা। ঘাটে সেদিন যাত্রীর খুব ভিড় ছিল। বালক একজন যাত্রী-ভদ্রলোকের একটি বড় ভারী ট্রাংক ও একটি বালতি লইয়া চলিয়াছেন। খাড়া সিঁড়ি বাহিয়া ডেকের উপরে উঠিবার সময় যাত্রীর চাপে তাল সামলাইতে না পারায়, হঠাৎ পা ফসকাইয়া যাওয়ায় বালতিটি তাঁহার হাত হইতে পড়িয়া যায়। ইহাতে জিনিষপত্রের কোন ক্ষতি না হইলেও, ভদ্রলোকটি ভীষণ কুপিত হইয়া বালককে কুৎসিত ভাষায় গালাগালি করেন এবং তাঁহাকে সবুট লাথি মারিতে উদ্যত হন। বালক নতমস্তকে নীরবে তাঁহার শাসন মানিয়া লইয়া বোঝাটা কোনমতে অতিকষ্টে নামাইয়া রাখিয়া প্রস্থান করিলেন।

উল্লিখিত ঘটনায় নিজ অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে অনুকূলচন্দ্র পরবর্তীকালে একদিন কথাপ্রসঙ্গে মন্তব্য করিয়াছিলেন,—"মানুষের কার কি সমস্যা সেটা যথাযথ অনুধাবন না ক'রে আমরা যদি নিজেদের ভাবটা অন্যের উপর আরোপ ক'রে তার সমাধান করতে চাই নিজেদের রকমে, তাতে কারুর সত্যিকারের উপকার হয় না। কুলিদের খাটুনি দেখে আমার অনেক সময় কষ্ট হ'তো। ভাবতাম, ওদের কত অসুবিধা! তাই আমি নিজে কিছুদিন ওদের সঙ্গে মিশে কুলিগিরি ক'রে দেখেছি। দেখলাম, ওরা আয় করে প্রচুর। তা-ছাড়া ওরা বেশ সুখী। মাজিত উন্নত ধরণের জীবন-যাপনের চাহিদার বালাই ওদের নাই। খেয়ে দেয়ে স্ফূর্তি ক'রে স্থূলভাবে জীবন কাটিয়ে দিতে পারলেই সুখী। আমরা ওদের যা problem মনে করি, সে-সব ওদের problem নয়। অথচ আমাদের কল্পিত ধারণা নিয়ে আমরা ওদের জন্য হৈ চৈ করি, আন্দোলন করি। এত আন্দোলন আমরা করি, কিন্তু তাদের সত্যিকারের কল্যাণ যাতে হবে, সেই মূলে আন্দোলন করি না।

····· আলোচনা-প্রসঙ্গ, প্রথম খণ্ড

পূর্ববর্তী অধ্যায়ে বাল্যকাহিনী আলোচনা-প্রসঙ্গে আমরা অনুকূলচন্দ্রের মাতৃভক্তির কথা বলিয়াছি। বালকের বয়ো-বৃদ্ধির সঙ্গে তাহা কেমন সমুজ্জ্বলরূপে প্রকট হইয়াছিল, তাঁহার বিদ্যালয়-জীবনের দৈনন্দিন অতি সাধারণ ঘটনায়ও তাহার প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। মাতৃভক্ত অনুকূলচন্দ্র জননীদেবীর যে-কোন কঠোর আদেশও দেবতার আশীর্বাদের মত মাথায় করিয়া লইতেন। বলিতে কি, মাতৃদেবীর নির্দেশ তিনি বেদবাক্য-তুল্য অভ্রান্ত বলিয়া মনে করিতেন। এ সম্বন্ধে একটি ঘটনার কথা বলিতেছি।—

একদিন কোন কারণে বালকের পা কাটিয়া যাওয়ায় ক্ষতস্থান হইতে রক্ত পড়িতে থাকে। অসহ্য বেদনায় তিনি কাতর হইয়া পড়েন। এই অবস্থায় স্কুলে যাওয়া তাঁহার কাছে অসম্ভব বোধ হইল। জননীদেবী এই সময় হঠাৎ সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বালকের অবস্থা তাঁহার নজরে পড়িলে তিনি তাঁহাকে বলিলেন,—"ও কিছু নয়, যা তাড়াতাড়ি স্কুলে চ'লে যা।" কি আশ্চর্য! মায়ের কথা শুনিবামাত্র বালকের মনেও এই দৃঢ় ধারণা হইল,—মা যখন বলেছেন, আমার কিছু হয় নাই, তখন বাস্তবিকই আমার কিছু হয় নাই। এই অবস্থায় তীব্র ব্যথা-বেদনার কথা একেবারে ভুলিয়া গিয়া ক্ষতযুক্ত পা লইয়াই তিনি আনন্দিত মনে স্কুলে গমন করিলেন।

আর একদিনের কথা। সেদিন বালকের অঙ্ক-পরীক্ষা। স্নানাহার সারিয়া স্কুলে রওনা হইতে তাঁহার একটু বিলম্ব ঘটে। ইহাতে জননীদেবী বলিলেন,—"এত দেরীতে যাচ্ছিস্, আজ আর তুই পরীক্ষায় পারবি না।" বালক স্কুলে গিয়া প্রশ্নপত্রটি পড়িয়াই কাঁদিতে লাগিলেন। শিক্ষক মহাশয় তাঁহাকে ক্রন্দনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি বলিলেন,—"আমার মা বলেছেন, আজ আমি পরীক্ষায়

উত্তর করতে পারব না। কিন্তু, আমি দেখছি, অঙ্কগুলি সবই আমি কষতে পারি। যদি উত্তর করি, তবে যে আমার মার কথা মিথ্যা হ'য়ে যাবে। আমি কি করব ?" বালকের মুখে এইরূপ অদ্ভুত কথা শুনিয়া শিক্ষক মহাশয় অবাক হইলেন। মাকে খুশী করার জন্য বরং তাহার ভাল করিয়া পরীক্ষা দেওয়া উচিত—একথা শিক্ষক মহাশয় তাহাকে কতভাবে বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু মাতৃবাক্য বালকের তরুণ মনে এমনই গভীর রেখাপাত করিয়াছিল যে, উত্তরগুলি সবই তাঁহার জানা থাকা সত্ত্বেও এবং শিক্ষক মহাশয় শত উপদেশ দিলেও মাতৃবাক্য অসত্য হইবে এই ভয়ে, তিনি আর সেদিন প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার কোনও চেষ্টা করিতে পারিলেন না।

মায়ের প্রতি বালকের এমনি একটা প্রাণকাড়া টান ছিল যে, কখনও কোন কারণে মায়ের কঠোর শাসন-তিরস্কার লাভ করিলেও, তাঁহার চিত্তে ক্ষণিকের জন্যও কোনরূপ বিরূপ মনোভাবের সৃষ্টি হইত না। বরং বলিতে কি, তাঁহার বুভুক্ষু অন্তরাত্মা মাতৃদেবীর আদর-সোহাগ এবং সঙ্গসুখ লাভের উদগ্র আকাঙ্ক্ষায় সদাই উন্মুখ হইয়া থাকিত। অনুকূলচন্দ্রের পরবর্তীকালের বহু কথায় তাঁহার ঈদৃশ মনোভাবের সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। কথা প্রসঙ্গে একদিন তিনি বলিতেছিলেন,—

"আমার জীবনের একমাত্র নেশা ছিল মাকে খুশী করা। আমার বুদ্ধি-বিবেচনা-শক্তিমত বরাবর সেই চেষ্টা করেছি। আমার লোভ ছিল, মার কাছ থেকে বাহবা পাওয়ার, তাঁর আদর পাবার। কিন্তু মা ছিলেন আমার প্রতি বড় কড়া, তাঁর শাসন ও ভর্ৎসনা পেয়েছি অজস্র, তাঁর সোহাগের জন্য ক্ষুধা থাকলেও তেমন পাইনি তা'। তাহ'লে কি হবে ? মা ছাড়া যে আমার অচল। মা যতই অসন্তুষ্ট হউন, রুষ্ট হউন, কেবল এৎফাক খুঁজতাম, কেমন ক'রে মাকে তুষ্ট করব। ঐ ছিল আমার ধান্ধা। প্রতিকূল অবস্থায় ছেড়ে দেবার বুদ্ধি আমার কোনকালে হয় না। তখন আমায় গোঁ চেপে যায়, কেমন ক'রে সেটাকে আয়ত্তে আনব। ছেলেবেলায় পাড়ার সকলেই ছিল আমার অভিভাবক। খামাকা কতজনে কান চেপে ধ'রে দুটো চড় দিয়ে ছেড়ে দিত। সেখানে দোষ হয়ত আমার কিছুই নেই। অন্য কারও দোষের কথা যে কব, তা'ও আমার কখনও মন চাইত না। অনেকে আজেবাজে কথা মার কাছে এসে লাগাত। মাও চালাতেন একচোট। এই রকম যতই ঘটুক, আমি কখনও হতাশ হতাম না, নিরাশ হতাম না। ভাবতাম, আমি আমাকে এমনভাবে তৈরী করব, এমনভাবে চলব, যা'তে এর অবকাশ না ঘটে।"

……আলোচনা-প্রসঙ্গে, ৩য় খণ্ড

অন্য একদিন বলিতেছিলেন,—

"আমি বড় হব, আমাকে মানুষে বড় করবে—সে কল্পনা আমার কোন দিনই নাই। ওই ধারণায় আমি ব্যক্তিগতভাবে কোন সুখ পাই না। তবে হ্যাঁ! মার কাছে মানুষে সুখ্যাতি করলে মা সুখী হবেন, মা আমাকে বাহাদুর ছেলে ব'লে বাহাবা দেবেন, সে লোভ আমার ছিল। লোভ থাকলে কি হবে, মা যেন কিছুতেই আমার উপর প্রসন্ন হতেন না। আমি যেন অপরাধ ক'রেই আছি তাঁর কাছে। কিন্তু তবু আমি হাল ছাড়তাম না, নাছোরবান্দা হ'য়ে লেগে থাকতাম মাকে খুশী করবই। মার হয়ত আমাকে না হ'লে চলতে পারতো, আমার কিন্তু মা ছাড়া চলারই উপায় ছিল না। তাই মার খুশীর ধান্ধায় ঘুরতেই হ'তো আমাকে।"

মাতৃদেবীর উক্তরূপ কঠোর আচরণের কথা অনুকূলচন্দ্রের নিম্নোদ্ধৃত বাল্য-রচনাটিতেও সুস্পষ্টরূপে প্রকাশ পাইয়াছে। যথা—

It was written when my mother chid me.

কেন গো মা হেন ভাব সন্তানের প্রতি,
কি দোষ করেছি মাগো চরণ কমলে ?
সদাই কেন গো হেন কোপ মম প্রতি,
সদা গালাগালি কেন কর বরিষণ ?
আমি কি গো পুত্র নয় তোমার জননী,
গর্ভে কি গো ধরনি মা অভাগা সন্তানে ?
আর আর যত তব পুত্রদের প্রতি,
সদাই সন্তোষ ভাব দেখাও জননী।
তারা যদি কাছে এসে ডাকে মা মা বলি,
প্রশান্ত হৃদয়ে মাগো উত্তর প্রদান।
আমি যদি কাছে এসে ডাকি মা মা বলি,
মোর ভাগ্যে শুধু ছাই দন্ত কড়মড়ি।
পিতার নিকটে যদি যাই গো জননী,
মিষ্ট কথা শুনিবারে মনের উল্লাসে,
তিনিও কঠোর বাক্য প্রয়োগি আমারে,
দূর ক'রে দেন মোরে সে স্থান হইতে।
মিষ্ট কথা ভালবাসি আমি গো জননী,
তাই সাধ যায় মম মিষ্ট শুনিবারে।
যেই গো জননী মোরে বলে মিষ্ট ভাব,

অমনি তাহার আমি হই পদানত।
ঈশ্বরের কেন গো মা এ কঠিন রীতি
যে-জন যাহা চায় তাহা নাহি পায় কেন?

যেমনি অপূর্ব মাতৃভক্তি তেমনি পিতৃদেবের প্রতি অসাধারণ শ্রদ্ধা ও ভালবাসায় তাঁহার অন্তরখানা সর্বদা ভরপুর থাকিত। তাঁহাদের প্রতি অপরিসীম শ্রদ্ধাভক্তির ভাব সর্বক্ষণ স্মরণে ও মননে রাখিয়া তিনি এমনি বিভোর থাকিতেন যে, তাঁহার তৎকালীন রচনাবলীতেও তাঁহার অন্তরের সে সকল দিব্য ভাবরাজি অতি সহজ ও স্বাভাবিকভাবেই আত্মপ্রকাশ না করিয়া পারে নাই।

নিম্নের উপদেশপূর্ণ সারগর্ভ কবিতার প্রতিটি ছত্রে পিতৃভক্তি ও মাতৃনিষ্ঠার গভীর মর্মবাণী কেমন ব্যাকুল উদাত্ত ভাষায় বারংবার ঘোষিত হইয়াছে।

মাতাপিতাই দেবতা

দেখিতে কি পাও জীব এ মহীমণ্ডলে।
ঈশ্বর কাহার নাম লোকে যারে বলে॥
তুমি যদি সে ঈশ্বরে দেখিতে নারিলে।
কেমনে ফেলিবে ফুল সে পদকমলে॥
মাতাপিতা দেব দেবী এই ধরাতলে।
পূজ জীব তাঁদের তুমি ভক্তিফুলদলে॥
তাঁদের পূজিলে যাবে মনোবিকার।
ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ পাবে অনিবার॥
যেই জন মাতৃপূজা করে ধরামাঝে।
কি করে শোকে দুঃখে আর মায়া-সবে॥
নিয়ত প্রফুল্ল চিত্ত থাকিবেক তার।
স্থাপহ হৃদয় মাঝে মূরতি তাঁহার॥
মাতৃপূজা কর জীব কর্ম যাবে কাটি।
অনায়াসে পাবে স্বর্গ বলিলাম খাঁটি॥
ধরণী উপরে তুমি যে দিকে চাইবে।
পিতামাতা ভিন্ন তুমি কিছু না দেখিবে॥
পিতামাতা সর্বময় দেখ নিরখিয়া।
পূজহ তাঁদের জীব খুলে দিয়া হিয়া॥

মাতা স্বর্গ মাতা ধর্ম মাতাময় সব।
মাতা ভিন্ন এ জগতে সকলই শব ॥
সৃজন পালন তাঁরা করেন জগতে।
তাঁরা ভিন্ন এ জগতে কে পারে রক্ষিতে?
জ্বালহ প্রদীপ জীব হিয়ার মাঝারে।
সমস্যা সকল তুমি ফেলে দাও দূরে ॥
যদি জীব ঘরে বসে চাও সিদ্ধ হতে।
মা-রবটি কর সার এ ছার জগতে ॥
মা ব'লে পরাণ ভরে ডেকে দেখ দেখি।
ইহা ছাড়া কিছু নাহি চাবে প্রাণপাখী ॥
যতই ডাকিবে জীব প্রাণ যাবে গলে।
মনে হেন বোধ হবে হাতে স্বর্গ পেলে ॥
মা-রবটি প্রাণভরে কর উচ্চারণ।
যাতনা সকল যাবে ছোঁবে না শমন ॥
সশরীরে দেব দেবী থাকিতে মহীতে।
নিরাকার দেবে জীব চাও গো পূজিতে?
এখনও বলি গো তোরে ওরে ভ্রান্ত মন।
ভ্রান্তি-অতলগর্ভে পড়ো না কখন ॥
মাতৃপদ কর সার এ ছার জগতে।
তুমি যদি সুখালয়ে চাও গো যাইতে ॥
মা মা বলে প্রাণ-খুলে ডাক উচ্চস্বরে।
শমন তোমার কাছে রবে জোড় করে ॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর যত দেবগণ।
মা-রব তাঁদের কাছে অমূল্য রতন ॥
এ হেন সাকার দেবে নাহি পূজে যেই।
নিকট শমন তার জানে যেন সেই ॥

বালকের রচিত নিম্নোদ্ধৃত সঙ্গীতটিতেও তাঁহার মাতৃভক্তির অত্যুজ্জ্বল পরিচয় পাওয়া যায়,—

মাতৃসঙ্গীত

মা বলে মন ডাক না ওরে
মায়ের পূজো কর না ভাই।
মায়ের গর্ভে জনম লয়ে
ভবের শোভা দেখতে পাই।
অসার সংসার মাঝে
মা-নামের অর্থ বুঝে
মা মা বলে কুতূহলে
সাগরে ঝাঁপ দে না ভাই॥

নারীমূর্তি দর্শনে জনৈক অনাথ বালকের অন্তরের উচ্ছ্বলিত আবেগের এক-খানা জীবন্ত ছবি ফুটিয়া উঠিয়াছে নিম্নের কবিতাটিতে। বালক-কণ্ঠের বিষাদ-মাখা করুণ বিলাপ লেখক অনুকূলচন্দ্রেরই জনকজননীপ্রাণ সমবেদনাময় অন্তরাত্মার মর্মধ্বনি মাত্র। কবিতাটি অতিশয় দীর্ঘ বলিয়া আমরা নিম্নে তাহার কয়েকটি মাত্র স্তবক উদ্ধৃত করিলাম।

পিতৃমাতৃহীন বালক

একটু দাঁড়াও দেবী একটু দাঁড়াও
একটু দাঁড়িয়ে হেথা
দেখ মোর মনোব্যথা
সান্ত্বনা করহ মোরে একটু দাঁড়াও
একটু দাঁড়াও দেবী একটু দাঁড়াও॥
হের মোর মুখখানি
ভরা যেন দুঃখ-খনি
তুলে দাও দুঃখগুলি একটু দাঁড়াও
একটু দাঁড়াও দেবী একটু দাঁড়াও॥
ভক্তির পুতলী মোর
মাতাপিতা স্নেহডোর
চলে গেছে, দেবী তুমি একটু দাঁড়াও
একটু দাঁড়াও দেবী একটু দাঁড়াও॥

মায়ের মুরতি যেই
তোমার মুরতি সেই
মা ব'লে ডাকিব তোমা একটু দাঁড়াও
একটু দাঁড়াও দেবী একটু দাঁড়াও ॥
মা বলিতে বড় সাধ
তাহাতে না সেধ বাদ
পুরাইব সাধ আজি একটু দাঁড়াও
একটু দাঁড়াও দেবী একটু দাঁড়াও ॥
পুত্র বলি ডাক মোরে
শুনে ভাসি সুখ-নীরে
মিটে যাক আশা মোর একটু দাঁড়াও
একটু দাঁড়াও দেবী একটু দাঁড়াও ॥
ডাকি তব মুরতিরে
মা ব'লে কাতর স্বরে
হৃদয়-বেদনা যাক একটু দাঁড়াও
একটু দাঁড়াও দেবী একটু দাঁড়াও ॥
অনন্ত দুঃখের প্রাণ
হেয় বলি হয় জ্ঞান
মা বলে সার্থক করি একটু দাঁড়াও
একটু দাঁড়াও দেবী একটু দাঁড়াও ॥
ওকি দেবী গেলে চলে
দাঁড়ালে না পুত্র ব'লে—
যেও না যেও না দেবী একটু দাঁড়াও
একটু দাঁড়াও দেবী একটু দাঁড়াও ॥
শুন মরমের বাণী
কণ্ঠাগত মোর প্রাণী
পায় ধরি দেবী তব একটু দাঁড়াও
একটু দাঁড়াও দেবী একটু দাঁড়াও ॥
থাকিলে আমার মাতা
কোলে করি মনোব্যথা
জুড়াইয়া দিত দেবী একটু দাঁড়াও
একটু দাঁড়াও দেবী একটু দাঁড়াও ॥

বিধি মোর নিদয় হ'য়ে
মাতাপিতা কেড়ে নিয়ে
অনাথ করেছে দেবী একটু দাঁড়াও
একটু দাঁড়াও দেবী একটু দাঁড়াও ॥
বাল্যাবধি মা আমার
ছেড়ে গেছে অভাগার
মা বলার কেহ নাই একটু দাঁড়াও
একটু দাঁড়াও দেবী একটু দাঁড়াও ॥
তাই সাধ দেবী তব
একবার মা ডাকিব
আহ্লাদে ভাসিবে প্রাণ একটু দাঁড়াও
একটু দাঁড়াও দেবী একটু দাঁড়াও ॥
কেন দেবী চ'লে গেলে
ডাকিলে না পুত্র বলে
কেন বা নিদয় হ'লে একটু দাঁড়াও
একটু দাঁড়াও দেবী একটু দাঁড়াও।*

আজন্মলব্ধ নিবিড় মাতৃভক্তির ফলে স্ত্রীজাতির উপর বাল্যকাল হইতেই অনুকূলচন্দ্রের এমনি একটা সহজ শ্রদ্ধার ভাব বিকশিত হইয়াছিল যে নারী মাত্রকেই তিনি স্বীয় গর্ভধারিণী জননী জ্ঞানে ভক্তিবিনম্রচিত্তে মান্য করিয়া চলিতেন। রমণীমাত্রেই মাতৃচেতনার এই সহজ সংস্কারটি তাঁহার যৌবনের একটি চরম দুর্ঘটনায় কিরূপে মহনীয় মঙ্গলরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল তাহা আলোচনা করিলে বিস্ময়-বিমুগ্ধ শ্রদ্ধায় চিত্ত আপ্লুত হয়। কাহিনীটি নিম্নে বিবৃত হইতেছে।

অনুকূলচন্দ্র তখন কলিকাতায় মেডিক্যাল স্কুলের ছাত্র। তাঁহার কমনীয় দেহকান্তি এবং রমণীয় স্বভাবচরিত্রে আকৃষ্ট হইয়া বহু সমপাঠী বন্ধু তাঁহার কাছে আসিয়া জটিত। অনুকূলচন্দ্র সারাদিনই অধ্যয়ন এবং পারিপার্শ্বিকের সেবাকার্য লইয়া ব্যস্ত থাকিতেন বলিয়া তাহাদের সহিত গল্পগুজব বা আমোদ-প্রমোদে

*অনুকূলচন্দ্র তাঁহার রচিত এই কবিতাটি ঢাকা জিলার আমিরাবাদ হইতে ময়মনসিংহ জিলার যশোদল ডাকঘরের অন্তর্গত দামপাড়া গ্রামের অধিবাসী তাঁহার অনেক সহপাঠী বন্ধু মহিমচন্দ্রের নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন।

সময় দিবার বিশেষ সুযোগ করিয়া উঠিতে পারিতেন না। কোনদিন একটু অবসর পাইলে, তিনি নির্জন গঙ্গাতীরে গিয়া সূর্যাস্তের শোভা দর্শন ও নির্মল বায়ু সেবনে দেহমনের শ্রান্তি অপনোদন করিতেন। বলা বাহুল্য, সঙ্গীদের অনেকেরই তাহা ভাল লাগিত না। উহাদের মধ্যে আবার কয়েকজন ছিল অতীব দুশ্চরিত্র। তাহারা গঙ্গার ঘাটে স্নানরতা মহিলাগণের প্রতি অশোভন দৃষ্টিপাত করিত এবং তাঁহাদের লইয়া অশ্লীল হাস্য-পরিহাস করিত। বন্ধুগণের ঈদৃশ অশিষ্ট আচরণে অনুকূলচন্দ্র মনে বড় ব্যথা পাইতেন। তাহাদের হীন মনোবৃত্তি সংশোধনের জন্য অনেক সময় তিনি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া যথেষ্ট চেষ্টাও করিতেন। বলিতে কি, তাঁহার এই কল্যাণ-প্রয়াস বন্ধুগণের বিরক্তিরই কারণ হইত। পরিশেষে এমন অবস্থা ঘটিল যে, তাহারা ঈর্ষা ও আক্রোশের বশে তাঁহার ভীষণ শত্রু হইয়া দাঁড়াইল এবং যেভাবেই হউক তাঁহাকে জব্দ করিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিল। অবশেষে কয়েকজন মিলিত হইয়া গোপনে পরামর্শ করিয়া স্থির করিল,—অনুকূল কিরূপ চরিত্রবান একবার আমরা দেখে নিব। সরলপ্রাণ অনুকূলচন্দ্র বন্ধুদের সে হীন ষড়যন্ত্রের কথা কিছুই জানিতেন না।

একদিন সান্ধ্যভ্রমণের উদ্দেশ্যে অনুকূলচন্দ্র তাঁহার গ্রে-স্ট্রীটের বাসা হইতে যাত্রা করিয়া শোভাবাজার হইয়া কাশী মিত্রের ঘাটের দিকে অগ্রসর হইতেছেন, এমন সময় উক্ত অসচ্চরিত্র যুবকবন্ধুদের দুইজন বেড়াইতে বেড়াইতে তাঁহার নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইল। পথিমধ্যে এক ভদ্রলোকের নিকট হইতে বাড়ীভাড়ার টাকা আদায় করিয়া লইয়া উহারাও তাঁহার সঙ্গে নদীর ধারে বেড়াইতে যাইবে,—এরূপ প্রস্তাব করতঃ বন্ধুরা অনুকূলচন্দ্রকে তাহাদের সঙ্গে যাইতে অনুরোধ জানাইল। সরল বিশ্বাসে খুশী মনে তিনিও রাজী হইলেন। কিছুক্ষণ নানা অজানা-অচেনা অলি-গলি ঘুরিয়া তাহারা অবশেষে চিৎপুর রোডের মোড়ে এক বেশ্যাপল্লীতে আসিয়া উপস্থিত হইল। এতক্ষণে সঙ্গীদের দুরভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া অনুকূলচন্দ্র চমকিয়া উঠিলেন। তিনি সেস্থান হইতে কতক্ষণে সরিয়া পড়িবেন, সেজন্য অস্থির হইয়া পড়িলেন। কিন্তু সঙ্গীরা তাঁহাকে নড়িবার একটুও সুযোগ দিতেছিল না। অতঃপর তাহারা তাঁহাকে জোর করিয়াই ধরিয়া রাখিল। অনুকূলচন্দ্র তখন অনন্যোপায় হইয়া একবার স্নেহকঠোর দৃষ্টিতে সঙ্গিদ্বয়ের দিকে চাহিলেন এবং নিজেকে তাহাদের কবলমুক্ত করিতে আপ্রাণ চেষ্টা আরম্ভ করিলেন। সঙ্গীরাও আর তাঁহাকে ধরিয়া রাখিতে পারিতেছিল না। অবশেষে বেগতিক দেখিয়া তাহারা তাঁহাকে দৃঢ় বাহুপাশে আবদ্ধ করতঃ কাঁধে লইয়া ঝুলাইতে ঝুলাইতে দ্রুতবেগে দৌড়াইয়া একটি দ্বিতল বাড়ীর উপরে উঠিয়া গেল। উহা ছিল এক বারবনিতার গৃহ। এইবার অনুকূলচন্দ্র চিৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন,—"তোরা আমায় কোথায় নিয়ে এলি ভাই? তোদের দু'টি পায়ে পড়ি, আমায় ছেড়ে দে।" এই সময় কোন-গতিকে একবার ছাড়া পাইয়া যেমন তিনি সিঁড়ি বাহিয়া ত্বরিতপদে নিচে নামিয়া যাইতেছেন, একজন যুবক

বেগে দৌড়াইয়া গিয়া তাঁহাকে ধরিয়া ফেলিল। তাহারা তখন উভয়ে একযোগে সর্বশক্তি প্রয়োগে তাঁহাকে দৃঢ় বাহুবন্ধনে আবদ্ধ করিয়া একটি কক্ষের মধ্যে আনিয়া মেজের উপর ধপাস্ করিয়া ফেলিয়া দিল।

পূর্ব-বন্দোবস্তমত সেখানে কয়েকজন বারবিলাসিনী যুবতী উপস্থিত ছিল। তাহাদের কুৎসিত ভাবভঙ্গী ও অসংবৃত বেশবাস দেখিয়া অনুকূলচন্দ্র হতভম্ব হইয়া গেলেন। একটি রমণী অগ্রসর হইয়া হাস্য-পরিহাসপূর্বক নানারূপ অশ্লীল রসিকতার অবতারণা করিয়া তাঁহাকে স্বাগত জানাইল। ক্ষোভে, দুঃখে ও অপমানে তাঁহার শিরায় শিরায় তপ্ত শোণিত-স্রোত প্রবাহিত হইতে লাগিল। এই মহা সংকট-মুহূর্তে অমিত মনোবলে বলীয়ান অনুকূলচন্দ্র আকুলকণ্ঠে বজ্রনাদে 'মা' 'মা' বলিয়া চিৎকার করতঃ চতুর্দিক প্রকম্পিত করিয়া তুলিলেন। আবেগ-উদ্দীপ্ত কণ্ঠে তখন তিনি উন্মত্তবৎ কত-কি বলিতে লাগিলেন।—"মা, তোদের সন্তানের অপমান হবে, সন্তানের অনিষ্ট হবে, সন্তান বিধ্বস্ত হবে, আর মা হ'য়ে তোরা তাই দেখবি? তোদের সন্তান জাহান্নমে যাবে, আর মায়ের জাত হ'য়ে, মা হ'য়ে তাই নীরবে সইবি?……।" বলিতে বলিতে তাঁহার কণ্ঠ রোধ হইয়া আসিল, তিনি অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া গেলেন। জলাশয়-বক্ষে সহসা লোষ্ট্র নিক্ষেপ করিলে তৎস্থানের জলরাশি যেমন চতুর্দিকে ছিটকাইয়া পড়ে, তাঁহার আবেগপূর্ণ গম্ভীরনাদী পবিত্র মাতৃ-সম্বোধন এবং উচ্ছ্বসিত কণ্ঠোচ্চারিত মর্মস্পর্শী বাক্যাবলী শ্রবণমাত্র অর্ধনগ্ন রমণীগণ ভীত সন্ত্রস্ত ও সংকুচিত চিত্তে তেমনই ইতস্ততঃ ছুটিয়া পলায়ন করিল। গৃহকর্ত্রী বেশ্যাটি স্তব্ধ, বিহ্বল ও হতবাক্ অবস্থায় নিশ্চল দাঁড়াইয়া রহিল। সংজ্ঞা ফিরিয়া আসিলে অনুকূলচন্দ্র দেখিতে পাইলেন,—উক্ত গৃহকর্ত্রী তাঁহার যুবক বন্ধু দুইটিকে তীব্র ভাষায় ভর্ৎসনা করিয়া গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিতেছে এবং বলিতেছে—"এমন নিষ্পাপ মহাপ্রাণ ব্যক্তিকে কেন তোমরা এখানে নিয়ে এলে?"

এই সময় অনুকূলচন্দ্র চলিয়া যাইবার জন্য ত্রস্তপদে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। বেশ্যারমণীটি তখন কাতরকণ্ঠে কত মিনতি জানাইয়া বলিল,—"না বাবা, বিছানায় বসবে চল,—বড্ড ক্লান্ত হয়েছ।" অনুকূলচন্দ্রের তখন মনে পড়িল,—সেই নিরালা পাল্লীর ক্রোড়ে নদীর ধারে তাঁহার মায়ের ক্ষুদ্র কুটীরখানার কথা। তিনি বলিলেন,—"না মা, বিছানায় বসে আমার ভাল লাগবে না মা।" তাঁহার মমতা-জড়ানো কোমল ব্যবহার এবং অমিয়-মধুর 'মা' ডাকে গণিকার নারী-হৃদয়ে মাতৃত্ব-বোধ জাগ্রত হইল, তাহার অন্তর ছাপিয়া সন্তান-বাৎসল্য উছলিয়া উঠিল। সে তখন বাজার হইতে একখানা নূতন আসন, কিছু ফলমূল ও এক গ্লাস বিশুদ্ধ পানীয় আনাইয়া তাঁহাকে গ্রহণ করিবার জন্য কান্নাকাটি করিয়া কত পীড়াপীড়ি করিতে লাগিল। কিন্তু ক্ষুব্ধ অনুকূলচন্দ্র কিছুতেই সেখানে এক মুহূর্ত থাকিতে বা কিছু গ্রহণ করিতে রাজী হইলেন না।

এইবার অনুকূলচন্দ্র গমনোদ্যত হইয়া কোমলকণ্ঠে বলিলেন,—"মা, আমি এখন যাই।" বেশ্যারমণীটি তখন ছলছল নেত্রে বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলিল,—"কি আর বলব বাবা! যদি চলেই যাবে, দয়া ক'রে এই পথ দিয়ে একটিবার যেও, তোমার এই অভাগিনী মা তোমাকে দেখে শান্তি পাবে।" ব্যথিতকণ্ঠে অনুকূলচন্দ্র বলিলেন,—"মা, তুই যদি সত্যি সত্যি আমায় পেটে ধরতিস, তবে কি একবারও এই প্রেতপুরীতে আসতে তোর ছেলেকে বলতে পারতিস?" এই বলিয়া অনুকূলচন্দ্র দ্রুত পদক্ষেপে কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। রমণীটি তখন ছুটিয়া গিয়া তাঁহার পায়ের উপর পড়িয়া মাথা ঠুকিতে লাগিল এবং আর্তনাদ করিয়া কত-কিছু বলিতে লাগিল। তিনি দেখিলেন, তাহার কপোল বহিয়া অশ্রু ঝরিতেছে, ললাট হইতে অবিরল ধারায় রক্ত পড়িতেছে, আর এই অবস্থায় স্বীয় জীবনের কত পাপ-কথা অনর্গল চিৎকার করিয়া বলিয়া যাইতেছে। অনুকূলচন্দ্র তাহাকে সস্নেহে ধরিয়া উঠাইলেন, এবং মধুর সম্ভাষণে সান্ত্বনা দিয়া যথোচিত শুশ্রূষাদানে কিঞ্চিৎ সুস্থ করিলেন। অতঃপর ধীর শান্ত পদক্ষেপে তিনি আপন গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

এই ঘটনার কিছুদিন পর শোনা গেল, বেশ্যারমণীটি তাহার সমুদয় ধন-সম্পত্তি কোন সদনুষ্ঠানে দান করিয়া চিরজীবনের মত পুণ্য বৃন্দাবনধামে চলিয়া গিয়াছে।

ছোটবেলা হইতেই অনুকূলচন্দ্র দৃঢ় আত্মপ্রত্যয়ে বলীয়ান হইয়া উঠিয়াছিলেন। কেহ নিজেকে হীন মনে করে, ইহা তিনি সহ্য করিতে পারিতেন না। এ-সম্বন্ধে তাঁহার তরুণ বয়সের একটি বিশেষ অভিজ্ঞতার কথা বর্ণনা করিয়া পরবর্তীকালে একদিন তিনি বলিতেছিলেন,—

"ছেলেবেলা থেকে আমি ভাবতাম ও বলতাম—পরমপিতা! তুমি আমার পিতা, আমি তোমার সন্তান, তোমার জোরে আমার জোর, তুমি থাকতে দোষ-দুর্বলতা আমাকে স্পর্শও করতে পারবে না। একজন বৈষ্ণব ভক্ত আমার এই মনোভাবের কথা শুনে বলল—'সে কি? ও তো অহঙ্কারের কথা। বরং দীন-ভাবে বলবে—'আমি দুর্বল, আমি পাপী, আমি অসহায়, আমি অধম, আমি নীচ, আমি অপবিত্র, তুমি আমাকে রক্ষা কর, ত্রাণ কর দয়াময়!' তার কথামত আমার কথা ছেড়ে ঐ ব'লে প্রার্থনা করতাম। কিছুদিনের মধ্যে শঙ্কা, সঙ্কোচ ও গ্লানি ঘিরে ধরলো আমাকে। সব সময় মনে হয়, আমি যেন কত বড় অপরাধী। মানুষের বিশেষতঃ মায়েদের মুখের দিকে সহজে চোখ তুলে চাইতে পারি না। কারো ঘরে ঢুকতে গেলে যেন ভয়-ভয় করে। আমি যেন কুচকে এতটুকু হ'য়ে গেলাম। কারও সঙ্গে সহজভাবে মিশতে পারি না, কথা কইতে পারি না, ভাবি আমার স্পর্শে যদি অন্যের ক্ষতি হয়। আমার বুকের ভিতরে যে একখানা আনন্দ ও পবিত্রতার পূর্ণচন্দ্র নিটোল হ'য়ে বিরাজ করতো, তা অমাবস্যার অন্ধকারে ছেয়ে গেল। সে কি দুর্দিনই গিয়েছে! ক্রমেই অবস্থা অসহনীয় হ'য়ে

উঠতে লাগলো, না পেরে শেষে একদিন বিকালবেলায় পদ্মার পাড়ে গিয়ে আকুলভাবে চিৎকার ক'রে ব'লে উঠলাম—'আমি পাপী নই, আমি দুর্বল নই, আমি অধমনই, আমি দুষ্কৃত নই, আমি তোমারসন্তান, পরমপিতা ! আমি তোমার সন্তান, আমি নির্মল, আমি পবিত্র, আমি জ্যোতির তনয়, চিরজ্যোতিষ্মান্ আমি।' এইভাবে আরও যা' যা' মনে আসলো, মনের আবেগে ব'লে গেলাম। কি কি বলেছিলাম সব আমার মনে নেই। যাহোক ঐভাবে বলার পর আমার বুকখানা হাল্কা হ'য়ে গেল, তখন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচি। তাই অন্যকে হীন ভাবা যেমন খারাপ, নিজেকে হীন ভাবাও তেমনই খারাপ। ··· শুনেছি চৈতন্যচরিতামৃতে আছে—'আমারে ঈশ্বর ভাবে আপনারে হীন, তার প্রেমে কভু আমি না হই অধীন।' "

··· ···আলোচনা-প্রসঙ্গে, ৩য় খণ্ড

বাল্য হইতেই অনুকূলচন্দ্র অতীব ধর্মানুরাগী ছিলেন। ঈশ্বরের প্রতি ছিল তাঁহার অচলা ভক্তি ও অটুট বিশ্বাস। জগন্মাতার আরাধনা ও মহিমা কীর্তন ও ভগবচ্চরণে আত্মনিবেদন করিয়া তিনি অপার আনন্দ ও শান্তি লাভ করিতেন। অনুকূলচন্দ্রের তরুণ মনের সে সকল দিব্য ভাবরাজি তাঁহার তৎকালীন রচনায়ও স্বতঃই পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছিল। দৃষ্টান্তস্বরূপ আমরা নিম্নে তাঁহার রচিত গুটিকয়েক ভক্তিমূলক কবিতা ও সঙ্গীতের অংশ-বিশেষ উদ্ধৃত করিলাম।

বাণীস্তব

পাদপদ্ম বিভূষিত
শ্বেতকমলম্
শ্বেত অঙ্গে বিরাজিত
মনোহারম্
শ্বেত হস্তে বিরাজিত
বীণা শোভাম্
প্রণমামি সরস্বতী
দেহি পদম্ ॥
ভকতবৎসলা মাতা
ভক্তধনম্
অনুকূলে অনুকূল
প্রদায়নম্
প্রণমামি সরস্বতী
দেহি পদম্ ॥

*　　*　　*

কোথা মা রইলে
দেখা নাহি দিলে
পাপ-দাপে কাঁদিছে যে প্রাণ।
এ দেহ বিকল
নাহি পাই বল
জরাজীর্ণ দেহ তৃষিত পরাণ।
ষড়রিপুচয়
না ফিরিতে দেয়
মহাতৃষ্ণায় আজি বাহিরায় প্রাণ।
আয় মা জননী
কণ্ঠাগত প্রাণী
কোলে তুলে মাগো কর মোরে ত্রাণ।
মহা বিভীষিকা
যেন অগ্নিশিখা
আসিতেছে মোর বধিবারে প্রাণ।
নে মা কোলে তুলে
যাই সব ভুলে
শান্তি-হ্রদে ডুবে হেরি ঐ চরণ।

ভালবাসা যদি চাস্
মূঢ় মন,
বাস ভাল তাঁরে দিয়ে
প্রাণ মন॥
কাঁদ তাঁরি তরে,
পাবে তাঁর প্রেম
অমূল্য রতন॥
এ সংসারে যত ভালবাসা-বাসি,
ভালবাসা নয় গলে পরা ফাঁসি।
ভালবাসা তুমি সেই সনাতন
যথা যাও পাবে সুখ-নিকেতন॥

দেখ্ মা ফিরে দেখ্ মা কালী
ডেকে মোল মা পাগল ছেলে।
ঘন ঘন হায় বেজে মোল
হৃদয়েরি তার মা মা বলে।
ফিরে চা মা তুই ফিরে চা মা
কোলেতে তোর নে মা তুলে
হৃদয়েরি বীণা বেঁধে ওমা
বাজাই সুখে মা মা বলে॥
গলা ধ'রে তোর দু'হাতে মা
ডাকব শুধু মা মা ব'লে
এত আশা ক'রে ডাকি মা তোরে
শোন না মা পাগল বলে' ॥

কে জানে মা তব দয়া ওমা দেবী মহেশ্বরী।
ভকতি কুসুম দলে
দিয়ে প্রাণ মন খুলে
যে পূজিবে শ্রীচরণ মোক্ষফল হবে তারি ॥
যে জন পূজেনি তোরে
পড়িয়াছে মহা ঘোরে
নিত্যসুখ পাবে না সে পাবে না অকূলতরী ॥
অখিল ব্রহ্মাণ্ডব্যাপী
কত শোকী মহাতাপী
কত কষ্ট ভুঞ্জে তারা তুই বিনে মা জীবেশ্বরী ॥
জানি না মা হর হরি
জানি মাত্র মা আমারি
পদধূলি যে মা পূরে ওমা দেবী সর্বেশ্বরী ॥
সংসার পরীক্ষা ফাঁদে
পড়ে মাগো প্রাণ কাঁদে
কবে মাগো পাবো ত্রাণ ব'লে দাও মা দীনেশ্বরী ॥

শোন্ মা শ্যামা দুখের কথা শোন্ ।
(দুটি কতক দুখের কথা শোন্)
এ ভব সংসারে
ভালবাসা-বাসি
কেন গড়েছিলি
হেন মহা ফাঁসি ?
কেন গড়েছিলে
সন্তানে ছলিতে,
কেন ভুলাইলি মহা মোক্ষধন ?
উপায় বিহীন
এ দেহ দুর্বল,
দিলি না সাধিতে
ও পদ-কমল,
অন্ধ মোরা এবে বিহীন নয়ন ।
অনুকূল বলে
দে মা ও চরণ,
শান্ত হোক মোর
এ অশান্ত মন ।
ব'লে দে মা আগে
কি উপায়ে পাব
ঐ মোক্ষময় রাতুল চরণ ॥

কোথা গেলে পাব সেই প্রেমধন
সর্ব প্রেমাধার নিত্য নিরঞ্জন ।
যে প্রেমে প্রকৃতি
মুগ্ধা দিবারাতি,
জগতে ছড়ান
যে প্রেমের ভাতি,
অনলে অনিলে
যাহার সদা স্থিতি,
কি করিলে পাব ভাবি অনুক্ষণ ।

চন্দ্র সূর্য আদি
গ্রহ তারা যত
যে প্রেমের ভাতি
দেয় অবিরত,
সজীব নির্জীব
যে প্রেমের প্রীতি,
এ ভাগ্যেতে লিখা আছে কি সে ধন?
অনুকূল কয়,
আছে লিখা বটে,
ভক্তিঅস্ত্র ধর।
যদি গোল ঘটে,
মায়া সর্বনাশীর
ধর আঙ্গুল চেপে॥
পাবে অনায়াসে সেই মহাধন।

তরুণ বয়সেই অনুকূলচন্দ্রের মনে নির্মল দেশভক্তির বিকাশ ঘটিয়াছিল। তাঁহার ছাত্রাবস্থায় ভারতের তদানীন্তন বড়লাট লর্ড কর্জনের শাসনকালে বঙ্গদেশ খিখণ্ডিত হয়। ক্ষমতা-গর্বিত বৃটিশরাজের সেই নির্মম অত্যাচারের প্রতিবাদে সে-যুগে সারাদেশব্যাপী যে তুমুল আন্দোলন সুরু হইয়াছিল, দুরান্তের নিভৃত পল্লীতে অনুকূলচন্দ্রের কোমল মনকেও তাহা চঞ্চল করিয়া তুলিয়াছিল। বঙ্গভঙ্গ-আন্দোলনের সময় ১৩১৪ বঙ্গাব্দে মাননীয় এ. চৌধুরী বার-এট্-ল মহোদয়ের সভাপতিত্বে এবং দেশবরেণ্য জে. চৌধুরী, কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ নেতৃবৃন্দের উপস্থিতিতে পাবনা সহরে যে মহতী স্বদেশী সভা অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, অনুকূলচন্দ্র তাহাতে স্বেচ্ছাসেবকের দায়িত্ব-পালনে অক্লান্ত শ্রম করতঃ দেশমাতৃকার প্রকৃত সেবকের কর্তব্য পালন করিয়াছিলেন। বঙ্গব্যবচ্ছেদের দরুণ তৎকালে বাংলার ঘরে ঘরে যে করুণ ক্রন্দনরোল উত্থিত হইয়াছিল, বালকের তরুণ হৃদয়তন্ত্রীতে তাহা কি সুতীব্র বেদনার ঝঙ্কারই না তুলিয়াছিল। দেশের সেই দুর্দিনে জাতীয় মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য তিনিও যথাশক্তি আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। বঙ্গবাসীর নিদারুণ দুঃখে তাঁহার অন্তরাত্মার সে গভীর মর্মবাণী তাঁহার তৎকাল-রচিত কবিতায় ও সঙ্গীতে উদাত্তস্বরে ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে। উদাহরণ স্বরূপ আমরা নিম্নে তাহার কয়েকটি উদ্ধৃত করিলাম।

বঙ্গভঙ্গে

সাবাস্ কর্জন ভায়া সাবাস্ সাবাস্ !
প্রজাদের পায় ঠেলে,
তুলে দিলে শিলা গলে।
পরালে মোদের গলে ছেদনের ফাঁস !
সাবাস্ কর্জন ভায়া সাবাস্ সাবাস্ !

সাবাস্ কর্জন ভায়া সাবাস্ সাবাস্ !
এত সব কাঁদাকাটি
সব তুমি কোরে মাটি।
যাহা বোঝ তুমি ভায়া করিয়াছ বেশ।
সাবাস্ কর্জন ভায়া সাবাস্ সাবাস্ !

সাবাস্ কর্জন ভায়া সাবাস্ সাবাস্ !
তোমার মনের মত
এখন হয়েছে তো ?
চক্ষে কি প'ল না তব বাঙ্গালীর ক্লেশ ?
সাবাস্ কর্জন ভায়া সাবাস্ সাবাস্ !

সাবাস্ কর্জন ভায়া সাবাস্ সাবাস্ !
ভালই কোরেছ তুমি,
শদ্ধ এবে বঙ্গভূমি,
আর না হইবে এবে বাঙ্গালীর ক্লেশ।
সাবাস্ কর্জন ভায়া সাবাস্ সাবাস্ !

সাবাস্ কর্জন ভায়া সাবাস্ সাবাস্ !
'ইউনিটি'র জোরে মোরা
আর না হইব সারা
আর না পাইব মোরা অনশনে ক্লেশ।
সাবাস্ কর্জন ভায়া সাবাস্ সাবাস্ !

সাবাস্ কর্জন ভায়া সাবাস্ সাবাস্ !
একদমে বাজিমাৎ
কোরে তুমি কেয়াবাৎ

চ'লে গেলে দেশে তুমি করিয়াছ বেশ।
সাবাস্ কর্জন ভায়া সাবাস্ সাবাস্!

সাবাস্ কর্জন ভায়া সাবাস্ সাবাস্!
শুনেছে কর্জন ভায়া
ছাড়িয়ে বিদেশ মায়া
লেগেছে বাঙ্গালী সব হবে দুঃখ শেষ॥
সাবাস্ কর্জন ভায়া সাবাস্ সাবাস্!

বিদেশী বর্জ্জন

দাঁড়াও দাঁড়াও দেখি বঙ্গের সন্তান।
যেও না যেও না তুমি কর অবধান॥
আমরা হলেম সবে বঙ্গদেশ বাসী।
বঙ্গছেলে কেন হই বিদেশ প্রত্যাশী॥
এস এস ভ্রাতৃগণ কর এই পণ।
দেশের দশের তরে সঁপি প্রাণমন॥
আজ হ'তে সবে মিলি বিদেশী জিনিষ
পরিহারে ব্রতী হই স্মরি জগদীশ॥

স্বদেশী সঙ্গীত

আয়রে আয় সবে মোরা
মায়ের পূজা করি।
মায়ের সন্তান মোরা
দিনে দিনে হচ্ছি সারা
মা মোদের বড়ই দুখে
আছেন জীবন ধরি॥
মায়ের কোলে ব'সে মোরা
দৈন্য দুঃখে হচ্ছি সারা
কেমন কোরে পুত্রের মুখ
দেখেন পরাণ ধরি॥

আজি এই অঙ্গছেদে
মা ব'লে কেঁদে কেঁদে
মা-তানে বাঁধিয়ে বীণা
আয় সবে গান করি।
বিমাতার প্রলোভনে
আর না মজিব প্রাণে
আয় সবে কেঁদে কেঁদে
মায়ের পায়ে পড়ি॥

এস গো ভারতবাসী আমরা সকলে মিলি
বঙ্গমাতার অঙ্গচ্ছেদে ভাসি রে শোক-সলিলে।
ছিল রে জীবনে মরা
মা মোদের এতদিন
সন্তানের হীনবলে ভেবে ভেবে তনুক্ষীণ।
লোহার শৃঙ্খল গলে
বক্ষে ধরে অবহেলে
কুসন্তান গর্ভে ধ'রে হোয়েছে অতি মলিন।
এখন আবার দেখ হায়
অর্ধ অঙ্গ কাটা যায়
উপায় কি নাহি রে তার থাকিতে মোরা সকলে?
ধর ধর শক্তি ধর প্রতিজ্ঞা অটল রাখ
বিদেশীর আসবাব সাধ্যমত ছুঁও নাক।
কুপিলে ইহাতে ব্রিটন রাজন
ভয়ে হীনবল হয়ো না কখন।
আরও দৃঢ়তর করি প্রাণপণ
মায়ের মঙ্গল গাও রে সকলে॥
দীনের অধীনা এ ভারতমাতা
যা আছে সম্বল হইয়ে একতা
লও মাথে করি মাতৃদত্ত ধন
ব্যবহারে ভাস আনন্দ সলিলে॥

জাগ রে ভারতবাসী যাবে কত নিদ্রা আর।
পূরব গগনে হের কি মলিন দিবাকর ॥
চেয়ে দেখ ধরাতলে মা আমাদের দুখে গলে'
ভাসিয়ে অশ্রুধার হ'য়ে আছে হীনকর।
মলিন বসন পরে'
সদা ভেসে দুখ-নীরে
আছেন মা আমাদের প্রসারিয়ে হীনকর
দেখ মায়ের বক্ষ 'পরে
শ্বেতাঙ্গেরা নৃত্য করে
তা দেখে এখন মোরা হ'য়ে আছি যেন মর ॥
ধর ধর শক্তি ধর
মায়ের দুঃখ দূর কর
পদধূলি নিয়ে মায়ের হও সবে তেজকর ॥
আজি মোদের দুখের দিন
মা হয়েছেন অঙ্গহীন
এখনও ব'সে মোরা হ'য়ে আছি হীনকর।
এস এস ভাই ভাই
না হইব ঠাঁই ঠাঁই
প্রতিজ্ঞা অটল রাখি হই সবে তেজকর ॥
আমরা মায়ের ছেলে
কেন মোদের মা ফেলে
বিমাতার কাছে গিয়ে হই সবে হীনকর ॥
মা যেমন ভালবাসে
সন্তানের দুখে ভাসে
কেউ কি আর তত বাসে······হীনকর ॥
এস এস পরস্পর
গাই গীতি একতার
কোলাকুলি দিয়ে সবে রাখি মোরা সুখকর ॥

অনুকূলচন্দ্রের কোমলমধুর দরদভরা প্রাণের পরিচয় তাঁহার তরুণ জীবনের সর্বত্র ছড়াইয়া আছে। পরিবারের প্রত্যেকের জন্য ছিল তাঁহার প্রাণকাড়া টান। পূজনীয়দিগকে তিনি যে গভীর শ্রদ্ধা-ভক্তি করিতেন এবং স্নেহাস্পদ ভাই-বোনদের কত ভালবাসিতেন, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। প্রিয়জনের প্রীতিসুখ-পরশের তিনি এমনই কাঙাল ছিলেন যে, কাহারও মুহূর্তের অদর্শন তাঁহার নিকট অসহ্য বোধ হইত। সকলকে লইয়া আনন্দোচ্ছল জীবন-যাপনের এক উদগ্র নেশায় তাঁহার অন্তরখানা সর্বদা ভরপুর থাকিত। দুর্ভাগ্যের বিষয়, প্রাণাধিক ভ্রাতা-ভগিনীর কয়েক জনের শোচনীয় অকাল মৃত্যুশোক তাঁহার তরুণ প্রাণে বড়ই নিদারুণ আঘাত হানিয়াছিল। সে কঠোর মর্মবেদনা তাঁহার বাল্যের রচিত বহু পদ্য ও গীতে কি করুণ সুরেই না বাজিয়া উঠিয়াছে। পরিজনের প্রতি বালকের আন্তরিক শ্রদ্ধাপ্রীতির নিদর্শন-স্বরূপ তাঁহার কয়েকটি কবিতা নিম্নে উদ্ধৃত হইল।—

শ্রীযুক্তেশ্বরী মাতঙ্গিনী দেব্যা

মাসীমাতা ঠাকুরাণী

শ্রীচরণকমলেষু,

আপনার অকৃত্রিম স্নেহের অন্তরে :
বেঁধেছেন এ দাসেরে চিরদিন তরে ॥
তাই মা রহিনু বাঁধা স্নেহের বন্ধনে।
ছিঁড়িবে না কভু ইহা সুকঠিন টানে ॥
একমাত্র বোন মম স্নেহের পুতুলী।
রক্ষিতেছ কিরূপেতে জানি মা সকলি ॥
অকাতরে শুশ্রূষা মা করি বরিষণ।
রক্ষিতেছ তুমি শুধু ভগিনী রতন ॥
তব সম দয়াশীলা দুখেতে কাতরা।
নাই মা জগতে আর দেখি নাই মোরা ॥
তুমি মা প্রেমমূর্তি মোর স্নেহেতে।
দেখিতেছ সেইরূপ স্নেহের চক্ষেতে।
দুর্লভ জগতে মাগো প্রতিদান তার।
তাই মা রচিনু এই স্নেহাশ্রুর হার ॥
পরিয়া কণ্ঠেতে মাগো সন্তোষ দাসের।
আহ্লাদে মাতিয়ে আরো গাঁথি অশ্রুহার ॥

কুটিল ধরণী 'পরে খুঁজিলাম কত।
নাহি পেনু প্রতিদান মম মন মত ॥
দেখিলাম এক প্রান্তে আছে পড়ে শুধু।
অশ্রুহার নাম তার স্নেহমাখা শুধু ॥
তাই মা আনিনু হেথা তোমার কারণ।
ধর ধর কর মাগো হস্ত প্রসারণ।
আশীর্বাদ কর মাগো দাসের এখন।
কমলার দাস যেন না হই কখন ॥
শ্বেতাঙ্গিনী বীণাপাণি যেন দয়া করে।
দেন যেন পদছায়া অভাগা দাসেরে ॥
আর কি চাহিবে মাগো আশিস অধম।
তব পদে থাকে যেন সদা মতি মম ॥
দিন যদি দেন মাগো বিভু সনাতন।
চেষ্টা ক'রে প্রাণ ভ'রে দিব প্রতিদান ॥
বিদায় হইল মাগো অভাগা সন্তান।
রাখ মা পদেতে এই ক্ষুদ্র প্রতিদান

It was written when my sister died

কোথা কোথা মোর প্রাণের ভগিনী,
কোথায় লুকায়ে আছ রে তুমি ?
দাদা কি তোমার এতই পাপী,
তারে দেখিবে না জীবনে তুমি ?
দেখিব না কিরে ও চারু বয়ান,
দেখিব না কিরে জীবনে আর ?
শুনিব না কিরে ও সুধা বচন,
জুড়াবে না কিরে জীবন মোর ?
সর্বদা বহিছে জীবনে আমার
কি ভীষণ আহা দুঃখের স্রোত !
থামিবে না কিরে জীবনে আমার
সে ভীষণ দুখের সোঁত ?

থামিবে না কেন? থামিবে না আর।
জুড়াইয়া যাইত মনের ব্যথা,
থামিয়া যাইত জীবনের মত,
শুনিতাম যদি চাঁদের কথা।
শুনিব না আর জ্বলিবে সদাই
ভবের পারে জীবন আমার,
জুড়াবে না আর জ্বলিবে সদাই
ভবের অনলে পরাণ আমার।

It was written when my younger brother died

ভাই, আজ কেন তুমি হইলে এমন,
মুখে কেন নাই সে আধ বচন?
বল ভাই বল এমন কেন,
সে প্রফুল্ল মুখ নাই কেন আজ,
কোথায় লুকাল সে সব আজ?
দেখিয়ে তোমার এ চারু বদন
হৃদয় ভাসিছে দুখেতে কেন!
আধো আধো হাসি আধো দাদা কথা
বল ভাই বল লুকালে কোথা?
হৃদয় আমার ফাটিয়া যাইছে,
উঠ ভাই উঠ জুড়াক ব্যথা।
ডাক ডাক ডাক দাদা দাদা ব'লে,
মরমের ব্যথা জুড়াই এখন,
আর না আর না দেখিতে পারি রে,
ফাটিয়া যাইছে আমার পরাণ।
ডাক ডাক ভাই ডাক দাদা ব'লে,
প্রাণে আর ভাই সয় না আর।
না শুনিতে পেলে আধো দাদা রব,
মরণ বাঁচন সমান আমার।
ও হো! সে কি ভাই কোথায় ছাড়িয়ে আমায়

দেখা কি দিবি না আর অভাগা ভ্রাতায় ?
বড় দুঃখী আমি ভাই পৃথিবী মাঝারে
তাই বুঝি ছেড়ে গেলি থুইয়া আমারে !
অনন্ত দুখের সাথে খেলিতেছি আমি,
তাই বুঝি ছেড়ে গেলে ঘৃণা ক'রে তুমি !
ননীর পুতুলী ভাই তুই রে ফাল্গুনী
হেসে হেসে একবার দাদা বল শুনি।*

For my sister

খেলিতে পারিত গো,
খেলিল না সে।
নিমেষে হেসে গেল,
নিমেষে খেলে গেল,
প্রাণভরা আহা
সুখ আবেশে।
জোছনা হেসেছিল,
নিমেষে নিভে গেল,
চিরময় শুধু
দুখেরি পাশে।
আমারই হিয়াটুকু
সহিবে দুখটুকু।
ভুলিবে না কভু
আহা তাহারি পাশে।

Foy my brother

দুদিন খেলেছিল
আপন মনে।
আবার চ'লে গেল
রবিটি ডুবে গেল

*কবিতাটি অতিশয় দীর্ঘ বলিয়া উহার কয়েকটি মাত্র স্তবক এখানে উদ্ধৃত করা হইল।

দেখিল না চেয়ে
হৃদয় পানে।
ঝলকে হেসে গেল
বিজলী চেয়ে গেল
অমনি চ'লে গেল
বারিধি পানে।
সংসারে এসেছিল
দুখ দিয়ে সে গেল
চে'ল না ফিরিয়ে পুনঃ
মোর পানে।

জাগে হৃদয় মাঝে
সে মুখ মাধুরীটুকু,
নয়নেরি কোণে যেন
দেখিতেছি হাসিটুকু।
প্রাণ হরষিত আধ বচনে
বলিতেছে যেন মোরে
কে তুমি এখানে।
হায়রে নিদয় বিধি,
এই কি রে হল বিধি!
আনিয়ে দুখেরি পথে
হরে নিলে সুখটুকু।

সে মুখ যে সুধামাখা
কখন কি ভোলা যায়!
চাঁদেরি কিরণ দিয়ে
গড়েছিল বিধি তায়।
মধুর যে সে বদন
বিজলিত ঘন ঘন।

সে সুন্দর প্রেমফুল
বিধি কেড়ে নিলে হায় !
অধরে মধুর হাসি
দেখিতাম দিবানিশি
সুখলতা ছিঁড়ে বিধি
ভাসালে দুখেতে হায় !

যেমনই আপন জনের জন্য তেমনই অপর প্রত্যেকের প্রতি অনুকূলচন্দ্রের ছিল প্রাণঢালা অফুরন্ত ভালবাসা। অন্তরের এই সহজ দরদ-বোধের দরুণ, বাল্যকাল হইতে তিনি স্বভাবতই ছিলেন অতিশয় পরদুঃখকাতর। দুঃখীর দুঃখ মোচনের জন্য তাঁহার যত্ন ও চেষ্টার অবধি থাকিত না। দুঃস্থ, বিপন্ন ও আর্তের সেবায় অকৃত্রিম সহানুভূতির পরিচায়ক বহু ঘটনার কয়েকটি আমরা নিম্নে উল্লেখ করিলাম।

একদিন অপরাহ্ণে দারুণ শীত পড়িয়াছে। অনুকূলচন্দ্র একখানা আলোয়ান গায় জড়াইয়া স্কুল হইতে বাড়ী ফিরিতেছিলেন। এমন সময় পথিমধ্যে শীর্ণকায়া ছিন্নবসনা এক বৃদ্ধার সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। প্রচণ্ড শীতের প্রকোপে বৃদ্ধাটি ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতেছিল। তাহার এইরূপ দুরবস্থা অনুকূলচন্দ্রের অসহ্য বোধ হইল। তিনি তৎক্ষণাই বৃদ্ধার কাছে উপস্থিত হইয়া আপনার গায়ের মূল্যবান চাদরখানা তাহার দেহে সযত্নে পরাইয়া দিলেন এবং নিজে কোনমতে অতিকষ্টে খালি গায়ে বাড়ী ফিরিলেন।

আর একটি ঘটনার বিবরণ অনুকূলচন্দ্র নিজেই কথাপ্রসঙ্গে যেরূপ বলিয়াছেন, নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।

"পাবনার ইস্কুল থেকে বাড়ী ফিরছি। খুব এক পশলা শিলাবৃষ্টি হ'য়ে গেল। শিলা বন্ধ হ'লেও মুষলধারে বৃষ্টি পড়ছে। রাস্তাঘাট সব সাদা হ'য়ে গেছে। রাস্তার ধারের নালা দিয়ে স্রোতের মত জল যাচ্ছে। তার মধ্যে দেখি, বৃদ্ধ মুসলমান কেমন ক'রে সেই নালায় প'ড়ে আছে। প্রথমে দেখতে পাই নাই। কে যেন আর্তস্বরে এক এক বার বলছে—'আল্লা, আল্লা'। থমকে দাঁড়িয়ে খুঁজতে লাগলাম। দেখি ঐ বৃদ্ধের মাথাটি একটা উঁচু জায়গায় আটকে রয়েছে, আর তার সর্বাঙ্গের উপর দিয়ে শিলা-মিশ্রিত জলের প্রবাহ চলছে। বৃদ্ধ শীতে মুমূর্ষু। আমারও সর্বাঙ্গ ভিজে গিয়েছে, শীতে হিম হ'য়ে যাচ্ছি। কিন্তু বৃদ্ধের দুর্দশা দেখে নিজের কথা ভুলে গেলাম। আমি তখন শিশু, মাত্র একা। কি ক'রে তাকে তুলব, অথচ ধারে-কাছে একজনকেও পেলাম না যে আমাকে সাহায্য করে। উপায় নাই— গেলাম বৃদ্ধের কাছে। সেখানে আমার প্রায় এক বুক জল, তার উপর স্রোতও অত্যন্ত প্রবল। একটু পা ফসকালে আমিও ভেসে যাব। কোনরকমে লোকটির মাথা তুলে তাকে পিঠের উপর নিলাম। গুরুভারে আমার কষ্ট হ'তে লাগল

অত্যন্ত। অতি সন্তর্পণে স্রোত ঠেলে উপরের দিকে আসতে লাগলাম। তখন বৃদ্ধ বলছে—'তুমি আমার আল্লা'। উপরে উঠে আরও বিপদ। নিকটে কোথাও লোকালয় নাই। বহু দূরে একঘর মুসলমান বাড়ী দেখতে পেয়ে সেইখানে নিয়ে চল্লাম। যখন সেখানে পৌঁছুলাম, তখন বৃদ্ধের দেহ অসাড় হ'য়ে গেছে। ওরা তৎক্ষণাৎ আগুন জ্বেলে তার দেহ গরম করতে লাগল। আমি ইতিমধ্যে বাড়ীর দিকে চল্লাম। কিছুদূর যেতে যেতে একটা বাজপাখী, বোধহয় ঝড়ে-জলে আর্ত হ'য়ে আমার কাঁধের উপর আশ্রয় নিল। অতি সন্তর্পণে দাঁড়িয়ে রইলাম। জানি, যদি নড়ি, সে ভয় পেয়ে অন্যত্র চ'লে যাবে। এইভাবে কিছুক্ষণ থাকার পর পাখীটা একটু সুস্থ হ'য়ে অন্যত্র চ'লে গেল ”

আর একটি ঘটনা। অনুকূলচন্দ্র তখন নৈহাটি হাইস্কুলের ছাত্র। সে-স্থানের দরিদ্র জনসাধারণের দুরবস্থা দেখিয়া তিনি মনে বড়ই ব্যথা পাইতেন। ইহাদের দুঃখ-মোচনের কি উপায় করিতে পারেন, সে চিন্তায় তিনি অস্থির হইয়া পড়িলেন। প্রাণের সেই ঐকান্তিক আকাঙ্ক্ষা পরিপূরণের উদ্দেশ্যে তিনি স্থানীয় উদার-প্রাণ খ্যাতিমান চিকিৎসক পরমেশচন্দ্র চক্রবর্তীর সহায়তায় সেখানে 'সেবা-সমিতি' ও 'অনাথ ভাণ্ডার' নামে সাহায্য-সংস্থা স্থাপন করিলেন। লোকের দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া তিনি এই দুইটি প্রতিষ্ঠানের উন্নতিকল্পে নানাভাবে যথেষ্ট অর্থাদি সংগ্রহ করিলেন। এইভাবে তিনি পীড়িত ও দুঃস্থদের জন্য অন্নবস্ত্র, চিকিৎসা ও শুশ্রূষাদির অতি সুন্দর ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। ইহাতে কত লোক যে সেবা ও সাহায্য লাভ করিয়া দুর্দশামুক্ত হইয়াছিল তাহা বলিবার নয়। অনুকূলচন্দ্রের এইরূপ পরোপকার ও সেবাপ্রাণতার জন্য স্থানীয় অধিবাসিগণ সকলেই তাঁহাকে বিশেষ স্নেহ ও প্রীতির চক্ষে দেখিতেন।

ছাত্রাবস্থায় সর্বত্রই অনুকূলচন্দ্র তাঁহার সরল স্বভাব ও মধুর ব্যবহারের গুণে অত্যল্পকালের মধ্যে সহপাঠীদিগকে আপন করিয়া লইতেন। তিনি সকলকে প্রাণ দিয়া ভালবাসিতেন, তাহাদের যে-কোনরূপ দুঃখ-কষ্ট ও অভাব-অসুবিধা নিজের বলিয়া বোধ করিতেন এবং সর্বদাই সবাইকে খুশী করিয়া চলিবার চেষ্টা করিতেন। তাঁহার ঈদৃশ অপূর্ব বন্ধু-প্রীতির কত না কাহিনী! আমরা নিম্নে কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ করিতেছি।

একদিন বালক ক্লাসে সহপাঠীদের সঙ্গে বেঞ্চের উপর বসিয়া আছেন। তখন শীতকাল। বিশেষ, সেদিন খুব ঠাণ্ডা পড়িয়াছিল। খালি বেঞ্চে বসিয়া পড়াশুনা করিতে বন্ধুদের না জানি কত কষ্ট হইতেছে, সহসা এই চিন্তা মনে উদিত হইয়া তাঁহাকে ব্যাকুল করিয়া তুলিল। বালক তৎক্ষণাৎ বেঞ্চ হইতে উঠিয়া পড়িলেন এবং অন্যদেরও অল্প কিছুক্ষণের জন্য বেঞ্চখানা ছাড়িয়া দিতে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাইলেন। তাঁহার সবিশেষ পীড়াপীড়িতে সকলে বেঞ্চ হইতে উঠিয়া দাঁড়াইলে, তিনি তাড়াতাড়ি তাঁহার গায়ের মূল্যবান আলোয়ানখানা লম্বালম্বি ভাঁজ করিয়া বেঞ্চের উপর পাতিয়া দিলেন এবং সকলকে তাহার উপর বসিতে অনুরোধ

জানাইলেন। অনুকূলচন্দ্রের এইরূপ অপূর্ব দরদী প্রাণের পরিচয় পাইয়া বন্ধুগণ মুগ্ধ হইলেন। বালক আবার এমনই আপনভোলা ছিলেন যে, স্কুল হইতে বাড়ী ফিরিবার সময় শীতবস্ত্রখানা সঙ্গে লইয়া যাইতে ভুলিয়া গেলেন। বলা বাহুল্য, এজন্য তাঁহাকে সেদিন বাড়ীতে মাতৃদেবীর নিকট যথেষ্ট তিরস্কার সহ্য করিতে হইয়াছিল।

বিদ্যালয়-জীবনে সহপাঠীদের সহিত অধ্যয়নকালে অনুকূলচন্দ্র কখনও তাহাদের কাহারও গায় চাদর বা জামা নাই, কিংবা কেহ ছিন্ন বস্ত্র পরিয়া স্কুলে আসিয়াছে, দেখিতে পাইলে, মনে বড় দুঃখ পাইতেন। এই অবস্থায় তিনি কোন দিন নিজ গায়ের চাদরখানা, কোন দিন জামাটি, কোন দিন বা পরিধেয় বস্ত্রখানাই সে ছাত্রবন্ধুকে দান করিয়া খালি গায়ে বাড়ী ফিরিতেন। কখনও কখনও তিনি বাড়ী হইতে গোপনে টাকা-পয়সা লইয়া গিয়া গরীব বন্ধুদের কাহারও অন্নের, কাহারও বস্ত্রের, কাহারও বা পথ্যাদির অভাব-মোচনে সাহায্য করিতেন, আবার কখনও তাহাদিগকে ভাল মিষ্ট দ্রব্য কিনিয়া খাওয়াইতেন।

স্বভাবসুলভ সরল মধুর উদার আচরণে অনুকূলচন্দ্র কিভাবে বিরুদ্ধ বন্ধুদেরও হৃদয় জয় করিয়া লইতেন সে-সম্বন্ধে একটি সামান্য ঘটনার উল্লেখ করিতেছি। একদিন তাঁহার হাতে একটি সূর্যমুখী ফুল দেখিয়া যোগেন্দ্র নামক তাঁহার এক সহাধ্যায়ী ফুলটি তাঁহার হাত হইতে কাড়িয়া নেন। অনুকূলচন্দ্র তখন ফুলটি যোগেন্দ্রের নিকট হইতে নেওয়ার জন্য অগ্রসর হইলে, যোগেন্দ্র তাঁহার গালে সজোরে আঘাত করেন। বন্ধুর এইরূপ নির্মম ব্যবহারে একান্ত বিস্মিত ও ব্যথিত হইয়া অনুকূলচন্দ্র তাঁহাকে সবিনয়ে বলিলেন,—"ভাই, কেন তুমি আমাকে অকারণে এভাবে মারলে? আচ্ছা, আমি যদি এখন তোমাকে মারি, তোমার কেমন লাগে? কারুর গায় হাত তোলা কি ভাল? বিশেষ, আমি তো ভাই তোমার সমপাঠী বন্ধু।" অনুকূলচন্দ্রের ঈদৃশ সরল অমায়িক ব্যবহারে নিতান্ত লজ্জিত ও দুঃখিত হইয়া যোগেন্দ্র তাঁহাকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া ক্ষমা ভিক্ষা চাহিলেন।

উত্তরকালে আলোচনা-প্রসঙ্গে একদিন অনুকূলচন্দ্র এ সম্বন্ধে নিজ জীবনের একটি ঘটনার কথা যাহা বলিয়াছেন, নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি।— "……আমি যদি কারও উপর প্রতিশোধও নিতে চাই, তবে ভাবি কেমন ক'রে তাকে জয় করব। আমার একজন খেলার সাথী আমার প্রতি অযথা বিদ্বেষপরায়ণ হ'য়ে উঠেছিল। সে সর্বত্রই আমার বিরুদ্ধে নিন্দা করতো। কিন্তু সব জানা সত্ত্বেও আমি সাক্ষাতে-অসাক্ষাতে তার প্রশংসা করতাম। তার সঙ্গে দেখা হ'লে সশ্রদ্ধ প্রীতি-পূর্ণ ব্যবহার করতাম। সত্যিই তার প্রতি আমার কোন বিরূপ ভাব ছিল না। কিন্তু মনে মনে রোখ ছিল যেমন ক'রে হোক তাকে আপন ক'রে তুলবই। বার বছর ধ'রে তাকে আমি এইভাবে pursue করেছিলাম, পরে সে নিজেই অনুতপ্ত হ'য়ে একদিন আমার কাছে এসে কেঁদে প'ড়ে বললো—'ভাই! তুমি যে কত মহৎ,

আর আমি যে কত হীন, তা' এতদিনে বুঝতে পেরেছি। তুমি আমাকে ক্ষমা কর।' আমি তখন আর ওসব কথা পাড়তে দিই না।"

অনুকূলচন্দ্রের পবিত্র মধুর স্বভাবের জন্য সহপাঠীগণ যেমনই তাঁহাকে ভালবাসিত, তেমনই শ্রদ্ধাও করিত। প্রাণের একান্ত সহজ টানে তাহারা সকলে অনুকূলচন্দ্রকে 'প্রভু' বলিয়া ডাকিত। তাঁহার প্রতি বন্ধুগণের সহজ প্রীতি ও শ্রদ্ধার পরিচায়ক বহু ঘটনার একটি এখানে উল্লেখ করিতেছি।—

একদিন শিক্ষক মহাশয়ের অনুপস্থিতিতে অনুকূলচন্দ্রের সহাধ্যায়ী ছাত্রগণ ক্লাসে ভীষণ গোলমাল করিতেছিল। ইহাতে পাশের ঘরের পাঠনরত শিক্ষক মহাশয় অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া সেখানে ছুটিয়া আসেন। সম্মুখেই অনুকূলচন্দ্রকে দেখিতে পাইয়া তিনি তাঁহাকে প্রহার করিতে উদ্যত হন। ইহাতে অনুকূলচন্দ্রের সহপাঠিগণ সকলে সমস্বরে চিৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল,—"স্যার, মারবেন না, মারবেন না, আমাদের প্রভুকে মারবেন না, তার কোন দোষ নেই, আমরাই সকলে গোলমাল করছিলাম।"

বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে ছাত্র অনুকূলচন্দ্রের কার্যকলাপে তাঁহার স্বভাবসুলভ অপূর্ব বন্ধুপ্রীতি আরও কত উজ্জ্বল দৃষ্টান্তেরই না পরিচয় পাওয়া যায়। এখানে একটি ঘটনার উল্লেখ করিতেছি। –সে-বার নৈহাটি হাইস্কুল হইতে অনুকূলচন্দ্র প্রবেশিকা পরীক্ষার জন্য নির্বাচিত হন। এই সময় পরীক্ষার ফিস্ দাখিল করিবার জন্য পিতৃদেব তাঁহার নিকট প্রয়োজনীয় অর্থ প্রেরণ করেন। এদিকে অনুকূলচন্দ্র সংবাদ পাইলেন, তাঁহার সহাধ্যায়ী একটি দরিদ্র বালক ফিসের টাকা সংগ্রহ করিতে না পারিয়া বড়ই হতাশ হইয়া পড়িয়াছে। বন্ধুবৎসল অনুকূলচন্দ্র ইহাতে অত্যন্ত বিচলিত হইয়া পড়িলেন। নিজের কথা বিন্দুমাত্র না ভাবিয়া তিনি অবিলম্বে উক্ত পরীক্ষার্থী বালকের নিকট গিয়া উপস্থিত হইলেন এবং পিতৃদেবের প্রেরিত টাকা কয়টি তাহার হাতে দিয়া বলিলেন,—'ভাই, টাকার জন্য ভাবনা করো না, এই টাকা নিয়ে তুমি পরীক্ষার ফিস্ জমা দাও।' সহৃদয় অনুকূলচন্দ্রের অর্থানুকূল্যে বালকটি যথারীতি পরীক্ষা দিয়া কৃতকার্যতা লাভ করিল, কিন্তু তাঁহার নিজের আর পরীক্ষা দেওয়া হইল না।

পাবনা, আমিরাবাদ, নৈহাটি, কলিকাতা প্রভৃতি যে সকল স্থানে অনুকূলচন্দ্র ছাত্রজীবন অতিবাহিত করিয়াছেন, সর্বত্রই সহপাঠিগণ তাঁহার অনুসন্ধিৎসু সেবা ও অমায়িক ব্যবহারের গুণে তাঁহার বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। বন্ধুবৎসল অনুকূলচন্দ্র আপন পঠদ্দশায় সময় সময় ইঁহাদের অনেকের উদ্দেশে মধুর কবিতায় তাঁহার সরল মনের অকৃত্রিম প্রীতি ভালবাসা ব্যক্ত করিয়াছেন। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ নিম্নে কয়েকটি কবিতার অংশ-বিশেষ উদ্ধৃত করা হইল।—

For a friend of mine,
Hem Chandra Choudhury, Junaidaha, 24 Parganas

* * *

কেন ভাই আজ বিষাদ পরাণ?
না দেখিতে পারি অমন ভাব।
কহ গো বিস্তারি বিষাদ কারণ॥
হৃদয়ে না সয় অমন ভাব।
হাসিতেছে তুমি সাথীদের সনে,
সে হাসি তোমার বড়ই কটু।
হেম নাম তব হেমের বরণ
কিসে ভাই বল কোরেছে রুষ্টু॥

* * *

For a friend, Ganesh Chandra Adhikari,
Amta, Hooghly

কি ভাই গণেশ কি হয়েছে আজ
বল বল ভাই জুড়াক হৃদয়।
তোমাকে দেখিয়া হৃদয় আমার
জ্বলিছে ভীষণ চিতার প্রায়।
বল বল ভাই কাঁদিলে কেন,
কেহ কি বলিছে কু-কথা তোর?
দেখে তব ঐ করুণ বয়ান
হৃদয় জ্বলিছে সদাই মোর।
কেন কেন ভাই বলিতে কি মানা
তোমার সকল দুখের কথা?
না বলিলে ভাই হৃদয় আমার
সহিবে সদাই দারুণ ব্যথা॥
বুঝিয়াছি এবে বিষাদ কারণ
বুঝিয়াছি তোর হৃদয় ভাব।
নিশ্চয় কেহ বা কু-কথা বলেছে
নতুবা কেন তোর অমন ভাব॥

আমার হৃদয় জানিয়াছে সব
তোমার প্রাণের হতাশ কারণ।
যদি ভাই প্রাণে বাঁচিয়া থাকি,
জুড়াব তোমার হৃদয় যাতন ॥
আশীর্বাদ করি বিভুর নিকটে
কালেতে তুমি হও রে ধনী।
যাতনা ভাবনা যাক চ'লে দূরে
কর সুখে সদা বিভুর ধ্বনি ॥

For a friend, Joygopal Brahmachari
Brahmanbaria, Tippera.

বহু দিন গত ভাই হ'য়ে গেছে মোর
দেখিতে না পারিয়াছি বয়ান তোমার।
আজ কি সুখেতে ভাই
ভাসিল যে প্রাণ,
কি বলিব আমি তাই
তোমার নিকটে।
আজি ভাই ঈশ্বরের
অপার মহিমায়
দেখা হ'ল দুই জনে
বহু দিন পরে।
নিরলে বসিয়া মোরা
দুই জনে মিলি,
কহিব উভয়ে মোরা
মরমের কথা ॥
শান্তি ভাই বহু দিন
পাই নাই হৃদে,
শান্তি-রসে আজি
ভাই মজাব পরাণ।
মরম-বেদন যত
খুলিয়া বলিব
ভাই তোমার নিকটে।

For Biharilal Saha, P.o. Amirabad, Dist. Dacca,

তুমি ভাই মোর কাছে
অতীব সুন্দর।
যথা যাই তব সম
না দেখি আর।
কমল-নিন্দিত ঐ
মুখ যবে দেখি,
আনন্দে ভাসয়ে প্রাণ
দেখি ভরে আঁখি।
একবার যদি শুনি
সুমধুর বাণী,
অনিত্য জীবন মোর
ধন্য ব'লে মানি।
যখন বিহার করি
বিহারীর সনে,
অগাধ স্নেহের জলে
ভাসি তার সনে।
দেখিলে ও সুধামাখা
শরীর গঠনে,
হৃদয়ে পুষিয়া রাখি
হেন লয় মনে।
আমার করিয়া তারে
আপনার মত
সাধ হয় শিখাইব
জানি আমি যত।
* * *

অনুকূলচন্দ্রের প্রেমিক চরিত্রের স্বভাব-সুন্দর মাধুর্য পশুপক্ষী ইতর প্রাণীরা পর্যন্ত সহজেই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিত। সে কারণ, ইহারাও অনুকূলচন্দ্রকে নিতান্ত আপন জন জ্ঞানে কতই না ভালবাসিত। অন্তরের একান্ত সহজ টানে ইহারা তাঁহার সহিত অবাধে মেলামেশা করিত এবং তাঁহার সঙ্গসুখ উপভোগ

করিয়া আনন্দে আত্মহারা হইত। এ সম্বন্ধে নিম্নে গুটিবয়েক সাধারণ ঘটনার উল্লেখ করা যাইতেছে।

স্কুল ছুটির পর বাড়ী ফিরিয়া বালক অনুকুলচন্দ্র কোচরে চিড়া-মুড়ি লইয়া বহির্বাটীর আঙ্গিনায় পদ্মার ধারে বাবলা-তলায় আহার করিতে বসিতেন। এই সময় নানা জাতীয় বন্য পাখী নির্ভয়ে তাঁহার কাছে আসিয়া ভিড় করিত। ইহারা নিঃসংকোচে কেহ তাঁহার মাথায়, কেহ কাঁধের উপর, কেহ-বা কোলে চড়িয়া বসিত এবং তাঁহার নিকট হইতে খাবার আদায় করিবার জন্য কলরব করিয়া কত-না আব্দার জানাইত! তিনিও তাঁহার প্রাণখোলা ভালবাসার টানে খুশীমনে ইহাদের জন্য ইতস্ততঃ মুড়ি ছড়াইয়া দিতেন। পাখীগুলি তাঁহার চারিধারে ঘুরিয়া বেড়াইত এবং খুঁটিয়া খুঁটিয়া খাবার খাইতে খাইতে মনের আনন্দে নৃত্য করিত।

আর একটি ঘটনা। একদিন বিদ্যালয়-ছুটির পর বালক মাতৃদেবীর কোন বিশেষ প্রয়োজনে বাড়ীর নিকটবর্তী এক স্বর্ণকারের দোকানে গিয়া একখানা বেঞ্চের উপর বসিয়া আছেন। এই সময় আরও জন-কয়েক লোক সেখানে উপস্থিত ছিলেন। সকলেরই লক্ষ্যে পড়িল, একটি পাখী আকাশে কিঞ্চিৎ ঊর্ধ্বে কিছুকাল ধরিয়া এমনভাবে উড়িতেছে, যেন উহা কোথায়ও একটু আশ্রয়স্থল খুঁজিয়া লওয়ার চেষ্টায় আছে, কিন্তু আশে-পাশে লোকজন দেখিয়া নিচে নামিতে ইতস্ততঃ করিতেছে। এইভাবে কিছুকাল অতিবাহিত হওয়ার পর পাখীটি একবার হঠাৎ ঝুপ্ করিয়া নামিয়া তথায় উপবিষ্ট অনুকুলচন্দ্রের কোলে গিয়া বসিল এবং বেশ কিছু সময় সেখানে আপনমনে থাকিয়া বিশ্রাম-সুখ উপভোগ করতঃ আবার উড়িয়া গেল।

বাড়ীর কুকুর-বিড়ালগুলি অনুকুলচন্দ্রকে এমনই ভালবাসিত যে তাঁহাকে দেখিলেই ইহারা পাগল হইয়া তাঁহার নিকট ছুটিয়া যাইত। আনন্দে লেজ নাড়িতে নাড়িতে ইহারা তাঁহার গায় লাফাইয়া উঠিত। মানুষেরই মত ইহারা তাঁহার মুখের সঙ্গে নিজেদের মুখ লাগাইয়া এবং আরও কত-না ভাবে তাঁহাকে আদর জানাইয়া সোহাগ করিত। উহাদের কাহারও সঙ্গে কখনো তাঁহার একটু সাক্ষাৎ হইলে আর রক্ষা থাকিত না। বহুক্ষণ ধরিয়া নানাভাবে ইহাদিগকে আদরযত্নে শান্ত না করা পর্যন্ত তিনি কিছুতেই নিষ্কৃতি পাইতেন না।

অনুকুলচন্দ্রের অন্যতম চরিত্র-বৈশিষ্ট্য—তাঁহার অপূর্ব অনুসন্ধিৎসু সেবা-প্রবৃত্তির কথা বলিতেছি। বাল্যকালে স্কুলে পড়িবার সময় যেমন তিনি সেবামাহাত্ম্যে সহপাঠীগণের অন্তর জয় করিয়াছিলেন, তেমনই যৌবনারম্ভে মেডিক্যাল স্কুলে অধ্যয়নকালেও স্বীয় স্বভাবসুলভ সেবাপটু ব্যবহারের গুণে পারিপার্শ্বিক সকলকে আপন করিয়া লইয়াছিলেন। গ্রে-ষ্ট্রীটের যে কয়লার গুদামে থাকিয়া তিনি পড়াশোনা করিতেন, তাহার সন্নিকটেই ছিল মিছরির এবং আরও অন্য কয়েকটি কারখানা। এই সকল কারখানায় বহু দরিদ্র কুলি কাজ করিত। তাহারা

অনেকেই ছিল অত্যন্ত অভাবগ্রস্ত। নানারূপ ব্যাধিতে তাহারা কষ্ট পাইত। এই সকল দারিদ্র্যক্লিষ্ট এবং ব্যাধি-পীড়িতদের কিভাবে একটু সুস্থ করিয়া তুলিবেন, এজন্য তাঁহার দুশ্চিন্তার অবধি ছিল না। অধ্যয়নের অবসরে কোনমতে একটু সময় করিয়া লইয়া তিনি তাহাদের সঙ্গে মিশিতেন এবং তাহাদের অভাব-অসুবিধায় যথাসাধ্য সাহায্য করিতেন। এই সকল রোগীদেরও সেবা-শুশ্রূষা ও চিকিৎসা দ্বারা ব্যাধিমুক্ত করিতে তিনি সচেষ্ট হইলেন। তাঁহার সেবাযত্নে কিছুদিনের মধ্যে তাহারা অনেকেই নিরাময় হইয়া উঠিল।

তৎকালে হাটখোলায়—গ্রে-ষ্ট্রীট ও চিৎপুর রোডের মোড়ে হেমন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের * 'লাহিড়ী কোম্পানী' নামে একটি হোমিওপ্যাথিক ঔষধালয় ছিল। হেমন্তবাবুর সহিত অনুকূলচন্দ্রের বিশেষ বন্ধুত্ব জন্মিয়াছিল। ইনি অনুকূলচন্দ্রকে চব্বিশ শিশির একবাক্স হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ও মহেশচন্দ্র ভট্টাচার্য-কৃত একখানি 'পারিবারিক চিকিৎসা'-গ্রন্থ উপহার দিয়াছিলেন। অনুকূলচন্দ্র ইহারই সাহায্যে তাঁহার রোগীদের চিকিৎসা-কার্য চালাইতেন। এইভাবে তদঞ্চলের অধিবাসী ও কারখানার কুলিদের ব্যারাম-পীড়ায় ঔষধপত্রের ব্যবস্থাদি করিতে করিতে কিছুকালের মধ্যেই তিনি বেশ ছোট-খাটো একজন ডাক্তার হইয়া উঠিলেন। দেখিতে দেখিতে তথায় তাঁহার বেশ পসার জমিয়া উঠিল।

মেডিক্যাল স্কুলের অধ্যয়ন-কার্যে সারাদিন অতিবাহিত করিয়া রাত্রিতে বাসায় ফিরিবার পথে অনুকূলচন্দ্র তাঁহার রোগীদের দেখিতে বাহির হইতেন। কুলিদের বাড়ী বাড়ী যাইয়া তিনি প্রত্যেক রোগীর অবস্থার সংবাদ লইতেন। রোগীদের ঔষধপত্র ও ব্যবস্থাদানের প্রয়োজনীয় কার্যাদি সারিয়া গভীর রাত্রে শ্রান্তদেহে তিনি গৃহে ফিরিতেন। এই সময় তাঁহাকে বাড়ী পেঁাছাইয়া দিবার অছিলায় অনুগত কুলিদের জনতা ঔষধের বাক্স মাথায় লইয়া তাঁহার অনুগমন করিত। দরদী অনুকূলচন্দ্রের আপ্রাণ সেবাযত্নে দরিদ্র কুলীরা নিত্যই নিজেদের বিপদ-আপদে পরম স্বস্তি লাভ করিত বলিয়া তাহারা সবাই কৃতজ্ঞতার অর্ঘ-স্বরূপ তাঁহাকে দুই চার আট আনা যে যেমন পারিত দান করিয়া কৃতার্থ হইত। তিনি কিন্তু তাহাদের কাহারও নিকট চিকিৎসা-ব্যয় বাবদ কিছুই চাহিতেন না। স্বেচ্ছায় খুশীমনে তাঁহাকে যে যাহা দিত, তাহাতেই তিনি পরম সন্তুষ্ট থাকিতেন। কুলিদের প্রদত্ত এই অর্থের পরিমাণ নিতান্ত স্বল্প হইলেও, তাহাই ছিল তাঁহার নিকট প্রচুর। এই সময় স্থানীয় অধিবাসী-মহলেও সময় সময় তাঁহার ডাক পড়িত। তাঁহারা অনেকে দৈনিক দেড় টাকা, দুই টাকা, আড়াই টাকা ভিজিট দিয়া তাঁহাকে রোগী দেখাইতেন। এইভাবে ডাক্তারী করিয়া অনুকূলচন্দ্র তখন প্রতিমাসে ৩০/৪০ টাকা উপায় করিতে লাগিলেন। ইহাতে তাঁহার দৈনন্দিন জীবনযাত্রার আর্থিক দুঃখকষ্টের অনেকটা লাঘব হইল। তথাপি, তিনি

* ইনি স্বনামধন্য দেশপ্রেমিক মহাপ্রাণ যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের (বাঘা যতীনের) মাতুল।

কিন্তু তখনও যথাসম্ভব কম খরচে নিজের থাকা-খাওয়ার ব্যয় নির্বাহ করিতেন এবং গরীব প্রতিবেশীদের অভাব-মোচনের জন্যই যথাসাধ্য অর্থ সঞ্চয়ের চেষ্টা করিতেন। সেই উদ্বৃত্ত অর্থ দ্বারা তিনি দুঃস্থ কুলিদের—যাহাদের জামা-কাপড় থাকিত না তাহাদের জামা-কাপড় কিনিয়া দিতেন, যাহাদের খাদ্যাভাব ঘটিত তাহাদের খাদ্য যোগাইতেন, পীড়িতদের ঔষধ ও পথ্যের ব্যবস্থা করিতেন।

সহৃদয় অনুকূলচন্দ্রের এইরূপ সদয় ব্যবহার সরলপ্রাণ দরিদ্র কুলিদের অন্তরের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। ফলে, তাহারা অনুকূলচন্দ্রের সহিত প্রাণের গভীর প্রীতির নিবিড় বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিল। তাঁহাকে ছাড়া তাহারা আর কিছুই বুঝিত না। প্রত্যেকেই মনে করিত, ইঁহার মত দরদী বান্ধব তাহাদের আর কেহ নাই। সে কারণ, তাহাদের অন্তরের সুখ-দুঃখের যত কথা কেহ তাঁহাকে না জানাইয়া থাকিতে পারিত না এবং তাঁহার উপদেশ না লইয়া কেহ কোন কার্য করিত না। প্রাণের আবেগে তাহারা অনেক সময় বলিত,—'ডাক্তার-বাবু, তুমি আমাদের একেবারে বাপ-মা'। তাহারা সর্বক্ষণই অনুকূলচন্দ্রের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও সন্তোষ বিধানের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিত,—তাহাদের যথাসর্বস্ব তাঁহার কল্যাণে উৎসর্গ করিতে উন্মুখ থাকিত। প্রতিবৎসর গ্রীষ্ম ও পূজা উপলক্ষে স্কুল-ছুটির সময় অনকূলচন্দ্র যখন বাড়ী রওনা হইতেন, তাঁহার মালপত্র কুলিরা কে কাহার আগে মাথায় করিবে, সেজন্য তাহাদের মধ্যে কাড়াকাড়ি লাগিয়া যাইত। ঐ দিন তাহারা সকলে দলবদ্ধভাবে ষ্টেশনে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে সযত্নে ট্রেণে তুলিয়া দিয়া ম্লানমুখে বাড়ী ফিরিত। আবার যেদিন তিনি কলিকাতা ফিরিতেন, সকলে নির্দিষ্ট সময়ে ষ্টেশনে উপস্থিত থাকিয়া তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া উৎফুল্ল অন্তরে বাসায় পেঁীছিত। সেবা-মাহাত্ম্যে অনুকূলচন্দ্র বাল্যে ছিলেন খেলার সাথীদের "প্রিয় রাজাভাই", সহপাঠীগণের "প্রাণের প্রভু", যৌবনে হইলেন তিনি প্রতিবেশী দরিদ্র কুলিদের "মনের মানুষ"। তাঁহার প্রতি কুলিদের কি গভীর অনুরাগ ও প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ছিল, তাহারই স্বরূপ প্রকাশ করিতে গিয়া উত্তরকালে একদিন কথাপ্রসঙ্গে অনুকূলচন্দ্র বলিতেছিলেন,—"এরা আমার এত অনুগত হ'য়ে পড়েছিল যে, আমি যদি তাদের দিয়ে ধর্মঘট করাতে চাইতাম, তবে একদিনে ওখানকার সব কারখানা বন্ধ ক'রে দিতে পারতাম।"

ছাত্রাবস্থা হইতে আন্তরিকতার সহিত দুঃস্থ পারিপার্শ্বিকের সেবা করিয়া অনুকূলচন্দ্র মানুষের অন্তর-বাহির সবকিছুর প্রকৃত অবস্থার সহিত সুপরিচিত হইবার যে সুযোগ লাভ করিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি এই অমূল্য অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছিলেন যে, অনুসন্ধিৎসু সেবাই হইল দারিদ্র্য-মোচনের একমাত্র মুখ্য উপায়। দারিদ্র্য-ক্লিষ্ট হইয়াও দরিদ্রের সেবা দ্বারাই কিভাবে দারিদ্র্য-মুক্ত হওয়া যায়—দারিদ্র্যের অভিশাপকে কিভাবে সম্পদের আশীর্বাদে পরিণত করিতে পারা যায়, ছাত্র অনুকূলচন্দ্র তাহাই তাঁহার নিজ জীবনে সপ্রমাণ করিয়াছিলেন। দুঃখ-পূর্ণ ছাত্রজীবনের স্মৃতি আলোচনা-প্রসঙ্গে তাই তাঁহাকে একদিন বলিতে

শুনিয়াছিলাম,—"পড়াশোনার জীবনে আমি যে কঠোর দারিদ্র্যের সঙ্গে যুদ্ধ করেছি, তা আমাকে অনেকখানি ঠিক ক'রে দিয়েছে। অতখানি চরম অবস্থার মধ্যে না পড়লে, মানুষের কষ্ট আজ যেমন ক'রে বুঝতে পারি, তা বোধ হয় পারতাম না। আমার নাম অনুকূল বটে, কিন্তু জীবনের প্রায় প্রতি পদক্ষেপে আমাকে প্রতিকূলতার পাহাড় কেটে এগুতে হয়েছে।"

এইবার আমরা অনুকূলচন্দ্রের বাল্যবন্ধু অবসরপ্রাপ্ত উচ্চপদস্থ সরকারী কর্ম্মচারী শৈলজানন্দ ব্রহ্মচারী ও পণ্ডিত ক্ষিতীশচন্দ্র সান্যাল কাব্যতীর্থ মহাশয়দ্বয়ের নিকট তাঁহার ছাত্রজীবনের যে বিবরণ জানিতে পারিয়াছি, নিম্নে তাহারই কিয়দংশ উদ্ধৃত করতঃ বর্তমান অধ্যায়ের আলোচনা সমাপ্ত করিব।

শ্রদ্ধেয় শৈলজানন্দ ব্রহ্মচারী মহাশয় লিখিয়াছেন—

"আমার বাড়ী পাবনায়। ঠাকুরের (অনুকূলচন্দ্রের) বাড়ী হিমাইতপুরে। ঠাকুরের জন্ম বাং ১২৯৫ সনে, আমার জন্ম বাং ১২৯৮ সনে। সে আমার চেয়ে বয়সে সামান্য কিছু বড়। আমরা 'পাবনা ইন্‌ষ্টিটিউসনে'র ছাত্র ছিলাম। 'পাবনা ইন্‌ষ্টিটিউসন' তখন সহরে বাজারের মধ্যে ছিল। বড় টিনের ঘরে আমাদের স্কুল বসিত। গোপাল লাহিড়ী আমাদের অধ্যক্ষ ছিলেন। অধর মৌলিক আমাদের হেডমাষ্টার ছিলেন। তা-ছাড়া সতীশ সান্যাল, রাজেন চৌধুরী, বিপিন পাল, মহিমবাবু, রমণী চক্রবর্তী, শশিলোচন কাব্যতীর্থ, পঞ্চানন মৈত্র প্রভৃতি আমাদের স্কুলের মাষ্টার ছিলেন।

"ঠাকুর প্রায়ই খালি পায়ে ও শুধু একখানা চাদর গায় দিয়া স্কুলে আসিত। তাহার সহিত আরও দুই চার জন ছেলে আসিত। তাহার ভিতর দেবেন সরকার বলিয়া একটি ছেলে ছিল।

"ঠাকুর দেখিতে খুবই সুশ্রী ছিল। তাহার গায়ের রং মটর ডালের মত ছিল। চোখ দু'টি খুব টানা-টানা এবং মুখখানা তাহার সর্বদা হাসিমাখা ছিল। তাহার চেহারা ছিল শীর্ণ। সহপাঠীরা সকলেই তাহার বশে থাকিত। সে ছিল **Natural Leader of them.** সকলেই তাহাকে মানিয়া চলিত। মাষ্টার মহাশয়রাও তাহাকে খুব ভালবাসিতেন। অতি বিনয়ী নম্রস্বভাব ছেলেকে কে না ভালবাসে!

"আমাদের স্কুল বাজার হইতে উঠিয়া জজকোর্টের ধারে চলিয়া আসে। তখন ১৯০৫ সন, **Bengal partition** হয়। সে সময় স্বদেশী আন্দোলনের যুগ। ঠাকুরও হিমাইতপুরের সে আন্দোলনে মাতিয়া ওঠে।

"তারপর ঠাকুর যখন 3rd class-এ পড়ে, তখনই বোধ হয় খুব অল্প বয়সে তাহার বিবাহ হয়। বিবাহে আমাদের ক্লাসের কয়েকটি ছেলে যাইয়া নিমন্ত্রণ খাইয়া আসে। আমি যাইতে পারি নাই।"

শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র সান্ন্যাল কাব্যতীর্থ মহাশয়ের* বিবৃতি—

"স্বভাব-চরিত্র অভ্যাস-ব্যবহার—সব রকমেই অনুকূল ছিল সদ্গুণের আধার। তার দয়া, মমতা ও সেবার কথা ভুলবার নয়। নৈহাটি থাকা-কালে একবার আমি দাদ-রোগে অনেকদিন খুব ভুগেছিলাম। অনুকূল আমার দুঃখে একান্ত কাতর হ'য়ে একদিন স্থানীয় ডাক্তার নলিনীকান্ত ভট্টাচার্য এল্ এম্, এস্, মহাশয়ের কাছে গিয়ে বলে,—'ডাক্তারবাবু, আমার মেসো মহাশয় Ring worm-এ খুব কষ্ট পাচ্ছেন, তাঁর জন্য একটা ভাল ঔষধের ব্যবস্থা ক'রে দেবেন।' অনুকূলের অনুরোধে উক্ত ডাক্তারবাবু সেবার আমাকে খুব যত্নপূর্বক চিকিৎসা ক'রে সুস্থ করেন। সব সময়ই দেখেছি, কখনও কারও কোন অসুখ-অসুবিধা অনুকূলের চোখে পড়লে তা দূর করার জন্য সে অস্থির হ'য়ে পড়ত।

"উচ্চ আদর্শের প্রতি অনুকূলের গভীর শ্রদ্ধা ছিল। এ সম্বন্ধে একটা ঘটনা মনে পড়ল। একদিন সে আমার সঙ্গে 'মূলাজোর কলেজে'র তৎকালীন লব্ধপ্রতিষ্ঠ ছাত্র শ্রীকালীপদ চক্রবর্তী (অধুনা সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত মহামহোপাধ্যায় শ্রীকালীপদ তর্কাচার্য) মহাশয়ের নিকট গিয়ে বলল—'আপনার কাছে এসেছি, আমাকে দু'খানি বিয়ের উপহার লিখে দিতে হবে। উপহার দু'টির রচনা এমন হবে যে, তা যেন ব্যক্তি-বিশেষের সম্পর্কিত ব'লে মনে না হয়, উহাতে যেন

*প্রশ্নোত্তর সান্ন্যাল মহাশয় আত্মপরিচয় প্রদান-প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—"আমার জন্মভূমি রাজসাহী জিলার অন্তর্গত হরিপুর পোষ্টাফিসের অধীন মাইনম গ্রাম। ইহা অনুকূলচন্দ্রের জন্মস্থান হিমাইতপুর গ্রাম হইতে ২০ মাইল দূরবর্তী। অনুকূলদের সহিত আমাদের আত্মীয়তা অনেক দিনের। পৈতৃক সম্বন্ধে তাঁহারা আমাদের কিছু দূরবর্তী আত্মীয় হইলেও, আমাদের উভয় পরিবারের মধ্যে বিশেষ ঘনিষ্ঠতা ছিল। আমার পিতা শ্রীকৈলাসচন্দ্র সান্ন্যাল মহাশয় অনুকূলের পিতৃদেব শ্রীশিবচন্দ্র চক্রবর্তী মহাশয়ের জীবিতকালে (তিনি তখন পাবনা ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডে কণ্ট্রাক্টরের কার্য করতেন) বহুবার হিমাইতপুর তাঁহাদের বাড়ীতে যাতায়াত করেছেন। বাং ১৩১১ সালের বৈশাখ মাসে আমার বিবাহ হয়। অনুকূল বিবাহ করে বাং ১৩১৩ সালের শ্রাবণ মাসে। বিবাহ-সম্পর্কসূত্রে অনুকূলের সহিত আমাদের আর এক নূতন সম্পর্ক স্থাপিত হয়। সে-সম্বন্ধে অনুকূল আমার স্ত্রীর মাসতুত-বোনের জামাই। এই সম্বন্ধ হওয়ার পর থেকে আমিও বহুবার তাঁহাদের বাড়ী যাতায়াত করেছি।

অর্ধোদয়-যোগের সময় (অনুমান বাংলা ১৩১৪ সাল) থেকে নৈহাটি সহরে শ্রীশশীভূষণ চক্রবর্তী মহাশয়ের বাড়ীতে অনুকূলের সহিত আমি একসঙ্গে কিছুকাল বাস করি। শশীবাবু অনুকূলের মাসতুতবোন-জামাই এবং আমার স্ত্রীর পিসতুত বোন-পো। এই সম্বন্ধ-সূত্রে অনুকূল আমাকে মেসো ব'লে ডাকত। অনুকূলের পিতৃদেব চাকরি জীবনের শেষের কর্মত্যাগ করার পর, অনুকূল শশীবাবুর বাসায় থেকে নৈহাটি হাইস্কুলে পড়ত। সে তখন ১ম কি ২য় শ্রেণীতে (১০ম, ৯ম মানে) পড়ত। আমিও তখন সেই বাসায় থেকে 'মূলাজোর সংস্কৃত কলেজে' অধ্যয়ন করতাম। শশীবাবুর বাড়ীতে অনুকূল ও আমি একত্র থেতাম, এক বিছানায় শুতাম ও একসঙ্গে বেড়াতাম। আমরা দু'জনেই সমবয়সী ছিলাম এবং উভয়েই পড়াশোনা নিয়ে থাকতাম বলে, আমাদের মধ্যে খুবই প্রীতি ও সৌহার্দ্যের ভাব ছিল।"

সর্বজনীন ভাবটি ফুটে ওঠে।' চক্রবর্তী মহাশয়ও তার অনুরোধ-মত ঐরূপ দুখানা উপহার লিখে দিয়েছিলেন। অনুকূল তা পেয়ে খুব খুশী হয়েছিল।

"অনুকূলের চরিত্রে আর একটি জিনিস লক্ষ্য করতাম। তার স্বভাবের এমনি একটা মাধুর্য ছিল, যে-কেউ তার সংস্পর্শে আসত, সেই মুগ্ধ হ'য়ে যেত। সমবয়সী বা বয়সে বড়—সবারই সঙ্গে সে প্রাণখুলে মেলামেশা করত। বন্ধু-বান্ধবদের খাইয়ে সে যেমন আনন্দ পেত, তাদের কাছ থেকেও আব্দার ক'রে খাবার আদায় করতে সে তেমনি ওস্তাদ ছিল। আমাদের প্রতিবেশী কৃষ্ণকাসারী-বাবুর (নৈহাটির তৎকালীন এসিস্টান্ট্ স্টেশন মাষ্টার) উপরই তার জুলুমটা ছিল কিছু বেশী। কৃষ্ণবাবুও অনুকূলের যতকিছু আব্দার হাসিমুখে রক্ষা ক'রে কত খুশী হতেন!

"নৈহাটির বাসায় আমরা রোজ দুবেলা পনর ষোল জনে একসঙ্গে ব'সে খাওয়া-দাওয়া করতাম। খাদ্য পরিবেশণের সময় অনুকূল পাচক ঠাকুরকে বলত—'ঠাকুর, আমায় একটু পরবশ কর'!—তার মানে হ'ল, দয়া ক'রে আমায় একটু ভাল ক'রে খেতে দাও। অনুকূল কাঁঠালের বীচি বড় ভালবাসত। মনে পড়ে, যেদিন তরকারীতে কাঁঠালের বীচি পাকত, অনুকূল পাচক ঠাকুরকে পীড়াপীড়ি ক'রে দু'-চারটি কাঁঠালের বীচি বেশী আদায় করত। এমনি মিষ্টি কথায় সে তার আব্দার জানাতো, পাচক ঠাকুর খুশী মনেই তা' রক্ষা না ক'রে পারত না। বলতে কি, তার শিশুর মত সরল আচরণে সবারই মন গলে যেত।

"অনুকূলের অন্তরটা ছিল দরদে ভরা। একদিনের কথা মনে পড়ে। হিমাইতপুর তাদের বাড়ীতে গিয়েছি। সেদিন বাড়ীতে কেউ ছিলেন না, সবাই গিয়েছিলেন পাবনায়, অনুকূলের এক ভাইয়ের চিকিৎসার জন্য। পরদিন সকালে সকলে বাড়ী ফিরলেন। দুঃখের কথা, অনুকূলের সে ভাইটি মারা যায়। ভাইয়ের জন্য অনুকূলের সারাদিন আর্তকণ্ঠে সে কি করুণ বিলাপ! তার বুকফাটা কান্না শুনে আমিও না কেঁদে পারলাম না।

"নৈহাটি থেকে অনুকূল গেল কলকাতায় ডাক্তারী পড়তে। শশীবাবুই তাকে সেখানে শরৎ মল্লিকের 'ন্যাশন্যাল মেডিকেল স্কুলে' ভর্তি ক'রে দিয়ে এলেন। প্রথম দিকে অনুকূল নৈহাটির বাসা থেকেই মাসিক-টিকিটে কলকাতা গিয়ে স্কুল করত। তারপর সে কিছুদিন মেসে থেকে পড়াশোনা করেছে। তখন আমি মাঝে মাঝে তার কাছে গিয়েছি। কলকাতায় তার অনেক সহপাঠী বন্ধু ছিল। অনুকূল তাঁদের মাঝে মাঝে নৈহাটির বাসায় নিয়ে আসত। তাঁরা এলে তিন চার দিন থেকে যেতেন। এই সময় আমরা তাঁদের নিয়ে খুব আমোদে দিন কাটাতাম। অনুকূলের মধুর ব্যবহার ও আদর-আপ্যায়নায় সহপাঠীরা সবাই খুব মুগ্ধ ছিলেন।

"একবার আমি 'টন্সিল্' রোগে খুব অসুস্থ হ'য়ে কলকাতায় অনুকূলের কাছে যাই। সে-যাত্রাও সে আমার চিকিৎসার জন্য কি চেষ্টাই না করল!

অনুকূল প্রথমত আমাকে তাদের স্কুলের দু'জন অধ্যাপকের কাছে নিয়ে যায়। তাঁরা কিছুকাল বিশেষ যত্ন ক'রেই আমার চিকিৎসা করলেন, কিন্তু ব্যারাম তেমন সারল না। আমি খুব চিন্তিত হ'য়ে পড়লাম। অবশেষে অনুকূল একদিন আমায় বলল—'মেসো, নগেনবাবু ডাক্তারী পাশ করে' Foreign থেকে ফিরে এসেছেন। রাস্তায় তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হলো, তিনি আমাকে তাঁর ঠিকানা দিলেন। আমি আপনাকে তাঁর কাছে নিয়ে যাব।' ডাক্তার নগেন চৌধুরী খ্যাতনামা চিকিৎসক প্রতাপ মজুমদারের জামাতা। নগেনবাবু তখন সবেমাত্র আমেরিকা থেকে 'হোমিওপ্যাথী' শিক্ষা ক'রে দেশে ফিরে এসে শ্বশুরের বাসায় আছেন। অনুকূল যখন পাবনা স্কুলে পড়ত, নগেনবাবু তার শিক্ষক ছিলেন। অনুকূল একদিন আমাকে নিয়ে ডাক্তার নগেনবাবুর বাসায় গেল। বাড়ীতে ঢুকে সে চাকরকে দিয়ে সংবাদ পাঠালো। নগেনবাবু খবর পেয়ে তক্ষুণি নিচে নেমে এলেন এবং অনুকূলকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। অনুকূল তাঁর কাছে আমার অসুখের কথা সব বলল। তিনি আমাকে খুব ভালভাবে পরীক্ষা ক'রে বললেন,—Wonderful tonsil, তবে ভয় নেই সেরে যাবে। তাঁর চিকিৎসায় কিছু দিনের মধ্যেই আমি সম্পূর্ণরূপে সুস্থ হ'য়ে উঠলাম। সেদিন ছাত্র অনুকূল ও শিক্ষক নগেনবাবু পরস্পরের মধুর সম্পর্কের একটা জীবন্ত পরিচয় পেয়ে আমি মুগ্ধ হ'য়ে গিয়েছিলাম।

"নৈহাটি থেকে কলকাতায় এসে পড়বার সময়ই অনুকূল একটু একটু হোমিও-প্যাথী চর্চা করত। গরীব-দুঃখী অনেককেই সে বিনামূল্যে ঔষধ দিত। দেখতাম, তার চিকিৎসায় রোগীরা বেশ সহজেই সেরে উঠত। তার সুচিকিৎসার একটি ঘটনা বলছি। আমাদের 'মূলাজোর কলেজে'র অধ্যাপক শ্রীহরিপদ স্মৃতিতীর্থ মহাশয় একবার কোমরের ব্যথায় খুব কষ্ট পাচ্ছিলেন। আমি অনুকূলের কাছ থেকে ঔষধ নিয়ে তাঁকে দিই। কিছুদিন সে-ঔষধ সেবনের পর তিনি সম্পূর্ণ সেরে ওঠেন। মনে আছে, এজন্য অধ্যাপক মহাশয় অনুকূলের খুব প্রশংসা করেছিলেন।

"ছোটবেলা থেকেই অনুকূল ছিল বেশ সুস্থ, সবল ও সহনপটু। নৈহাটির বাসায় আমরা সবাই সর্দি, কাসি, জ্বর, পেটের অসুখ প্রভৃতি নানা রোগে কত সময় কত ভুগেছি। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, অনুকূলের কোনদিনই কোন অসুখ-বিসুখ হ'তে দেখিনি। আহার-বিহার, আচার-আচরণ, চলন-চরিত্র—সব ব্যাপারেই অনুকূল ছিল সংযমী, স্বাবলম্বী ও সত্যাশ্রয়ী। বেশ-ভূষায় সে ছিল খুব পরিপাটী, অথচ একদম সাদাসিধে। বিলাসিতা সে আদৌ পছন্দ করত না! অল্পমূল্যের সাধারণ কাপড়-চোপড় পরতেই সে অভ্যস্ত ছিল। তার জামা-কাপড় সে নিজেই কেচে নিত। নিজের দেহখানিও সে মেজে-ঘসে খুব পরিচ্ছন্ন থাকত। তাকে কেউ কোনদিন কোনভাবে একটু নোংরা থাকতে দেখেনি। পরিচ্ছদ ও

দেহের শুচিতার ন্যায় অন্তর-শুদ্ধির জন্যও তার নিষ্ঠার অবধি ছিল না। প্রতিদিন সকাল-সন্ধ্যায় সে নিয়মিতভাবে গভীর মনোযোগের সহিত নামধ্যান করত এবং প্রত্যহ শয়নের পূর্বে সে একটি দীর্ঘ হিন্দী দোঁহা পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে সুর ক'রে গান করত। ঐ দোঁহার একটি লাইন—'বিনয় শুনো কির্‌পা করো, দীজে চরণ নিবাসা' এখনো আমার বেশ স্মরণে পড়ে। দিনের বেলায়ও চলতে ফিরতে সে সব সময় মনে মনে গুণ গুণ ক'রে নানা হিন্দী দোঁহা গান করত। অনুকূল বলেছিল, দোঁহাগুলি সে তার মার কাছে শিখেছে।

"সঙ্গীত ও কবিতা রচনায় অনুকূলের খুব ঝোঁক ছিল। একখানা বাঁধানো খাতায় সে তার সুন্দর ঝক্‌ঝকে হস্তাক্ষরে কবিতা ও গান লিখে রাখত। মাঝে মাঝে সেগুলি সে আমাকে পড়ে' শুনাতো। তার সহজ সরল রচনাগুলিতে উচ্চ ভাব-সম্পদ ও প্রাণের পরশের পরিচয় পেয়ে মুগ্ধ হ'য়ে যেতাম।"



অষ্টম অধ্যায়

চিকিৎসাবৃত্তি

কলিকাতায় ডাক্তারী-স্কুলে অধ্যয়নের পর ছাত্রজীবন অতিবাহিত হইলে, অনুকূলচন্দ্র স্বগ্রাম হিমাইতপুরে প্রত্যাবর্তন করেন। ছাত্রাবস্থায় জীবনের পথে তিনি যে বিচিত্র অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছিলেন, তাহারই সম্বল লইয়া এইবার তিনি সংসার-ক্ষেত্রে পদার্পণ করিলেন। তিনি দেখিতেন, লোকে সাধারণতঃ চাকুরি দ্বারা অর্থোপার্জন করতঃ জীবিকা নির্বাহ করিয়া থাকে। সেজন্য সকলের দেখাদেখি তিনিও ডাক্তারী-কার্যের একটি চাকুরির জন্য শিলাইদহ ঠাকুর-ষ্টেটে একখানা দরখাস্ত পাঠাইলেন। আবেদন-পত্রখানার উত্তর পাইবেন, মনে এরূপ কোন আশাও তিনি পোষণ করেন নাই; বিশেষ, চাকুরির জন্য তাঁহার তেমন কোন আগ্রহও ছিল না। যাহা হউক, কিছু দিনের মধ্যেই তাঁহার নিয়োগ-পত্র আসিয়া উপস্থিত হইল। চাকুরিটির মাসিক বেতন ছিল পঞ্চাশ টাকা। তদুপরি বিনা-ভাড়ায় বাসস্থান ও আসবাবপত্রাদি ব্যবহার এবং স্বেচ্ছামত স্বাধীনভাবে চিকিৎসা দ্বারা অতিরিক্ত অর্থোপার্জন প্রভৃতি কতকগুলি বিশেষ সুযোগ-সুবিধাও ইহাতে ছিল। অনুকূলচন্দ্র নিয়োগ-পত্রখানা একবার পড়িলেন। কিন্তু কি আশ্চর্য! ইহা পাঠ করিবামাত্র তাঁহার মাথা ঘুরিয়া গেল, থর থর করিয়া সর্বাঙ্গ কাঁপিতে লাগিল। আনন্দের পরিবর্তে সংকোচে ভয়ে ও বিষাদে তাঁহার দেহ-মন অবসন্ন হইয়া পড়িল।—আপন সত্তা-বিরোধী এই কার্য তিনি কিভাবে করিবেন! অর্থের বিনিময়ে সেবাদান! গোলামি করিয়া—নিজত্ব বিকাইয়া জীবিকার্জন!—ভাবিতে গিয়া তিনি শিহরিয়া উঠিলেন। অনুকূলচন্দ্র বিলক্ষণই জানিতেন, তৎকালে তাঁহাদের পরিবারে যে গুরুতর অভাব-অনটন যাইতেছিল, তাহাতে অর্থাগমের এরূপ সুবর্ণ সুযোগের কথা তাঁহার পিতৃদেব একবার জানিতে পারিলে, যেরূপেই হউক তিনি তাঁহাকে চাকুরিটি গ্রহণ করিতে বাধ্য করিবেন। এই অবস্থায় অনুকূলচন্দ্র পিতাঠাকুরকে এ বিষয় বিন্দুবিসর্গ কিছুই না জানাইয়া নিয়োগ-পত্রখানা তৎক্ষণাৎ টুকরা টুকরা করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিলেন। বলিতে কি, ইহাতে তিনি যেন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিলেন। জনসেবামূলক স্বাধীন জীবনযাত্রাকেই অনুকূলচন্দ্র মনে-প্রাণে যথার্থত শ্রেয় বলিয়া মনে করিতেন। সেদিন হইতে তিনি এই সংকল্প গ্রহণ করিলেন যে, চিকিৎসাবৃত্তি অবলম্বনপূর্বক সর্বসাধারণের সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়া তিনি জীবন-পথে অগ্রসর হইবেন।

অনুকূলচন্দ্র প্রথমত বসন্তকুমার সাহা চৌধুরী নামক জনৈক নিকটবর্তী প্রতিবেশী ভদ্রলোকের সহযোগিতায় তাঁহারই গৃহে একটি 'ডিস্‌পেন্‌সারী' স্থাপন করতঃ

চিকিৎসাকার্য আরম্ভ করিলেন। এলোপ্যাথী ও হোমিওপ্যাথী উভয় মতেই চিকিৎসা চালাইতে তিনি অভিজ্ঞ ছিলেন। যে রোগী যেরূপ চিকিৎসায় সহজে আরোগ্যলাভ করিবে বলিয়া তিনি মনে করিতেন, তাহার জন্য তদ্রূপ ব্যবস্থাই অবলম্বন করিতেন। তরুণ চিকিৎসক অনুকূলচন্দ্রের সহজ সরল জীবনযাত্রা, সবারই জন্য তাঁহার আপ্রাণ ভালবাসা এবং চিকিৎসা ব্যাপারে তাঁহার অসীম নৈপুণ্যের পরিচয় পাইয়া গ্রামবাসী ধনী দরিদ্র সকলে ক্রমে ক্রমে তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পড়িলেন। রোগীদিগকে তিনি যে কিরূপ অশেষ যত্ন সহকারে চিকিৎসা করিতেন, তাহা বলিবার নয়। রোগীর বাড়ীতে উপস্থিত হইয়াই অনুকূলচন্দ্র তাহার শয্যাপার্শ্বে বসিয়া সস্নেহে তাহার সর্বাঙ্গে হাত বুলাইয়া দিতেন, একান্ত আপন জনের মত দরদমাখা মধুর আলাপনে আস্তে আস্তে খুঁটি-নাটি করিয়া তাহার রোগের সকল অবস্থা ও উপসর্গাদির সংবাদ লইতেন। তাঁহার অমিয় মধুর ব্যবহার, প্রাণঢালা যত্ন এবং অন্তর স্পর্শী ভরসার বাণীতে রুগ্নব্যক্তি সহজেই তাহার রোগ যন্ত্রণা ভুলিয়া গিয়া পরম স্বস্তি লাভ করিত।

অনুকূলচন্দ্র ছিলেন দরিদ্র পল্লীবাসীদের দরদী বন্ধু। কেহ অর্থাভাবে ঔষধপত্র খরিদ করিতে না পারিলে, তিনি তাহাকে নিজ ব্যয়ে তাহা সংগ্রহ করিয়া দিতেন। দুঃস্থ রোগীদের জন্য তিনি নিজেই সাগু, বার্লি, মিছরি প্রভৃতি পথ্য-বস্তু কিনিয়া লইয়া যাইতেন। অনেক সময় তিনি স্বয়ং রোগীদের শুশ্রূষা করিতেন এবং প্রয়োজনবোধে এমন-কি তাহাদের পথ্যাদি পর্যন্ত নিজে প্রস্তুত করিয়া দিয়া আসিতেন। তাঁহার ঈদৃশ সেবাপরায়ণ মধুর চরিত্রের জন্য গ্রামবাসীরা তাঁহাকে শুধু চিকিৎসক বলিয়াই জানিত না তাহাদের একজন নিকটতম পরম সুহৃদ্ বলিয়া মনে করিত। তাঁহাকে দিয়া যাহারা একবার চিকিৎসা করাইত, তাহাদের নিজ পরিবারের বা প্রতিবেশী কাহারও কখনও কোন অসুখ-বিসুখ হইলে, তাঁহাকে না ডাকা পর্যন্ত তাহারা কিছুতেই মনে শান্তি পাইত না। বস্তুত তাঁহার প্রতি প্রতিবেশী সকলেরই এমন অগাধ অটল বিশ্বাস জন্মিয়া গিয়াছিল যে, চিকিৎসার্থ তিনি গৃহস্থের বাড়ীতে উপস্থিত হওয়ামাত্র বাড়ীসুদ্ধ সকলে পরম নিশ্চিন্ত বোধ করিত ; রোগীরও মনে হইত, তাহার রোগ-যন্ত্রণা যেন অর্ধেক সারিয়া গিয়াছে।

রোগীরা ছিল অনুকূলচন্দ্রের নিকট তাঁহার প্রাণাধিক আপনজন তুল্য। তিনি কাহারও চিকিৎসার দায়িত্ব একবার গ্রহণ করিলে, তাহাকে সম্পূর্ণরূপে নিরাময় করিয়া না তোলা পর্যন্ত কিছুতেই নিশ্চিন্ত হইতে পারিতেন না। রোগীদের জন্য নিরন্তর চিন্তা-ভাবনায় তিনি এমনই উদ্বিগ্নচিত্ত থাকিতেন যে, তাহাদের কাহারও অবস্থাদি যথাসময়ে জানিতে না পারিলে তাঁহার ছটফটানির অন্ত থাকিত না। এই অবস্থায় রোগীর বাড়ী হইতে ডাক পাওয়ার অপেক্ষা না করিয়াই তিনি অনেক সময় নিজেই অযাচিতভাবে নিঃসংকোচে তাহার বাড়ীতে গিয়া হাজির হইতেন। এ-সম্বন্ধে তাঁহাকে একদিন বলিতে শুনিয়াছি,—"যাহাতে রোগীর আত্মীয়-স্বজন



পিতৃদেব ও ভক্তগণের সহিত শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র

চেয়ারে উপবিষ্ট :—বামদিক হইতে তৃতীয়—পিতৃদেব

দণ্ডায়মান :—বামদিক হইতে তৃতীয়—শ্রীশ্রীঠাকুর

কেহ আমাকে দেখিতে পাইয়া ডাকিয়া নেয়, এই উদ্দেশ্যে কোন রোগীর জন্য যখনই খুব চিন্তিত হইয়া পড়িতাম, আমি নিজেই যাইয়া সেই রোগীর বাড়ীর আশেপাশে ঘুরিতে থাকিতাম।" রোগীদের প্রতি তাঁহার মমত্ব-বোধ এমনই সত্যিকারের সুগভীর ছিল যে, চিকিৎসা ব্যাপারে তাহাদের অভিভাবকদের কোন-রূপ শৈথিল্য ও উদাসীনতা তিনি মোটেই বরদাস্ত করিতে পারিতেন না। এজন্য অনেক সময় তাহাদিগকে ভর্ৎসনা করিতেও তিনি ছাড়িতেন না। ইহা বলাই বাহুল্য যে, তাঁহার তদ্রূপ কঠোর আচরণের জন্য কেহ তাঁহার উপর বিন্দুমাত্র অসন্তুষ্ট হইত না, বরং তাঁহার আন্তরিক সহানুভূতির সরল পরিচয় পাইয়া তাহারা কৃতজ্ঞতা-বোধে অভিভূত হইয়া পড়িত। এ-প্রসঙ্গে তাঁহার কথিত একটি ঘটনা তাঁহারই ভাষায় নিম্নে বিবৃত করিতেছি। একদিন তিনি বলিতেছিলেন—

"তখন আমি ডাক্তারী করি। একবার এক রোগীর বাড়ী থেকে কয়দিন খবরও দেয় না, ঔষধও নিতে আসে না। অথচ বলবৎ রোগী। আমি ভেবে ভেবে সারা। নিজে যে যাব সে ফুরসুতও ক'রে উঠতে পাচ্ছি না। ওরাও আসে না। উৎকণ্ঠায় আমার প্রাণ ওষ্ঠাগত। শেষটা তিন দিন পরে রোগীর বাড়ী থেকে ঔষধ নিতে এলো। লোকটাকে দেখে প্রথমে রোগীর খবর নিলাম, তারপর রেগে আমি এইছান (এমন) গালাগালি সুরু ক'রে দিলাম, সে আর কথা কবে কি ? আমাকে তিনদিন ধ'রে এতখানি দুশ্চিন্তায় ভুগিয়েছে, আমিও মনের ঝাল মিটিয়ে বকলাম। যা' মনে আসলো বল্লাম। অবশ্য, সে বলার মধ্যে উদ্দেশ্য ছিল তাদেরই মঙ্গল। আমার বকা খেয়ে সে বলে—'বাবু, আপনি আর একটু গালান (গালি দিন)। আমার ঘাট হইছে বাবু, আর এমন করব না। তবে, গাল-মন্দ যে এত মিঠে লাগে, আমার জানা ছিল না, আপনি আর একটু গালান। আপনার মুখে কথা-গুলি কত ভাল শোনালো, আর কেউ আমাকে এমন কথা কলি (কহিলে) তার ঘাড়ড়া আমি ছিঁড়ে ফেলতাম না এতক্ষণ ! কিন্তু আপনি কি সুন্দর ক'রে ক'লেন'।"

আলোচনা-প্রসঙ্গে, ২য় খণ্ড।

দুঃস্থ বিপন্ন গ্রামবাসীদের জন্য অনুকূলচন্দ্রের কতখানি গভীর দরদ-বোধ ছিল, তাহার দৃষ্টান্তের অবধি নাই। আমরা নিম্নে বহু ঘটনার একটি বিবৃত করিতেছি।

একবার হিমাইতপুর ও তৎপার্শ্ববর্তী গ্রামাঞ্চলে কলেরা রোগের ব্যাপক প্রাদুর্ভাব ঘটিয়াছিল। দেখিতে দেখিতে দিন কয়েকের মধ্যেই বহু লোকের মৃত্যু ঘটিল। চারিদিকে হাহাকার পড়িয়া গেল। গ্রামবাসীদের দুঃখে অনুকূলচন্দ্রের কোমল মন বিগলিত হইল। আর্তের রক্ষার্থ তাহাদের কাছে ছুটিয়া যাইবার জন্য তিনি অস্থির হইয়া পড়িলেন। কিন্তু তাঁহার পিতামাতা এই কাল-ব্যাধির বিকট লীলাভূমিতে তাঁহাকে একটি বারের জন্যও যাওয়ার অনুমতি দিতে চাহিলেন না। এই অবস্থায় অনুকূলচন্দ্র নিদারুণ মর্মবেদনায় ছটফট করিতে লাগিলেন। অবশেষে তিনি জনক-জননীকে কাতরকণ্ঠে বিশেষ অনুনয়-বিনয় সহকারে বুঝাইয়া বলিলেন,

—"দেখুন, এত ক'রে ডাক্তারী বিদ্যাটা শিখলাম, দুঃস্থের সেবায়, বিশেষ, এই সংকট-কালে যদি লোকের প্রাণ-রক্ষায় তা লাগাতে না পারলাম, তবে আর কি হ'লো ? আমারই বা বেঁচে থাকার মূল্য কি ? কত লোক চারিদিকে অচিকিৎসায় মারা যাচ্ছে, প্রতিকারের কোন চেষ্টা না ক'রে, ব'সে ব'সে তা দেখে কি ভাবে সহ্য করবো ?" যাহা হউক, অনেক বলিয়া কহিয়া পিতামাতাকে রাজী করাইয়া তিনি মাত্র একদিনের জন্য তথায় যাওয়ার অনুমতি পাইলেন।

সেদিন ভোরবেলা কিছু আহারাদি করিয়া অনুকূলচন্দ্র দুর্গতদের সেবাদানের জন্য সেই মহামারী-বিধ্বস্ত অঞ্চল অভিমুখে যাত্রা করিলেন। একজন লোক ঔষধের বাক্স লইয়া তাঁহার সঙ্গে চলিল। অনুকূলচন্দ্র প্রতি পল্লীতে গিয়া বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়া রোগীদের দেখিতে লাগিলেন, তাহাদের প্রত্যেকের ঔষধ-পত্রের ব্যবস্থা করিলেন এবং সেবাশুশ্রূষাদি সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় উপদেশ দান করিলেন। এই-ভাবে তিনি সারাদিন দ্রুতপদে হাঁটিয়া, হিমাইতপুরে, কাশীপুরে, প্রতাপপুরে, ছাতুনি, পৈলানপুরে, নাজিরপুর প্রভৃতি অনেকগুলি গ্রামের শত শত রোগীর চিকিৎসাপত্রের যথাযথ ব্যবস্থা করিয়া সন্ধ্যার পর ক্লান্ত দেহে গৃহে ফিরিলেন। পরদিন হইতে রোগীদের আত্মীয়-স্বজনরা বাড়ীতে আসিয়া তাঁহাকে সংবাদ দিতে লাগিল, ঔষধ সেবনে রোগীদের প্রত্যেকের অবস্থা আশ্চর্যরূপে দ্রুত উন্নতির দিকে যাইতেছে। তখন হইতে তিনি নিজ বাড়ীতে থাকিয়াই লোক-মারফত ঔষধ প্রেরণ ও ব্যবস্থা প্রদান করিয়া নিয়মিতভাবে রোগীদের চিকিৎসা-কার্য চালাইতে লাগিলেন। এইভাবে সে-যাত্রা তাঁহার সময়োচিত স্বতঃস্বেচ্ছ সেবাদানের ফলে ও অব্যর্থ চিকিৎসার গুণে কিছুদিনের মধ্যেই তদঞ্চলের কত শত লোক যে অনিবার্য মৃত্যুর কবল হইতে রক্ষা পাইয়াছিল, তাহা বলিবার নয়।

চিকিৎসা-কার্য পরিচালনায় অনুকূলচন্দ্র স্বভাবতই সুগভীর মনোযোগ-প্রয়োগে অভ্যস্ত ছিলেন। আর্তের প্রতি সহজ মমতাবশত তিনি সর্বদাই রোগের মূলীভূত কারণ নির্ণয়ের জন্য তৎপর থাকিতেন। সেজন্য অত্যল্প কালের মধ্যেই চিকিৎসা-ব্যাপারে তিনি অপূর্ব দক্ষতা অর্জন করিতে পারিয়াছিলেন। বস্তুত কারণ-সন্ধানী নিরন্তর ধ্যানপরায়ণতার জন্য তাঁহার বোধশক্তি ক্রমশই এমন প্রখর হইয়া উঠিয়াছিল যে, কোন রোগীকে দেখামাত্রই তাহার রোগের প্রকৃত কারণ, ইহার সকল লক্ষণ, উপসর্গ ও অবস্থাদি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অতিশয় সুস্পষ্টভাবে তাঁহার তীক্ষ্ণ সূক্ষ্ম দৃষ্টির কাছে অনায়াসেই ধরা পড়িত। রোগী-বিশেষের আরোগ্যের জন্য যে নির্দিষ্ট ঔষধটির প্রয়োজন, তাহাও তৎক্ষণাৎ তাঁহার মানস-পটে ভাসিয়া উঠিত, এবং এমন-কি, উহা তাঁহার ঔষধের বাক্সের মধ্যে যে স্থানে রহিয়াছে, তাঁহার হাতখানাও স্বতঃই ঠিক সেইস্থানে গিয়া হাজির হইত। বলিতে কি, তাঁহার ঔষধ-নির্বাচন এমনি নির্ভুল হইত যে, ইহার প্রয়োগে অব্যর্থ সুফল ফলিত। সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টির ফলে কঠিন পীড়ার ব্যবস্থাপত্র এইভাবে আপনা-আপনি তাঁহার মস্তিষ্কে আসিয়া উপস্থিত হইত বলিয়া, অতিশয় দুরারোগ্য

রোগীকেও তিনি অত্যল্প কালের মধ্যেই নিরাময় করিয়া তুলিতে পারিতেন। তাঁহার এইরূপ অদ্ভুত ক্ষমতা দেখিয়া জনসাধারণ মনে করিত,—তিনি মন্ত্র জানেন, দৈবশক্তি ভিন্ন কেহ এমন সহজে এরূপ কঠিন রোগ সারাইতে পারে কি ?

এই বিষয়ে আলোক-পাতের জন্য আমরা পরবর্তীকালের একটি আলোচনা-প্রসঙ্গ এখানে লিপিবদ্ধ করিতেছি। ফ্রী-প্রেসের রিপোর্টার ইন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয়ের সঙ্গে ঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের কথোপকথন হইতেছে। ইন্দ্রনাথবাবু প্রশ্ন করিতেছেন এবং ঠাকুর অনুকূলচন্দ্র তাহার উত্তর দিতেছেন।—

প্রশ্ন—লোকমুখে শুনিতে পাই, আপনি নাকি অনেক অলৌকিক ও অদ্ভুত কাজ করিয়াছেন—কিরূপে করিলেন ?

উত্তর—আমি অলৌকিক ও অদ্ভুত কিছু জানি না এবং করিও নাই—মানুষে ঐ রকম যা'-তা' বলে। আমাকে যেমন দেখিতেছেন, আমি তাহাই। অদ্ভুত আমরা তখনই ভাবি, যখন আমরা কারণ জানি না। আপনি শর্টহ্যান্ডে লিখেন, এটা আমার কাছে অদ্ভুত, কারণ আমি উহা জানি না। আমি যখন হোমিও-প্যাথী প্র্যাক্‌টিস্ করিতাম, তখন ঔষধ সম্বন্ধে, রোগের কারণ সম্বন্ধে এবং মানুষ সম্বন্ধে আমি মনে মনে ভাবিতাম।

একদিন কাশীপুরের রাস্তা দিয়া রোগী দেখিতে যাইতেছিলাম—রাস্তায় একটি মুসলমানকে মাথায় ধামা ও হাতে গোটাকতক বোয়াল মাছের বাচ্চা লইয়া পাবনা বাজার হইতে আসিতে দেখিলাম। তাহাকে দেখিয়া হোমিওপ্যাথিক ঔষধ 'ভিরাট্রাম এলবাম'-এর ছবি মনে পড়িল। অমনি তাহাকে বলিলাম,—'ভাই, তুমি কখনও এ মাছ খাইও না, তোমার অত্যন্ত পেটের অসুখ করিবে।' তাহাতে সে বলিল—'খোদা পয়দা করিয়াছেন, একদিন মরিতেই হইবে।' এই বলিয়া চলিয়া গেল, আমিও চলিয়া গেলাম। রোগী দেখিয়া আমি বাড়ী ফিরিয়াছি, কিছুক্ষণ পরেই দেখিলাম, সেই লোকটির একটি আত্মীয় আসিয়া আমাকে বলিল যে, লোকটির দুইবার দাস্ত হইয়াছে, হাত-পা ঠাণ্ডা, অত্যন্ত গা বমি-বমি—খিল ধরার মত হইয়াছে। পাবনা হইতে আসিয়া হাত-পা ধুইয়া কেবল তামাক খাইতেছে, এমন সময়ে পেটের ভিতর কল্-কল্ করিয়া উঠিল, একবার বাহ্য গেল,—তারপর সমস্ত গা ঝিম্ ঝিম্ করিতে লাগিল, কপালে ঘাম হইতে লাগিল। তার কিছু-ক্ষণ পরেই আর একবার দাস্ত হওয়ায় তাড়াতাড়ি আপনাকে ডাকিতে পাঠাইয়াছে। আমি গিয়া তাহাকে 'ভিরাট্রাম এলবাম ৩০' দিলাম, রোগীও আরোগ্য হইল—সে বিশ্বাস করিল না, আমি ঔষধ দিয়া তাহাকে সারাইয়াছি, মানুষের কাছে বলিতে লাগিল—আমি অলৌকিক বিদ্যা জানি।

প্রশ্ন—লোকটিকে দেখিবামাত্রই আপনি বুঝিতে পারিলেন, তাহার কলেরা হওয়ার সম্ভাবনা আছে,—এই অদ্ভুত পর্যবেক্ষণের ক্ষমতা আপনি লাভ করিলেন কেমন করিয়া ?

উত্তর—মানুষ কোন জিনিষ লইয়া যদি sincerely engaged থাকে—

আর তা apply করে, তাহ'লে তা' হ'তে মানুষের experience হয়, common sense grow করে, আর শেষে তা' instinct-এর মত হ'য়ে আসে—আর তার ফলেই বোধহয় আমার অমনতর হয়েছিল।

অনুকূলচন্দ্রের অদ্ভুত রোগনির্ণয়-ক্ষমতার আর একটি ঘটনা উল্লেখ করা যাইতেছে। নাজিরপুর-নিবাসী দুর্গানাথ সান্যাল মহাশয় বলিয়াছেন।—

"আমার বড় ভগিনী আমাশয়-রোগে একবার অসুস্থ হইয়া অনুকূলচন্দ্রকে দিয়া তাঁহার চিকিৎসা করাইবার একান্ত আগ্রহ প্রকাশ করেন। দিদির বিশেষ অনুরোধে আমি তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে ডাকিয়া আনি। তিনি আসিয়া রোগীকে বিশেষভাবে পরীক্ষা করিলেন। অতঃপর আমাকে গোপনে ডাকিয়া কহিলেন,—'দাদা, ঔষধ দিয়ে কি করব? রোগীর অবস্থা যেরূপ দেখছি, আমার মনে হয়, এ রোগী বাঁচবে না।' তাঁহার কথায় একান্ত বিস্মিত হইয়া আমি বলিলাম,—'সে কি! ব্যারামটা তো খুব সাধারণ ব'লেই মনে হয়। ইহা কি এমনই গুরুতর যে, রোগীর জীবন-সংশয় আশঙ্কা করা যেতে পারে?' প্রত্যুত্তরে তিনি বলিলেন,—'রোগটা বাহ্যত তেমন কঠিন ব'লে মনে না হ'তে পারে, কিন্তু আমার মনে হয়, অচিরেই ইহা মারাত্মক হ'য়ে দাঁড়াবে, চিকিৎসায় তাহা রোধ করা কিছুতেই সম্ভব হবে না। ঔষধ দিবার কথা বলছেন,—তা আমি দিচ্ছি, কিন্তু আমার ভয় হয়, রোগীকে রক্ষা করা যাবে না।' ঔষধ-সেবন চলিল। আশ্চর্যের বিষয়, চতুর্থ দিনে রোগীর অবস্থা হঠাৎ সাংঘাতিক হইয়া উঠিল। দিদি আর রক্ষা পাইলেন না।"

যতই দিন যাইতে লাগিল, অনুকূলচন্দ্রের অত্যাশ্চর্য রোগনির্বাচন-ক্ষমতা, অভ্রান্ত ব্যবস্থাদান, অশেষ-স্নেহপূর্ণ রোগী-পরিচর্যা এবং সর্বোপরি দরিদ্রের প্রতি তাঁহার অপার দয়া-দাক্ষিণ্য প্রভৃতির বহুল পরিচয় পাইয়া, গ্রামবাসী সকলে গভীর কৃতজ্ঞতা-বশে তাঁহার একান্ত অনুরক্ত হইয়া পড়িল। এইভাবে অনুকূলচন্দ্র আপনার মধুর চরিত্র, প্রখর বুদ্ধি ও অপার সেবাগুণে অল্পদিনের মধ্যেই পারিপার্শ্বিকের অন্তর জয় করিতে সমর্থ হইলেন। দেখিতে দেখিতে তাঁহার বাড়ীতে রোগীর ভিড় জমিয়া গেল। বৎসর-দুই যাইতে না যাইতেই খ্যাতিমান চিকিৎসক বলিয়া চারিদিকে তাঁহার সুনাম ছড়াইয়া পড়িল। কেহ বলিল,—"ও'র হাতে রোগী মরে না।" কেহ বলিল,—"উনি মরা মানুষ বাঁচাতে পারেন।" কেহ-কেহ বা প্রচার করিতে লাগিল,—"উনি তো ডাক্তার নন—ফকির, ফকিরালী জানেন।" আর দীন-দরিদ্র-দুঃস্থেরা অন্তরের অন্তর দিয়া বুঝিল,—তাঁহার মত দরদী বান্ধব তাহাদের আর কেহ নাই।

রোগীদের চিকিৎসা-ব্যাপারে অনুকূলচন্দ্র তাহাদের নিকট ভিজিট বা ঔষধের মূল্য বাবদ অর্থাদি কিছুই চাহিতেন না। তাঁহাকে সন্তুষ্টচিত্তে যে যাহা দিত, তাহাই তিনি খুশী মনে গ্রহণ করিতেন এবং পরমারাধ্যা জননীদেবীর শ্রীচরণে অর্ঘ্যাঞ্জলি দিয়া নিজেকে ধন্য মনে করিতেন। এইভাবে সকলের স্বতঃস্ফূর্ত

অবদানে তাঁহার অর্থোপার্জ্জনের পরিমাণ দিন দিন ক্রমশ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। শুনিলে বিস্ময় বোধ হয়, সে যুগে হিমাইতপুরের মত এক নগণ্য গণ্ডগ্রামে মাত্র কয়েক বৎসরের ডাক্তারীকালে অনুকূলচন্দ্রের উপার্জ্জন মাসিক প্রায় হাজার টাকা পর্যন্ত উঠিয়াছিল। চিকিৎসক হিসাবে তাঁহার এইরূপ অসাধারণ কৃতিত্বের কথা চারিদিকে এমন ব্যাপকভাবে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল যে, বহু দূরবর্তী স্থান হইতে নানা দুরারোগ্য রোগের চিকিৎসার জন্য অনেকে তাঁহার শরণাপন্ন হইত। দেখিতে দেখিতে কিছু কালের মধ্যেই সকলে তাঁহাকে কলিকাতা মহানগরীর শ্রেষ্ঠ ডাক্তারগণের অনুরূপ ভিজিট দিয়া রোগী দেখাইতে লাগিল। অবশেষে এক সময় এমন হইয়াছিল, একশত এক টাকা ভিজিট দিয়াও তাঁহার ব্যবস্থাপত্র পাইবার জন্য কত লোক তাঁহার বাড়ীতে আসিয়া ভিড় করিত। শুনিয়াছি, তাঁহাকে রোগীর বাড়ীতে নিয়া যাওয়ার জন্য সে সময় প্রত্যহ দশ বার খানা পাল্কি সর্বক্ষণ তাঁহার বাসভবনে প্রস্তুত থাকিত।

চিকিৎসা-কার্যে অনুকূলচন্দ্রের পূর্বোক্তরূপ অসামান্য প্রতিষ্ঠা-লাভ অনেকেরই চক্ষে ভাল লাগিত না। একজন যুবক চিকিৎসককে স্বল্প-কালের মধ্যে এরূপ প্রভূত প্রসার-প্রতিপত্তি লাভ করিতে দেখিয়া, স্থানীয় প্রবীণ ডাক্তারগণ ঈর্ষান্বিত হইয়া উঠিলেন। তাঁহারা অনুকূলচন্দ্র সম্বন্ধে নানা অবাস্তব আজগুবি মিথ্যা নিন্দাবাদ প্রচার করিয়া তাঁহাকে লোকসমাজে হেয় প্রতিপন্ন করিতেও চেষ্টার ত্রুটি করিলেন না। বলা বাহুল্য, লোক-সেবক মহাপ্রাণ অনুকূলচন্দ্র তাঁহাদের এই হীন আচরণের প্রতি মোটেই ভ্রূক্ষেপ করিতেন না। পরম নিষ্ঠার সঙ্গে অবিচলিত চিত্তে তিনি আপন কর্তব্য নিরন্তর পালন করিয়া যাইতেন। এ-প্রসঙ্গে এইবার অধ্যায়-শেষে, আমরা অনুকূলচন্দ্রের ডাক্তারী-জীবনের কথা, যাহা সময় সময় তাঁহার মুখে শুনিয়াছি, কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিতেছি।—

"ডাক্তারী যখন সুরু করলাম, স্থানীয় ডাক্তাররা প্রাণপণ শত্রুতা করেছে। বিধিমত চিকিৎসা ক'রে রোগ সারালেও তারা বলতো,—আমি তুক্ করে রোগ সারিয়েছি।......বসন্ত চৌধুরী প্রভৃতি ফাঁক পেলেই আমাকে মানুষের সামনে অপমান ক'রে ছেড়ে দিতেন। তাঁদের ঐ অপমান আমি গায় মাখতাম না। যে আমার বিরুদ্ধে যাই বলুক, কারুর বিরুদ্ধে বলবার মত আমার কখনো মন হ'তো না। কারুর বিরুদ্ধে বলব কি? কোন রোগী হাতে নিলে তাকে ভাল করবার জন্য প্রাণ ছটফট করত, সেই ধান্ধাতেই আমি অস্থির। বার বার রোগীর বাড়ী গেলে লোকে কিছু মনে করে, সেজন্য রোগীর বাড়ীর কাছে গিয়ে ঘুরতাম, ভাবতাম, একবার ডাকলে আর একবার যেয়ে রোগীর অবস্থাটা দেখে আসি, তাকে আর একবার সাহস ভরসা দিয়ে আসি। টাকার জন্য আমি কোনদিন ডাক্তারী করিনি, কিন্তু টাকা আসতো খুব। অবস্থা খারাপ দেখলে টাকা নিতাম না, বরং ঔষধের জন্য গাঁটের থেকে টাকা খরচ করতাম। এ করতাম নিজেরই শান্তির

গরজে। পরে এমন হ'লো, যারা আমার নিন্দা করত, মানুষে তাদের তাড়া করত।"

উক্তরূপে অন্য এক দিনের কথা—

"আমি যখন ডাক্তারী করি তখন আমার হাতে রোগী আরাম হতো খুব। আর চারিদিকে খুব সুনাম প'ড়ে গেল। খুব সুখ্যাতি করতো সবাই। এতে স্থানীয় প্রবীণ চিকিৎসকদের মধ্যে কেউ কেউ খুব ঈর্ষান্বিত হ'য়ে উঠলো। লোকের সামনে আমাকে হীন কটূক্তি ক'রে অপমান করতেও কুণ্ঠিত হ'তো না। আমি চুপ ক'রে থাকতাম। আর পিছনে আমার সম্বন্ধে যে কি বলতো না বলতো তার তো ঠিক-ঠিকানাই ছিল না। লোকে বলত—'যাই কন, রোগী তো সেরে তোলে ডাক্তারবাবু, আর টাকাপয়সার উপর লোভ বলতে নেই, কেমন মিষ্টি কথা, কেমন মিষ্টি ব্যবহার! আমরা ঘরের মানুষ রোগীর জন্য যতখানি ব্যস্ত না হই, ডাক্তারবাবু যেন তার চাইতে ব্যস্ত হ'য়ে পড়ে।' তার উত্তরে বলতো—'রোগ সারানের কথা আর ক'য়ো না। ও কি আর ডাক্তারী জানে যে, চিকিৎসা ক'রে রোগ সারাবে? ডাক্তারী ওর ভান, ডাক্তারী ও কিছুই জানে না, ওর মা কামাখ্যা থেকে কি কি জানি শিখে এসেছে, তার জোরে রোগ সারে। এই রোগ সারাবার মজা পরে টের পাবে। অসুখ যাপ্য থাকে, পরে যখন ঠেলা দেবে তখন টের পাবে। তখন আর ওই জারিজুরিতে কুল পাবে না, আমাদের কাছেই দৌড়োন লাগবে। আর রোগীর পর দরদ দেখাবার কথা যে বলছ, পেটে বিদ্যাবুদ্ধি না থাকলে একটা ভোল ধ'রে মানুষের মন ভোলান লাগবে তো, তাই অমনি খোশামোদি করে। ওর কথা ছাড়ান দাও তোমরা।' লোকের মনে সন্দেহ হয়, ভাবে, সত্যিই কি তাই নাকি? কিন্তু যত দিন যায় তত দেখে, যারা সুস্থ হয়েছে আমার হাতে তারা তো সুস্থই আছে, যাপ্য অসুখ তো বেড়ে উঠছে না। এই রকম চলে, সব কথা আমার কানে আসে, কিন্তু আমি চুপ ক'রে থাকি, কারও বিরুদ্ধে একটা কথাও বলি না, বরং ভাল যার বিষয়ে যা' জানি তাই বলি এবং আমার যে তাদের কাছে অনেক শিখবার আছে, তাও বলি। এতে ওরা যেন কেমন হতবাক্ হ'য়ে থাকে—ভাবে, ডাক্তারবাবু খুব ভাল মানুষ, কিছু বোঝে না, আর শরীরে রাগও কম। পরে একজন ডাক্তার এক গ্রামে মুসলমানদের সামনে আমার বিরুদ্ধে যা'-তাই বলছে, এমন সময় একটা লোক ক্ষিপ্ত হ'য়ে তাকে তাড়া করলো। সে বললো—'তবে রে শালা! চক্রবর্তী-মশার ছাওয়ালের খামাকা নিন্দা করা আমি দেখাচ্ছি তোকে। সে ভদ্রলোক মানুষের ভাল ছাড়া মন্দ করে না, ভাল ছাড়া মন্দ কয় না, বিপদে-আপদে বুক দিয়ে আসে পড়ে, দাবী-দাওয়ার ধার ধারে না, দরকার হ'লে গাঁটের পয়সা খরচ করে রোগীর জন্য, আর তার নামে যত অকথা-কুকথা। তার সেই খাপ্পা মেজাজ দেখে সে আজও দৌড়, কালও দৌড়।"

নবম অধ্যায়

মনোব্যাধির নিরাকরণে

চিকিৎসা-ব্যাপারে স্বগ্রামের চতুষ্পার্শ্বস্থ স্থানসমূহের নিম্নোন্নত সকল শ্রেণীর লোকের সঙ্গেই অনুকূলচন্দ্রের ঘনিষ্ঠ মেলামেশার অবকাশ ঘটিয়াছিল। ইহারই ফলে সমাজের আভ্যন্তরীণ অবস্থায় প্রকৃত স্বরূপ তিনি সুস্পষ্টরূপেই প্রত্যক্ষ করিতে পারিয়াছিলেন। তদঞ্চলে তখন নীতিজ্ঞানহীন দুর্বৃত্ত লোকের অভাব ছিল না। পরস্বাপহরণ, পরস্ত্রীগমন, মদ্যপান, গুপ্তহত্যা প্রভৃতি এমন কোন ঘৃণিত পাপ-কার্য ছিল না, যাহাতে সুযোগ পাইলেই তাহারা লিপ্ত না হইত। উন্মুক্ত দিবালোকে নারীধর্ষণ, রাহাজানি, ডাকাতি প্রভৃতি দুষ্কর্ম প্রায়শই লাগিয়া থাকিত। আর জমা-জমি লইয়া মারামারি খুনাখুনি মামলা-মোকদ্দমা প্রভৃতি অনর্থের তো অবধিই ছিল না। গ্রামের মধ্য দিয়া কোন স্ত্রীলোক পাল্কি করিয়া যাইতেছেন, দুর্বৃত্তেরা জানিতে পারিলে, তাঁহার গন্তব্যস্থানে পৌঁছান প্রায়ই ঘটিয়া উঠিত না। পল্লীর বালিকা ও বধূগণের সঙ্গিহীন অবস্থায় নদীতে গমনাগমন তখন স্বপ্নেরও অগোচর ছিল। কোন যুবতী বধূ বা কন্যার আপন গৃহমধ্যেও নিরুদ্বেগে নিদ্রা যাইবার উপায় ছিল না, পাছে বেড়া ভাঙ্গিয়া বা সিঁধ কাটিয়া ঘরে ঢুকিয়া পাষণ্ডেরা তাহাকে লইয়া পলায়ন করে। পথচারীদের নিরাপদে রাস্তা দিয়া যাতায়াত করা একরূপ অসম্ভব ছিল। আবার, এই সকল দুর্দান্ত দুর্জনদের কথা রাজপুরুষের গোচরীভূত করা কাহারও সাহসে কুলাইত না। আপন গ্রামবাসীদের অনেকেরই এইরূপ অধোগতি ও উচ্ছৃঙ্খলতা লক্ষ্য করিয়া দরদী অনুকূলচন্দ্রের অন্তরখানা বেদনায় ভরিয়া উঠিল। তিনি দেখিলেন,—দেহের রোগ সাময়িক, তাহা অল্পদিনেই সারিয়া যাইতে পারে, কিন্তু মনের ব্যাধিই মানুষকে চিরদিন কষ্ট দেয়, আর মনোবিকারগ্রস্ত ব্যক্তিরাই সমাজ-জীবনে অসাধ্য অনর্থের সৃষ্টি করে—সমাজকে দুর্দশার চরমে লইয়া যায়। এই কঠিন বেদনাময় প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ফলে লোককল্যাণভিক্ষু অনুকূলচন্দ্র অধঃপতিত জনগণের অন্তরের সঞ্চিত কলুষরাশি পরিমার্জিত করিয়া তাহাদিগকে উন্নত আদর্শে উদ্বুদ্ধ করিবার জন্য স্বতঃই ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন।

এইবার অনুকূলচন্দ্র তাঁহার ডিস্পেন্সারিটি বসন্তকুমার সাহা চৌধুরীর বাড়ী হইতে নিজ বহির্বাটীর সম্মুখে পদ্মার ধারে একখানা ছোট চৌচালা ঘরে উঠাইয়া আনিলেন এবং বাল্যসখা ডাক্তার অনন্তনাথ রায়ের হস্তে ইহার পরিচালনার ভার অর্পণ করিলেন। তখন হইতে তিনি মানুষের দেহরোগের চিকিৎসা ছাড়িয়া তাহাদের মনোব্যাধির নিরাকরণে তাঁহার সকল শক্তি, বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতা নিয়োজিত করিতে বদ্ধপরিকর হইলেন। তিনি বুঝিলেন,—শাসনে, তিরস্কারে ও শুদ্ধ

উপদেশে বা বাধাপ্রদান করিয়া এই সকল চিরাভ্যস্ত দুষ্কর্ম হইতে পতিত মানবকে প্রতিনিবৃত্ত করা কখনও সম্ভবপর হইবে না। তাই, তিনি ভালবাসার সহিত সহজভাবে মেলামেশা করিয়া তাহাদের সঙ্গে অন্তরের নিবিড় যোগসূত্র স্থাপন করিতে যত্নশীল হইলেন। উদ্দেশ্য-সিদ্ধির জন্য তিনি তদবধি তাহাদের সঙ্গে নানাভাবে পরম প্রীতিভরে সহযোগিতা করিতে লাগিলেন,—নিজেই অর্থব্যয় করিয়া তাহাদের ভাল খাওয়া-পরা এবং বিপদে আপদে সাহায্যের ব্যবস্থা করিলেন, এবং নানা উপলক্ষ সৃষ্টি করিয়া প্রায়শ তাহাদের সঙ্গে মিলিত হইয়া বল, ভরসা ও সাহস প্রদানে তাহাদিগকে উৎসাহিত করিতে লাগিলেন। কেহ জানিত না, কেন তিনি উহাদের মত দুশ্চরিত্র লোকের সঙ্গে এমনভাবে অবাধে মেলামেশা করিতেছেন। ইহাতে গ্রামবাসী অনেকেই সন্দেহ করিতে লাগিলেন, হয়ত বা তিনিও তাঁহাদের দলে ভিড়িয়া গেলেন। অনেকে দুঃখ করিতে লাগিলেন,—হায়, এমন ভাল মানুষটি বুঝি এই অল্প বয়সেই পথভ্রষ্ট হইয়া গেল। এ জন্য পিতামাতার তিরস্কারও তাঁহাকে কম সহ্য করিতে হইল না। কিন্তু এ-সকল কোন-কিছুতেই তাঁহার বিন্দুমাত্র ভ্রূক্ষেপ ছিল না। প্রাণতুল্য ঐ-সকল বিভ্রান্ত আপনজনদিগকে কিভাবে পাপের পঙ্কিল পথ হইতে ফিরাইয়া আনিবেন, অহর্নিশ ইহাই ছিল তাঁহার অন্তরের একমাত্র ভাবনা। যতকিছু নিন্দা, অপবাদ, বাধা উপেক্ষা করিয়া তরুণ চিকিৎসক অনুকূলচন্দ্র পতিতের ত্রাণতপস্যায় অবিচল রহিলেন।

অনুকূলচন্দ্রের অকৃত্রিম সেবায় ও অফুরন্ত ভালবাসার অপূর্ব প্রভাবে ঐ-সকল দুর্বৃত্ত ব্যক্তিরা অল্পদিনের মধ্যেই তাঁহার প্রতি এমন আকৃষ্ট হইয়া পড়িল যে, তাহারা তখন একদণ্ডও তাঁহাকে ছাড়া আর থাকিতে পারিত না। তাহারা দেখিত,—সবাই তাহাদিগকে ঘৃণা করে, ধিক্কার দেয়। একমাত্র তিনিই তাহাদিগকে প্রাণ দিয়া ভালবাসেন, সযত্নে বুকে করিয়া রাখেন। এইভাবে যতই দিন যাইতে লাগিল, তাহাদের এই অকৃত্রিম সুহৃদটির কাছে তাহারা অবশেষে আত্মসমর্পণ না করিয়া পারিল না। তাহারা সকলে তখন জনে জনে আসিয়া তাহাদের নিজ নিজ পারিবারিক অশান্তির কথা, কত-না মানসিক অবসাদ ও পীড়ার কথা, তাহাদের অন্তরের গুহ্যাতিগুহ্য সকল কথা নিঃসংকোচে প্রাণ খুলিয়া তাঁহার কাছে ব্যক্ত করিতে লাগিল। অকৃপণ সেবায়, সাহচর্যে, সদাশয়তায় এবং অচিন্তিতপূর্ব নব নব উপায়ে অনুকূলচন্দ্র তাহাদের দগ্ধ পীড়িত বিষণ্ণ প্রাণকে শান্ত সুস্থ ও সঞ্জীবিত করিয়া তুলিলেন। এইরূপে তিনি তাহাদের সকলের অন্তরের অন্তরতম প্রদেশ পর্যন্ত সম্পূর্ণরূপে জয় করিয়া লইলেন।

তখন হইতে অনুকূলচন্দ্র সময় ও সুযোগ বুঝিয়া সঙ্গীদিগকে সুকৌশলে সৎপথে পরিচালিত করিবার কার্যে বিশেষভাবে আত্মনিয়োগ করিলেন। এজন্য জনসাধারণের মধ্যে তাঁহার সংকীর্তনাদি প্রবর্তনের কথা পরবর্তী অধ্যায়ে আলোচনা করা হইয়াছে। এইভাবে তাঁহার প্রেম ও প্রেরণার অপূর্ব প্রভাবে

অচিরেই গ্রামস্থ দুর্বৃত্তগণের জীবন ও চরিত্রে এক অসাধারণ পরিবর্তন দেখা দিল। দেখিতে দেখিতে তদঞ্চলের কত দুর্জন সজ্জন হইয়া উঠিল, কত পশু-মানব দেব-মানবে পরিণত হইল! শক্তিশালী চুম্বক যেমন লৌহখণ্ডকে সবলে আকর্ষণ করিয়া ইহাকে ক্রমে ক্রমে চুম্বকে পরিণত করে, তিনিও তদ্রূপ তাঁহার উৎসারিত অব্যর্থ প্রেমের বলে ঐ সকল পতিত মানবকে ধীরে ধীরে সৎ-আদর্শে অনুপ্রাণিত করিয়া তুলিলেন। অনুকূলচন্দ্রের সেই বিরামবিহীন অক্লান্ত কল্যাণসাধনার কত-না কাহিনী! আমরা সে সমুদয় অসংখ্য বিচিত্র ঘটনার কয়েকটিমাত্র নিম্নে সংক্ষেপে বিবৃত করিতেছি।

একদিন ঘোর অন্ধকার রাত্রিতে দুর্বৃত্তদের কয়েক জন মিলিত হইয়া বিশেষ উদ্দেশ্যে বহির্গমনের উদ্যোগ করিতেছিল। অনুকূলচন্দ্র সে-সময় সেখানে উপস্থিত হইয়া তাহাদের সহযাত্রী হওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। সঙ্গীরা তাঁহাকে সঙ্গে নিতে কিছুতেই রাজী নয়। তিনিও ছাড়িবার পাত্র নহেন। অবশেষে তাঁহার অশেষ পীড়াপীড়ির পর তাহারা তাঁহাকে লইয়াই বাহির হইল। এক গৃহস্থ-বাড়ীর আঁস্তাকুড়ের কাছে যাইয়া তাহারা লুকাইয়া রহিল। একটি স্ত্রীলোক ঘরে বিছানায় শুইয়া আছেন, দেখা যাইতেছে। দুর্বৃত্তেরা মতলব আঁটিয়াছে, রমণীটি কোন কারণে ঘরের বাহির হইলেই, তাহাকে বলপূর্বক লইয়া পলায়ন করিবে। মশার কামড়ে প্রাণ অস্থির। মাঝে মাঝে মশা তাড়াইতে গিয়া অনুকূলচন্দ্র ইচ্ছাপূর্বকই নিজের শরীরে সজোরে আঘাত করিতেছেন। শব্দ শুনিয়া সঙ্গীরা ভীত চমকিত হইয়া উঠিতেছে এবং নানা উপায়ে তাঁহাকে থামাইয়া রাখিবার চেষ্টা করিতেছে। এইভাবে কিছুক্ষণ অতিবাহিত হওয়ার পর, অনুকূলচন্দ্র হঠাৎ উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং তৎক্ষণাৎ ভীষণ বেগে দৌড়াইতে লাগিলেন। তাঁহার দেখাদেখি সঙ্গীরাও ভীতমনে ঊর্দ্ধশ্বাসে তাঁহার পিছন পিছন ছুটিয়া চলিল। দৌড়াইতে দৌড়াইতে তিনি অদূরে এক মাঠের মধ্যে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। অনুকূলচন্দ্র তখন দৃপ্তকণ্ঠে সঙ্গীদিগের উদ্দেশ্যে বলিতে লাগিলেন,—'কি শালার মশার কামড় খেয়ে মরতে গে'ছিলাম এই ঝোপ-ঝাড়-জঙ্গলের মধ্যে! আমাদের কি প্রাণের মায়া নেই! জীবনটা কি এতই তুচ্ছ!'—বলিতে বলিতে তাঁহার কণ্ঠস্বর ভীষণ গম্ভীর হইয়া উঠিল। আবেগভরে অনর্গল কত কথা তিনি বলিয়া যাইতে লাগিলেন—'আমরা কি পুরুষ নই যে, মেয়ে-মানুষের পিছনে ছুটব এমনি জঘন্যভাবে! আমাদের কি লজ্জা নেই! আমরা কি এতই নীচ এতই হীন যে, পুরুষ হ'য়ে সামান্য স্ত্রীলোকের জন্য এমন ঘৃণিত কুৎসিত কার্যে আত্মমর্যাদা বিসর্জন দেবো! যদি পুরুষই হ'য়ে থাকি, আমাদের শৌর্যবীর্য, রূপ-গুণ দেখে মেয়েরাই ছুটবে আমাদের পিছনে, তবে ত!······।' তাঁহার কল্যাণময়ী অগ্নিবর্ষী প্রতিটি কথা সঙ্গীদের অন্তরের অন্তস্তলে গিয়া বিদ্ধ হইল, তাঁহার তেজোদীপ্ত বাণীগুলি তাহাদের মনে তীব্র আত্মসম্মানবোধ জাগ্রত করিল। দারুণ অনুশোচনায় মর্মপীড়িত হইয়া তাহারা সকলে কাঁদিতে কাঁদিতে তাঁহার চরণতলে লুটাইয়া

পড়িল। অনুকূলচন্দ্রের পূণ্য ব্যক্তিত্বের প্রভাবে সেই দিন হইতে সঙ্গীদের চরিত্রে একটা অদ্ভুত পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইল।

প্রকৃতিতে পুরুষ যে কত সুন্দর, কত মহীয়ান, কত গরীয়ান, তাহারই একটি চিত্র সেদিন অনুকূলচন্দ্রের মনশ্চক্ষে কেমন জ্বল্ জ্বল্ করিয়া ভাসিয়া উঠিয়াছিল—সে-কথা অনুকূলচন্দ্রকে পরবর্তীকালে অনেক দিনই গল্প করিতে শুনিয়াছি। তিনি বলেন,—"সঙ্গীদের সহিত যখন উচ্ছ্বসিত আবেগে কথা বলছিলাম, দেখতে পেলাম, একটা সিংহ গম্ভীরভাবে রাজার মত বসে আছে, একটা সিংহী তার মুখের পানে চেয়ে আছে, যেন তৃপ্ত হচ্ছে ; একটা ময়ূর পেখম ধ'রে নৃত্য করছে, একটা ময়ূরী তাই দেখে আনন্দে মাতোয়ারা ; একটা পুং-দোয়েল শিস্ দিচ্ছে, একটা স্ত্রী-দোয়েল তাই অবাক বিস্ময়ে চেয়ে দেখছে ;—ভাবলাম, পুরুষ কত সুন্দর! পুরুষ স্ত্রীর পিছনে ছুটবে কেন ? এটা যে সত্যই প্রকৃতি-বিরুদ্ধ।"

আর একটি দুশ্চরিত্র সঙ্গীর কথা। সে স্ত্রীলোকের প্রতি কামলোলুপতার বশবর্তী হইয়া গৃহস্থের বাড়ীর আনাচে-কানাচে এখানে-সেখানে প্রায়ই ঘুরিয়া বেড়াইত। লোকটি তাহার দুরভিসন্ধি পূরণে সাহায্য করিবার জন্য অনুকূলচন্দ্রকে যখন-তখন বিরক্ত করিত। তিনি অতিষ্ঠ হইয়া একদিন তাহাকে বলিলেন,—'দ্যাখ, মেয়েমানুষকে কি অমন ক'রে পাওয়া যায় ? এরও মন্ত্র আছে।' লোকটি বলিল,—'হাঁ, রেখে দে তোর মন্ত্র। আচ্ছা, বাজি রাখ্ দেখি ! কোন মেয়েমানুষকে যদি তুই মন্ত্রবলে বশ ক'রে দেখাতে পারিস, তবে তো বুঝব !' তখন অপরাহ্নকাল। একটি স্ত্রীলোক পদ্মা হইতে জল লইয়া কলসীকক্ষে গৃহে ফিরিতেছিলেন। অনুকূলচন্দ্র দূরে হইতে তাঁহাকে দেখাইয়া বলিলেন,—'দেখবি ? এখনই আমি এঁকে কেমন আপন ক'রে নিতে পারি ! তুই শুধু দূরে থেকে দেখে যাস।" এই বলিয়া অনুকূলচন্দ্র রমণীর সমীপবর্তী হইয়া তাঁহাকে আপন স্বভাবসুলভ মধুর কণ্ঠে এমনভাবে 'মা' বলিয়া ডাকিলেন যে, তাহা শ্রবণমাত্র রমণীর অন্তরখানা বাৎসল্যরসে ভরপুর হইয়া উঠিল—এক অপার্থিব আনন্দের অমৃতপ্রস্রবণে তাঁহার সর্বাঙ্গ যেন স্নাত হইল। এমন মধুমাখা প্রাণারাম মা-ডাক তো জীবনে তিনি কোনদিন শুনেন নাই ! রমণী তখন স্নেহ-উচ্ছলিতকণ্ঠে বলিলেন,—"কি লক্ষ্মী ছেলে আমার !" অনুকূলচন্দ্র তখন হাসিভরা মুখে আপনার সরল মনের সহজ কথায় রমণীটির সঙ্গে গল্প জুড়িয়া দিলেন। দুইজনে মনের আনন্দে কথাবার্তায় পথ চলিতে চলিতে কিছুক্ষণের মধ্যেই রমণীর গৃহসমীপে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। অনুকূলচন্দ্র এইবার সহাস্য বদনে বলিলেন,—"মা, আমি বাড়ী যাই ?" অনুকূলচন্দ্রের প্রাণজুড়ানো আলাপনে, বিশেষত তাঁহার মধুর কণ্ঠের 'মা'-সম্বোধনে রমণীর চিত্তখানা সন্তান-স্নেহে এমনি আপ্লুত হইয়াছিল যে, তাঁহাকে শুধু-মুখে বিদায় দিতে কিছুতেই তাঁহার প্রাণে চাহিল না। তিনি তখন আব্দারমাখা আদরের সুরে তাঁহাকে বলিলেন,—"কিছু খেয়ে যাবে না, বাছা ?"—এই বলিয়া তিনি

তাড়াতাড়ি গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া একখানা পাত্রে কিছু মিষ্টদ্রব্য ও একগ্লাস জল লইয়া আসিলেন এবং তাঁহাকে কাছে বসাইয়া সযত্নে ভোজন করাইয়া তবে বিদায় দিলেন। লোকটি এতক্ষণ দূরে হইতে সমুদয় ব্যাপার বিশেষ আগ্রহের সঙ্গে লক্ষ্য করিতেছিল। অনুকূলচন্দ্রের অদ্ভুত ক্ষমতা প্রত্যক্ষ করিয়া সে তো অবাক্। অনুকূলচন্দ্রও তাহার নিকট ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন,—'দেখলি তো, ভাই, মন্ত্রের প্রভাব !'

উক্ত ঘটনার পর হইতে সেই লোকটি অনুকূলচন্দ্রের পিছনে পিছনে কেবলই ঘুরিতে লাগিল এবং নারীবশীকরণ-মন্ত্রটি শিখাইয়া দিবার জন্য তাঁহাকে একেবারে উত্ত্যক্ত করিয়া তুলিল। নানা অছিলায় অনুকূলচন্দ্র অনেকদিনই তাহাকে ভাঁড়াইয়া চলিলেন। অবশেষে একদিন সে নাছোড়বান্দা হইয়া তাঁহাকে এমনই ধরিয়া বসিল যে, কোনও অজুহাতেই তাহাকে এড়ানো আর সম্ভব হইল না। অনুকূলচন্দ্র তখন অকস্মাৎ অতীব গম্ভীর মূর্তি ধারণ করিলেন এবং বন্ধুটিকে ইঙ্গিতে ডাকিয়া লইয়া তড়িদ্‌বেগে অদূরবর্তী কলনাদিনী পদ্মার সৈকতদেশে গিয়া উপনীত হইলেন। বন্ধুটিও মন্ত্রমুগ্ধবৎ তাঁহার নির্দেশ-অনুসরণক্রমে তাঁহার পার্শ্বে আসিয়া হতভম্বের মত নিশ্চল দাঁড়াইয়া রহিল। এই সময় সহসা অনুকূলচন্দ্রের বদনমণ্ডলের এক অপূর্ব পরিবর্তন লক্ষ্য করিয়া এবং মন্ত্র-লাভের ক্ষণ আসন্ন বুঝিয়া লোকটি যুগপৎ ত্রাসে ও হর্ষে অভিভূত হইয়া পড়িল। বিস্ময়বিমুগ্ধ চিত্তে সে তখন শুনিতে পাইল, অনুকূলচন্দ্রের উদাত্তকণ্ঠোচ্চারিত অমৃতনিষ্যন্দী মা-মা-মা······ধ্বনিতে নদীর এপার ওপার, তটবর্তী নির্জন প্রান্তর এবং দূরবর্তী কান্তার পর্যন্ত মুহুর্মুহু প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিতেছে। সেই পরমপবিত্র প্রাণারাম মাতৃনাম শ্রবণ করিয়া তাহার অন্তরখানও তখন সুরলোকের সুধাধারায় আপ্লুত হইতেছে, অনির্বচনীয় আনন্দের শিহরণে তাহার তনুমন পুলকিত হইতেছে! এই অবস্থায় লোকটি ভাবের আবেশে অনুকূলচন্দ্রের পদতলে পতিত হইল এবং তাঁহারই কণ্ঠে আপন কণ্ঠ মিলাইয়া ভক্তিবিগলিতচিত্তে উচ্ছ্বসিত আবেগে ডাকিতে লাগিল—মা-মা-মা ও মা। এইভাবে অনুকূলচন্দ্রের কাছে মাতৃ-মন্ত্রে দীক্ষালাভের পর সত্যসত্যই তাহার জীবনের আমূল পরিবর্তন ঘটিয়া গেল—সে ধন্য হইল।

আর একটি ঘটনা। অনুকূলচন্দ্রের এক চোর-বন্ধু ছিল। লোকটিকে তিনি খুবই ভালবাসিতেন এবং তাহার অভাব-অভিযোগের সময় তাহাকে অর্থাদি দিয়া সাহায্য করিতেন। সে তাঁহাকে 'দাদাঠাকুর' বলিয়া ডাকিত। অনুকূলচন্দ্রের সস্নেহ সুকুশল পরিচালনায় এককালে এই লোকটিরও চরিত্রের অদ্ভুত পরিবর্তন ঘটিয়াছিল এবং সে সজ্জন বলিয়া সমাজে সমাদৃত হইয়াছিল। এই চোর-বন্ধুটির কাহিনী আমরা অনুকূলচন্দ্রের মুখে যেরূপ শুনিয়াছি, তদ্রূপ নিম্নে লিপিবদ্ধ করিলাম। একদিন কথাপ্রসঙ্গে তিনি বলিতেছিলেন,—

"একদিন দেখি কতকগুলি লোক রাস্তার উপর দাঁড়িয়ে খুব বলাবলি করছে।

গ্রামে চুরি হয়েছিল, সেটাই ছিল তাদের আলোচ্য বিষয়। সবাই চোরের নামে নানারকম কথা বলছিল। আমি সেখানে যেয়ে ওদের ঐসব কথাবার্তা শুনে বল্লাম,—'কেন সে চুরি করবে না ? তাকে ডেকে কোনদিন খেতে দাও ? একটা কথা কয়ে থাক ?·· ·· ···।' এই রকম আরও কি বলেছিলাম। এই ভিড়ের মধ্যে সে-চোরও ছিল। সে আবার কিছুদিন আগে আমার বাড়ীতেও চুরি করেছিল। ও তখন কোন কথা বলেনি। সেদিন অনেক রাত্রে—রাত প্রায় ১২টার সময় ও আমার কাছে এসেছে। এসে একেবারে আমার পা জড়ায়ে ধ'রে কেঁদে বল্লে,—'বাবু, আমিই আপনার বাড়ী চুরি করেছিলাম। আপনার সব কথা আজ শুনেছি। আমার কাছে এখনও আপনার জিনিস কয়টা আছে। এই থালা-বাসনগুলো আপনি নেন।' আমি তখন তাকে বল্লাম,—'না, ও তুই রাখ্, ওগুলো আমি তোরে দিলাম।'

"তারপর থেকে ও মাঝে মাঝে আমার কাছে যাওয়া-আসা করতো। আমি কখনও কখনও তাকে কিছু দিতাম। দু'পাঁচ টাকা যখন যা পারতাম তাকে দিয়ে সাহায্য করতাম। আস্তে আস্তে আমার সঙ্গে তার বেশ ভাব জমে গেল। সে প্রায়ই এসে সরল মনে তার কাজের জয়-পরাজয়ের কত কথা গল্প করতো। দু'জনের মধ্যে চুরি করার কায়দা-কৌশলের কত কথাবার্তা হতো। সে মন দিয়ে আমার সব কথা শুনতো। সে বুঝে নিয়েছিল, আমার যুক্তি-বুদ্ধি তার খুবই কাজে লাগবে। আর এতে আমার প্রতি তার টান যেন আরও বেড়ে গিয়েছিল। একদিন আমি তাকে বল্লাম,—'এই, তোরা কেমন ক'রে চুরি করিস আমি দেখতে যাব। এর পরে যেদিন যাবি, আমায় কিন্তু সঙ্গে নিয়ে যাবি'।

" সেদিন ছিল অমাবস্যার রাত্রি। ও এসেছে। এক বাড়ীতে চুরি করবে ব'লে মতলব এঁটেছে। খবর পেয়েছে, সে বাড়ীতে কচ্‌কচে তিন হাজার টাকা এনে রেখেছে। কালো কাপড় দিয়ে ওর চারিদিক জড়ানো। আমি ওর সাথে যাব। প্রথমত আমাকে সঙ্গে নিতে সে খুবই আপত্তি করলো, বললো,—'বাবু, আপনি আমার সঙ্গে যাবেন না। যদি আমাকে ধ'রে ফেলে, আমার সাথে আপনাকেও ধরবে নে। ভদ্রলোক ব'লে ছেড়ে দেবে না।' আমিও নাছোড়বান্দা। বল্লাম,—'না, চল যাই। তোরা কেমন ক'রে চুরি করিস, আমি দেখব।' শেষটা খুশী মনেই আমাকে সঙ্গে নিতে রাজী হ'য়ে আমাকেও কালো কাপড় পরায়ে চোরের বেশে সাজায়ে নিল। দু'জনে ঘোরঘুট্টী অন্ধকারের মধ্যে বেরিয়ে পড়লাম। রাস্তায় যেতে যেতে বল্লাম,—'দ্যাখ, এ-পর্যন্ত তুই যত চুরি করেছিস তা সব একত্র করলে, কোন লোকের আর চুরি ক'রে খেতে হতো না,—তোর হাঁড়িতে কিন্তু কোনদিন চাল থাকে না। কত লোকের মনে ব্যথা দিস, এক জায়গায় কত লোকের সর্বনাশ করিস। এই জন্যই পরমপিতা তোর ভাগ্যে সম্পদ লিখেন নাই। তোর হা-ভাত ঘোচে না।' আমার সব কথা শুনে সে বল্লে,—'তা যা বলেছ দাদাঠাকুর, সবই ঠিক। চুরি ক'রে যখন যা আনি, সঙ্গে সঙ্গে খতম

হ'য়ে যায়, ভবিষ্যতের জন্য কখনও জমাতে পারি না কিছু। চুরিতে যেদিন কিছু মেলে না, পরের দিন উপোস থাকতে হয়।' আমি বল্লাম,—'তবেই দ্যাখ, ওতে এগুলো কি?' কথাবার্তায় উভয়ে গৃহস্থের বাড়ীর দিকে যাচ্ছি।

"আমি জানতাম, ও-লোকটার বৌয়ের 'পর একটা জেলের নজর আছে। সেই জেলে প্রায়ই ওর বাড়ীর সামনে দিয়ে শিস্ দিয়ে যায়। সেই কথা মনে হ'তেই ওকে জিজ্ঞাসা করলাম,—'এই, তোর ঘরের দরজা ভাল ক'রে আটকে দিয়ে এসেছিস্ তো?' ও বল্লে—'বাবু, তা কি দেওয়া যায়? যদি আমাকে তাড়া করে, তাহ'লে দৌড়ে যেয়ে ঘরের মধ্যে ঢুকে শুয়ে পড়তে হয় কিনা! তাই দরজা খোলাই রেখে আসি। আমি তখন বল্লাম,—'তা দরজা খোলা রেখে এসেছিস, সেই জেলেটা যদি খালি বাড়ী জেনে আবার ঐ সময় আসে, তোর জিনিষপত্র সব নিয়ে যায়। ওর তো আবার তোর বৌয়ের 'পর নজর আছে। তোর স্ত্রী—যার জন্য তুই এতসব অপকর্ম করছিস, তাকেই যদি নিয়ে যায়, তবে পরমপিতার দরবারে তোর বলবার কি থাকতে পারে!' এই কথাশুনবামাত্র লোকটা থমকে দাঁড়ালো। সে তখন একেবারে নির্বাক নিস্তব্ধ। সে আর পথ চলতে পারলো না, মাটির উপর ব'সে পড়ল। এই অবস্থায় কিছুক্ষণ কি চিন্তা ক'রে, হঠাৎ উঠে ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়ে গিয়ে চুরি করার তার সব যন্ত্রপাতি পদ্মার জলে ফেলে দিয়ে এসে বল্ল,—'দাদাঠাকুর, আমার আর চুরি করা হবে না, চলুন বাড়ী যাই। ঐ লোকটাকে কালও আমার বাড়ীর সামনে ঘোরাফেরা করতে দেখেছি। ওর নজর ভাল না।' আমি তখন বল্লাম,—'না, চল। তোরা কেমন ক'রে কি করিস আমি দেখব। সেইজন্যই তো এত কষ্ট ক'রে এলাম।' ও আরও বেঁকে ব'সে বল্ল,—'না, বাবু, জীবনেই আমি আর কোনদিন চুরি করব না।' এই ব'লেই বাড়ীর দিকে ছুটে চলল।

"সেই থেকে কেমন ক'রে যেন ওর মাথায় ঢুকে গেল,—অপরের ক্ষতি করতে গেলে অজ্ঞাতে নিজের দারুণ ক্ষতি হ'য়ে যেতে পারে। চুরি করার বুদ্ধি ওর ঐদিন থেকে ছেড়ে গেল। তবু সারাজীবনের অভ্যাসবশে অন্ধকার রাত দেখলে মাঝে মাঝে ওর চুরির খুব ঝোঁক চাপতো। পাছে একলা থাকলে লোভ সামলাতে না পারে তাই সেই নিশুতি রাতে আমার কাছে চ'লে আসতো। আমি উঠে পড়তাম। ওর সঙ্গে ব'সে ব'সে গল্প ক'রে রাত কাটিয়ে দিতাম। ভোরের দিকে ও বাড়ী চ'লে যেত। কিছুদিন এইরূপে আসা-যাওয়ার পর তার মনে হ'লো—(কথাগুলো সে আমাকে পরে একদিন বলেছিল) 'আমি একটা চোর, সমাজের কত নীচ ও ঘৃণ্য। আমার জন্য দাদাঠাকুর রাতের পর রাত না ঘুমিয়ে কাটিয়ে দেন, আর আমি তাঁকে অযথা বিরক্ত ক'রে কত কষ্টই না দিই।'—সেইদিন থেকে রাত্র হ'লে যখনই ঐ কুপ্রবৃত্তি তাকে নাজেহাল করার উপক্রম করত, তখন সে ছুটে আমার কাছে না এসে পারত না বটে, কিন্তু আমার আর ঘুম ভাঙ্গাতো না। আমার সঙ্গে কথাবার্তা বলতে না পারায় নেহাৎ যেদিন কিছুতেই শান্তি না পেত,

আমার ঘরের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে অতিশয় সন্তর্পণে এবং অতীব মৃদুস্বরে 'দাদাঠাকুর, জেগে আছেন', 'দাদাঠাকুর, জেগে আছেন' ব'লে ডাকতো, আর আমার ঘরের চারিদিকে সারারাত ঘুরে বেড়াত। অবশেষে পরিশ্রান্ত হ'লে, যখন তার প্রবৃত্তির তাড়না অনেকটা কমে আসত, তখন বাড়ী গিয়ে শুয়ে থাকত। কিছুদিন পরে ও ঝোঁকটাও আর তার রইল না। মানুষটা একেবারে বদলে গেল। আমি তাকে মাঝে মাঝে যে দু'-চার-পাঁচ টাকা দিতাম, তারই মূলধনে তরিতরকারী বিক্রীর কারবার ক'রে সে সদ্ভাবে সংসার করত। সে খুব বিশ্বাসী হ'য়ে দাঁড়ালো। হাজার হাজার টাকা ওর কাছে দিয়ে দেখা গিয়েছে, একটা পয়সাও সে ছুঁতো না। আর লোক চিনত খুব। খারাপ বুঝলে আমাকে সাবধান ক'রে দিত।"



দশম অধ্যায়

আধ্যাত্মিক চেতনা

'নাম'ই ছিল অনুকূলচন্দ্রের সত্তার স্বতঃস্পন্দন। অতি-শৈশব হইতেই তাঁহার অন্তরে স্বতঃই সৎ-নাম স্ফুরিত হইত। এই সহজ আধ্যাত্মিক সংস্কারের বশে তিনি অহর্নিশ নাম-ধ্যানে নিমগ্ন থাকিতেন। তখন তাঁহার মনে এই ধারণা বদ্ধমূল ছিল যে,—দুনিয়ার সকলেই যেমন চোখ দিয়া দেখে, কান দিয়া শোনে, শ্বাস-প্রশ্বাস নেয়, সেইরূপ সবাই বুঝি তাঁহার মত সহজ অভ্যাসবশে নামও করিয়া থাকে। অবশ্য বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে দীর্ঘকাল পরে তাঁহার এই ধারণার পরিবর্তন হইয়াছিল।*

অনুকূলচন্দ্র কোনদিনই কোন বিশেষ উদ্দেশ্য লইয়া নাম করিতেন না। তিনি নাম-জপে স্বভাবতই এমন এক অনির্বচনীয় আনন্দ অনুভব করিতেন যে, এক মুহূর্তও নাম না করিয়া থাকিতে পারিতেন না। আর, সেজন্য আহার-নিদ্রা ভুলিয়া গিয়া অনুক্ষণ নাম-ধ্যানেই তিনি বিভোর থাকিতেন।

অতিবাল্য হইতেই এইভাবে তীব্র অনুরাগের সহিত সহজ ধ্যান ও নাম-জপের ফলে, তাঁহার যে কত অদ্ভুত অবস্থাদি ঘটিত, অধ্যাত্মলোকের কত অত্যাশ্চর্য অনুভূতির সহিত তাঁহার প্রত্যক্ষ পরিচয়ের প্রকাশ হইত, তাহা বলিবার নয়। তিনি কখনও অজ্ঞান হইয়া ভূতলে পতিত হইতেন, কখনও তাঁহার জ্যোতিঃ ও নানা দেবদেবীর মূর্তি দর্শন হইত, তাঁহার অঙ্গস্পর্শে বৃক্ষপল্লবে অপূর্ব শিহরণ দেখা দিত, শরীরের উত্তাপ ও কর্মশক্তি বিপুল পরিমাণে বৃদ্ধি পাইত,……… ইত্যাদি কত কি!

বালক অনুকূলচন্দ্রের উক্তরূপ অদ্ভুত অবস্থাদি প্রত্যক্ষ করিয়া আত্মীয়-স্বজন এবং প্রতিবেশী সকলেই অত্যন্ত চিন্তাকুল হইয়া পড়িয়াছিলেন। এ-সম্বন্ধের প্রতিকারের জন্য নানা জনে নানারূপ অভিমতও ব্যক্ত করিতেন। কেহ বলিতেন, বালকের কঠিন 'হিস্টেরিয়া'-রোগ হইয়াছে ; কেহ বলিতেন, তাঁহার মস্তিষ্ক-বিকৃতি ঘটিয়াছে, অভিজ্ঞ ডাক্তার-কবিরাজ দ্বারা তাঁহার উপযুক্ত চিকিৎসার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন ; অনেকে আবার মন্তব্য করিতেন, তাঁহার উপর ভূত-প্রেতের আশ্রয়

---

* এই প্রসঙ্গে অনুকূলচন্দ্রের শৈশবকালের আর একটি সহজাত বিশেষ সংস্কারের কথা উল্লেখযোগ্য।

ছোটবেলা হইতেই শয়নের পূর্বে আকাশ না দেখিলে তাঁহার ঘুম পাইত না। তন্ময়ভাবে তিনি দেখিতেন, তিনি যেন তারার বিছানায় তারার বালিশে শুইয়া আছেন, আর তাই দেখিতে দেখিতে ঘুমাইয়া পড়িতেন। বালক মনে করিতেন, অন্য সকলেও তাঁহার মত সহজভাবে এরূপ দেখিয়া থাকে। একদিন সহপাঠীদের সঙ্গে কথাবার্তার পর তাঁহার এই ধারণার পরিবর্তন ঘটে।

হইয়াছে, কবজ-তাবিজ, ঝারফুক ছাড়া অন্য কিছুতে তাহা সারিবে না, ইত্যাদি কত কিছু। বাল্যাবধি নিরন্তর নাম-জপের ফলেই যে অনুকূলচন্দ্রের উক্ত প্রকার নানা অত্যাশ্চর্য ব্যাপার ঘটিত, তৎসম্পর্কে তাঁহার পারিপার্শ্বিক কাহারও বিন্দুমাত্র কোন ধারণাই ছিল না। যাহা হউক, পুত্রের রোগারোগ্য-কামনায় জননীদেবী হিতৈষীবর্গের উপদেশ মত, যথাবিহিতরূপে একে একে সকল প্রকার উপায়ই অবলম্বন করিলেন, কিন্তু বলিতে কি, সকল প্রচেষ্টাই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইল, কোনক্রমেই সাধারণ মানুষের মত স্বাভাবিক অবস্থা তাঁহার আর ফিরিয়া আসিল না। প্রতিকারের কোনও উপায় খুঁজিয়া না পাইয়া জননীদেবী বড়ই বিচলিত হইয়া পড়িলেন।

এই অবস্থায় কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া মাতা মনোমোহিনী দেবী পুত্রের আশৈশব উক্তপ্রকার সকল বৃত্তান্ত আনুপূর্বিক বিবৃত করিয়া গাজীপুর গুরুদেবের— রাধাস্বামী-মতের তৎকালীন চতুর্থ জীবন্ত সদ্‌গুরু বাবু কামতাপ্রসাদের (সরকার সাহেবের) নিকট পত্রযোগে নিবেদন করিলেন। ইহা উল্লেখযোগ্য, জননীদেবীর গুরুদেব হুজুর মহারাজ (দ্বিতীয় সদ্‌গুরু) এবং তৎপরবর্তী মহারাজ সাহেব (তৃতীয় সদ্‌গুরু) উভয়েই তখন স্বর্গগত. সরকার সাহেবই তৎকালে তাঁহাদের স্থানে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

মনোমোহিনী দেবীর উক্ত পত্রখানা প্রাপ্তিমাত্র গুরুদেব সরকার সাহেব তাঁহাকে লিখিয়া পাঠাইলেন,—"তোমার পুত্রের অবস্থাদি বর্ণনা করিয়া তুমি যাহা যাহা লিখিয়াছ, তাহা যদি সত্য হয়, তবে মনে করিতে হইবে, তুমি পরম ভাগ্যবতী। কারণ, ঐ সমুদয় মোটেই মস্তিষ্ক-বিকৃতি বা অন্য কিছুর লক্ষণ নয়, পরন্তু তাহা আধ্যাত্মিক রাজ্যের অত্যুচ্চ স্তরের গভীর অনুভূতির পরিচায়ক। সুতরাং তোমার শঙ্কিত হওয়ার কোনই কারণ নাই। তোমার ছেলের অবস্থা আস্তে আস্তে অবশ্যই স্বাভাবিক হইয়া আসিবে। তবে একটি বিশেষ প্রয়োজনীয় কথা এই যে, তোমার পুত্র যদি এখনও সৎ-নামে দীক্ষিত না হইয়া থাকে, তাহা হইলে তুমি তাহাকে অবিলম্বে সৎ-দীক্ষা দান করিবে।"

গুরুদেব সরকার সাহেবের উক্ত নির্দেশ-বাণী পাওয়ামাত্র মনোমোহিনী দেবী পুত্র অনুকূলচন্দ্রকে সৎ-নামে দীক্ষা দান করিলেন। মাতৃদেবীর কাছে 'নাম' পাওয়ার পর অনুকূলচন্দ্র তাঁহাকে বলিলেন,—"মা, এই নাম তো আমি ক'রেই থাকি, বরাবরই তো এই নাম করি।" জননীদেবী তখন সবিশেষ কৌতূহলী হইয়া পুত্রকে প্রশ্ন করিলেন,—"এ নাম তুই কোথায় পেলি?" অনুকূলচন্দ্র উত্তরে বলিলেন,—"সে আমি জানি না, মা। তবে জন্মাবধি আমি এই নাম ক'রে আসছি।" অনুকূলচন্দ্র তখন নামধ্যান-সংক্রান্ত তাঁহার সকল অবস্থা ও অনুভূতির কথা মাতৃদেবীর নিকট সরলভাবে সবিস্তার বর্ণনা করিয়া কহিলেন,—"মা, যা আমি করি, যা আমি জানি, যা বুঝি, যা যা আমার হয়, সবই আমি তোকে বললাম, এখন তোর যা বলবার আছে, আমায় বল, আমি তাই করব।"

অধ্যাত্মশাস্ত্রবিদুষী সাধিকা মনোমোহিনী দেবী দেখিলেন, বালক অনুকূলচন্দ্র তাঁহার উক্তিতে ষট্চক্রভেদ হইতে আরম্ভ করিয়া ওঁকার এবং ওঁকারেরও পরবর্তী সত্য লোক, অলখ লোক, অগম লোক, অনামী লোক প্রভৃতি অধ্যাত্মজগতের অত্যুচ্চ ধামসমূহের সমস্ত অনুভূতির কথাই অতিশয় সুস্পষ্টরূপে ও বিশদভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। ইহাতে নিরতিশয় বিস্মিত ও আনন্দিত হইয়া তিনি পুত্রকে কহিলেন,—"এই নামই তো আদি সৎ-নাম। তুই এই নাম করতে থাক।" অনুকূলচন্দ্র তাঁহার স্বাভাবিক অধ্যাত্ম চেতনার ধারায় শৈশবাবধি এতকাল যে সৎ-নামের সাধনা করিয়া আসিতেছিলেন, কৈশোরে গুরুদেব সরকার সাহেবের দেশনায় জননীদেবীর নিকট দীক্ষাপ্রাপ্তি-কালে তাহারই সার্থক সমর্থন প্রাপ্ত হইলেন।

শুনিয়াছি, মাতৃদেবীর নিকট সৎ-নামে দীক্ষালাভের সঙ্গে সঙ্গে অনুকূলচন্দ্র নাকি কিয়ৎক্ষণের জন্য অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছিলেন এবং ঐ সময় শ্মশ্রুবিশিষ্ট তেজঃপুঞ্জ এক দিব্য পুরুষকে (গুরুদেব সরকার সাহেবের মূর্তির অনুরূপ) দর্শন করিয়াছিলেন। ইহাও শুনিয়াছি, 'নাম' পাওয়ার পর তাঁহার কিছুদিন এইভাবে কাটিয়াছিল যে, স্নান আহার, ভ্রমণ বিশ্রাম, নিদ্রা জাগরণ—সকল অবস্থায় সকল সময় সকল স্থানে তিনি সরকার সাহেবের জ্যোতির্ময় মূর্তিখানা তাঁহার চারিপাশে দেখিতে পাইতেন।

অনুকূলচন্দ্র তাঁহার আজন্ম নাম-অভ্যাস ও তাঁহার গুরু-করণ প্রসঙ্গে উত্তরকালে মাঝে মাঝে যে সকল উক্তি করিয়াছেন, এই অবসরে আমরা নিম্নে তাহার কিছু কিছু উল্লেখ করিলাম।—

"নাম নিয়েই আমি জন্মেছিলাম। ...... জানি নামই আমার basis, তাই মাতৃগর্ভে থাকতেই আমি নাম করতাম।"

"নাম মার কাছ থেকে নেবার আগেই আমি নাম করতাম। ছোটবেলা থেকেই নাম করতাম। মা হুজুর মহারাজকে গুরুদেব ব'লে ডাকতেন, আমি পরমপিতা ব'লে ডাকতাম। আর তাঁরই ধ্যান সর্বক্ষণ সহজেই হতো। ......।"

"সরকার সাহেবই আমার গুরু। মায়ের গুরু হুজুর মহারাজকেও ছোটবেলা অবধি খুবই শ্রদ্ধা ও ভক্তি করি। তাঁদের কাউকে আমি কখনও দেখি নাই। এজন্য মনে কখনও কখনও খুব কষ্ট হয়, তখনই মায়ের দিকে তাকিয়ে শান্তি পাই। আমার মা-ই যেন সরকার সাহেব, হুজুর মহারাজ ও অন্যান্য মহাপুরুষের প্রতীক—মা-ই আমার আদর্শ।"

অনুকূলচন্দ্রের আশৈশব নাম-ধ্যানের এই সহজ অভ্যাস তাঁহার বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে নিরন্তর সমানভাবেই অব্যাহত ছিল। তীব্র অনুরাগের সহিত আকুল নেশায় অবিরাম নামজপের ফলে তাঁহার মস্তিষ্ক-কোষের তীক্ষ্ম সাড়াশীলতা ও প্রখর গ্রহণক্ষমতা এমনই বৃদ্ধি পাইয়াছিল যে, তিনি কত বিচিত্র মধুর শব্দ—অনাহতনাদ ও তালমানলয়যুক্ত সঙ্গীতাদি শ্রবণ করিয়া আকুল হইতেন, কত অনির্বচনীয়

মনোরম দৃশ্যাদি অবলোকন করিয়া মুগ্ধ হইতেন, নানা বিষয়ে কত অভিনব অত্যাশ্চর্য অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়া বিস্মিত হইতেন। তাঁহার এই সমুদয় দর্শন-শ্রবণাদির অনন্ত বিচিত্র অনুভূতি ইষ্টসূত্রে গ্রথিত হইয়া তাঁহাকে জাগতিক সকল ব্যাপারে অসীম প্রাজ্ঞ ও জ্ঞানাধীশ করিয়া তুলিয়াছিল।

এই নীরন্ধ্র নামাভ্যাসের ফলে অনুকূলচন্দ্রের এমন অবস্থা হইয়াছিল যে, তিনি যখনই যাহা-কিছুতে গভীরভাবে মনঃসংযোগ করিতেন, তৎকালে নিজেও তদবস্থা প্রাপ্ত হইয়া যেন তাহাই হইয়া যাইতেন। একাগ্রচিত্তে বৃক্ষের প্রতি মনোনিবেশ করিলেন, অমনি নিজেই যেন বৃক্ষ হইয়া মাটি হইতে রস আহরণে খাদ্য সংগ্রহ করিতেছেন, সূর্যকিরণে পত্রাভ্যন্তরে তাহার সমীকরণ দ্বারা পুষ্টির আনন্দে তৃপ্ত হইতেছেন, এইরূপ বোধে মশগুল হইয়া পড়িতেন ; বৃক্ষের ফুল ও ফল প্রসবের আনন্দ, তাহার আঘাত-ব্যথার বেদনা, তাহার যতকিছু সুখ-দুঃখ বৃক্ষের মতই নিজে অনুভব করিতেন। শকুন মাঠে পরমানন্দে মরা গরুর পচা মাংস খাইতেছে, তাহা দেখিয়া শকুনে মন নিবদ্ধ করিয়া শকুনভাব প্রাপ্ত হইলেন, শকুনের মতই গলিত গোমাংসের আস্বাদন-সুখে বিভোর হইয়া পড়িলেন। ইচ্ছা হইল, চাঁদে মনঃস্থির করিয়া চাঁদে উপনীত হইলেন, সে স্থানের সকল দৃশ্য প্রত্যক্ষ করিলেন, তাহার তত্ত্ব ও তথ্যাদি সম্বন্ধে সাক্ষাৎ অভিজ্ঞতা অর্জন করিলেন। এইভাবে তীক্ষ্ণ অন্তর্দৃষ্টির বলে বিশ্বপ্রকৃতির কত বিচিত্র অভিনব দুর্জ্ঞেয় রহস্যের সন্ধান যে তাঁহার প্রত্যক্ষ অনুভূতির নিকট ধরা পড়িত তাহার ইয়ত্তা নাই।

অটুট ইষ্টপ্রাণতার অমোঘ প্রেরণায় অবিরাম এইভাবে নামাভ্যাসযোগে তিনি গভীরে—আরও গভীরে—গভীরতম স্তরে গমন করিয়া সমগ্র জগতের অন্তর্নিহিত আদি কারণ-সত্তারও সাক্ষাৎ লাভ করিলেন। তিনি সর্বসত্তা দিয়া প্রত্যক্ষভাবে ইহা উপলব্ধি করিলেন যে, বিশ্বের যতকিছু সবই সেই অনাদি একেরই অভিব্যক্তি —সেই এক তিনিই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সবকিছুতে বিরাজমান রহিয়াছে। আর এই পরম ও চরম সত্যের অপরোক্ষ অনুভূতি এমনই অনায়াসে তাঁহার সর্বসত্তায় অনুস্যূত হইয়াছিল যে, জল-স্থল, আকাশ-বাতাস, গাছপালা, জীবজন্তু—দুনিয়ার যতকিছু সকলকেই তিনি একান্তভাবে আত্মবৎ মনে করিতেন,—তিনি নিজেই যেন সবকিছু হইয়া আছেন, এরূপ বোধ করিতেন। আর এই সহজ পরম বোধ তাঁহার জীবনযাত্রার প্রাত্যহিক সাধারণ কার্যকলাপেও অহরহই অসাধারণরূপে আত্মপ্রকাশ করিত।

আহারে বসিয়াছেন, অন্ন গ্রহণ করিতে পারিলেন না। —তিনি যাহা, অন্নও তাহাই, কে কাহাকে আস্বাদন করিয়া গ্রহণ করিবে,—এইভাবে আবিষ্ট হইয়া অন্নগ্রহণে বিরত থাকিলেন। কখনও বা কিছুক্ষণ আহারের পর ভাবাবেশে বিভোর হইয়া আহারের কথা একেবারেই ভুলিয়া গেলেন, আহার বন্ধ করিয়া গান গাহিতে লাগিলেন।······মূত্রত্যাগের পর জলশৌচ করিতে গিয়া মহা সমস্যায় পড়িলেন,—তিনি যাহা, শিশ্নও তাহা, প্রস্রাবও তাহা, জলও তাহাই, সুতরাং



শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র (যৌবনে)

কে কাহাকে কি দিয়া শোচ করিবে,—এই ভাবনায় ব্যাকুল হইয়া রহিলেন। এইরূপ ভাববিহ্বল অবস্থায় কিছুকাল তাঁহার কখন দিবা, কখন রাত্রি, সে-বোধ পর্যন্ত বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। এই অবস্থায় দিবারাত্রি এক মুহূর্তও না ঘুমাইয়া তিনি এক সময় একাদিক্রমে দীর্ঘ ছয় মাস সদা জাগ্রৎ অবস্থায় কখনও গৃহমধ্যে, কখনও প্রাঙ্গণে, কখনও পদ্মাতীরে কখনও চরভূমিতে, কখনও উন্মুক্ত শস্যক্ষেত্রে, কখনও বা শ্মশানভূমিতে বিচরণ করিয়া অতিবাহিত করিয়াছেন।

একাত্মানুভূতির এই সহজ সাবলীল বিকাশে অনুকূলচন্দ্র বাল্যকাল হইতেই আপনভোলা ভালবাসার আবেশে অকাতর সেবায় ও সমবেদনায় কত লোকের অন্তর যে জয় করিয়াছিলেন, সে সকল অসংখ্য অপূর্ব কাহিনীর উল্লেখ এখানে আর করিব না। শত শত ঘটনায় ইতরপ্রাণী ও উদ্ভিদাদির প্রতি তাঁহার গভীর একাত্মতাবোধের যে প্রত্যক্ষ পরিচয় পাওয়া যায় তাহাও প্রকাশের অবকাশ এখানে নাই ; তবে প্রসঙ্গানুরোধে শুধু সে-সম্বন্ধেই আমরা উদাহরণ-স্বরূপ সংক্ষেপে দুই-চারিটি কথা বলিব।

একদিনের কথা। বর্ষাকাল। অনুকূলচন্দ্র নিজবাটী হইতে কাশীপুরের দিকে যাইতেছিলেন। তিনি দেখিলেন, রাস্তায় জলস্রোতে অনেকগুলি কীট ভাসিয়া যাইতেছে। ইহাতে তাঁহার প্রাণে এমনই ব্যথা লাগিল যে, তিনি সেখানে বহুক্ষণ থাকিয়া অতিযত্নে কীটগুলিকে একটি একটি করিয়া মাটির উপর তুলিয়া দিতে লাগিলেন। অনেক চেষ্টায় সবগুলি পোকার উদ্ধারকার্য সমাপ্ত করিয়া তবে তিনি শান্ত মনে পথ চলিলেন।

বাড়ীর সম্মুখে পদ্মার চরে দুইটি চকা-চকী উড়িয়া যাইতেছিল। একজন শিকারী পাখী দুইটি লক্ষ্য করিয়া গুলি নিক্ষেপ করে। গুলি ডানায় লাগিলেও পাখী দুইটি উড়িয়া গিয়া অনতিদূরে বসিল। ঘরের বারান্দা হইতে অনুকূলচন্দ্র তাহা দেখিতে পাইয়া অত্যন্ত কাতরকণ্ঠে চিৎকার করিয়া উঠিলেন,—"হায়! হায়! পাখী দু'টোকে মারছে বোধ হয়। আমি অসহায় কি করতে পারি! আমার যে কোনই ক্ষমতা নেই।" এই অবসরে পাখী দুইটির প্রতি নিষ্ঠুর শিকারীর দ্বিতীয়বার গুলি নিক্ষেপের শব্দ শ্রুত হইল। অনুকূলচন্দ্র আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। পাগলের মত হইয়া, "হায়! হায়! মরল রে, উঃ উঃ—" বলিতে বলিতে তিনি আর্তনাদ করিতে লাগিলেন। শিকারীর গুলি যেন তাঁহারই বক্ষে বিদ্ধ হইয়াছে, এইরূপ অসহ্য যন্ত্রণাবোধে ছটফট করিতে করিতে তিনি আহতের ন্যায় মাটির উপর পড়িয়া গেলেন।

একবার চৈত্র-সংক্রান্তি দিবসে বাড়ীর নিকটবর্তী শ্মশান-ভূমিতে এক তান্ত্রিক সাধক ছাগশিশু বলি দ্বারা পূজা করিবার আয়োজন করিয়াছিলেন। রজ্জুবদ্ধ ছাগশিশুটির ক্রন্দন শুনিয়া অনুকূলচন্দ্রের কোমল প্রাণে দারুণ আঘাত লাগিল। অসহায় প্রাণীটিকে রক্ষা করিবার জন্য তাঁহার প্রাণ ছটফট করিতে লাগিল। অনুকূলচন্দ্র উক্ত সন্ন্যাসীর নিকট গিয়া ছাগশিশুটিকে বলি না দিয়া অন্য উপচারে

পূজা সম্পন্ন করিবার জন্য বিনীতভাবে কাতরকণ্ঠে কত প্রার্থনা জানাইলেন। কিন্তু সন্ন্যাসী ক্রোধাবিষ্ট হইয়া কর্কশ ভাষায় তাঁহার মিনতিপূর্ণ করুণ আবেদন অগ্রাহ্য করিলেন। এমন সময় জননীদেবী তথায় উপস্থিত হইয়া অনুকুলচন্দ্রকে হস্ত-ধারণপূর্বক বাড়ী লইয়া গেলেন। মায়ের কথায় তিনি সেস্থান হইতে চলিয়া আসিলেন সত্য, কিন্তু তাঁহার অন্তরখানা নিদারুণ ব্যথায় পুড়িয়া ছাই হইয়া যাইতেছিল। তিনি অসহ্য যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া উন্মত্তের মত সেই অন্ধকার রাত্রিতে ইতস্তত ছুটাছুটি করিতে লাগিলেন। অনুকুলচন্দ্রের সেই তীব্র মর্মবেদনা সহ্য করিতে না পারিয়া, তাঁহার জনৈক প্রিয় সেবক নফরচন্দ্র ঘোষ কোনমতে ছাগশিশুটিকে উদ্ধার করিয়া লইয়া আসেন। অনুকুলচন্দ্র ছাগশিশুটিকে পাইয়া আনন্দে আত্মহারা হইলেন, তাহাকে কোলে লইয়া মুহুর্মুহু চুম্বন করিতে লাগিলেন; মনে হইল, সন্তানহারা মা যেন কতদিনের পর তাঁহার হারানিধিকে ফিরিয়া পাইয়াছেন।

একবার অনুকুলচন্দ্র কতিপয় পার্ষদের সঙ্গে ঘোড়ার গাড়ীতে করিয়া যাইতেছিলেন। অশ্বের গতিবেগ বৃদ্ধি করিবার মানসে গাড়োয়ান একবার সজোরে উহার পিঠে চাবুক দিয়া আঘাত করে। অনুকুলচন্দ্র অশ্বপৃষ্ঠের সেই তীব্র কষাঘাত সহ্য করিতে না পারিয়া কাতরকণ্ঠে চিৎকার করিতে করিতে তৎক্ষণাৎ চলন্ত গাড়ী হইতে লাফাইয়া নিচে ভূমিতে পড়িয়া যান। সঙ্গীরা তখন কাছে যাইয়া ইহা দেখিয়া বিস্মিত হইলেন যে, ঘোড়ার পিঠে চাবুকের যে লম্বা লাল দাগ পড়িয়াছে, চাবুক মারার সঙ্গে সঙ্গে অনুকুলচন্দ্রের পৃষ্ঠদেশেও তাহা মোটা অনুরূপভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে, আর সেজন্য অসহ্য যন্ত্রণায় তিনি ভীষণ কষ্ট পাইতেছেন।

এক সময় অনুকুলচন্দ্র বাঁশের মাচাং-এর পায়খানায় মলত্যাগ করিতেন। অনেক সময় ময়লার গামলায় গুবরে পোকা পায়খানায় বসিয়াই তিনি সর্বপ্রথম নিচের দিকে লক্ষ্য করিতেন, কোন গুবরে পোকা সেখানে আছে কিনা। যেদিন পোকা রহিয়াছে দেখিতে পাইতেন, সেদিন আর তাঁহার পায়খানা করা হইত না। তাড়াতাড়ি পায়খানা হইতে নামিয়া আসিয়া তিনি পোকাগুলিকে একটি একটি করিয়া তুলিতে আরম্ভ করিতেন। এইভাবে পোকাগুলি সব উদ্ধার না করা পর্যন্ত তাঁহার অস্বস্তি দূর হইত না।

কেহ কোন বৃক্ষাদি কর্তন করিলে অথবা বৃক্ষের শাখা বা পত্রপুষ্পাদি ছিন্ন করিলে, অনুকুলচন্দ্র তাহা দেখিয়া যন্ত্রণায় অভিভূত হইয়া পড়িতেন। ঝড়ে কোন বৃক্ষের শাখাপ্রশাখা ভাঙ্গিয়া গেলে, তিনি বৃক্ষের সেই ক্ষতস্থানে মাটি, গোবর, খড় প্রভৃতি দ্বারা ব্যাণ্ডেজ বাঁধিয়া এবং তাহাতে নিয়মিত জলসেচ করিয়া ক্ষতস্থানটি সত্বর নিরাময় করিয়া তুলিবার জন্য কত চেষ্টাই না করিতেন। বৃক্ষদেহের ক্ষতটিকে তিনি যেন নিজ অঙ্গের ক্ষত বলিয়াই মনে করিতেন। একদিন তিনি কথায় কথায় বলিতেছিলেন,—"এককালে দাঁতনকাঠি ভাঙ্গবার সময়

আমার মনে হ'ত যেন সত্যি সত্যি আমারই আঙ্গুলটাকে মট্ ক'রে ভেঙ্গে ফেল্লাম, তখন থেকে মাটি দিয়ে দাঁতন করতাম।"

অনুকূলচন্দ্রের আজন্মলব্ধ সত্তানুস্যূত ইষ্টানুরাগ বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে দিন দিনই উদ্দাম উচ্ছলতায় মূর্ত হইয়া উঠিয়াছিল। এই উর্জী ভক্তি—এই দুর্বার যোগাবেগ তাঁহাকে ঈশ্বর-প্রাপ্তির উদগ্র নেশায় এমনই পাগল করিয়া তুলিয়াছিল যে, ভগবানের ধ্যানেই তিনি অহর্নিশ আত্মভোলা হইয়া থাকিতেন। এই অবস্থায় প্রাণের আবেগে কখনও তিনি পরমপিতাকে আর্তস্বরে ডাকিয়াছেন, কখনও তাঁহার প্রেমসুধা পানে আনন্দে অধীর হইয়া উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে তাঁহার মহিমা কীর্তন করিয়াছেন, কখনও প্রিয়তম-সামীপ্যের প্রীতি-সুখ-পরশে তিনি আহ্লাদে উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছেন, কখনও তাঁহার বিরহ-বেদনার দহন-জ্বালায় ছটফট করিয়াছেন—কাঁদিয়া বক্ষ ভাসাইয়াছেন, কখনও ব্যথিত অন্তরের কত-না অভিমান ব্যক্ত করিয়াছেন, কখনও সন্তান-মনের কত গর্ব কত দাবী, কত আব্দারের কথা জানাইয়াছেন, কখনও বা আপনার দীনতার জন্য অশ্রুসিক্ত কাতরকণ্ঠে তাঁহার চরণে ক্ষমাভিক্ষা চাহিয়াছেন। এইভাবে অন্তরের সুখ-দুঃখ, আশা-নৈরাশ, উল্লাস-বিষাদের কত সঙ্গীতই তিনি গাহিয়াছেন, আত্মনিবেদনের কত কথাই শুনাইয়াছেন। ভক্তহৃদয়ের এই উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা, আগ্রহ-আকুতি, আবেগ-উচ্ছ্বাসের কত-যে বিচিত্র গীতিমাল্য রচনা করিয়া তিনি তাঁহার আরাধ্য দেবতার অর্চনা করিয়াছেন, তাহার অবধি নাই। ইষ্টপূজার—ইষ্টসেবার—ইষ্টসম্ভোগের সে কি বিপুল অপূর্ব সমারোহ! শ্রেষ্ঠপদে নিবেদিত, অনুকূলচন্দ্রের উদ্গীত সে-সকল অনবদ্য অর্ঘাঞ্জলিও তদীয় আধ্যাত্মিক চেতনা ও অপার্থিব অনুভূতি-নিচয়ের অন্যতম অন্তরঙ্গ পরিচয়। এখানে তাঁহার সে-সমুদয় ভক্তিরসাত্মক কবিতাবলীর কয়েকটি উদ্ধৃত করিতেছি।—

নেচে নেচে চল্ দেখি ভাই ডাকেন পিতা আকুল প্রাণে।
চল্ চল্ হৃদয় জুড়াই পরমপিতার আলিঙ্গনে॥
অনুতাপ আকুল ক্রন্দনে
ডাকি আয় হৃদয়-রঞ্জনে
শোক তাপ ব্যথা যাবে দূরে তাঁর প্রেম-পরশনে॥

কৃষ্ণ পিতা কৃষ্ণ মাতা কৃষ্ণ আমার প্রাণধন।
কোথা গিয়ে লুকালে নাথ হরে নিয়ে প্রাণমন॥
কৃষ্ণ বিনা এ সংসার
সবই দেখি অন্ধকার
কে আমার আমি কার যেন নিশার স্বপন॥

যেদিকে মেলি আঁখি
কৃষ্ণকর লেখা দেখি
উর্দ্ধবাহু হয়ে থাকি দেহ নাথ দরশন ॥
দীন হীন কিশোর দাস
করে কৃষ্ণ তব আশ
কর পাপের বিনাশ ঘুচাও জীববন্ধন ॥
মুক্ত কর সকল প্রাণী
তোমার চরণে আনি
লয়ে আমার প্রাণ পাপীতাপীর কর ত্রাণ ॥

কে যেন প্রাণের কোণে রাধা ব'লে ডেকে গেল।
রাধা রাধা রাধা ব'লে হৃদয় চুরি করে নিল ॥
বসিয়া মোহেরই ঘোরে গেথেছিনু আশা-মালা।
পাগল-করা কি এক সুরে সাধের মালা হরে নিল।
যেদিকে চাহিয়া দেখি ভুলে যায় লো দু'টি আঁখি
মরম মাঝে বাজে যে কে আমার সরবস্ব কেড়ে নিল ॥

জানি না কেন বাঁশি শুধু রাধা রাধা বলে।
আমি তো আমারি ওগো ডাকি নি তো কারো ছলে ॥
অনাহত অবিশ্রান্ত
বাঁশি আমার কেবল বাজে
আমি পাগল বাঁশির গানে আমায় নিয়ে বাঁশি ভোলে ॥

এস এস পরমপিতা হৃদয়ে আমার।
তোমার দয়া এ জগতে অসীম অপার ॥
তুমি যখন হৃদে এসে
দাঁড়াও পিতা শান্তি হেসে
জগত যেন শান্তিমাখা হাসে অনিবার ॥
একবার তোমার সাড়া পেলে
সকল দুঃখ যাই গো ভুলে

শান্তি শান্তি শান্তি জগত শান্তির আধার ॥
না পেলে তোমায় বড় যাতনা
ধরাতে যে মোর মন টেঁকে না
আকুল প্রাণে কাঁদি একা বিকল অন্তর ॥

আমার আঁধার হৃদয়ে জ্বালো ওগো পিতা
তোমারি স্নিগ্ধ আলো।
সারাটি অন্তর উঠুক হাসিয়া
ঘুচে যাক যত কালো ॥
অমল ধবল স্নিগ্ধ কিরণে
নাচুক হৃদয়খানি।
তব নামসুধা পান করে সদা
তৃপ্ত হোক মোর প্রাণী।
কাঁপুক তোমার শুভ্র সিংহাসন
আমার করুণ ডাকে।
অবশ পরাণ শান্তিতে ভাসুক
তোমারে হৃদয়ে রেখে ॥
শোক দুঃখ জ্বালা যাক পিতা ভেসে
উঠুক জাগিয়া ভক্তি।
তোমারি চরণে আমি লয় হয়ে
হউক আমার মুক্তি।
ষড়রিপুচয় সকল পালাক
সুদূরে পালাক ভ্রান্তি।
মন হতে সব ঘুচুক বিকার
থাকুক অনন্ত শান্তি ॥

আজি এ হৃদয় শুধু তোমা বিনে
মরুভূমি প্রায় জ্বলিছে ভীষণ ॥
যথা ফিরে চাই শুধু তুমি আঁকা
- তুমিময় শুধু হেরি এ ভুবন ॥

কোথা আছ তুমি শুধু খুঁজে মরি
পাই না যে তোমা তবু শুধু ঘুরি
হতাশ অন্তরে কাঁদি শেষে একা
আছ তুমি পুনঃ হেরি গো স্বপন ।।
ভাঙ্গা বুক লয়ে কি যেন আশায়
পুনঃ খুঁজি ভেবে পাইব তোমায়
হায় রে পাষাণী পলাইয়া যাও
দেখাও আঁধার এ তিন ভুবন ।।
হতাশ অন্তরে বুকে ব্যথা ধরি
আঁখি নীরে ভেসে পুনঃ বসে পড়ি
এত ভালবাসি এত কেঁদে মরি
হাত ধরে এসে তোল না কখন ।।
তুমি আছ ভেবে শুধু বেঁচে আছি
বড় সাধ তাই থাকি কাছাকাছি
হায় মিছে ভাবি মিছে কেঁদে মরি
আঁধার হৃদয় আঁধার ভুবন ।।

— ——

(আর মা) আমায় ভালবেস না স্নেহ কর না
নিও না কোলে তুলে।
(তুমি) ভুলিয়া যাও চলিয়া যাও চেও না মা
আর ছেলে ব'লে ।।
হৃদয়-অনল জ্বলে অনুক্ষণ
গেল ছাই হয়ে দেহ প্রাণ মন
একে মম স্থান নির্জন কানন
যাও মা গো মোরে ভুলে ।।
কত যে বলেছ বার বার তুমি
চলে গেছি দূরে শুনি নাই আমি
যত কেশ ধ'রে তুলিছ উপরে
(তত) ডুবেছি গভীর জলে ।।

তবু কেন মা করিছ যতন
তবু কেন দাও ও রাঙ্গা চরণ
(মা গো), ফিরাও বদন ফিরাও নয়ন
(মোরে) পায়ে ঠেলে যাও চলে ॥

আমি আর কত দিন রহিব বসিয়া
অপার অনন্ত সিন্ধুপারে।
তুমি কোথা ফাঁকি দিয়া গিয়াছ চলিয়া
আসিবে না কি গো নিমেষতরে ॥
তুমি আর কি কখন অধমে স্মরিয়া
দাঁড়াবে না কি গো কখন হাসি।
ভুলে সাড়া দিতে মোরে আসিয়া এ-ধারে
বাজাবে না তব মোহন বাঁশি ॥
আমি একেলা আঁধারে চিরদিন কি গো
বিরহে তোমার মরিব কাঁদি।
তুমি ভুলিয়া কখন আসিবে না কাছে
শুনিতে রোদন হৃদয়ভেদী ॥
ও গো সাঁজের প্রদীপ ক্রমে নিভে গেল
থামিল মন্দিরে আরতি বাজা।
আমি এ-ধারে একলা নির্জন এ-পারে
এস এস ওগো হৃদয়-রাজা ॥
প্রভু, ধীরে ধীরে বেলা গেল চলে
ক্রমে সন্ধ্যা গেল উধাও হ'য়ে।
এ যে বড় অন্ধকার বসিয়া এ-পার
দুরু দুরু হৃদি কাঁপিছে ভয়ে ॥
আমি ডেকে ডেকে তোমা হয়েছি কাতর
আর যে পারি না কহিতে কথা।
মোর গলা ধ'রে অশ্রু শুকায়েছে
সহিতেছি হৃদে বড়ই ব্যথা।

ও গো খেয়া নেয়ে এসো গো এ-পারে
বিতরি তোমার করুণা-কণা।
আমি বহু ঘুরে ঘুরে এসেছি হেথায়
কে তরাবে তব করুণা বিনা।

তোরা জানিস্ তো কেউ বলে দে গো
কোথা পরমপিতা আমার।
আমি আকুল পরাণে ঘুরিয়া বেড়াই
পাই নাক দেখা তাঁর।।
চারিদিকে যত খুঁজি পাতি পাতি
দেখি যেন তত তাঁরি শান্ত ভাতি
আমি পথহারা দেহ শ্রান্ত অতি
ব'লে দাও মোরে একবার।।
পিতার জ্যোতিতে বিশ্ব আলোকিত
জ্বলে চন্দ্র সূর্য আর তারা যত
এত আলো তবু আমি গো আঁধারে
কেঁদে মরি শুধু অনিবার।।
তাই বলি ওগো ভূচর খেচর
চন্দ্র সূর্য তারা যক্ষ বা কিন্নর
যদি জেনে থাক বল বল বল
পাব কিনা দেখা বিধাতার।।

(প্রভু) সন্তানে রেখ চরণে।
রাধাস্বামী বলে ডাকিলে এস গো
বাধা দিও এসে মরণে।
জটিল সংসারে যদি ডুবে যাই
সুধামাখা নাম যদি বা হারাই
ছুটে এসে তুমি আমারে ধর গো
ভুলো না মোর তরণে।।
হইলে আমার কুপথে মতি

ফিরাইও এসে তাহার গতি
বাতাসেতে মিশে একটু বল গো
বসেছ তুলিতে চরণে ॥
দেখাইও তব বিমল জ্যোতি
ফিরিবে অমনি আমার মতি
আমি উঠিব বসিতে কোলে গো
রহিব না পাপ শয়নে ॥

কত দুখ দিবি তারা পাঠাইয়ে অভাগারে
শান্তিধারা বলে কারে জানি না জনম ভরে ।
দুখে ভরা এ জীবন
শান্তিহীন অনুক্ষণ
এসেছ কি কভু ভুলে দেছ কি মা দেখা মোরে ॥
এত যে কাঁদি মা ভবে
ভুলে কি এসেছ কবে
শান্তি দিতে অভাগারে নিতে ভুলে কোলে করে ॥
দীন অনুকূলে বলে
শান্তি নাই ধরাতলে
তারা বলে ডাক সদা যদি ভুলে দয়া করে ॥

কত যে ভেবেছি কত যে কেঁদেছি
কত যে ডেকেছি তারা তারা ব'লে ॥
বড়ই পাষাণী তুই মা ঈশানী ।
দিলি নি মা স্থান ও-পদ কমলে ॥
বড় ব্যথা পেয়ে বলে' তারা তারা ।
ডাকি মা তোমারে দিবে ব'লে সাড়া ॥
তুই সর্বনাশী ওমা দুঃখহরা ।
হল না মা দয়া কুসন্তান ব'লে ॥
সারাদিন খেটে লভিতে বিশ্রাম ।
প্রাণের আবেগে করি তারা নাম ॥

নয়ন সলিলে ভাসি তারা ব'লে।
দিলি নি মা সাড়া নিলি নি মা কোলে ॥
সারাদিন ভাবি বুঝি মা আমার।
এল কোলে নিতে তনয় তাহার ॥
হায় মিছে ভাবি মিছে দেখি ছবি।
পরিণত হয় সকলই মা ভুলে।

কেন ভুলে গিয়ে হলি রে অসার
জগত-জনক রাধাস্বামীরে।
মেতে মিছা মদে আশু হেয় সুখে
সে সুখে বঞ্চিত হলি রে সংসারে ॥
কেহ তো চাবে না আর তো সুধাবে না
মাতিলে ক্ষণ-সুখে ভুলিলে জনকে।
এ সুখ সম্পদ কোথা যাবে ডুবে
পাবি না সান্ত্বনা আর ও ভাঙ্গা বুকে ॥
পিতা সুত দারা যাবে ফাঁকি দিয়ে
নয়ন-সলিলে হেরিবে আঁধার।
আমার বলিতে পাবে না জগতে
সুখের জীবন হইবে গুরুভার ॥
তাই বলি মন ভ্রম না কুপথে
শরণ লও এসে পিতার চরণে।
পরম দয়াল সেই রাধাস্বামী
দিবেন অভয় তাঁহারি সন্তানে ॥
তুলিবেন ধরি কুপথ হইতে
করিবেন চুম্বন কত বারে বারে।
দিবেন প্রসাদ বাড়িবে সম্পদ
ভাসিবে মহা সুখে এ সুখ-সংসারে।

তব অনাদরে বল ক্ষতি কি আমার।
আমি নাম ভালবাসি
হেরিয়ে সুখে ভাসি
তুমি তো আমার বাহে অমিয় পাথার
তব অনাদরে বল ক্ষতি কি আমার ॥

এ হিয়ায় তুমি ভরা
তাই ঝরে আঁখি তারা
তব অনাদরে নহে জেন বার বার
তব অনাদরে বল ক্ষতি কি আমার ॥
তোমার মুরতিখানি
ঈশ্বর বলিয়া মানি
তব প্রেমে আঁখি দু'টি ঝরে অনিবার
তব অনাদরে বল ক্ষতি কি আমার ॥

আমি তো তোমারি আছি
তোমারে সকলি দিছি
রূপ গুণ মন প্রাণ যা ছিল আমার ॥
অনাদর কর তাতে ক্ষতি কি আমার ॥
তবু তব কৃপা চাব
চরণে আদরে রব
না হয় ঠেলিও নাথ পদে বার বার
অনাদরে অবহেলে ক্ষতি কি আমার।

বসিয়া চরণ-প্রান্তে
ডুবিব না আর ভ্রান্তে
উদ্দেশ্য তোমাতে মেশা হবে তো আমার
অনাদর কর তাতে কি দুঃখ আমার ॥

মরম-মন্দির খুলি
নিতি বনফুল তুলি
পুজিব তোমারে নাথ কিবা ভয় আর
তব অনাদরে বল কি হবে আমার ॥

অবলা বলিয়া ঠেলি
দূরে করি দাও ফেলি
তোমার চরণ ছাড়া কি আছে আমার
তব অনাদরে বল ক্ষতি কি আমার ॥

মন তুই যদি রে ভালবাসিস আমার একটা কথা রাখ।
একবার আকুলপ্রাণে মনে-প্রাণে পরমপিতা ব'লে ডাক ॥
হবে না আর দুঃখ ভোগ
পালাবে তোর যত রোগ
ময়লা ধুয়ে খাঁটি হ'য়ে (মন) তুই হৃদাসনে তাঁরে রাখ ॥
অশ্রুজলে ধো রে ময়লা
ঘুচে যাক সকল জ্বালা
একান্ত প্রশান্ত হ'য়ে (মন তুই) শুদ্ধ ভক্তি-চন্দন মাখ ॥
সে চন্দনের গন্ধে তোর
আপনি প্রাণ হবে ভোর
রিপুমারা আগুন ভক্তি (দেখা মন) তারা পুড়ে হবে খাক ॥

ওগো তোমারি মহিমা ফুটিছে সদাই নদ-নদী কত কন্দরে।
কত বন-উপবনে সুন্দর উদ্যানে সজীব নির্জীব অন্তরে ॥
ওগো অখিল ব্রহ্মাণ্ড তোমারই সৃজন
তোমারই কৃপায় জীবের জীবন
ওগো তুমি আদি অন্ত অনন্ত বিমান, তুমিই ব্যাপ্ত আছ চরাচরে
অসার হৃদয়ে তুমিই পাষাণ
তুমি সৃষ্টি স্থিতি তুমিই শ্মশান
প্রতি ঘটে ঘটে তব অবস্থান, কি কুৎসিত কিবা সুন্দরে ॥
ওগো চিরদিন মম হৃদয়েরি সাধ
কৃপা-কণা দানে সেধো নাক বাদ
এস মম ধ্যানে রাখিব যতনে এই ক্ষুদ্র হৃদি-গহ্বরে ॥

মা গো, পরাব বলিয়া তোমার গলায় যতনে মালাটি গেঁথেছি।
ধর ধর ধর পর পর মা গো, আমি বড় আশা ক'রে এনেছি॥
আপনা ভুলিয়ে সুষুপ্তির কোলে
দিয়েছিনু যেন মালা কার গলে
আবেশ টুটিল মারে মনে প'ল তাই ত্বরা মালা গাঁথিয়া এনেছি॥
গলে পরে' মালা হৃদয়-মাঝারে
দাঁড়া দাঁড়া মা গো দাঁড়া আলো করে
আমি মনের মতন সাজাইব তোরে যেমন দেখিতে চেয়েছি॥
মন-ফুলে গাঁথা এ মালাটি মোর
আনিয়াছি তাই গলে দিতে তোর
আমার ধরম করম ভকতি শ্রদ্ধা মালাটির সাথে সঁপেছি॥

পিতা তোমারে ডাকা হলো না
মুখে পিতা বলি মনে তোমায় ছলি
(তাই) মন মুখ এক হ'ল না॥
সংসার-দহনে কাঁদি ক্ষণে ক্ষণে
তব প্রেমে কই কাঁদি না।
(এই) পোড়া আঁখি-নীর তোমা নামে স্থির
শুষ্ক হ'য়ে যায় পড়ে না।
যবে ভাবি মনে বসিয়া নির্জনে
করি তোমাতেই মন যোজনা।
হায় হায় মন করে জ্বালাতন
ভাবে কত শত বিশ্ব-ভাবনা॥
বসিয়া আসনে যদি ভাবি মনে
করি তব নাম জপনা।
আলস্য জড়তা ঘুম অস্যরতা
করে কত শত তাড়না॥
যদি মনে করি সকলি পাশরি
স্থির হ'য়ে করি সাধনা।

(পিতা) কিবা কব দুখ ফেটে যায় বুক
শ্রবণেতে শুনে শোনে না ॥
(তাই) বল বল পিতা ওগো দয়াল ত্রাতা
অধমে কোলে কি নেবে না ॥
(আমি) এমনি করিয়া রব কি পড়িয়া
সব কি শমন-যাতনা ॥
(তুমি) দয়া না করিলে এসে না তুলিলে
পাতকী তরান হবে না।
এস এস পিতা ওগো দয়াল দাতা
তোমা বিনা প্রাণ বাঁচে না ॥
যেন ও রাঙ্গা চরণ নমি অনুক্ষণ
নিমেষেও ভুলে যাই না।
পাইলে প্রসাদ যাবে অবসাদ
হবে প্রাণ সুখে মগনা ॥

আয়রে আয় সোনার টিয়ে তুই না রে ভাই অন্তর্যামী।
তাইতে তোর নাম রেখেছি আদর ক'রে রাধাস্বামী ॥
মরমেতে যত ব্যথা পাই
তোর কাছে সকল জানাই
তাই বড় শান্তি পাই ভাই, হই নারে কুপথগামী ॥
তোর নামে ভাই ভুলে' জ্বালা
পরবো সুখে শান্তির মালা
মনে হ'লে ডাকি যে ভাই তোমার পাবার আশে আমি ॥

দগধ পরাণে বস এসে তুমি
দুখ-কালিমা ঘুচায়ে।
তব শান্ত কিরণ দিয়ে দাও মোর
তপ্ত হৃদয় মুছায়ে ॥
তব পুণ্য মহিমা ব্যাপ্ত রয়েছে
অখিল সংসার ভরিয়া।

আমি শূন্য হৃদয়ে ছুটিয়াছি শুধু
মোক্ষ চরণ স্মরিয়া ॥
তুমি কাল-করম-হন্তা ঘুচাও পাপ-পন্থা
তব মোক্ষ-চরণে লয়ে যাও মোরে
বিশ্ব-বিপদ ভুলায়ে
আমি বিপদ-সাগরে পড়িয়া মরি গো ডাকিয়া ডাকিয়া
তব মোক্ষ চরণে স্থান দাও মোরে
দগধ অশ্রু মুছায়ে ॥

হৃদয়-গগন মাঝে তুমি মম ধ্রুবতারা।
তোমারেই করিয়াছি জীবনের শান্তি-ধারা ॥
এ জীবনে তুমি মম
অমিয় নির্ঝর সম
হৃদয়-মাঝে তুমি মম বারি-ধারা ॥
অশান্ত হৃদয় মাঝে
তব প্রেম সদা রাজে
চারিদিকে হেরি সদা তোমারি সোহাগ-ভরা ॥
তুমি মম আশা-তৃষা
তুমি মম ভালবাসা
জনমে জনমে হবে তুমি মম সুখ-ধারা ॥

অই শ্রীচরণ নিলাম শরণ, যা হয় এখন কর।
কে আছে আর এ অভাগার, তুমি আমার সর্বেশ্বর।
জেনেছি তুমি দয়াময়, আপন গুণে আছ সদয়
তোমাকে কি আর বলতে হয়, প্রভু আমায় দয়া কর ॥
অকূল এই ভব পাথার, তুমি মাত্র তায় কর্ণধার
না ক'রে সেই কুল বিচার, নায়ে চড়েই যে পার কর ॥
তোমার রাঙ্গা চরণ ফেলে, যেন রাঙ্গা মাকাল ফলে
ভুলেই কভু না যাই ভুলে, পদে পদে সে ভুল ধর ॥
তোমার উপর হুকুম জারি, আমি কিহে কর্তে পারি

এইটি মাত্র বলতে পারি, আজ্ঞাকারী আমায় কর ॥
যে যা ভাবে ভাবুক তোমায়, আমি ভাবিব ঐ রাঙ্গা পায়
ও-পায় যে না পায় উপায়, ধরুক ঐ পায় নিরন্তর ॥
সর্বতীর্থ সর্বদেব ঐ চরণে দেখতে পাব
কিজন্য আর কোথা যাব, কারে বলব দুঃখ হর ॥
অনুকূল বলে, হৃদয়নাথ তুমি যে জগতনাথ
নরনারী সবারি নাথ, তুমি হরি তুমি হর ॥

অতি তরুণ বয়স হইতেই অনুকূলচন্দ্রের জীবনে যে-সকল অপূর্ব আধ্যাত্মিক অনুভূতির স্ফুরণ হইয়াছিল তৎসম্বন্ধে নানা সময়ের কিছু কিছু বিবরণ তিনি উত্তরকালে মাঝে মাঝে কথাপ্রসঙ্গে প্রকাশ করিয়াছেন। এইবার আমরা সেই বিবরণ-রাজির অংশ-বিশেষ নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া আলোচ্যমান 'আধ্যাত্মিক চেতনা'-প্রসঙ্গটির (১) উপসংহার করিব।

"আমি ছোটবেলায় সব সময় নামময় হ'য়ে থাকতাম। দিন-রাতই নাম করতাম (২)। কোনকালেই আসনাদি ক'রে নাম-ধ্যান করি নাই। নাম করতে খুব ইচ্ছা হ'তো, ভাল লাগতো, তাই সর্বদাই নাম চালাতাম। দিবারাত্র সর্বক্ষণ

---

(১) এ-সম্বন্ধে অনুকূলচন্দ্রের কথিত, তদীয় নিজ-জীবনে অনুভূত অপূর্ব দর্শনাদির বিশদ বর্ণনা 'কথাপ্রসঙ্গে' ৩য় খণ্ডে দ্রষ্টব্য।

(২) এই প্রসঙ্গে আমরা 'নাম' করার প্রকৃত তাৎপর্য ও প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোকপাতের জন্য, ঠাকুর অনুকূলচন্দ্র পরবর্তীকালে একদিন প্রশ্নোত্তরে যাহা বলিয়াছিলেন, নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি।—

"পাতঞ্জলে আছে—'তজ্জপস্তদর্থভাবনম্'। জপের মধ্যে আছে মানস আবৃত্তি। আবৃত্তি মানে সম্যকভাবে থাকা। জপ্য মন্ত্র বা নাম আদি কারণের প্রতীক স্বরূপ। আর 'নাম' করা মানে, সেই কারণ-সত্তার প্রতি আনত হ'য়ে তাতেই অবস্থান করার চেষ্টা করা। অর্থ মানে গতি বা গন্তব্য। নামের গন্তব্য হচ্ছেন নামী। নামের অর্থ ভাবতে গেলেই নামীতে যেয়ে পৌঁছাতে হবে। নাম, নামী, জগৎ ও আমি এই সবগুলির সার্থক সঙ্গতি ও সম্পর্ক আবিষ্কারই জপধ্যানের কাজ। তা যদি না করি, তবে আঁধারে পথ চলার মত অবস্থা হয়। চলনটা হয় কসকানে রকমের। কারণ, নিজের সঙ্গে ও জগতের সঙ্গে এবং তার পিছনের কারণের সঙ্গে কোন পরিচয় বা যোগসূত্র ঘটে না। তাই চলনটা হয় এলোমেলো ও অসঙ্গতিপূর্ণ। কিন্তু এই পরিচয় আমাদের করাই চাই। অর্থ সহ নাম করলে ঠাকুরের পরমস্ফূর্তি হয়। নাম হলো শব্দব্রহ্মেরই প্রতীক, তা থেকেই যা-কিছুর উদ্ভব। নামের মধ্যেই আছে বিশ্বসত্তার অর্থপরিচয়। নামই ঠাকুরের সত্তা, প্রতিটি যা-কিছুর সত্তা। তোমার প্রাণন-শক্তির তোষণ করলে তুমি যেমন তুষ্ট হও, ঠাকুরের প্রতি অনুরাগ নিয়ে নাম করলে তিনিও তেমনি তুষ্ট হন, পুষ্ট হন অর্থাৎ তোমার সত্তারূপী ঠাকুর তোষণপুষ্ট ও নন্দিত হ'য়ে ওঠেন। যতই নাম-ধ্যান করা যায় ততই ঠাকুরের প্রতি অর্থাৎ জীবন্ত সদ্গুরুর প্রতি সত্তার সম্বেগ বাড়ে। তিনিই যে আমার জান-প্রাণ এমনতর অনুভব সমগ্র সত্তাকে ছেয়ে ধরে। এইভাবে এগোতে এগোতে 'সানুবেগ সর্বাসিদ্ধি' হ'য়ে ওঠেন। স্পষ্ট বোধ

নামে বিভোর, নামে তন্ময় হ'য়ে থাকতাম। একদিন চুপ ক'রে নাম করছি, দেখলাম প্রকাণ্ড সূর্যের মত জ্বলন্ত গোলাকার পদার্থ আমার সম্মুখে ভেসে বেড়াতে লাগলো। চোখ যেন ঝলসে যায়। শেষে সেটা ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল। মাঝে মাঝে দেখতাম, শত-সহস্র চন্দ্র-সূর্য আমার চারিদিকে ঘুরছে, আর শব্দ করছে, যেন সহস্র সহস্র 'ইলেক্‌ট্রিক্ পাওয়ার হাউসে'র একসঙ্গে শব্দ হচ্ছে। মাঝে মাঝে মনে হতো, প্রাণ যায়-যায়, কিন্তু তবু নাম করা ছাড়িনি। তবুও যখন কষ্ট হতো, কাতরে 'মা' 'মা' ব'লে ডাকতাম, আর কালী-মূর্তি এসে হাজির হতো, কত স্নেহের হাত গায় বুলিয়ে দিত। স্নিগ্ধতায় সমস্ত দেহ অবশ হ'য়ে আসত। এমন কত দেখেছি! নাম করতে করতে সমস্ত শরীরটা মনে হতো যেন আগুন। গায়ে জল ঢেলে দিলে বাষ্প হ'য়ে যেত। এই অবস্থায় আমার সাধারণ জ্ঞান কিন্তু স্বাভাবিকই থাকতো।"

"আমি প্রথম ষ্টীমারের 'সার্চ লাইটে'র মত আলো দেখতাম। তবে তার কিরণগুলো নীল, ঠিক অমনি উজ্জ্বল। চোখ যেন ঝলসে যেত। একদিন বিষ্ণুমূর্তিও দেখেছিলাম। তখন আমি শিশু। আমি ঘরের ভিতর ঘুমিয়ে

করা যায়, তিনি ছাড়া কেউ নেই, কিছু নেই। সবের মধ্যে এককে বোধ, আবার সেই পরম একের মধ্যে সবকে বোধ। এই দেখাই তো দেখা, এই জানাই তো জানা। আর, এই জানাটা কিন্তু একটা ধ'রে নেওয়া বা আরোপ করা ব্যাপার নয়। সেই একই শক্তি কোথায় কিভাবে কেমন ক'রে কিরূপে পরিণতি লাভ করেছে তা যুক্তি-সহ বোধ করা যায়। Analytically ও sinthetically দেখা যায়—সেই একই আছেন সর্বত্র। সব দিক দিয়ে এমনি সব রকমে সেই এককে বিচিত্ররূপে না পেলে সুখ কোথায়, মজা কোথায়? এ-আনন্দ নিত্য-নূতন যোগসূত্র ও সম্পর্ক আবিষ্কারের আনন্দ। তাই বলে নিত্যলীলা। মানুষ তখন নির্ভর-হয়, নিদ্বন্দ্ব হয়, সদানন্দ হয়। স্ফূর্তিতে গান ধরে,—তোমার খাই, তোমার পরি, তোমার ঘরে বসত করি। Theory করলে হবে না, concrete-এ এসে পৌঁছান চাই। তাই বলেছেন বাসুদেব অর্থাৎ বসুদেবের ছেলে কেষ্ট-ঠাকুর।

শ্রীকৃষ্ণের যতেক লীলা সর্বোত্তম নরলীলা
নরবপু তাঁহার স্বরূপ
গোপবেশ বেণুকর নবকিশোর নটবর
নরলীলার হয় অনুরূপ।

শুধু নরবপু ব'লে ছেড়ে দেননি, গোপবেশ বেণুকর, নবকিশোর নটবর ব'লে চিহ্নিত ক'রে দিয়েছেন। তাঁকেই চাই। অর্থাৎ নিজ সদ্গুরুর প্রতি নিষ্ঠা চাই। ঐ সক্রিয় নিষ্ঠা ও অনুরাগই মূল জিনিস। নচেৎ শুধু নাম করলে কি হবে? তাই আছে 'কোটি জন্ম করে যদি নাম-সংকীর্তন, তথাপি না পায় ব্রজেন্দ্র-নন্দন'। অবশ্য আগ্রহ সহকারে নাম করতে করতে অনুরাগ হয়। তাই চাই আগ্রহ-সম্বলিত অভ্যাস-যোগ। Mood-টা ঐমুখী ক'রে ফেলতে হয়। অভ্যাসেই হয়। ওয়ার রাস্তা একদম খোলা। 'দীক্ষা করহ, বিনা প্রেমসে নাহি মিলে নন্দলালা'। আমি বলি, নন্দলাল কেন কাউকেই কিছুকেই 'বিনা-প্রেমসে' মেলে না। প্রেম যদি চাওয়াই হয় তবে নন্দলাল ছাড়া যায় তার পায়ে চলতে যাব কোন, দুঃখে? আমরা কি বেকুব নাকি?"

আলোচনা প্রসঙ্গে, ১০ম খণ্ড

আছি, হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল, আর ভগবানকে দেখব এই ব্যাকুলতা এত বেশী হ'ল যে, চোখ ফেটে জল পড়তে লাগলো। আর ভগবানকে ডাকতে হ'লে জানি নাম করতে হবে। তাই প্রাণে প্রাণে নাম করছিলাম। এমন সময় দেখলাম, আমার ঘরের বেড়ার উপরে একটা মানুষের সমান বড় 'ম্যাজিক-লেণ্টারণ'-এর আলোর ন্যায় আলো পড়েছে, আর তার ভিতরে বিষ্ণুমূর্তি। বর্ণ তার সতেজ কচি পাতার মত। চারি হস্তে শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম—কর্ণে কুণ্ডল, চোখ দু'টি শান্ত; এখনো সে চেহারা বেশ মনে পড়ে—মুচ্‌কে মুচ্‌কে হাসছিলো।

"আমি হঠাৎ অমন দেখে অবাক হ'য়ে পড়ছিলাম। প্রায় দুই-তিন মিনিট অমন থেকে আলোটা একটু একটু ক'রে অস্পষ্ট হ'তে লাগলো, আর মূর্তিটিও অদৃশ্য হ'য়ে গেল। তখন মনে হ'লো, আমি কি স্বপ্ন দেখছি? ভাল ক'রে চারিদিক চেয়ে দেখলাম, স্বপ্ন ব'লে তো মনে হ'লো না! তখন মনে মনে তাঁকে বল্লাম,—'তুমি যদি সত্যই এসে থাকো, তবে একখানা হাত দেখাও'। অমনি একখানা হাত আমার দিকে প্রসারিত হ'লো। তখনো মনে হচ্ছে,—একি সত্যই দেখছি, না স্বপ্ন? তখন আবার তাঁকে বল্লাম,—'আমার বিশ্বাস কিছুতেই হয় না, তুমি আবার এসো।' তখন সে আবার আমার দিকে হাত নাড়তে লাগলো, তারপর আলোটা মিলিয়ে গেল। তখন মনে করলাম, বোধ হয় সূর্যের আলো ঘরের ভিতর পড়েছিলো, তাই দেখেছি। এই মনে ক'রে দরজা খুলে বাইরে এসে দেখি, ঘোর অন্ধকার, কোথাও আলোর চিহ্নমাত্র নাই।

"সে মূর্তি আর দেখিনি। তবে কালী-মূর্তি ও কৃষ্ণ-মূর্তি অনেক দেখেছি। আমার যখনই খুব কষ্ট হ'তো, আর 'মা' 'মা' ব'লে ডাকতাম, তখনই কালী-মূর্তি আসতো, আমার সঙ্গে কত গল্প করতো, মাথায় হাত বুলিয়ে দিতো, তখন যেন শান্তি পেতাম। মা-কালীকে দেখামাত্র মনে হ'তো যেন আমার মা, আমার মার সঙ্গে কোন পার্থক্য মনে হ'তো না। তাই বোধহয় মার উপর আমার এত টান বেড়ে গিয়েছিল। ছোটবেলায় একদিন আমাদের চাকরের সঙ্গে নারিকেলের বোঝা মাথায় ক'রে আনছি, তখন আমাদের অবস্থা ভাল ছিল না, বোঝা বইতে আর পারি না, তখন কাতরে মনে মনে 'মা' 'মা' ক'রে ডাকছি, এমন সময় মনে হ'লো, মা-কালী যেন আমার সে বোঝা মাথায় নিল। আমার আর কোন কষ্ট হ'লো না! আমি যে বোঝা টানছি, এ-ভাবই আমার মনে হ'লো না।"

"একবার দক্ষিণেশ্বরে গিয়েছিলাম—গিয়ে খুব পিপাসা পেয়েছিল। একজন অনেককে জল দিল, আমাকে দিল না—আমার বড় রাগ ও দুঃখ হ'ল। রামকৃষ্ণের ঘরের দিকটা গেলাম—গিয়ে যেন খুব পরিচিত মনে হ'লো, অবশ্য ও কিছু নয়, আগে শোনার দরুণও হ'তে পারে। তারপর আমি পঞ্চবটী-তলায় গিয়ে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম—দেখলাম, মা-কালী আসছেন। কালো তবু অত্যন্ত soothing রূপ, কাছে এসে আমার মাথাটা তুলে নিজের হাঁটুর উপর রাখলেন—

তাঁর স্পর্শে আমি কেমন হ'য়ে গেলাম—তাঁর কথার প্রতিবাদ করতে পারলাম না—যা' বলেন তাই করি—আদর ক'রে বললেন—তুই সবার সামনে খেতে চাইলে আমি কি তা দিতে পারি ?—লক্ষ্মী, এইগুলি খা—দেখি সোনার মত অথচ উজ্জ্বল থালায় লুচি, বরফীর মত সন্দেশ ইত্যাদি—খাইয়ে দিলেন। খেলাম, খেয়ে বড় তৃপ্তি পেলাম। জলটল যখন খাওয়া হয়েছে, তখন কে এসে আমাকে ডাকল, ঘুম ভেঙ্গে গেল, দেখি ক্ষিধে-তেষ্টা নেই। রাত দশটা পর্যন্ত কত হাঁটলাম, তবু ক্ষিধে পেল না—শুনেছিলাম, এ-সব কথা কাউকে বলতে নেই, তাই কাউকে তখন বলিনি।"

"আর একদিন অতি কষ্টে একটা বড় যাঁতা আনছিলাম। আমার মত বয়সে এত ভারী জিনিষ ব'য়ে আনা যেমনই কষ্টকর তেমনই বিপজ্জনক। সমস্ত শরীর হিম হ'য়ে আসছে, হাত, পিঠ ও বুকের শিরাগুলো যেন ছিঁড়ে যাবার উপক্রম হচ্ছে, এমন সময় দেখলাম, কালী-মা হাত বাড়িয়ে যাঁতাটা ধ'রে আমার সঙ্গে সঙ্গে আসতে লাগলেন, যাঁতা বইতে আমার আর কোন কষ্ট হচ্ছে না। একদিন ক্ষুধার্ত হ'য়ে ভাঁটি-বনে ব'সে কাঁদছিলাম। মা-কালী এসে আমাকে পায়সান্ন খাইয়েছিলেন। একদিন কুড়োল দিয়ে কাঠ কাটছিলাম। শ্রীকৃষ্ণ এসে আমার হাত থেকে কুড়োল নিয়ে নিজেই তা কেটে দিয়ে চ'লে গেলেন। এগুলো সাধারণ চোখেই দেখেছি, বাইরের জিনিষগুলো যেমন দেখছি, এগুলো ঠিক সেই সঙ্গেই দেখেছি।"

"আমি যখন ব'সে ব'সে নাম করতাম, কেষ্ট-ঠাকুর এসে বাবলা-তলায় দাঁড়িয়ে বাঁশি বাজাতেন। একেবারে কান enchantingly ঝালাপালা ক'রে দিতেন। তাঁর অপূর্ব নূপুরনিক্কণ আর বাঁশির স্বর-লহরী মন মুগ্ধ করতো। শ্রীকৃষ্ণ এলে আমার নাম করার বিঘ্ন হ'তো বলে তাঁর আসাটা আমার ভালো লাগতো না। তবুও তিনি আসতেন, আমার গাত্র স্পর্শ ক'রে বলতেন,—'কেন ভাই, রাগ কর কেন? দেখ, তোমায় কত ভালবাসি।' আমি বলতাম,—'না ভাই, তুমি এখন যাও।' তিনি যেতে চেতেন না। আমি বলতাম,—'যা ভাই, বিরক্ত করিসনে।' শ্রীকৃষ্ণকে দেখতাম আমার বয়সী, তবে রং কাল নয়। দূর্বা যদি কিছু দিয়ে ঢেকে রাখা যায়, কিছুদিন পরে তার যেমন রং হয়, অনেকটা সেই রকম। আমি-আপনি যেমন ব'সে কথা বলছি, এমনি-ভাবেই তাঁর দর্শন লাভ হ'তো।"

"একদিন জনৈক প্রতিবেশী ভুলবশতঃ নিজেই পুজোর ফুল-বেলপাতার সঙ্গে তাঁর শালগ্রাম-শিলাটি ফেলে দিয়েছিলেন। দোষ পড়লো আমার উপর। মার কাছে নালিশ হ'লো। শুনবামাত্র মা আমাকে অত্যন্ত প্রহার করলেন। গায়ে অত্যন্ত ব্যথা হ'লো, মনের ব্যথা হ'লো ততোধিক। পরমপিতাকে স্মরণ ক'রে

বল্লাম,—'তুমি ভিন্ন আমার কেউ নেই।' বিছানায় শুয়ে সে অভিমান আরও তীব্র হ'লো। ঘর অন্ধকার, হরিদাস—আমার মাসতুত ভাই—পাশে আছে ঘুমিয়ে। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছি, আর পরমপিতাকে ডেকে বলছি—'মা আমাকে বিনা দোষে মারলে, তুমি ছাড়া আমার আর কেউ নেই।' এই কথা বার বার বলছি, আর হাপুস্ নয়নে কাঁদছি। কিছুক্ষণ পরে দেখি, বেড়ার উপর 'সার্চ-লাইটের' মত এক অত্যুজ্জ্বল আলো এসে পড়েছে। অবাক বিস্ময়ে তাই দেখছি। মনে করেছি যে, এটা স্টীমারের 'সার্চ-লাইট'। কিন্তু বাইরে চেয়ে দেখি, সব অন্ধকার। একি হ'লো? এত আলো এলো কোত্থেকে? একদৃষ্টে সেইদিকে দেখছি, এমন সময় সেই আলোর মধ্যে এক দিব্যমূর্তির আবির্ভাব হ'লো। কি হাসি-ভরা প্রসন্ন আনন, কি সুন্দর নয়ন, মূর্তির কি অপূর্ব শ্রী! বিস্ময়ে হতবাক। হরিদাসকে দেখবার জন্য ঠেলতে লাগলাম। সে বার দুই আঁ উঁ ক'রে পাশ ফিরে ঘুমুলো, আর উঠলো না। শেষে মূর্তিখানা সরে গেল। তখন মনে হ'লো, বোধহয় স্বপ্ন দেখলাম। উঠে বসেই ছিলুম। নিজ গায়ে চিমটি কেটে দেখলাম, নাঃ স্বপ্ন তো নয়! তখন বল্লাম,—'যদি এসে থাকো পরমপিতা, তবে আর একবার দেখা দাও।' আবার দেখা দিলেন, তবে সম্পূর্ণ নয় অর্দ্ধেক, আবার মিলিয়ে গেলেন। আবার দেখতে ইচ্ছা হ'লো। বল্লাম,—'বার বার তিন বার। এবার যদি দেখা দাও, তা'হলে বুঝবো, তুমি সত্যই এসেছিলে।' আবার এলেন, তবে এবার কেবল পায়ের দু'খানি হাত। তারপর হাত নেড়ে বারণ করলেন, আর না ডাকতে। আনন্দে আত্মহারা হ'য়ে গেলাম। সব ব্যথা মুছে গেল। রাত্রে বেশ আনন্দের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়লাম।"

"নাম করতাম এমনভাবে—যায় প্রাণ যাবে। সারা শরীর charged হ'য়ে থাকতো। একদিন পায়খানা করবার সময় ছোট একটা আকন্দ গাছে হাত লাগলে গাছটা শিউরে উঠলো—কয়েকবার গোড়ায় হাত দিয়ে দেখলাম একই রকম হয়। প্রাণঘাতী নাম করতাম। অনেক সময় অজ্ঞান হ'য়ে পড়তাম। শ্বাস-প্রশ্বাসে নাম করার কথা বলে, আমি ভাবতাম শ্বাস-প্রশ্বাসের উপরে যাব। একবারের শ্বাস-প্রশ্বাসের মধ্যে কতবার নাম হ'তো, ছিঁড়ে যাওয়ার মত হ'তো। তখন সমগ্র সত্তাটা, সমস্ত কোষগুলি সজাগ হ'য়ে থাকতো। কাজকর্ম হ'তো কত ক্ষিপ্র, ভুল বলে' জিনিষ ঢুকতে পারতো না। প্রত্যেকটি ইন্দ্রিয় তর্‌তর্ হয়েও control-এ থাকতো।"

"নাম করতে করতে হাত-পা সব শরীরের ভিতরে ঢুকে যেতে চাইতো। কষ্টে প্রাণ যায়-যায় হ'তো, তবুও ছাড়তাম না। আপনা-আপনি নাম হ'তে থাকতো। তখন এত কষ্টের সঙ্গে এমন আনন্দ হ'তো যে, বুঝি আনন্দের চোটেই মারা যাব। ঘরে দরজা-জানালা বন্ধ ক'রে সে অসীম আনন্দের হাত এড়াতে পারি না।"

"নাম করতে করতে এক এক দিন এমন আনন্দ হ'তো, যেন আর ধ'রে রাখা যায় না। বুকটা বুঝি ফেটে যাবে, এমন মনে হ'তো, আর আনন্দের যন্ত্রণা কমাবার জন্য মনটাকে অন্যমনস্ক করবার চেষ্টা করতাম। ঘরের মধ্যে দরজা বন্ধ ক'রে ব'সে থাকতাম, যদি তাতে আনন্দ একটু কমে। কিন্তু আনন্দ এতই উদ্বেল হ'য়ে উঠতে থাকতো যে, মনে হ'তো এক লাফ দিয়ে কড়িকাঠে মাথাটা ভেঙ্গে ফেলি। সেখানে নিষ্ফল প্রয়াস হওয়াতে একবার একখন্ড বাঁশ পদ্মার জলে পুতে তাই ধ'রে ডুব দিয়ে থাকতাম, কিন্তু তাতেও আনন্দের খাঁকতি হ'তো না, যেন ঠেলে ঠেলে তুলতো। এক দিনের কথা। জল থেকে উঠে দেখি, উত্তপ্ত কড়াইয়ে জলের ছিটা দিলে যেমন শোঁ শোঁ ক'রে উঠে যায়, আমার গায়ের জলও সেইরূপ উবে গিয়ে সারা গা শুকনো হ'য়ে গেল। ভয় হ'লো, বুঝি জ্বর হয়েছে। পা টিপে টিপে বাবার ঘরে গিয়ে থার্মোমিটারটা নিয়ে পারদের দিকটায় যেমন দু'টো আঙ্গুলের চাপ দিয়ে ধরেছি, অমনি পক্ ক'রে ১১০° temperature উঠে গেল, ভয় হ'লো বুঝি ফেটে যায়। তাড়াতাড়ি ওটা যথাস্থানে রেখে দিয়ে বাবলা গাছটায় হেলান দিয়ে যেই দাঁড়িয়েছি, অমনি দেখি বাবলা গাছটা কেঁপে উঠলো। একটা কুকুর আমার বড় প্রিয় ছিল। দেখা হ'লেই তার লেজটা অন্ততঃ একবার আমার গায় বুলিয়ে দিয়ে যাবেই। সেদিনও অভ্যাসবশতঃ যেমন এসে সে আমার গায় তার লেজটা ছুইয়েছে, অমনি কেঁউ কেঁউ করতে করতে দশ হাত দূরে ছিটকে প'ড়ে দৌড়ে পালালো। এরূপ অভাবনীয় কত কি ঘটেছে, আনন্দ কিন্তু জোয়ারের মত ফুলে' ফুলে' উঠেছে। মনে করলাম, নাম একটু কমিয়ে দিই, কিন্তু কার সাধ্য কমায় সে বেগ। দূরে একটা লেবুগাছ ছিল, অবশেষে সেখানে ঝাঁপিয়ে পড়লাম। কাঁটাগুলো গায় বিঁধে সর্বাঙ্গ ছিঁড়ে গিয়ে রক্ত পড়তে লাগলো। তখন আনন্দ একটু সহ্য সীমার মধ্যে এলো। আশ্চর্য এই যে, গায়ের ক্ষতগুলো আধ ঘণ্টার মধ্যেই মিলিয়ে গিয়ে নিশ্চিহ্ন হ'য়ে গেল। Vital current-এর flow বেশী হ'লেই বোধহয় এইরূপ হয়।"

"নাম করতে করতে এমন হ'তো যে চিৎকার ক'রে লাফিয়ে উঠি। সমস্ত শরীরটা যেন electrified হ'য়ে যেত। এক এক দিন নাম করতে করতে শরীর একেবারে full-steamed engine-এর মত থাকতো। নামে শরীরের ভিতর একটা শক্তির vibration খেলে, তা আমি নিজে অনুভব করেছি। অনবরত নাম করতে করতে একদিন দুই-একটা গাছকে স্পর্শ করা মাত্র সেগুলো শিউরে—উঠেছে—নামের গুণে যে শুষ্ক-তরু মুঞ্জরে তা আমি নিজে অনুভব করেছি। একদিন গায়ে জ্বালা হচ্ছিল, তখন একটা আকন্দের গাছ চেপে ধরেছিলাম, আর সঙ্গে সঙ্গে আকন্দের গাছটা শিউরে উঠ্লো—খুব perceptible শিহরণ। নাম করবার সময় মনে হ'তো, বাইরের জিনিষগুলো পুঞ্জীভূত আলোক-রাশি। গাছগুলো দেখে মনে হ'তো, আলোর কণা একত্র জমাট হ'য়ে সেগুলোকে তৈরী

করেছে*। জমায়েত আলোকণাগুলিকে নিজেরই অংশ ভেবে আঁকড়ে ধরতে যেতাম, হাতে ঠেকতো কঠিন গাছপালা সবকিছু।

"তখন ছেলেবেলায় একদিন স্কুল থেকে বাড়ী যাচ্ছিলাম, হঠাৎ দেখলাম, electric light-এর মত লাল-নীল আলো দ্বারা সমস্ত জগৎ ব্যাপ্ত, বিশ্বের মাঝে সে উজ্জ্বল আলোক সমুদ্রের ঢেউ খেলে যাচ্ছে, তাতে যেন চোখ ঝলসে যাচ্ছে, তার মধ্যে বৈচিত্র্যময় সৃষ্টি যেন আলোর কোটি কোটি বুদ্বুদ। যে জায়গা থেকে এমন দেখলাম, সে জায়গাটা ছিল কাদা জলে ভরা। আমি সেই কাদার ভিতরেই অজ্ঞান হ'য়ে পড়লাম। আমাদের দুধওয়ালী সেই পথে যাচ্ছিল, সে আমার চোখে-মুখে জল দিয়ে জ্ঞান ফিরিয়ে বাড়ী এনে দিয়ে গিয়েছিল।"

"মাঝে মাঝে মনে হ'তো এটা 'হিষ্টেরিয়ার' মত। কিন্তু সাধারণ পূর্ণ চেতনার সঙ্গে যখন এ জ্ঞানটা আসত, তখন তাকে 'হিষ্টেরিয়া' কি ক'রে বলি? একদিন কাশীপুর যাচ্ছিলাম, দেখলাম তড়িতের বিন্দুর মত জ্বলন্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অণু-পরমাণুর বিন্দু সমস্ত বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে ছড়ানো। সেগুলো এক একটা whirl pool-এর মত; আর দেখলাম, যেন এইগুলো একত্র হ'য়ে সমস্ত দ্রব্যের সৃষ্টি করেছে, আর চারিদিকে দেব-দেবীরা সব গান করছে। গানের দু'টো লাইন আগে আমার বেশ মনে ছিল, অনেকবার বলেছিও—এখন 'স্বাগতম্' এইটুকুই শুধু আমার মনে পড়ে।"

"তখন স্কুলে পড়ি, খুব নীচের ক্লাসে। হঠাৎ বোধ হ'তো, চারিদিকে যা-কিছু দেখি, সব যেন আলোর কণা জ'মে তাই হ'য়ে আছে। টেলিগ্রাফের পোষ্ট, গাছ-পালা, বাড়ী-ঘর, পশু-পক্ষী সব আলোর কণা হয়ে গেছে। সবই স্বচ্ছ। এদিকের জিনিস ওদিকে দেখা যায়। ঐ সময়ে দেখতাম, দেয়ালের ওপারের সব জিনিস দেখা যায়। প্রথমে প্রথমে বিস্মিত হ'তাম। ছুটে গিয়ে ওদের ধরতে যেতাম, তখন তাদের কাঠিন্য বুঝতে পারতাম। মধ্যে মধ্যে মাঠের মধ্যে জ্ঞানশূন্য হ'য়ে পড়ে থাকতাম। কখনো দেখতাম, আকাশ ঘনঘোর মেঘে আচ্ছন্ন হ'য়ে উঠলো, প্রবল বেগে ঝড় বেড়ে উঠলো। চারিদিকে ঝড়ের হুম্ হুম্ হুঙ্কার গর্জে উঠছে, পৃথিবীর যেন শেষ হ'য়ে আসছে। তার মধ্যে হঠাৎ কড়্‌কড়্ কড়াৎ শব্দে আকাশ বিদীর্ণ হ'য়ে বাজ গর্জে উঠলো, আর সঙ্গে সঙ্গে আমিও জ্ঞানহারা হ'য়ে পড়তাম। তখন এরূপ প্রায়ই হ'তো। কাউকে কিছু বলতাম না। সকলে ভাবত, আমার নিশ্চয়ই মূর্চ্ছারোগ হয়েছে কেউ কেউ আবার বলতো, নিশ্চয়ই আমার উপর ভূত-প্রেতের নজর পড়েছে। এজন্য কত ওঝা, কত তাবিজের ব্যবস্থা হ'লো, কিন্তু কিছুতেই কিছু হ'লো না।"

---

*অনুকূলচন্দ্রের সপ্তবিংশতিতম দিবসের নবম সংখ্যক মহাভাববাণীতে আছে—"মন যত উঁচে ওঠে, তত সব জ্যোতির্ময় দেখা যায়। তখন তাই যা যা দেখা যায় তাহা জ্যোতির্ময়। গাছটা দেখলে সেও আলোর গাছ।"

"লাভ-লোকসানের ধারণা নিয়ে আমি কোনদিন কিছু করিনি। নাম করতে ভাল লাগত, আর আপন-মনে নাম করতাম, নাম না করেই যেন পারি না! কি পাব, কি হবে, এসব কিছু ভাবনা ছিল না। কিন্তু আকুল নেশা ছিল। গভীরে, আরও গভীরে চ'লে যেতাম। এই অনুশীলনের ফলে কতই কি দেখা যায়, কতই কি শোনা যায়,—সে এক অপরূপ জগৎ! তবে অনুরাগই এর মূল বস্তু। অনুরাগযুক্ত অনুশীলনে আমাদের মস্তিষ্ক-কোষগুলির মধ্যে যতই দহন-তাপের সৃষ্টি হয়, ততই শব্দ ও আলোর অনুভব করা যায়, এর মধ্য দিয়ে আমাদের সাড়াশীলতা ও গ্রহণ-ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। জগতের যা-কিছুকে তখন তীক্ষ্ম-ভাবে বোধ করা যায়। এই বোধগুলি আবার যতই ইষ্ট-সূত্রে গ্রথিত হয়, ততই সমাহারী প্রজ্ঞার আবির্ভাব হয়।"

"একদিন দেখলাম, আশ্রমের সম্মুখে একটা শকুন পরমানন্দে একটা মরা গরুর মাংস খাচ্ছে। একদৃষ্টে শকুনটার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে এক সময় উপলব্ধি করলাম—আমি যেন সত্যি শকুন হ'য়ে গেছি এবং সেই মরা গরুর মাংসের রস আস্বাদন করছি পরম তৃপ্তি-সহকারে। প্রত্যক্ষভাবে বোধ করতে লাগলাম, সে মাংস খেতে অতি উপাদেয়। কিছুক্ষণ পরে আমার মনে হ'লো, এ অবস্থায় যদি দেহত্যাগ হ'য়ে যায়, তবে তো শকুন-যোনি প্রাপ্ত হ'ব! যেমনই মনে হওয়া, আমি আত্মস্থ হ'য়ে নিজদেহে ফিরে এসে সুস্থ হলাম।—নাম করতে করতে এই রকম হয়। মনে হয়, গরু হ'য়ে গেছি, একটা গাছ হ'য়ে গেছি, একটা গাছ হ'য়ে তার pain and pleasure বোধ করছি।......

"দেখি দুনিয়ায় সবই চেতন, অচেতন কোথাও কিছু নেই, সবারই সঙ্গে তাই আদান-প্রদান চলে, ভাব-বিনিময় চলে। আবার মাঝে মাঝে মনে হয়, সবই যেন মানুষ, গরু-মানুষ, গাছ-মানুষ, ঘাস-মানুষ, চাঁদ-মানুষ, সূর্য-মানুষ এমন কত কী! কখনো আবার দেখি—সবাই যেন আমি—গাছ-আমি, পোকা-আমি, রাম-আমি, শ্যাম-আমি, এক আমি এত হ'য়ে আছি, আমিই আমার সঙ্গে এত কাণ্ড করছি—এ বড় বিচিত্র ব্যাপার! তাই, কেউ যখন কারও ক্ষতি করতে চায়, আমার বড় হাসি পায়। ভাবি,—পরমপিতা! তোমার কি খেলা! মানুষ নিজেরই ক্ষতি করতে চায় নিজে। কারও ক্ষতি করা যে নিজেরই ক্ষতি করা, এইটুকুই বোঝে না।"

"আগে যখন ভাব (ভাববাণী)* বের হ'তো, তখন একেবারে কথাই শুনতে পেতাম। প্রথম হ'লো কাঠের ঘরের দোতালায়। দোতালার বারান্দার এক কোণে ছালা দিয়ে ঘেরা ছিল। প্রথম ভীষণ আলো হ'লো। ব'সে-থাকা মানুষ লাফিয়ে উঠলাম। বাড়ীর সকলে ভাবলো, বাড়ীতে বুঝি চোর এসেছে। তখন থেকে সুরু। প্রথম যখন সমাধি* হ'তো, তখনও ভজন পাই নাই! আগে

*গ্রন্থের ত্রয়োদশ অধ্যায়ে 'ভাববাণী' ও একাদশ অধ্যায়ে ভাব-সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে।

মাঝে মাঝে স্কুলে যেতে রাস্তায় হ'তো। সকলে ভাবতো, স্কুলে যাওয়ার ভয়ে বুঝি এরকম করছি। তখন ভীষণ নাম করতাম। মনে একটা ভাব হ'তো যে, নৌকা যেন ভাটিয়ে চলেছে, আমি প্রাণপণে দাঁড় টেনে উজান বেয়ে যেতাম। নাম করতে আমি কাঠ মেরে যেতাম, vitality quenched হ'য়ে যেতো, shattered হ'য়ে যাবার মত অবস্থা হ'তো। স্ফূর্তির ঠেলায় মনে হ'তো, গেলাম বুঝি! মনে হ'তো, বোধহয় nerves-গুলো ফেটে যাবে। বাইরের স্ফূর্তির সঙ্গে সে-স্ফূর্তির কোন তুলনা হয় না।"

"একদিন রাত্রে স্বপ্নে হুজুর মহারাজের কাছ থেকে ভজন পেলাম। সেদিন থেকে শব্দ শুনতাম। হঠাৎ মন শব্দের দিকে চ'লে যেত, আর জগৎ থেকে মনটা স'রে যেত। প্রথম যেদিন জ্যোতিঃ দেখলাম, চিৎকার ক'রে লাফিয়ে উঠলাম। রাজেন্দ্র চৌধুরী শুনে 'চোর' 'চোর' ব'লে চেঁচিয়ে উঠেছিলো। একদিন ব'সে নাম করছি, স্ত্রীলোকের কান্না শুনতে পেলাম। সেদিকে যেতেই আরও দূরে স'রে গেল—এমনই যতই সে কান্না follow ক'রে সেদিকে যাচ্ছি, ততই স'রে যেতে লাগলো। শেষে বুঝলাম, এ কান্না মানুষের কান্না নয়। নাম করতে করতে সে এক সময় গেছে, চারিদিকের সব তোলপাড় হ'য়ে উঠতো, আলো দেখতাম, শরীরটা ফাটো ফাটো হ'তো। নাম করতে করতে নাকের সোজা চ'লে যেতাম। একদিন কাঁটা গাছের ভিতর ঢুকে গেলাম। কাঁটা গায়ে লেগে চেতন হ'লাম।"

"আমার এমনও হয়েছে—হাঁটতে হাঁটতে যাচ্ছি, নাম চলছে, কোথাও দাঁড়িয়ে গেছি—আবার কাজকর্মের মধ্যেই কোন কোন দিন মনে হয়েছে, যেন সব মুছে গেছে—কোন কোন দিন হয়তো নাম ক'রে চলতে চলতে পটল-ক্ষেতে বা বেত-বনে ঢুকে গেছি। কোন খেয়াল থাকত না, চলছি তো চলছি। পথ-ঘাট না দেখে সিধে হাঁটতাম, কেউ ব'লে দিলে চেতনা আসতো। ছয় মাস তো দিন-রাত ঘুমাইনি। তারপর প্রথম যখন ঘুমাতে যাই, তখন তো চোখ বুঁজলে এক জগৎ আর চোখ মেলে এই জগৎ। আর তখন কেমন ক্ষিপ্রভাবে চলতাম—কাজকর্ম করতাম! বাইশ মিনিটে খোকসা থেকে তিন মাইল পথ চ'লে গেলাম। এত জোরে হাঁটতাম, মনে হতো হঠাৎ বুঝি ধম্ ক'রে প'ড়ে যাব। ধান-ক্ষেতের মধ্য দিয়ে যখন হাঁটতাম, মনে হ'তো, ধানগাছগুলো যেন আমার সামনে দিয়ে দৌড়াচ্ছে।"

"হাউস হ'লো, হয়ত রাত দুপুরে নাম করতে লাগলাম—আর খুব ক্ষিপ্রতার সঙ্গে কাজ করবার একটা ঝোঁক ছিল। Activity খুব বেড়ে গিয়েছিল। কাজ খুব ভাল লাগতো।...... আগে তখন কি দিনই গিয়েছে। কি হবে তা জানি না, কিন্তু একটা দুরাগ্রহ আগ্রহ নিয়ে নাম, ধ্যান, ভজন ক'রেই চলেছি। সাধন, ভজন, অনুভূতির যে সব অবস্থা গিয়েছে, এখনও তা স্মরণ করতে বুকের মধ্যে কেমন করে।"

"ডাক্তারী করতাম, রোগী দেখতে যাচ্ছি, পথে চলেছি, নাম-ধ্যান সহ দর্শন-শ্রবণের অনুভূতি হ'তে হ'তে যাচ্ছি। কোথায় রাস্তা কোথায় জল কিছুই বোধ নাই। কিন্তু পরমপিতার এমন দয়া, যেন হাত ধ'রে রোগীর বাড়ী নিয়ে যান! কোথাও বাধা পাইনি বা প'ড়ে গিয়ে ব্যথা পাইনি। রোগীর বুকে stethescope লাগিয়ে শুনেছি, heart ও lungs-এর sound পাই না। পাই, যেন নাম হচ্ছে, শুনেছি তো—কতক্ষণ তাই শুনেছি। হাত দেখছি, নামের beat দিচ্ছে এইরূপ। মুমূর্ষু রোগীর বাড়ী গিয়ে যেই তার হাতখানা ধরেছি, অমনি সে ধড়ফড় ক'রে উঠে বসেছে। বোধ হয় নামের স্পন্দনে vital current imparted হ'য়ে অমনতর হয়। মন সর্বদাই একমুখী হ'য়ে থাকতো—যেন টেনে নামিয়ে বাইরের কাজ করা হ'তো, আবার যথাস্থানে আপনি চ'লে যেত। রোগী দেখে এসে বসেছি, ঔষধ দেবার কথা ভুলে গিয়েছি। একজন বল্লে,—'বাবু, ওষুধ', অমনি মনে হ'লো, —তাইতো, ঔষধ দিতে হবে। আর যেই মনে হওয়া, অমনই ভেসে উঠলো, একটা ঔষধ বা prescription. তা ভেবে চিন্তে ঠিক করতে হ'তো না, যেন আপনি ভেসে উঠতো। বোধ হয়, মানুষের মস্তিষ্কে অভ্যাসের ঝোঁকই অমনতর ক'রে থাকে। বোধ হয়, রোগের লক্ষণগুলিই আমার অভ্যস্ত practise-এর ঝোঁককে অমনতর glimpse-এর ভিতর দিয়ে অমন ক'রে তুলত। এইভাবে যেই ঔষধ দেওয়া তক্ষুণি রোগ সারা, এইরূপ হ'তো। আবার কখনও কখনও ভুলে ঔষধ বেশী দেওয়া হ'য়ে যেত। হয়ত যার একটা ঔষধ পাঁচ গ্রেণ বা এক ডোজ দেওয়া দরকার, তাকে হয়ত দশ গ্রেণ বা দুই ডোজ দিয়ে ফেলা হোত। কিন্তু পরমপিতা যাতে ঐ ঔষধ অতিরিক্ত ব্যবহার না হয় তা guard করতেন। এমন ঘটত যে, সেই অতিরিক্তটা খাওয়া হ'তো না, হয় ছেলেরা ফেলে দিলে, না-হয় প'ড়ে গেল বা আর কিছু হ'লো। যেটুকু দরকার সেইটুকুই রোগীর খাওয়া হ'তো। পরমপিতার এইরূপ দয়ায় মোহিত হ'য়ে যেতাম।"

"ছোটবেলায় ঘাসের বুকে শিশির-বিন্দুকে দেখতাম যেন গোটা সূর্যকে প্রতিফলিত করছে সে। দেখতাম আর মনে হ'তো, শিশির-বিন্দু যদি জগৎ-প্রসবিতা সূর্যকে বুকে বহন ক'রে বেড়াতে পারে, তবে আমি যত ক্ষুদ্রই হই, আমিই বা পারব না কেন পরম কারুণিক পরমপিতাকে বুকে বহন ক'রে বেড়াতে, শিশির-বিন্দুর মতই তাঁকে ঠিকরে দিতে আমার সারাটা জীবন দিয়ে? এই সব কথা ভাবতাম আর বুকখানা যেন আনন্দে দশ হাত হ'য়ে উঠতো। এখন দেখছি, ছেলেবেলার ভাবনাটা মিথ্যা কখনও নয়। রবীন্দ্রনাথও তো এই কথাই বলেছেন তাঁর মত ক'রে কবির ভাষায়ঃ—

'সীমার মাঝে অসীম তুমি বাজাও আপন সুর
আমার মধ্যে তোমার প্রকাশ তাই এত মধুর।'

.... আলোচনা-প্রসঙ্গে, ৪র্থ ভাগ।

একাদশ অধ্যায়

সংকীর্তন ও মহাভাবসমাধি

বাল্য হইতেই অনুকুলচন্দ্র লোকসঙ্গের কাঙাল। যৌবনে সংসারে প্রবেশ করিয়াও মানুষের জন্যই তিনি পাগল হইয়া উঠিলেন। কর্মজীবনের আরম্ভে তিনি চিকিৎসাবৃত্তি অবলম্বনপূর্বক গ্রামের ধনী দরিদ্র, উচ্চ নীচ, পণ্ডিত মূর্খ সকলের সেবায় আত্মনিয়োগ করিলেন। এইভাবে নিত্য জনসাধারণের নিবিড় সান্নিধ্যে থাকিয়া তিনি প্রত্যেকের স্বভাব-চরিত্রের প্রকৃত স্বরূপ এবং জীবন-ধারার রহস্য সুস্পষ্টরূপে উপলব্ধি করিবার সুযোগ পাইলেন। তিনি দেখিলেন,— প্রায় সর্বত্রই মানুষের নৈতিক মানের অতীব শোচনীয় অধঃপতন ঘটিয়াছে ; শ্রদ্ধা প্রীতি, নিয়ম নিষ্ঠা, সেবা সহযোগিতা প্রভৃতি সদ্‌গুণ মানুষের জীবন হইতে একরূপ বিলুপ্ত হইয়াছে ; অধর্মের তাণ্ডব-লীলা সমাজে অবাধে চলিতেছে ; উচ্চ আদর্শের অনুসরণে উন্নত জীবনযাত্রার আগ্রহ-আকাঙ্ক্ষা দুর্লভ হইয়া পড়িয়াছে ; কুসংস্কারাচ্ছন্ন ও প্রবৃত্তি-তাড়িত হইয়া অধিকাংশ লোকই দুর্গত অধম জীবন যাপন করিতেছে। মানুষের ঈদৃশ নিদারুণ ব্যাপক দুর্দশা দর্শনে দরদী অনুকুলচন্দ্র নিরতিশয় মর্মাহত হইলেন। বিকৃত স্বভাব-চরিত্র ও অভ্যাস-ব্যবহারের সংশোধন করিয়া কিভাবে মানুষ সত্যনিষ্ঠ, জিতেন্দ্রিয় ও কর্মকুশল হইয়া উঠিবে, এই চিন্তায় তিনি অস্থির হইয়া পড়িলেন। তিনি বুঝিলেন, অসৎ-প্রবণ মনোবৃত্তির পরিবর্তন সাধন করিতে হইলে, যে-কোন উপায়ে মানুষকে পবিত্র ভগবৎপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিতে হইবে। লোকসেবার এই উদার আকুতি লইয়া তিনি সর্বসাধারণের মধ্যে শ্রীমন্মহাপ্রভুর পুণ্য হরিনাম-সংকীর্তনের ধারা পুনঃ প্রবাহিত করিয়া সকলকে তাহাতেই অনুরক্ত করিয়া তুলিতে কৃতসংকল্প হইলেন।

অনুকুলচন্দ্র গ্রামবাসী সকলের সঙ্গেই প্রাণ খুলিয়া মিশিতেন, নিতান্ত আপন জনের মত সকলের বাড়ী যাতায়াত করিতেন, সবলেরই সুখ-দুঃখ ভাল-মন্দের খোঁজ-খবর লইতেন, অফুরন্ত সেবায় ও অনুপম মাধুর্যে সকলকে সঞ্জীবিত করিয়া তুলিতেন। এজন্য সবাই তাঁহাকে অন্তরের সহিত ভালবাসিতেন এবং তাঁহার সঙ্গ-সুখের জন্য উন্মুখ হইয়া থাকিতেন। লোক-প্রেমিক অনুকুলচন্দ্রও লোকজনের সাক্ষাৎ পাইলেই আনন্দে অধীর হইয়া পড়িতেন এবং গল্পগুজবের আসর জমাইয়া সকলকে খুশিতে মাতাইয়া তুলিতেন। সুযোগ পাইলেই তিনি তাঁহাদের নিকট নানা সদালোচনার অবতারণা করিতেন। কথাপ্রসঙ্গে তিনি তাঁহাদিগকে 'শ্রীশ্রীরাম-কৃষ্ণ কথামৃত', ঠাকুর হরনাথের 'কৃষ্ণলীলা', কুমারনাথের 'গীতা' এবং গুরু নানক, কবীর সাহেব, শ্রীচৈতন্য, হুজুর মহারাজ প্রভৃতি মহাপুরুষগণের বাণী ও জীবন কথা প্রভৃতি পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়া শুনাইতেন। তাঁহার উক্তরূপ আলোচনার

দৃষ্টান্ত-স্বরূপ আমরা এই সুযোগে অনুকূলচন্দ্রের তৎকালীন অন্যতম নিত্যসঙ্গী দুর্গানাথ সান্যাল মহাশয়ের প্রদত্ত একটি বিবরণী এখানে উদ্ধৃত করিতেছি।—

"ঠাকুর সেদিনের বৈঠকে প্রথমতঃ কবীর সাহেবের জীবনী আলোচনা করিয়া বলিলেন,—'কবীর ছিলেন জোলার ছেলে। তিনি সাধনায় এত উন্নত হইয়াছিলেন এবং মানুষকে এত ভালবাসিতেন যে, গ্রামের লোকেরা ব্রাহ্মণদের সম্মান না দিয়া দলে দলে আসিয়া কবীরের পায় পড়িয়া থাকিত। ইহাতে দেশের ব্রাহ্মণরা খুব চটিয়া গেলেন। একবার তাঁহারা এক বেশ্যা-মায়ের সঙ্গে গোপনে পরামর্শ করিয়া তাহাকে এই বলিয়া রাজী করাইলেন যে, কবীর যখন হাটে কাপড় বিক্রয় করিতে আসিবেন, তখন ঐ বেশ্যা-মা কবীর সাহেবকে বলিবে,—'তুমি আমাকে বিবাহ করিয়া পলাইয়া আসিয়াছ, আমার ভরণ-পোষণের কোন ব্যবস্থা না করিয়া ভুলিয়া রহিয়াছ। তুমি যদি আমার খাওয়া-পরার ভার না লও, তবে আমি তোমাকে কিছুতেই ছাড়িব না।' একদিন ঐ বেশ্যা মা-টি হাটে আসিয়া কবীর সাহেবকে উক্তরূপ কথাবার্তা বলিলে, তিনি তাহার দিকে সবিস্ময়ে কিছুক্ষণ তাকাইয়া থাকিয়া শান্ত মনে প্রসন্ন বদনে বলিলেন,—'মা, আপনার এরূপ কোন কথাই তো আমার স্মরণে পড়ে না। তবে আপনি যখন বলিতেছেন, আমি অবশ্যই আপনার কথামতই কার্য করিব, আপনার খাওয়া-পরার ব্যবস্থা করিয়া দিব।' এই সময় ব্রাহ্মণগণ সেখানে উপস্থিত হইয়া কবীর সাহেবকে যথেষ্ট টিট্‌কারী দিলেন এবং তাঁহাকে লইয়া নানারূপ হাস্য-পরিহাস করিলেন। এদিকে কবীর সাহেব আপন মনে তাঁহার নিজের কাজকর্ম সব সারিয়া লইয়া বাড়ী যাইবার প্রাক্কালে বেশ্যা-রমণীটিকে ডাকিয়া বলিলেন,—'মা, আসুন, আমার সঙ্গে বাড়ী চলুন, আমি আমার যথাসাধ্য আপনার ভরণ-পোষণের বন্দোবস্ত করিয়া দিতেছি।' কবীর সাহেবের এইরূপ অপূর্ব মহৎ আচরণে বেশ্যা মা-টি অত্যন্ত বিস্মিত ও মুগ্ধ হইল, সঙ্গে সঙ্গে তাহার আপন মনোভাবেরও অদ্ভুত পরিবর্তন ঘটিল। সে তখন কবীর সাহেবের পায়ের উপর কাঁদিয়া পড়িল এবং নিজ পাপকর্মের জন্য অনুতপ্ত অন্তরে তাঁহার চরণে ক্ষমা ভিক্ষা চাহিয়া বলিল,—'ঠাকুর, আমার মত মহাপাপী আর কেহ নাই, আপনি দয়া করিয়া আমাকে রক্ষা করুন।' কবীর সাহেব তখন সদয় হইয়া তাহাকে সৎ-নামে দীক্ষিত করতঃ আশ্রয় দান করিলেন। এইভাবে সেই পতিতা নারী কবীরের কৃপায় উদ্ধার পাইল। সদ্‌গুরু, সৎ-নাম ও সৎসঙ্গের এমনই মহিমা।

"তারপর ঠাকুর নানক সাহেব এবং গুরুগোবিন্দ সিংহের জীবনী ও কর্মপন্থা সম্বন্ধে আলোচনা করিলেন; সোনামুখীর হরনাথ ঠাকুরের উপদেশ-বাণী পড়িয়া সকলকে শুনাইলেন। অতঃপর সত্যযুগের—নারায়ণঃ পরা বেদা নারায়ণঃ পরাক্ষরঃ। নারায়ণঃ পরা মুক্তির্নারায়ণঃ পরা গতিঃ ॥—মূলদেবতা নারায়ণ; ত্রেতাযুগের—রাম নারায়ণানন্ত মুকুন্দ মধুসূদন। কৃষ্ণ কেশব

কংসারে হরে বৈকুণ্ঠবামন ।।—মূলদেবতা শ্রীরামচন্দ্র ; দ্বাপরযুগের—হরে মুরারে মধুকৈটভারে গোপাল গোবিন্দ মুকুন্দ শৌরে। যজ্ঞেশ নারায়ণ কৃষ্ণ বিষ্ণো নিরাশ্রয়ং মাং জগদীশ রক্ষ ।।—মূলদেবতা শ্রীকৃষ্ণ ; কলিযুগের তারকব্রহ্ম নাম—হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ।।—ইত্যাদির তত্ত্বগত গূঢ় অর্থাদি বিশ্লেষণ করিলেন। যুগোপযোগী সদ্‌গুরু ও সৎ-নাম গ্রহণই যে মানবের শ্রেষ্ঠ কর্তব্য এবং নাম ও নামীতে যে কোন ভেদ নাই—ইত্যাদি বিষয়ও তিনি সকলকে সুন্দররূপে বুঝাইয়া দিলেন।

"তারপর ঠাকুর শ্রীবুদ্ধ, শ্রীগৌরাঙ্গ, শ্রীরামকৃষ্ণ স্বামিজী মহারাজ প্রভৃতি যে-সকল মহাপুরুষ এই কলিযুগে আসিয়াছেন, তাঁহাদের গুণ-কীর্তন করিলেন। ইঁহারা জগতে আসিয়া মানুষের যে কত মঙ্গল করিয়াছেন, সে সম্বন্ধে অনেক আলোচনা করিলেন। তিনি বলিলেন,—'মানুষ হইয়াই যুগে যুগে ভগবান পৃথিবীতে আসেন। যখনই এই ধরায় ধর্মহানি হওয়ায় পাপ বৃদ্ধি পায়, আর মানুষ ধ্বংসের দিকে যায়, তখনই আদি-শক্তি ধরিয়া মহামানব জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহারা সাধুদের পরিত্রাণ করেন এবং পাপীদের উদ্ধার করেন।'

"অবশেষে ঠাকুর নিজের শরীরটি দেখাইয়া বলিলেন,—'এটি পরমপিতার আবাস-স্থল। আমাদের প্রত্যেকেরই উচিত, ইহাকে তাঁহারই মন্দির ভাবিয়া সদাচারে পুষ্ট করিয়া জ্ঞানমিশ্রা ভক্তির সাহায্যে গীতার নির্দেশে জীবনপথে অগ্রসর হওয়া।' আরও বলিলেন,—'কুমারনাথের গীতা (মূল্য পাঁচ আনা মাত্র) বাংলায় লেখা বড় সুন্দর বই। ইহা পড়িলে গীতার সারমর্ম সহজেই বুঝিতে পারা যাইবে। গীতা অনুসরণ করিলে পরমপিতাকে জানা যাইবে। তবে, মন স্থির করাই হইল আসল কথা। মনই নানা সময় নানা চিন্তা করিয়া মানুষকে ঘোর-প্যাঁচ খাওয়ায়। মন স্থির করিতে পারিলেই সমাজ, সংসার, শিক্ষা, দীক্ষা প্রভৃতি সব কাজেই উন্নতি লাভ করিতে পারা যায়। মনই জীবকে মনের উচ্চস্তর প্রাণ-রাজ্যে লইয়া যাইবে এবং প্রাণের সাহায্যে আত্মার রাজ্যে পৌঁছাইয়া দিবে, তখন আর বিনাশ নাই। ......ইত্যাদি।"

বন্ধুগণ সশ্রদ্ধ চিত্তে অনুকূলচন্দ্রের এই সকল সুধামাখা সদালোচনা উৎকর্ণ হইয়া শুনিতেন। এইভাবে প্রায়শ সঙ্গীদের কাছে ভাগবত-রসালাপের অমৃত পরিবেশণ করিতে করিতে তিনি অচিরেই তাঁহাদিগকে অপার্থিব প্রেমানন্দে মসগুল করিয়া তুলিলেন, ফলে তাঁহাদের অন্তরে ঈশ্বর-ভক্তির উন্মেষ দেখা দিতে লাগিল। সঙ্গিগণের এই ভক্তিভাব যাহাতে ক্রমশ আরও গভীর ও নিবিড় হয়, সেই উদ্দেশ্যে তিনি তাঁহাদের লইয়া প্রত্যহ নিয়মিত হরিনাম-সংকীর্তনের আয়োজন করিলেন। এজন্য নিজেই খোল-করতাল যোগাড় করিয়া আনিলেন, এবং নিজেই কীর্তনের উপযোগী নিত্য-নূতন সঙ্গীত রচনা করিয়া দিতে লাগিলেন।*

* অনুকূলচন্দ্রের স্বরচিত এবং অন্য কয়েকটি সংকীর্তন গান পরিশিষ্টে সন্নিবিষ্ট করা হইল।

প্রত্যহ অপরাহ্নে সঙ্গীদের বৈঠক বসিলে, অনুকূলচন্দ্র প্রথমত কিছু সময় পূর্বপীঠিকারূপে ধর্মগ্রন্থাদি পাঠ করিয়া সহজ সরল কথায় সরস আলোচনার সাহায্যে নানা নীতি ও তত্ত্বের মর্মার্থ সকলকে সুন্দররূপে বুঝাইয়া দিতেন। অতঃপর তিনি সঙ্গীদের লইয়া বাদ্যাদি সহ কীর্তনে নামিতেন এবং দীর্ঘ সময় ধরিয়া তুমুলবেগে সেই কীর্তন চালাইতেন। যতই দিন যাইতে লাগিল, অনুকূলচন্দ্র প্রায় আহার-নিদ্রা ভুলিয়া সঙ্গীদের লইয়া কীর্তনানন্দে মত্ত হইয়া পড়িলেন। তখন দিবারাত্র প্রায় সর্বক্ষণই কীর্তন চলিত।

নামকীর্তনের মাধ্যমে সর্বসাধারণের মধ্যে পবিত্র ভাগবত ভাব সঞ্চারিত করিবার উদ্দেশ্যে অনুকূলচন্দ্র তখন যে কীর্তনের দলটি গঠন করিয়াছিলেন, পনর-কুড়ি জন ভক্ত তাহার প্রাণস্বরূপ ছিলেন। সেই ভক্ত-গোষ্ঠীর মধ্যে ছিলেন—তাঁহার দুই বাল্যসখা—মাঝিপাড়ার কিশোরীমোহন দাস বৈষ্ণব ও কাশীপুরের অনন্তনাথ রায়, * সালগাড়িয়ার সতীশচন্দ্র গোস্বামী, নাজিরপুরের দুর্গানাথ সান্ন্যাল ও বৃন্দাবনচন্দ্র অধিকারী, প্রতাপপুরের মুকুন্দচন্দ্র ঘোষ, একদন্তের নফরচন্দ্র ঘোষ, দয়ারামপুরের কৃষ্ণচন্দ্র দাস, পালপাড়ার যদুনাথ পাল ও মধুনাথ পাল, বুনোপাড়ার তরণী বুনে ও কোকন বুনে, নারায়ণ মিস্ত্রী, হারাণ মিস্ত্রী এবং আরও অনেকে। কিশোরীমোহন ছিলেন এই কীর্তনদলের প্রধান। ইঁহারই গৃহে অনুকূলচন্দ্র সর্বপ্রথম তাঁহার কীর্তনলীলা আরম্ভ করেন এবং সেখানেই সদলবলে বহুকাল ধরিয়া তাহা চলে**। অবশেষে এক সময় দলপতি কিশোরী-মোহনের উপরেই অনুকূলচন্দ্র কীর্তনপরিচালনার সকল দায়িত্ব ন্যস্ত করেন। কিশোরীমোহন দাসের বাড়ীর সেই কীর্তন সম্বন্ধে পূর্বোক্ত দুর্গানাথ সান্ন্যাল মহাশয় পরবর্তীকালে একদিন কথাপ্রসঙ্গে বলিতেছিলেন,—

"১৩২১ বঙ্গাব্দের কথা। তখন প্রায় সব সময়ই আমি ঠাকুর-বাড়ীতে থাকিতাম। সেখানে ঠাকুর, অনন্ত মহারাজ ও আমি একসঙ্গে আহারাদি করিতাম এবং তিনজনে পদ্মার ধারের দক্ষিণ-দুয়ারী ঘরটিতে শয়ন করিতাম। সারাদিন নানা সদালোচনায় পরমানন্দে আমাদের দিন কাটিত। সন্ধ্যারাত্রে আহারাদির পর আমরা কথাবার্তা বলিতে বলিতে পাড়ার মধ্যে একটু বেড়াইয়া মাঝিপাড়ায় কিশোরীমোহন দাস বৈষ্ণবের বাড়ীতে গিয়া হাজির হইতাম। সন্ধ্যা হইতে

---

* ইঁহাদের সংক্ষিপ্ত জীবন-বৃত্তান্ত পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য। কীর্তনসাথী আরও অনেকের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দ্বাদশ অধ্যায়ে প্রদত্ত হইয়াছে।

** এ-প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, জনগণের মনে কীর্তনের জন্য আগ্রহ-উন্মাদনা সমধিক বৃদ্ধি পাইলে, অনুকূলচন্দ্র পরবর্তীকালে কাশীপুরের অনন্তনাথ রায়ের বাড়ীতে আর একটি কীর্তন-কেন্দ্র স্থাপন করিয়াছিলেন। তখন সেখানে প্রভাত হইতে দ্বিপ্রহর পর্যন্ত এবং কিশোরীমোহনের বাড়ীতে সন্ধ্যা হইতে গভীর রাত্রি পর্যন্ত কীর্তন চলিত। সর্বশেষে অনুকূলচন্দ্রের আপন বসতবাড়ী—আশ্রম বাটীতেই দিবারাত্র সর্বক্ষণ বিপুল জনসমাবেশ হইত এবং তথায় সকলে কখনও কীর্তনে, কখনও সদালোচনায়, কখনও বা নাম-ধ্যানে ব্যাপৃত থাকিতেন।

না হইতেই প্রত্যহ সেখানে সকলে আসিয়া সমবেত হইত এবং ঠাকুরকে কেন্দ্র করিয়া উদ্দাম নৃত্য ও কীর্তনে মাতিয়া উঠিত। দুপুরে রাত্রি পর্যন্ত আমাদের কীর্তন চলিত। একদিন কিশোরীমোহনের বাড়ীতে গিয়া দেখি, ঠাকুরের জন্য একটি সুন্দর নূতন গড়গড়া আনা হইয়াছে! ঐ গড়গড়া দিয়া তাঁহাকে তামাক খাইতে দেওয়া হইল। ঠাকুর তামাকু সেবন করিলে পর আমরাও তাঁহার প্রসাদ পাইলাম। তাহার পর ঠাকুর কিছুক্ষণ ধরিয়া পাগল হরনাথের পুস্তক ও অন্যান্য নানা ধর্মগ্রন্থ পাঠ ও ব্যাখ্যা করিলেন। অবশেষে তিনি আমাদের সকলকে লইয়া কীর্তনে নামিলেন। যতদূর স্মরণে পড়ে, তদঞ্চলের পালদের, ঘোষদের ও বুনোদের বয়স্ক লোক ও ছেলেপিলে মিলিয়া আমরা পনর-কুড়ি জন লোক সেই কীর্তনের দলে ছিলাম। সেদিনের কীর্তনের গানটি ছিল—

ছাড় রে মন ভবেরই আশা
অজপা নামে কর রে নেশা
রাধাগোবিন্দ নামটি বদনে ল'য়ে
সদা আনন্দে ভাস রে।
পতিতপাবন নাম রাধা রাধা রাধা বল রে॥...ইত্যাদি

কীর্তনের আসরের মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া ঠাকুর নৃত্য করিতে লাগিলেন এবং তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করিয়া দলবলসহ কিশোরীমোহনের তাণ্ডব নৃত্য ও কীর্তন চলিতে লাগিল। ঠাকুর তাঁহার একখানা হাত আমার কাঁধের উপর এবং অন্য হাতখানা অনন্তনাথের কাঁধের উপর রাখিয়া নাচিয়া নাচিয়া কীর্তন করিতে লাগিলেন। 'পতিতপাবন নাম রাধা রাধা রাধা বোল'—সঙ্গীতের এই অন্তরাটিই শুধু সন্ধ্যা হইতে দুপুর রাত্রি পর্যন্ত সকলের সমবেত কণ্ঠে গুরুগম্ভীরনাদে লক্ষ লক্ষ বার গীত হইল। সে কি তুমুল কীর্তন! রাত্রি তিন ঘটিকা পর্যন্ত সেদিন ভক্তগণ সহ ঠাকুরের নৃত্য ও কীর্তন চলিয়াছিল। অবশেষে কীর্তন ভঙ্গ হইলে হরিলুটের প্রসাদ লইয়া আমরা বাড়ী ফিরিলাম!"

অনুকূলচন্দ্রের অদম্য উৎসাহে ও আপ্রাণ চেষ্টায় কিছুদিনের মধ্যেই তদীয় নিজ গ্রাম হিমাইতপুরে এবং তৎপার্শ্ববর্তী বাজিতপুরে, নাজিরপুরে, কাশীপুরে, ছাতুনী, প্রতাপপুরে, জেলেপাড়া, মাহিষ্যপাড়া, ঘোষপাড়া, বুনোপাড়া প্রভৃতি বিভিন্ন পল্লী-অঞ্চলে একে একে বহু কীর্তনের দল গড়িয়া উঠিল। অনুকূলচন্দ্র তাঁহার অন্তরঙ্গ সঙ্গিগণ সহ পাড়ায় পাড়ায় ঘুরিয়া এই সকল কীর্তনের দলে যোগদান করিয়া সকলের উৎসাহ বর্ধন করিতেন এবং প্রাণারাম হরিনাম-মাহাত্ম্য-কীর্তনে সকলকে সর্বক্ষণ ভাগবদ্মুখী করিয়া রাখিতেন। তাঁহার পুণ্য সংস্পর্শে ব্রাহ্মণ-কায়স্থ হইতে আরম্ভ করিয়া বুনো-বাগ্দী পর্যন্ত সকল স্তরের সকল লোকের মনে কীর্তনের জন্য আগ্রহ-উন্মাদনা এককালে এরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছিল যে, তাঁহারা তখন প্রায় সর্বক্ষণই কীর্তনামোদে বিভোর থাকিতেন। পরিশেষে এমন ঘটিল

যে, কীর্তনের উৎকর্ষ লইয়া তাঁহাদের পরস্পরের মধ্যে প্রতিযোগিতা পর্যন্ত চলিতে লাগিল। পল্লীতে পল্লীতে তখন সকলে সারারাত্রি মহানন্দে তুমুল কীর্তন চালাইতেন এবং পরদিবস প্রত্যূষে স্ব-স্ব কীর্তনদল লইয়া বিশেষ জাঁকজমকের সহিত নগর-পরিক্রমায় বাহির হইতেন। অনুকূলচন্দ্রের প্রেরণায় এই সকল বিভিন্ন কীর্তনগোষ্ঠী কালক্রমে মিলিত হইয়া তদঞ্চলে এক সুবৃহৎ হরিভক্তের দল প্রস্তুত করিল।

দেখিতে দেখিতে সুরতালসমন্বিত সুমধুর কীর্তনের প্রবাহে চতুর্দিকের পল্লীগুলি ভাসিয়া যাইতে লাগিল। দূরদূরান্তের গ্রামসমূহ হইতেও বহু লোক নিত্য আসিয়া এই সকল কীর্তনের দলে বিপুল উৎসাহে যোগদান করিতে লাগিল। তখন সে-অঞ্চলের সমগ্র পরিবেশ—পদ্মাতীরবর্তী লোকালয়, বনভূমি, পথ মাঠ ঘাট, আকাশ বাতাস শত শত লোকের উত্তাল কীর্তনরোলে সর্বদা মুখরিত থাকিত। অবিরাম এই মহাকীর্তনের নামধ্বনি শ্রবণে আবালবৃদ্ধবনিতা সকলের অন্তর মাতিয়া উঠিত। সকাল-সন্ধ্যায় পল্লীর বালক-বালিকারা নিজ-নিজ গৃহাঙ্গনে কীর্তনের তালে নৃত্য করিয়া খেলা করিত; অন্তঃপুরের গৃহস্থ-বধূরা কীর্তনের রোলে মসগুল থাকিয়া মনের আনন্দে নিজ-নিজ ঘর-সংসারের কাজ করিত; ধনী দরিদ্র, কৃষক মজুর, ছোট বড় সকলে স্ব-স্ব কর্মস্থলে সকল সময় কীর্তনের কথা বলাবলি করিত। তৎকালে গ্রামবাসী বাল-বৃদ্ধ-যুবা পুরুষ-নারী সবাইকে এইভাবে মাতাইয়া তুলিয়া অনুকূলচন্দ্র দিনের পর দিন, মাসের পর মাস কীর্তনরঙ্গে অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। তাঁহার এই অপূর্ব কীর্তন-সমারোহ এক-এক দিন পূর্বাহ্ণে আরম্ভ হইয়া অবিরাম গতিতে সারাদিন সারারাত্রি একটানা চলিয়া পরদিবস অপরাহ্ণকালে মাত্র কিছুক্ষণের জন্য ক্ষান্ত থাকিত, আবার ঐদিনই উহা সন্ধ্যায় আরম্ভ হইয়া রাত্রি-প্রভাতের সঙ্গে সমাপ্ত হইত। তাঁহার ঐশী প্রেরণায় সঙ্গীদের চিত্ত ভাবাবেশে এমনই ভরপুর থাকিত যে, তাঁহাদের প্রায় দিবসই দিবারাত্র চব্বিশ ঘণ্টাই উদ্দাম নৃত্য ও তুমুল কীর্তনে কাটিয়া যাইত। কীর্তনকালে সঙ্গীরা তাঁহার বিশেষ নির্দেশে তদ্গতচিত্তে ইষ্টমূর্তি ধ্যানে নিমগ্ন থাকিতেন। এই ধ্যানের ফলে তাঁহারা স্বভাবতই অসীম আনন্দে আত্মহারা হইয়া পড়িতেন।

কোন স্থানে কীর্তন হইতেছে শুনিতে পাইলেই অনুকূলচন্দ্র এমনই অস্থির হইয়া পড়িতেন যে, শত কাজ ফেলিয়াও সেখানে গিয়া কীর্তনে যোগদান না করিয়া থাকিতে পারিতেন না। তাঁহাকে কীর্তনে পাইলে সঙ্গিগণেরও আনন্দের আর সীমা থাকিত না। ভাবাবেশে মাতোয়ারা হইয়া অনুকূলচন্দ্র যখন কীর্তনে নামিতেন, তাঁহার তৎকালীন সেই অনির্বচনীয় ভাব-বিভঙ্গ দর্শনে সমাগত জনমণ্ডলী মুগ্ধ হইয়া যাইতেন। নবোদ্ভিন্ন যৌবনের অনুপম রূপলাবণ্য লইয়া প্রাণের আকুল আবেগে অপূর্ব ছন্দে অন্তরের স্বতঃ-উৎসারিত উচ্ছল প্রাচুর্যে তিনি কখনও দুই বাহু ঊর্ধ্বে তুলিয়া হেলিয়া দুলিয়া নৃত্য

করিতেন, কখনও নিজেই কাহারও স্কন্ধে আরোহণ করিতেন, কখনও অন্যকে নিজের স্কন্ধে লইয়া নৃত্য করিতেন, আবার ভাবে গদগদ হইয়া কখনও বা কাহাকেও বক্ষে জড়াইয়া ধরিয়া মুহুর্মুহু চুম্বন করিতেন।

নৃত্যকালে অনুকূলচন্দ্রের সেই দিব্য মোহন মূর্তি, পুলক-শিহরিত নধর বপুর অপূর্ব ভঙ্গিমা, নবনীত-কোমল সুঠাম বাহু-যুগলের মৃদুমন্দ উৎক্ষেপণ, রাতুল চরণ-দ্বয়ের ললিত-সুন্দর গতি, আরক্তিম বদনমণ্ডলের আনন্দতরল জ্যোতি, প্রশান্ত ললাটের দর্পণ-স্বচ্ছ দীপ্তি, আয়ত নয়নযুগলের দর-বিগলিত ধারা, রোম-কূপাবলির বিন্দু-বিন্দু স্বেদ-নিঃসৃতি, কেশরাজির ঋজু-উর্ধ্বগতি প্রভৃতি প্রাণ-মনোহর ভাববিলাস স্বচক্ষে দর্শন করিবার এবং তাঁহার মধুর কণ্ঠের সুধানিষ্যন্দী সঙ্গীত স্বকর্ণে শ্রবণ করিবার সৌভাগ্য যাঁহারই হইত, এক অননুভূতপূর্ব শিহরণে তাঁহার সর্বশরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিত, কেহই প্রেমাশ্রু বর্ষণ না করিয়া থাকিতে পারিতেন না। ভাবে আপনভোলা অনুকূলচন্দ্রের সেই আবেগময় অমৃত-স্পর্শে উদ্দীপ্ত হইয়া তাঁহার সঙ্গিগণও প্রীতির আদান-প্রদানে পরস্পরে কোলাকুলি করিয়া আনন্দে ডগমগ হইতেন।

অনুকূলচন্দ্রের প্রাণোন্মাদী কীর্তনের প্রভাবে ঐশচেতনাময় এমন এক অপূর্ব ভাব-স্পন্দনের সৃষ্টি হইত যে, সমগ্র পরিবেশ সেই দিব্য প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ উদ্বেল হইয়া উঠিত। সঙ্গিগণসহ কীর্তনের দল লইয়া যেখানেই অনুকূলচন্দ্র যাইতেন, উন্মত্ত পতঙ্গের মত জনগণ তাহাতে ঝাঁপাইয়া পড়িত। বহু খোল-করতাল-কাঁসর-ঘণ্টার সহিত আট-দশটি দামামা ও জয়-ডঙ্কার বিপুল গম্ভীর ধ্বনি সমবেত জনতার প্রতিটি হৃদয় স্পন্দিত ঝঙ্কৃত করিয়া তুলিত, আর সেই ভাবোন্মত্ত জনগণ আনন্দের উচ্ছ্বাসে পাগলপারা হইয়া উদ্দাম নৃত্যে তুমুল বেগে কীর্তন করিয়া যাইত।* তখন পার্শ্ববর্তী গৃহসমূহ হইতেও অসংখ্য

---

* অনুকূলচন্দ্র-কর্তৃক এই ধরনের কীর্তন-প্রবর্তন প্রসঙ্গে নিম্নলিখিত বিষয়টি প্রণিধানযোগ্য—

জননী মনোমোহিনী দেবী ও পুত্র অনুকূলচন্দ্র উভয়েই যথাক্রমে শ্রীশ্রীহুজুর মহারাজ ও সরকার সাহেবের নিকট সন্তমতে দীক্ষিত ছিলেন। সন্তমতকে 'সুরত-শব্দযোগ-সাধন' বলা হয়। ব্রত, পূজা, কীর্তনাদি বাহ্য আচার-অনুষ্ঠান এই মতে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। এই কারণে, অনুকূল-কর্তৃক জনসমাজে সংকীর্তন-প্রবর্তন জননীদেবীর প্রথমত বিশেষ মনঃপূত ছিল না। কিন্তু অনুকূলচন্দ্রের ছিল প্রগতিশীল মনোবৃত্তি। কোনও মতবাদের নির্বিচার গতানুগতিকতা তিনি পছন্দ করিতেন না। বরং সত্তানুকূল যাহাই যেখানে দেখিতেন, তিনি সাগ্রহে তাহা গ্রহণ করিতেন। কীর্তনাদি সন্তমতের পরিপন্থী হইলেও, তিনি লোক-কল্যাণ-কামনায় মহাপ্রভু-শ্রীচৈতন্য-প্রবর্তিত পন্থায় খোল-করতাল-সহযোগে সংকীর্তনের প্রচলন করিলেন। দুর্বল জনসাধারণের চিত্তে সহজে অবোন্মাদনা সৃষ্টি করিবার মানসে তিনি অতঃপর খোল-করতাল-ধ্বনির সহিত শঙ্খ, ঘণ্টা, কাঁসর প্রভৃতির উচ্চ গম্ভীর নিনাদ সংযোগের ব্যবস্থা করিলেন। আবার শত শত লোকের বিপুল সমাবেশে যাহাতে সকলেই একসঙ্গে অনায়াসে দিব্য ভাবের প্রেরণায় উন্মাদিত হইতে পারে, সে-জন্য তিনি পরিশেষে খোল-করতাল-শঙ্খ-ঘণ্টা-কাঁসরাদির সহিত একসঙ্গে বহু জয়ঢক্কা ও দামামার গুরুগম্ভীর বিরাট ধ্বনি সংযুক্ত করিয়া উদ্দাম নৃত্যে সুদীর্ঘ সময়ব্যাপী তুমুল কীর্তনের প্রচলন করিয়াছিলেন।

শঙ্খ-ঘণ্টা-কাঁসর বাজিয়া উঠিত এবং ললনাগণের মুহুর্মুহু হুলুধ্বনিতে চতুর্দিক মুখরিত হইয়া উঠিত।

এই অপূর্ব ভাবময় আনন্দঘন পরিবেশে অনুকূলচন্দ্র ভক্তকুল-পরিবেষ্টিত হইয়া নিরুপম ভঙ্গিমায় মহাভাবাবেশে অবিরাম নৃত্য করিতে থাকিতেন। এই অবস্থায় কোন-কোন দিন তাঁহার শ্রী-অঙ্গ হইতে উজ্জ্বল আলোকরশ্মি বিচ্ছুরিত হইয়া চতুর্দিক উদ্ভাসিত করিয়া তুলিত; কখনও কখনও তাঁহার লোমকূপ হইতে বিন্দু-বিন্দু শোণিতক্ষরণ হইত—কীর্তনান্তে গামছা দ্বারা অঙ্গ-মার্জনাকালে তাহা রক্তে ভিজিয়া যাইত; আবার কোন-কোন দিন তাঁহার লোমকূপাবলি হইতে পিচকারির ধারার মত তীব্রবেগে রক্তস্রোত নির্গত হইত।* সাধু অসাধু, পণ্ডিত মূর্খ, হিন্দু মুসলমান, বাল-বৃদ্ধ-বনিতার বিপুল জনতা নৃত্যরত অনুকূলচন্দ্রের সে-সকল নানা অলৌকিক বিভূতি দর্শনে বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া পড়িতেন। তখন প্রাণের স্বতঃস্ফূর্ত আবেগে হিন্দুর মুখে উচ্চারিত হইত 'হরিবোল' 'হরিবোল', মুসলমানগণ বলিয়া উঠিতেন—'আল্লা আল্লা'। ঈদৃশ ভাবতন্ময় কীর্তন-মুখরিত অলোকসাধারণ পরিবেশের মধ্যে কত সময় কত অদ্ভুত ব্যাপারই যে সংঘটিত হইত তাহা বলিবার নয়!

কীর্তনানন্দে নৃত্যবিভোর হইয়া অনুকূলচন্দ্র যখন সঙ্গীদের লইয়া পথে বাহির হইতেন, জীবজন্তু ও উদ্ভিদাদি পর্যন্ত নাম-স্পন্দনে থর্ থর্ করিয়া কাঁপিয়া উঠিত। সেই তাণ্ডবকীর্তনের তড়িৎ-সংঘাতে চতুষ্পার্শ্বস্থ বৃক্ষশ্রেণী পত্র-পুষ্প-পল্লবাদি সহ দুলিতে থাকিত। কীট-পতঙ্গাদি ছুটিয়া আসিয়া অনুকূলচন্দ্রের অঙ্গে স্থির হইয়া বসিয়া থাকিত, আর সেগুলি নিজদেহে লইয়াই ভাববিহ্বল অবস্থায় তিনি কীর্তন-দলের সঙ্গে চলিতে থাকিতেন। ঐ

কিয়ৎকালের মধ্যেই লোকচিত্তে এই সংকীর্তনের অপূর্ব প্রভাব লক্ষ্য করিয়া জননীদেবী নিজেও সংকীর্তনের অতীব অনুরাগিণী হইয়া উঠিয়াছিলেন। সৎসঙ্গাবলম্বীরা সংগোপনে ইষ্টনাম জপ-ধ্যান করিয়া সাধনা করেন। কিন্তু অনুকূলচন্দ্র সেই সৎ-নাম প্রকাশ্যে কীর্তন-সহযোগে প্রচার করিলেন, শ্রীচৈতন্যদেবের সংকীর্তনের পন্থায়। আবার বৈষ্ণব-সমাজে প্রচলিত মৃদু-মধুর সুখদ সুর-তালের পদ্ধতি পরিবর্তন করিয়া অনুকূলচন্দ্র জয়ঢাক ও দামামা বাদ্যের উচ্চ ধ্বনিযোগের প্রবর্তন করিলেন এই নাম-সংকীর্তনেই। লোকহিতার্থে দেশকালোচিত উপায় পদ্ধতি অবলম্বনে অনুকূলচন্দ্রের এই উদার স্বাতন্ত্র্য তাঁহার চরিত্রের এক অসাধারণ লক্ষণকেই প্রকাশ করিতেছে।

* এ সম্বন্ধে নিম্নোক্ত প্রসঙ্গটি উল্লেখযোগ্য। যথা—

শ্রীশ্রীঠাকুরের কীর্তনযুগের কাহিনী শুনিবার জন্য সেকালে অনেকেই প্রেমের কিশোরীমোহন দাসের বাড়ীতে যাইতেন। আগন্তুকদের নিকট তিনি বলিতেন,—"কোন কোন দিন কীর্তনে নৃত্য করতে করতে ঠাকুর যখন ভাবাবিষ্ট হ'য়ে পড়তেন, তাঁর লোমকূপ দিয়ে পিচকারীর ধারার মত রক্ত বের হোত, তখন তাঁকে দেখে মনে হ'ত, যেন রক্তের একটা পুতুল। এই অবস্থায় একদিন এই ঘরের বেড়ায় ঐ যীশুখৃষ্টের ছবির পাশে তাঁর শ্রীহস্ত রেখেছিলেন। এই সেই ঠাকুরের দেহের সেই রক্তের দাগ, যা এখনো রয়েছে। জীর্ণ এই দাগ তখনকার স্মৃতিচিহ্ন। সযত্নে এটা আমি রেখে দিয়েছি। ছবিখানার ঐ অংশে আমি কাউকেই ছুঁতে দিই না, পাছে এই পবিত্র চিহ্ন লোকের আঙুলের ঘর্ষণে বিলুপ্ত হ'য়ে যায়।"

সময় পক্ষিকুল তাঁহার মস্তকের উপর চক্রাকারে ঘুরিতে থাকিত এবং কখনও কখনও তাঁহার কাঁধের উপর বসিয়া চঞ্চুদ্বারা তাঁহার গণ্ডদেশ সযত্নে ঘর্ষণ করিত। কুকুর ও ছাগলগুলি প্রাণের উচ্ছ্বসিত আনন্দে লাফাইতে লাফাইতে কীর্তনের সঙ্গে ছুটিয়া চলিত। গাভীগণ ঊর্ধ্বপুচ্ছ হইয়া হাম্বারবে কীর্তন-দলের পিছনে দৌড়াইতে থাকিত। কীর্তনকালে সারা বিশ্ব-প্রকৃতির সেই উদ্দাম উচ্ছ্বাস-উন্মাদনা প্রত্যক্ষদর্শী ভিন্ন অন্যের পক্ষে অনুমান করাও কঠিন। আমরা অনুকূলচন্দ্রের কীর্তনসঙ্গী ও তাঁহার সমসাময়িক অনেককেই এরূপ উক্তি করিতে শুনিয়াছি যে, বৈষ্ণব-গ্রন্থাদিতে বর্ণিত শ্রীচৈতন্যদেবের কীর্তনলীলার অনির্বচনীয় মহিমা ও মাধুরী চিরদিনই তাঁহাদের নিকট অবিশ্বাস্য ও অনাস্বাদিতই থাকিয়া যাইত, যদি না তাঁহাদের ভাগ্যে অনুকূলচন্দ্রের সেই বিস্ময়কর নর্তন-কীর্তন প্রত্যক্ষভাবে উপভোগ করিবার সুযোগ ঘটিত।

যতই দিন যাইতে লাগিল, অনুকূলচন্দ্রের কীর্তনলীলার অলৌকিক কাহিনী-নিচয় লোকমুখে চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। যাঁহারাই এ-সকল অপার্থিব ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিতেন, অবাক বিস্ময়ে সকলেই অভিভূত হইতেন। এই সমস্ত চমকপ্রদ ঘটনায় পাছে জনসাধারণ তাঁহাকে অলৌকিক শক্তির আধার মনে করিয়া সেইভাবে তাঁহাকে ভজনা করিতে শুরু করেন, এই আশঙ্কায় অনুকূলচন্দ্র তখন হইতে নিজেকে যথাসম্ভব সংগোপনে রাখিবার চেষ্টা করিতেন। আত্মপ্রকাশ তাঁহার কাম্য ছিল না। তাঁহার একমাত্র উদগ্র লক্ষ্য ছিল—জনগণের চিত্তসংশোধন, মানুষের মনুষ্যত্বের উদ্বোধন। এই অভীষ্ট সিদ্ধির জন্যই তিনি সর্বক্ষণ সর্বপ্রযত্নে চেষ্টাপরায়ণ থাকিতেন। সুযোগ পাইলেই তিনি সর্বসাধারণের নিকট কীর্তন-মাহাত্ম্য প্রচার করিয়া বেড়াইতেন এবং কীর্তনে যোগদান করিতে দেশের যুবা-বৃদ্ধ সকলকে নানাভাবে উৎসাহিত করিতেন।*

* এ সম্বন্ধে বহু ঘটনার একটি এখানে উল্লেখ করা যাইতেছে। ১৩১৬ বঙ্গাব্দের কথা। হিমাইতপুরের পার্শ্ববর্তী নাজিরপুর গ্রামে একবার 'সমাজের নৈতিক উন্নতিসাধন'-বিষয়ে আলোচনার জন্য এক বিরাট জনসভার অনুষ্ঠান হইয়াছিল। পাবনার খ্যাতনামা উকীল বৃন্দাবনচন্দ্র অধিকারী বি-এল মহাশয় ইহাতে সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন এবং তদঞ্চলের বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি বক্তৃতা করিয়াছিলেন। সভার কাজ সমাপ্ত হইবার পর যুবক অনুকূলচন্দ্র দণ্ডায়মান হইয়া সমবেত শ্রোতৃবর্গের উদ্দেশে সবিনয় আবেদন জানাইয়া বলিলেন,—"দেখুন, আমার মনে হয়, শুধু বক্তৃতা করিলে বিশেষ কিছুই হইবে না। সভাসমিতিতে আলাপ-আলোচনাদির শেষে সকলে মিলিয়া কিছুক্ষণ কীর্তন করিতে পারিলে ভাল হয়। সুযোগ করিয়া প্রতি সপ্তাহে এবং সম্ভব হইলে প্রতি রাত্রে কীর্তনের ব্যবস্থা করিলে আরও ভাল হয়। প্রতি গ্রামে প্রতি পল্লীতে কীর্তনের দল গঠন করা দরকার। কীর্তনের বন্যায় সারা দেশ ভাসাইয়া দিতে পারিলে লোকের চিত্ত আপনা হইতেই পরিশুদ্ধ হইবে। তাহাতেই সমাজের সত্যিকার নৈতিক উন্নতি সাধিত হইবে।" অবশেষে সকলের সভাস্থল পরিত্যাগ-কালে তিনি পুনরায় সবাইকে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাইয়া বলিলেন,—"বাবারা, আপনারা কিন্তু কীর্তন করবেন, যেখানেই কীর্তন হবে ঝাঁপিয়ে পড়বেন। কীর্তনের মত জিনিষ নেই, ওতেই সব হবে। মাধবপাড়ার কিশোরীমোহন দাসের বাড়ীতে রোজই কীর্তন হয়, আপনারা দয়া ক'রে অবশ্য সেখানে যাবেন।"

পল্লীর সকলের কাছে অনুকূলচন্দ্র তখন লোকোত্তর মহাপুরুষগণের চরিত্র-মাহাত্ম্য ও উচ্চাদর্শের অবিরাম আলোচনা করিতেন এবং তাঁহাদের উপদেশবাণী অনুসরণ করিয়া চলিতে সবাইকে অনুপ্রাণিত করিতেন। ভারতীয় ধর্মগুরুদের মধ্যে সে যুগে বাঁকুড়া জেলার সোনামুখী গ্রামের পাগল হরনাথ ঠাকুরের নাম সর্বাধিক প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। সঙ্গীদিগকে বাস্তবভাবে ইষ্টানুসরণে উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিবার জন্য তিনি তাঁহাদের নিকট উক্ত হরনাথ ঠাকুরের কথাই বিশেষভাবে আলোচনা করিতেন, ঠাকুরের উপদেশবাণী পড়িয়া তাঁহাদিগকে শুনাইতেন, ঠাকুরের নাম যোজনাপূর্বক নিজে সঙ্গীত রচনা করিয়া তাঁহাদের দিয়া কীর্তন করাইতেন এবং সময় সময় তাঁহাদিগকে ঠাকুরের সঙ্গ করিবার জন্য তাঁহার সোনামুখী আশ্রমে পাঠাইয়া দিতেন। এই প্রসঙ্গে আমরা অনুকূলচন্দ্রের তৎকালীন অন্যতম কীর্তনসঙ্গী মুকুন্দচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের পরবর্তীকালের কথিত একটি বিবৃতি এখানে উদ্ধৃত করিলাম।—

"ঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের কীর্তনযুগের কথা। ঠাকুর তখন আমাদিগকে প্রায়শই বলিতেন,—'হাঁরে, পাগল হরনাথ ঠাকুর বলে' একজন মহাপুরুষ আছেন, তোরা একবার তাঁকে দেখে আয় না। তাঁহার কথায় কিশোরীমোহন একদিন বলিলেন,—'তিনি কোথায় থাকেন তাতো জানি না।' তদুত্তরে ঠাকুর বলিলেন,—'বাঁকুড়া জেলায় সোনামুখী গ্রামে হরনাথ ঠাকুরের আশ্রম আছে। তোরা সকলে মিলে একবার সেখানে গিয়ে তাঁর শ্রীচরণ দর্শন ক'রে আয়।' তারপর একদিন কোকন, তরণী, হারাণ, যদু পাল, তারক পাল, মেদনা ভৌমিক প্রভৃতি আমরা পনর-ষোল জন কিশোরীমোহনের নেতৃত্বে সোনামুখী রওনা হইলাম। একতারা ও করতাল বাজাইয়া কীর্তন করিতে করিতে আমরা সন্ধ্যাবেলা ঠাকুর হরনাথের আশ্রমে গিয়া উপস্থিত হইলাম। পরদিন প্রাতঃকালে ঠাকুরের সহিত আমাদের সাক্ষাৎ হইল। আশ্রমবাসীরা আমাদের পরিচয় জানিতে চাহিলে, ঠাকুর হরনাথ বলিলেন,—'এরা আমার পূর্ববঙ্গের ভক্তবৃন্দ।' আমরা তখন সকলে মিলিয়া ঠাকুরের সম্মুখে তাঁহারই রচিত দুইটি সংকীর্তন গান পর পর গাহিলাম। যথা—

আমার হরিবোল বলা হল না
আমি মুখে বলি হরি মনে অন্য করি
তাই প্রেমবারি চোখে আসে না।
গোবিন্দ বলিয়ে দু'বাহু তুলিয়ে
আমার মন-প্রাণ কই নাচে না।
আমি কবে নামরসে বেড়াইব ভেসে
রূপরসে হব মগনা।

যদি মনে করি সকলি পাশরি
ধ্যানযোগে করি আরাধনা।
আমার দশে ছয়ে ষোল এরা বাদী হল
ভুলাইল ক'রে নানা ছলনা।
শুনেছি পুরাণে সাধু-গুরুর স্থানে
'হরি' এই নামের নাই তুলনা।
জীবের জন্মজন্মান্তরের সর্বপাপ হরে
একবার ডাকের মত ডাকে যে জনা।
আমি এখনো যা করি যাত্রাকালে হরি
শ্রীহরি বলিতে ভুলি না।

*   *   *   *

ভবে ভোলার ধনে ভুলে থেকো না।
যা গেছে তা গেছে, যে কটা দিন আছে
একবার হরেকৃষ্ণ হরি বল না।
জন্মমরণ-বারণকারণ
শ্রীরাধারমণ বল না।
এ নাম স্মরিলে ভবনদীর জলে
পারের যাতনা পাবে না।
মহামন্ত্র হরিনাম
তিলার্ধ আধো ছাড়া হয়ো না।
কি হয় কখন অস্থির জীবন
এই আছ, আবার এই না।
এ হেন সুযোগ আর কোন যুগে
হয় নাই হবে না।
ব্রত উপবাস না চায় সন্ন্যাস
নামাভ্যাসে পুড়ে কামনা।
এখনো রসনা বশে না রাখিলে
অসময়ে বলা হবে না।
কবে অলক্ষিতে দুর্দিন আসিবে
তাই নিদানবন্ধু নাম আর ছেড়ো না।

যে নামে উন্মত্ত হ'য়ে হরনাথ
অবিরত করেন ভাবনা
বিনোদে* শুধালে উপায় না বলে
কাছের মরা গঙ্গা পেল না।

কীর্তন চলিতে থাকিলে, ঠাকুর হরনাথও আসিয়া আমাদের সঙ্গে কীর্তনে যোগ দিলেন ও প্রেমানন্দে মত্ত হইয়া দুই বাহু তুলিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। কীর্তনকালে ঠাকুর আমাদিগকে মুহুর্মুহু স্নেহালিঙ্গনে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া ধন্য করিলেন। দুপুরবেলা কীর্তন শেষ হইলে ঠাকুরের সঙ্গে স্নান সমাপন করিয়া আমরা প্রসাদ পাইলাম।

"আমরা তিন দিন পরমানন্দে আশ্রমে যাপন করিয়া ঠাকুরের সুমধুর সঙ্গসুখ প্রাণ ভরিয়া উপভোগ করিলাম। এই কয়দিন তিনি ধর্ম-সম্বন্ধীয় নানা আলোচনায় আমাদিগকে উদ্বুদ্ধ করিলেন এবং মানবজীবনের কর্তব্য বিষয়ে আমাদিগকে কত অমূল্য উপদেশ দান করিলেন। কথাপ্রসঙ্গে তিনি আমাদের নিকট অনুকূলচন্দ্রের কত-না গুণকীর্তন করিলেন এবং আমরা যাহাতে সর্বান্তঃকরণে তাঁহার অনুসরণ করিয়া চলি, এই উদ্দেশ্যে তাঁহার ঐকান্তিক ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। একদিন কিশোরীমোহনের সহিত ঠাকুর হরনাথের অনেক গোপন কাথাবার্তা হইল। কিশোরীমোহনের নিকট পরে শুনিয়াছি, ঠাকুর নাকি তাঁহাকে সেদিন আলোচনা-কালে বিশেষ দৃঢ়তার সহিত বলিয়াছিলেন,—'দ্যাখ, তোদের যিনি এখানে পাঠিয়েছেন তাঁর কাছেই সব পাবি। তিনিই প্রকৃত সদ্‌গুরু। অচিরেই তিনি প্রকট হ'য়ে সর্বত্র পূজিত হবেন। তিনিই যুগ-গুরু। মনপ্রাণ দিয়ে তাঁকেই ভজনা করিস।"

অনুকূলচন্দ্রের কথা যাহা বলিতেছিলাম। তাঁহার কল্যাণকরী দিব্য পরিচালনার প্রভাবে সঙ্গীদের অন্তর ধীরে ধীরে সত্যের বিমল বিভায় উদ্ভাসিত হইয়া উঠিতে লাগিল। ঐকান্তিক আগ্রহ-সহকারে তাঁহারা সকলে শিব ও সুন্দরের উপাসনায় আত্মনিয়োগ করিলেন। দেখিতে দেখিতে তাঁহাদের চলন-চরিত্রে অদ্ভুত পরিবর্তন পরিলক্ষিত হইল। চোর চৌর্যবৃত্তি ত্যাগ করিল। লম্পট লাম্পট্য ভুলিয়া গেল। পল্লীর দলাদলি, পরস্পরের হিংসা-দ্বেষ কোথায় উধাও হইল। সদভ্যাস ও সৎকর্মের অনুশীলনে সকলে একতায় সদ্ভাবে পবিত্র ধর্মজীবন যাপনের জন্য তাঁহারা অনেকেই নিরতিশয় উৎসাহী হইয়া উঠিলেন। সঙ্গীরা ইতঃপূর্বেই মহাপুরুষ ঠাকুর হরনাথের মুখে তাঁহাদের প্রিয়সুহৃদ অনুকূলচন্দ্রের অত্যুন্নত ভাগবত জীবনের অলৌকিক গুণ-গ্রামের কত ভূয়সী প্রশংসা শুনিয়াছেন; এদিকে আবার অনুকূলচন্দ্রকে তাঁহারা প্রত্যেক স্ব-স্ব জীবনের পরম উদ্ধারকারূপে পাইয়া তাঁহার অজস্র করুণালাভে নিত্য ধন্য

* ঠাকুর হরনাথের জনৈক প্রিয় শিষ্য।

হইতেছেন। এই অবস্থায় সঙ্গীরা কালক্রমে একে একে শ্রদ্ধাবনত কৃতজ্ঞ অন্তরে অনুকূলচন্দ্রের শ্রীচরণে আত্মনিবেদন না করিয়া পারিলেন না। অবশেষে তাঁহাকেই শ্রীগুরুপদে বরণ করিয়া তাঁহারা কৃতার্থ হইলেন।

এদিকে অনুকূলচন্দ্রকে তাঁহার প্রিয় সঙ্গীরা তাঁহাদের জীবন-সর্বস্ব প্রিয়পরম-জ্ঞানে সর্ব মনপ্রাণ দিয়া এমনই ভালবাসিয়া ফেলিয়াছিলেন যে, তাঁহার মধুময় সঙ্গ-সান্নিধ্য হইতে এক দন্ডও দূরে থাকা তাঁহাদের কাছে অসহ্য বোধ হইত। এই অবস্থায় তাঁহাদের অনেকেই অনুকূলচন্দ্রের সমারব্ধ লোককল্যাণযজ্ঞে আত্মোৎসর্গ করিয়া নিয়তরূপে তাঁহার শ্রীচরণাশ্রয়ে বাস করিতে লাগিলেন। তাঁহাদেরই মত একজন সাধারণ মানুষ-জ্ঞানে অনুকূলচন্দ্রের সঙ্গে তদনুরূপভাবে ব্যবহারাদি করিতে তাঁহারা মনে মনে খুবই লজ্জা ও সংকোচ বোধ করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের এতদিনের ডাক্তারবাবুকে 'ডাক্তারবাবু' ডাকিয়াও কেহ আর তৃপ্তি পান না। প্রাণের একান্ত সহজ ভক্তি ও প্রেমের আকর্ষণে তখন হইতে তাঁহাকে কেহ 'প্রভু', কেহ বা 'ঠাকুর' বলিয়া সম্বোধন করিতে আরম্ভ করিলেন। এইভাবে কিছুদিনের মধ্যে সকলের কাছেই অনুকূলচন্দ্র 'ঠাকুর' নামেই পরিচিত হইয়া উঠিলেন।

পরবর্তীকালে অনুকূলচন্দ্রকে অনেকদিনই বলিতে শুনিয়াছি—আত্ম-প্রতিষ্ঠা-সূচক এই 'ঠাকুর'-সম্বোধনটি তিনি মোটেই পছন্দ করিতেন না। এজন্য কত সময় কতভাবে তিনি আপত্তিও করিয়াছেন। কিন্তু সঙ্গীরা কেহই তাঁহার কথায় বিন্দুমাত্র কর্ণপাত করিতেন না। সকলকে বারংবার যথেষ্ট নিষেধ করিয়াও যখন তিনি তাঁহাদিগকে কিছুতেই এ-ব্যাপারে প্রতিনিবৃত্ত করিতে পারিলেন না, তখন অনন্যোপায় হইয়া অবশেষে নিজমনে এই বলিয়া প্রবোধ লইলেন,—লোকে পাচক ব্রাহ্মণকেও তো 'ঠাকুর' ব'লে ডাকে, তা এরা যদি আমায় 'ঠাকুর' ডেকে একটু আনন্দ পায়, তা ডাকুক,—কি আর করব!

ঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের কীর্তনযুগের কথা বলিতেছিলাম। অনুকূলচন্দ্রের তৎকালীন সেই সংকীর্তনের আসরে চারিযুগের সৎ-নাম-চতুষ্টয়ই সাধারণত গীত হইত। পদকীর্তন তখন খুব কমই হইত। তাঁহার কীর্তনের আর একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য এই ছিল যে, পদকীর্তন-কালেও 'পতিতপাবন নাম রাধা রাধা বোল' সঙ্গীতের এই বিশেষ পদটিই শুধু ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরিয়া শত শত জনের সম্মিলিত কণ্ঠে অবিরাম গীত হইতে থাকিত। অনুকূলচন্দ্র সেই মধুমাখা রাধা-নাম শুনিতে শুনিতে ভাববিহ্বল হইয়া পড়িতেন। কীর্তন আরম্ভ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই অনুকূলচন্দ্র সব সময় কীর্তনে নামিতেন না। কীর্তন যখন খুব জমিয়া উঠিত, তিনি আসিয়া কীর্তনে ঝাঁপাইয়া পড়িতেন। কীর্তনকালে অনেক সময় তাঁহার মুখে কীর্তনের পদাবলী বড় শোনা যাইত না। ভাববিভোর হইয়া নানা ভঙ্গিমায় এবং একরূপ নিঃশব্দে

তিনি শুধু তালে তালে নৃত্য করিয়া যাইতেন।* এইভাবে ভাবাবেশে নৃত্য করিতে করিতে তিনি অনেক সময় অজ্ঞান হইয়া পড়িতেন। তাঁহার অবশ তনুখানা তখন নিষ্প্রাণবৎ নিশ্চল হইয়া মাটির উপর এলাইয়া পড়িত। তাঁহার এইরূপ অদ্ভুত অবস্থা দর্শনে সঙ্গীরা প্রথম প্রথম ভয়ে একান্ত ব্যাকুল হইয়া পড়িতেন এবং তাঁহার চৈতন্য সম্পাদনের জন্য সকলে ঐ সময় সমাহিত চিত্তে সম্মিলিত কণ্ঠে মৃদুস্বরে সৎ-নাম কীর্তন করিতে থাকিতেন। ইহাতে কিয়ৎকালের মধ্যে তাঁহার জ্ঞান-সঞ্চার হইত।

পূর্বোক্তরূপে ভাবাবস্থায় অনুকূলচন্দ্রের বাহ্যচেতনা লুপ্ত হইলে, মাঝে মাঝে এক অনির্বচনীয় অদ্ভুত ব্যাপার পরিলক্ষিত হইত। তাঁহার সমস্ত শরীরখানা যখন অবশ হইয়া মাটির উপর ঢলিয়া পড়িত, নানা বিচিত্র ছন্দে তাহা কাঁপিয়া উঠিত এবং তাহাতে যোগশাস্ত্রোক্ত এবং আরও বহু প্রকারের আসন ও মুদ্রাদি প্রকাশ পাইত। কখনও তিনি বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের উপর সর্বাঙ্গ ন্যস্ত করিয়া অবস্থান করিতেন, কখনও তাঁহার সর্বশরীর বৃত্তাকারে পরিবর্তিত হইয়া গাড়ীর চাকার মত গড়াইয়া যাইত, কখনও তাহা ঊর্ধ্বে উৎক্ষিপ্ত হইত, কখনও সজোরে ভূমির উপর পতিত হইত, কখনও কচ্ছপের মত হস্তপদাদি সমুদয়ই তাঁহার দেহমধ্যে প্রবিষ্ট হইত, কখনও বা তীরভূমিতে সদ্য-উৎক্ষিপ্ত মৎস্যের মত তাঁহার শরীরটি লাফাইতে থাকিত। এই অবস্থায় পদ্মাসন, বীরাসন, কূর্মাসন, ময়ূরাসন, রাজাসন—ইত্যাদি জ্ঞাত-অজ্ঞাত কত রকমের কত অদ্ভুত আসনই যে হইত, তাহা বলিবার নয়। এই সকল আসন-ক্রীড়া একটির পর একটি অতিশয় নৈপুণ্য ও ক্ষিপ্রতার সহিত নিতান্ত অভ্যস্ত ভঙ্গিমায় অনায়াসে হইতে থাকিত।** হস্তপদাদির এমন সহজ সরল সাবলীল বিন্যাসের সঙ্গে আসনগুলি নিষ্পন্ন হইত যে, তাহা দেখিয়া মনে হইত, তাঁহার দেহখানা যেন একটি মাংসপিণ্ড মাত্র, তাহাতে কোন গ্রন্থি নাই, অস্থিরও লেশমাত্র নাই, আর থাকিলেও তাহা যেন গলিয়া বাঁকিয়া একাকার হইয়া গিয়াছে। কঠোর-কষ্টসাধ্য এই আসনগুলি যেন অবলীলাক্রমে ও অবিরাম গতিতে তাঁহার দেহে প্রকাশ পাইত, তাহাতে তাঁহার না-জানি কত শ্রম ও ক্লেশ হইতেছে,—এই চিন্তায় আত্মীয়বর্গ, সঙ্গিগণ এবং সমাগত দর্শকবৃন্দ অত্যন্ত অস্থির হইয়া পড়িতেন।

---

* প্রত্যক্ষদর্শী অনেকেই বলিয়া থাকেন,—"অনুকূলচন্দ্র যখন ভাবাবেশে তন্ময় হইয়া নৃত্য করিতেন, মনে হইত, তাঁহার পদদ্বয় যেন মাটিতে নাই, তিনি যেন শূন্যে থাকিয়া নৃত্য করিতেছেন।"

** আসনমুদ্রাদি সম্বন্ধে ঠাকুরের পূর্বোক্তরূপ কোনরূপ অভিজ্ঞতা কিছুই না থাকিলেও, তাঁহার দেহের উপর দিয়া এই সকল অদ্ভুত ক্রীড়া কিরূপে এবং কেন যে সংঘটিত হইত, সে-রহস্য আমাদের জ্ঞান-বুদ্ধির সম্পূর্ণ অগম্য। তবে কোন-কোন প্রাজ্ঞ ব্যক্তি এ-সম্বন্ধে এরূপ অভিমত ব্যক্ত করিয়া থাকেন যে, প্রকৃতিতে যখন কুলাবেগে চরম-প্রান্তে অবতরণ হয়, তখন এইভাবে স্বভাবে স্বভাবে আন্দোলন-বিক্ষেপাদি প্রকাশ পাইয়া থাকে।

আসনাদি হওয়ার পরেই অনুকূলচন্দ্রের দিব্য দেহখানি মাটির উপর শবের ন্যায় স্থিরভাবে পড়িয়া থাকিত। এই অবস্থায় তাঁহার দক্ষিণপদের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠটি হঠাৎ থর্‌থর্‌ করিয়া ভীষণবেগে কাঁপিয়া উঠিত। বহু জনে একসঙ্গে আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াও সে তীব্র স্পন্দন বিন্দুমাত্র রোধ করিতে পারিত না। আবার কিছুক্ষণের মধ্যে এই অদ্ভুত কম্পন সম্পূর্ণ শান্ত হইত এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার দেহে প্রাণের সমস্ত লক্ষণই একেবারে বিলুপ্ত হইত। দেখিতে দেখিতে গণ্ডদেশ হইতে শরীরের নিম্নভাগ পর্যন্ত সর্বাঙ্গ অসাড়, নিথর, হিমশীতল হইয়া যাইত। এই অবস্থায় বক্ষঃপরীক্ষার যন্ত্র দ্বারা অনেক অভিজ্ঞ ডাক্তার অতিশয় নিবিড়ভাবে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে, তাঁহার শ্বাস-প্রশ্বাস ও হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা সত্য-সত্যই বন্ধ রহিয়াছে। এই সময় তাঁহার নেত্রপুত্তলি এমন স্থির নিশ্চল হইয়া পড়িত যে, তাহাতে অঙ্গুলি-স্পর্শেও সাড়া-বোধের বিন্দুমাত্র চিহ্ন লক্ষিত হইত না। তাঁহার এইরূপ মৃতবৎ ভয়াবহ অবস্থা দর্শনে আত্মীয়-স্বজন ও অন্তরঙ্গ সঙ্গিগণ শোকাকুল হইয়া ক্রন্দন করিতেন। অন্যদিকে আবার সন্দেহপরায়ণ দুষ্ট ব্যক্তিরা তাঁহাকে নির্দয়ভাবে পরীক্ষা করিতেও ছাড়িত না। কেহ তাঁহার দেহে সজোরে চিম্‌টি কাটিত, কেহ বা তাঁহার অঙ্গুলির অগ্রভাগ সূচীবিদ্ধ করিত, কেহ কেহ আবার তাঁহার কোমল অঙ্গে ঘন্টার পর ঘন্টা জ্বলন্ত অঙ্গার চাপিয়া ধরিয়া রাখিত, তাহাতে মাংসচর্ম দগ্ধ হইয়া যাইত। কিন্তু বড়ই আশ্চর্যের বিষয়, এই সমুদয়ের কোন কিছুতেই তাঁহার শরীরে প্রাণের পরিচয় অণুমাত্রও প্রকাশ পাইত না। এইরূপ সংজ্ঞাহীন নিষ্প্রাণ অবস্থায় কিয়ৎকাল অবস্থানের পর তাঁহার বদনমণ্ডল ধীরে ধীরে স্ফীত হইয়া কখনও হাস্যোজ্জ্বল, কখনও নীল-বিবর্ণ, কখনও আরক্তিম দিব্য বিভায় দীপ্তিমান হইয়া উঠিত, চক্ষুদ্বয় আয়ত হইয়া অনবদ্য শ্রীমণ্ডিত হইয়া উঠিত এবং কখনও আবার তাঁহার ললাটদেশ হইতে ভাস্বর জ্যোতিচ্ছটা বিচ্ছুরিত হইত। ঈদৃশ অনির্বচনীয় ভাবদশায় সময় সময় তাঁহার শ্রীমুখ হইতে নানা ভাষায় বিশ্ব-রহস্যের গভীর তত্ত্বপূর্ণ উদার বাণীসমূহ ধীর গম্ভীর উদাত্তস্বরে নিঃসৃত হইত। সমবেত শ্রদ্ধাপ্লুতচিত্ত বিপুল জনতা সে অমৃতধারায় অভিস্নাত হইয়া ধন্য হইত। গভীর-তত্ত্বালোচনাকালে ভাবোন্মাদনায় মসগুল হইয়া পড়িলে, কখনও বা কাহারও প্রাণস্পর্শী গীতধ্বনি শ্রবণ করিলেও পূর্বোক্তরূপে বাহ্যজ্ঞান বিলুপ্তির সঙ্গে তাঁহার এইরূপ মহাভাবসমাধি হইত। সুমধুর সঙ্গীত শ্রবণে উক্তরূপ ভাবদশা ঘটিবার বহু কাহিনীর কয়েকটি নিম্নে উল্লেখ করা যাইতেছে।—

১৩২১-২২ বঙ্গাব্দের কথা। ঠাকুর আছেন কুষ্টিয়ায় সংঘত্রাতা মোক্তার অশ্বিনীকুমার বিশ্বাস মহাশয়ের বাসায়। একদিন চৌদ্দমাদলের এক বিরাট কীর্তনদল নগর-পরিক্রমায় বাহির হইয়াছে। কীর্তনদলটি যখন অনুকূলচন্দ্রের উক্ত আবাস-বাটিকার সম্মুখস্থ রাস্তা দিয়া যাইতেছিল, তিনি ঐ বাড়ীর প্রকোষ্ঠ হইতে বাহিরে আসিয়া ফটকের সম্মুখে দাঁড়াইয়া তন্ময়চিত্তে সেই কীর্তন শুনিতে-



কুষ্টিয়ায় চৌদ্দমাদলের সংকীর্ত্তন-শ্রবণে
ভাবসমাধিস্থ শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র
ভক্ত অশ্বিনীকুমার (দক্ষিণে) তাঁহাকে বাহুবদ্ধ করিয়া আছেন।

ছিলেন। কীর্তন শুনিতে শুনিতে তিনি ভাবদশায় সংজ্ঞাহারা হইয়া পড়েন এবং তাঁহার দেহখানা মাটির উপর পড়িয়া যাওয়ার উপক্রম হয়! তাঁহার অন্তরঙ্গ পার্ষদ অশ্বিনীকুমার তৎকালে নিকটেই অবস্থান করিতেছিলেন। পাছে অনুকূলচন্দ্র ভূপতিত হইয়া আঘাতপ্রাপ্ত হন এই ভয়ে অশ্বিনীকুমার তাড়াতাড়ি অগ্রসর হইয়া তাঁহাকে উক্তরূপে দণ্ডায়মান অবস্থায়ই বাহুবন্ধনে ধরিয়া রাখেন। অনুকূলচন্দ্রের তখন পূর্ণ ভাবসমাধি-দশা। এই অবস্থার একখানি আলোকচিত্র গ্রন্থমধ্যে সন্নিবিষ্ট করা হইল। তাঁহাকে উক্তরূপ সংজ্ঞাহীন অবস্থায় ধরাধরি করিয়া গৃহাভ্যন্তরে লইয়া যাওয়া হইলে, তাঁহার শ্রীমুখ হইতে বাণী নির্গত হইতে থাকে।

অনুরূপ একটি কাহিনী বিবৃত করিয়াছেন প্রবীণ ভক্ত শ্রদ্ধেয় সুশীলচন্দ্র বসু, বি-এ।

"১৯১৮ খৃষ্টাব্দের ১৮ই অক্টোবর শ্রীশ্রীঠাকুর কীর্তনের দলবল সহ আমাদের বাড়ীতে (হরিণাকুণ্ড, যশোহর) আসেন। পরদিন শনিবার ১৯শে অক্টোবর কোজাগরী পূর্ণিমা দিবস বাইরের হলঘরে সন্ধ্যা হইতে তুমুল কীর্তন হয়। ঐ কীর্তনে অসংখ্য লোকসমাগম হয়েছিল। পরের দিনও সকাল থেকে সেই হলঘরে অনেক লোক সমবেত হ'তে লাগল। নানারূপ আলাপ-আলোচনা চলতে লাগল। অনেকে দীক্ষাও নিলেন। গ্রামের নড়াইল জমিদারী কাছারীর নায়েব সুশিক্ষিত যতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য মহাশয় শ্রীশ্রীঠাকুরকে দর্শন করতে এলেন। তিনি দু-একটি প্রশ্ন শ্রীশ্রীঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করলেন। উপস্থিত ভদ্রলোকদের মধ্যে একজন নায়েব মশাইকে দেখিয়ে বললেন,—'উনি বেশ ভাল গান গাইতে প্যারেন'।

"শ্রীশ্রীঠাকুর তখন নায়েব মশাইয়ের কোলে মাথা রেখে শুয়েছিলেন। নায়েব-মশাইয়ের দিকে তাকিয়ে বললেন—'একটু গান শুনাবেন কি দাদা'?

"হাঁ? নিশ্চয়ই!' এই কথা বলে' কিছুক্ষণ বাদে তিনি শ্রীশ্রীঠাকুরকে গান গেয়ে শুনান। ভগবদ্‌বিষয়ক গান—গানের লাইন কয়টা এখন আর মনে নাই। শ্রীশ্রীঠাকুর তৎক্ষণে তাঁর কোল থেকে উঠে একা বালিশে মাথা রেখে গান শুনতে লাগলেন। গায়কের সুমিষ্টস্বর এবং ভগবদ্‌বিষয়ে উদ্‌গত-চিত্ততা সবাইকে মোহিত ক'রে তুলল। নিবিষ্টমনে গান শুনতে শুনতে শ্রীশ্রীঠাকুরেরও ভাবান্তর উপস্থিত হ'লো। প্রথমে মাথাটা এপাশ-ওপাশ হ'তে লাগল। তারপর তা থেমে গেল। দেহ স্থির অচঞ্চল হ'য়ে এল। মহারাজ* তাড়াতাড়ি এসে বালিশটা সরিয়ে নিলেন। ঠাকুর ধীরে ধীরে সমাধিস্থ হ'য়ে পড়লেন। তাঁর ডান পায়ের বুড়া আঙ্গুলটা থর্ থর্ ক'রে কাঁপতে লাগল। তারপর জলদগম্ভীর স্বরে বাণী নির্গত হ'ল—

"সে একটা স্ব-অস্তিত্বের অনন্তত্ব, আত্ম হ'তে ইচ্ছা তাই 'এক্সিস্টেন্স্'। স্ব-এর ক্রম-নিদ্রা ক্রম-জাগরণ সোঽহং-পুরুষ। 'অ' বিন্দুর ব্যাপ্তির বিরোধ হয় না।

---

* শ্রীশ্রীঠাকুরের অন্যতম প্রধান পার্ষদ মহারাজ অনন্তনাথ রায়।

প্রসারণেই সংকোচকে আকর্ষণ করে, সংকোচেরই অবস্থাভেদ প্রসারণ। স্ব-এর ভুল—অসৎ অজ্ঞান ; পূর্ণ বিন্দুও নয়, ব্যাপ্তিও নয়, তাই অনস্তিত্বের অস্তিত্ব।

"আমি, আমিই ডেকেছি, তোমায় যদি না ডাকবো তবে কা'কে ডাকবো ? কে আছে,—তুমিই সব, তোমারই সব, তাই আমি। দেখ, অনন্তের দ্বারে এক ভিক্ষুক, তাকে পূর্ণ করতে পারবে না ? দেখ, পূর্ণত্বের জ্ঞানই অপূর্ণ হ'য়ে পড়েছে ; দেখ, জীবনই মরণকে এনেছে। দেখ, তুমি আমার মরণের পর তার পথ ব'লে দিতে পারবে না ? শান্তিতে আছি, যেদিন মনে ক'রেছি অশান্তি—তখনই এসেছে। ওগো ! শান্তি অশান্তি ভুলিয়ে দিতে পারবে না ? যখন নূতন দেখেছি, পরমুহূর্তেই পুরাণ দেখেছি। নূতন পুরাণের পার নিয়ে যাও।

"দেখ দেখ, কেন এমন করছো ? তুমি এত চঞ্চল কেন ? তুমি কি আপন ভুলে চঞ্চল হ'চ্ছো ? অতীত ভুলে চঞ্চল হচ্ছো ? একি চঞ্চলতা না স্থিরতা ? ব্যাপ্তি না ক্ষুদ্রত্ব ?

"যখন সংকোচের কোলে বসেছি,—প্রসারণকে ধ্যান করেছি ; প্রসারণের কোলে বসেছি,—তখনই সংকোচকে ধ্যান করেছি। যখনই আমার জীব-বোধ হয়, তখনই আমি মুক্ত, আমি বদ্ধ। যদি খেলা ভুলতে চাও, মুক্ত বন্ধের পারে যাও ; আর যদি জীবন্মুক্ত হ'তে চাও—তবে স্মরণ কর তুমি চৈতন্য, মুক্ত-চৈতন্য তোমার ভিতর।

"যত ব্যথা, যত কষ্ট, যত দুঃখ দৈন্য সব আমার ; আমি করি সব ; আমিই নাচি, গাই, বাজাই ; আমিই অনন্ত, আমিই শান্ত ; আমিই চন্দ্র, আমি সূর্য, আমি বালিকণা। আমি সৃষ্টি করি নাই, সৃষ্ট হয়েছি ! যখনই আমি 'আমি' মনে করেছি, তখনই আবার 'তুমি' চাই ; যখন 'তুমি' মনে করেছি, তখনই আবার 'আমি' চাই।

"কেঁদ না, আমি আছি। যত দুঃখ কষ্ট আছে আমি সইব। কেঁদ না, সব আমি করবো। আনন্দ কর, স্ফূর্তি কর। আমি তোমার ভিতরে আছি। আমি তো সবার সঙ্গে আছি, তবে কাঁদ কেন ? তুমি যত বল—'আমি পাপী', তত আমার অনন্তত্ব লোপ হ'য়ে যায়। তুমি আমি, আমি তুমি। দেখ, আমাকে ভালবাস, তোমাকে ভালবাস, জগৎকে ভালবাস। যখন তুমি তোমাকে ভালবাস নাই, তোমাকে হিংসা ক'রেছ, তখনই তোমাকে বিপন্ন করেছ।

"আমি জানি না ভাই, আমি কিছু জানি না ; আমি তোমাদের চেয়ে মূর্খ। তুমি কর না ভাই, ক'রে যাও। তোমার ভিতর কি আছে দেখতে চাও ? ওগো, ঐ চিন্তার নামই কাম। 'এনার্জি ক্রিয়েট' কর, নাম কর, আপনিই, পরমায়ু বাড়বে।......'

"সমাধিভঙ্গের পূর্বাবস্থায় ব'লে উঠলেন,—'আমি জল খাব রে, জল খাব'।

মহারাজ একটা তামার ঘটীতে ক'রে জল এনে দিলেন। তখন বেলাও অধিক হয়েছিল। সমাধিভঙ্গের পরে একে একে সবাই বিদায় নিলেন।"

অন্য একটি ঘটনার বিবৃতিদান-প্রসঙ্গে সংঘভ্রাতা কবি হিরণ্ময় মুন্সী মহাশয় লিখিয়াছেন,—

"গিয়েছি আশ্রমে। দিন তারিখ সাল অস্পষ্ট। স্মরণের বাইরে। পদ্মার ধারে ঠাকুরের ডিস্পেন্সারী ঘর। দক্ষিণমুখী। সম্মুখে বিরাট পদ্মা। বর্ষার জল নেমে গেছে—চক্চকে ভেজা বালুর চর জেগে উঠেছে সম্মুখে। একখানা বাঁশের মাচার উপর তিনি বসা। আমরা জনকয়েক ভাই তাঁকে ঘিরে তাঁর অমৃতবাণী শুনছি ও অপলক-নেত্রে দেখছি তাঁর অনিন্দ্য-সুন্দর রূপ।

"আশ্রমে গেলে প্রায়ই ঠাকুর আমায় বলতেন গান গাইতে। সেদিনও হঠাৎ আমার দিকে লক্ষ্য ক'রে বললেন,—'একটা গান গা তো'। আমি সুরু করলাম রামপ্রসাদী গান—

'দোলে দোলে রে আনন্দময়ী করালবদনী। (কালী)
মনপবনে দোলাইছে দিবসরজনী
ঈড়া-পিঙ্গলানামা
সুষুম্না মনোরমা
তার মাঝে গাঁথা শ্যামা ব্রহ্মসনাতনী॥'

গান শুনতে শুনতে ঠাকুরের শ্রীমুখখানা আরক্তিম আভা ধারণ করল। কিছুক্ষণ পরে শুয়ে পড়লেন তিনি মাচার ওপরে। দেহ স্থির নিস্পন্দ, চোখ-মুখ অপূর্ব দিব্য ভাবোন্মাদনায় রঙিন—উদ্ভাসিত। এই অবস্থায় ভয়ে ও বিস্ময়ে হঠাৎ গানটা থামিয়ে দিলাম আমি। কেমন যেন আমারও অবস্থা হ'য়ে উঠলো তখন। সবাই আমরা সন্ত্রস্ত। কী যেন হয়-হয় ভাব। প্রায় অর্ধ ঘণ্টার উপর কাটলো এমনিভাবে। তারপর ধীরে ধীরে তিনি যেন সহজ অবস্থায় এলেন ফিরে। উঠে বসলেন আলুথালু ভঙ্গীতে। কথা বললেন বহুক্ষণ পরে।

"এ ঘটনাটি তাঁর ভাবাবস্থার অনুরূপ। যদিও সেদিন ভাববাণীর প্রকাশ হয়নি, তবুও কেউ কেউ বল্লেন, গান চলতে থাকলে হয়তো বাণী বের হতো। জানি না, হতো কিনা। তবে এটা যে ভাবসমাধির প্রাক্ প্রকাশ এতে সন্দেহ নাই।"

জনৈক সংঘভ্রাতার মুখে শুনিয়াছি, একদিন নিম্নোক্ত সঙ্গীতটি শ্রবণেও ঠাকুরের ভাবসমাধি হইয়াছিল তাঁহার সম্মুখে।—

"মায়ের নাম নিয়ে ভাসান তরী যেদিন ডুবে যাবে রে
সেদিন রবি-চন্দ্র-গ্রহ-তারা তারাও ডুবে যাবে রে
সেদিন তারাও ডুবে যাবে রে॥
বহুদিনের পরে আবার মরা গাঙ্গে পেয়ে জোয়ার

আমরা জোয়ারে ধরেছি পাড়ি আর কি পড়ি ঠেকে রে
মোদের আর কি পাড়ি ঠেকে রে ॥
মায়ের সন্তান ভণে আমরা উজানেও ভয় করিনে
এবার মায়ের নামে বাদাম টেনে উজান বেয়ে যাব রে ॥"

ঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের ভাবদশার কথা বলিতেছিলাম। এই অবস্থায় কখনও তিনি ভীষণবেগে ধাবিত হইতেন, কখনও বলের মত গড়াইয়া যাইতেন, কখনও লাফ দিয়া ডিগবাজী খাইয়া পড়িতেন, কখনও মাটির উপর মুখ ঘষিতেন—ইট-কাঁকর ধুলো-মাটি কিছুই গ্রাহ্য করিতেন না। এই অবস্থায় কেহ বাধা প্রদান করিলে তিনি আরও উদ্দাম হইয়া ছিটকাইয়া পড়িয়া আছাড় খাইতেন। সে কারণ, ঐ সময় কেহ তাঁহার অঙ্গ স্পর্শ করিতে সাহসী হইত না। এইভাবে আঘাত পাওয়ায় অনেক সময় তাহার কোমল অঙ্গ ক্ষতবিক্ষত হইয়া যাইত এবং তাহা হইতে রক্তক্ষরণ হইত।* কিন্তু ভাবদশার পরে পূর্ণ জাগ্রত অবস্থায় জ্ঞান ফিরিয়া আসিলে, ক্ষতাদি-জনিত কোন যন্ত্রণাই তিনি অনুভব করিতেন না, ক্ষতগুলিও সত্বর সারিয়া উঠিত।

সমাধি-অবস্থায় ঠাকুরের শ্রীমুখ-নিঃসৃত বাণীগুলি সমবেত বিস্ময়-বিমুগ্ধ জনমণ্ডলীর অন্তরে স্বতঃই এক অপূর্ব স্বর্গীয় ভাবাবেশের সঞ্চার করিত। সেই উচ্ছ্বসিত দিব্য স্বর-লহরী, আবেগ-আপ্লুত কণ্ঠের সে বিদ্যুৎ-স্পন্দন সকলের মর্মদেশে গিয়া বিদ্ধ হইত। শ্রোতৃবর্গ সেই সুধাবর্ষী মহাবাণী মন্ত্র-মুগ্ধের ন্যায় শ্রবণ করিতেন এবং এক অনির্বচনীয় ভাবোন্মাদনায় দিশাহারা হইয়া পড়িতেন।

অর্ধভাবাবস্থায় কখনও যদি কীর্তন থামিয়া যাইত, ঠাকুর খুবই কষ্ট পাইতেছেন বলিয়া মনে হইত। এ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোক-পাতের জন্য আমরা সংঘভ্রাতা ধীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী বি. এ. মহাশয়ের প্রদত্ত একটি বিবৃতি নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।—

"বহুকালের কথা। পাবনা-হিমাইতপুর আশ্রম হইতে ঠাকুর কলিকাতায় ১১১ সি, হরিতকীবাগান লেনে আসিয়াছেন সংবাদ পাইয়া, তাঁহার শ্রীচরণ দর্শন-কামনায় একদিন সেখানে গিয়াছি। দোতালার বড় ঘরটায় ডাক্তার শশিভূষণ মিত্র নগেন্দ্রনাথ ঘোষাল, মনোহরচন্দ্র বসু, হীরালাল দাস প্রভৃতি বহু ইষ্টভ্রাতা ঠাকুরকে ঘিরিয়া বসিয়া আছেন। ঠাকুর ডাক্তার শশীদার কোলে মাথা রাখিয়া শুইয়া আছেন। নানা বিষয়ে আলাপ-আলোচনা চলিতেছে। এমন সময় সংঘ-

*শুনিয়াছি, ঠাকুরের ভাবাবস্থাকালে একদিন জননীদেবী তাঁহার এইরূপ অবস্থা দর্শনে অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়েন। পরিশেষে ঠাকুর প্রকৃতিস্থ হইলে, তিনি তাঁহার নিকট, যাহাতে এরূপ শোচনীয় দশা আর না ঘটে, সেজন্য অতীব ব্যথিত অন্তরে আপন মনোভাব ব্যক্ত করেন। এই অবস্থায় এবং অন্যান্য আরও নানা কারণে অতঃপর ঠাকুরকে তাঁহার এভাব সংবরণ করিতে হইয়াছিল।

ভ্রাতা যতীন্দ্রনাথ বসু মহাশয় একজন ভদ্রলোককে সঙ্গে লইয়া সেখানে উপস্থিত হইলেন। ভদ্রলোকটি ছিলেন একজন সুগায়ক। উপস্থিত সকলে তাঁহাকে একটি গান গাহিয়া শুনাইবার জন্য অনুরোধ করিলে, তিনি গান ধরিলেন,—'ওগো যন্ত্রী, তোমার যন্ত্রটিকে মিলিয়ে নাও।.....' গানের ভাব যেমন গভীর, গায়কের কণ্ঠস্বরও ছিল তেমনি মধুর। সকলে তন্ময়চিত্তে সঙ্গীত-শ্রবণে মগ্ন। এদিকে ঠাকুর গান শুনিতে শুনিতে ভাববিভোর অবস্থায় নিশ্চল নিস্পন্দ। তাঁহার নেত্রদ্বয় স্থির। বাহ্য-সংজ্ঞাও বিলুপ্ত-প্রায়। সকলেই বুঝিলেন, ইহা ভাবসমাধির ঠিক পূর্বাবস্থা। গায়ক ভদ্রলোক ঠাকুরের এইরূপ আকস্মিক অবস্থান্তর লক্ষ্য করিয়া অত্যন্ত ভীত হইলেন। কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থায় তিনি হঠাৎ সঙ্গীত বন্ধ করিয়া দিলেন। ইহাতে ঠাকুরের স্নায়ুর উপর তীব্র আঘাত লাগায় তাঁহার অতিশয় শোচনীয় দশা উপস্থিত হইল। তিনি অসহ্য যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া অর্ধচেতনাবস্থায় টলিতে টলিতে চলিতে আরম্ভ করিলেন। এই সময় দুই জন ইষ্টভ্রাতা তাঁহাকে দুই পাশে ধরিয়া বাড়ীর অন্য একটি নির্জন কক্ষে লইয়া যাওয়ার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু বড়ই আশ্চর্যের বিষয়, ঠাকুরের অঙ্গস্পর্শ হওয়ামাত্র তাঁহারা উভয়েই তড়িৎস্পৃষ্টের ন্যায় দূরে ছিটকাইয়া পড়িলেন। অতঃপর এইরূপ টলায়মান অবস্থায়ই তাঁহাকে কোনমতে পার্শ্ববর্তী গৃহে জননী-দেবীর কাছে লইয়া যাওয়া হইল। পুত্রকে ক্রোড়ে লইয়া মাতৃদেবী শয্যার উপর বসিলেন। ঠাকুরের তখনও একরূপ অজ্ঞানাবস্থা। দীর্ঘ সময় ধরিয়া সেবাশুশ্রূষাদি করিবার পর ধীরে ধীরে তাঁহার সহজ স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়া আসিল।"

অনেক সময়ই লক্ষ্য করা গিয়াছে, ঠাকুরের ভাবসমাধিকালে কেহ দেহ-মনের অশুচিতা নিয়া ঠাকুরের দিব্য অঙ্গ স্পর্শ করিলে, অব্যক্ত যন্ত্রণায় তাঁহার সমস্ত শরীর কম্পিত হইয়া উঠিত। এই সময় তিনি কখনও—"উঃ দাউ দাউ ক'রে জ্বলে গেল!" কখনও—"আগুন, আগুন" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিতেন। ভাবাবস্থায় স্পর্শদোষহেতু ঠাকুরের নিদারুণ অস্বস্তি-ভোগের বহু কাহিনী আমরা প্রত্যক্ষ-দর্শীদের মুখে শুনিয়াছি। এ-সম্বন্ধে সংঘভ্রাতা যতীন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের বিবৃত শুধু একটি ঘটনাই নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।—

"ইংরাজী ১৯১৯ সালের ১৩ই ডিসেম্বর, শনিবার বিকালবেলা কলিকাতায় ১।১ সি, হরিতকী বাগান লেনের বাড়ীর দোতলায় একটি বড় ঘরে কীর্তন হইতেছে। কীর্তনের দলে সতীশচন্দ্র গোস্বামী, নগেন্দ্রনাথ ঘোষাল, ডাক্তার শশিভূষণ মিত্র, সুশীলচন্দ্র বসু, ক্ষেত্রনাথ বসু, বলাইচন্দ্র ঘোষ, যতীন্দ্রনাথ সরকার প্রভৃতি আমরা গুরুভাইয়েরা অনেকেই আছি। ঠাকুর তখন কীর্তন-আসরের পাশের ঘরে নানাস্থান হইতে আগত মায়েদের সহিত আলাপ-আলোচনায় ব্যাপৃত রহিয়াছেন। সেদিন আমরা গান ধরিয়াছিলাম—

সাঁঝের আঁধার আসছে ঘিরে এখনো তো সামনে ওরে
বহু পথ পড়ে আছে, আসছে আঁধার ঘিরে।
প্রেমের আলো জ্বালিয়ে তাই তো ডাকছে দয়াল তোরে ॥
এমন দয়াল পাবে নাকো খুঁজলে জগৎ ভরি।
প্রেম বিলাতে এসেছে রে নররূপ ধরি ॥
যারে তারে দেয় কোল মুখে বলে রাধাবোল
বলে এমন মধুর নাম কে নিবি রে আয়।
প্রতিদান চায় না সে যে, যেচে প্রেম বিলায় ॥
এমন দয়াল পাবে নাকো খুঁজলে জগৎ ভরি।
প্রেম বিলাতে এসেছে রে নররূপ ধরি ॥
মেরেছ বেশ করেছ তবু রাধা ব'লে নাচ
কোন্ দেশের ইতিহাসে আছে এমন কথা।
জীব তরাতে প্রেম বিলাতে কার বা এমন ব্যথা ॥
এমন দয়াল পাবে নাকো খুঁজলে জগৎ ভরি।
প্রেম বিলাতে এসেছে রে নররূপ ধরি ॥
বৃথা মোহে বৃথা কাজে দিন কাটানো আর কি সাজে
সুবাতাস উঠছে গাঙ্গে দে তুলে দে পাল।
দেখবি দয়াল ঠাকুর দয়া ক'রে ধরবে এসে হাল ॥
এমন দয়াল পাবে নাকো খুঁজলে জগৎ ভরি।
প্রেম বিলাতে এসেছে রে নররূপ ধরি ॥

"কীর্তন খুব জমিয়া উঠিয়াছে। বাদ্য ও সঙ্গীতের উচ্চ ধ্বনিতে সারা বাড়ীখানা গম্‌গম্ করিতেছে। কীর্তনাবেশে সবাই বিভোর—আনন্দে মাতোয়ারা। কীর্তন শুনিতে শুনিতে ভাবে ডগমগ হইয়া ঠাকুর সহসা পাশের ঘর হইতে আমাদের কীর্তনের আসরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং উর্ধ্ববাহু হইয়া প্রেমানন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন। নৃত্যকালীন তাঁহার সে কমনীয় দেহকান্তি ও অপরূপ ভাব-বিভঙ্গের কথা ভাষায় বর্ণনা করিবার সামর্থ্য আমার নাই। সে অতুলনীয় রূপমাধুরী শুধু নয়ন ভরিয়া উপভোগ করিবারই বস্তু। আমি তখন অমিয়-সাগরে ডুবিয়া গিয়া গীতবাদ্য সবই ভুলিয়া গিয়াছি, আর তন্ময় হইয়া তাঁহার ভুবন-ভুলানো মূর্তিখানাই শুধু দেখিতেছি। হারমোনিয়ম বাজাইয়া আমিই এতক্ষণ গানের সুর দিয়া আসিতেছিলাম। কিন্তু এই অবস্থায় কখন যে যন্ত্র হইতে আমার হাতখানা খসিয়া পড়িয়াছে এবং আমি গান ছাড়িয়া দিয়াছি,

কিছুই আমার স্মরণে নাই। অনুমান তিন চার মিনিট কাল বোধ হয় আমি এইরূপ আত্মভোলা অবস্থায় ছিলাম। ততক্ষণ কীর্তনও বন্ধ ছিল। কীর্তন হঠাৎ থামিয়া গেলে ঠাকুরের অসহ্য কষ্ট হয়, এ কথা পূর্বে হইতে জানা থাকায়, সতীশচন্দ্র গোস্বামী অবিলম্বে তড়িদ্বেগে আমার কাছে ছুটিয়া আসিলেন এবং আমাকে সজোরে ধাক্কা দিয়া সজাগ করিয়া দিলেন। আমিও তৎক্ষণাৎ গানে সুর দিলাম। কীর্তন পূর্ববৎ তুমুলবেগে চলিতে লাগিল। প্রায় দুই ঘন্টা কাল ধরিয়া ঠাকুর কীর্তনের তালে তালে নৃত্য করিলেন। ভাবাবেশে নৃত্য করিতে করিতে ঠাকুর হঠাৎ ভূপতিত হইলেন এবং কীর্তনের আসরের মেজেতে শায়িত অবস্থায় পড়িয়া রহিলেন। দেখিলাম, তাঁহার সংজ্ঞা বিলুপ্ত-প্রায়, দেহখানা অবশ ও নিশ্চল। সাধারণত এইরূপ অবস্থায়ই ঠাকুরের শ্রীমুখ হইতে বাণী নির্গত হয় জানিয়া, আমরা সকলেই সেজন্য একান্ত আগ্রহাকুল-চিত্তে অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। কিন্তু দুঃখের বিষয়, বাণী বাহির হওয়া তো দূরের কথা, ঠাকুরকে লইয়াই তখন মহা হুলস্থূলে পড়িয়া গেল। কারণ, দেখা গেল, তিনি যন্ত্রণায় কাতর হইয়া ছটফট করিতেছেন। দেখিতে দেখিতে তাঁহার ভীষণ শ্বাস-কষ্ট উপস্থিত হইল। হঠাৎ তাঁহার নীরোগ দেহটি এরূপে সাংঘাতিকভাবে অসুস্থ হইয়া পড়িবার কারণ আর কিছুই নয়, সেদিন ঠাকুরের উক্তরূপ ভাবসমাধি-অবস্থা লক্ষ্য করিবামাত্র সমাগত মহিলাগণ পুণ্যার্জনের প্রলোভনে পাগল হইয়া, যে যেখানে ছিলেন, ছুটিয়া গিয়া তাঁহার পরম-পবিত্র দেহখানি যথেচ্ছভাবে স্পর্শ করিতে লাগিলেন। যাহা হোক, ঐ অবস্থায়ই তাঁহাকে ধরাধরি করিয়া তাড়াতাড়ি দোতলার ছাদের উপর লইয়া যাওয়া হইল। সময়োচিত সেবা-পরিচর্যা এবং চিকিৎসাদির পর তিনি ধীরে ধীরে সুস্থ হইয়া উঠিলেন।

"অন্তরঙ্গ পার্ষদগণের কাছে পরে শুনিয়াছি, ভাবসমাধি-অবস্থায় ঠাকুরের পূতদেহে বাহিরের কোন স্পর্শদোষ ঘটিলে তাহা অধিক দিন স্থায়ী হইবে না, এরূপ তাঁহার শ্রীমুখোচ্চারিত ভাববাণীর মধ্যেই ইঙ্গিত ছিল। সেজন্য ঐ অবস্থায় তাঁহার দিব্য দেহখানি পরিরক্ষণের জন্য যথাসম্ভব প্রয়োজনীয় সতর্কতামূলক ব্যবস্থাদি অবলম্বনে তাঁহারা সর্বদাই তৎপর থাকিতেন। কিন্তু, দুর্ভাগ্যবশতঃ সেদিন এ সম্বন্ধে কাহারও মোটেই কোন লক্ষ্য ছিল না।"

ভাবসমাধি-কালে ঠাকুরের শ্রীমুখ হইতে যে সকল বাণী নির্গত হইত তাহা সাধারণত সৃষ্টিতত্ত্ব, অবতারবাদ, জ্ঞান, বিশ্বাস, ভক্তি, ধর্ম ও কর্মের গূঢ়তত্ত্বের সহজ সরল ব্যাখ্যা, নাম-ধ্যান, অনুসন্ধিৎসু সেবা, সর্বজনীন ভ্রাতৃভাব, সংকীর্তন-মাহাত্ম্য, সাধন-সংকেত, আশা ভরসা, অভয় ও উৎসাহের বাণী, প্রেম-প্রচার প্রভৃতি জগন্মঙ্গলকর নানা অমূল্য ভাব-সম্পদে পূর্ণ থাকিত। বিশ্বমনের গভীর ভাবব্যঞ্জক এবং মানবজীবনের সর্বসমস্যা-সমাধানী এই সকল অসংখ্য অপূর্ব উপদেশ-বাণীর প্রতিছত্রে পরমাত্মা জীবকল্যাণকর মহাভাববাণী ব্যক্ত করিয়াছেন দেখিতে পাওয়া যায়। বাণীতে কোন কোন দিন উপস্থিত ব্যক্তি-বিশেষের উদ্দেশ্যে,

কখনও তাহাদের গোপন-মনের কোন কথা বা প্রশ্নের উত্তর*, কখনও অনুভূতি-রাজ্যের নানা উচ্চ স্তরের বর্ণনা, কখনও জগতের ভূত, ভবিষ্যত ও বর্তমানের নানা বিষয়, কখনও ভূখণ্ডের নানা দেশ ও জাতির সম্বন্ধে বিভিন্ন প্রসঙ্গের উল্লেখ থাকিত। **

মহাভাবাবস্থায় ঠাকুরের বাণী-কথনের আর একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য এই ছিল যে, বাণী-প্রদান দিবসের কার্যাবলীর যে ছাপ তাঁহার মস্তিষ্কে সঞ্চিত থাকিত, তাহাও ঐ দিবসের উচ্চারিত বাণীর মধ্যে সমন্বয়েই পর পর বাহির হইয়া পড়িত,—সারা দিনের গোপনীয় অগোপনীয় চিন্তা ও কথাবার্তাদি সব-কিছুই এক এক করিয়া পর পর প্রকাশ পাইত। মানস-পটের ভাবরাজি পর্যন্ত তৎকালীন ভাবভঙ্গীতে অনুরূপভাবে মূর্ত হইয়া উঠিত। এক-এক দিন ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরিয়া উক্তরূপ সংজ্ঞাহীন অবস্থায় তাঁহার শ্রীমুখ হইতে বাণী নির্গত হইত। বাণীগুলি কখনও শ্লথ-গতিতে কখনও বা জোয়ারের মত অজস্র উত্তালতায় ক্ষিপ্র-গতিতে বাহির হইত। অবশেষে ধীরে ধীরে তাঁহার সহজ জ্ঞান ফিরিয়া আসিত। এই সময় পিপাসার্তকণ্ঠে তিনি 'জল'—'জল'—'জল খাব'—'জল খাব রে' বলিয়া চীৎকার করিতে থাকিতেন। এই অবস্থায় খানিকটা জলপান করতঃ ক্রমশ সুস্থ হইয়া তিনি স্বকীয় স্বাভাবিক অবস্থায় উপনীত হইতেন, আর তখন যেন তিনি অমৃত-নদীতে স্নান করিয়া উঠিলেন, এমনই একটা প্রাণ-প্রাচুর্য অনুভব করিতেন।

উক্তরূপ ভাবাবস্থার স্মৃতি সম্বন্ধে ঠাকুর কোন-কোন দিন খুবই সচেতন থাকিতেন, কখনও বা সবই ভুলিয়া যাইতেন। সচেতন থাকাটাও যেন মেঘলা মনের মত—মনে যেন একটা কুয়াসার ভাব থাকিত। ঠাকুর পরবর্তীকালে তাঁহার ভাবাবস্থার অভিজ্ঞতার কথা আপন স্মৃতি হইতে সময় সময় কিছু কিছু কথাপ্রসঙ্গে প্রকাশ করিয়াছেন। তাহারই যৎকিঞ্চিৎ বিবরণ এখানে উদ্ধৃত করা গেল।—

একদিন বলিতেছিলেন,—"কীর্তন-টীর্তন করতাম, trance-এর সময় consciousness থাকত না—অন্য সব সময়ই conscious থাকতাম।" অন্য একদিন বলিতেছিলেন,—"বাণীর সময় কখনও কখনও মনে হ'তো, যেন কতগুলি ideas-এর ঢেউ আমার আমিত্বের মধ্য দিয়ে ফক্‌ফক্‌ ক'রে বেরিয়ে আসছে, আর

---

* "ভাববাণী সমূহের দৈনিক উক্তি যদিও সত্যের সমষ্টি, তথাপি উহা কোন-কোন ব্যক্তি-বিশেষকে উপলক্ষ করিয়াই প্রথমত প্রকাশিত হয়। ব্যক্তিগত দুর্বলতা, বিশেষত্ব ও গুণরাজি অবগত হইয়া উক্ত দৈবীলীলা দুর্বলতার নিরাকরণ, আবশ্যক-স্থলে বিশেষত্বের সংরক্ষণ ও গুণরাজির উৎকর্ষ সাধনের জন্য যথোপযুক্ত ভাবে ও ভাষায় উপদেশ প্রদান করিয়াছেন এবং ঐ উপদিষ্ট ব্যক্তিকে সত্য-প্রচার অবলম্বনে সনির্বন্ধ অনুরোধ করিয়াছেন।" 'সর্বসাধারণের প্রতি নিবেদন'—'পুণ্যপুঁথি' (প্রথম-পনর দিবসের ভাববাণীর সংকলন-গ্রন্থ, যাহ ১৩২৫ সনে মুদ্রিত)।

** ভাববাণীর পরিচিতি-প্রসঙ্গে গ্রন্থের ত্রয়োদশ অধ্যায়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা হইল।

বায়োস্কোপের ফিলম্‌স্‌-এর মত ideas-গুলি দেখা দিত মূর্ত—জীবন্ত হ'য়ে—সে কি ভীষণ! যেন একটা উল্কা এসে সামনে দাঁড়ালো, আর তাই দেখে সব বেরুত।"

আর একদিন কথাপ্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন,—"আগে নাচতে নাচতে যখন মত্ততা আসত, তখন যেন মন্দিরে কাঁসর-ঘণ্টা বেজে উঠবার মত টের পেতাম। কখনও কখনও flash of light আসতো, কখনও বাঁশীর মত শব্দ জাগতো, কখনও কখনও চৈতন্যদেব বা কোন মহাপুরুষের কথা ভাবতে ভাবতে তাঁতেই যেন merge ক'রে যেতাম, কখনও কখনও ঘুমের আবেশের মত আসতো, তার মধ্যে যেন স্বপ্ন দেখতাম—ও-অবস্থাটা বেশীক্ষণ থাকতো না।"

সমাধি-অবস্থার অনুভূতি সম্বন্ধে ঠাকুরের অন্য-এক দিনের উক্তি, যথা—

"সে অবস্থা কথায় ঠিক ব্যক্ত করা যায় না। যেমন ক'রেই বলতে চেষ্টা করা যাক, প্রকৃতরূপে তার description দেওয়া যায় না। কথা দিয়ে বলতে গেলেই, সে অবস্থার তুলনায় যেন মিথ্যা বলা হয়। তার ঠিক ঠিক প্রকাশ বাক্যে করা যায় না। তবে সে চরম অবস্থা nothing হ'য়ে যাওয়া নয়, তবে সেটা nothing কি not-nothing তাও ব'লে বোঝান দায়! কেমন জানেন?—যেমন একটা লোকের খুব গাঢ় নিদ্রা হয়েছে, স্বপ্ন-আধি কিছুই দেখে নাই। তারপর ঘুম ভাঙ্গলে, তাকে যদি জিজ্ঞাসা করা যায়,—'কেমন ঘুম হয়েছিল? তখন তুমি ছিলে, কি nothing হ'য়ে গিয়েছিলে?' তাহ'লে সে বলবে কি? সে বলবে—'nothing' হ'য়ে যাই নাই, ছিলাম এবং ঘুম ভালই হইয়াছিল, কারণ, ভাল বলে' যখন একটা স্মৃতির মত আছে, তখন নিশ্চয়ই ভাল বোধ করেছিলাম এবং সে-বোধ আমিই করেছি, কাজেই তখন nothing হ'য়েও যাই নাই। তবে তদবস্থায় ঠিক ঠিক কেমন বোধ হয়েছিল, তার detailed বর্ণনা দেওয়া যায় না',—এও কতকটা সেইরূপ। স্মৃতির হিসাবে, বাক্যে এইমাত্র বলা যায় যে, খুব আনন্দানুভূতি, আনন্দ-স্বরূপ হ'য়ে যাওয়া।"

পুরাকথায় ভাবাবস্থা বা ভাবসমাধি সম্বন্ধে কিছু কিছু উল্লেখ রহিয়াছে। অতীতে দ্বাপর যুগে শ্রীকৃষ্ণ এবং পরবর্তীকালে শ্রীবুদ্ধ, শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভাবসমাধির কথা শুনিতে পাওয়া যায়। ঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের ভাবসমাধি-অবস্থার যে পরিচয় আমরা লাভ করিয়াছি—ভাবসমাধিতে স্থিত থাকাকালে, হৃদ্‌স্পন্দ-বিহীন বহিশ্চেতনা-শূন্য অবস্থায় বহু সংখ্যক বার এবং প্রতিবারেই দীর্ঘ সময় ধরিয়া এরূপ অনর্গলভাবে নানা তত্ত্বপূর্ণ বাণী-নির্গমনের এই ইতিহাস অনন্য-সাধারণ এবং অভূতপূর্ব বলিয়াই মনে করি। নির্বিকল্প সমাধিতে—যেখানে জ্ঞান, জ্ঞেয়, জ্ঞাতা সবই লয় হ'য়ে যায়—নিজের অস্তিত্বের কোন বোধই থাকে না, সে-অবস্থায় কথা-বলা অসম্ভব হইলেও ঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের সমাধি-অবস্থায় তাহা সম্ভব হইয়াছিল। ইহার হেতু কি? "ভাবের চরমে আমি পৃথক থাকিলে কথা বলা যায়"—ঠাকুরের সমাধি-অবস্থায় উচ্চারিত এই মহাভাববাণীর অন্তর্নিহিত

গভীর তত্ত্বটির মধ্যেই উক্তরূপ অসাধারণ অলৌকিক ঘটনার কারণ নিহিত রহিয়াছে, মনে হয়। ঠাকুরের মহাভাববাণীর প্রাচীনতম সংকলনগ্রন্থ (১৩২৫ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত) 'পুণ্যপুঁথি'তে 'সর্বসাধারণের প্রতি নিবেদন'-এ ভাববাণী ও ভাবসমাধি-তত্ত্ব সম্বন্ধে যে আলোকপাত করা হইয়াছে, সবিশেষ প্রণিধানযোগ্য বিবেচনায় আমরা এখানে তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি। যথা—

"সমাধি-অবস্থায় চিত্তবৃত্তি স্থির হয়, চিন্তা থাকে না, সুখ-দুঃখ-বোধ থাকে না, এমন অবস্থা হয়, যাহা বর্ণনা করা যায় না। এই অবস্থা হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইলে এক অপূর্ব আনন্দের স্মৃতি বর্তমান থাকে। সমাধির চরম অবস্থায় উপনীত হইলে মানুষের সকল বিশেষত্ব ও ব্যক্তিত্ব লুপ্ত হয়। এই অবস্থা হইতে মানুষের আর প্রত্যাবৃত্ত হইবার কারণ থাকে না বলিয়া, কেহ আর প্রত্যাবৃত্ত হন না। সত্য-সত্যই এই অবস্থায় উপনীত হইয়া যিনি প্রত্যাবৃত্ত হন তিনি সমগ্র বিশ্বের জীবন, তাঁহার মনই সমগ্র বিশ্বের পশ্চাতে অবস্থিত মন ; তিনিই বিশ্বপতি।

"মানব-সমাজের জটিল সমস্যার মহা পরিবর্তন আনয়নের জন্য যুগ বা মহাযুগের অন্তে, এক এক নির্দিষ্ট পরম-পবিত্র নরাকার-বিশিষ্ট দেহকে অবলম্বন করিয়া মানব-সমাজে সৃষ্টিরহস্যের মূলমন্ত্র, সুখ-দুঃখাদি জীবন-সমস্যার চরম সিদ্ধান্ত এবং সকল প্রশ্নের শেষ মীমাংসা প্রকাশিত হয়।

"সমাধির চরম অবস্থা বা পরম নির্বিকার অবস্থা হইতে উহার নিকটবর্তী সবিকল্পের প্রথম সোপানে অবতীর্ণ হইলে, সেই অবস্থায় মাত্র উচ্চতম সত্যসকল ব্যক্ত হয়।"

দ্বাদশ অধ্যায়

কীর্তনলীলা-বিবরণী

(প্রত্যক্ষদর্শী-বিবৃতি)

ঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের কীর্তনলীলা ও মহাভাবদশার অপূর্ব দৃশ্য যাঁহাদের স্বচক্ষে সন্দর্শন করিবার সৌভাগ্য ঘটিয়াছিল, তন্মধ্যে কতিপয় ব্যক্তির অভিজ্ঞতার বিবরণ যাহা সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি, তাহারই সঙ্কলনে বর্তমান অধ্যায়টি রচিত হইল। বিবৃতি-কয়টি নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল।

১

মনোমোহিনী দেবীর বিবৃতি

[ঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের জননী মনোমোহিনী দেবীর জীবনকথা এই গ্রন্থের তৃতীয় অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে ।]

এক দিনের কথা বলছি। খুব সকাল থেকে কীর্তন আরম্ভ হয়েছে সেদিন। বেলা-বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে কীর্তনের বেগও বেড়েই চললো এবং অবশেষে তা' ভীষণ আকার ধারণ ক'রে বসলো। দলবল নিয়ে অনুকূল তন্ময় হ'য়ে কীর্তনে মেতে আছে, দুপুরের খর-রৌদ্রে তার সর্বাঙ্গ দিয়ে দরদর ধারায় ঘাম ঝরছে। ভাবাবেশে অজ্ঞানের মত হয়ে সে কেবলই নৃত্য ক'রে যাচ্ছে ঘণ্টার পর ঘণ্টা। এই তুমুল কীর্তন কখন যে থামবে, কখন তার স্নান-খাওয়া হবে, এই চিন্তায় অস্থির হ'য়ে আমি প্রমাদ গুণলাম। জানি তো, কীর্তন এইভাবে চলতে থাকলে, অগোণেই নিশ্চিত তার ভাবসমাধি হবে, আর তা'হলে, তার জ্ঞান ফিরে আসতে আরও কত সময় যে লাগবে, তা বলবার নয়। এদিকে রান্না-করা ডাল ভাত তরকারি সব ঠাণ্ডা হ'য়ে যাচ্ছে, বাড়ীশুদ্ধ সকলে অভুক্ত।

কীর্তন থামাবার জন্য আমি কতভাবে কত চেষ্টাই না করলাম, কিন্তু কিছুতেই কিছু হ'লো না। অবশেষে আমার মাথায় এক বুদ্ধি এলো। নফর আর রাধিকাকে ডেকে বললাম,—তোরা এক কাজ কর। আট-দশ কলস জল এনে উঠানে ঢেলে দে। ওরা তাই করল। এতে কীর্তনের আঙ্গিনাটা জলে-কাদায় পিচ্ছিল হ'য়ে গেল, আর তাতে নাচতে গিয়ে কীর্তনীয়ারা বারবার আছাড় পড়তে লাগলো, তাদের ভাবের নেশা কেটে যাওয়ায় কীর্তনের বেগও ক্রমশ কমে আসতে লাগলো। অবশেষে কীর্তন থেমে গেলে অনুকূলেরও আস্তে আস্তে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে এলো। আমি নিশ্চিন্ত হলাম।

২

কিশোরীমোহন দাস বৈষ্ণবের বিবৃতি

[কিশোরীমোহন দাসের সংক্ষিপ্ত জীবন-বৃত্তান্ত গ্রন্থের পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য]

তখন আমার সাধন-ঘরে রোজ প্রায় সময়ই কীর্তন হ'তো। রাত্রিকালেই লোকসমাগম অধিক হ'তো। প্রতিদিন সন্ধ্যাবেলায় ঠাকুর এসে কীর্তন আরম্ভ করতেন এবং কীর্তন শেষ ক'রে গভীর রাত্রে বাড়ী ফিরতেন। কীর্তনে মত্ত হ'য়ে ঠাকুর যে অপূর্ব ভঙ্গিমায় নৃত্য করতেন, তা' ভাষায় বর্ণনা করবার শক্তি কারুর নেই। কীর্তনকালে কোন কোন দিন তাঁর দেহ থেকে উজ্জ্বল জ্যোতিঃ বেরুতো, কখনও কখনও লোমকূপ হ'তে অজস্র রক্ত-বিন্দু ঝরতো, কখনও বা পিচকারীর ধারার মত রক্ত বার হ'তো। কীর্তনদলের লোকসংখ্যার অনুপাতে আমাদের ঘরখানি ছিল নেহাৎই ছোট, কিন্তু কীর্তনের সময় মনে হ'তো, ঘরের আয়তন যেন কত বেড়ে গেছে, আমার বহু লোক তাতে অনায়াসেই উদ্দাম নৃত্যে তুমুলে কীর্তন চালাতাম, কোনও অসুবিধা হ'তো না। কীর্তন-ঘরের পাশেই ছিল কতকগুলো বড় বড় আম গাছ। কীর্তন যখন খুব জমে উঠতো, নামের জোরে গাছের ডালপালাগুলো ঘরের চালের উপর পড়ে' প্রবলবেগে আছাড় খেতো, মনে হ'তো বাইরে যেন কত জোরে ঝড় বইছে। কখনও কখনও চোখে পড়তো, জ্যোতির্ময় পুরুষেরা নেচে নেচে কীর্তনের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। ঠাকুরের ভাবে তন্ময় হ'য়ে যেদিন আমরা কীর্তনে খুব মেতে উঠতাম, তখনই এমন সব অদ্ভুত অদ্ভুত ব্যাপার ঘটতো। সে-সব কথা বললে এখন আর কেউ বিশ্বাস করবে না।

৩

সতীশচন্দ্র গোস্বামীর বিবৃতি

[সতীশচন্দ্রের জন্ম হয় বঙ্গাব্দ ১২৮১ সালের ফাল্গুন মাসে। তাঁহার পৈতৃক নিবাস পাবনার অন্তঃপাতী সালগেড়িয়া গ্রাম। ইঁহারা শ্রীমৎ অদ্বৈতাচার্য মহাপ্রভুর বংশধর। বিদ্যাচর্চায় সতীশচন্দ্র যথেষ্ট পাণ্ডিত্য অর্জন করিয়াছিলেন। তাঁহার পিতৃদেব কৃষ্ণচন্দ্র গোস্বামীও তৎকালে তদঞ্চলে একজন খ্যাতনামা পণ্ডিত ছিলেন। এই গোস্বামী-পরিবার এককালে বিশেষ সঙ্গতিশালী গৃহস্থ ছিলেন। হিমাইতপুর, প্রতাপপুর, মাঝিপাড়া, বারাদি প্রভৃতি বহু গ্রামাঞ্চলে তাঁহাদের অনেক শিষ্য-সেবক ছিলেন। কিশোরীমোহনের বাড়ীতে কীর্তনের আসরে ঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের পুণ্য সান্নিধ্যলাভের পর হইতেই সতীশচন্দ্র তাঁহার প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হন। অতঃপর কিছুকালের মধ্যেই তিনি তাঁহার শ্রীচরণে দীক্ষা গ্রহণ করিয়া ধন্য হন। তদবধি সারাজীবন তিনি ঠাকুরের নিত্যসঙ্গী অন্যতম প্রধান পার্ষদরূপে ইষ্টপ্রতিষ্ঠাকার্যে আত্মোৎসর্গ করিয়া গিয়াছেন। আপন শিষ্যবর্গকে তিনি পূর্বে

কৃষ্ণমন্ত্রেই দীক্ষিত করিতেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের সংস্পর্শে আসিবার পর, তাঁহার নির্দেশে, তিনি তাহাদিগকে ঠাকুর পাগল হরনাথকে অনুসরণ করিতে উপদেশ দিতেন। অতঃপর তিনি তাঁহার সকল শিষ্যকেই স্বীয় সদ্‌গুরু শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের শ্রীচরণে দীক্ষিত করেন। অটুট আদর্শ-নিষ্ঠা, অপূর্ব আত্মত্যাগ ও অক্লান্ত সেবাদানের জন্য তিনি সকলের পরম ভক্তিভাজন ছিলেন। সাধকপ্রবর ইষ্টপ্রাণ সতীশচন্দ্র ১৩৬৯ বঙ্গাব্দের ২০শে বৈশাখ অশীতিপর বৃদ্ধবয়সে বৈদ্যনাথধামে শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীচরণপ্রান্তে সজ্ঞানে সাধনোচিত ধামে গমন করেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর ও তাঁহার সৎসঙ্গ-প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সতীশচন্দ্রের সুদীর্ঘ জীবনের নিবিড় মধুর সম্পর্কের বহু বিচিত্র কাহিনী তদীয় সুযোগ্য পুত্র শ্রীসচ্চিদানন্দ গোস্বামীর রচিত "শ্রীমৎ আচার্য সতীশচন্দ্র গোস্বামী ও সৎসঙ্গ আন্দোলন"-নামক গ্রন্থে উপবর্ণিত হইয়াছে।]

আমি যখন পাবনা সরকারী টোলে পড়ি, তখন ঠাকুর অনুকূলচন্দ্রকে 'পাবনা ইন্‌স্টিটিউসনে' পড়াশোনা করিতে দেখিয়াছি, তারপর আরও অধিক বয়সে একবার কাশীপুরে সখের যাত্রাগানে 'হরি-অন্বেষণ' পালায় শ্রীকৃষ্ণের ভূমিকায় অভিনয় করিবার সময় তাঁহাকে দর্শক-মণ্ডলীর মধ্যে একজন নিবিষ্ট শ্রোতারূপে দেখিয়াছিলাম, মনে পড়ে। তখনও তিনি বালক। তিনি যখন যৌবনে পদার্পণ করিয়াছেন, তখন তাঁহার সহিত আমার সাক্ষাৎ হয় আমার শিষ্য পুলিনচন্দ্র ঘোষের বাড়ীতে মাঝিপাড়া গ্রামে। সে-যাত্রা আমি তীর্থভ্রমণে বাহির হইয়াছিলাম। ঠাকুরের সঙ্গে তখন আমার সামান্য কথাবার্তা হইয়াছিল। তিনি আমার কাছে পাগল হরনাথ ঠাকুর ও কিশোরীমোহনের কীর্তনের খুব প্রশংসা করিয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন,—'ফিরবার পথে কিশোরীর বাড়ীতে তার কীর্তন শুনে যাবেন, তখন আমিও সেখানে থাকব।'

নানা দেশ ঘুরিয়া অনেক দিন পরে বাড়ী আসিবার কালে বাজিতপুর ঘাটে পেঁছিলাম। স্টীমার থেকে নামিবামাত্রই আমার শিষ্য শ্রীমান মুকুন্দচন্দ্র ঘোষের সহিত সাক্ষাৎ হইল। সে আমাকে দেখিয়াই খুব উল্লাসের সঙ্গে বলিল,—"এইমাত্র ঠাকুর আমাকে দৌড়িয়ে পাঠালেন আপনাকে ঘাট থেকে কিশোরীবাবার বাড়ীতে নিয়ে যাবার জন্য। সেখানে কীর্তন হচ্ছে, ঠাকুরও আছেন সেখানে।" তার কথায় আমি স্তম্ভিত হইলাম,—এ কি আশ্চর্য! আমি যে এতদিন পরে আজ এখানে আসিব, ঠাকুর তা জানিলেন কিভাবে।

বিস্মিত অন্তরে মুকুন্দের সঙ্গে কিশোরীমোহনের বাড়ীর দিকে রওনা হইলাম। কিছুদূর যাইয়াই শুনিতে পাইলাম, কীর্তন হইতেছে—

এস গৌরাঙ্গ নদীয়ার চাঁদ হে—
তুমি আসিলে আনন্দ হবে
তুমি এস হে।

তখন সন্ধ্যার প্রাক্কাল, অন্ধকার হইয়া আসিয়াছে। ঘরে তখনও আলো

জ্বালানো হয় নাই। কিশোরীমোহনের আঙ্গিনায় উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, ঠাকুর কীর্তন-ঘরে বসিয়া আছেন, তাঁহার অপরূপ রূপে ঘরখানি আলোকিত হইয়া আছে। আমাকে দেখিয়াই ঠাকুর তাড়াতাড়ি উঠিয়া আসিলেন এবং আমাকে হাত ধরিয়া ঘরে লইয়া গিয়া তাঁহার পাশে নিয়া বসিলেন। ইতিমধ্যে আর একখানি সঙ্গীত আরম্ভ হইল। কিশোরীমোহন গান ধরিলেন,—

শ্যামগরবে গরবিণী রাধা রাধা
রাধে রাধে আমার
তুমি আমার প্রেমের গুরু।

নিবিষ্টমনে কীর্তন শুনিতে লাগিলাম। কিছুক্ষণ পর ঠাকুর আমাকে লইয়া ঘরের বাহিরে গেলেন। কীর্তনের দলটিও তখন বাহিরে যাইয়া কীর্তন করিতে লাগিল। এই সময় ঠাকুর একবার আমাকে কীর্তনের মধ্যে ঠেলিয়া দিলেন, নিজেও কীর্তনে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন এবং আমার হাত ধরিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। সে কি অপূর্ব নৃত্য! এদিকে কিশোরীমোহনও ঊর্ধ্ববাহু হইয়া তাণ্ডব নৃত্য আরম্ভ করিলেন। তুমুলবেগে কীর্তন চলিতে লাগিল। ভাববিহ্বল হইয়া অবিরাম নৃত্য করিতে করিতে ঠাকুর অবশেষে বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া মাটির উপর পড়িয়া গেলেন। ভক্তমণ্ডলী তখন তাঁহার অবশ দেহখানি ধরাধরি করিয়া ঘরের মেজেতে নিয়া শোয়াইয়া দিলেন।

দেখিলাম, তাঁহার শরীরে জীবনের চিহ্নমাত্র নাই। নিশ্চল অসাড় হইয়া তিনি পড়িয়া আছেন। তাঁহার ভাবসমাধি হইয়াছে বুঝিতে পারিয়া ভক্তগণ তাঁহার চৈতন্য-সম্পাদনের জন্য তন্ময়চিত্তে কীর্তন করিতে লাগিলেন।

এইরূপ সংজ্ঞাশূন্য অবস্থায় কিছুক্ষণ মৃতের মত পড়িয়া থাকার পর, ঠাকুরের ডান পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলিটি হঠাৎ থর্ থর্ করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। ক্রমে ক্রমে হাত-পায়ের চারিটি বৃদ্ধাঙ্গুলিই দ্রুতবেগে কাঁপিতে লাগিল। এইরূপ কম্পন কিছুকাল চলিবার পর তাহা আস্তে আস্তে কমিয়া একেবারেই থামিয়া গেল। এইবার তাঁহার দেহে নানা প্রকারের আসনপ্রক্রিয়া চলিতে লাগিল। একের পর এক করিয়া প্রায় শতাধিক রকমের আসন হইল। অঙ্গপ্রত্যঙ্গের নানারূপ অপূর্ব বিন্যাসে কত জাতীয় শ্রমসাধ্য আসনই যে তিনি করিলেন, তাহা বলিবার নয়। বলিতে কি, সে এক অত্যদ্ভুত ব্যাপার! আসনগুলি হওয়ার পরই ঠাকুরের দেহখানা আবার পূর্বের মত নিথর নিশ্চল অবস্থায় মাটির উপর পড়িয়া রহিল এবং এইরূপ মৃতবৎ অবস্থায় তাঁহার মুখ হইতে গভীর ভাবপূর্ণ উচ্চতত্ত্বের অসংখ্য বাণী অনবরত উচ্চারিত হইতে লাগিল। এইরূপে অনেকক্ষণ ধরিয়া বাণী বাহির হওয়ার পর তাঁহার বাহ্যচেতনাহীন দেহে ক্রমশ প্রাণের স্পন্দন দেখা দিতে লাগিল এবং কিছুকাল মধ্যেই তিনি অনেকটা আত্ম-সম্বিৎ ফিরিয়া পাইলেন। অবশেষে, —'জল—জল—আমি জল খাব, গোঁসাইর হাতে পদ্মার জল খাব'—বলিয়া উচ্চকণ্ঠে চিৎকার করিতে লাগিলেন। তাঁহার কথা শুনিবামাত্র আমি দৌড়িয়া

গিয়া পদ্মায় ডুব দিয়া এক ঘটি জল আনিয়া দিলাম। তিনি প্রাণ ভরিয়া জল পান করিয়া কিঞ্চিৎ সুস্থ হইলেন। ধীরে ধীরে তাঁহার স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়া আসিল, তিনি সহজভাবে কথাবার্তা বলিতে লাগিলেন।

সংজ্ঞাহারা ব্যক্তির মুখ দিয়া এইভাবে বাণী বাহির হওয়ার এরূপ অত্যাশ্চর্য ব্যাপার ইতঃপূর্বে আমি আর কোনদিন প্রত্যক্ষ করি নাই; তবে, অতঃপর আরও বহুবার ঠাকুরের ভাবাবস্থার এরূপ অপূর্ব দৃশ্য স্বচক্ষে দেখিবার সৌভাগ্য আমার ঘটিয়াছিল।

৪
মুকুন্দচন্দ্র ঘোষের বিবৃতি

[মুকুন্দচন্দ্র ঘোষের পৈতৃক নিবাস ফরিদপুর জিলার অন্তর্গত গোয়ালন্দ মহকুমার অধীন সেনগ্রাম। ইঁহার পিতার নাম মহিমচন্দ্র ঘোষ। মুকুন্দচন্দ্র হিমাইতপুরের পার্শ্ববর্তী মাঝিপাড়া গ্রামের পুলিনচন্দ্র ঘোষের ভাগিনেয়। তিনি শৈশবাবধি মাতুলালয়েই লালিত-পালিত ও বর্ধিত হন। ছোটবেলা হইতেই তাঁহার শ্রীশ্রীঠাকুরের সঙ্গলাভের সৌভাগ্য ঘটে। বার-চৌদ্দ বৎসর বয়সে তিনি তাঁহার কীর্তনের দলে যোগদান করেন ও তাঁহারে শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া ধন্য হন। তৎকালে শ্রীশ্রীঠাকুরের সহিত তিনি বাংলা দেশের নানাস্থানে যাইয়া কীর্তনের মাধ্যমে সৎ-নাম প্রচার করিয়াছিলেন। বর্তমানে তিনি নদীয়া জিলার অধীন শিবনিবাস গ্রামে সপরিবারে বাস করিতেছেন।]

কত দিনের কত কথা! ছোটবেলা থেকে ঠাকুরের সঙ্গে কত কীর্তন করেছি, তাঁর ভাবসমাধিও কত দেখেছি। এতদিনে অনেক-কিছু ভুলে গিয়েছি। অতীতের স্মৃতি থেকে যতটুকু পারি বলার চেষ্টা করছি মাত্র।

একদিনের কথা। তরণী, কোকন, যদু পাল, হারাণ মিস্ত্রী ও আমি পদ্মার পারে ব'সে হাততালি দিয়ে হরিনাম করছি, এমন সময় ঠাকুর ও ডাক্তার কিশোরী-মোহন আমাদের কাছে এসে দাঁড়ালেন। তখন ঠাকুর বললেন,—"হাঁ রে, তোরা তো বেশ নাম-কীর্তন করছিস! আচ্ছা, আমি যদি গান তৈরী ক'রে দিই, তবে তোরা সুর দিয়ে গাইতে পারবি তো?" আমরা বল্লাম—"হাঁ, আমাদের মত ক'রে সুর দিয়ে গাইতে পারবো।" ঠাকুর তখন বল্লেন,—"আচ্ছা, কালই আমি তোদের জন্য গান লিখে আনবো।" পরদিন বিকালবেলা সেই রাস্তা দিয়ে যাবার সময় ঠাকুর বল্লেন,—"এই নে, তোদের জন্য গান লিখে এনেছি, সুর ক'রে গাইবি।" আমরা তখন খুব আনন্দের সঙ্গে সেই লেখাটা নিয়ে গেলাম এবং দুই-তিন দিনে মুখস্থ ক'রে সুর দিয়ে গাইতে লাগলাম।

তারপর একদিন নদীর ধারে ঐ রকম হাততালি দিয়ে সেই গান গাইছি, এমন সময় ঠাকুর কিশোরীমোহনকে সঙ্গে নিয়ে সেখানে এসে হাজির হ'লেন ও আমাদের গান শুনে বল্লেন,—"বাঃ, বেশ গেয়েছিস তো! বেশ সুন্দর হয়েছে। বিনা

যন্ত্রেই যেমন গেয়েছিস, তাতেই প্রাণ মুগ্ধ হয়ে গেছে। আচ্ছা, আমি আরও দু-চারটা গান তৈরী করে দিচ্ছি, হয়ত কালই দেব, তোরা এই রকম সুরে ক'রে গাইবি।" তারপর বল্লেন,—"দ্যাখ, শুধু হাততালি দিয়ে গান গাইলে গান তেমন জমে না। তোরা কিছু যন্ত্র সংগ্রহ কর্।" আমি তখন বল্লাম,—"কি যন্ত্র সংগ্রহ করব ?" ঠাকুর বল্লেন,—"তোরা যদি আর কোন যন্ত্র সংগ্রহ করতে না পারিস, তবে দেখিস তো লাউ-এর খোল যোগাড় করতে পারিস কিনা। লাউ-এর খোল দিয়ে একতারা তৈরী ক'রে নে, একতারা খুব ভাল জিনিষ। এতে সেতারের মত অতি সুন্দর সুর হয়।" তাঁর কথায় আমরা তাড়াতাড়ি লাউ-এর খোল যোগাড় ক'রে প্রত্যেকে এক একটি একতারা তৈয়ার ক'রে নিলাম। তখন থেকে আমরা একতারা বাজিয়ে আনন্দে হরিনাম কীর্তন করতাম।

আমরা যখন এইভাবে কীর্তন করতাম, রোজ ঠাকুর এসে দাঁড়িয়ে থেকে তা শুনতেন আর খুব খুসী হ'য়ে বলতেন—"তোদের গান শুনলে আমি মোহিত হ'য়ে যাই, কি সুন্দর গানই না করিস তোরা। তোরা আরও কিছু যন্ত্র সংগ্রহ কর্।" আমরা জিজ্ঞাসা করলাম,—"আর কি যন্ত্র সংগ্রহ করব ?" তখন ঠাকুর বল্লেন,—"তোরা গোটা-দুই খোল যোগাড় কর। দুইটা যদি না পারিস, একটার দাম আমি দিচ্ছি।" পরদিন ঠাকুর আমাদের হাতে একটি খোলের দাম দিয়ে বল্লেন,—"তোরা শিকারপুর থেকে খোল কিনে নিয়ে আয়।" আমরা নিজেরাও কিছু পয়সা-কড়ি যোগাড় ক'রে একদিন শিকারপুর গিয়ে দু'-খানা খোল কিনে নিয়ে এলাম। তখন থেকে আমরা খোল, করতাল ও একতারা বাজিয়ে কীর্তন করতাম।

তারপর একদিন ঠাকুর আমাদের ডেকে বল্লেন,—"এখন থেকে তোরা রোজ পল্লীর রাস্তা ধ'রে কীর্তন করতে করতে যাবি, আর লোকের বাড়ী গিয়ে বলবি,—"ওগো, তোমরা হরিলুট দাও না, আমরা তোমাদের বাড়ীতে কীর্তন করব।" ঠাকুরের কথামত আমরা নদীর ধার দিয়ে চলতে চলতে গান করতাম এবং পাড়া-পড়শীকে তাদের বাড়ীতে কীর্তন দেওয়ার জন্য অনুরোধ করতাম। সবাই আমাদের অনুরোধে খুসী হ'য়ে রাজী হতেন, দুই আনার বাতাসা আমাদের হাতে দিয়ে বাড়ীর লোকেরা ঘুমিয়ে পড়তেন, আর আমরা সন্ধ্যা হ'তে দুপুর রাত্রি পর্যন্ত সেখানে মনের আনন্দে তুমুল কীর্তন করতাম এবং কীর্তনের পর লুটের প্রসাদ পেয়ে বাড়ী ফিরতাম।

এইভাবে কীর্তন করতে করতে কীর্তনের জন্য আমাদের আগ্রহ ও আবেগ ক্রমশই বেড়ে যেতে লাগলো। আমাদের মনে হ'তো, সারা দিন-রাত কীর্তন করি, কীর্তন ছাড়া এক দণ্ডও থাকতে মন চাইত না। ঠাকুরের কথামত রোজই সন্ধ্যাবেলায় কোন নির্জন স্থানে কীর্তন আরম্ভ ক'রে দিতাম। আমরা সবাই নিজে থেকেই এসে কীর্তনের স্থানে জড় হ'তাম। কারুর কাউকে ডেকে আনতে হ'তো না। একদিন আমরা সবাই মিলে কীর্তন করছি, এমন সময় ঠাকুর ও

কিশোরীমোহন এসে আমাদের কীর্তনে যোগ দিলেন। আমরা সবাই মিলে অনেক রাত ধ'রে তুমুলবেগে কীর্তন করলাম। সেদিন আমাদের কীর্তন শুনে আশে-পাশের বহু লোক সেখানে এসে উপস্থিত হ'লেন। পাড়ার লোকেরা সেই দিন থেকে জানতে পারলেন, ঠাকুর আমাদের নিয়ে একটা কীর্তনের দল করেছেন।

এই ঘটনার দুই এক দিন পর ঠাকুর একদিন বললেন,—"হাঁ রে মুকুন্দ, আমি তোদের মধ্য থেকে কয়েকজনকে বেছে নিতে চাই। তোরা চার-পাঁচ জন মিলে বিশোরী ডাক্তারের ডিস্‌পেন্‌সারী-ঘরে দরজা বন্ধ ক'রে রোজই জোর কীর্তন করবি, আর অপর সকলে এখন যেমন বাইরে কীর্তন চালাচ্ছিল তাই ক'রে যাবি। এক এক দলের কীর্তনের জন্য এক একটা খোল থাকবে। কেমন, রাজী আছিস তো?" আমরা সকলে তখন একবাক্যে বল্লাম,—"হাঁ, তাই হবে, এখন থেকে আমরা তাই করবো।"

তখন থেকে আমরা প্রায় প্রত্যহই কিশোরীমোহনের ডিস্‌পেন্‌সারী-ঘরের দরজা বন্ধ ক'রে তুমুলে কীর্তন করতাম। ঠাকুরও রোজই এসে তাতে যোগ দিতেন। কীর্তন করতে করতে ঠাকুরের ভাবদশা ঘটত। এই অবস্থায় তিনি অজ্ঞান হ'য়ে মাটির উপর পড়ে যেতেন। আমরা তখন ছেলে মানুষ, 'ভাব' হওয়ার কথা বেশী কিছু বুঝতাম না। তবে এ কথা শোনা ছিল যে, নাম-কীর্তন করতে করতে যদি কারুর ভাব হয়, তখন কীর্তন ছেড়ে দিলে সে মানুষ নাকি বাঁচে না। কাজেই ঠাকুরের ভাব হওয়া দেখলেই আমরা তাঁর চারিদিকে তুমুলবেগে কীর্তন করতে থাকতাম। এইভাবে দুই ঘণ্টা আড়াই ঘণ্টা জোর কীর্তনের পর ঠাকুরের জ্ঞান ফিরে আসতো। একদিন তাঁর এইরূপ ভাবদশা হ'লে, এটা তাঁর সত্যিকারের ভাব কিনা তাই পরীক্ষা করবার জন্য আমি দিয়াশলাইয়ের কাঠি জ্বালিয়ে বেশ কিছুক্ষণ তাঁর একটা আঙ্গুলে রেখেছিলাম। এতে সঙ্গে সঙ্গেই সে আঙ্গুলটায় ফোস্কা প'ড়ে যায়। কিন্তু আশ্চর্যের কথা, এজন্য ঠাকুর একবারও একটু উঃ আঃ ক'রলেন না। তারপর জ্ঞান ফিরে এলে, তিনি আমাকে ডেকে বল্লেন,—"হাঁ রে মুকুন্দ, আমার এই আঙ্গুলটায় এমন জ্বালা করছে কেন রে? দ্যাখ দেখি কি হয়েছে?" আমি তখন তাঁর কাছে নিজের দুষ্কর্মের কথা সব খুলে বল্লাম। ঠাকুর হাসতে হাসতে বলতে লাগলেন,—'তুই তো শালা বদ্ধ পাগল, তুই জীয়ন্ত মানুষের গায় আগুন ধরিয়ে দিয়ে পরীক্ষা করিস! খবরদার, বেকুব, এমন কাজ আর করিস না কিন্তু!"

আর একদিন কীর্তন আরম্ভ হয়েছে। তিন-চার ঘণ্টা ধ'রে তুমুল কীর্তন চলবার পর ঠাকুর ভাবাবেশে মাটির উপর এলিয়ে পড়লেন। এই সময় তাঁর শরীরে নানা রকমের আসন হ'তে দেখা গেল। আসনগুলির নাম জানি না, আর কোনদিন এসব আসন দেখিও নাই। আসন হওয়ার সময় তাঁর শরীরের অবস্থা দেখে মনে হ'ল, তাতে যেন কোন হাড় নেই। আমরা তখন বলাবলি করতে লাগলাম,—"ঠাকুরের কি এই সব আসনের অভ্যাস পূর্বেও ছিল!"

আমাদের কথা শুনে কিশোরীবাবা বললেন,—"না রে, তাঁকে তো কোন দিনই কোন আসন করতে দেখিনি, এই তো প্রথম দেখছি।" আসন হবার পর ঠাকুরের মুখ দিয়ে সেদিন কথা বেরুল। কথাগুলো বুঝতে পারিনি। কারণ, আমরা ছেলে মানুষ, লেখাপড়াও জানিনি। আর অজ্ঞান অবস্থায় মানুষ কথা বলতে পারে দেখে খুবই অবাক হলাম।—যাহোক ঐ সময় আমরা তালে তালে কীর্তন করতে লাগলাম, তাতে ধীরে ধীরে ঠাকুরের জ্ঞান ফিরে এলো। তারপর সহজ অবস্থায় তিনি আমাদের ডেকে বল্লেন,—"দ্যাখ, তোরা জোর কীর্তন করবি, কীর্তন ক'রে যা, কীর্তন করলেই সব হবে, কীর্তন করলে আর কিছুরই দরকার হয় না। তোরা কীর্তন ছাড়িস নে, কীর্তন ছাড়লেই অন্ধার হ'য়ে যাবি। যত পারিস কীর্তন করবি।"

আর একদিন আমরা সকলে মিলে কীর্তন আরম্ভ করেছি, এমন সময় ঠাকুর এসে দরজায় ধাক্কা দিয়ে বল্লেন,—"ওরে, দরজা খোল, দরজা খোল।" দরজা খোলা হ'লো। ঠাকুর কীর্তনে নেমে খুব নাচতে লাগলেন। সেদিন দুই তিন ঘণ্টা সমান তালে খুব জোর কীর্তন চলল। কীর্তনের মধ্যে ঠাকুর ভাবে অজ্ঞান হ'য়ে পড়লেন।

আর একদিনও কীর্তন হচ্ছে। ঠাকুর ও কিশোরীমোহন দু'জনেই এসে কীর্তনে যোগ দিলেন। সেদিনও কয়েক ঘণ্টা তুমুল কীর্তনের পর ঠাকুরের ভাবদশায় তাঁর শ্রীমুখ হ'তে কিছু কিছু বাণী বের হলো।

ঠাকুরকে নিয়ে আমাদের এইভাবে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস কত কীর্তন চলেছে। ঠাকুর আমাদের কীর্তনের জন্য সব সময় কত উৎসাহ ও উপদেশ দিতেন। সে সব কত কথা এখনও একটু একটু মনে পড়ে। তিনি বলতেন,—"দ্যাখ, তোরা যে কীর্তন করবি, তা কিন্তু মনে প্রাণে করবি। মনে-প্রাণে কীর্তন না করলে তাঁকে পাওয়া যায় না। ডাকার মত ডাকতে না পারলে সে কখনও আসে না·········।"

ঠাকুরের সঙ্গে কীর্তনে মসগুল থেকে এইভাবে আমাদের দিন যাচ্ছে। রোজ কীর্তন করি, মাঝে মাঝে তাঁর ভাব হ'তে দেখি, কোন কোন দিন বাণীও শুনি। একদিন সকালবেলা উকীল বৃন্দাবনচন্দ্র অধিকারী বি-এল্ মহাশয় কিশোরীমোহনের বাড়ীর কীর্তন-ঘরের সম্মুখে পদ্মার ধার দিয়ে পাবনার কোর্টে যাচ্ছিলেন। তিনি একজন নিষ্ঠাবান বৈষ্ণব ও পরম ধার্মিক লোক। সবাই তাঁকে খুব শ্রদ্ধা করেন। সেদিন তাঁকে পেয়ে আমরা কয়েক জনে তাঁর কাছে ঠাকুরের কীর্তনের সব কথা বিস্তারিত ক'রে বল্লাম। তিনি শুনে অবাক হ'য়ে বল্লেন,—"অনুকূলের মধ্যে নিশ্চয়ই কোন মহান আত্মার—খুব সম্ভব মহাপ্রভুর—আবির্ভাব হয়েছে। এখন থেকে তোমরা একখানা খাতা ক'রে, তার ভাবাবস্থার বাণীগুলো সব লিখে রাখবে। এই সকল পরম-মঙ্গল বাণীর একটিও যেন বাদ না যায়। খবরদার, ভুলে যেও না।" ব্যাপারটা যে খুবই গুরুত্বপূর্ণ, তখন থেকে আমাদের এবং ক্রমে

ক্রমে আরও অনেকের নজরে পড়লো এবং বাণীগুলো টুকে রাখবার ব্যবস্থা হ'তে লাগলো।

কিশোরীমোহনের বাড়ীতে বেশ কিছুকাল একটানা কীর্তন চলবার পর আমরা ঠাকুরের নির্দেশে কুঞ্জলাল ঘোষের বাড়ীতে এক নাগাড়ে কয়েক দিন কীর্তন চালাই। গ্রামের মধ্যে সকলের সামনে ঠাকুরের সদল-বলে ইহাই সর্বপ্রথম কীর্তন। ইহার কয়েক দিন পরে আমরা ঠাকুরের সঙ্গে কীর্তনের দল নিয়ে দোগাছির বঙ্কু বসাকের বাড়ীতে দুই-তিন দিন কীর্তন করি, তৎপর ঐ গ্রামের শিবদাস পাটনীর বাড়ীতেও কয়েক দিন দিবারাত্র তুমুল কীর্তন হয়। এই সকল কীর্তনে গ্রামের বহু লোক এসে যোগ দিত। ঠাকুর তাঁর কীর্তনের দল নিয়ে নাম-প্রচারে বাহির হয়েছেন, একথা তখন চারিদিকে রাষ্ট্র হ'য়ে পড়ল। মহারাজ অনন্তনাথ, কিশোরীমোহন, সতীশ গোস্বামী, তরণী, কোকন, যদু পাল প্রভৃতি আমরা পনর-ষোল জন তখন এই দলে ছিলাম।

৫

কৃষ্ণচন্দ্র দাসের বিবৃতি

[কৃষ্ণচন্দ্র দাসের পৈতৃক নিবাস নদীয়া জিলার অন্তর্গত কুমারখালীর অন্তঃপাতী দয়ারামপুর গ্রাম। ইনি জাতিতে বৈরাগী। তাঁহার পিতা ধর্মপ্রাণ প্রহ্লাদচন্দ্র 'হুলি'-গানের সুকবি এবং একজন অভিজ্ঞ কবিরাজ ছিলেন। শৈশবে মাতাপিতার মৃত্যু ঘটায় কৃষ্ণচন্দ্রের বাল্য ও কৈশোর চরম দুর্দশায় অতিবাহিত হয়। পনর-ষোল বৎসর বয়সে কুষ্টিয়া সহরে তাঁহার সর্বপ্রথম শ্রীশ্রীঠাকুরের দর্শন লাভ ঘটে। অতঃপর তিনি হিমাইতপুর আশ্রমে গিয়া তাঁহার শ্রীচরণে দীক্ষাগ্রহণ করিয়া ধন্য হন। শ্রীশ্রীঠাকুরের কীর্তন-দলের অন্যতম প্রধান সঙ্গীরূপে তিনি বহুকাল নানাস্থানে পরিভ্রমণ করিয়া সৎ-নাম প্রচার করেন। 'ভুলের ঝুলি', 'গানের বই', 'আর্যরীতি' কয়েকখানা পুস্তিকাও তিনি রচনা করিয়াছেন। বর্তমানে তিনি জলপাইগুড়ি জিলার আলিপুরদুয়ারে শ্রীশ্রীঠাকুরের ভাবধারার প্রচারকার্যে ব্রতী আছেন।]

সে-যুগে আশ্রমের কাজের মধ্যে কীর্তনই ছিল প্রধান। কীর্তনের দলে গোড়ার দিকে আমরা পনর-ষোল জন লোক ছিলাম। অনন্ত মহারাজ, ডাক্তার কিশোরীমোহন ও সতীশ গোস্বামী—এই তিন জন ছিলেন আমাদের দলের নেতা। ঠাকুরের নির্দেশে এঁরাই আমাদের পরিচালনা করতেন। কখন কোথায় কিভাবে কীর্তন করতে হবে, এঁরা ব'লে দিতেন। আমাদের প্রত্যেকের ব্যক্তিগত আচার-আচরণের প্রতিও এঁরা নজর রাখতেন। জপ-ধ্যানের সময় এঁরা সব সময় উপস্থিত থাকতেন এবং কেউ একটু অন্যমনস্ক হ'লে তাকে সজাগ ক'রে দিতেন। ঠাকুরের নির্দেশমত আমাদের রোজ রাত্রি ৩টায় ঘুম থেকে উঠে ধ্যানে বসতে হ'ত। ঘণ্টা-দুই ধ্যানের পর আমাদের স্নান করিয়ে আতপ চাউলের ফ্যানাভাত আলুসিদ্ধ দিয়ে

খেতে দেওয়া হ'তো। খাবার খেয়েই কোকনদা কাঁধে ঢাক নিয়ে উঠে পড়তো। তরণীদা ঝাঁঝ, মধুদা কাঁসর, নফরদা বিউগল্ এবং যদুদা, মুকুন্দদা প্রভৃতি আমরা সবাই এক এক জোড়া করতাল নিয়ে, 'নিতাই এনেছে নাম, হরিবোল হরিবোল' গাইতে গাইতে কীর্তন শুরু ক'রে দিতাম এবং ঠাকুরকে প্রণাম ক'রে আশীর্বাদ নিয়ে দল-বদ্ধ হ'য়ে বেরিয়ে পড়তাম। দলপতিরা আমাদের আগে আগে চলতেন, আমরা তাঁদের পিছনে কখনও হেঁটে হেঁটে কখনও দৌড়িয়ে যেতাম। এমনি ভাববিভোর হ'য়ে আমরা তখন চলতাম যে, পথের মধ্যে খানা-ডোবা কিছু পড়লে তা' মোটেই ভ্রূক্ষেপ করতাম না। রাস্তার ধারে ধনী লোকের যে-সব বাড়ী দেখতাম, সেখানে না গিয়ে আমরা সাধারণত যাদের ঘরে একখানা মাত্র চাল, এমন সব গরীবের বাড়ীতে গিয়ে বিউগল বাজিয়ে হাজির হতাম, আর তাণ্ডব নৃত্যে কীর্তন জুড়ে দিতাম। তুমুল কীর্তনের বিপুল শব্দ শুনে গ্রামবাসীরা দলে দলে ছুটে আসত। সকলে মিলে সেখানে কিছু সময় কীর্তন করবার পর আমরা অন্য গ্রামের দিকে দৌড়াতাম। কীর্তন নিয়ে ছুটতে ছুটতে কোন-কোন দিন এমন হ'তো যে, মাঠের মধ্যে কোন অড়হর ক্ষেতেই হয়তো ঘণ্টা-দুই কেটে গেল। এরূপ উদ্দাম কীর্তন আমাদের সারাদিনই চলতো। কীর্তনের দল নিয়ে এইভাবে প্রতিরোজ পাঁচ-ছয় খানা গ্রাম ঘুরে আমরা বেলা-শেষে আশ্রমে ফিরে আসতাম।

যে-সব গ্রামে আমরা দিনের বেলায় কীর্তন ক'রে আসতাম, সন্ধ্যা হ'তে না হ'তেই সেখানকার লোকেরা আশ্রমে এসে জমায়েত হ'তো। তখন তাদের নিয়ে সভা বসতো। ঐ সভায় দলপতিরা সবাইকে সদ্‌গ্রন্থ পাঠ ও ব্যাখ্যা ক'রে শুনাতেন এবং শ্রীশ্রীঠাকুরের পবিত্র ভাবধারার কথা আলোচনা করতেন। তারপর রাত্রি ৮টা ৮॥ টায় কীর্তন আরম্ভ হ'তো। আমরা সবাই তাড়াতাড়ি রাত্রির আহারাদি সারা ক'রে কীর্তনে এসে যোগ দিতাম। গভীর রাত্রি পর্যন্ত তুমুলবেগে সে কীর্তন চলতো। কীর্তন যখন খুব জমে উঠতো, ঠাকুর এসে কীর্তনে ঝাঁপিয়ে পড়তেন আর তন্ময় হ'য়ে অপূর্ব ভঙ্গীতে নাচতে থাকতেন। এই সময় তিনি কখনও কখনও আত্মহারা হ'য়ে সবেগে ছুটাছুটি করতেন। এই অবস্থায় কঠিন কোন-কিছুর উপর পড়ে গিয়ে পাছে তিনি আঘাত পান, সেজন্য দলপতিরা হাত ধরাধরি ক'রে বেষ্টনী ক'রে তাঁকে আটকে রাখতেন। কীর্তনের সময় সমবেত লোকদের মনোভাব বুঝে দলপতিরা কখনও ঢিমে কখনও বা জোরে কীর্তন চালাতেন।

তুমুল কীর্তনের মধ্যে কোন-কোন দিন ঠাকুর ভাবাবেশে মাটির উপর প'ড়ে যেতেন। এই অবস্থায় তাঁর নানা রকমের আসন হ'তো। কখনও কখনও তিনি মাথাটি মাটির উপর এবং সবটা শরীর শূন্যে রেখে দশ-পনর মিনিটকাল কাটাতেন। এরূপ আরও কত রকমের কঠিন কঠিন আসনই যে হতো তা বলবার নয়। ঐ সময় মনে হ'তো, তাঁর শরীরে যেন কোন হাড় নেই। আসন হবার পরই

তাঁর সর্বাঙ্গ কাঁপতে থাকতো, তলপেট থেকে আরম্ভ ক'রে সর্বশরীর ক্রমশ সংকুচিত হ'য়ে উপরের দিকে উঠতে থাকতো, কাঁধের শেষ ভাগ ও কপাল প্রায় এক ইঞ্চি পরিমাণ ফুলে উঠতো, মাথার চুলগুলি খাড়া হ'য়ে দাঁড়িয়ে থাকতো, চোখ-দু'টি বুজে যেত, কপালখানা আগুনের মত উজ্জ্বল হ'তো, আর মুখখানা ফুটন্ত পদ্মফুলের মত সুন্দর দেখাতো। কিছু সময় পরে তাঁর দেহখানা নিশ্চল নিস্পন্দ সংজ্ঞাহীন অবস্থায় মাটির উপর মরার মত প'ড়ে থাকত। আমরা তখন তাঁর দেহে জ্ঞান ফিরিয়ে আনার উদ্দেশ্যে একমনে অতি মৃদুস্বরে ব্রজবুলি কীর্তন করতে থাকতাম। উক্তরূপ সমাধির অবস্থায় তাঁর দেহে আর একটি লক্ষণ প্রকাশ পেতো,—তাঁর ডান পায়ের বুড়া আঙ্গুলটা কিছুক্ষণ কেঁপে উঠে থেমে যেতো এবং তখন তাঁর মুখ হ'তে অনর্গল বাণী বেরুতে! দলপতিরা সেগুলি যত্নের সঙ্গে লিখে নিতেন। এই সব বাণী নানা ভাষায় বেরুত। যে ভাষা কেউ বুঝতেন না, সে-সব বাণী লেখা হ'তো না। বাণীতে কোন-কোন দিন ঠাকুর কারও নাম ধ'রে তার মনের নানা প্রশ্নের উত্তর দিতেন। কোন কোন দিনের বাণী শুনে মনে হ'তো, তিনি যেন কত স্থানের কত দৃশ্য স্বচক্ষে দেখে তারই বর্ণনা দিচ্ছেন। একদিনের কথা স্মরণ থেকে কিছুটা বলছি—যেমন—'সব গেল! কোথায় গেল? কোথায়? এ কি ভীষণ অন্ধকার, সব গেল, ডুবে যাচ্ছে, সব গেল! ·· কি সুন্দর! চির বসন্ত! বেশ! এমন আনন্দ, এমন স্ফূর্তি, এমন প্রাণ-মাতানো রব কেউ শোনেনি। আঁধারের লেশ নাই। আলোর মানুষ, আলোর শব্দ, আলোর বাতাস, চাঁদের আলো ফিক্ ফিক্ ক'রে হাসছে, ঐ দেখ আলোর সরোবর, আলোর পাখীগুলি কেমন উড়ে বেড়াচ্ছে, বাঁশী......। আমি ওখানে যতটুকু এখানেও ততটুকু। ওখান থেকে আমায় নিয়ে আয় তো। ....'

এই প্রসঙ্গে দুঃখের সঙ্গে একটি কথা না ব'লে পারছি না। সে-কালের সেই কীর্তনের আসরে দুষ্ট-প্রকৃতির লোকেরাও বহু এসে জুটতো। ঠাকুরের এই 'সমাধি' সত্যিকারের কিনা, তাই পরীক্ষা করবার জন্য তারা কেউ কেউ কয়লার আগুন ধরিয়ে তা তাঁর উরুতে চেপে ধরেছে, কেউ-বা তাঁর শরীরে সূঁচ ঢুকিয়ে দিয়েছে।* কিন্তু বড়ই আশ্চর্যের বিষয়, কোন-কিছুতেই তাঁতে সাড়া-বোধের কোন লক্ষণ প্রকাশ পেতো না।

সমাধিভঙ্গের পর ঠাকুর নেশাখোরের মত উঠে বসতেন। তখন অন্তরঙ্গ ভক্তেরা তাঁর সেবাশুশ্রূষায় লেগে পড়তেন—কেউ তাঁর শরীরের ধুলামাটি ঝেড়ে পরিষ্কার ক'রে দিতেন, কেউ পাখার বাতাস করতেন, কেউ বা তাঁর গায় হাত বুলিয়ে দিতেন। বিশ্রামের পর ঠাকুর যখন সুস্থ হ'য়ে তামাক খেতে খেতে সহজ অবস্থায়

* এইরূপ নৃশংস ব্যাপার কিছুকাল ঘটিবার পর অন্তরঙ্গদের বিশেষ যত্নানুসারে সমাধি-অবস্থায় কাহাকেও শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীঅঙ্গ স্পর্শ করিতে দেওয়া হইত না।

কথাবার্তা শুরু করতেন, আমরা অনেক মূর্খ তাঁর কাছে গিয়ে বলতাম,—"ঠাকুর, আপনাকে এখন চিনে ফেলেছি। আপনি তো বাণীতে বলেছেন যে, আপনি পরব্রহ্ম, পরমাত্মা। আপনাকে আর আমরা ছাড়ব না, আমাদের উদ্ধার ক'রে দিতে হবে।" আমাদের কথা শুনে ঠাকুর হাসতে হাসতে বলতেন,—"দূর্ শালা, আমি কি এমন কথা বলতে পারি? তবে পরব্রহ্ম পরমাত্মা লাভে উপায় যদি তোরা জানতে চাস্, তবে আমি তোদের তা ব'লে দিতে পারি। আমার কথা শুনে চললে তোরা যা চাস্ তাই পাবি।"

৬

দুর্গানাথ সান্ন্যালের বিস্মৃতি

[দুর্গানাথ সান্ন্যাল ১২৮৮ বঙ্গাব্দের ১লা বৈশাখ পাবনা সহরের অন্তঃপাতী নাজিরপুর গ্রামে তাঁহার মাতুলালয়ে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম যাদবচন্দ্র সান্ন্যাল, নিবাস ফরিদপুর জিলার অন্তর্গত রাজবাড়ী মহকুমার অধীন সোনারপুর গ্রাম। দুর্গানাথের মাতামহ ঈশ্বরচন্দ্র অধিকারী অপুত্রক ছিলেন। সে কারণ, দুর্গানাথ তাঁহার পিতার জীবদ্দশায়ই মাতামহ-সম্পত্তির উত্তরাধিকারী-রূপে নাজিরপুরেই বসবাস করিতে থাকেন। উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের নবম শ্রেণী পর্যন্ত অধ্যয়ন সমাপ্ত করিয়া তিনি গ্রামস্থ জমিদার যাদবচন্দ্র অধিকারী মহাশয়ের ষ্টেটে নায়েবী পদ গ্রহণ করেন। তিনি যৌবনে একবার একাদিক্রমে বহু বৎসর কঠিন আমাশয় রোগে নিদারুণ কষ্ট পান। অবশেষে জীবনের সম্বন্ধে একেবারে হতাশ হইয়া আত্মীয়-স্বজনের পরামর্শে তিনি দেওঘরে বাবা বৈদ্যনাথের চরণে হত্যা দেন। সেখানে তিনি এরূপ স্বপ্নাদেশ প্রাপ্ত হন যে, হিমাইতপুরের ঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের শ্রীচরণে দীক্ষাগ্রহণ-পূর্বক নামধ্যানে জীবন যাপন করিলে তিনি সম্পূর্ণরূপে নিরাময় হইবেন। এই অবস্থায় তিনি দেওঘর হইতে বাড়ী ফিরিয়াই শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীচরণে দীক্ষাগ্রহণ করেন এবং অত্যল্পকাল মধ্যেই সম্পূর্ণ-রূপে সুস্থ হইয়া উঠেন। তদবধি তিনি ঠাকুরের অন্যতম অন্তরঙ্গ পার্ষদরূপে জীবন অতিবাহিত করেন। তাঁহার ন্যায় অমায়িক সরলপ্রাণ ভগবদ্‌বিশ্বাসী ভক্ত সচরাচর দৃষ্টিগোচর হয় না।]

আমি বঙ্গাব্দ ১৩২০ সালে শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীচরণে দীক্ষাগ্রহণ করি। তখন ঠাকুরকে দেখিয়াছি গৌরবর্ণ একহারা সুন্দর-গঠন। অনন্ত মহারাজ ছিলেন উত্তম শ্যামবর্ণ ছিপ্-ছিপে দীর্ঘাকৃতি। আর কিশোরীমোহনের ছিল হাড়ে-মাংসে জড়িত স্থূলকায় সুশ্রী দেহ। তিন জনেই তখন যুবা পুরুষ।

সে-কালে প্রত্যহ সন্ধ্যার পর হইতে দুপুর রাত্রি পর্যন্ত কিশোরীমোহনের বাড়ীতে কীর্তন হইত। ঠাকুর ও অনন্ত মহারাজ সেই কীর্তনে নিত্য যোগ দিতেন। আমিও প্রায় প্রতি রাত্রেই তাঁহাদের সঙ্গে যাইয়া সেখানে কীর্তন করিতাম। কীর্তনের আসরে প্রথমত কিছু সময় ঠাকুর পাগল হরনাথের

কৃষ্ণলীলার বই পাঠ হইত, তারপর কীর্তন আরম্ভ হইত। সালগেড়িয়ার সতীশ গোস্বামী, প্রতাপপুরের মধু পালের পুত্র যদু পাল, কৃষ্ণচন্দ্র দাস, মুকুন্দ ঘোষ, কোকন বুনে, তরণী বুনে, ঘোষেদের ছেলে ও দুই ভাই, হারাণ মিস্ত্রি, নারায়ণ মিস্ত্রি, মধু ঘোষের জামাতা নফর ঘোষ প্রভৃতি ঠাকুরের এই কীর্তনের দলের প্রধান সঙ্গী ছিলেন। ইঁহাদের অপূর্ব কীর্তন শুনিয়া সকলে মুগ্ধ হইত। কিশোরীমোহন ও অনন্তনাথের উচ্চ কণ্ঠের সুললিত ভাবগম্ভীর কীর্তনে সকলে বিস্মিত হইত। আর ঠাকুরের ছিল অপরূপ নৃত্য-ভঙ্গিমা—সে এক অত্যাশ্চর্য অনির্বচনীয় দৃশ্য!

কীর্তনকালে আমরা আপন শরীরটা ফাঁপা বলের মত হাল্কা বোধ করিতাম। সে কারণ, দীর্ঘ সময় ধরিয়া কীর্তন করিলেও আমাদের বিন্দুমাত্র শ্রম-বোধ হইত না, কীর্তনের সময় ঠাকুরের নির্দেশে আমরা যথাস্থানে ইষ্টমূর্তি ধ্যানের অভ্যাস করিতাম। চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ধ্যানস্থ হইয়া আমরা অবিরাম কীর্তন করিয়া যাইতাম। তখন আমাদের অনেকেরই নানা দেব-দেবীর এবং সময় সময় ইষ্ট-মূর্তির দর্শনলাভ ঘটিত।

কীর্তন আরম্ভ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ঠাকুর বড় কীর্তনে যোগ দিতেন না। সাধারণত কীর্তন খুব জমিয়া উঠিলেই তিনি আসিয়া কীর্তনে নামিতেন এবং দুই বাহু তুলিয়া নৃত্য আরম্ভ করিতেন। ঠাকুরের মুখে কীর্তনের পদ বিশেষ শোনা যাইত না, নৃত্য—নৃত্য—শুধু নৃত্যামোদেই তিনি বিভোর থাকিতেন! এই সময় মনে হইত, তাঁহার সর্বাঙ্গে যেন প্রবলবেগে তড়িৎ-স্রোত বহিতেছে। তাঁহার মাথার চুলগুলি তখন থর্ থর্ করিয়া কাঁপিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া থাকিত। এই অবস্থায় অনেক দিন তাঁহাকে জড়াইয়া ধরিয়া নিজদেহে অপূর্ব শিহরণ অনুভব করিয়াছি।

কীর্তনকালে অনেক দিনই ঠাকুরের ভাবসমাধি হইতে দেখিয়াছি। সে অলৌকিক অত্যাশ্চর্য ব্যাপার ভাষায় বর্ণনা করা আমার সাধ্যাতীত। তুমুল কীর্তনের মধ্যে ঠাকুর যখন ঊর্ধ্ববাহু হইয়া কীর্তন করিতে থাকিতেন, তাঁহার সর্বশরীরে কম্পন দেখা দিত, ক্রমে নাড়ির গতি স্তব্ধ হইয়া যাইত, চোখের তারা স্থির হইত এবং সর্বাঙ্গ অবশ হইয়া পড়িত। এইরূপে অবস্থায় তাঁহার দেহখানা মাটির উপর পড়িয়া যাওয়ার উপক্রম হইলে, তাঁহাকে ধরাধরি করিয়া সতরঞ্চ বা মাদুরের উপর শোয়াইয়া দেওয়া হইত। চিৎ হইয়া কিছুকাল সটান পড়িয়া থাকার পর হঠাৎ তিনি লাফ দিয়া উঠিয়া পড়িতেন এবং তখন তাঁহার দেহে নানা প্রকারের আসন হইতে থাকিত। আসনের সময় তাঁহার শরীরটাকে একটা অস্থিশূন্য মাংসপিণ্ড বলিয়া বোধ হইত। আসনাদি হওয়ার পর বাহ্যজ্ঞানশূন্য অবস্থায় তাঁহার শ্রীমুখ হইতে নানা ভাষায় গভীর তত্ত্বপূর্ণ বহু বাণী বাহির হইত। যেদিন কিছু বেশী সময় ধরিয়া আসন-প্রক্রিয়া চলিত, সেদিন বাণী সাধারণত কিছু কম বাহির হইত।

ঠাকুরের কীর্তনলীলার অন্যতম সঙ্গী যদুনাথ পালের বাড়ীতেই তাঁহার মহাভাবসমাধির এই বিশেষ অবস্থাটি সর্বপ্রথম প্রকাশ্যরূপে সকলের নিকট ধরা পড়ে। ইতিপূর্বে অবশ্য আরও কয়েক দিন কিশোরীমোহনের বাড়ীতে তাঁহার উক্তরূপ অবস্থাদি ঘটিয়াছে, কিন্তু তৎপ্রতি কাহারও তেমন কোন গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টি পড়ে নাই। ভাবসমাধি-কালে ঠাকুরের উক্তরূপ মৃতবৎ অদ্ভুত অবস্থা দেখিয়া প্রথমত সবাই খুব শঙ্কিত হইতেন, আত্মীয়-স্বজন ও অন্তরঙ্গেরা শোকাকুল হইয়া কান্নাকাটি করিতেন। কিন্তু ঐরূপ অবস্থা যখন প্রায়শই ঘটিতে লাগিল, তখন সকলে এই বুঝিয়া আশ্বস্ত হইলেন যে, ইহা তাঁহার একটি বিশেষ অলৌকিক অবস্থা ছাড়া আর কিছুই নয়। ঐ অবস্থায় তাঁহার চিৎ-সত্তা আধ্যাত্মিক রাজ্যের এক উচ্চতম স্তরে উপনীত হইয়া বিচরণ করিত, ফলে তাঁহার শরীর-বিধানে কিয়ৎকালের জন্য জীবনের কোন লক্ষণই বর্তমান থাকিত না। তবে এই বিশেষ অবস্থা হইতে তিনি অনায়াসেই স্বকীয় চিত্তভূমিতে নামিয়া আসিয়া মানব-সাধারণের মতই পুনরায় অবস্থান করিতে সমর্থ হইতেন।

ঠাকুরের এই অপূর্ব ভাবসমাধি অবস্থা দেখিবার জন্য তৎকালে পাবনা সহর এবং নিকটবর্তী গ্রামাঞ্চল হইতে নিত্য কীর্তনের আসরে বহু লোকের সমাগম হইত। শ্রদ্ধাশীল অনেকে এই অদ্ভুত অলৌকিক ব্যাপারটিকে বিশেষ ভক্তির চক্ষেই দেখিত, কিন্তু দুষ্ট-প্রকৃতির লোকেরা ইহাকে বুজরুকী বলিয়া উড়াইয়া দিত এবং ঠাকুরের সম্বন্ধে নানা মিথ্যা নিন্দাবাদ প্রচার করিয়া তাঁহার কীর্তনের দলটি ভাঙ্গিয়া দিবার চেষ্টা করিত। ঠাকুর কিন্তু ইহাদিগকে খাওয়াইয়া পরাইয়া এবং বিপদে আপদে সাহায্য করিয়া সুস্থ ও নিরাপদ রাখিতে সর্বদাই আপ্রাণ চেষ্টা করিতেন। বলা বাহুল্য, নিত্য নানাভাবে ঠাকুরের এইরূপ উদার চরিত্রের পরিচয় পাইয়া এই সকল অবিশ্বাসীদের অনেকেই কালক্রমে তাঁহার বিশেষ অনুগত ভক্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন।

৭

সতীশচন্দ্র জোয়ারদারের বিবৃতি

[নদীয়া জিলার কুষ্টিয়া মহকুমার অধীন বরৈচেরা গ্রামে সতীশচন্দ্র জোয়ারদারের জন্ম হয়। ইঁহার পিতার নাম হরিশচন্দ্র জোয়ারদার। সতীশচন্দ্র যৌবনে এল্.এম্.পি. পরীক্ষা পাশ করিয়া কুষ্টিয়া সহরে ডাক্তারী ব্যবসায় আরম্ভ করেন। কিছুকাল তিনি স্থানীয় মিউনিসিপ্যালিটির ভাইস-চেয়ারম্যান পদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া জনসেবা-কার্যে সকলের বিশেষ প্রশংসা অর্জন করেন। বুদ্ধিমান, পরোপকারী এবং সজ্জন বলিয়া সকলের শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। সতীশচন্দ্র যেমনই তত্ত্ব-জিজ্ঞাসু তেমনই ধর্ম-পিপাসু ছিলেন। বহু মতে সাধন-ভজন করতঃ অভীষ্ট লাভে বিফল-মনোরথ হইয়া সদ্‌গুরুর আশ্রয় লাভের জন্য তিনি এক সময় একান্ত ব্যাকুল হইয়া পড়েন এবং শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীচরণে সৎ-নামে দীক্ষা লাভ করিয়া ধন্য

হন। তদবধি শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রচার ও প্রতিষ্ঠা-কার্যে আত্মনিয়োগ করতঃ তিনি স্বীয় জীবন অতিবাহিত করেন। "জননী মনোমোহিনী ও শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র"-নামক* চরিত-গ্রন্থের কৃতী রচয়িতা বলিয়াও তিনি সকলের নিকট সুপরিচিত।]

একদিন শুনিতে পাইলাম, হিমাইতপুরের ঠাকুর অনুকূলচন্দ্র কুষ্টিয়া সহরে আসিয়াছেন। অনেক দিন হইতেই লোকমুখে তাঁহার সম্বন্ধে নানা অদ্ভুত কথা শুনিয়া আসিতেছিলাম। সে কারণ, তাঁহাকে প্রত্যক্ষভাবে জানিবার আমার বহু দিনের একান্ত আগ্রহ ছিল। সে-বার তাঁহাকে নিকটে পাওয়ায় মনে হইল, ভালই হইয়াছে। একবার তাঁহাকে বেশ করিয়া পরীক্ষার সুযোগ পাইব। ভাল-মন্দ বোধ-শক্তি তো ভগবান সকলকেই দিয়াছেন, অতএব ছাড়িব কেন?

তখন কুষ্টিয়া-বারের কোন কোন উকীল, মোক্তার এবং সহরের গণ্যমান্য ডাক্তার, শিক্ষক, ব্যবসায়ী প্রভৃতি অনেকে তাঁহার চরণে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন, কেহ কেহ আবার স্বপ্নে উপদেশ ও দীক্ষা লাভ করিয়াছেন। ইহারা তাঁহাকে "ঠাকুর" বলিয়া ডাকিতেন।

সে-যাত্রা কুষ্টিয়ায় আসিয়া ঠাকুর তাঁহারই জনৈক বিশিষ্ট ভক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায় উকীলের বাসায় অবস্থান করিতেছিলেন। আমি একদিন প্রফুল্লবাবুর বাড়ীতে গিয়া দেখিলাম, একজন গৌরবর্ণ কমনীয়-কান্তি সুন্দর যুবা-পুরুষ মেজেতে উত্তানভাবে শায়িতাবস্থায় অবস্থিত—যেন অজ্ঞানাবস্থা। তাঁহাকে বেষ্টনপূর্বক সহরের অনেক বিশিষ্ট ভদ্রলোক সেখানে উপবিষ্ট আছেন। গৃহের বহির্দেশে, দ্বারদেশে ও গবাক্ষ-সমীপে বহু ভদ্রলোক ও মহিলা সোৎসুকভাবে যেন কি একটা অদ্ভুত ব্যাপার দর্শনপ্রয়াসে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। কয়েক জন ভক্ত ঠাকুরের মুখ-বিনির্গত বাক্যসমূহ লিপিবদ্ধ করিতেছেন। আরও লক্ষ্য করিলাম, এই সময় ঠাকুরের দক্ষিণ অঙ্গের কটিদেশ হইতে বৃদ্ধাঙ্গুলি পর্যন্ত সর্বশরীর এবং উহার অভ্যন্তরস্থ মাংসপেশী অতি দ্রুতগতিতে কম্পিত হইতেছে। মনে হইল, এ কি ব্যাপার! ভণ্ডামি নয় তো? 'ঘর-পোড়া গরু সিঁদুরে মেঘ দেখিয়া ভয় পায়'—আমার তখন এই অবস্থা।

কেহ কেহ বলিলেন,—"কীর্তনের মধ্যে ঠাকুরের সমাধি হয়েছে। এটি তাঁহার মহাভাবাবস্থা। জগতের মঙ্গলের জন্য এই সকল মহাবাণী তাঁহার শ্রীমুখ হইতে উচ্চারিত হইতেছে।" আমি তখন কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া তাঁহাকে পরীক্ষা করিবার ইচ্ছায় তাঁহার পদধারণ করিয়া দেখিলাম যে, সে-কম্পন কৃত্রিম বা সাধারণ মনুষ্য-সাধ্য ব্যাপার নহে; আর ইহা বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না যে, এইরূপ দ্রুত স্পন্দন ইচ্ছা করিয়া করিতে সক্ষম হওয়া কাহারও পক্ষে আদৌ সম্ভব নহে। তাঁহার পা-খানি বিশেষ বলপূর্বক দৃঢ় মুষ্টিতে চাপিয়া ধরিয়াও আমি কিছুতেই

---

* এই গ্রন্থ সর্বপ্রথম প্রকাশিত হয় বঙ্গাব্দ ১৩৩২ সালে। গ্রন্থটির আধুনিক দ্বিতীয় ও তৃতীয় সংস্করণ "শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র" এই নামে সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউস (দেওঘর) হইতে বঙ্গাব্দের যথাক্রমে ১৩৭২ ও ১৩৭৩ সালে প্রকাশিত হইয়াছে।

সে-স্পন্দনের গতি রোধ করিতে পারি নাই। আর আমি ইহা লক্ষ্য করিয়াও বিস্মিত হইলাম যে, তখন তাঁহার মুখ হইতে যে-সকল বাণী নির্গত হইতেছিল, তাহা ছিল অতি সুন্দর, প্রেমপূর্ণ অমৃতনিষ্যন্দী, ধর্ম ও কর্মের সার সত্য—সার তত্ত্ব, জগতের সর্বপ্রকার মঙ্গলকর উপদেশসমূহ—জীবের ত্রিতাপজ্বালা বিদূরিত হইবার উপায়াবলী।

৮

সুশীলচন্দ্র বসুর বিবৃতি

[ঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের 'সৎসঙ্গ' প্রতিষ্ঠানের বর্তমান সভাপতি সুশীলচন্দ্র বসু ১৮৯০ খৃষ্টাব্দের ৭ই নবেম্বর যশোহর জিলার অন্তর্গত হরিণাকুণ্ড গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম প্রতাপচন্দ্র বসু। সুশীলচন্দ্র ছাত্রাবস্থায় সাতাশ বৎসর বয়ঃক্রম-কালে শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীচরণে দীক্ষাগ্রহণ করেন। তদবধি তিনি তাঁহার নিত্যসঙ্গী অন্যতম অন্তরঙ্গ প্রধান পার্ষদরূপে ইষ্টসেবা-কার্যে আত্মনিয়োগ করিয়া আছেন। 'সৎসঙ্গ' প্রতিষ্ঠানের গোড়া হইতেই তিনি ইহার গুরুদায়িত্বপূর্ণ কার্যাবলী অতীব নিষ্ঠা ও যোগ্যতার সঙ্গে সম্পাদন করিয়া আসিতেছেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের লোককল্যাণকর আদর্শ ও জনজাগরণী ভাবধারার সার্থক রূপায়ণে তাঁহার আপ্রাণ চেষ্টা ও অক্লান্ত শ্রমের তুলনা হয় না। সুশীলচন্দ্র একজন সুপণ্ডিত ও কৃতী লেখকও বটেন। 'সৎসঙ্গে'র মুখপত্র "আলোচনা" পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁহার বহু মূল্যবান প্রবন্ধ পাঠে অনেকেই বিশেষ উপকৃত। তাঁহার রচিত "জাতিস্মর-সন্ধানে" ও "রাজস্থানের পথে" এই গ্রন্থ দুইটি বঙ্গীয় পাঠক সমাজের বিশেষ সমাদর লাভ করিয়াছে। মধুর অমায়িক চরিত্র, অপূর্ব বুদ্ধিমত্তা ও কর্মকুশলতা এবং অটুট ইষ্টনিষ্ঠার জন্য তিনি সৎসঙ্গী জনসাধারণের পরম শ্রদ্ধার পাত্র।]

সে অনেক দিনের কথা। ১৯১৭ সালের নবেম্বর মাস। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'এম্. এ' ও 'ল' পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতেছি। ৬ই নবেম্বর তারিখে কলিকাতা হইতে কুষ্টিয়া (এখন বাংলাদেশ) সহরে আসিলাম আমার ভগ্নীকে দেখিবার জন্য। আমার ভগ্নীপতির বাড়ীতে প্রবেশ করিতেই বাহিরের ঘরে দেখিলাম,—একটি সুঠাম সুদর্শন ব্রাহ্মণ যুবক বসিয়া আছেন, গলদেশে যজ্ঞোপবীত লম্বমান। তাঁহার স্নেহল ও তীক্ষ্ণ দৃষ্টি আমাকে আকর্ষণ করিল। আমাকে ঘরে প্রবেশ করিতে দেখিয়া তিনি উঠিয়া চির-পরিচিতের ন্যায় আমাকে গাঢ় আলিঙ্গনে আবদ্ধ করিলেন। কিছুক্ষণ তাঁহার স্নেহালিঙ্গনে আবদ্ধ থাকিবার পর তদবস্থায় আমাকে প্রশ্ন করিলেন,—"আমাকে কি রকম লাগে দাদা?" তাঁহার গাঢ় আলিঙ্গনে অভিভূত হইয়াই হউক, বা অন্য যে-কোন কারণেই হউক, বলিয়া ফেলিলাম,—"আপনার সহিত আমার যে এ-জীবনে এই প্রথম সাক্ষাৎকার তা তো মনে হইতেছে না, বরং মনে হইতেছে যে, আপনি আমার

বহু দিনের পরিচিত বন্ধু।" তিনি কিছুক্ষণ স্তব্ধ থাকিয়া বলিলেন,—"আমার প্রথমে অপরিচিত ভদ্রলোক বলিয়াই মনে হইয়াছিল, কিন্তু এখন মনে হইতেছে, আপনি আমার বহু দিনের পরিচিত।" তখন পর্যন্ত জানি না তিনি কে, তাঁর নাম কি, কোথা হইতে তিনি আসিয়াছেন, বা তিনি কি করেন।

কিছুক্ষণের জন্য তাঁহার নিকট হইতে বিদায় লইয়া হাতমুখ ধুইবার জন্য বাড়ীর ভিতরে আসিলাম। সেখানে আমার ভগ্নীপতি অশ্বিনীকুমার বিশ্বাস মহাশয়ের নিকট জানিতে পারিলাম, ইঁহার নাম শ্রীঅনুকূলচন্দ্র চক্রবর্তী, তাঁহারা ইঁহাকে শ্রীশ্রীঠাকুর বলিয়া ডাকেন, কীর্তন করিতে করিতে ইঁহার ভাবসমাধি হয়, তখন বাহ্যজ্ঞান থাকে না, সেই অবস্থায় অনেক কথা বলেন, সেগুলি লিখিত আছে। সেই ভাবসমাধি অবস্থায় বাহ্যজ্ঞান ফিরাইয়া আনিবার জন্য টিকা পোড়াইয়া তাঁহার দেহে ধরা হইয়াছিল, তাহাতেও বাহ্যজ্ঞান ফিরিয়া আসে নাই,—ইত্যাদি।

হাতমুখ ধুইয়া কিঞ্চিৎ জলযোগ করিয়া পুনরায় বাহিরের ঘরে আসিয়া তাঁহার নিকট বসিলাম। সেখানে এমন কয়েকজন লোককে দেখিলাম, যাঁহাদের নৈতিক চরিত্র অতি নিকৃষ্ট ধরণের বলিয়া আমি পূর্ব হইতেই জানিতাম। তাঁহাদের মধ্যে একজন আমাকে বলিয়াছিলেন,—"Criminal Procedure Code-এর এমন কোন section নাই, যাহার crime আমি না করিয়াছি।" ইঁহাদের এরূপে সাধুপুরুষের সংস্পর্শে দেখিয়া বিস্মিত হইলাম। পরে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিয়াছিলাম যে, এই মহাপুরুষের সংস্পর্শে আসিয়া ইঁহাদের চরিত্রের আমূল পরিবর্তন সংঘটিত হইয়াছে, Saul Paul-এ রূপান্তরিত হইয়াছে।

তাঁহার সহিত নানা কথাবার্তা হইতে লাগিল। তখন সন্ধ্যা হয়-হয়। আমি তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলাম,—"আপনার সহিত নিরালায় কিছু আলাপ করিতে চাই।" তিনি তৎক্ষণাৎ বলিলেন,—"আসুন।" এই বলিয়া বাহিরের ঘরের সংলগ্ন একটি ছোট ঘরে উঠিয়া গেলেন, সেখানেই তিনি শয়ন করিতেন। আমি তাঁহার শয্যাপার্শ্বে উপবেশন করিলাম। দীপ জ্বালা হইল। আমি প্রশ্নের পর প্রশ্ন করিয়া যাইতে লাগিলাম। তিনি মুহূর্তমাত্র চিন্তা না করিয়াই স্বতঃস্রোতা নদী-প্রবাহের ন্যায় অনর্গলভাবে বলিয়া যাইতে লাগিলেন। রাত্রি অধিক হওয়াতে খাবার ডাক পড়িল। তিনি ও আমি খাইতে গেলাম। খাইয়া আসিয়া আবার তাঁহার শয্যাপার্শ্বে পূর্বের ন্যায় বসিলাম—আবার প্রশ্নোত্তর চলিতে লাগিল। এইভাবে কথা-বার্তায় আলাপ-আলোচনায় কিভাবে যে রাত্রি অতীত হইয়া গেল, টেরই পাইলাম না। ভোরে কাকের ধ্বনি শুনিয়া তিনি বলিলেন,—"বোধ হয় ভোর হইয়া গিয়াছে, কাক ডাকিতেছে।" জানালা খুলিয়া দেখিলাম, পূর্বাকাশ ফর্সা হইয়া আসিয়াছে।

দর্শন-শাস্ত্রের ছাত্র হিসাবে এবং নিজের জীবনের যত প্রশ্ন জমা হইয়া উঠিয়াছিল—ব্যক্তিগত জীবন, পারিপার্শ্বিক, সামাজিক, রাষ্ট্রিক, অর্থনৈতিক—

সবই উজাড় করিয়া দিয়া তাহার যথার্থ সমাধান পাইয়া তৃপ্ত হইলাম। ভাবিলাম, একজনের পক্ষে এরূপ বহুবিধ সমস্যার সমাধান দেওয়া কিরূপে সম্ভব!—বিশেষতঃ যিনি বলিতে গেলে উচ্চ শিক্ষার ধার ধারেন না। সারা রাত্রি তাঁহার সহিত আলোচনায় এই মনে হইল যে, তিনি সর্ববিধ বিদ্যায় শিক্ষিত। মনে হইল, পারমার্থিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাষ্ট্রিক মুক্তির বার্তা লইয়া জগতে এযাবৎ বহু মহাপুরুষের আবির্ভাব ঘটিয়াছে, কিন্তু সে সংকীর্ণ মুক্তি জগতের কোন বন্ধনই ঘোচায় নাই। তবে কি ইনি সেই একাধারে সর্বমুখী বিকাশের নরদেবতা, যাঁহার অপেক্ষায় মানব-সমাজ যুগ যুগ ধরিয়া প্রতীক্ষা করিয়া আছে? সেদিনের আলোচনায় স্পষ্টই প্রতীতি জন্মিল যে, সর্বমানবের প্রতি তাঁর প্রাণভরা দরদ—তাঁর মানবপ্রীতি জাতিধর্ম দেশ-কালের দ্বারা সীমিত নয়।

প্রভাতে উঠিয়া হাত-মুখ ধুইয়া তাঁহার কাছে আসিয়া বসিলাম। তিনি প্রীতি-প্রসন্ন দৃষ্টিতে আমার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। তাঁর সেই দৃষ্টিতে কি আকর্ষণ ছিল জানি না। শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে আমি দেখিনি, শুনিনি তাঁর কণ্ঠস্বর। প্রথম যেদিন "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত" পড়ি, অপূর্ব অনুভূতি হইয়াছিল সেদিন। সেদিন তাঁর দৃষ্টিতে স্পষ্ট উপলব্ধি করিলাম যেন রামকৃষ্ণ ঠাকুরই আমার দিকে স্নেহল দৃষ্টিতে তাকাইয়া আছেন। বলিলেন তিনি তাঁর দিকে আগাইয়া যাইতে—মনে হইল যেন শ্রীরামকৃষ্ণের কণ্ঠস্বর। কি জানি কেন অভিভূত হইয়া পড়িলাম। আগাইয়া যাইয়া প্রণাম করিয়া বলিলাম—"আমাকে দীক্ষা দিন।" সেই দিন ৭ই নবেম্বর তখনই তিনি নিজে আমাকে দীক্ষা দিলেন। আমার জন্ম হইয়াছিল ৭ই নবেম্বর, দ্বিতীয় জন্মও হইল সেই তারিখে।*

৭ই ও ৮ই নবেম্বর তাঁর সঙ্গে রহিলাম কুষ্টিয়ায়। কত লোক আসিত কত প্রশ্ন ও সমস্যা লইয়া। ইতর ভদ্র, মূর্খ বিদ্বান, ধনী দরিদ্র সবাইকে স্নেহালিঙ্গনে

---

* এ প্রসঙ্গে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনার কথা বলিতেছি।—ঠাকুরের সঙ্গে সাক্ষাতের চারি বৎসর পূর্বে একবার ভাগলপুরে একজন সাধুর সহিত আমার আলাপ-পরিচয় হয়। আমার জনৈক সহপাঠী বন্ধুও সে সময় আমার সঙ্গে ছিলেন। উক্ত সাধুবাবা সেদিন স্বতঃ-প্রবৃত্ত হইয়াই আমার সঙ্গীর সেই বন্ধুটিকে দীক্ষা দিয়াছিলেন। আমি তখন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম,—"বাবা, আপনি আমাকে তো কিছু বলিলেন না!" ইহাতে সাধুবাবা উত্তর করিয়াছিলেন,—"তোমার যিনি গুরু, আজ থেকে চারি বৎসর পরে তাঁহার সহিত তোমার সাক্ষাৎ হবে, এবং তখন তোমার দীক্ষা হবে।" সাধুবাবার সহিত সাক্ষাতের সেই দিনটি ছিল ইং ১৯১৩ সালের ৭ই নবেম্বর। তারিখটি আমি তখনই আমার নোটবুকে টুকিয়া রাখিয়াছিলাম। কিছুকালের মধ্যে ঘটনাটি আমি একেবারেই ভুলিয়া যাই। কিন্তু সেদিন ঠাকুর-চরণে দীক্ষা নেওয়ার সময় সাধুবাবার কথা মনে পড়িল। পরে নোটবুকখানি খুঁজিয়া বাহির করিয়া সাধুবাবার ভবিষ্যদ্বাণী যে সত্য হইয়াছিল, তাহাই প্রত্যক্ষ করিয়া বিস্মিত হইয়াছিলাম।

আবদ্ধ করিয়া সস্নেহে তাদের সকল প্রশ্নের জবাব দিতেন তিনি। তাঁহার অসীম ধৈর্যের পরীক্ষা হইত। সবার প্রতি তাঁহার সমান ভালবাসায় মুগ্ধ হইয়া যাইতাম। কি রকমে সময় কাটিতে লাগিল বুঝিতেই পারিলাম না। ৯ই তারিখ সকালবেলা তিনি বলিলেন,—"আমি রাতুলপাড়ায় যাব—(রাতুলপাড়া কুষ্টিয়া হইতে ৪।৫ মাইল দূরেবর্তী)—আপনি যাবেন কি ?" আমি বলিলাম,—"আজকে কলকাতায় ফিরবার কথা আছে।" তিনি বলিলেন,—"তবে থাক্।"

তাঁহার চলিয়া যাইবার পরেই মনে হইল, তাঁর সঙ্গে গেলেই হইত। এই কয়দিন তাঁহার সান্নিধ্যে থাকিয়া তাঁহার অভাবটা বিশেষভাবে অনুভব করিতে লাগিলাম। মনে হইল,—কলিকাতায় একখানা টেলিগ্রাম করিয়া দিই যে, আমার ফিরিতে দেরী হইবে। কিন্তু তাঁহার কাছে যাইব কি করিয়া, পথ তো চিনি না ! সেই দিন বিকালের দিকে একজন ভদ্রলোক আসিয়া বলিলেন,—"আজ শ্রীশ্রীঠাকুরের সঙ্গে রাতুলপাড়ায় যেতে পারিনি, কাল সকালে সেখানে যাবো, আপনি ইচ্ছা করলে আমার সঙ্গে যেতে পারেন।" তাঁহার এই কথা শুনিয়া মনে হইল, আমার অভীষ্ট পূরণের যোগাযোগ ঠাকুরই যেন করিয়া দিলেন। পরদিন ১০ই নবেম্বর সেই ভদ্রলোকের সঙ্গে রওনা হইয়া বেলা আন্দাজ ৯টায় রাতুলপাড়ায় পোঁছিলাম।

শ্রীশ্রীঠাকুর তখন একটি ঘরের মধ্যে কয়েক জনের সঙ্গে কথাবার্তা বলিতেছিলেন। আমি বাড়ীর উঠানে দাঁড়াইয়া শুনিলাম, কে যেন তাঁহাকে বলিলেন,—"সুশীলদা এসেছেন।" তাহা শুনিয়া তিনি এক লাফ দিয়া ছুটিয়া বাহিরে আসিয়া আমাকে গভীর আলিঙ্গনে আবদ্ধ করিলেন এবং বলিলেন,— "আপনার কথাই ভাবছিলাম, আপনি এলে খুব ভাল হ'ত, এই কথাই চিন্তা করছিলাম, তাই পরমপিতা মিলিয়ে দিলেন।" আমিও বলিলাম, "আপনি চ'লে আসবার পরেই আপনাকে দেখবার জন্য মনটা কেন জানি না, অত্যন্ত ব্যগ্র হ'য়ে উঠলো, তাই এই ভদ্রলোকের সঙ্গ পেয়ে চ'লে এলাম।" "খুব ভাল হয়েছে"— বলিয়া তিনি আমাকে ধরিয়া লইয়া ঘরে আসিলেন। আমি আসার দরুণ তাঁহার যে আবেগ ও আনন্দোচ্ছ্বাস দেখিলাম, তাহাতে চমক লাগিয়া গেল। ভাবিলাম, নিতান্ত আপনার জন না হইলে কেহ কাহারও দর্শনে এত আনন্দিত হয় না। ঘর-ভর্তি লোক, তাহার মধ্যে আমাকে স্নেহালিঙ্গনে আবদ্ধ করিয়া পাশে বসাইয়া সকলকে বলিতে লাগিলেন,—"আজ বড় আনন্দ হচ্ছে।" তাঁহার চোখে মুখে অভূতপূর্ব আনন্দোচ্ছ্বাস ফুটিয়া উঠিল। আমি ভাবিয়াও কূল-কিনারা পাইলাম না, কি করিয়া একজন মানুষের দর্শনে আর একজনের এরকম আনন্দের অভিব্যক্তি হয়। তাঁহার এই ভাবটাই আমাকে বিশেষভাবে অভিভূত করিল। নানা কথাবার্তা চলিতে লাগিল।

সন্ধ্যার দিকে বাড়ীর আঙ্গিনায় কীর্তন আরম্ভ হইল। কীর্তন বলিতে আমরা যা বুঝি, খোল-করতাল বাজাইয়া কীর্তন—এ তা নয় ! দুই তিনটা বাদ্য-ড্রাম

বাজিয়া উঠিল। শঙ্খ, ঘন্টা, কাঁসর বাজিয়া উঠিল। সকলে মিলিয়া তাণ্ডব নর্তন ও কীর্তন আরম্ভ হইল। কীর্তন আরম্ভ হইবার কিছুক্ষণ পরে শ্রীশ্রীঠাকুরও ঘর হইতে বেগে ছুটিয়া আসিয়া কীর্তনে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন এবং দুই বাহু তুলিয়া নৃত্য আরম্ভ করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে অদ্ভুত পট পরিবর্তন হইল। এমন উদ্দীপনার সৃষ্টি হইল যেন সবাই ভাবে পাগল হইয়া উদ্দাম নৃত্য করিতে লাগিল। কীর্তনের মাঝখানে শ্রীশ্রীঠাকুর দুই বাহু তুলিয়া মোহন ভঙ্গীতে প্রাণের উচ্ছল প্রাচুর্যে নৃত্যরত। তাঁহার বদনমণ্ডল অপূর্ব জ্যোতিঃ-বিভায় বিমণ্ডিত। সেই অপূর্ব সুঠাম দেহের মনোহর নৃত্যভঙ্গী যে না দেখিয়াছে তাহাকে ভাষায় বোঝানো কঠিন। সে কীর্তনের এমনই আকর্ষণী শক্তি যে, শত শত লোক সে আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া কীর্তন করিতে যোগ দিল। আমিও স্থির থাকিতে পারিলাম না, দুই বাহু তুলিয়া কীর্তনে ঝাঁপাইয়া পড়িলাম। কীর্তনে এমনই আলোড়ন সৃষ্টি হইল যে, দেখিলাম দুই তিনটি কুকুর পর্যন্ত সে কীর্তনে যোগ দিয়া নাচিতেছে। মানুষ তো কোন্ ছার, দূরে গাভীরা হাম্বা হাম্বা রব করিতে লাগিল। এরূপ অপূর্ব কীর্তন আমি পূর্বে কখনও দেখি নাই। শুনিয়াছি মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য কীর্তনে এইরূপ মাতোয়ারা হইতেন; মনে হইল, বোধ হয় তাহা এই ধরণের কীর্তনই হইবে।

কীর্তনে নাচিতে নাচিতে সহসা শ্রীশ্রীঠাকুর বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া গেলেন। সমগ্র দেহখানি অবশ হইয়া মাটিতে এলাইয়া পড়িল। মনে হইল তাঁহার দিব্য দেহখানি বাহ্য-চৈতন্যহীন হইয়া শবের মত পড়িয়া আছে। আমি সচকিত হইলাম। মনে হইল, এ কি হইল! পার্শ্ববর্তী একজন তদবস্থ আমার দৃষ্টি তাঁহার ডান পায়ের বুড়ো আঙ্গুলের দিকে নির্দেশ করিয়া দেখাইলেন। শরীরে যে চৈতন্য আছে, তাহা তখন আমি বুঝিতে পারিলাম, যখন দেখিলাম, তাঁহার ডান পায়ের বুড়ো আঙ্গুলটি থর্ থর্ করিয়া কাঁপিতেছে। গায়ে হাত দিয়া দেখিলাম, শরীর ঠাণ্ডা। এত উদ্দণ্ড কীর্তনের পর হৃদ্‌পিণ্ডের ক্রিয়া দ্রুততর হাওয়াই বিধি, কিন্তু বুকে হাত দিয়া হৃদ্‌পিণ্ডের ক্রিয়ার কোন লক্ষণ অনুভব করিতে পারিলাম না। চক্ষু পলকহীন। এমন অবস্থায় হঠাৎ বিদ্যুৎ-ঝঙ্কারের মত তাঁহার কণ্ঠে উদ্ঘোষিত হইয়া উঠিল উদাত্ত বাণী—"রাখ, ওগো রাখ। সব রক্ত—কেবল রক্ত—রক্তগঙ্গা ছুটে গেল। এখনও নীরব, নিস্পন্দ? এখনও ঘাতকের মত ভুলে আছিস? প্রেমের সন্তান তোরা? চারিদিকে রক্ত। রক্তের আকাশ, রক্তের বাতাস, রক্তের আগুন, রক্তের পৃথিবী, রক্ত—রক্ত—রক্ত—কেবল রক্ত। কে আছিস্ তোরা? আয় কে আছিস্? ডাকতে জানিস্? ডাকতে দে। প্রেম ভিক্ষা। ঐ দ্যাখ, ঐ দেশের মাটিতে বুকে ধরে, হৃদ্‌পিণ্ড দিয়ে কে প্রেম দিয়ে গেছে রে! ওরে সে যে আমারই, নির্দয়রূপে চোরের মত ক্রুশবিদ্ধ হয়েছিল, আর তোরা এখনো নীরব, নিস্তব্ধ? পশুর মত কামাসক্ত, আমোদপ্রিয়?

সেদিনটা ১০ই নবেম্বর, ১৯১৭। তখন ইউরোপে প্রথম বিশ্ব মহাযুদ্ধ

চলিয়াছে। সেই রক্তক্ষয়ী মহাসংগ্রামকে উপলক্ষ করিয়াই যে এই বাণী তাহা বুঝিতে কষ্ট হইল না। তারপরই আবার বাণী নির্গত হইতে লাগিল।—"যা-কিছু হচ্ছে, যা-কিছু কচ্ছে, সব শব্দতরঙ্গ থেকে। চৈতন্যতরঙ্গই ব্রহ্ম। সহস্রদল থেকে বাহিরের ধারা পিণ্ডে এসেছে। করা যায়—তবে ব্রহ্মাণ্ডে, পিণ্ডে কি এসে যায়? পিণ্ড একদম ভুল। যে ইচ্ছা থাকে পিণ্ডে, সেই ইচ্ছাই সৃষ্টি, অষ্টসিদ্ধি ইহারই অন্তর্গত।"...বুঝিলাম, সৃজন-প্রগতির কথা বলিতেছেন।

সেদিন তাঁহার এই অবস্থা অর্ধ ঘণ্টা স্থায়ী হইয়াছিল। বাহ্যজ্ঞান ফিরিয়া আসিবার পূর্ব মুহূর্তে তিনি বলিয়া উঠিলেন,—"জল খাব রে, জল খাব।" অনন্ত মহারাজ নিকটেই ছিলেন। তিনি পরিষ্কার একটি তামার ঘটীতে জল আনিয়া তাঁহাকে খাইতে দিলেন। রামকৃষ্ণদেবের ভাবসমাধি হইত। সমাধি অবস্থা হইতে নামিয়া আসিবার কালে একটা পার্থিব আকাঙ্ক্ষা আশ্রয় করিয়া তিনি সাধারণ ভূমিতে নামিয়া আসিতেন। তিনিও সমাধি-ভঙ্গের পূর্বমুহূর্তে 'জল খাব' বা 'তামাক খাব'—ঠিক এই কথা বলিয়াই ভূমিতে নামিয়া আসিতেন। এদিক দিয়া ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সঙ্গে ইঁহার অপূর্ব মিল দেখিতে পাইলাম। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণদেব সমাধি অবস্থায় কোন কথাই বলিতেন না—এই প্রশ্নই মনে মনে জাগিল। এ বিষয়ে অধিক কথা বলা অপ্রয়োজন বলিয়া এখানেই নিরস্ত হইলাম।

তাঁহাকে তদবস্থায় দেখিয়া তিনি যে খুব ক্লান্ত হইয়াছেন, বোধ হইতে লাগিল। একটা প্রলয়ংকর ঝড় যেন তাঁহার দেহের উপর দিয়া বহিয়া গিয়াছে। অনন্ত মহারাজকে ধরিয়া ঘরের মধ্যে আসিয়া শ্রীশ্রীঠাকুর কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম করিলেন। আমিও পাশে আসিয়া বসিলাম। সেই থেকে তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া এই রকম ভাববাণী অনেক দেখিয়াছি। সময় সময় সৃষ্টি-তত্ত্বের প্রসঙ্গও তিনি বলিয়াছেন এই অবস্থায়—কি করিয়া অব্যক্ত হইতে ব্যক্ত হইল—তাহার ভাবধারা। কিন্তু এ অবস্থাটা কি তাহা বুদ্ধি দিয়া ব্যাখ্যা করা চলে না। এটা হয়তো অপরোক্ষানুভূতি হইবে, যাহার কথা বলিতে গিয়া উপনিষদ্ বলিয়াছেন—যতো বাচো নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ।

সুশীলচন্দ্র বসুর আর একটি বিবৃতি

১৯১৮ সনের ১৮ই অক্টোবর শ্রীশ্রীঠাকুর কীর্তনের দলবল সহ হরিণাকুণ্ড (যশোহর) আমাদের বাড়ীতে এসে পৌঁছুলেন। পরদিন শনিবার ১৯শে অক্টোবর কোজাগর পূর্ণিমা। দলে দলে সকাল থেকেই লোক এসে সমবেত হ'তে লাগলো। গুচ্ছে গুচ্ছে ব'সে আলোচনা চলতে লাগলো। মহারাজ, কিশোরীদা, সত্য দত্ত, কেষ্ট দাস প্রভৃতি আলোচনা চালাতে লাগলেন। মধ্যাহ্ন অতীত হ'তে চললো, তবুও আলোচনা, বাদানুবাদ, তর্কের ঝড় যেন আর থামতে চায় না।

বিকেলের দিকে কিশোরীদা, গোঁসাইদা প্রভৃতি কীর্তনের দলবল সহ গ্রাম-

পরিক্রমায় বের হলেন। সন্ধ্যার পর কীর্তন পরিক্রমা সাঙ্গ ক'রে কীর্তনের দল বাড়ীতে এসে ঢুকল।

বাইরে হলঘরের মধ্যে কীর্তন আরম্ভ হ'ল। জয়ঢাক, কাঁসর ও ঘণ্টার ধ্বনিতে, কীর্তনের উল্লাসে, হরি-ধ্বনিতে ও মেয়েদের হুলুধ্বনিতে মনে হ'ল যেন ঘরের ছাদ ভেঙ্গে পড়বে। চতুর্দিকে অসংখ্য জনতা ঘরে ঢুকতে না পেরে সোৎসুক নয়নে অপেক্ষমান। কিছুক্ষণ বাদে শ্রীশ্রীঠাকুর কীর্তনে এসে যোগ দিলেন। ভাবের আতিশয্যে সবাইকে বুকে জড়িয়ে ধরতে লাগলেন। অননুভূতপূর্ব শিহরণে তাদের দেহ-মন পুলকিত হ'য়ে উঠতে লাগলো। ভরা যৌবনের অপরূপ রূপ নিয়ে অনুকরণীয় মোহন ভঙ্গীতে প্রাণের উচ্ছল প্রাচুর্যে—শেষে দু'বাহু তুলে নেচে নেচে সবাইকে আপন-ভোলা ক'রে তুললেন। তারপর মহারাজের ঘাড়ে এক হাত রেখে, আর এক হাত ঊর্ধ্বে তুলে কীর্তন করতে লাগলেন। পরে আবার মহারাজকে ছেড়ে দিয়ে দু'বাহু তুলে নৃত্য করতে করতে তাঁর দিব্য দেহখানি বাহ্যচৈতন্যহীন ও বিবশ হ'য়ে শবের মতন এলিয়ে পড়ল। মহারাজ আস্তে দেহখানি ধ'রে মাটিতে শুইয়ে দিলেন। তখন তাঁর বদনমণ্ডল আরক্তিম স্বর্গীয় বিভায় মণ্ডিত। কপালটা আয়নার মত চক্ চক্ করতে লাগল। ডান পায়ের বুড়ো আঙ্গুলটা থর্ থর্ ক'রে কাঁপতে লাগল। এই অবস্থায় ধীর উদাত্ত স্বরে বাণী নির্গত হ'ল। "বাপরে বাপ্ কি ভীষণ অন্ধকার! দুর্ভেদ্য! আর যে ঢুকতে পারছি না। কে আছ? বিরাট অন্ধকার! কারো সাড়া নাই, কারো শব্দ নাই। কেবল ঘোর অন্ধকারের স্তূপ। এ কি? এ কি? এ কেমন? আর কিছুই তো দেখতে পারছি না। সব গেল। সব হারিয়ে গেল। যা-কিছু সব যায়-যায়। আর কিছুই থাকে না। এ যে সব সত্তা হারিয়ে যাচ্ছে। ঘুম। এ ঘুমে জেগে থাকা কঠিন। সব ঘুমিয়ে যাচ্ছে। ও ঘুম মধুর বড়।"—মনে হয়, ভাবাবস্থায় ঠাকুর সাধনার যে স্তর ভেদ ক'রে চলেছেন, তারই বর্ণনা দিচ্ছেন।

১০

হরিপদ সাহার বিবৃতি

[হরিপদ সাহা ১৩০২ বঙ্গাব্দের ফাল্গুন মাসে নদীয়া জেলার অন্তর্গত কুষ্টিয়া মহকুমার অধীন বারাদি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম বরদাকান্ত সাহা। শ্রীশ্রীঠাকুরের অন্যতম প্রধান পার্ষদ সতীশচন্দ্র গোস্বামী মহাশয় ইঁহাদের কুলগুরু ছিলেন, তিনিই ইঁহাদের পরিবারস্থ সকলকে শ্রীশ্রীঠাকুর-চরণে দীক্ষিত করেন। হরিপদ 'আর. জি. কর মেডিক্যাল স্কুল' হইতে ডাক্তারী পাশ করিয়া কিছুকাল নানা স্থানে ডাক্তারী ব্যবসায় পরিচালনা করেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের সঙ্গ লাভের পর হইতে তিনি চিরকৌমার্য-ব্রত গ্রহণপূর্বক তাঁহার সেবা-পরিচর্যা এবং আশ্রমবাসী রোগীদের চিকিৎসা-কার্যে জীবন উৎসর্গ করেন।

সৎসঙ্গের "ভারত ভেষজ কুটীর"-নামক আয়ুর্বেদ ঔষধালয়টি শ্রীশ্রীঠাকুরের নির্দেশে তাঁহারই তত্ত্বাবধানায় পরিচালিত হইতেছে। নিষ্ঠা, সেবা ও চরিত্র-মাধুর্যে তিনি আশ্রমবাসী সকলের বিশেষ প্রিয়পাত্র।]

ঠাকুরের সেই পাগল-করা কীর্তন একবার শুনলে মানুষ আর স্থির থাকতে পারতো না। যে-রাস্তা দিয়ে তিনি কীর্তন নিয়ে চলতেন, লোকজনের কি ভিড় জমে যেতো। কীর্তন শুনে গরু-বাছুরগুলো লেজ তুলে হাম্বা হাম্বা ক'রে পিছনে পিছনে ছুটতে থাকতো। কত কুকুর বিড়াল ছাগল কীর্তনের সঙ্গে লাফাতে থাকতো। যেখানে কীর্তন হ'তো, কাছে-ভিতরে ঘর-বাড়ী বন-জঙ্গল সব-কিছু যেন আনন্দে শিউরে উঠে থর্ থর্ করে কাঁপতে থাকতো। গাছের ডাল-পালাগুলো সপাং-সপাং শব্দে উঠা-নামা করতো। সে যে কী অদ্ভুত কীর্তন, আর কী অপূর্ব তার আকর্ষণ, নিজ চোখে না দেখলে, কল্পনায় তা ধারণা করা অসম্ভব। আমি মূর্খ লোক, ভাষায় কি ক'রে তা প্রকাশ করবো। তখন সর্বত্র দিবারাত্র এইভাবে কীর্তন হতো। ফলে, ঠাকুরের কথা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়তে লাগলো। 'ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এসেছেন', 'মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য' এসেছেন—ইত্যাদি নানা জনের নানা কথা চারিদিকে রটে গেল।

তখন ঠাকুর মাঝে মাঝে বারাদি গ্রামে আমাদের বাড়ীতে অনন্ত মহারাজ, কিশোরীবাবা, গোঁসাইবাবা, কোকনভাই, তরণীভাই প্রভৃতি তাঁর দলের লোকজন নিয়ে কীর্তন করতে আসতেন। ঢাক, শঙ্খ, ঘণ্টা, কাঁসর, ঝাঁজ, করতাল নিয়ে তাঁরা সকলে মিলে তুমুল কীর্তন করতেন। কীর্তনের সময় ঠাকুরের সমাধি হ'তো। চারিদিকের পল্লী থেকে বহু লোক সেই সমাধি দেখতে আসতো। 'সমাধি' কাকে বলে আমি তা আগে জানতাম না। একদিন দেখলাম, ঠাকুর আমাদের বাড়ীর উঠানে কীর্তনের মধ্যে দুই হাত তুলে অনেকক্ষণ ধ'রে নাচতে লাগলেন। সে কি মনোহর নৃত্য! তাঁর চোখ-মুখ কি এক স্বর্গীয় আভায় ঝক্ ঝক্ করছে, সর্ব শরীর দিয়ে উজ্জ্বল আলো ফুটে বেরুচ্ছে ও ঘাম ঝরছে। এই অবস্থায় তিনি ধীরে ধীরে জ্ঞানহারা হ'য়ে পড়লেন। অনন্ত মহারাজ, কিশোরীবাবা প্রভৃতি তাঁকে তখন মাটির উপর শুইয়ে দিলেন। কিছুক্ষণ নিশ্চল থাকার পর তাঁর ডান পায়ের বুড়ো আঙ্গুলটি বেগে কাঁপতে লাগলো এবং শরীরে নানা প্রকারের আসন হ'তে লাগলো। তাঁর দেহটা যেন তখন দলা পাকিয়ে একটা বলের মত হ'য়ে গেল, শরীরে যেন হাড়-গোড় কিছুই নেই। এর কিছুক্ষণ বাদেই তাঁর মুখ দিয়ে ইংরাজী বাংলা প্রভৃতি নানা ভাষায় নানা কথা বেরুতে লাগলো। সব কথা স্পষ্ট বোঝা গেল না। এরূপ অবস্থা প্রায় এক ঘণ্টা ধ'রে চললো। তারপর আস্তে আস্তে আবার তাঁর জ্ঞান ফিরে এলো। তিনি "জল, জল" ব'লে চিৎকার ক'রে উঠলেন। "অনন্ত", "কিশোরী" ব'লে ডাকতে লাগলেন। এক ব্যক্তি ঘটী ক'রে জল নিয়ে এলেন। তিনি উঠে ব'সে খুব খানিকটা জল খেলেন, তারপর তামাক খেলেন। এইভাবে কিছু সময়ের মধ্যেই

তিনি সম্পূর্ণ স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এলেন। ঠাকুরের ঐরূপ বাহ্যজ্ঞানশূন্য অবস্থাকেই যে 'সমাধি' বলে, তা তখন জানলাম। অবশ্য তারপর আরও বহু জায়গায় তাঁর ঐরূপে সমাধি-অবস্থা হ'তে দেখেছি। অনেক সময় ইহাও লক্ষ্য করেছি, কীর্তনের সময় ছাড়া অন্য সময়েও কেউ তাঁর কাছে ব'সে প্রাণখুলে কোন ভাবপূর্ণ গান গাইলেও, তাঁর এইরূপে ভাবদশা হ'তো।

১১
নফরচন্দ্র ঘোষের বিবৃতি

[নফরচন্দ্র ঘোষের জন্মস্থান পাবনা জিলার অন্তর্গত একদন্ত গ্রাম। যৌবনারম্ভেই তাঁহার শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীচরণাশ্রয় লাভের সৌভাগ্য ঘটিয়াছিল। শ্রীশ্রীঠাকুর সর্বপ্রথম যে কীর্তনের দল গঠন করিয়াছিলেন, নফরচন্দ্র তাহার অন্যতম প্রধান ছিলেন। কীর্তনের দল লইয়া সত্যনাম প্রচারের জন্য শ্রীশ্রীঠাকুর যে-যে স্থানে গমন করিয়াছিলেন, প্রায় সর্বত্রই তিনি তাঁহার সহচর ছিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের সেবা-কার্যে তিনি আজীবন যে নিষ্ঠার পরিচয় দিয়া গিয়াছেন, তাহা সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় না। সৎসঙ্গের "আনন্দবাজার" (সাধারণ ভোজনাগার) পরিচালনার ভার আদি হইতেই নফরচন্দ্রের উপর অর্পিত ছিল। তৎকালে আশ্রমের নিদারুণ অর্থকষ্টের দিনে সেই গুরু-দায়িত্ব পালনে তিনি যে ধৈর্য, নিষ্ঠা ও কর্মকুশলতার পরিচয় দিয়াছেন, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না।]

ঠাকুরের সেই কীর্তন সাধারণতঃ প্রত্যহই সন্ধ্যায় আরম্ভ হ'য়ে দুপুর রাত্রি পর্যন্ত চলত। কখনও কখনও রাত্রি ভোর হ'য়ে যেতো। কোন কোন সময় এমনও ঘটতো, এক নাগাড়ে দু'চার দিন—মাঝে মাঝে কিঞ্চিৎ মাত্র বিরতি দিয়ে, দিবারাত্র চব্বিশ ঘণ্টাই কীর্তন চল্‌তো। শঙ্খ, ডঙ্কা, ঘণ্টা, কাঁসর, ঝাঁজ, করতালের বিপুল শব্দের সহিত আমরা কীর্তন করতাম। কীর্তনের সময় আমাদের সবারই মুখে এক ধ্বনি—"রাধা রাধা রাধা বোল", আর সবারই এক লক্ষ্য—যথা নির্দিষ্ট স্থানে ইষ্টমূর্তির ধ্যান। কীর্তনকালে কারুর চক্ষু মুদ্রিত, কারুর নয়নে জল, কেউ ধূলোয় গড়াগড়ি যাচ্ছে, কেউ কেউ একে অন্যের পায়ের ধূলো মাথায় নিয়ে কোলাকুলি কচ্ছে, আর সবার মাঝে ঠাকুর প্রেমানন্দে বিভোর হ'য়ে দুই বাহু তুলে অপরূপ ভঙ্গীতে নৃত্য ক'রে যাচ্ছেন। এই অপূর্ব দৃশ্যে মুগ্ধ হ'য়ে চারিদিকের দর্শকেরাও ভাবাবেগে কীর্তনের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়তো, তখন শত শত কণ্ঠের রাধা-নামের বিপুল ধ্বনিতে আশে-পাশের পল্লী-অঞ্চল মুখরিত হ'য়ে উঠতো। সেই প্রাণোন্মাদী কীর্তনের মধ্যে কোন কোন দিন ঠাকুরের ভাবসমাধি হ'তো। সে অপূর্ব ব্যাপার দেখবার জন্য কত জায়গার কত লোক যে জমায়েত হ'তো তার ঠিকানা নেই।

ঠাকুরের সেই কীর্তনের যুগে তাঁর অলৌকিক প্রভাবে কত সময় কত অদ্ভুত ব্যাপারই না ঘটতো? একটির কথা মাত্র এখানে বলছি।

সেবার পাবনার সহরতলী অঞ্চলে কলেরা-রোগ মহামারীরূপে দেখা দিয়েছিল। এই মহা বিপদে শঙ্কাকুল পল্লীবাসীদের প্রাণে বল-ভরসা দিবার জন্য ঠাকুর আমাদের নিয়ে প্রত্যহ ঐসব গ্রামে সারা রাত্রি ঘুরে কীর্তন ক'রে কাটাতেন। আমরা দলে দলে ভাগ হ'য়ে পাড়ায় পাড়ায় গিয়ে স্থানীয় ছোট-বড় সবাইকে নিয়ে কীর্তন করতাম। স্ত্রী-পুরুষ-বালক-বৃদ্ধ-যুবক সকলে নামরসে মসগুল হ'য়ে থাকতো। ঠাকুরের প্রেরণায় পল্লীর মুসলমান ভাইরাও তখন একটা কীর্তনের দল গ'ড়ে তুলেছিলেন। ঠাকুরের নির্দেশে আমরা কিশোরীদার নেতৃত্বে তাদের সঙ্গে যোগ দিয়ে পল্লীতে পল্লীতে ঘুরে সারা রাত্রি কীর্তন করতাম। মুসলমান ভাইরা যে ভাষায় ভগবানের নাম করতেন, আমাদের তা উচ্চারণ করতে প্রথম প্রথম খুব অসুবিধা হতো, অবশ্য কয়েক দিনের মধ্যেই আমাদেরও তা অভ্যাস হ'য়ে গিয়েছিল। হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের এইভাবে এক সঙ্গে নাম-কীর্তনের এরূপ দৃষ্টান্ত ইতিপূর্বে আর কোথাও দেখা যায় নাই। পরস্পরের এরূপ আদর্শ মিলনের ফলে তদঞ্চলের সকল শ্রেণীর লোকের মধ্যে একটা গভীর মধুর ভ্রাতৃত্বের ভাব গ'ড়ে উঠেছিল। ঠাকুরকে সকলেই এজন্য অন্তরের সহিত শ্রদ্ধা করত ও ভালবাসত।

১২

বীরেন্দ্রনাথ রায়ের বিবৃতি

[নদীয়া জিলার অন্তর্গত কুষ্টিয়া মহকুমার অধীন আলামপুর গ্রামে বীরেন্দ্রনাথ রায়ের জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম সীতাপ্রসন্ন রায়। ইঁহারা বারেন্দ্র-শ্রেণীর ব্রাহ্মণ। বীরেন্দ্রনাথ কুষ্টিয়া ফৌজদারী আদালতের একজন সুদক্ষ মোক্তার ছিলেন। বঙ্গভঙ্গ-আন্দোলনে তিনি এক বিশিষ্ট সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। এজন্য গোয়েন্দা পুলিশ সর্বদাই তাঁহার উপর সুতীক্ষ্ন দৃষ্টি রাখিয়া চলিত। শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রাণ-মাতানো কীর্তনে ও তাঁহার প্রেমিক চরিত্রে আকৃষ্ট হইয়া কুষ্টিয়া সহরের গণ্যমান্য অনেকেই যখন সৎ-নামে দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন, বীরেন্দ্রনাথও ঐ সময় শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীচরণাশ্রয় লাভ করিয়া ধন্য হন। শ্রীশ্রীঠাকুরের অলৌকিক মাহাত্ম্য ও ভাবধারা প্রচারে বীরেন্দ্রনাথের অক্লান্ত চেষ্টার তুলনা হয় না। তৎকালে কুষ্টিয়া সহরে "শ্রীশ্রীবিশ্বগুরুর আবির্ভাব"-নামক যে বিরাট উৎসবের অনুষ্ঠান হইয়াছিল, বীরেন্দ্রনাথ ছিলেন তাহার অন্যতম প্রধান কর্মকর্তা। বীরেন্দ্রনাথ যুক্তিবাদী কর্ম্মযোগী সাধক ছিলেন। বাক্‌পটুতা, কর্মকুশলতা, বিদ্যাচর্চা, গীত-বাদ্য, সাধন-ভজন কোন বিষয়েই তাঁহার দক্ষতার অভাব ছিল না।]

It was either in the latter part of 1915 or the beginning of 1916. Thakur came to our town of Kusthia and stayed with a relative of mine, Prafulla Chandra Roy. I went to see him.

It was very early in the morning. Very few were there. In the room there was a table harmonium and I took my seat in front of it. I thought of singing a song to him and sang that song of Swami Vivekananda in perfect communion.—

নাহি সূর্য, নাহি জ্যোতিঃ, নাহি শশাঙ্ক সুন্দর,
ভাসে ব্যোমে ছায়া সম ছবি বিশ্বচরাচর ৷৷·····

I sang with all my heart and feeling ; for I could feel his pleasure. His eyes closed, his body swayed, his face flushed. I was enjoying his easy undulating movement. It was as though he were floating on the waves of music. But before I could finish the song— when I was on the words 'অবাঙ্‌-মনস'— he suddenly fell on the floor. I was bewildered. I asked my relative what had happened. 'Samadhi', he replied, and became busy collecting pencil, pen, ink and paper. The flush was still on his face. I went over to him and tried to open his eyes. The others objected. I tried to open them any way, but both the eye-balls were fixed, as if gazing at a point behind the junction of the eye-brows. His head was tossing from side to side. I examined his heart and pulse. They seemed to be without any function. All his limbs were motionless, but the toe of his right foot was pulsating rapidly, as if some thrilling vibrations were passing through it. It was not possible to make such a rapid motion voluntarily. I tried to stop it but failed.

I was a Criminal-court pleader and had lost almost all faith in the honesty of men. I was suspicious. This might be a hoax, a pose. He began to talk. I took a pin from a pin, cushion and very carefully, so that none might see me, I stuck it in the top of his finger just between the nail and flesh. Blood came. I was watching to see if there would be any change in his body and countenance. I could see no change. The toe was still moving, the other limbs were still and motionless the flush was there. Words were coming out of his mouth, the eyes were closed and the head was tossing. I repeated the experiment to make doubly sure. The result was the same. There was no change. And I joined the others in taking down his words.

I suppose many men have hypnotized themselves into trance by music or some other means. But I became convinced that his was no self-induced trance. Sometimes Thakur would go into it quietly. This was usually when there were singing and dancing and when the company was sympathetic. The dance he would do at such times was such as we would call heavenly. It dragged our minds into heights of bliss. He would be in the centre, we would be all around him. Every one would be wheeling, circling, dancing, each in his own way, yet with a rhythm concordant. And he in the centre would look at us with looks full of love. We would all be charmed with that look which said it begged only ourselves and nothing else. His whole body would dance—every muscle of it, and from it came a reddish-golden hue. Now his arms would be flung upwards the sky, now they would come down and he would come towards us to take us one in each arm—to dance with him. He would go on dancing, sometimes for many hours together, forgetting everything else. Finally he would go into his sleep as he had done on that first day and would give forth utterances that seemed to us like messages of God. But at other times he would enter that sleep quite violently. Then the music would take him as if by force, and compel him to dance a dance of fury. He would fall down as if senseless. Still he would do many different dancing feats called 'Yogic Asanas', and with such swiftness that many of us who knew his soft and tender body would be amazed. At one moment he would be standing on his head with the body all erect ; at the next he would be bent backward, his head touching his feet to make a circle and he would be doing somersaults in lightning-like succession. Then at last he would sleep his sleep of communion—apparently a 'carcass'.

Whether he arrived at that sleep smoothly or violently, during it he would give out many wonderful sayings. Many sayings were never recorded. Sometimes they came so quickly that we could not write them down. Then too, he was telling us so many valuable things in his

conscious state that we neglected what he told us in his physically unconscious state. In the first recorded (1914) English sayings were read "There is one I—the truth.......... Seek everything in me. Me is I." I am still struck by the sweep of such statements. I took them to be the picture of his inner mind, a mind that thinks and feels for all. In his activities I saw that he was thinking and feeling for us all, as if we were he. I came to have some faith. I could think no longer that he might be an imposter.

During his communion-state his body occasionally jerked and we could see that each jerk signified some change in the region of his thought. It was as though he were loosening seals of thought. In the later stages he sometimes mirrored our own minds and gave answers to unspoken questions. On one occasion a friend of mine asked him the mental question—"Is this spirit-possession ?" He answered—"No." My friend's mind framed the question, "Then who is the speaker of this revelation ? Please tell us clearly." And the answer came, "If I tell you, you won't believe, won't rely. You will remain as you are. Follow, think, all will manifest in your faith ; I say repeatedly, Follow."

১০

রাধারমণ জোয়ারদারের বিবৃতি

[রাধারমণ জোয়ারদারের পিতার নাম হরিশ্চন্দ্র জোয়ারদার। নিবাস নদীয়া জিলার অন্তর্গত কুষ্টিয়া মহকুমার অধীন বরৈচরা গ্রাম। শ্রীশ্রীঠাকুরের কীর্তনলীলার পূর্বোক্ত অন্যতম বিবৃতিকার ডাক্তার সতীশচন্দ্র জোয়ারদার মহাশয় ইঁহার জ্যেষ্ঠভ্রাতা। রাধারমণ যৌবনারম্ভেই শ্রীশ্রীঠাকুর-চরণে সস্ত্রীক দীক্ষালাভ করেন। অতঃপর কিছুকালের মধ্যেই তিনি বিষয়-সংসার পরিত্যাগ করিয়া নিয়তকর্মিরূপে সৎসঙ্গের কাজে যোগদান করেন। তদবধি তিনি সপরিবারে শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীচরণাশ্রয়েই আছেন। তাঁহার ন্যায় নিরলস নিষ্ঠাবান নিরভিমান কুশল কর্মী বিরল। সরল মন ও মধুর চরিত্রের জন্য তিনি আশ্রমবাসী সকলের অশেষ শ্রদ্ধার পাত্র।]

শ্রীশ্রীঠাকুর একবার কুষ্টিয়ায় আসিয়া গুরু-ভাই অশ্বিনীকুমার মোক্তারের বাসায় আছেন। তাঁহার আগমন-সংবাদ সহরময় ছড়াইয়া পড়িয়াছে। দলে দলে কত লোক আসিতেছে তাঁহাকে দেখিবার জন্য। অনন্ত মহারাজ, কিশোরীমোহন,

সতীশ গোস্বামী প্রভৃতি ঠাকুরের প্রবীণ পার্ষদগণ আগন্তুকদের সহিত আলাপ-আলোচনায় মত্ত থাকেন। প্রতিদিন সকালে ও রাত্রে বহুক্ষণ তুমুল কীর্তন হয়। রাত্রিতে কীর্তনের পর কেহ কেহ অশ্বিনীদার বাসায় থাকিয়া যান, অনেকে নিজ বাড়ীতে চলিয়া যান এবং পরদিন আবার আসিয়া কীর্তনে যোগ দেন। এইভাবে দিবারাত্র মহানন্দে দিন কাটে সকলের।

একদিন সকালবেলা অনন্ত মহারাজ, কিশোরীমোহন ও সতীশ গোস্বামী ভক্তদের লইয়া কীর্তন করিতেছেন। কীর্তন খুব জমিয়া উঠিয়াছে। সকলেই প্রেমানন্দে বিভোর হইয়া নৃত্য ও কীর্তনে মত্ত আছেন। এমন সময় ভাবে টলটল হইয়া শ্রীশ্রীঠাকুর আসিয়া কীর্তনের মধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন। এইভাবে অকস্মাৎ তাঁহাকে পাওয়ায় ভক্তদের আনন্দের আর সীমা রহিল না। তখন আরও উদ্দাম বেগে কীর্তন চলিতে লাগিল। ঠাকুর দুই বাহু তুলিয়া অপূর্ব ভঙ্গীতে ত্রিভঙ্গ-বঙ্কিম মূর্তিতে নৃত্য করিতে লাগিলেন। বাহ্যজ্ঞান তখন তাঁহার একরূপে নাই বলিলেই চলে। দেহের স্বাভাবিক রূপ রং সবই যেন বদলাইয়া গিয়াছে। সর্বাঙ্গ দিয়া জ্যোতিঃ ফুটিয়া বাহির হইতেছে। ননীর মত তাঁহার কোমল অঙ্গখানি যেন গলিয়া পড়িতেছে। এইভাবে কীর্তন করিতে করিতে তাঁহার দেহখানা অজ্ঞান অবস্থায় মাটির উপর ঢলিয়া পড়িবার উপক্রম হইল। অন্য কেহ যাহাতে এ-সময় তাঁহার অঙ্গ স্পর্শ করিতে না পারে, বা কীর্তনের চাপে তাঁহার গায় কোন আঘাত না লাগে, সেজন্য মহারাজ প্রভৃতি বিশিষ্ট ভক্তেরা বিশেষ সতর্কতার সহিত তাঁহাকে কিছুক্ষণ ধরিয়া রাখিলেন এবং অবশেষে মাটির উপর শোয়াইয়া দিলেন। কীর্তন থামিয়া গেল। এইবার তাঁহার শরীরে নানা রকমের আসন হইতে লাগিল। আসনের পর তিনি সটান চিৎ হইয়া মাটিতে শুইয়া রহিলেন। তাঁহার মাথাটি ডানে-বামে এ-পাশ ও-পাশ নড়িতে লাগিল। কিছুক্ষণ বাদে তাঁহার সর্ব শরীর নিশ্চল অবশ হইয়া গেল, শুধু মাত্র ডান পায়ের বুড়া আঙ্গুলটি দ্রুত বেগে কাঁপিতে থাকিল। শুনিলাম, এই অবস্থায় তাঁহার পদস্পর্শ করিলে জোরে 'ইলেক্‌ট্রিক্‌ শক্‌' লাগে। কিছুক্ষণের মধ্যে পায়ের কম্পনও থামিয়া গেল। তখন তাঁহার মুখ হইতে উচ্চকণ্ঠে নানা ভাষায় বাণী বাহির হইতে লাগিল। জন কয়েক ভক্ত খাতা পেন্‌সিল নিয়া তাহা লিখিতে লাগিলেন। লক্ষ্য করিলাম, এক এক দফা বাণী বাহির হওয়ার পর তাঁহার শরীরে এক একটা ঝাঁকি দেয় এবং তারপর আর এক দফা বাণী বাহির হয়। এইভাবে অনেকক্ষণ ধরিয়া তাঁহার মুখ দিয়া নানা কথা, গান ও উপস্থিত নানা জনের মনের নানা প্রশ্নের উত্তর আসিতে লাগিল, তারপর সর্বশেষে, সেদিন সকাল হইতে সমাধি-সময় পর্যন্ত যাঁহার সহিত তাঁহার যতকিছু গোপনীয় অগোপনীয় কথাবার্তা হইয়াছে, তাহাই যথাক্রমে বাহির হইল। বাণীর শেষে পিপাসায় কাতর হইয়া তিনি জলের জন্য চিৎকার করিতে লাগিলেন,—"ওগো, কে কোথায় আছ,, একটু জল দিয়ে আমার প্রাণ বাঁচাও। ··· পিপাসা ···বড় পিপাসা।" ভক্তদের

মধ্যে একজন তখন তাড়াতাড়ি শঙ্কভাবে এক ঘটী জল আনিয়া তাঁহাকে খাইতে দিলেন। জল পান করিয়া তিনি কিঞ্চিৎ স্বস্থ হইলেন, তারপর তামাক খাইলেন এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই সুস্থ হইয়া উঠিলেন, তাঁহার সহজ স্বাভাবিক অবস্থাও ফিরিয়া আসিল।

বলিতে কি, এরূপ অদ্ভুত ব্যাপার আমি ইতিপূর্বে আর কখনও দেখিও নাই, শুনিও নাই। অবশ্য পরে আরও বহুবার তাঁহার এইরূপে সমাধি-অবস্থা আমার দেখিবার সৌভাগ্য ঘটিয়াছিল।

১৪

সুখময় সরকারের বিবৃতি

[সুখময় সরকার অধুনা পূর্বপাকিস্তানের অন্তর্গত খুলনা জিলার অধীন মাগুরখালি গ্রামের (পোঃ কপিলমুনী) অধিবাসী। অতি বাল্য হইতেই তাঁহার মধ্যে ভাবুক ও উদাসীন প্রকৃতির লক্ষণ প্রকাশ পায়। তরুণ বয়সেই সদ্‌গুরুর সন্ধানে ব্যাকুল হইয়া নানা স্থানে ঘুরিয়া তিনি অবশেষে শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীচরণাশ্রয় লাভ করিয়া ধন্য হন। তদবধি তিনি ইষ্টসেবা-কার্যে আত্মনিয়োগ-করতঃ ঠাকুরের আশ্রমেই বাস করিতে থাকেন। একবার মৌনব্রত অবলম্বনপূর্বক তিনি কিছুকাল মথুরা, বৃন্দাবন প্রভৃতি নানা তীর্থস্থানে পরিভ্রমণে অতিবাহিত করেন। আশ্রম-জীবনে তিনি বহুকাল নানা স্থানে শ্রীশ্রীঠাকুরের নাম-প্রচারে অতিবাহিত করিয়াছেন। এক সময় তিনি উচ্চ ধর্মভাবের কতকগুলি সঙ্গীত রচনা করিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরকে গান করিয়া শুনাইয়াছিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর অতিশয় প্রীত হইয়া "অনুগীতিকা" নামকরণে তাহা মুদ্রিত করাইয়া দিয়াছিলেন। সুখময় বর্তমানে খুলনা জিল্যার নানা স্থানে শ্রীশ্রীঠাকুরের ভাবধারার প্রচার-কার্যে রত আছেন।]

অনেক দিনের কথা। একবার ভাদ্র মাসে শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মোৎসব উপলক্ষে কিশোরীবাবা ও গোঁসাইবাবা কীর্তনের দল নিয়ে নগর-পরিক্রমায় বাহির হন। আমরা তাঁদের সঙ্গে নিশান-হাতে "রাধা রাধা রাধা বোল" কীর্তন করতে করতে সারা পাবনা-সহর ও সহরতলীর পল্লী-অঞ্চল ঘুরে দুপুরবেলা আশ্রমে ফিরি। কীর্তনের দলটি যখন আশ্রম-সীমার কাছাকাছি এসেছে, শ্রীশ্রীঠাকুর কীর্তনের ধ্বনি শুনে দ্রুতপদে আমাদের দলের সম্মুখে এসে উপস্থিত হলেন। তিনি সেখানে কীর্তন-ভূমির ধূলি নিয়ে আপাদ-মস্তক নিজ অঙ্গে মাখলেন, দলের প্রত্যেককে গড় হ'য়ে প্রণাম করতে করতে সকলের সঙ্গে কোলাকুলি করলেন ও পরে ভাবগম্ভীর মূর্তিতে করজোড়ে সবার সম্মুখে দাঁড়িয়ে রইলেন। আমরাও তখন আনন্দে অধীর হ'য়ে তাঁর চরণে ভক্তিভরে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম ক'রে তাঁকে ঘিরে তুমুলবেগে কীর্তন করতে লাগলাম।

এইবার আমরা শ্রীশ্রীঠাকুরকে দলের সম্মুখে নিয়ে তাঁর পিছনে কীর্তন করতে করতে সমগ্র আশ্রম ঘুরে ডাক্তারখানার সম্মুখের প্রাঙ্গণে এসে উপস্থিত হলাম। এই সময় আশ্রমের আরও বহু লোক এসে কীর্তনে যোগ দিলেন এবং সকলে ঠাকুরকে পেয়ে আনন্দে মাতোয়ারা হ'য়ে উদ্দাম নৃত্যে কীর্তন করতে লাগলেন। কিশোরীবাবা ঝুঁকে ঝুঁকে একবার এ-দিকে অন্যবার ও-দিকে তড়িৎ-বেগে ছুটোছুটি করছেন, কখনও কখনও সিংহ-গর্জনে হুঙ্কার তুলে চারিদিক কাঁপিয়ে তুলছেন। আমরাও তাঁর সঙ্গে সঙ্গে লম্ফে-ঝম্ফে ঘুরণ-ফিরণ করছি। আমাদের শরীর যেন তখন ফাঁপা বলের মত হাল্কা হ'য়ে গিয়েছে, একজনের ধাক্কায় অন্যজন দূরে ছিটকে পড়লেও কেউ শরীরে কোন ব্যথা বোধ করছেন না। এইভাবে কীর্তনের আনন্দে মত্ত হ'য়ে ভক্তরা ভাবাবেশে একে অন্যের পায়ের ধুলো মাথায় নিচ্ছেন এবং পরস্পরে প্রেমালিঙ্গনে মাটিতে গড়াগড়ি যাচ্ছেন।

কীর্তন-আঙ্গিনার পাশেই আশ্রম-প্রাঙ্গণে তখন নরনারায়ণ-সেবার আয়োজন চলছে। অনাথ আতুর, দীন দুঃখী, ফকীর দরবেশ, সাধু সন্ন্যাসী, মুচি মেথর, বাগ্দী বুনো—হিন্দু মুসলমান সহস্র সহস্র লোক একসঙ্গে সারি বেঁধে ভোজনে বসেছে। লুচি, খিচুড়ি, ডাল, তরকারি, দই, মিষ্টান্ন প্রভৃতি উৎকৃষ্ট খাদ্য-দ্রব্যে "রাধা রাধা রাধা বোল" ধ্বনির মধ্যে তাদের ভূরিভোজনে পরিতৃপ্ত করা হচ্ছে। এমন সময় হঠাৎ ঠাকুর কীর্তন ছেড়ে চ'লে এলেন ও কিশোরী-বাবাকে ডেকে বললেন—"ডাক্তার, এঁদের মধ্যে আমায় একটু ঠাঁই ক'রে দাও না, আজ আমি আমার প্রাণের ভাইদের সাথে একসঙ্গে ব'সে খাব।" কিশোরীবাবা তৎক্ষণাৎ দৌড়ে গিয়ে পাতা ও জল এনে আসন পেতে দিলেন, ঠাকুর সানন্দে সকলের সঙ্গে ভোজনে বসলেন। এদিকে শত শত কণ্ঠের "রাধা রাধা রাধা বোলের" উচ্চ ধ্বনিতে তুমুল কীর্তন চলছে।

১৫

যতীন্দ্রনাথ বসুর বিবৃতি

[যতীন্দ্রনাথ বসু ১২৮৮ বঙ্গাব্দের ১৪ই বৈশাখ খুলনা জিলার অন্তর্গত মুকুন্দপুরে গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৩৬৭ বঙ্গাব্দের ৬ই বৈশাখ ৭৯ বৎসর বয়সে বারাসাত (২৪ পরগণা) নিজ বাড়িতে পরলোক গমন করেন। ছয়ত্রিশ বৎসর বয়সে তিনি শ্রীশ্রীঠাকুর-চরণে দীক্ষালাভ করেন। তিনি কলিকাতায় বেলেঘাটায় থাকিতেন এবং প্রায়শই তথা হইতে আশ্রমে আসিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের সঙ্গ-সুখ উপভোগ করিতেন। যতীন্দ্রনাথ যন্ত্র ও কণ্ঠ-সঙ্গীতে খুবেই পারদর্শী ছিলেন। কীর্তনের দল লইয়া তিনি নানা স্থানে গমনকরতঃ স্বীয় অপূর্ব সঙ্গীত-মাধুর্যে জনসাধারণকে শ্রীশ্রীঠাকুরের ভাবধারায় মতাইয়া তুলিতেন। সৎ-নাম প্রচারের জন্য তিনি তাঁহার কীর্তনের দল লইয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের সহিত পুরীধামেও গমন করিয়াছিলেন।]

ইং ১৯২০ সনের গোড়ার দিকের কথা। কলিকাতা বেলেঘাটা কন্সার্ট-পার্টির আমরা জন কয়েক গুরু-ভাই একবার হিমাইতপুর আশ্রমে গিয়া দিন কতক ছিলাম। একদিন বিকালে পদ্মার ধারে ঠাকুর-ঘরের বারান্দায় বসিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের অপূর্ব কথামৃত পান করিতেছি, এমন সময় কিশোরীদা দল-বল লইয়া কীর্তন করিতে করিতে আশ্রম-প্রাঙ্গণে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আশ্রমবাসী অনেকেই আসিয়া তখন সে কীর্তনে যোগ দিলেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই কীর্তন খুব জমিয়া উঠিল। আলাপ-আলোচনার মধ্যে শ্রীশ্রীঠাকুর একবার বলিয়া উঠিলেন,—"ওরা জোর কীর্তন চাল্যাচ্ছে, আর থাকা যায় না।" এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি আসন হইতে উঠিয়া পড়িলেন এবং ত্বরিতপদে যাইয়া কীর্তনে যোগ দিলেন। আমরাও তাঁহার পিছন পিছন যাইয়া কীর্তনে নামিলাম।

কিশোরীদা, তরণী ভাই, কোকন ভাই প্রভৃতি সকলে উদ্দাম নৃত্যে তুমুল কীর্তন করিতেছেন। ঠাকুর কীর্তন-দলের মধ্যস্থলে পদ্মার দিকে মুখ করিয়া ঊর্দ্ধবাহু হইয়া অপরূপ ভঙ্গিমায় অবিরাম নৃত্য করিতেছেন। "রাধা রাধা রাধা বোল"'র প্রাণ-মাতানো গুরু-গম্ভীর ধ্বনিতে চতুর্দিক মুখরিত হইয়া উঠিয়াছে। সেই প্রাণোন্মাদী অপূর্ব কীর্তনের কথা ভাষায় প্রকাশ করিবার শক্তি আমার নাই। আমরা কলিকাতা নগরীর সৌখিন গায়ক যন্ত্র কণ্ঠসঙ্গীতের সূক্ষ্ম শিল্প-কলার চর্চা করিয়া থাকি। ডঙ্কা, শঙ্খ, কাঁসরাদির কর্ণবিদারী বাদ্যের সঙ্গে তাণ্ডব নৃত্য সহ উচ্চকণ্ঠে অগণিত বার শুধু "রাধা রাধা রাধা বোল"—এই একটি মাত্র চরণের গীতিতে এইরূপ অদ্ভুত কীর্তন আমাদের রুচিসম্মত না হওয়ারই কথা। কিন্তু সেদিন আমাদের এক অত্যাশ্চর্য অভিনব অভিজ্ঞতা লাভ হইল। কীর্তনের সঙ্গে কিছুকাল থাকিবার পরই আমরা ইহার অপূর্ব আকর্ষণী ও উন্মাদনী শক্তি উপলব্ধি করিলাম। আত্মভোলা হইয়া আমরা সেদিন অপরাহ্ণ হইতে গভীর রাত্রি পর্যন্ত কীর্তনামোদে মত্ত ছিলাম। বলিতে কি, সে রাত্রির সেই অপূর্ব আনন্দানুভূতির কথা জীবনে কোনদিন ভুলিতে পারিব না।

১৬

অবিনাশচন্দ্র অধিকারীর বিবৃতি

[অবিনাশচন্দ্র অধিকারী পাবনা-সহরের অন্তঃপাতী হিমাইতপুরের পার্শ্ববর্তী নাজিরপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি শ্রীশ্রীঠাকুরের আদিযুগের অন্যতম অন্তরঙ্গ পার্ষদ পরম বৈষ্ণব বৃন্দাবনচন্দ্র অধিকারী বি-এল্ মহাশয়ের পুত্র। পিতৃদেবের প্রেরণায় অবিনাশচন্দ্র ছাত্রাবস্থায়ই শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীচরণাশ্রয় লাভে ধন্য হইয়াছিলেন এবং যৌবনারম্ভ হইতেই তাঁহার একজন বিশিষ্ট সেবকরূপে পরিগণিত হইয়াছিলেন। এম্-এ ও বি-এল্ পরীক্ষা পাশ করিয়া তিনি প্রথমে

পাবনা জজকোর্টে এবং পরে কলিকাতা হাইকোর্টে আইন ব্যবসায় করেন। কুশল আইনজীবী বলিয়া তাঁহার যথেষ্ট সুনাম ছিল। 'সৎসঙ্গ'-প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলীর সহিত অবিনাশচন্দ্র আজীবন ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। এই প্রতিষ্ঠানের সর্বপ্রথম 'কাউন্সিল'-এর তিনি ছিলেন শ্রীশ্রীঠাকুরের মনোনীত অন্যতম সদস্য। এই পদের নানা গুরু দায়িত্ব পালন এবং প্রতিষ্ঠানের মুখপত্র "সৎসঙ্গী"-পত্রিকার সম্পাদনে তিনি বিশেষ যোগ্যতার পরিচয় দিয়া সকলের অকুণ্ঠ প্রশংসা অর্জন করিয়াছিলেন। দুঃখের বিষয়, প্রৌঢ়াবস্থায় অকালে তাঁহার জীবন-প্রদীপ নির্বাপিত হয়। সদালাপী, সেবাপটু ও সজ্জন বলিয়া অবিনাশচন্দ্র আশ্রমবাসী সকলেরই বিশেষ শ্রদ্ধা ও ভালবাসার পাত্র ছিলেন।]

সে ১৯১৪ সালের জুন মাসের কথা। আমি তখন পাবনা কলেজে I. A. পড়ি। আমার পিতা সুপণ্ডিত পরম বৈষ্ণব স্বর্গীয় বৃন্দাবনচন্দ্র অধিকারী মহাশয় পাবনা জজকোর্টে ওকালতি করিতেন। ঐ বৎসর মে মাসে আমার জ্যেষ্ঠভ্রাতা সুরেশচন্দ্র অধিকারীর মৃত্যু হয়। পিতাঠাকুর এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় একান্ত অভিভূত হইয়া পড়েন। দাদার মৃত্যুর কয়েক দিন পরেই তিনি পাবনার বাসা ছাড়িয়া দিয়া নাজিরপুর গ্রামে আমাদের নিজ বাড়ীতে সপরিবারে বাস করিতে থাকেন। তিনি কিছুতেই মন স্থির করিতে পারিতেছিলেন না। এই অবস্থায় দিবসের অধিকাংশ সময়ই তিনি জপ-ধ্যানে কাটাইতেন। মাঝে মাঝে ধ্যান করিতে করিতে তাঁহার দুই চক্ষু জলে ভরিয়া আসিত। এই সময় হিমাইতপুর হইতে ঠাকুর ও অনন্ত মহারাজ প্রায়শ পিতৃদেবের নিকট আসিয়া ধর্মতত্ত্ব সম্বন্ধে নানা আলাপ-আলোচনা করিতেন। তাঁহারা উভয়েই পিতাঠাকুরকে তাঁহাদের গ্রামে গিয়া কীর্তনে যোগ দিতে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাইলেন। ইহাতে পিতৃদেব যেন শান্তির আশ্রয় পাইলেন। তখন হইতে তিনি প্রত্যহ রাত্রিতে তাঁহাদের কীর্তনে যোগ দিতে লাগিলেন। দেখিয়াছি, তখন তিনি সারাদিন কোর্টের কাজের পরিশ্রমের পর বাড়ী ফিরিয়াই হিমাইতপুর চলিয়া যাইতেন এবং সমস্ত রাত্রিটাই সেখানে ঠাকুরের সহিত কীর্তনে ও ধর্মালোচনায় কাটাইতেন। এভাবে মাসের পর মাস যদিও তিনি একটুও ঘুমাইতেন না, তথাপি এতটুকুও দুর্বলতা বোধ করিতেন না। পরন্তু, তাঁহার শ্রমশক্তি যেন দ্বিগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছিল। তখন প্রায়শই তিনি বলিতেন,—"অনুকূলের সংস্পর্শে এসে আমি যেন নবজীবন পেলাম। মনে হয়, আমার উৎসাহ যেন এখন full-steamed engine-এর মত।"

একদিন পিতৃদেব আমাকে বলিলেন,—"চল্, আজ কীর্তন দেখবি। জীবনে যা কখনও দেখিসনি বা কোনদিন দেখবার সম্ভাবনা নাই, তাই দেখতে পাবি।" আমি বলিলাম—"ধর্ম-পুস্তকে তো কত-কিছু পড়েছি। নূতন আর কি দেখবো!" পিতৃদেব উদ্দীপ্ত হইয়া বলিলেন,—"ধর্ম-পুস্তকে Revelation-এর কথা পড়েছিস? কখনও তা বিশ্বাস করিস?" আমি বলিলাম,—"না, ওটা Church-men's dodge." তিনি বলিলেন,—"বটে! সেটা যে কি, তাই

নিজে প্রত্যক্ষ করবি আজ।" আমি কৌতূহলী হইয়া ব্যাপারটা জানিতে চাহিলাম। তিনি বলিতে লাগিলেন,—"আমি কীর্তনে গিয়ে দেখি, কীর্তন করতে করতে অনুকূল অজ্ঞান হ'য়ে পড়ে, তার হাত-পা stiff হ'য়ে যায়, প্রাণের কোন স্পন্দন থাকে না, অথচ মনে হয় যেন স্বর্গের কোন্ এক পবিত্র সুরে তিনি মর্ত্যবাসীকে আহ্বান কচ্ছেন কোন সুরলোকে। এমন অনেক দিন আগেও হয়েছে, শুনেছি। কিন্তু ওর সঙ্গীরা আমল দেয়নি। শেষে আমার সম্মুখেও ঐরূপ হ'লো। ঐরূপ অবস্থা দেখে আমি বললাম,—"অনন্ত, এ যে সমাধির অবস্থা থেকে ভাববাণী হচ্ছে। তোমরা এর সদ্ব্যবহার কর।" অনন্ত মহারাজ উত্তর দিলেন,—"এমন তো আরও অনেক দিন হয়েছে। আমরা তো কিছু করিনি।" আমি বললাম,—"এ তো শ্রীগৌরাঙ্গের ভাব। পুঁথিতে পড়েছি, শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর এইরূপে সমাধি অবস্থায় বাণী বেরুত। যাঁরা অবতার পুরুষ, তাঁদেরই শুধু সমাধি অবস্থায় এইরূপ হয়। বিশ্বহিতের জন্য তাঁদের জন্ম। তাই তাঁরা এরূপ অবস্থায় গিয়েও মর্ত্যের সঙ্গে যোগসূত্র রক্ষা করেন। সুতরাং আর অবহেলা নয়। এখন থেকে তিন-চারি জন মিলে এগুলি লিখতে সুরু কর। এ যেন আর একটুও নষ্ট না হয়। পূর্বেও তোমাদের একথা বলেছি। খুব শুদ্ধ শরীরে তাঁকে স্পর্শ করবে, নতুবা তিনি কষ্ট পাবেন।" তখন হ'তে ভাববাণী লেখার চেষ্টা সুরু হ'লো। কীর্তন-অবস্থায় তিনি অচেতন হ'লেই তাঁর কয়েকজন বিশিষ্ট সঙ্গী তাঁকে ঘিরে থাকেন এবং বাণী বেরুলে তা' লিখে নেন। কথাগুলি তিনি এত দ্রুত বলেন যে, শত চেষ্টাতেও সকল কথা লিখে ওঠা সম্ভবপর হয় না, এজন্য অনেক কথা বাদও পড়ে যায়। আবার অনেক সময় নানা দুর্বোধ্য ভাষায় (বোধ হয় French, Latin-এ) যে কথা বলেন সেগুলো আর লেখা হয় না।"

পিতাঠাকুরের কথায় কৌতূহলী হইয়া আমি সেদিন রাত্রিতে আমার জনৈক বন্ধু শ্রীনারায়ণচন্দ্র শিকদারকে সঙ্গে লইয়া হিমাইতপুর রওনা হইলাম। সেদিন পিতৃদেবের সহিত ঠাকুরের কিছুক্ষণ ধর্মালোচনা হওয়ার পর কীর্তন সুরু হইল। আমরাও কীর্তনে যোগ দিলাম। কীর্তন যখন পূর্ণবেগে চলিতেছে, ঠাকুর কীর্তনে নামিলেন। সকলেই তখন নামের তালে উন্মত্ত। ঢাকের বাদ্য নৈশ গগন প্রতিধ্বনিত করিয়া পদ্মার পরপারে ধাক্কা খাইতেছে। এই সময় অকস্মাৎ ঠাকুর অচেতন অবস্থায় মাটিতে পড়িয়া গেলেন। কীর্তন থামিয়া গেল। অনন্ত মহারাজ ও কিশোরীমোহন প্রভৃতি কয়েক জন ঠাকুরের দেহখানা উত্তোলন করিয়া তাঁহার পৈতৃক গৃহের পশ্চিমদ্বারী ঘরের মধ্যে লইয়া গেলেন। অপর সকলে ঘরের বাহিরে ঔৎসুক্যভরে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। তখন বাণী বাহির হইতে লাগিল। কেহ কেহ তাহা লিখিতে আরম্ভ করিলেন, আমিও লিখিয়াছিলাম কিছুক্ষণ। আমি তখন কৌতূহল বশতঃ ডাক্তার অনন্ত মহারাজের নিকট হইতে তাঁহার 'ষ্টেথেস্কোপ্'খানা চাহিয়া লইয়া তাহা দিয়া ঠাকুরকে পরীক্ষা করিলাম। দেখিলাম, তাঁহার বক্ষের স্পন্দন তিলমাত্র নাই।

আমার বন্ধু নারায়ণও পরীক্ষা করিলেন। তিনিও তাঁহার মধ্যে কোন স্পন্দন অনুভব করিলেন না। অথচ এই অবস্থায় তাঁহার মুখ দিয়া বাণী নিঃসৃত হইতেছে। সে বাণীতে অনুকূলচন্দ্র চক্রবর্তীর স্বর নাই। এ যেন কোন পরমকারুণিক দেবতা অপার স্নেহে চরম পবিত্রতা সুরে ঢালিয়া বিশ্ববাসীকে শান্তি পরিবেষণ করিতেছেন। ঠাকুর যেন তাহার Medium—বক্তা—যেন পৃথক ব্যক্তি। এ কি পরম বিস্ময়! হস্তপদ মৃতদেহের মত কঠিন। বক্ষের বা অন্য কিছুরও কোনও স্পন্দন নাই, শুধু একটা নাড়িতে অবিরাম বিদ্যুৎকম্পন হইলে যেরূপ একটানা স্পন্দনের স্রোত চলে, পা হইতে উপরের দিকে সেইরূপ একটা একটানা স্পন্দন শরীরের মধ্যে চলিতেছে, বৃদ্ধাঙ্গুলিটি কাঁপিতেছে, আর বোঁ বোঁ শব্দের মত শব্দ হইতেছে, যেন telegraph post-এর মধ্যে electric current pass করিতেছে। নিজে প্রত্যক্ষ না করিলে কখনও ইহা বিশ্বাস করিতাম না। মধুর স্বরে কর্ণের কাছে এখনও যেন বাজিতেছে তাঁহার সেদিনের বাণী ঃ—"Children! You must fix your attention at the root of the nose to have 'you' and draw the spirit-current onward. This was my policy when I was Jesus. You can search the Holy Book."

বাহিরে আসিয়া দেখিলাম, উঠানে কুকুরগুলি ঐ ঘরের দিকে তাকাইয়া আছে। রাত্রির নিস্তব্ধ অন্ধকারে পার্শ্ববর্তী বৃক্ষগুলি যেন সেই পরম পবিত্রতায় স্নাত হইতেছে। এই পবিত্রতায় আমরাও স্নান করিয়াছি, ধন্য হইয়াছি, কৃতার্থ হইয়াছি। কোন্ শুভ মুহূর্তে না জানি জন্মিয়াছিলাম, যাহার জন্য এই অপূর্ব বিস্ময়ের আজিও সাক্ষী হইয়া আছি,—যাহা হয়ত কত যুগ পরে ঘটে, যাহা হয়ত আর ঘটিবে কিনা কে জানে! যেখানে বিজ্ঞানের সকল সন্ধান স্তব্ধ হইয়াছে, সেই জগতের প্রত্যক্ষ সন্ধান মিলিল। হৃদ্‌স্পন্দন না থাকিলেও যে জীবন-ধারা অক্ষুণ্ণ থাকে, ইহাই পরম বিস্ময়। বলা বাহুল্য, বিজ্ঞানের মাপ-কাঠির বহু ঊর্ধ্বে অবস্থিত সেই অনাবিষ্কৃত দেশ।

১৭

কালীষষ্ঠী সাহার বিবৃতি

[কালীষষ্ঠী সাহার স্বামীর নাম পূর্ণচন্দ্র সাহা বি. এল্। ইঁহাদের নিবাস নদীয়া জিলায় কুষ্টিয়া মহকুমার অধীন খোকসাজানিপুর গ্রাম। পূর্ণচন্দ্র কুষ্টিয়া কোর্টে ওকালতি করিতেন। এক সময় কুষ্টিয়া সহর ও ইহার অন্তঃপাতী গ্রামাঞ্চল সমূহ শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রাণোন্মাদী কীর্তনের প্রবল বন্যায় ভাসিয়া গিয়াছিল। ঐ সময় সহরের গণ্যমান্য উকীল, মোক্তার, ডাক্তার, শিক্ষক, ব্যবসায়ী এবং চতুষ্পার্শ্বের অসংখ্য নরনারী জাতিবর্ণ-নির্বিশেষে ঠাকুরের প্রচারিত সত্যনামে দীক্ষা-গ্রহণ করেন। তৎকালে পূর্ণচন্দ্রও সপরিবারে

তাঁহার শ্রীচরণাশ্রয় লাভ করিয়া ধন্য হন। তদবধি তিনি ঠাকুরের আদেশ ও নির্দেশে নানা জনকল্যাণ কর্মে আত্মনিয়োগ করিয়া জীবন যাপন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার ভক্তিমতী স্ত্রীও দীর্ঘকাল শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীচরণ-সান্নিধ্যে থাকিয়া ইষ্টাদর্শে সংসার-ধর্ম পালন করিয়া সম্প্রতি স্বর্গতা হইয়াছেন।]

কত কালের কথা। সব এখন স্পষ্ট মনে নেই। ঠাকুর একবার কীর্তনের দল নিয়ে কুষ্টিয়ায় এসে দিনকয়েক অশ্বিনী মোক্তারের ও কয়েক দিন হরিশ রায় উকীলের বাসায় ছিলেন। ঐ সময় মোক্তার নীরদ রায়, ডাক্তার যতীন রায়, অশ্বিনী মোক্তার, গোকুল ডাক্তার, ডাক্তার সতা দত্ত প্রভৃতি কুষ্টিয়ার বড় বড় ভক্তেরা ঠাকুরকে নিয়ে এলেন একদিন আমাদের গ্রামের গদাধর সাহার বাড়ীতে। ঠাকুর দুইদিন সেখানে ছিলেন। সে বাড়ীতে তখন দিবারাত্র কীর্তন চলতো ও বহু লোকের সমাগম হ'তো। তারপর ঠাকুর উঠে এলেন গ্রামের স্কুলের বোর্ডিং-বাড়ীতে।

একদিন বোর্ডিং-বাড়ীর সম্মুখ দিয়ে পাড়ার লোকেরা কীর্তন নিয়ে যাচ্ছিল। কীর্তন শুনে ঠাকুর ভাবে বিভোর হ'য়ে দৌড়ে এসে কীর্তনের সম্মুখে ঝাঁপিয়ে পড়লেন এবং নাচতে নাচতে কীর্তনের আগে ছুটে চললেন। কীর্তনের দলটি তাঁর পিছন পিছন চলতে লাগলো। বোর্ডিং-বাড়ী আমাদের বাড়ী থেকে আধ মাইল দূরে। ঐ সময় অনন্ত মহারাজ ছিলেন আমাদের বাড়ীতে। তিনি এসেছিলেন সৎনামে দীক্ষা নেওয়ার সম্বন্ধে আমার সঙ্গে কথাবার্তা বলতে। রাধিকা নামে এক ব্যক্তি তখন কাঁদতে কাঁদতে ছুটে এসে তাঁকে বলল, "মহারাজ, শীগ্‌গির আসুন, ঠাকুর ভাবে বিভোর হ'য়ে নাচতে নাচতে ছুটে চলেছেন, কোথায় গিয়ে পড়বেন কে জানে!" তার কথা শুনে মহারাজ ব্যস্ত-সমস্ত হ'য়ে তৎক্ষণাৎ ছুটে চললেন ঠাকুরের উদ্দেশ্যে। তিনি ঘর থেকে বাইরে এসে দেখতে পেলেন, ঠাকুর অন্যদিকে না গিয়ে নাচতে নাচতে আমাদের বাড়ীর দিকে আসছেন।

ঠাকুর নাচতে নাচতে আমাদের উঠানের আঙ্গিনায় এসে উপস্থিত হলেন। কীর্তনের দলের লোকেরাও তখন উঠানে এসে জড় হ'লো। এদিকে আবার চারিপাশের গ্রামাঞ্চলের কীর্তনের দলের লোকেরাও খোল-করতাল বাজিয়ে কীর্তন করতে করতে আমাদের বাড়ীতে এসে উঠলো। ক্রমেই এত অধিক সংখ্যায় লোক আসতে লাগল যে, বাড়ীতে তিল ধারণেরও আর স্থান রইল না। ওদিকে গোঁসাইবাবা, কিশোরী, তরণী, কোকন প্রভৃতি যে সকল ভক্তেরা পূর্বদিন শৈলকূপা গিয়েছিলেন কীর্তন করতে, তাঁরাও এসে তখন এই কীর্তনে যোগ দিলেন। শত শত লোকের সে কি তুমুল কীর্তন আরম্ভ হ'য়ে গেল! পুরুষেরা মনের আনন্দে হরিধ্বনি ও মেয়েরা হুলুধ্বনি দিতে লাগলো। অসংখ্য শঙ্খ, ঘণ্টা, কাঁসর, ঝাঁজ ও জয়ঢাকের বিপুল শব্দে কান ঝালা-পালা হ'য়ে যাবার মতো হ'লো।

ঠাকুর কীর্তনের মাঝখানে তন্ময় হ'য়ে দুই হাত উপরে তুলে অপূর্ব ভঙ্গীতে

নৃত্য কচ্ছেন, তাঁর শরীর থেকে উজ্জ্বল আলোর অসংখ্য কণা ঠিক্‌রে বেরুচ্ছে। তাঁর সে কি অপরূপ মনোমোহন মূর্তি! এই অবস্থায় কেউ দেখলো তাঁকে শ্রীকৃষ্ণ রূপে, কেউ শ্রীরাম রূপে, কেউ বা দেখলো শ্রীগৌরাঙ্গ মূর্তিতে।

প্রাতে সাড়ে ন'টায় কীর্তন আরম্ভ হয়েছিল। এগারটার উপর বেজে গেল। এতক্ষণ ধ'রে অবিরাম নাচতে নাচতে ঠাকুর তখন ভাবদশায় অজ্ঞান হ'য়ে মাটির উপর প'ড়ে গেলেন। কিছুক্ষণ বাদে তাঁর মুখ দিয়ে বাণী বেরুতে লাগলো। এই অপূর্ব দৃশ্য দেখে নারী-পুরুষ সকলে উচ্চ কণ্ঠে নাম করতে লাগলো। কেউ কেউ 'হরিবোল' 'হরিবোল' ব'লে কাঁদতে লাগলো। অনেকে কত স্তব-স্তুতি করতে লাগলো—হে ভগবান, এ কি তোমার মহিমা! ঠাকুর রক্ষা কর, রক্ষা কর।·········

প্রায় এক ঘণ্টা বাণী বেরুবার পর ঠাকুর বললেন,—"আমায় একটু জল দে, বড় পিপাসা, আমি জল খাবো। মাছের বাসনে কিন্তু জল দিস্‌নে। যে আমায় আহবান ক'রে নিয়ে এসেছে, সেই আমায় জল দেবে।" আমি তখন শ্বেত পাথরের গ্লাসে ক'রে তাঁকে জল খেতে দিই। সকলে তখন ঠাকুরকে উঠান থেকে তুলে নিয়ে ঘরের বারান্দায় বিছানার উপর শুইয়ে দিলেন। সমাধির ভাবটা তখনো অনেকটা র'য়ে গেছে। যাঁরা তাঁর কাছে ছিলেন, আধা-চেতন অবস্থায় ঠাকুর তাঁদের কোলে শুয়ে গলা জড়িয়ে ধ'রে আদর করতে লাগলেন। ক্রমে তাঁর সহজ স্বাভাবিক অবস্থা সম্পূর্ণই ফিরে এল। বেলা তখন প্রায় পৌণে একটা।

তখন ছিল শ্রাবণ মাস। কীর্তনের সময় উঠানের শেওলা-কাদা সব ঠাকুরের গায় লেগে গিয়েছিল। ঠাকুরকে নিয়ে তখন সবাই গেলেন গোড়াই নদীতে। ঠাকুর ভক্তদের সঙ্গে নদীতে নেমে স্নানের আনন্দ-আমোদে অনেকক্ষণ কাটিয়ে সবাইকে নিয়ে বোর্ডিং-বাড়ীতে ফিরে এলেন। সেখানেই ঠাকুরভোগ দেওয়া হ'লো। হেডমাষ্টার যোগেন সরকার, প্রমথ সিকদার এবং আরও অনেকে সেদিন সৎ-নামে দীক্ষা নিলেন।

সেদিন আমাদের বাড়ী থেকে স্নানে যাবার সময় ঠাকুর আমাকে ব'লে গিয়েছিলেন,—"বিকেলে খাবার ঠিক ক'রে রাখিস। আমি কিন্তু এসে খাবো।" আমি মালপোয়া ভেজে রেখেছিলাম, আর ঘরে ফজলী আম ছিল। ঠাকুর সাঙ্গোপাঙ্গো নিয়ে সন্ধ্যার পূর্বে আমাদের বাড়ী এলেন। ভোগ দেওয়া হ'লো। রেকাবী থেকে খাবার তুলে নিয়ে ঠাকুর নিজে একটু মুখে দিলেন ও উপস্থিত সবাইকে বিলিয়ে দিলেন।

জানিপুরে আর একদিন থেকে ঠাকুর বরৈচরা রওনা হলেন, সেখান থেকে গেলেন রাতুলপাড়ায় যোগেন সরকারের বাড়ীতে।

১৮

শ্রীশচন্দ্র দত্তের বিবৃতি

[শ্রীশচন্দ্র দত্ত শ্রীশ্রীঠাকুরের কৃপাধন্য কুষ্টিয়ার সত্যচন্দ্র দত্ত ডাক্তারের অগ্রজ। ১৩২১ বঙ্গাব্দে শ্রীশ্রীঠাকুরের সর্বপ্রথম কুষ্টিয়ায় পদার্পণ-কালে তিনি তাঁহার শ্রীচরণে দীক্ষা গ্রহণ করিয়া ধন্য হন। শ্রীশচন্দ্র যন্ত্র ও কন্ঠ-সঙ্গীতে পারদর্শী ছিলেন। দিবসের অধিকাংশ সময় তিনি তন্ময়চিত্তে সুর-সাধনায় মগ্ন থাকিতেন। তাঁহার কণ্ঠ-নিঃসৃত সঙ্গীত শ্রোতৃবর্গের কর্ণে সুধা বর্ষণ করিত। শ্রীশ্রীঠাকুরকে গীত-বাদ্যে পরিতৃপ্ত করিয়া তিনি অপার আত্মপ্রসাদ লাভ করিতেন। তাঁহার ভাবসমন্বিত অপূর্ব সঙ্গীতালাপ শ্রবণে শ্রীশ্রীঠাকুর অনেক সময় ভাবাবিষ্ট হইয়া পড়িতেন। প্রিয়পরমের সঙ্গসুখ-উপভোগের মধুময় স্মৃতি শ্রীশচন্দ্র আপন সরল মনের সহজ কথায় যাহা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছিলেন, নিম্নে তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করা হইল।]

কেমনে পেয়েছি গুরু বলতে করলাম সুরু।
প্রথম যেদিন ঠাকুর শরণে যাই,
বীরু (১) আমি অশ্বিনী (২) কেটেছে কত যামিনী।
সতীশ (৩) জর্দারের টিনের ঘরেতে ভাই,
কিশোরীর (৪) কীর্তন হ'তো, দেখিতাম ঠাকুর মত্ত,
বাণী যত বের হ'তো লিখিতাম কত জনে।
যেইটুকু পারে সেই তা লিপিবদ্ধ ক'রে
মিলাতাম সকলের লেখা পরদিনে।
যখনই ঠাকুর মত্ত (সমাধি অবস্থায়) বৃদ্ধাঙ্গুলি নড়ত,
ইলেক্‌ট্রিক কারেণ্ট পাচ্ছ যেন হ'ত।
কেউ যদি দেখে থাক, মনে মনে এখন আঁক,
সেদিনের কথা তিনি বলেছেন যত।
'ভাববাণী'র উৎপত্তি এই তো ঠাকুরের কীর্তি
অজ্ঞানে তিনি কিভাবে বলিতেন কথা।
দেখতে আসত কত লোকজন শত শত
তাণ্ডব কীর্তনে তারাও মিলিত তথা।
প্রফুল্লর (৫) বাড়ীর নিকটে বাস তাঁর,

(১) বীরু—কুষ্টিয়ার মোক্তার বীরেন্দ্রনাথ রায়।

(২) অশ্বিনী—কুষ্টিয়ার মোক্তার অশ্বিনীকুমার বিশ্বাস। ইনি প্রসিদ্ধ 'অমিয় বাণী' গ্রন্থের কৃতী সংকলয়িতা। শ্রীশ্রীঠাকুরের অন্যতম অন্তরঙ্গ পার্ষদ।

(৩) কুষ্টিয়ার ডাক্তার সতীশচন্দ্র জোয়ারদার। শ্রীশ্রীঠাকুরের অন্যতম প্রধান পার্ষদ।

(৪) শ্রীশ্রীঠাকুরের বাল্যসখা ও অন্তরঙ্গ পার্ষদ গুণধর কিশোরীমোহন দাস।

(৫) প্রফুল্ল—কুষ্টিয়ার উকীল প্রফুল্লকুমার রায়। শ্রীশ্রীঠাকুরের তৎকালীন অন্যতম প্রধান পার্ষদ।

চতুর্থ দিবসে তিনি বলেন, যাব অশ্বিনীর ঘর,
সেখানে না যেয়ে রহেন তিনি প্রফুল্লর টিনের আলয়ে,
এখনও ব্যবহারে আছে সেই ঘর।
কত লোক-সমাগম কেবল জানিতে মর্ম,
ইনিই হবেন কিনা বিশ্বগুরু অবতার।
পরদিন সন্ধ্যাবেলা সেতার লইয়া মেলা
করিলাম ঠাকুরের আদেশ মত।
তিনি বলিলেন,—'দাদা, বাজাও তো সেই রাধা,
হয় সুর যেন পঞ্চম পর্দায় গীত।
সেতারের ছড়ের সঙ্গে নাচিয়া উঠিলেন রঙ্গে,
অমনি কীর্তন ধরিল কিশোরী তালে।
দুই হস্ত প্রসারিয়া (ঠাকুর) অত্যন্ত বেগে ঘুরিয়া
ভাবগ্রস্ত হইয়া পড়িলেন ভূতলে।
ইলেকট্রিক কারেণ্ট পা হ'তে সর্ব অঙ্গেতে
আশ্চর্যরূপে নাচিতে লাগিল।
অন্যান্য সেবকগণে বাণী লেখে সেই স্থানে
যে যত যেখান হইতে লিখিতে পারিল॥

১৯

নলিনীন্দুশেখর দত্তের বিবৃতি

[নলিনীন্দুশেখর কুষ্টিয়ার বাদ্যবিশারদ শ্রীশচন্দ্র দত্তের পূর্ববর্তী বিবৃতিকার পুত্র। অধুনা তিনি ২৪ পরগণা জিলার বারাসতে বাস করেন।]

কুষ্টিয়ায় শ্রীশ্রীঠাকুরের কীর্তন-লীলার সময় আমি ছিলাম এক কিশোর বালক। তাঁর সে-সময়কার দু'চারটি মাত্র ঘটনা যা এখনো আমার স্মৃতিতে উজ্জ্বল হ'য়ে আছে, তাই বলছি।—

বাংলা ১৩২৩ সালের কথা। তখন আমার বয়স ১৩ বৎসর। একদিন আমি বাবার ঘরে ব'সে হারমোনিয়াম বাজিয়ে,—"সকল দুয়ার হইতে ফিরিয়া তোমারি দুয়ারে এসেছি ..." গানটি শিখছিলাম। সে সময় ঠাকুর আমাদের বাড়ীতে এলেন। ঘরের বারান্দায় ব'সে তিনি বাবাকে জিজ্ঞাসা করলেন,—"শ্রীশদা, গান করছে কে?" বাবা বল্লেন,—"বোধ হয় খোকা গাইছে।" ঠাকুর তখন বাবাকে বললেন আমাকে ডাকতে। আমি এলে ঠাকুর আমাকে তাঁর কোলে বসিয়ে বললেন,—"তুই তো বেশ গান করিস। গা, গা তো লক্ষ্মী।" তাঁর কোলে ব'সে গান ধরেছি। কিছুক্ষণ বাদেই বোধ করলাম তাঁর সর্বাঙ্গ কাঁপছে! আমি তখন ভয়ে তাঁর কোল থেকে নেমে পড়লাম। আর একটু পরে ঠাকুর অজ্ঞান হয়ে মাটির উপর প'ড়ে গেলেন। তখন তাঁর দেহে কি জানি কত কিছু সব হ'তে

লাগলো। সে-সব কথা এখন আর কিছুই আমার স্মরণে নেই। তারপর দেখলাম, তাঁকে নিয়ে বাড়ীশুদ্ধ সবাই ব্যস্ত হ'য়ে পড়েছেন এবং সকলে মিলে জোর কীর্তন করছেন। প্রায় এক ঘণ্টা পরে ঠাকুরের জ্ঞান ফিরে এল। ঠাকুরকে নিয়ে তখন কীর্তন করতে করতে সবাই চললেন অশ্বিনী কাকার বাসার দিকে। বাবার কাছে পরে শুনলাম, ওটাকে নাকি "সমাধি" বলে।

আর এক দিনের ঘটনা। আমি বৈঠকখানা ঘরের বারান্দায় ব'সে পড়ছিলাম। বাবা ভিতরে সেতারে বাজাচ্ছিলেন। এমন সময় কিশোরী কাকা, মহারাজ এবং আরও অনেকে কীর্তন করতে করতে আমাদের বাড়ীতে এলেন। তাঁদের কীর্তন যখন খুব জমে উঠেছে, ঠাকুরও তখন কয়েক জন সঙ্গীসহ কোথা থেকে এসে কীর্তনে যোগ দিলেন। তুমুল বেগে কীর্তন চলতে লাগল। তখন দেখলাম, পাড়ার কয়েকটা কুকুর ও গয়লা পাড়া থেকে কতকগুলি গরু ছুটে এসে জোরে শব্দ করতে করতে কীর্তনের সঙ্গে তালে তালে মনের আনন্দে লাফাতে লাগলো। কীর্তনের সময় মনে হচ্ছিল, চারিদিকের গাছ-প্যালা সব-কিছু যেন কাঁপছে। ইতিমধ্যে বাবাও এসে কীর্তনে যোগ দিলেন। আমাদের বাড়ীতে অনেকক্ষণ কীর্তন ক'রে সকলে কীর্তনের দল নিয়ে প্রফুল্ল কাকার বাড়ীর দিকে রওনা হলেন।

আর একদিন দেখেছিলাম, ঠাকুর বহু লোকজন নিয়ে কীর্তন করতে করতে আমাদের বাড়ীর সম্মুখের রাস্তা দিয়ে চলেছেন। সে সময় বহু লোক ঠাকুরের গলায় ফুলের মালা দিচ্ছিল। আমাদের পাড়ার নন্দ সরকারের খুড়ীমাও (তাঁর ডাক নাম বাঁকা বৌ) তাঁর গলায় একগাছি মালা দিয়েছিলেন। ঠাকুর মালাগুলো গলায় নিয়ে নাচতে নাচতে বাবার কাছে এসে মালাগুলো সব বাবার গলায় পরিয়ে দিলেন।

২০

গোপালচন্দ্র কর্মকারের বিবৃতি

[গোপালচন্দ্রের পিতার নাম নন্দলাল কর্মকার, নিবাস কুষ্টিয়ার অন্তর্গত খোকসা-জানিপুর। ১২৯৮ বঙ্গাব্দে কুষ্টিয়ার পার্শ্ববর্তী কমলাপুর গ্রামে মাতুলালয়ে তাঁহার জন্ম হয় এবং সেখানেই তাঁহার বাল্য জীবন অতিবাহিত হয়। দশ বৎসর বয়সে তিনি কুষ্টিয়ার জালিরাম আগরওয়ালার কাপড়ের দোকানে শিক্ষা-নবিশের কার্য গ্রহণ করেন। অতঃপর তিনি নিজেই একটি কাপড়ের দোকান স্থাপন করেন। ব্যবসায়ে উন্নতি করিয়া তিনি কুষ্টিয়ায় নিজেই বাড়ী করিয়া বাস করিতে থাকেন। ১৩২১ বঙ্গাব্দে শ্রীশ্রীঠাকুরের কুষ্টিয়ায় আগমনকালে তিনি তাঁহার শ্রীচরণে সস্ত্রীক দীক্ষা গ্রহণ করেন। কিছুকাল পূর্বে তিনি বৈদ্যনাথধামে শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীচরণ-সকাশে পরলোক গমন করিয়াছেন।]

১৩২১ বঙ্গাব্দের কথা। শ্রীশ্রীঠাকুর হিমাইতপুর হইতে কুষ্টিয়ায় আসিয়াছেন। কিশোরীদা, নফরদা, কোকনদা, তরণীদা প্রভৃতি ঠাকুরের কীর্তনদলের প্রধানরাও

তাঁহার সঙ্গে আছেন। সেদিন ডাক্তার সত্য দত্তের বাড়ীতে সন্ধ্যার পর কীর্তন হইতেছে। কিশোরীদা তাঁহার দলবল লইয়া কীর্তন আরম্ভ করিয়াছেন। সতীশ জোয়ারদার, বীরু রায়, অশ্বিনী বিশ্বাস, বিধু প্রামাণিক, বসন্ত রায়চৌধুরী প্রভৃতি আমরা স্থানীয় গুরুভাইরা এবং বাহিরেরও অনেকে সেই কীর্তনে যোগ দিয়াছেন। উঠানে সামিয়ানার নীচে কীর্তন হইতেছে। "নিতাই এনেছে নাম, রাধা রাধা রাধা বোল"—শুধু এই পদটিই বার বার গীত হইতেছে। জয়ঢাক, কাঁসর, ঝাঁজ ও ঘণ্টা উচ্চ শব্দে কানে তালি লাগিয়া যাইতেছে। সে কি তুমুল কীর্তন! এই সময় দেখিলাম, দুই তিনটা কুকুর কোথা হইতে ছুটিয়া আসিয়া পাগলের মত লাফাইতে লাফাইতে কীর্তনের সঙ্গে ঘুরিতে লাগিল। কিছু দূরে কয়েকটা গাভী নিশ্চলভাবে দাঁড়াইয়া কীর্তনের দিকে এক দৃষ্টে চাহিয়া আছে, মনে হইল, তারাও যেন প্রাণ ভরিয়া কীর্তনের আনন্দ উপভোগ করিতেছে।

রাত্রি ১০টার সময় ঠাকুর আসিয়া কীর্তনে নামিলেন। তাঁহাকে পাইয়া ভক্তগণের ভাবের আবেগ শতগুণ বাড়িয়া গেল। ঠাকুর দুই হাত উপরে তুলিয়া নানা ভঙ্গিমায় নাচিয়া নাচিয়া কীর্তন করিতে লাগিলেন। তাঁহার সোনার অঙ্গের কি অপূর্ব রূপ-মাধুরী! তন্ময় হইয়া নাচিতে নাচিতে তাঁহার চক্ষু দুইটি উপরে উঠিয়া স্থির হইয়া আছে, মাথার চুলগুলি খাড়া। ভাবাবেশে নাচিতে নাচিতে অনেকক্ষণ পরে অজ্ঞান অবস্থায় তাঁহার দেহখানা মাটির উপর পড়িয়া যাওয়ার উপক্রম হইল। সকলে তখন তাঁহাকে ধরাধরি করিয়া ঘরের বারান্দায় একখানা মাদুরের উপর শোয়াইয়া দিলেন। কিছুক্ষণ পরে কীর্তন বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল। আমরা তখন ঠাকুরকে ঘিরিয়া বসিয়া একমনে নাম-জপ করিতে লাগিলাম।

প্রায় আধ ঘণ্টা পর ঠাকুর তাঁহার মাথাটা এ-পাশ-ও-পাশ করিতে লাগিলেন এবং তাঁহার দুই পায়ের বুড়া আঙ্গুল দুইটি দ্রুতবেগে কাঁপিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে তাঁহার মুখ দিয়া বাণী বাহির হইতে লাগিল। বীরু রায়, সতীশ জোয়ারদার প্রভৃতি অনেকে বাণীগুলি খাতায় টুকিতে লাগিলেন। ভাবাবস্থার শেষে ঠাকুর জল খাইতে চাহিলেন। তাঁহাকে জল আনিয়া দেওয়া হইল। জলপানের পর কিঞ্চিৎ সুস্থ হইয়া তিনি সহজভাবে কথাবার্তা বলিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ বিশ্রাম গ্রহণের পর ঠাকুর আহার করিলেন। সত্যদা সেদিন ঠাকুর-ভোগের জন্য উৎকৃষ্ট অন্ন-ব্যঞ্জন, মিষ্টান্নাদির প্রচুর আয়োজন করিয়াছিলেন। ঠাকুর-ভোগের পর আমরা সকলে একসঙ্গে বসিয়া পরমানন্দে প্রসাদ গ্রহণ করিয়া রাত্রি প্রায় দুইটার সময় বাসায় ফিরিলাম।

আর একবার ঠাকুর কুষ্টিয়ায় আসিয়া অশ্বিনী বিশ্বাস মোক্তারের বাসায় আছেন। একদিন আমরা কয়েক জন গুরু-ভাই তাঁহাকে দর্শন করিতে গিয়াছি। সেখানে যাইয়া দেখিলাম, অনেক লোক ঘরের বাহিরে দাঁড়াইয়া ঠাকুরের ভাবাবস্থার কথা পরস্পরে বলাবলি করিতেছে,—"এ সব কিছু নয়, সবই বুজরুকি!

আমাদেরও তো বুদ্ধি আছে, আমরা নিজেরা পরীক্ষা ক'রে দেখব, ব্যাপার সত্য কিনা" ইত্যাদি। আমরা ঘরের ভিতরে ঠাকুরের কাছে চলিয়া গেলাম। তখন উঠানে কীর্তনের আয়োজন হইতেছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই কীর্তন আরম্ভ হইল। কিশোরীদা, নফরদা, কোকিলদা, তরণীদা প্রভৃতির সঙ্গে স্থানীয় বহু ভক্তরাও কীর্তনে নামিলেন। আমার অন্য প্রয়োজন ছিল বলিয়া আমি আর কীর্তনে নামিলাম না, দর্শকবৃন্দের সহিত এক পাশে দাঁড়াইয়া কীর্তন শুনিতে লাগিলাম। কীর্তন যখন খুব জমিয়া উঠিল, ঠাকুর আসিয়া কীর্তনে যোগ দিলেন। তুমুল কীর্তন চলিতে লাগিল। অন্যদিনের মত সেদিনও দীর্ঘ সময় ধরিয়া কীর্তন করিতে করিতে ঠাকুরের ভাবদশা ঘটিল এবং তাঁহার মুখ হইতে বাণী বাহির হইতে লাগিল। ঠাকুর যেখানে শয়ন অবস্থায় ছিলেন, একটি লোক সকলের সাক্ষাতেই সেখানে গিয়া 'ষ্টেথেস্কোপ' যন্ত্র দ্বারা তাঁহার শরীরের নানাস্থান পরীক্ষা করিতে লাগিল। এই সময় চারিপাশের জনতার মধ্য হইতে কয়েকজন মুসলমান মুটে-মজুর চিৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল,—"হায়, হায়, এ কি কাণ্ড! একটা তাজা মানুষের গায় আগুন ধরিয়ে দিয়ে তাকে পুড়িয়ে মেরে ফেলা হচ্ছে! দুর্গন্ধে টেকা যাচ্ছে না! এরা কেমন ধারা মানুষ!" তখন ব্যাপারটির প্রতি উপস্থিত সকলের দৃষ্টি পড়িল,—এক ব্যক্তি টিকা পোড়াইয়া আনিয়া গোপনে ঠাকুরের ডান পায়ের গোড়ালীতে রাখিয়া দিয়াছে এবং তাহাতেই চামড়া পোড়ার বিকট দুর্গন্ধ বাহির হইয়াছে। সকলে তখন দেখিয়া অবাক হইলেন যে, উপরোক্ত নৃশংস অত্যাচারেও ঠাকুরের বিন্দুমাত্র সাড়া-বোধ নাই, তিনি প্রশান্ত গম্ভীরভাবে অনর্গল বাণী বলিয়া যাইতেছেন।

ভাবাবস্থা কাটিয়া গেল। অবশেষে কিছুটা জল পান করিয়া তিনি ধীরে ধীরে সুস্থ হইয়া উঠিলেন, পরে সহজ অবস্থায় শুধু একবার বলিলেন—"হাঁ রে, আমার ডান পা-টা জ্বালা কচ্ছে কেন রে? পায় ফোস্কা প'ড়ে গেছে।" কেহ তাঁহার কথার কোন উত্তর করিল না। তিনিও আর কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলেন না।

২১

রাধাবিনোদ বসুর বিবৃতি

[রাধাবিনোদ বসু ১২৯৭ বঙ্গাব্দের মাঘ মাসে যশোহর জিলার হরিণাকুণ্ড গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম প্রতাপচন্দ্র বসু। রাধাবিনোদ বাল্যে উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের নবম মান পর্যন্ত অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। অর্থাভাবের দরুণ লেখাপড়ায় তিনি আর অধিক দূর অগ্রসর হইতে পারেন নাই। যৌবনের প্রারম্ভে স্বদেশী আন্দোলনের যুগে তিনি বিপ্লবী দলে যোগদান করেন এবং কাশী চলিয়া যান। তথায় বহু বৎসরের যত্ন ও পরিশ্রমে তিনি

হোমিওপ্যাথী চিকিৎসায় যথেষ্ট অভিজ্ঞতা ও সুনাম অর্জন করেন। ঐ সময় তিনি সন্ত সদ্গুরুগণের জীবনী, বাণী ও দোঁহাবলীর সযত্ন অধ্যয়ন ও অনুশীলনে গভীর জ্ঞান সঞ্চয় করেন। তিনি সম্প্রতি পরিণত বয়সে বৈদ্যনাথধামে শ্রীশ্রীঠাকুরের সান্নিধানে বাস করিতেছেন।]

অনেক কাল আগের কথা। লোকজন বড় কেহ তখনও ঠাকুরের কাছে আসে নাই। মহারাজ অনন্তনাথ, যতীন সরকার (শ্রীশ্রীঠাকুরের কম্পাউণ্ডার), বিরাজদা, ডাক্তার যতীন রায়, নফর ঘোষ, গিরীন্দ্র বিশ্বাস প্রভৃতি আমরা মাত্র জন কয়েক সে সময় আশ্রমে থাকিতাম। এক দিনের ঘটনা।—'আমি বিকালবেলা পদ্মার ধারে একাকী দাঁড়াইয়া আছি, এমন সময় শ্রীশ্রীঠাকুর আসিয়া আমাকে বলিলেন,—"চল্, বেড়ায়ে আসি।" তাঁহার শরীর সেদিন খুবই দুর্বল ছিল, কারণ, আট-দশ দিন জ্বরে ভুগিবার পর তিনি সবেমাত্র সেই দিনই অন্ন-পথ্য করিয়াছিলেন। তাঁহার কথায় আমি তাঁহার সঙ্গে রওনা হইলাম। তিনি আমার কাঁধের উপর ভর দিয়া চলিতে লাগিলেন। পথ চলিতে চলিতে শশধর কর্মকারের বাড়ীর কাছে আসিয়া ঠাকুর একটু দাঁড়াইলেন। এই সময় কিশোরীদা কীর্তনের দল লইয়া তাঁহার বাড়ী হইতে আশ্রমের দিকে আসিতেছিলেন। তাঁহারা সকলে দূর হইতে শ্রীশ্রীঠাকুরকে দেখিতে পাইয়া দৌড়াইয়া নিকটে আসিয়া তাঁহাকে ঘিরিয়া কীর্তন করিতে লাগিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুরও এই সময় আমাকে খুব শক্ত করিয়া ধরিয়া কীর্তনের তালে তালে নাচিতে লাগিলেন। তাঁহার শরীর তেমন সুস্থ ছিল না বলিয়া আমি তাঁহাকে খুবই জোরে ধরিয়া রাখিয়াছিলাম, যেন তিনি ইচ্ছামত পূর্ণ উদ্যমে কীর্তনে যোগ দিতে না পারেন। কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই শ্রীশ্রীঠাকুর আমাকে ছাড়িয়া দিয়া তাড়াতাড়ি ছুটিয়া গিয়া কীর্তনে নামিয়া পড়িলেন। কিছু সময় কীর্তন করিবাব পর শ্রীশ্রীঠাকুর হঠাৎ বেগে আশ্রমের দিকে ধাবিত হইলেন। কীর্তনের দলও তখন তাঁহার পিছনে ছুটিয়া চলিল। অতঃপর আশ্রমে পৌঁছিয়া বাবলা-তলায় অনেকক্ষণ ধরিয়া সকলে কীর্তন করিলেন। দেখিতে দেখিতে সেখানে বহু লোক জমিয়া গেল। মহারাজ, বিরাজদা, নফর ঘোষ প্রভৃতি সকলেই আসিয়া একে একে কীর্তনে যোগ দিলেন। ঐ দিন কীর্তনের সময় ঠাকুরের দুইটি আসন হইতে দেখা গেল, তারপর তিনি সমাধিস্থ হইয়া পড়িলেন। সে কি অপূর্ব দৃশ্য! এই সময় অন্য দিনের মত তাঁর ডান পায়ের বুড়ো আঙ্গুলটি থর্থর্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল। এইভাবে অনেকক্ষণ কাটিয়া গেল। আমরা কাগজ পেনসিল লইয়া প্রস্তুত হইয়া রহিলাম বাণী লিখিবার জন্য। কারণ, ঐরূপ অবস্থায়ই সাধারণত তাঁহার বাণী বাহির হইয়া থাকে। কিন্তু সেদিন আর বাণী বাহির হইল না। প্রায় আধ ঘণ্টা পর সমাধি ভাঙ্গিয়া গেল। শ্রীশ্রীঠাকুর তখন "জল—জল, জল খাব—জল খাব" বলিয়া চিৎকার করিয়া উঠিলেন। মহারাজ জল আনিয়া দিলে তিনি তাহা পান করিয়া সুস্থ হইয়া বসিলেন।

২২
সুরেন্দ্রভূষণ বিশ্বাসের বিবৃতি

[সুরেন্দ্রভূষণের পিতার নাম শশিভূষণ বিশ্বাস, জাতিতে পারশব, নিবাস নদীয়া জিলার অন্তর্গত কুষ্টিয়া মহকুমার অধীন কমলাপুর গ্রাম। এককালে তদঞ্চলে ইঁহারা শ্রেষ্ঠ ধনী ব্যবসায়ী বলিয়া খ্যাত ছিলেন। সুরেন্দ্রভূষণ কলিকাতায় 'জেনারেল এসেম্ব্রি ইন্‌স্টিটিউসনে' ২য় শ্রেণী (নবম মান) পর্যন্ত অধ্যয়ন সমাপন করিয়া প্রথম জীবনে প্রভূত মূলধন-বিনিয়োগে বৃহদাকারে কন্‌ট্রাক্টারি ব্যবসায় করেন। বাইশ-তেইশ বৎসর বয়ঃক্রম-কালে কুষ্টিয়া সহরে তিনি শ্রীশ্রীঠাকুরের দর্শন লাভ করেন এবং তাঁহার শ্রীচরণে সৎ-নামে দীক্ষিত হন। তদবধি তিনি তাঁহার শ্রীচরণাশ্রিত হইয়া আছেন। বর্তমানে তাঁহার বয়স আটাত্তর।]

যতদূর স্মরণে পড়ে, বাংলা ১৩২০।১৩২১ সালের কথা। সেকালে শ্রীশ্রীঠাকুর প্রায়শই কীর্তনের দল লইয়া হিমাইতপুর হইতে কুষ্টিয়ায় আসিতেন এবং বেশীর ভাগ সময়ই তিনি তখন কুষ্টিয়ায় কাটাইতেন। মহারাজ অনন্তনাথ, ডাক্তার কিশোরীমোহন, সতীশচন্দ্র গোস্বামী, নফরচন্দ্র ঘোষ, কোকন বুনে এবং কীর্তনের সঙ্গী আরও অনেকে তাঁহার সঙ্গে আসিতেন। সেকালে তাণ্ডব নৃত্যে সংকীর্তনের ব্যবস্থা ছিল। আমরা প্রত্যহ প্রাতে ৮টা হইতে বিকাল ৪টা পর্যন্ত সকলে মিলিয়া তুমুল কীর্তন করিতাম। রাত্রিতেও কীর্তন হইত। কোকন কীর্তনের মধ্যে ঢাক বাজাইত। দূর-দূরান্তের পল্লীবাসীরা সেই তুমুল কীর্তনে আকৃষ্ট হইয়া ছুটিয়া আসিত, দেখিতে দেখিতে কীর্তনের আসর লোকে লোকারণ্য হইয়া যাইত। ঠাকুর কখনও কখনও ভক্তদের লইয়া ঘরের দরজা বন্ধ করতঃ দীর্ঘ সময় ধরিয়া তন্ময় হইয়া কীর্তন করিতেন। সাধারণত আমাদের সকলকে একটানা তিন-চারি ঘণ্টা কীর্তন করিবার পর কীর্তন বন্ধ করতঃ অন্তত এক ঘণ্টাকাল নিবিষ্টমনে ধ্যান করিতে হইত। সেকালে একরূপ সারা দিন-রাতই সকলে কীর্তনে মত্ত থাকিতেন। মাঝে মাঝে শ্রীশ্রীঠাকুর আসিয়া ভক্তদের সঙ্গে কীর্তনে যোগ দিতেন। তাঁহাকে কীর্তনে পাইলে সকলের আনন্দের আর সীমা থাকিত না। তাঁহার সঙ্গে কীর্তন করিতে করিতে আমরা সবাই পাগলের মত হইয়া পড়িতাম।

কীর্তনে নাচিতে নাচিতে কখনও কখনও শ্রীশ্রীঠাকুরের ভাবদশা ঘটিত। ঐ সময় তাঁহার নানা রকমের আসন হইত। একদিন হিমাইতপুরে ঠাকুর-বাড়ীতে শ্রীশ্রীমার কটেজের সম্মুখে কীর্তনকালে ঠাকুরের আসন আরম্ভ হয়। লোটন পায়রার মত ঠাকুর কত ভঙ্গিমায় পটাপট্ কত প্রকারের আসন করিতে লাগিলেন! মনে হইল, তাঁহার শরীরে যেন একটুও হাড় নাই। সেদিন আসন-কালে তাঁহার দেহখানা বার বার যেরূপ ভীষণভাবে আঘাত পাইতেছিল, তাহাতে উপস্থিত সকলে ভীত হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, এইভাবে আসন হইতে থাকিলে

তাঁহার দেহের সমুদয় অস্থি চুরমার হইয়া যাইবে। সেজন্য সেদিন কয়েকটি আসন হওয়ার পরই তাঁহাকে বাধা প্রদান পূর্বক বিরত করা হইয়াছিল।

ভাবদশায় শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীমুখ হইতে নানা ভাষায় বাণী বাহির হইত এবং তাহা লিখিয়া রাখা হইত। সমাধি ভঙ্গ হইবার পূর্বে শ্রীশ্রীঠাকুর পিপাসায় কাতর হইয়া জল পানের জন্য অস্থির হইয়া পড়িতেন। অন্তরঙ্গদের মধ্যে কেহ তখন জল আনিয়া দিলে, তিনি তাহা পান করিয়া স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়া আসিতেন। ঠাকুরের এইরূপ সমাধি অবস্থা আমার চারিবার দেখিবার সৌভাগ্য ঘটিয়াছিল,—এই চারিদিনের দুই দিন হিমাইতপুর ঠাকুর-বাড়ীতে এবং দুই দিন কুষ্টিয়ায়।



ত্রয়োদশ অধ্যায়

পুণ্যপুঁথি-প্রসঙ্গে

মহারাজ অনন্তনাথ রায়, কিশোরীমোহন দাস, দুর্গানাথ সান্ন্যাল, মুকুন্দচন্দ্র ঘোষ প্রভৃতি ঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের আদি কীর্তনদলের প্রধান প্রধান সঙ্গীদের নিকট শুনিয়াছি, ঠাকুর সর্বপ্রথম কিশোরীমোহনের বাড়ীতে তাঁহার কীর্তন-লীলা আরম্ভ করিয়াছিলেন। তৎকালে কিশোরীমোহনের ডাক্তারখানা ঘরে এবং এক আম্রবৃক্ষ-তলে ঠাকুরকে লইয়া তাঁহাদের অহর্নিশ কীর্তন চলিত। তাঁহারা ইহাও বলিয়াছেন যে, সর্বাগ্রে এই দুই স্থানে কীর্তন-কালে ভাবাবস্থায় ঠাকুরের শ্রীমুখ হইতে কয়েক দিন বাণী বাহির হইয়াছিল। অতঃপর ঠাকুরের অন্যতম কীর্তন-সঙ্গী যদুনাথ প্যালের বাড়ীতে কীর্তনকালেও একদিন ভাবদশায় তাঁহার অনুরূপ বাণী নির্গত হইলে সহচরগণ এ বিষয়ে সবিশেষ কৌতূহলাবিষ্ট হইয়া পড়েন। এ অবস্থায় অনন্তনাথ রায়, কিশোরীমোহন দাস ও মুকুন্দচন্দ্র ঘোষ প্রভৃতি একদিন বিষয়টি পাবনা জিলা-কোর্টের তদানীন্তন লব্ধপ্রতিষ্ঠ উকীল পরম-বৈষ্ণব বৃন্দাবনচন্দ্র অধিকারী বি-এল মহোদয়ের গোচরে আনয়ন করেন। বৃন্দাবনবাবু ইঁহাদের নিকট সমুদয় বৃত্তান্ত শুনিয়া উপর্যুপরি কয়েক দিন ঠাকুরের কীর্তনে যোগদান করেন। ঐ সময় তিনি তাঁহার ভাবসমাধি-অবস্থার অপূর্ব ব্যাপারটি আনুপূর্বিক প্রত্যক্ষ করিয়া এবং তদবস্থায় তাঁহার শ্রীমুখ-নিঃসৃত বাণীসমূহের ভাব-গাম্ভীর্য ও সর্বজনীনতা উপলব্ধি করিয়া একান্ত বিস্মিত হন।

বিষয়টির যথার্থ মাহাত্ম্য ও গুরুত্ব মর্মে মর্মে হৃদয়ঙ্গম করিয়া বৃন্দাবনবাবু ঠাকুরের উক্ত অন্তরঙ্গ সঙ্গীদিগকে একদিন ডাকিয়া বিশেষ দৃঢ়তার সঙ্গে বলিলেন,—"দেখ, এ সম্বন্ধে আমি সম্পূর্ণ নিঃসন্দেহ ও সুনিশ্চিত যে, এ সকল শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভাব—বিশ্বহিতের জন্য পরমাত্মার মহাভাববাণী—মানব জাতির পরম সম্পদ। বহু যুগ অন্তে পরমপিতার বিশেষ ইচ্ছায় কদাচিৎ এরূপ ঘটিয়া থাকে। সুতরাং আমার সনির্বন্ধ অনুরোধ, তোমরা এখন হইতে ঠাকুরের শ্রীকণ্ঠোচ্চারিত এই সকল মহাবাণীর একটি অক্ষরও বাদ না দিয়া সমুদয়ই যথাশক্তি নিঃশেষে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিবার ব্যবস্থা করিবে। আমি আশা করি, তোমরা ইহা অবশ্যকরণীয় পরম-পবিত্র কর্তব্য বলিয়া মনে করিবে।" বলা বাহুল্য, বৃন্দাবনবাবুর এই নির্দেশ সশ্রদ্ধচিত্তে প্রতিপালন করিতে ঠাকুরের প্রিয় পার্ষদগণ যথাসাধ্য চেষ্টার ত্রুটি করেন নাই। তদবধি যখনই যেখানে ঠাকুরের ভাববাণী হইত, সেগুলি যথাসম্ভব সম্পূর্ণরূপে লিখিয়া রাখিতে তাঁহারা সর্বদাই আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াছেন।

বলিতে কি, কথিত বাণীগুলি যথাযথ লিপিবদ্ধ করিয়া ওঠা একটি নিতান্ত সহজসাধ্য ব্যাপার ছিল না। বাণীগুলি যখন বজ্র-নির্ঘোষে উচ্চারিত হইতে থাকিত, মনে হইত, আকাশ যেন ফাটিয়া চৌচির হইয়া যাইতেছে। এই অবস্থায় সমবেত দর্শক-মণ্ডলী মন্ত্রমুগ্ধের মত নির্বাক, নিস্তব্ধ ও নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিত। এইরূপ অপূর্ব গুরু-গম্ভীর পরিবেশে বাণী-লেখকের হস্ত স্বতঃই কম্পিত হইত। তড়িত্তুল্য দ্রুতগতিতে উচ্চারিত বাণীগুলি শ্রবণমাত্রই পুরোপুরি লিখিয়া ওঠা কাহারও পক্ষে সম্ভব হইত না, অনেক কথাই বাদ পড়িয়া যাইত। সে কারণ, বাণীকথন-কালে তিন-চার বা ততোধিক ব্যক্তি এক সঙ্গে অত্যন্ত ক্ষিপ্রতার সহিত প্রত্যেকে তাহা প্রথমত যথাশক্তি লিখিয়া যাইতেন, পরিশেষে তাঁহাদের সকলের যথাশ্রুত লিখনাংশগুলি মিলাইয়া সে-দিবসের যথাসম্ভব পূর্ণাবয়ব বাণী প্রস্তুত করা হইত।

অধিকাংশ ভাববাণী সহজ সরল বাংলা ভাষায়ই উক্ত হইয়াছিল। সংস্কৃত এবং ইংরাজী ভাষায়ও কিছু কিছু বাণী বাহির হইয়াছে। কখনও কখনও অনুনাসিক স্বরে, বোধহয়, ফ্রেঞ্চ বা অন্য কোন ভাষায়ও বাণী প্রকাশিত হইয়াছে। ঠাকুরের তৎকালীন পার্ষদগণের মধ্যে বাংলা, ইংরাজী ও সংস্কৃত ভিন্ন অন্য ভাষাভিজ্ঞ কেহ না থাকায়, উক্ত তিন ভাষায় উচ্চারিত বাণীগুলিই শুধু লিপিবদ্ধ করা সম্ভব হইয়াছিল।

ভাববাণী প্রকাশের ব্যাপারটি বৃন্দাবনবাবুর গোচরীভূত হওয়ার পূর্ব সময়ের কোন বাণী লিখিত না হওয়ায় তাহা আজ লুপ্ত। বঙ্গাব্দ ১৩২১ সনের ৩১শে জ্যৈষ্ঠ হইতে ১৩২৬ সনের ২৪শে জ্যৈষ্ঠ পর্যন্ত পাঁচ বৎসর কাল মধ্যে (৪৫তম দিবস ১৮নং বাণী দ্রষ্টব্য) মোট একাত্তর দিবসে বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন সময়ে যে-সকল ভাববাণী নির্গত হইয়াছে, তাহা যথাসম্ভব পূর্ণরূপেই লিপিবদ্ধ করার চেষ্টা করা হইয়াছে। লিপিবদ্ধ বাণীর সর্ব মোট সংখ্যা ১৪৬৭। নিম্নের তালিকায় বাণী-প্রকাশের দিনানুক্রম, কাল ও স্থান এবং প্রতি দিবসের কথিত বাণীর সংখ্যা উল্লেখ করা গেল।*

---

* 'পুণ্যপুঁথি'র আদিম হস্তলিখিত নকল, মুদ্রিত 'পুণ্যপুঁথি'র বিভিন্ন সংস্করণ, ঋত্বিকপ্রবর শ্রীত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তীর রচিত 'ধূমন-পথে' নামক পুস্তক, শ্রীশ্রীঠাকুরের ভাবসমাধির প্রত্যক্ষ-দ্রষ্টা কতিপয় প্রবীণ সৎসঙ্গীর সংরক্ষিত দিনপঞ্জী প্রভৃতিতে ভাববাণী-প্রকাশের স্থান ও সাল-তারিখের যে-সকল উল্লেখ পাওয়া গিয়াছে, তৎসমুদয়ের সম্যক পর্যালোচনা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষায় সর্বাধিক সঙ্গত ও প্রামাণ্য বলিয়া বিবেচিত তথ্যাদি অবলম্বনে বর্তমান তালিকাটি প্রস্তুত করা হইল।

বাণী-প্রকাশের দিনানুক্রম	বাণী-প্রকাশের তারিখ, সাল		বাণী-প্রকাশের স্থান	প্রকাশিত বাণীর সংখ্যা
প্রথম	৩১শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩২১ বাং		কাশীপুরে অনন্তনাথ রায়ের বাড়ী	৬৫
দ্বিতীয়	২শরা আষাঢ়	,,	অজ্ঞাত	২৬
তৃতীয়	৪ঠা আষাঢ়	,,	হিমাইতপুরে	২৭
চতুর্থ	৫ই আষাঢ়	,,	অজ্ঞাত	২৯
পঞ্চম	৮ই আষাঢ়	,,	,,	৩৫
ষষ্ঠ	১২ই আষাঢ়	,,	,,	১১
সপ্তম	১৩ই আষাঢ়	,,	হিমাইতপুরে শ্রীশ্রীঠাকুরের নিজবাড়ী	২৩
অষ্টম	১৭ই আষাঢ়	,,	ঐ	২৭
নবম	৪ঠা শ্রাবণ	,,	অজ্ঞাত	৫২
দশম	৫ই শ্রাবণ	,,	,,	১১৩
একাদশ	৬ই শ্রাবণ	,,	,,	৭১
দ্বাদশ	৭ই শ্রাবণ	,,	,,	৬৪
ত্রয়োদশ	১০ই শ্রাবণ	,,	,,	৭৬
চতুর্দশ	১১ই শ্রাবণ, মঙ্গলবার	,,	অজ্ঞাত	৪৭
পঞ্চদশ	১৫ই শ্রাবণ	,,	,,	৬৫
ষোড়শ	অজ্ঞাত, শুক্রবার	,,	,,	১৭
সপ্তদশ	১লা ভাদ্র মঙ্গলবার, দুইবার	,,	,,	৬+১৪
অষ্টাদশ	৩শরা ভাদ্র বৃহস্পতিবার	,,	,,	১২
উনবিংশ	অজ্ঞাত	,,	অজ্ঞাত	৪
বিংশ	১১ই ভাদ্র শুক্রবার	,,	,,	৩৮
একবিংশ	২০শে ভাদ্র	,,	,,	৩৬
দ্বাবিংশ	২১শে ভাদ্র	,,	,,	৪৫
ত্রয়োবিংশ	৩১শে ভাদ্র	,,	,,	১৮
চতুর্বিংশ	১০ই আশ্বিন	,,	,,	১৯
পঞ্চবিংশ	১৫ই আশ্বিন শুক্রবার	,,	,,	১৬

বাণী-প্রকাশের দিনানুক্রম	বাণী-প্রকাশের তারিখ, সাল		বাণী-প্রকাশের স্থান	প্রকাশিত বাণীর সংখ্যা
ষড়্‌বিংশ	২২শে আশ্বিন শুক্রবার	,,	,,	৩৫
সপ্তবিংশ	২৭শে আশ্বিন বুধবার	,,	,,	৩০
অষ্টাবিংশ	২শরা কার্তিক সোমবার	,,	,,	২০
ঊনত্রিংশ	১০ই কার্তিক মঙ্গলবার	,,	,,	২০
ত্রিংশ	২৯শে অগ্রহায়ণ	,,	,,	২৫
একত্রিংশ	অনুমান পৌষ হইতে চৈত্রমাসের মধ্যে	,,	,,	৮
দ্বাত্রিংশ	অনুমান জ্যৈষ্ঠ, ১৩২২ বাং		,,	১৮
ত্রয়স্ত্রিংশ	অজ্ঞাত	,,	,,	১৩
চতুস্ত্রিংশ	২শরা ফাল্গুন	,,	,,	১২
পঞ্চত্রিংশ	অজ্ঞাত, রবিবার	,,	,,	১৬
ষট্‌ত্রিংশ	২৫শে নবেম্বর, ১৯১৬ ইং		কুষ্টিয়া	৭
সপ্তত্রিংশ	২৬শে নবেম্বর	,,	,,	৯
অষ্টাত্রিংশ	২৭শে নবেম্বর, ১৯১৬ ইং		বাড়াদি (নদীয়া)	২০
ঊনচত্বারিংশ	৩শরা ফেব্রুয়ারী, ১৯১৭ ইং		কুষ্টিয়া	১৬
চত্বারিংশ	৬ই ফেব্রুয়ারী	,,	,,	৯
একচত্বারিংশ	৭ই ফেব্রুয়ারী	,,	,,	৩
দ্বিচত্বারিংশ	৮ই ফেব্রুয়ারী	,,	বাড়াদি (নদীয়া)	১৫
ত্রিচত্বারিংশ	১০ই ফেব্রুয়ারী	,,	কুষ্টিয়া, ডাঃ গোকুলচন্দ্র মন্ডলের বাড়ী	২৫
চতুশ্চত্বারিংশ	১২ই ফেব্রুয়ারী	,,	কুষ্টিয়া	১
পঞ্চচত্বারিংশ	২৭শে ফেব্রুয়ারী মঙ্গলবার	,,	খলিলপুর	১৮
ষট্‌চত্বারিংশ	৩শরা মার্চ	,,	কুষ্টিয়া, সতীশচন্দ্র জোয়ারদারের বাসা	১০
সপ্তচত্বারিংশ	২৭শে চৈত্র, ১৩২৩ বাং		বড়ইচারা (নদীয়া) রাধারমণ জোয়ারদারের বাড়ী	৫

বাণী-প্রকাশের দিনানুক্রম	বাণী-প্রকাশের তারিখ, সাল	বাণী-প্রকাশের স্থান	প্রকাশিত বাণীর সংখ্যা
অষ্টচত্বারিংশ	অজ্ঞাত	কুষ্টিয়া	৪
ঊনপঞ্চাশত্তম	অজ্ঞাত, ১৯১৭ ইং	কুষ্টিয়া আশ্রম	৪
পঞ্চাশত্তম	২৭শে বৈশাখ, ১৩২৪ বাং	প্রতাপপুর, কিশোরী-মোহন দাসের বাড়ী	১২
একপঞ্চাশত্তম	৩০শে বৈশাখ ,,	কুষ্টিয়া, গৌরীশঙ্কর আগরওয়ালার ধর্মশালা	৭
দ্বিপঞ্চাশত্তম	জ্যৈষ্ঠ ,,	ধুশড়ু (নদীয়া)	৪
ত্রিপঞ্চাশত্তম	জ্যৈষ্ঠ ,,	কণ্ঠগজরা (নদীয়া) সীতানাথ ঘোষের বাড়ী	১২
চতুঃপঞ্চাশত্তম	১লা শ্রাবণ ,,	ধলহরাচন্দ্র (যশোহর) জমিদার যোগেন্দ্রনাথ চৌধুরীর বাড়ী	৫
পঞ্চপঞ্চাশত্তম	২শরা শ্রাবণ বুধবার ,,	ঐ	১০
ষট্পঞ্চাশত্তম	২৩শে জুলাই, ১৯১৭ ইং	কুষ্টিয়া	৬
সপ্তপঞ্চাশত্তম	১৮ই আগষ্ট ,,	,,	৩
অষ্টপঞ্চাশত্তম	আগষ্ট ,,	কুষ্টিয়া, সৎসঙ্গ-আশ্রম	২
ঊনষষ্টিতম	২১শে সেপ্টেম্বর ,,	কুষ্টিয়া	৮
ষষ্টিতম	৮ই অক্টোবর ,,	খোকসাজানিপুর (নদীয়া) পূর্ণচন্দ্র সাহা উকীলের বাড়ী	৫
একষষ্টিতম	২০ কার্তিক, ১৩২৪ বাং (১০ই নবেম্বর, ১৯১৭ ইং)	রাতুলপাড়া (নদীয়া) যোগেন্দ্রনাথ ও শ্রীকান্ত সরকারের বাড়ী	৩
দ্বিষষ্টিতম	২৯ কার্তিক, ১৩২৪ বাং	কমলাপুর (নদীয়া) সুরেন্দ্রভূষণ বিশ্বাসের বাড়ী	৩
ত্রিষষ্টিতম	২৮শে ডিসেম্বর, ১৯১৭ ইং	চক্রতীর্থ (২৪ পরগণা)	৪
চতুঃষষ্টিতম	অজ্ঞাত, শুক্রবার, মাঘ ১৩২৪ বাং	মদাপুর (নদীয়া) শরচ্চন্দ্র ঘোষের বাড়ী	৬
পঞ্চষষ্টিতম	মাঘ, শনিবার, ১৩২৪ বাং	ঐ	১৯
ষট্ষষ্টিতম	২৭শে চৈত্র ,,	কুষ্টিয়া	১৫
সপ্তষষ্টিতম	৩০শে বৈশাখ, ১৩২৫ বাং	কুষ্টিয়া অশ্বিনীকুমার বিশ্বাসের বাসা	১০
অষ্টষষ্টিতম	১৩ই জ্যৈষ্ঠ ,,	কুষ্টিয়া	৭
ঊনসপ্ততিতম	২শরা কার্তিক ,,		

	লক্ষ্মীপূর্ণিমা, ১৯শে অক্টোবর, ১৯১৮ শনিবার রাত্রি	হরিণাকুণ্ডু (নদীয়া) সুশীলচন্দ্র বসুর বাড়ী	৭
বাণী-প্রকাশের দিনানুক্রম	বাণী-প্রকাশের তারিখ, সাল	বাণী-প্রকাশের স্থান	প্রকাশিত বাণীর সংখ্যা
সপ্ততিতম	৩শরা কার্তিক ১৩২৫ বাং ২০শে অক্টোবর ১৯১৮ রবিবার	সুশীলচন্দ্র বসুর বাড়ী	৬
একসপ্ততিতম	২৪শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৬ শনিবার রাত্রি ৮-৩০ মি	কুষ্টিয়া প্রফুল্লচন্দ্র রায় উকীলের বৈঠকখানা	১১

১৩২১ বঙ্গাব্দের ৩১শে জ্যৈষ্ঠ (বাণী-লিখনের প্রথম দিবস) রাত্রি প্রায় দুই ঘটিকার সময় ঠাকুর তাঁহার অন্তরঙ্গ বাল্য-সুহৃদ কীর্তন-সহচর কাশীপুরের অনন্তনাথ রায়ের বাড়ীতে একখানা চেয়ারে বসিয়া আপন মনে স্বামী বিবেকানন্দ রচিত নিম্নোদ্ধৃত গানটি গাহিতেছিলেন,—

নাহি সূর্য, নাহি জ্যোতিঃ, নাহি শশাঙ্ক সুন্দর,
ভাসে ব্যোমে ছায়াসম ছবি বিশ্ব চরাচর।
অস্ফুট মন-আকাশে, জগতসংসার ভাসে,
ওঠে ভাসে ডোবে পুনঃ অহং-স্রোতে নিরন্তর ॥
ধীরে ধীরে ছায়াদল, মহালয়ে প্রবেশিল,
বহে মাত্র 'আমি' 'আমি'—এই ধারা অনুক্ষণ ॥
সে ধারাও বন্ধ হ'ল, শূন্যে শূন্য মিলাইল,
'অবাঙ্ মনসগোচরম', বোঝে—প্রাণ বোঝে যার ॥

ভাবাবেশে তন্ময় হইয়া ঠাকুর যখন গানটি গাহিতেছিলেন অকস্মাৎ অজ্ঞান অবস্থায় তাঁহার চেয়ার হইতে ভূপতিত হওয়ার উপক্রম হয়। এই সময় তাঁহাকে ধরাধরি করিয়া ঘরের মেজেতে মাদুরের উপর শোয়াইয়া দেওয়া হয়। এই অবস্থায় কিছুকাল নানা প্রকার আসন-মুদ্রাদি হওয়ার পর মহাভাবাবস্থায় তাঁহার শ্রীমুখ হইতে বাণী নিঃসৃত হইতে থাকে এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহা লিপিবদ্ধ করার ব্যবস্থা করা হয়। কিন্তু বিশেষ চেষ্টা সত্ত্বেও সেদিনের প্রথম দিকের কয়েকটি বাণী লিখিয়া ওঠা সম্ভবপর হয় নাই। লিপিবদ্ধ বাণীসমূহের সর্ব-আদি বাণীটি হইল,—'আমি চাই শুদ্ধাত্মা।'

এই সকল জগন্মঙ্গলকর মহাভাববাণী গ্রন্থাকারে প্রকাশ করতঃ লোকসমাজে ব্যাপকভাবে প্রচারের উদ্দেশ্যে অতঃপর ভাষ্য ও বিবৃতি সহ উহার একটি পূর্ণাবয়ব পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করা হয়। উহা 'আবেশে উপদেশ'-নামক কয়েক খণ্ড পুস্তিকার সহিত কুষ্টিয়ার মোক্তার সংঘভ্রাতা বীরেন্দ্রনাথ রায়ের

নিকট একটি ব্যাগে রক্ষিত ছিল। দুঃখের বিষয়, একদিন দৈবক্রমে পাণ্ডুলিপি সহ ঐ ব্যাগটি চুরি হইয়া যায়। এই অমূল্য মহাগ্রন্থ এইভাবে অপহৃত হইয়া যাওয়ায় ভক্তগণের মনোদুঃখ ও দুশ্চিন্তার অবধি রহিল না। কিন্তু সৌভাগ্যবশতঃ পরমপিতার অশেষ কৃপায় কিয়ৎকাল মধ্যেই অলৌকিক উপায়ে ইহার পুনরুদ্ধার সম্ভব হইয়াছিল। এ সম্বন্ধে ঠাকুরের তৎকালীন অন্যতম পার্ষদ ডাক্তার সতীশচন্দ্র জোয়ারদার মহাশয় যে বিবৃতি দিয়াছেন প্রসঙ্গত নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করা হইল।—

"... শ্রীশ্রীঠাকুরকে গ্রন্থাপহরণের ব্যাপার সমুদয়ই জ্ঞাত করান হইল। তিনি বিশেষ কোন মতামত প্রকাশ করিলেন না। তাঁহার ভাবে বোধ হইল, পুনঃ-প্রাপ্তির আশা যে একেবারেই নাই তাহা নহে। দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ অতীত হইয়া গেল, কোন সন্ধান পাওয়া গেল না। একদিন বর্ষাসমাগমে অপরাহ্ণে আমি নলডাঙ্গা রাজষ্টেটের কুষ্টিয়া বাহাদুরখালির কাছারীতে শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ ঘোষ মহাশয়ের মুখে 'আবেশে উপদেশ'-এর দুই একটি কথা শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, তিনি সে-কথা কোথায় পাইলেন। তিনি বলিলেন, মাঠের মধ্যে এক জঙ্গলাকীর্ণ স্থানে ছেঁড়া পুস্তকের কয়েকখানি পাতা পতিত ছিল, তাহার এক পৃষ্ঠায় তিনি সেই কথা দেখিয়াছেন। তখন আমি নিজের মনোভাব সংগোপন করতঃ তাঁহাকে বিশেষ অনুরোধ করিয়া সঙ্গে লইয়া তৎক্ষণাৎ সেই স্থানে গমন করিলাম। বুঝিতে পারিলাম, শ্রীশ্রীঠাকুর দয়া করিয়া সেই অপহৃত মহাগ্রন্থের সন্ধান বোধ হয় অদ্য তাঁহার এই অধম সেবককে জানাইলেন।

"রাস্তায় অনেক ধান্যক্ষেত্র কর্দম ও জল অতিক্রম করিয়া এক জঙ্গলের সন্নিকটে উপনীত হইয়া দেখিলাম, সেই ব্যাগটি কর্তিত ও ছিন্নাবস্থায় পতিত রহিয়াছে। খাতা, পুস্তক ও কাগজগুলি তথায় বিচ্ছিন্নাবস্থায় পতিত। তাহার উপর কত বৃষ্টিপাত হইয়া গিয়াছে। পুত্তিকার অনুগ্রহ যে কিঞ্চিৎ না হইয়াছে, তাহাও নহে। মধ্যে মধ্যে পিপীলিকাগণ আবাসস্থল নির্মাণ করতঃ অসংখ্য অণ্ড প্রসব করিয়া তথায় অবস্থান করিতেছে। এই সমস্ত দর্শন মাত্রই আমি আনন্দে আত্মহারা হইয়া সমস্তগুলি একত্র করিয়া আমার গাত্রাবরণ বস্ত্র দ্বারা সযত্নে পরিবেষ্টিতাবস্থায় আমার ঔষধালয়ে লইয়া আসিলাম। তখন সেই সমস্ত অমূল্য বস্তু কতক রৌদ্রে, কতক বাতাসে, কতক অগ্নিতাপে শুষ্ক করা হইল। তখন দেখা গেল, আসল কার্যের বস্তু কিঞ্চিৎও নষ্ট হয় নাই। ... ।"

পূর্বোক্ত পাণ্ডুলিপির প্রথম পনর দিবসের ভাববাণী ভাষ্য ও বিবৃতি সহ মুদ্রিত করতঃ সর্বপ্রথম বঙ্গাব্দ ১৩২৫ সনে "পুণ্যপুঁথি" নামে প্রকাশ করা হয়। ভাষ্যটি রচনা করিয়াছিলেন উকীল বৃন্দাবনচন্দ্র অধিকারী বি-এল্ মহাশয়। ইহা উল্লেখযোগ্য যে, ভাববাণীর বক্তার সুস্পষ্ট নির্দেশানুসারেই বৃন্দাবনবাবু এই দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। উক্ত গ্রন্থে ভাষ্যকারের বিবৃতিতে তিনি নিজেও

উল্লেখ করিয়াছেন,—"আমার উপর আদেশ থাকাতেই আমি এই কার্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছি।"

যে-সকল ভাববাণীতে উক্তরূপ নির্দেশের কথা বারংবার পরিস্ফুট হইয়াছে, এই প্রসঙ্গে তাহার কয়েকটি নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল।

"বৃন্দাবনবাবু! দেখুন, এই সত্যগুলি অন্তরে অন্তরে প্রকাশ ক'রে দিয়ে যান। এই সত্যগুলি অন্তরে অন্তরে দিতেই হবে।......আচ্ছা, অন্ধের মত বিশ্বাস ক'রেই এ-কাজগুলি করেন না! আর এইগুলির ভাব বের ক'রে টীকা-টিপ্পনী দিয়ে একটা ভাষ্য রকম ক'রে দেন। বহুত তো খেটেছেন সংসারের জন্য, একটু খেটে যান তো। প্রাণগুলি তৈয়ার ক'রে দিয়ে যান তো। নতুবা আবার আসতে হবে, আবার কি আসা ভাল?"

(নবম দিবসের পঞ্চদশ বাণী)

"দ্যাখ, তোরা এথেকে একটা ভাষ্য ক'রে, এক কপি জার্মানীতে, এক কপি ফ্রান্সে, এক কপি ইংলণ্ডে, এক কপি স্কট্‌লণ্ডে, এক কপি আমেরিকায়, এক কপি ইউনাইটেড্ ষ্টেটে পাঠিয়ে দিবি। দ্যাখ, সমালোচনা দেখে ভয় করিস্ না। দ্যাখ, বৃন্দাবনবাবুকে বলবি।"

(একাদশ দিবসের ত্রয়স্ত্রিংশ ও চতুস্ত্রিংশ বাণী)

"দ্যাখ রে, ওটার থেকে একটা ভাষ্য-টাস্য ক'রে ফেলা না? ওটাকে বিলি ক'রে দে না? যার চিন্তাশক্তি যত বেশী, সে ওটাকে তত সুন্দর ক'রে আঁকতে প্যারবে। বৃন্দাবনবাবুকে বলিস, যাতে প্রবৃত্ত হবে তাই হবে।"

(ত্রয়োদশ দিবসের চতুঃষষ্টিতম বাণী)

"ঐ হোলিবুকটা উন্নত ক'রে ফেলাতে বল। এমন সরল ভাষ্য করবি যাতে সরলপ্রাণ কৃষকও বুঝতে প্যারে। বল্‌বি বৃন্দাবনবাবুকে। ওর জন্যই তো **life prolonged.** অক্ষরে অক্ষরে তার প্রাণ।"

(চতুর্দশ দিবসেব অষ্টাবিংশ বাণী)

ইহাও উল্লেখযোগ্য যে, ভাববাণীর সংকলন-গ্রন্থের 'Holy Book' ('পুণ্যপুঁথি') নামকরণের ইঙ্গিতটিও ঠাকুরের ভাবাবস্থায় কথিত বাণীতেই প্রকাশ পাইয়াছিল। আবার, এই 'Holy Book'—'পুণ্যপুঁথি'-এর মাহাত্ম্য এবং ইহার প্রচারের উদ্দেশ্য সম্পর্কেও ভাববাণীতেই অনেক উক্তি রহিয়াছে। এ সম্বন্ধে উদাহরণ-স্বরূপ নিম্নে কয়েকটি বাণী উদ্ধৃত করা গেল।—

"বইখানি আমারই দান। ···যে লোক এই উপদেশ মত কাজ করবে, সে নিশ্চয়ই উন্নত হবে।" (ত্রয়োদশ দিবসের দ্বিসপ্ততিতম ও ত্রিসপ্ততিতম বাণী)

"হোলিবুক'খানা তৈয়ারী হ'লে দেখাবি। যাদের দেখাবি তাদের যেন বিশ্বাস আর নষ্ট না হয়। যাদের প্রাণে বিশ্বাস আছে, তাহাদিগকে 'হোলিবুক'খানা দেখাবি। তাদের সেখানে একদম ব্রহ্মে লয় ক'রে দিবি। 'হোলিবুক'টাই দূত, ঐ রাস্তা, ঐ সব।"

(চতুর্দশ দিবসের ষড়্‌বিংশ ও সপ্তবিংশ বাণী)

"দ্যাখ, 'হোলিবুক'টাকে খুব ভক্তি করবি। যে একবার নির্জনে প্রাণ খুলে ঐটা দেখতে পাবে, তার তৎক্ষণাৎ ব্রহ্মভাব এসে পড়বে, নব বল এসে জুটবে। যার-তার হাতে দিস্ নে, ওটা ছিটোনো মন্তো নয় রে। যাদের দেখবি রাজলক্ষণ সত্ত্বভাব, তাদেরি হাতে দিবি।" (দ্বাবিংশ দিবসের ষড়বিংশ বাণী)

"'হোলিবুক'-এ আমাতে কোন প্রভেদ নাই। ভগবানকে যেমন চিন্তা না করলে পাওয়া যায় না, তেমনি 'হোলিবুক' ভাবলেই ভগবান লাভ হবে।"

(দ্বাবিংশ দিবসের সপ্তবিংশ বাণী)

"'হোলিবুক'খানা তৈয়ারী ক'রে ফেলে দে। 'হোলিবুক' প্রচার কর। সত্য প্রচার কর।" (চতুর্বিংশ দিবসের ঊনবিংশ বাণী)

'পুণ্যপুঁথি'-গ্রন্থের আলোচনা-প্রসঙ্গে এইবার আমরা উহার ভাষ্যকার বৃন্দাবনচন্দ্র অধিকারী বি-এল্ মহাশয় যে বিবৃতি দান করিয়াছেন, তাহার কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি।—

"ভাবাবস্থায় যে সকল আদেশ ও উপদেশ দেওয়া হইয়াছে, তাহার অধিকাংশই হাতে লেখা হইয়াছে, তাড়াতাড়ি লিখিতে না পারায় অনেক সময় অনেক কথা বাদ পড়িয়াছে। যাহা লেখা হইয়াছে, তম্মধ্যে অনেক ব্যক্তিগত কথা লিখিত আছে, সে সমস্ত যতদূর সম্ভব বাদ রাখিয়া অথবা সেইগুলির অন্তর্গত সত্যসমূহ মাত্র গ্রহণ করিয়া প্রকাশ করা গেল।...

"এই পুস্তকের মূল উপদেশগুলি ভাবাবস্থায় কথিত। এই সকল উপদেশের পত্রে পত্রে ছত্রে ছত্রে পরমাত্মা জীবজগতে আপনার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। যাহাতে জীব-মাত্রই তাঁহার ইচ্ছা অবগত হইয়া ও তদনুসারে কার্য করিয়া সহজে অনন্ত আনন্দ পাইতে পারে, সেই জন্য ভগবান স্বীয় অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন।

"জগতের দুঃখ দেখিয়া দয়াপরবশ হইয়া ভগবান জগতের প্রত্যেক জীবনের উদ্ধারের জন্য এই সত্যসমূহ ব্যক্ত করিয়াছেন। এই সত্য প্রচারের দ্বারা জগতের বর্তমান সর্ববিধ বিসম্বাদ বিনষ্ট হইবে, সর্বসমন্যার সমাধান হইবে—জগৎ স্বর্গীয় আনন্দ ও প্রেমধারায় ভাসিয়া যাইবে—সমগ্র মানবজাতি এক-সূত্রে আবন্ধ হইবে—সত্যযুগের আরম্ভ হইবে।...... ।" ইত্যাদি।

উক্ত 'পুণ্যপুঁথি'-নামক মুদ্রিত গ্রন্থে মাত্র প্রথম পনর দিবসের ভাববাণী প্রকাশিত হওয়ায় একাত্তর দিবসের সমগ্র ভাববাণী-পাঠের খুবই অসুবিধা ঘটিত। এই অভাব মোচনে সংঘভ্রাতা স্বর্গত চারুচন্দ্র সরকার মহাশয়ের উদ্যম সবিশেষ প্রশংসনীয়। এ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বিবৃত করা যাইতেছে।—

চারুচন্দ্রের জন্মস্থান ছিল রাজসাহী জেলার নাটোর মহকুমার অধীন চৌধুরাইডাঙ্গা পাড়া। পত্নী-বিয়োগের পর তিনি গৃহত্যাগ করতঃ হিমাইতপুর সৎসঙ্গ আশ্রমে আসিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীচরণে আশ্রয় লন এবং সৎসঙ্গের দাতব্য ঔষধালয়ের কম্পাউন্ডারের কার্যভার গ্রহণ করেন। চারুচন্দ্রের হস্তাক্ষর ছিল ছাপার হরপের মতই অতি সুন্দর এবং অত্যন্ত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। তিনি মহারাজ

অনন্তনাথের কাছে রক্ষিত সমগ্র ভাববাণীর পূর্বোক্ত আদি পাণ্ডুলিপি হইতে অক্লান্ত শ্রমে একাত্তর দিবসের সমুদয় ভাববাণী মনোরম হস্তাক্ষরে নিপুণভাবে নকল করতঃ পুস্তকাকারে প্রস্তুত করিয়া রাখিতেন। বাংলা ও ব্রহ্মদেশের নানা স্থানের ইষ্টভ্রাতা অনেকেই তৎকালে সাগ্রহে তাঁহার নিকট হইতে সেই হস্তলিখিত পুণ্যপুঁথি এক-এক কপি সংগ্রহ করিয়া নিজেরা পাঠ করিতেন এবং উহার সাহায্যে জনসাধারণের মধ্যেও শ্রীশ্রীঠাকুরের জগন্মঙ্গলকর ভাবরাজি প্রচার করিতেন। সে সময় এই হস্তলিখিত পুণ্যপুঁথির প্রচারও নেহাৎ কম ছিল না।

চারুচন্দ্র তাঁহার উক্ত হস্তলিখিত পুণ্যপুঁথিতে উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন যে, এই পরম পবিত্র কার্যটি তিনি সর্ব প্রথমবার ১৩৩২ বঙ্গাব্দের ১৬ই শ্রাবণ শনিবার রাত্রি বার ঘটিকার সময় সমাপ্ত করিয়াছিলেন। উক্ত পাণ্ডুলিপিতে তিনি নিজেকে "সৎসঙ্গের ঝাড়ুদার" এই বিশিষ্ট উপাধিতে ভূষিত করিয়া আপন সেবা-মাহাত্ম্য ও চিত্তৌদার্যের একটি প্রকৃষ্ট পরিচয় রাখিয়া গিয়াছেন। বলিতে কি, আশ্রমে যোগদানের পর এই ঝাড়ুদারের কার্য তিনি ইষ্টসেবা-ব্রতরূপে স্বেচ্ছায় বরণ করিয়া লইয়াছিলেন এবং জীবনের শেষদিন পর্যন্ত পরম নিষ্ঠার সহিত তিনি এই কর্তব্য পালন করিয়া গিয়াছেন।

অতি প্রত্যুষে শয্যাত্যাগ করিয়া চারুচন্দ্র সম্মার্জনী হস্তে বাহির হইতেন এবং ঠাকুর-বাড়ীর অন্দর-বাহির অঙ্গন-চত্বর অলি-গলি, আনাচে-কানাচে নিপুণভাবে ঝাঁট দিয়া চক্-চকে ঝক্-ঝকে রাখিতেন। তাঁহার ঈদৃশ সশ্রদ্ধ সযত্ন সেবায় পদ্মা-তীরবর্তী সুবিস্তৃত প্রাঙ্গণ সহ সমগ্র আশ্রম-বাটিকা সর্বক্ষণ এক অনির্বচনীয় শুচি-শুভ্র রমণীয়তায় ঝলমল করিত। কি আশ্রমবাসী কি আগন্তুকগণ সবাই তাঁহার এই নিরলস নিরভিমান সেবায় অতীব মুগ্ধ হইতেন।

১৩২৫ বঙ্গাব্দে প্রথম পনর দিবসের ভাববাণী ভাষ্য ও বিবৃতি সহ প্রকাশিত হওয়ার বহুকাল পর চারুচন্দ্রের উক্ত হস্তলিখিত পুণ্যপুঁথির পাণ্ডুলিপি অবলম্বনে বঙ্গাব্দ ১৩৫৬ সনে (ইংরাজী ১৯৪৯ সনের জুলাই মাসে) পুণ্যপুঁথির পূর্ণাঙ্গ প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয়। উহাতে একাত্তর দিবসের সমুদয় বাণীই মুদ্রিত হয়, তবে পূর্ববারের মত তাহাতে কোন ভাষ্য বা বিবৃতি যোগ করা হয় নাই। অতঃপর ১৩৭১ সালের ৩০শে ভাদ্র ইহার দ্বিতীয় এবং ১৩৭৩ সালের ৩০শে শ্রাবণ তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে।

এইবার আমরা 'পুণ্যপুঁথি'-গ্রন্থের বিষয়বস্তু সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়া বর্তমান অধ্যায় তথা গ্রন্থের উপসংহার করিব।

'পুণ্যপুঁথি' একখানি সবার্থসার্থক শক্তিগর্ভ উদাত্ত দিব্য গ্রন্থ। ইহা জ্ঞান ভক্তি, ধর্ম কর্ম, বিচার বিশ্বাস, জন্ম মৃত্যু, স্বর্গ নরক, সুখ দুঃখ, গৃহ সমাজ, সংসার সন্ন্যাস প্রভৃতি মানবসত্তার নানা দিকের তত্ত্বদীপনী সার্থক-সমাধানী সঞ্জীবনী বাণীমঞ্জুষা।

বিষয়ী বিবাগী, ত্যাগী, ভোগী, সংশয়ী বিশ্বাসী, সাধক প্রেমিক, গৃহী

সন্ন্যাসী, পণ্ডিত মূর্খ, উচ্চ নীচ, ধনী দরিদ্র, পুরুষ নারী, যুবা বৃদ্ধ, হিন্দু মুসলমান, বৌদ্ধ খ্রীষ্টান, শিখ জৈন, প্রভৃতি সর্বশ্রেণীর সর্ব স্তরের সর্ব মতের সকল মানবের জীবন-পথের অপরিহার্য অমূল্য পাথেয় এই 'পুণ্যপুঁথি'।

বলিতে কি, গ্রন্থখানা মানুষের অজ্ঞান-অন্ধকার বিনাশ করে, ত্রিতাপ জ্বালা প্রশমিত করে, ক্ষুদ্র-আমিকে জানায় বৃহৎ-আমির সন্ধান, উদ্ঘাটিত করে জীবাত্মার মুক্তির দ্বার। আরও বলিব, ইহা পতিতকে শোনায় উদ্ধারের বাণী, শোকার্তকে দেয় সান্ত্বনা, হতাশার প্রাণে জ্বালায় আশার আলো, পথহারাকে দেয় পথের নির্দেশ।

বিষয়বস্তুর গাম্ভীর্যে এবং ভাববৈভবের বৈচিত্র্যে বৈশিষ্ট্যে 'পুণ্যপুঁথি' সত্যই এক যুগোপযুক্ত সনাতনী উপনিষদ। নিরাবিল পরিবেশে শুদ্ধ সমাহিত চিত্তে ইহার কল্যাণগর্ভ শক্তি-সঞ্চারিণী বাণীরাজির নিত্য-নিয়মিত ধ্যান-নিবিড় অধ্যয়ন ও সশ্রদ্ধ মনন এবং ইহার সাত্বত নীতি-বিধির একাগ্র অনুশীলনে মানুষের অন্তর হইতে অবিশ্বাস, অবসাদ, ভয় ও বিষাদের জড়তা চিরতরে বিলুপ্ত হইবে, ধরণীর ধূলি-আবরণ অপসারণ করিয়া নির্মলচৈতন্যরাজ্যের আনন্দ-তীর্থের উদ্দেশে মানুষের মহান যাত্রাপথ উন্মুক্ত হইবে, আত্মসাক্ষাৎকার লাভ করিয়া মানুষ একদিন সত্তার চরম লক্ষ্যে—ঈশ্বর-সকাশে উপনীত হইতে সমর্থ হইবে, এবং মানুষের সেই পরম-বাঞ্ছিত দিব্য সামর্থ্যের আলোক-পথেই জগৎ ও জীবনের সর্ববিধ সমস্যার সুসমন্বিত সমাধানের সত্য-রূপটি উদ্ভাসিত হইয়া উঠিবে—এই উদার আশার কথা শুভশঙ্খরবে ঘোষণা করা যাইতে পারে।

সর্বশেষে এই অমূল্য মহাগ্রন্থের প্রতি পাঠকবর্গের দৃষ্টি আকর্ষণের প্রয়োজনবোধে আমরা ভাববাণীতে কথিত বিভিন্ন বিষয়ের বাণীর দৃষ্টান্ত-স্বরূপ 'পুণ্যপুঁথি'-মহোদধির অগণিত বিচিত্র রত্নরাজির মাত্র গুটি-কয়েক সংগ্রহ করতঃ এখানে সন্নিবিষ্ট করিলাম।*

সৃষ্টিরহস্য

When I was before, He was latent in me! When I was before, you were latent in me! When I was you, You were I, I was the only One—I was latent in me! Think yourselves. You were latent in me. Whole creation is you– no doubt the spirit. I was the sound. Sound is my creation; therefore you are created by me. Only sound is your spirit, no doubt! 3/22.

সে একটা অব্যক্ত পরমানন্দ,—নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ—প্রাণের প্রাণ, জগতের জগত—অণুর অণু—সে একটা বলা যায় না রে! যখন "ছিল না"র সত্তা ছিল, কাল আসে নাই, যখন শব্দ ছিল, যখন সূর্যের চাঁদের সৃষ্টি হয় নাই,

* উদ্ধৃত বাণীর সঙ্গে সংযুক্ত অঙ্ক দুইটি যথাক্রমে ভাববাণী-নির্গমনের দিবস ও ঐ দিবসের কথিত বাণীর সংখ্যা সূচিত করিতেছে।

যখন বিরাট গগনের সৃষ্টি হয় নাই, তখন এক বিরাট ধ্বনি সোঽহং পুরুষ ভেদ ক'রে সৃষ্টি করতে চ'লে এল—সেই ওম্। শব্দে, সূক্ষ্ম মায়াতে, ব্রাহ্মী মায়াতে, হ্লাদিনী শক্তিতে, ঘাতপ্রতিঘাতে সে ধারা বাধা গেল, তখনই সৃষ্টি,—ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর—সত্ত্ব রজঃ তমঃ—ত্রিধারা। বিরাট গতিতে শব্দ চলতে লাগলো, তখন প্রাণ স্থির হয় নাই—তখন সৃষ্টি হ'লো আকাশ·········বায়ু·······...কাল নির্দেশ ক'রে চলল—তখন সৃষ্টি তেজ—সেই শক্তি। গতি চলছিল আবার চলবে, তাই দিয়ে বিরাট জলখণ্ড। তেজ ও জলখণ্ড যখন উপর গতি ধরতে না পেরে আপন গতিতে চলতে লাগলো, তখন সৃষ্টি হ'ল জড়। আবার এই ঘাতপ্রতিঘাতে সৃষ্টি হ'ল দেবতা, কিন্নর, জীব-জগৎ। ৫৫।১

অবতারবাদ

কলির লয় অতি নিকট। তোরাই রে তোরা! তোরা সব মিলে আমি—মহা আমি, তাই কল্কি অবতার! সব গেল, সব গেল,—রেণু রেণু ক'রে সব গেল—তীব্র বেগে গেল, সব গেল। পূর্ণ—নূতন আবার চিরকাল। নূতন, অনিত্য ও নূতন, সব নূতন নিত্য! তাই অবতার কল্কি! পূর্ণ আমি! ৩।১৭

চরমে চরম প্রকাশ কল্কি। ৪।২৯

আদিতে এক, ইচ্ছায় বহু, শেষে একা—তাই কল্কি। প্রথম ছিলাম নির্বিকার, কিছু ছিল না; তারপর হলেম বিকার। আবার ইচ্ছা নির্বিকার হ'তে, তাই অবতার কল্কি। আমার আমিগুলি কুড়িয়ে নিয়ে আবার পূর্ণত্ব প্রাপ্তি।

দ্যাখ্, তোদের জন্য কত ভাগ হয়েছি, কত মহাভাগ হয়েছি—কেবল কুড়িয়ে নিতে। আয় ছুটে আয়। তোরাই আবার কুড়িয়ে নিবি। তোরা খোঁজ করিস্ জন্য আমি খোঁজ করি, আবার আমি খোঁজ করি বলে' তোরা খোঁজ করিস্। ৫।২৫

বুদ্ধ লয় শিক্ষা দিয়ে গিয়েছিল। শঙ্করাচার্য পরিষ্কার ক'রে দিয়েছিল। বুদ্ধের উত্তর শঙ্করাচার্যের কাছে, জ্ঞানী ছাড়া বুঝত না কিনা, তাই চৈতন্যের আবির্ভাব। ধর্ম নিয়ে হিংসা হয়েছিল কিনা, তাই একত্ব দেখাতে এসেছিলেন রামকৃষ্ণ। থাক ধর্ম কর্ম, আমার আমিত্ব দেখাতে পেলেই বাঁচি এখন। ৬।৪

ব্রহ্মোপলব্ধি

আপনি মিশে যাচ্ছে, আপনি চলেছে,—তাহাকেই বলে প্রকৃতি। আমি পরম কারণ। অনন্ত কোটি দেবতা ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু, বরুণ, ব্রহ্মজ্যোতি, সেই পরম পুরুষ শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীকৃষ্ণের সত্তা, সত্ত্ব, আমিই সব, আমিই সেই দয়াল-দেশ, ব্রহ্মদেশ, পিণ্ডদেশ। আমি সেই বৃন্দাবন, আমি কৃষ্ণ, রাধা, গোপ, গোপী, আমার আরতি করে চন্দ্র, সূর্য, তারকা, কোটি কোটি গগন সব আমারই লীলা, আমারই প্রকট, আমারই জন্য আমারই ফাঁদ আর কিছু নয়। আমি লুকিয়ে থাকি প্রতি প্রাণে, অন্তরে অন্তরে লুকিয়ে থাকি। আমি চৈতন্য পুরুষ, আবার আমিই 'হা

ভগবান' ব'লে কেঁদে বেড়াই। আমি স্ত্রী হ'য়ে স্বামী সেবা করি ......আমিই স্বামী হ'য়ে স্ত্রীর মনোরঞ্জন করি আমিই পুত্র, কন্যা, আমি সন্ন্যাসী, বৈরাগী, আমি কত ন্যাচি, কত কাঁদি, কত গাই, কত ভান ক'রে বেড়াই। আমি কুকুর হ'য়ে এক মুষ্টি অন্নের জন্য ছুটে যাচ্ছি, আবার নির্মম হ'য়ে আমারই মাথায় লাঠি মারছি।—আমিই পথ,—বেদ, কোরাণ, বাইবেল সব আমি। ওরে আমি জীবন্ত হ'য়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি। আমিই মৃত। আমারই গোর দিচ্ছে, আমাকেই পোড়াচ্ছে, আবার ইন্ধন যা-কিছু সব আমি। ৫৫।২

ব্রাহ্মণ হ'তে হবে। ব্রাহ্মণ হ'লেই ভগবানও বুকে পা রাখে। ব্রাহ্মণের পা ভগবানও আরাধনা করে, তাই কৃষ্ণ ভৃগুমুনির পদচিহ্ন বুকে ধরেছিল। ১৪।৩২

দ্যাখ, যেমন ঐ ব্রহ্মভাবটি জেগে ওঠে, তখন কি হয় জানিস্?—ঐ যে কাজ করছিস্ সেও ব্রহ্ম, যে কাজ সেও ব্রহ্ম। দ্যাখ্—প্রস্রাব করতে বসেছিস্, তখন দেখবি—আমি ব্রহ্ম, আমার শিশ্ন ব্রহ্ম, মাটিটা ব্রহ্ম, প্রস্রাবটা ব্রহ্ম। তখন দেখবি—একমেবাদ্বিতীয়ম। ঐ সবগুলি একটা। ১৫।৪৪

জ্ঞান, ভক্তি

যে শুদ্ধা ভক্তির অধিকারী তার কাছে শুদ্ধা ভক্তিই ভাল। ১১।৪৪

যে জ্ঞানের অধিকারী তার কাছে জ্ঞানই ভাল। ১১।৪৬

জ্ঞান আর ভক্তিতে কোন দিনই প্রভেদ নাই। ৩০।১০

ভক্তি না হ'লে কোন দিনই জ্ঞান পাওয়া যায় না। শুদ্ধ নিরেট ভক্তিই চরম জ্ঞান। সে ভক্তির ফল আমি। এই মুক্তি, এই নির্বাণ। ৩০।১১

ভক্তির পথ দিয়ে হেঁটে চল। চোখ দু'টি রাখ জ্ঞানের 'পর। ৩২।৯

ধর্ম, কর্ম

কর্ম, তীব্রকর্মী হ'তে হবে। খুব কর্ম কর। কর্ম বিনা এক দণ্ডও কেউ থাকতে পারে না।··· যে যত বেশী কর্ম করবে, তার মুক্তি তত সম্মুখে। বীর-প্রাণ হওয়া চাই। এক মুহূর্তও কর্ম বিনা থাকতে প্যারি না, এইরূপ হবে। কর্মের জন্য ক্ষেপা কুকুরের মত বেড়াবে। ২০।২৩

ধর্ম জাগাতে হ'লে কর্ম জাগাতে হয়, আর কর্মটা জাগাতে হ'লে ধর্মটা জাগাতে হয়। দুটো পাশাপাশি। ওরা দু'টো ভাই রে। ধর্ম কর্ম দুই ভাইকে মিলিয়ে নিয়ে তখন নিবৃত্তির পথে সেই ব্রহ্ম। পরিত্রাণ চাইলেই দুটো ভাইকে আগে ডাকা লাগে। ও দুটো ভাই দুটো দিকেই যায়। সৎ-এর দিকেও যায়, অসৎ-এর দিকেও যায়। চুরি করা চোরের ধর্ম। সাধুর ধর্ম পরোপকারাদি সৎকর্ম আর ভগবানে আত্মসমর্পণ হ'লো ধর্ম। কর্মটা চালিয়ে নিয়ে যায়, ধর্মটা ধ'রে রাখে। ১৩।২৭-৩২

"আমি একটা উত্তম কর্মী" ব'লে অহংকার করা ভাল নয়। তার চেয়ে নিরহঙ্কারী······ধীর কর্মী ভাল। জানিস্ নে সেই কচ্ছপ আর খরগোসের

গল্প ? কর্ম না করলে পেট চলাই ভার হয় রে। পেট না চললে কি ধর্ম কর্ম আসে ? দ্যাখ্, একটা কথা আছে—হাত, পা, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পেটের উপর রাগ ক'রে তার খাওয়া বন্ধ ক'রেছিল, তার ফলে হ'লো কি, তার হাত পাই আগে শুকিয়ে যেতে লাগলো। ১২।৩-৪

মন

দ্যাখ্, শরীরের সঙ্গে কোন সম্বন্ধ নাই অথবা মহা সম্বন্ধ। দ্যাখ্, স্থূলের ভিতর দিয়ে সূক্ষ্ম যাওয়া বই আর কিছুই নয় রে! যদি মনে করিস্ শরীর নাই তবে কিছুই নাই, তবে আমি। দ্যাখ্, মহা আমি – সূক্ষ্ম আমি ধরতে হয়, তাই শরীর লাগে। যে চালাক সে শরীর ছাড়ে না। দ্যাখ্ রে, বনের বাঘে খায় না, মনের বাঘে খায়। যত দোষ মনের, শরীরের দোষ নাই। দ্যাখ্, মন শক্ত কর, কাজে লেগে যা, আপনি মন ঠিক হবে। আর শরীর শরীর করিস্, তবে আজ চুলকানি, কাল পাঁচড়া, ওদিন মাথাধরা ইত্যাদি করতেই পারে। ৩।১৩

মনটা দিয়েই ভগবানকে ধরতে হয়। মনটাকে ঠাণ্ডা রাখা চাই। দ্যাখ্, একটা চালাকী আছে রে। দ্যাখ, এই মনটাকে ঠাণ্ডা রাখতে হ'লে, পরিবারবর্গকে শান্তি দিতে হয়, ধর্মভাব ঢুকিয়ে দিতে হয়. নিজের পরিবারবর্গের ভিতর ধর্মভাব না ঢুকলে বড়ই কষ্ট পেতে হয়। ১২।৬

এই মনটা যদি শাশ্বত-পদে ফেলে দেওয়া যায় তবে আপনি আনন্দ উথলে ওঠে, আর যদি নরকের দিকে ফেলে দেওয়া যায়, তবে আপনি দুঃখ উথলে ওঠে। সবই মন। ১৩।৫

মনের শক্তি যেখানে বল সেখানে। চাই মন, মন হ'লে প্রাণ, প্রাণ হ'লে আমি। ১।৪৪

দ্যাখ্, রেলগুলো সোজা—জটিল নয়, তাই দৌড়ে নিয়ে যায়। তেমনি মনটা কোন রকমে সরল কর্তে পাল্লেই প্রাণ-ইঞ্জিন গেল আর কি একদম দার্জিলিং! ১৮।১১

কীর্ত্তন-মহিমা

সংকীর্তন কর, সংকীর্তন প্রচার কর। কীর্তন বড় ভাল জিনিস, কীর্তন মৃগনাভি, পিক্রিক এসিড...নাশ করে অজ্ঞান, অবিদ্যা। ১।২৬

দ্যাখ্, কীর্তন প্রচার কর, খুব কীর্তন কর। সব আমি দিব! গুরুর দেওয়া জিনিষ যদি দিনের মধ্যে দুই এক বার কাজ করা যায়, তাতে কিছু হয় না ; চব্বিশ ঘণ্টা ভাবতে হয়। তবে নিয়ম বেঁধে করা ভাল, মন তৈয়ারী হয় ; কিন্তু কীর্তনে মন একেবারে তৈয়ারী হয়। বিশ্বাস ক'রে তার ভিতর ঢুকলেই হয়। ১।৫১

ছুটে আয়, ঐ দ্যাখ, কীর্তনের ঋষিরা ঘুরে বেড়াচ্ছে ; নাম দিয়ে বেড়াচ্ছে, ১ম—১৮

সঙ্গে সঙ্গে মায়া, মমতা, কাম, ক্রোধ ইত্যাদি সব হরিনামের বিনিময়ে ল'য়ে যাচ্ছে, আর বলছে,—"আয় মহাপাপী, কে আছিস্ ছুটে আয়,—তোদের সব পাপ-তাপ আমার ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে তোরা প্রাণ মন খুলে দিয়ে সংকীর্তন কর্, প্রাণ খুলে হরিবোল হরিবোল বল।" ৮।১১

সংসারে প্রত্যেক কাজেই ভগবানকে মেখে রাখবি। প্রচণ্ডবেগে কীর্তন করবি, কাজ করবি, কীর্তন ভাঙ্গলেই যে তিমিরে সে তিমিরে। কীর্তন জীবনের ব্রত ব'লে জানবি। সারাটা দিন প্রাণ দিয়ে খাটবি, সন্ধ্যাবেলা সংসার থেকে বিদায় নিবি! 'এখন আমি চল্লাম পরমপিতার কাছে।' পিতাকে আশ্রয় করবি। ১৭।২

দ্যাখ, কীর্তনটা কি ভাল জিনিস! একাধারে সৎসঙ্গ—সাধনা। ১০।২৮

নাম-মাহাত্ম্য

শুধু নাম, নাম প্রণবের উপরে। প্রণবের আগে নাম, পাছেও নাম। বীজমন্ত্র কিরে? নাম। দ্যাখ, নাম নিয়ে। দ্যাখ, নাম নিয়ে যায় প্রণবে, আর প্রণব নিয়ে যায় আমাতে। আমি পরমাত্মা, শুদ্ধ ব্রহ্ম। দ্যাখ্, নামে উঠে একদম শিলিগুড়ি! প্রণবে উঠে পরব্রহ্ম। নাম—দার্জিলিং মেল। ৪।১৩

আলস্য জড়তা শয়তানের থানা করিস্ নে। নামে ডুবে থাক। নাম কর আর বিলিয়ে দে!⋯ ⋯শান্তি শান্তি ক'রে ঘুরে বেড়াচ্ছিস? নাম ক'রে জগৎ ভুলে যেতে পারিস্ না? শরীর ভুলে যেতে পারিস্ না? তা না হ'লে শান্তি পাবি কোথায়? কি চাস্? আর কি চাস্? অমৃত? দেবগণ যে অমৃত পান ক'রে অমর হয়েছিল, তোদের সম্মুখেই সেই অমৃত। তোদের হাতে ধ'রে দিচ্ছে, মুখে তুলে দিচ্ছে, তাও খেতে পারবি না? অহঙ্কার করবি তো নামের। নাম কর। হনুমানের মত বক্ষ বিদারণ ক'রে দেখাবি নাম।⋯অন্তরে নাম ক'রে যা, সব দিতে পারি! অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড লয় ক'রে দিতে পারিস্, তার একমাত্র উপায় নাম। নামই সব। ৩৫।৪

ভগবানই সৎবস্তু। নাম আর ভগবানে পৃথক নাই। নামকেই জানবি ভগবান ব'লে। ১৭।২

বিশ্বাস

বিশ্বাসটা ঢুকিয়ে দিবি অন্তরে অন্তরে। যদি বিশ্বাস করিস্ তবে আর ভয় কি? ঐ বিশ্বাসটাই জানবি আমি। যা'র বিশ্বাস আছে তার আমি আছি। যে বিশ্বাস করে তাকে আমি সব দেই। যে বিশ্বাস করে, তার অপ্রাপ্য আমার কাছে কি আছে? আমি সব দিব। ১৩।৩৬

চোরকে বিশ্বাস ক'রে যদি তার কাছে টাকা রাখা যায়, সে কখনও সে টাকা চুরি করে না। বিশ্বাস কর, আমায় বিশ্বাস কর। ১৩।৩৭-৩৮

যারা প্রাণে প্রাণে বিশ্বাস করে, প্রাণে প্রাণে ডুবে থাকে, তাদের সংসার অচল হয় না। ভগবান মাথায় ক'রে তাদের খাদ্যসামগ্রী এনে থাকে। তাদের পুত্রপৌত্রাদি পর্যন্ত সুখে থাকে।

যদি বিশ্বাস করিস কাণাকড়িরও মূল্য আছে, আর যদি বিশ্বাস না করিস্ তবে মোহরের মূল্য নাই। ১৮।২

দ্যাখ্, ভগবানকে আনতে হ'লে বিশ্বাস দিয়ে সিংহাসন তৈয়ার কর্তে হয়। দ্যাখ্, সেই অমল ধবল বিশ্বাস ব্যতীত সেই পরমাত্মার আগমন হয় না, ভগবানের আসন হয় না। ২০।১১

ভালবাসা

দ্যাখ, ভালবাসতে হয় প্রাণ দিয়ে, ভালবাসতে হয় সবাইকে ···৯।৯

সাপকে পর্যন্ত ভালবাসিস্। এমন দিন আসবে, সাপও তোকে অনিষ্ট করবে না। ৪৬।৭

Name and Love can won everyone. Love can gain everything in this world. Love can gain I and Love can gain you, and everyone will be loved. Love and Name can conquer I, can won I. Therefore Love and Name can conquer the Universe! Because Universe is I. Declare Name and Love. Give heart to heart and won heart. Love is Heaven and Heaven is Love. ৩।২৩

দ্যাখ্, ভালবাসার বড় শক্তি, এটি নরকেও স্বর্গ ক'রে দিতে পারে। ভগবানকে ভালবাসি কিনা ঠিক করতে হ'লে, আগে দেখতে হয় আমি জগৎকে ভালবাসি কিনা। যদি দেখিস্ জগতের প্রত্যেক জীবকে ভালবাসি, প্রত্যেক বস্তুকে ভালবাসি, তখন বুঝবি আমি ভগবানকে ভালবাসি, ঐ ভাবটা ভাব্।

মনে করবি প্রত্যেকের ভিতর ভগবান আছেন। জগতে যা-কিছু সব তাঁর জিনিষ ব'লে ভালবাসবি। ২৭।১৬

নারীসাধনা

মেয়েদের যতদিন খাঁটিভাবে মা ভাবতে না পারছিস, ততদিন তাদের মুখের দিকেও চাইতে পারবি না। পথ সত্যের ও মখমল দিয়ে ঢাকা, দু'দিকে দু'টি মস্ত খাদ,—একটা কামিনী, একটা কাঞ্চন। একটু হেলিস্ দুলিস যদি তবে খাদে প'ড়ে মারা যাবি। যদি আর কোন দিকে না চেয়ে সেই ধ্রুব তারার দিকে চেয়ে অর্থাৎ পরমপিতার দিকে চেয়ে চ'লে যেতে পারিস, তবে আর কোথাও পড়বি না। ৫৩।৭

যে নিজের স্ত্রীকে ভালবাসে কিন্তু জগৎকে ভালবাসে না, সে ভালবাসা কখনও ভালবাসা নয়, সে কেবল মত্ততা। ১৩।৫৯

মেয়েগুলিকে দেখা চাই মায়ের মত। বাজারে যে দাঁড়িয়ে আছে তাকেও, ঘরে যে আছে তাকেও। ১৮।৬

সদ্‌গুরু

ভগবানকে পাওয়া কি কষ্ট রে? গুরু পাওয়াই কষ্ট। সময় হ'লেই সদ্‌গুরু মিলে, সদ্‌গুরুই ভগবান। যা, যা, আমাকে জেনে ফেলতে পারলেই সব মিটে গেল। বুঝে নে, দেখে নে আমি কে? আমি নানা রং-এ প্রতিফলিত, তাইতো রে গোলমাল! এক একটা ক'রে রং বাদ দিয়ে ফেল, ঠিক আমি দাঁড়াবে। দ্যাখ্, আমার আমিই সদ্‌গুরু, আমার সদ্‌গুরুকে ভালবাসতে হয়। আমাকে ধারণা করতে পারে না কিনা, তাই সদ্‌গুরু। সদ্‌গুরু আমার ছায়া। তুমি তুমি করতে করতে আমাতে লয় হ'য়ে যায়। ২৭।২

না রে, না না; গুরু একজন সেই অনামী পুরুষ। আর বিরাটত্ব—প্রেম যার ভিতর জেগে উঠেছে সেই সদ্‌গুরু। আমরা সাকার কিনা, তাই সদ্‌গুরু আমাদের উপাস্য। একমাত্র সদ্‌গুরুই সেই ধামে নিয়ে যেতে পারে......যে নাম করবি সেই স্তরের নাম......ধ্বন্যাত্মক নামই শ্রেষ্ঠ। সদ্‌গুরুর ভিতরে সেই অনামী কম্পনের স্মৃতি আছে, আর তার সঙ্গে যারা থাকে, তাদের ভিতরও সেই কম্পনের শক্তি যায়, তারাও শক্তিমান। সদ্‌গুরুর প্রত্যেক কথাই মন্ত্র, গুরুমুখ হ'লেই কম্পন বোঝা যায়। ৫৫।৬

দেখ রে দেখ, যাকে দেখলে মনের অন্ধকার ঘুচে যায়—যার সঙ্গে একটা কথা বল্লে মনের অন্ধকার ঘুচে যায়, তাকেই গুরু বরণ করবি আর অনবরত নাম করবি। ২৮।২০

সাধন-সংকেত

ধ্যান করবি সকল সময়। চলতে বসতে খেতে শুতে সকল সময়। একটু অভ্যাস করলেই হয়, বেশী কঠিন কিছু নয়। আর মনে অনবরত নাম, এমন কি কথা বলতে পর্যন্ত মনের মধ্যে নাম হচ্ছে, এই রকম করতে করতে স্বারূপ্য লাভ হয়। ৯।২৪

দ্যাখ্, নিঝুম হ'য়ে নাম কর, ডুবে নাম কর, বেশ তালে তালে নাম কর আর মনের চোখটি ঠিক জায়গায় রাখ। শিরদাঁড়া সোজা ক'রে হাত দুটি ঘুরিয়ে মাজার উপর রাখ। কাজের সময় কাকেও কাছে রাখবি নে, একা। এমন ক'রে বসবি, যাতে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ না ঝুলে পড়ে, না গ'লে পড়ে। একটা ঘুমের অবস্থা আসবে, সেটা করিস নে। অন্য রকম স্মৃতি কিছু আসতে দিস

না, আসলেও তাড়িয়ে দিবি। তিন বেলা প্রত্যেক বার এক ঘণ্টা থেকে দেড় ঘণ্টা। ৩৫।৭

কর্ম না করলে ধ্যান হয় না। আসলে ধ্যানে অধিকারী হয় না। যে যত কর্মী সে তত ধ্যানী। ঘুম বেশী করতে নেই। ঘুম বেশীতে লয় এনে দেয়। মাঝামাঝি থাকবি। ৪৫।৫

দ্যাখ্, যেমন তেমন ক'রে নাম কর্তে পাল্লেই আয়ু বৃদ্ধি হয়। নামের সঙ্গে সঙ্গেই আয়ু বল সব বেড়ে পড়ে। নামে মুক্তি। অনবরত নাম করবি আর চলতে ফিরতে সব সময় নাসামূলে দৃষ্টি রাখবি। দ্যাখ্, যে আপন গুরুকে ঐ জায়গায় জাগিয়ে নিতে পারে, তার সব হবে। ২২।২৪

তাঁকে ধ্যান করবি চব্বিশ ঘণ্টা। সব দেখবি—সব সেই। তাঁকেই কর সংধ্যারে বন্ধ্যা করা। ৩।১৯

পূর্ণবেগে কীর্তনটা কর, তারপর গিয়ে ধ্যান ধারণা সব কর। যখন দর্শন-টর্শন হবে তা হোক, তারপর যখন শব্দটা শুনতে পাবি, তখন ঐ শব্দের দিকে মনটা ফেলে দিয়ে চুপ ক'রে থাকবি। ১৩।১৯

ঐ নামটি ও ধ্যানটি যদি চব্বিশ ঘণ্টা করতে পারিস্,—এমন-কি অন্যের সঙ্গে কথা কইতেও ধ্যানটি হওয়া দরকার।

সন্ধ্যায় শব্দ শোনা যায়। সন্ধ্যাটা দিন যায় রাত আসে—ভোরেও। তাই দুই সময়ই প্রকৃত কাজের সময়। দুই সময়ই ভাল। ২৬।১১

নীতিনির্দেশ

নেশনটা পড়ে গেছে কেবল ছুৎমার্গে! কেবল কতকগুলো কুলগুরু আর পুরোহিত—ধর্মজ্ঞান তো দেয়ই নাই, কেবল দেহি দেহি, বার্ষিক পেলেই মিটে গেল। সঙ্গে সঙ্গে নিজেরাও হারিয়েছে! একটা কথা আছে—"যতই করিবে দান তত যাবে বেড়ে"—দানও করে নাই, বেড়েও যায় নাই। ১১।১৭

Spit on and spurn the sin, not the man · the sinner. 3/21

Do not hate anyone, hate their errors, correct their errors. Embrace and keep the sinner's breast on your breast and thus let the sin erase in truth and not in false. 5/13

ক্রোধকে পাপ ব'লে জানবি। ওকে প্রশ্রয় দিবি না, সহ্য করবি। সহ্য করার চেয়ে আর বড় গুণ নাই। দ্যাখ্, সংসারে থাকতে হ'লে মাঝে মাঝে ফোঁস করার দরকার। ১৭।২

ঘুমটা খুব কম করার দরকার। চার ঘণ্টা ঘুমই যথেষ্ট। বিদ্যুৎবেগে কাজ করবি, আলসে হ'য়ে ব'সে থাকিস না। আলসে হ'য়ে ব'সে থেকে হরিনামের কলংক করিস্ না।

সব সময় ভাবাব "আমি যন্ত্র, ভগবান যন্ত্রী", তাহ'লে পাপ স্পর্শ করতে পারে না। কামকে প্রশ্রয় না দেওয়াই ভাল। ১৭।২

সব জাতি মিলে একসঙ্গে খেলে কি সর্বধর্ম সমন্বয় হয় রে? সব্বাইকে জানতে হয় এক—সব ভগবান, সব্বার প্রাণ এক হওয়া চাই, প্রাণে প্রাণে জানা চাই ঈশ্বরকে। ১৮।৫

না না, পরের কাছে কারও নিন্দা করিস্ না। যদি নিন্দা করতে হয় তার সম্মুখে। ভালবেসে যা করবি তাই ভাল। আত্মপ্রশংসা সব ছেড়ে দে। প্রাণ খুলে পরের প্রশংসা কর। ৫০।৩

সংসার সংসার ক'রে যত জড়িয়ে ধরবি, সংসার তত তোকে ফাঁকি দেবেই দেবে। বিচারের আর কিছুই নাই। কেবল অন্তরে অন্তরে বিচার করবি, কোথায় তোর দোষ। ৫০।৪

দেখ্, মন যদি কখনও কোথায় কু হয়, তবে মানুষের কাছে বলবি। আর তোর যে শত্রু, তার কাছে আগে বলবি, তার সঙ্গে আগে মিত্রতা করবি। যে তোকে লাথি মারবে, তাকে বল ভাই। ৫০।৫

কমেণ্ট না ক'রে কমেণ্ট পেয়ে সন্তুষ্ট হ'তে চেষ্টা করা ভাল। তা'হলে কোনও দিন কারও সাথে ঝগড়া হয় না। ৫০।৭

দেখ্, 'পারিনে' খবরদার বলবিনে, চেষ্টা কর। কর্ম ছাড়া ভগবানও কিছু নয়, ভগবান ছাড়া কর্মও কিছু নয়। বুকের তেজ না থাকলে কি আর বিশ্বাস হয় রে? বিশ্বাস বীরভোগ্যা। শক্তিহীনের আত্মসাক্ষাৎকার হয় না। ৫০।৬

যম কেউ কারও নয় রে! তোর যম তুই। ১।৬০

সংসারী সন্ন্যাসী চাই, জঙ্গলের সন্ন্যাসী আর চাই না, নিতাই চাই। ২।৫

থাকবি সংসারে মন রাখবি ভগবানে। ৪।৩

Charm yourself, if you wish to charm everyone. 4/17

Knowledge is the crown of God. 4/21

Your heart is the store of uncommon power, because you are God, because I am God. 4/22

There is great similarity in every religion. 4/23

Without low-tongue you cannot expect low-tongue. 4/24

প্রাণ ধরতে গেলে প্রেমই ওষুধ। ৮।২

সুখে দুঃখে যার সমান ভাব, সুখেও ডুবে পড়ে না, দুখেও কাতর হয় না, তারাই সচ্চিদানন্দ। ৯।৩

দ্যাখ্, ঐ যে একটা কথা আছে,—ধ্যান করতে হয় মনে, বনে, কোণে। ৯।১৮

যদি তাঁর নামে ডুবে থাকা যায়, সেই পরম ভক্তি।

মন সরল, মধুর বচন আর বুকভরা প্রেম—তিনটিই মুক্তির প্রধান উপায়। ২৭।২৬

যে স্ত্রী স্বামীকে ভগবানের দিকে যেতে দেয় না সে জানবি অসতী, তার সম্পর্শে স্বামী সমেত মারা যায়। সতের দিকে যে যেতে না দেয় সেই অসতী। ভগবানই সৎবস্তু। ১৭।২

দিব্য অনুভূতি

তখন এক বজ্র প্রেমের খেলা আরম্ভ হ'লো। তখন স্বপ্নের ভিতর, আপনার ভিতর একটি শক্তি······কাজ করতে আরম্ভ করলো। এক্স্প্যানসান্ ব্রহ্মা, স্ট্যাগ্নেশন বিষ্ণু, রিপাল্স্যান মহেশ্বর। তখন জ্যোতির সৃষ্টি হ'লো তাই শিবের বুকে শ্যামা। নিভে গেল, সব নিভে গেল, এক একটি ক'রে সব ডুবে গেল। যা ছিল, যা হয়েছিল ; আশা গেল, ভরসা গেল, সব গেল। কেবল আমি, সেই আমি গো, সেই অনন্ত আমি, অসীম আমি, আমি গো কেবল আমি। তুমি আমি, সে আমি—আমির ধারা, আমির ঢেউ···। ব্রহ্মা আমি, বিষ্ণু আমি, ঐ জ্যোতি আমি, ঐ গ্রহ নক্ষত্র সব আমি। ঐ যাকে দেখে তুমি যে ঘৃণা করছ তাও আমি। বল—কেবল আমি, আমি গো আমি। দেখ দেখ, তুমি যাকে ভালবাস, তুমি যাকে বিষের মত ভয় কর, তুমি যাকে শত্রুর মত দেখ, দ্বিধা কর, সন্দেহ কর, তাও আমি, সব আমি। দেখবে ভাইকে আমি, চিনবে ভাইকে তাও আমি। অনন্ত আমি। দেখ—'তুমি' ভুলে যাও, 'তুমি' মুছে ফেলাও, দেখবে শুনবে বুঝবে তাও আমি। আমি অনন্ত ধারা, আমি সত্য পুরুষের ধারা ; আমি শব্দ, আমি ঈশ্বর, আমি জ্যোতি, আমি সৃষ্টি। দুঃখ—তাও আমি, সুখ—তাও আমি, দেখ—আমার ভেদ নাই, আমি—আমার আমি, যখন আমার জ্ঞান হয়, আমি তখনই স্রষ্টা,—আমি বিষ্ণু। আমি মায়া—যখনই আমি ভুলে যাই, আমার অস্তিত্ব আমি সগর্বে মুছে ফেলি—তখনই আমি মহাকাশ ; আকাশের ঢেউ লেগে সব ····আমি সৃষ্টি স্থিতি লয় ক'রে ফেলি, অনন্তে মিশে যাই। আমার জ্ঞান অজ্ঞান—সেও জ্ঞানময়··· ৬৮।১

দেখ, ব্রহ্মের চরম দশম দ্বারে। দশম দ্বারে সমস্ত বাসনা ছুটে গেছে, একমাত্র আমির দিকে ছুটে গেছে। দেখ্ 'ভ্যানিস্' নয়। ভগবতের রাজ্য—তেস্রা তিল হ'তে সোহহং। গীতা তেস্রা তিল হ'তে মূলাধার। তেস্রার পর আর কর্ম্ম-টর্ম্ম নেই। কেবল প্রেমে পর্য্যবসিত হচ্ছে। ৪২।৪

অভয় বাণী

তোদের যত জ্বালা আছে, যত পাপ আছে—যত তাপ আছে, সব আমার মাথায় চাপিয়ে দে। হাস্, হাস্, কীর্তন কর্, তোদের আমি আছি। দ্যাখ্, ভয় কি রে ? দ্যাখ্, তোর সংসার কি রে ? সংসার কার রে ? সংসার তোর ?

তুই কে রে ? সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম পরম পুরুষ। তোর আবার সংসার ? তোর আবার স্বর্গ ? তুই যা ইচ্ছা করবি, তাই হবে, তাই হবে। তোদের জগতে ভয় কি রে ? তোদের ভয় কি ? একমাত্র নাম। তোদের সকলের আত্মায় আমি বিদ্যমান। আমি সকলের আত্মা, আমি পরব্রহ্ম, আমার সকল ইচ্ছা তোদের ভিতর ঢুকিয়ে দিয়েছি, এখন ইচ্ছা তোদের। একটু পথ দে, আমি তোদের সব চূর্ণ ক'রে ফেলব। তোরা সিংহের শিশু, এক-একটা ক'রে ধরবি আর চিবিয়ে চিবিয়ে উদরস্থ ক'রে সব লয় ক'রে দিবি। তোদের কেউ প্রতিদ্বন্দ্বী নাই। তোরা মহাপুরুষ। ৫।১৭

আয় রে সতীত্ব-অপহরণকারি ! এখনও বলছি নামে ডুবে যা। সব পাপ তাপ আমি খুলে দিব। মা, মা ক'রে ডাক। পাপের ভাগী কে রে ? পাপের জন্য আমি দায়ী, বুকভরা প্রেম নিয়ে চ'লে আয়। ৫।২২

তোরা ছুটে আয়, পাগল হ'য়ে ছুটে আয়, উধাও হ'য়ে আমার পানে ছুটে আয়। চন্দ্রলোক, সূর্যলোক, গ্রহলোক, নক্ষত্রলোক, প্রেতলোক এমন কোন লোক নাই যে তোদের গতি রোধ করতে পারে। ৫।২৩

আমার...আমি উঠে পড়েছি। জীব ! তোর চিন্তা কি ? তোর শোক দুঃখ কি ? ছুটে আয়, বিশ্বাস কর্—ঝাঁপ দে কীর্তনে ব্রহ্মসাগরে ডুবে যাবি। তোদের মহা মহা পাপ থাক, ব্রহ্মহত্যা, গোহত্যা, স্ত্রীহত্যা ইত্যাদি ক'রে থাকিস্, ভয় নাই। আমায় বিশ্বাস কর্, আত্মাকে বিশ্বাস কর্, ছুটে চ'লে আয়, নাচতে নাচতে ছুটে আয়, ভগবান ভগবান ব'লে ছুটে চ'লে আয় ; জয় জিসাস্, জয় জিসাস্ ব'লে ছুটে চ'লে আয়। কে কোথায় আছিস শিখ, বৌদ্ধ, খৃষ্টান, জৈন, ব্রাহ্মণ, বৈষ্ণব—আয় চণ্ডাল, একবার পরমাত্মার ভাবে ভাবিত হ, তোদের সব জ্বালা যন্ত্রণা আমার হাত দিয়ে সব মুছে দেব। অন্তরে অন্তরে নাম কর, নামে ডুবে পড়। আমি অনামী, তোদের অন্তরে অন্তরে জেগে উঠব। সকলকে বল—ভয় নাই, চিন্তা নাই......অভীরভীরভীঃ। একবার সকলের প্রাণের কাছে গেয়ে গেয়ে বেড়াতো যে তোদের সকলের শান্তি দিতে পরমাত্মা জেগে উঠেছে। ছুটে আয়, আমি তোদের শান্তি দিব, আমি তোদের স্থান দিব, আমি নরকে স্বর্গরাজ্য স্থাপিত ক'রে দিব। তোরা আমারই বুদ্বুদ আমাতেই লয় হ'য়ে যাবি, আর বাতাসের আঘাত সহ্য করতে হবে না। ছুটে আয়, বিশ্বাস কর্, মনে কর, চিন্তা কর—আমি আত্মা, আমি পরমাত্মা, আমি পরব্রহ্ম, আমি জেগে উঠব, আমি তোদের ভিতরে প্রকট হব। ১৩।৫০-৫৭

......অভীরভীরভীঃ। ঐ দ্যাখ পরমাত্মার পূর্ণ বিকাশ সব অন্তরে অন্তরে ঢুকে যাচ্ছে। পরমাত্মা তোদের জন্য আকুলি-বিকুলি করছে...... যা হয় নাই, যা বহু কষ্ট ক'রে লোকে আনতে পারে না, এবার তোদের তাই। ২০।২১

দেখ্, তোরা কে কত পাপ করেছিস্ নিয়ে আয় দেখি ? দে দেখি তোদের সমস্ত পাপ তাপ আমার মাথায় চাপিয়ে, আমায় ডুবাতে পারিস্ কি না ?

তোদের সব পাপ আমার মাথায় দিয়ে তোরা শূন্যে উঠে যেতে পারিস্ কি না—ব্রহ্মে লয় হ'তে পারিস্ কিনা ? ৮।১৬

ব্যক্তি-বিশেষের উদ্দেশে

অতুল ! একবার উন্মত্তের মত গেয়ে গেয়ে বেড়াতো দেখি ! নিদ্রিতের কানের কাছে গিয়ে বল্—"উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত......" বিশ্বকে স্তম্ভিত ক'রে ফেল। তুই প্রাতঃসূর্যের মত সকলকে জাগা। চোখ মুছে কানে মুখ দিয়ে সকলকে বল দেখি ! তুই পারবি। ৭।২০

দেখ্ কিশোরী ! প্রতীচ্য পাশ্চাত্য সব এক খুঁটোয় বাঁধতে হবে প্রেম দিয়ে। বুঝিয়ে দিস্ স্বাধীনতা কাকে বলে। তোদের প্রত্যেকে রাজভক্তি শিখবি। পূর্ণবেগে কীর্তন জাগিয়ে তোল তো আবার। আবার প্রত্যেক প্রাণে প্রাণে শান্তি ঢেলে দে তো !—আদর্শ রাজভক্ত, আদর্শ ভগবদ্ভক্ত সৃষ্টি কর্ তো ? দেখ্, এক ঢেউ জগতের এপার ওপার দিয়ে চ'লে যাবে, ঠিক পাবি না ! নাম আর প্রেমই যেন তোদের প্রধান সহায় হয়, বুঝিয়ে দিবি ! বুঝিয়ে দিবি—সেই বিরাট থেকে এক ক্ষুদ্র বণা পর্যন্ত সেই এক ভগবানের সত্তা, কেউ যেন কা'কে হিংসা না করে ! বন্ধুকে একটু কম ভালবাসিস্ তাতে ক্ষতি নাই, কিন্তু শত্রুকে খুব বেশী। সমুদ্রের জল থেকে লবণ বার করলে জলও খাদা, লবণও খাদা। ৩৩।৬

প্রশ্নোত্তর

কিশোরীমোহন দাসের চিন্তার উত্তর

তোর অনেকবার মৃত্যুর গতি রোধ করেছি। কয়বার মরতে বসেছিস, আমি ঘুরিয়ে দিয়েছি কেন ? বুঝেও বুঝিস্ না কেন ? তুই যা, পূর্ণবেগে কীর্তন কর। ঠাকুরকে বিলি ক'রে দে অন্তরে অন্তরে—মৃত্যুভয় কি রে ? যখন কাজ হবে তখন আমি এসে আমাতে লয় ক'রে নিয়ে যাব। তোর ভাবনা কি রে ? ১২।২৪

অশ্বিনীকুমার বিশ্বাস মনে মনে প্রশ্ন করিতেছেন, ভাব-বাণীতে তাহার উত্তর হইতেছে।—

প্রশ্ন—বলিলেন, "আমিই তিনি"। তিনিটা আবার কি ?

উত্তর—তা তো বলেইছি।

প্রশ্ন—বলেছেন ?

উত্তর—হাঁ!

প্রশ্ন—বুঝতে পারি নাই।

উত্তর—পাগল, ছুটে এস, দেখ—আমি বলি নাই কখনো, আমাকে বলিয়েছে। আমি নাই, আমি নাই। যখন 'আমি' বলে' বলতে গিয়েছি, তখনই হারিয়ে

দিয়েছে, তখনই ক্ষুদ্র হ'য়ে পড়েছি। কেমন ক'রে ইঙ্গিত করছে, হাত বাড়িয়ে দিচ্ছে—অনন্ত বাহু প্রসারণ, তুমি অনুসরণ কর।

Q.—Is it spirit possession ?

উত্তর—না গো, না, না।

প্রশ্ন—তবে কি ভাববাণী ?

উত্তর—হাঁ, তাতো ঠিকই।

প্রশ্ন—তা হ'লে এ ভাববাণীর বক্তা কে, খুলে বলুন।

উত্তর—আমি যদি ব'লে দিই, তোমার বিশ্বাস হবে না, নির্ভর করা হবে না। তুমি যেমন, তেমনি থাকবে। অনুসরণ কর, অনুসরণ কর। চিন্তা কর, তোমার বিশ্বাসে সব ফুটে উঠবে। বার বার বলি—অনুসরণ কর......তোমার এত কষ্ট হতোই না, যদি বিশ্বাস করতে, নির্ভর করতে। ৭।১৬-৭

চতুর্দশ অধ্যায়

সত্যনাম-প্রচার

লোককল্যাণ-অভীপ্সা ছিল শ্রীশ্রীঅনুকূলচন্দ্রের সত্তাগ্রথিত জন্মগত সহজ বৈশিষ্ট্য। পল্লীবাসী পারিপার্শ্বিক সবাইকে তিনি প্রাণ দিয়া ভালবাসিতেন এবং সর্বক্ষণ তাহাদের মঙ্গল-চিন্তায় নিরত থাকিতেন। স্বীয় সমাজের বীভৎস কুৎসিত চিত্রটি নিয়তই তাঁহার চক্ষের সমক্ষে জ্বলজ্বল করিয়া ভাসিয়া উঠিত। সর্বত্র পাপের নারকীয় লীলা চলিতেছে; মানুষ মঙ্গলময় ভগবানের পুণ্যনাম ভুলিয়া গিয়া অন্যায় ও অসত্যের স্রোতে গা ভাসাইয়া চরম ধ্বংসের সম্মুখীন হইতেছে। দেশবাসী জনসাধারণের ঈদৃশ শোচনীয় দুর্দশা পরদুঃখকাতর অনুকূলচন্দ্রের অসহ্য হইয়া উঠিল। অন্তরের কলুষরাশি বিদূরিত করতঃ প্রতিটি ব্যক্তি যাহাতে সাত্বত পথে চলিয়া শাশ্বত কল্যাণের অধিকারী হইতে পারে তাহার বিহিত বিধানের জন্য তিনি অতীব ব্যাকুল হইলেন।

স্বীয় অভীষ্ট সিদ্ধির উদ্দেশ্যে অনুকূলচন্দ্র তাঁহার কতিপয় অনুরাগী ভক্ত লইয়া একটি কীর্তনের দল গঠন করিলেন এবং জাতি-বর্ণ-নির্বিশেষে সকলের কাছে পুণ্য হরিনামামৃত বিতরণে বদ্ধপরিকর হইলেন। প্রতাপপুরের কিশোরীমোহন দাস, কাশীপুরের অনন্তনাথ রায়, নাজিরপুরের দুর্গানাথ সান্যাল, মাঝিপাড়ার কোকন বুনে ও তরণী বুনে প্রভৃতি তাঁহার কীর্তনদলের নিত্যসঙ্গী হইলেন। অতঃপর কিছুকাল মধ্যে সালগেড়িয়ার শ্রীমৎ অদ্বৈত মহাপ্রভুর কৃতী বংশধর গোস্বামী সতীশচন্দ্র আসিয়া ইঁহাদের সঙ্গে যোগদান করেন।

কিশোরীমোহন ও সতীশচন্দ্র উভয়ে অনুকূলচন্দ্রের নির্দেশে তৎপ্রদত্ত পতিত-পাবন সত্যনাম জনসাধারণের মধ্যে ব্যাপকভাবে প্রচারের জন্য জীবন উৎসর্গ করিয়া ধন্য হন। তাঁহারা কীর্তনের দল লইয়া দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর অক্লান্ত শ্রমে নানাস্থানে পরিভ্রমণ করতঃ দেশবাসী আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলের কাছে নামপ্রচার করেন। ভক্তগণের ঐকান্তিক আগ্রহে শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্রও সময় সময় সপার্ষদ বহু অঞ্চলে গমন করিয়া জনগণকে প্রেমানন্দে মাতাইয়া তুলিতেন। সমবেত জনতা তাঁহার প্রাণমাতানো কীর্তনে ও মধুর নর্তনে মুগ্ধ হইত, তাঁহার অপূর্ব ভাবসমাধি দর্শনে বিস্মিত হইত এবং তাঁহার অলৌকিক ঐশী প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হইত। তিনি যখনই যেখানে যাইতেন, শত শত নরনারী ভক্তিবিগলিত চিত্তে তাঁহার শ্রীপদে আত্মসমর্পণপূর্বক সৎনাম গ্রহণ করিয়া ধন্য হইত।

দীর্ঘকাল ধরিয়া এইভাবে সংকীর্তনের মাধ্যমে লোকের দ্বারে দ্বারে সত্যনাম প্রচারের ফলে এক সময় এমন হইয়াছিল যে, বাংলার যত শহর-শহরতলী, বাজার-

বন্দর, পল্লী ও গ্রামাঞ্চল এবং বাংলার বাহিরেও বহুস্থানে শ্রীশ্রীঠাকুরের কথা ছড়াইয়া পড়িয়াছিল এবং সর্বত্রই জনমানসে দিব্য ভাবোন্মাদনার এক বিপুল বন্যা প্রবাহিত হইয়াছিল। সে সকল অপূর্ব কাহিনী আজ বিস্মৃতির গর্ভে প্রায় বিলীন হইয়া গিয়াছে। বহু আয়াসে তৎকালীন যাজন পরিক্রমার যৎকিঞ্চিৎ বৃত্তান্ত যাহা সংগ্রহ করিতে পারা গিয়াছে, বর্তমান অধ্যায়ে তাহাই পরিবেষণ করিবার প্রয়াস পাইলাম।

হিমাইতপুর ও তৎপার্শ্ববর্তী অঞ্চলে

ভক্ত কিশোরীমোহন দাসের প্রতাপপুরের বাড়ীতে শ্রীশ্রীঠাকুরের কীর্তনলীলার কথা ইতঃপূর্বে আলোচনা করা হইয়াছে। তখন শত শত ভক্তের প্রাণোন্মাদী কীর্তনে কিশোরীমোহনের ক্ষুদ্র পল্লীভবনখানি অহর্নিশ মুখরিত থাকিত। সকল সময়ই সেখানে আনন্দের মেলা জমিয়া থাকিত। প্রেমময় শ্রীশ্রীঠাকুর ছিলেন সেই আনন্দমেলার মধ্যমণি, আর তিনিই ছিলেন সেই কীর্তন লীলার প্রাণপুরুষ।

দেখিতে দেখিতে প্রতাপপুরের পার্শ্ববর্তী হিমাইতপুর, মাঝিপাড়া, ছাতীন, কাশীপুর, নাজিরপুর, রাধানগর, সিঙ্গা, সালগেড়িয়া, কুলমীয়া, দোগাছি, চিথলিয়া, ভাঁড়ারা, সুজানগর, সাতবেড়িরা, কামারহাট প্রভৃতি গ্রামাঞ্চলগুলি কীর্তনের বন্যায় ভাসিয়া গেল। শ্রীশ্রীঠাকুর তখন প্রায়শই ভক্তবৃন্দসহ এই সকল স্থানে গমন করিয়া আবালবৃদ্ধবনিতা সকলকে কীর্তনে মুগ্ধ করিতেন। নাজিরপুরের দুর্গানাথ সান্যাল, কাশীপুরের যোগেশচন্দ্র রায়চৌধুরী ও অন্নদা রায়, সালগেড়িয়ার সতীশচন্দ্র গোস্বামী, সিঙ্গাগ্রামের পূর্ণচন্দ্র চৌধুরী ও অন্নদা দত্ত, দোগাছি গ্রামের বঙ্কু বসাক ও শিবদাস পাটনী প্রভৃতি অনেক অনুরাগী ভক্তের বাড়ীতেই শ্রীশ্রীঠাকুর সদলবলে উপস্থিত হইয়া বহুদিন কীর্তন করিয়াছেন। সেই উত্তাল কীর্তন এক-এক দিন ঘণ্টার পর ঘণ্টা সুদীর্ঘ সময় ধরিয়া চলিত। কীর্তনান্তে শ্রীশ্রীঠাকুর সদ্‌গ্রন্থপাঠে ও সদালোচনায় সকলকে উদ্বুদ্ধ করিতেন। তাঁহার প্রেমিক চরিত্র ও অমিয় উপদেশে আকৃষ্ট হইয়া এই সকল পল্লীর বহু নরনারী তাঁহার শ্রীপদে আত্মসমর্পণ করিয়া ধন্য হইয়াছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর যখন যেমন সুযোগ পাইতেন, প্রতিবেশী নারীদের আধ্যাত্মোন্নতির জন্যও কম চেষ্টা করিতেন না। হিমাইতপুর ও তন্নিকটবর্তী ছাতীন, প্রতাপপুর সাহাপাড়া প্রভৃতি পল্লী হইতে রমণ সাহার মা, শশী সাহার স্ত্রী, ননী সাহার মা ও মাসীমা, নরেন সাহার মা প্রভৃতি প্রাচীনারা নদীর জল নেওয়ার জন্য পাড়ার বৌ-ঝিদের সঙ্গে লইয়া প্রত্যহ বিকালে কলসী কক্ষে ঠাকুরবাড়ীর ঘাটে উপস্থিত হইতেন। শ্রীশ্রীঠাকুর সাধারণত ঐ সময়টা পদ্মার ধারে পাঁচ-চালা ঘরের সম্মুখস্থ প্রাঙ্গণে বিশ্রম্ভালাপে কাটাইতেন। তাঁহার শ্রীমুখনিঃসৃত বচনসুধা পান করিবার

অভিপ্রায়ে উক্ত মহিলারাও তখন অদূরে কলসী রাখিয়া তাঁহার কাছে আসিয়া বসিতেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের অমিয়বাণী শুনিবার অধীর আগ্রহে আশ্রমবাসী বহু মায়েরাও ঐ সময় সেখানে সমবেত হইতেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর এই সুযোগে আদর-সোহাগ ও হাস্য-কৌতুকের মধুর আলাপনে সমবেত মাতৃমণ্ডলীর নিকট নারীজাতির মঙ্গলজনক ও উন্নতিকর নানা বিষয়ে কত অমূল্য উপদেশ প্রদান করিতেন। কোনোদিন মহামানবের জীবন ও বাণী, কোনোদিন মহীয়সী আর্য নারীর কীর্তিকাহিনী, কোনোদিন সদ্গুরু, সৎ-নাম ও সৎসঙ্গের মহিমা, কখনো শ্বশুর-শাশুড়ী স্বামী-পুত্র পরিবার-পরিজনের সেবা-পরিচর্যা, কখনো বা গৃহস্থালীর দৈনন্দিন কাজকর্ম প্রভৃতি নানা বিষয়ের সহজ সরল সরস আলোচনায় তিনি সকলকে উদ্দীপ্ত ও উদ্বুদ্ধ করিতেন। মহিলাবৃন্দ তাঁহার এই সমুদয় মহামূল্য মধুর উপদেশবাণী সশ্রদ্ধ চিত্তে উৎকর্ণ হইয়া শ্রবণ করিতেন। এইভাবে নিয়ত শ্রীশ্রীঠাকুরের পুণ্যসান্নিধ্য লাভের ফলে উক্ত মহিলারা অনেকেই নিজ নিজ পরিবারবর্গকে সৎ-আদর্শে অনুপ্রাণিত করিয়া তুলিতে সমর্থ হন এবং কালক্রমে স্বামী-পুত্র-পরিজন সহ শ্রীশ্রীঠাকুরচরণে দীক্ষা গ্রহণ করিয়া জীবন ধন্য করেন।

বাড়াদি গ্রামে

শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রবর্তিত সত্যনাম প্রচারের প্রচেষ্টা প্রথমত পূর্বোক্ত প্রতাপপুর, হিমাইতপুর ও তন্নিকটবর্তী গ্রামাঞ্চল সমূহেই সীমাবদ্ধ ছিল। আচার্য সতীশচন্দ্র গোস্বামীর সমগ্র জীবনের সার্থক যাজনে উদ্বুদ্ধ হইয়া অতঃপর দূর-দূরান্তবর্তী বহু স্থানের অসংখ্য নরনারী সৎনামে দীক্ষা গ্রহণ করিয়া ধন্য হন। আচার্য মহোদয়ের এই পুণ্যকর্মের প্রথম সূত্রপাত হয় বাড়াদি গ্রামে। তদবধি এ-যাবৎ কাল শত শত নিবেদিতপ্রাণ সেবকবৃন্দের বহুকালের প্রাণপাত পরিশ্রমে এই জগন্মঙ্গলকর মহা-আন্দোলন ক্রমশ বিস্তার লাভ করিয়া আজ সমগ্র বিশ্বে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। এই মহতী প্রচেষ্টার প্রথম পথিকৃৎ পূজ্যপাদ সতীশচন্দ্রকে আমরা অন্তরের সশ্রদ্ধ অভিনন্দন জানাই।

গোস্বামী সতীশচন্দ্র সত্যনাম-প্রচারার্থ শ্রীশ্রীঠাকুরের নির্দেশ পাইয়া সর্বপ্রথম বাড়াদি গ্রামে গমন করেন। সেখানে তিনি নিজেদের বংশগত শিষ্য বিখ্যাত জমিদার গোপেন্দ্রনাথ সাহা (খোকা ডাক্তার), তাঁহার ভ্রাতাগণ এবং একে একে এই পরিবারে সকল স্ত্রীপুরুষকেই সৎনামে দীক্ষিত করেন। অতঃপর এই গ্রামের ধনী ব্যবসায়ী কুঞ্জলাল রায়চৌধুরী, কৃষ্ণলাল রায়চৌধুরী, বসন্তলাল রায়চৌধুরী প্রমুখ অনেকে তাঁহার নিকট সৎমন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করেন। সতীশচন্দ্র তৎকালে জগতি, চোরহাস, বারখাদা, তালবাড়িয়া, ঘোরামারা প্রভৃতি গ্রামাঞ্চলগুলি পরিভ্রমণ করিয়া তাঁহার শিষ্য সেবক ও অন্যান্য বহু নরনারীকে সৎনামে দীক্ষিত করেন। উক্ত বাড়াদি গ্রামটি কয়েকবারই শ্রীশ্রীঠাকুরের শুভ পদার্পণে ধন্য

হইয়াছিল। তথায় তাঁহার প্রথমবারের শুভাগমন বৃত্তান্তটি নিম্নে বিবৃত করা যাইতেছে ঃ

খোকা ডাক্তার তাঁহার পিতৃশ্রাদ্ধের পর কুলগুরু সতীশচন্দ্র গোস্বামীকে পত্র-যোগে জানাইলেন,—"আমাদের পরিবারস্থ সকলেরই ঐকান্তিক আকাঙ্ক্ষা শ্রীশ্রীঠাকুর যদি কৃপা করিয়া একটিবার পদধূলিদানে আমাদের গৃহখানি পবিত্র করেন, আমরা ধন্য—কৃতার্থ হইব।" সতীশচন্দ্র খোকা ডাক্তারের উক্ত সনির্বন্ধ প্রার্থনার কথা শ্রীশ্রীঠাকুরচরণে নিবেদন করিলে, তিনি তাহাতে সানন্দে সম্মতি দান করিয়া বলিলেন,—"তা হলে কিশোরীকে সঙ্গে করে আজই আপনি বাড়াদি রওনা হয়ে পড়ুন। অনন্ত রংপুরে তার ভগ্নীপতি রাধারমণ গোস্বামীর বাড়ী গিয়েছে। তাকেও আসবার জন্য একটা তার করে দিন। সে এলে পর তাকে সঙ্গে নিয়ে আমি বাড়াদি যাব।"

শ্রীশ্রীঠাকুরের নির্দেশ অনুসারে সতীশচন্দ্র কিশোরীমোহনকে সঙ্গে লইয়া কীর্তনের দল সহ সেদিন সকালের স্টীমারে বাড়াদি যাত্রা করিলেন। বাজিতপুর স্টীমার ঘাটে যাওয়ার পথে কিশোরীমোহন সদলবলে মনের আনন্দে গান ধরিলেন—

অকূল ভবসাগরবারি পার হবি কে
আয়রে আয়।
ভবের কাণ্ডারী শ্রীগুরু আজিকে পারের তরী
বেয়ে যায়॥
অন্ধ-আতুর অনাথ-নিরাশ্রয়,
পাপী-তাপী আজ কে কোথায়!
ভবতারণ ভবে, পার নাহি হবে—
সময় ফুরাবে হায় রে হায়॥
দশ ইন্দ্রিয় দশজন দাঁড়ী
কর্মগুণ ধরি জোর চালায়।
আমি উচ্চ আশায় পাল তুলে দিয়েছি
ভক্তি-প্রেম তাহার সহায়॥
ঠাকুর অনুকূলে কিশোরীরে বলেন—
পাপী-তাপী লয়ে ধেয়ে আয়,
আমি অকূলের কূল হয়ে অনুকূল
হাত ধরে লয়ে যাব কিনারায়॥

ঐ দিন সন্ধ্যাকালে ভক্তপ্রবর দুর্গানাথ সান্ন্যাল আশ্রম বাড়ীতে শ্রীশ্রীঠাকুর-চরণে উপস্থিত হইলে, তিনি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"দুর্গানাথদা, আপনার

কি অবসর হবে, আপনি বাড়াদি যেতে পারেন ? অনন্ত রংপুরে গিয়েছে, তাকে চলে আসার জন্য তার করা হয়েছে। গোঁসাই কিশোরীকে নিয়ে আজ প্রাতে রওনা হয়ে গেলেন।" শ্রীশ্রীঠাকুরের কথায় দুর্গানাথ বলিলেন,—"আপনি আদেশ করলে যেতে পারি।" তাহাতে শ্রীশ্রীঠাকুর কহিলেন,—"তাহলে বাড়ীর কাজকর্ম সেরে এক্ষুণি চলে আসুন।" দুর্গানাথ আপন গৃহস্থালীর যথাসম্ভব বিধিব্যবস্থা করিয়া রাত্রেই আসিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁহাকে বলিলেন,—"আগামীকাল ৯টার স্টীমারে আমার বাড়াদি যাবার কথা ঠিক হয়ে আছে। আমাকে যখন অনন্তর জন্য অপেক্ষা করতে হচ্ছে, তখন আপনি সতীশ কাব্যতীর্থকে সঙ্গে নিয়ে ঐ সময় চলে যান, নতুবা কথার খেলাপ হবে। ওদের বলবেন,—অনন্ত এলে পর তাকে নিয়ে আমি রাত্রির স্টীমারে রওনা হব।" এদিকে দুর্গানাথ বাড়াদি যাবার আয়োজন করিতেছেন, এমন সময় আশ্রমের মফিজ-ভাই* তাঁহার সঙ্গে যাওয়ার জন্য অস্থির হইয়া ভীষণ বায়না ধরিল। এই অবস্থায় শ্রীশ্রীঠাকুরের অনুমতি লইয়া দুর্গানাথ পরদিবস প্রাতঃকালে ৯টার স্টীমারে সতীশ কাব্যতীর্থ ও মফিজ ভাই সহ বাড়াদি যাত্রা করিলেন। সেদিন তাঁহারা বেলা ১১টায় কুষ্টিয়া ঘাট পৌঁছিয়া সেখান হইতে ১২টার ট্রেনে বাড়াদি রওনা হইলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুরকে অভ্যর্থনা করিয়া বাড়াদি গ্রামে লইয়া যাওয়ার জন্য গোস্বামী সতীশচন্দ্র কতিপয় ভক্তসহ জাগতি রেল ষ্টেশনে উপস্থিত ছিলেন। দুর্গানাথ সেখানে ট্রেন হইতে নামিয়াই তাঁহাকে জানাইলেন যে, শ্রীশ্রীঠাকুর ও অনন্তনাথ উভয়েই রাত্রির স্টীমারে রওনা হইয়া আসিতেছেন। খোকা ডাক্তারের বাড়ী পৌঁছিয়া তাঁহারা দেখিতে পাইলেন, কিশোরীমোহন সদলবলে কীর্তনে মত্ত হইয়া আছেন, সমবেত কণ্ঠে গীত হইতেছে—

আসিয়াছে দুয়ারেতে ঈশতনয়
হৃদয়দরজা খুলি সযতনে লও তুলি
অনিমেষে চেয়ে থাক ভুলি আপনায় ॥

---

* অনেক দিনের কথা। আশ্রমে এক আপনভোলা পাগল থাকিত। সে মুসলমান ছিল। আমরা সকলে তাহাকে 'মফিজ ভাই' বলিয়া ডাকিতাম। দিবারাত্র সব সময় সে আপন মনে বিড় বিড় করিয়া কি বকিত এবং গুণ গুণ করিয়া কখনো শ্যামাসঙ্গীত, কখনো লালন ফকিরের গান, কখনো বা তাহার স্বরচিত কোনো গীত গাহিত। শ্রীশ্রীঠাকুরের সঙ্গে তাহার অতি নিবিড় মধুর প্রীতির সম্বন্ধ ছিল। শ্রীশ্রীঠাকুরকে সে 'বামুন ভাই' বলিয়া সম্বোধন করিত এবং প্রায় সময়ই তাঁহার কাছে কাছে থাকিত। তাহাকে দেখিলেই শ্রীশ্রীঠাকুরও কুশলাদি নানা প্রশ্নে আপ্যায়িত করিতেন। সেও একগাল হাসিয়া স্বল্প কথায় তাহার জবাব দিত। শ্রীশ্রীঠাকুর যখন তামাকু সেবন করিতেন, মফিজ ভাই নীরবে অদূরে দাঁড়াইয়া থাকিত এবং তাঁহার তামাকু সেবন শেষ হওয়া মাত্র গড়গড়া হইতে নিঃসংকোচে সে কলিকাটি তুলিয়া লইত এবং পরমানন্দে তাহার সদ্ব্যবহার করতঃ পুনরায় সযত্নে যথাস্থানে রাখিয়া দিত। মফিজ ভাই দিনের বেলায় আপন খেয়াল-খুশী মত এখানে ওখানে ঘুরিয়া বেড়াইত। সন্ধ্যা হইলেই সে আশ্রমে ফিরিয়া আসিত এবং শ্রীশ্রীঠাকুরের শয়নকক্ষের অলিন্দে নিজের ক্ষুদ্র শয্যাটি রচনা করিয়া শয়ন করিত।

কীর্তনপ্রাঙ্গণে দুর্গানাথকে দেখিবামাত্র কিশোরীমোহন ছুটিয়া আসিয়া তাঁহাকে বাহুপাশে জড়াইয়া ধরিলেন। দুর্গানাথ ও অন্যান্য সকলেই সঙ্গে সঙ্গে কীর্তনে যোগ দিলেন। তুমুল বেগে কীর্তন চলিতে লাগিল। সমাগত মহিলাবৃন্দের মুহুর্মুহুঃ শঙ্খ ও হুলুধ্বনিতে চতুর্দিক মুখরিত হইয়া উঠিল।

রাত্রি ১১টায় শ্রীশ্রীঠাকুর ও অনন্তনাথ আসিয়া পৌঁছিলেন। তাঁহাদের উপস্থিতিতে ভক্তবৃন্দের আনন্দোচ্ছ্বাস শতগুণে বৃদ্ধি পাইল। সেই নিশীথকালীন কীর্তনের গগনবিদারী প্রচণ্ড ধ্বনি শুনিয়া বহু দূরবর্তী গ্রামাঞ্চল হইতে দলে দলে লোক উন্মত্তের মত ছুটিয়া আসিতে লাগিল। এইবার কিশোরীমোহন আর একখানি গান ধরিলেন—

মাটিতে চাঁদের উদয় কে দেখবি আয়
যুগল চাঁদে কেউ দেখিসনি দেখ এসে নদীয়ায়।
হেরিয়ে গৌরাঙ্গের মুখশশী
লাজে গগনের চাঁদ পড়ে খসি,
এ চাঁদ ষোলকলায় পূর্ণ দিবানিশি
হেরে পাপতমোরাশি দূরে পালায়।।
অনুরাগকলঙ্কে হৃদয় ভরা
পীত ধড়া তেজি কৌপিন পরা
গোরার রাধানামে আঁখি জলে ভরা
নিজে কাঁদিয়ে গোরা জগৎ কাঁদায়।।
যজ্ঞসূত্রে কিবা শোভে গলা
তুলসীর মালা করে হেলা দোলা
যে শোনে ঐ বদনে হরিবোলা
তার হরিবোলা জনমে আর না ফুরায়।।
ব্যাস-আদি নারদ করিছেন স্তব
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড তোমার বৈভব
তোমার ও পদে কলুষহরা গঙ্গার উদ্ভব
যারে সাদরে ধরেন হর শিরোজটায়।।

আনন্দোন্মত্ত সমবেত জনতা একতানে কীর্তন গাহিয়া চলিয়াছে। সে তুমুল কীর্তন ঐদিন সারা রাত্রি এবং পরদিবস অপরাহ্ণ পর্যন্ত চলিয়া সাঙ্গ হয়।

খোকা ডাক্তারের পরিবারস্থ সকলের ঐকান্তিক অনুরোধে শ্রীশ্রীঠাকুর সে যাত্রা চার-পাঁচ দিন তাঁহাদের গৃহে অবস্থান করিয়াছিলেন। এই কয় দিবস খোকা ডাক্তারের বাড়ীখানা দিবারাত্র কীর্তন ও সদালোচনায় সর্বক্ষণ মুখরিত থাকিত।

শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীচরণদর্শনাকাঙ্ক্ষী হইয়া প্রত্যহ পল্লীবাসী বহু নরনারী সেখানে সমবেত হইতেন এবং তাঁহার অমিয় সঙ্গসুখে প্রাণ ভরিয়া উপভোগ করিতেন। এই সুযোগে ইঁহাদের অনেকেই সৎনাম পাইয়া ধন্য হইয়াছিলেন এবং খোকা-ডাক্তারের পরিবারবর্গ ও শ্রীশ্রীঠাকুরের নিত্যসেবাপূজা ও গৃহাগত অতিথিগণের আদর-অভ্যর্থনায় আত্মনিয়োগ করিতে পারিয়া কৃতার্থ হইয়াছিলেন।

এই প্রসঙ্গে একটি বিশেষ ঘটনার উল্লেখ করা যাইতেছে।—

খোকাডাক্তারের মাতুল কুষ্টিয়ার খ্যাতনামা চিকিৎসক ডাঃ গোকুলচন্দ্র মণ্ডল এল. এম. এস্. মহাশয় ঐ সময় রোগী দেখিতে বাড়াদির নিকটবর্তী জগতিগ্রামে আসিয়াছিলেন। খোকাডাক্তার এই সুযোগে জরুরী পত্রযোগে সংবাদ পাঠাইলেন যে, শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁহাদের গৃহে শুভাগমন করিয়াছেন। তিনি (গোকুলচন্দ্র) যেন অবিলম্বে তাঁহার শ্রীচরণে উপস্থিত হন। তৎকালে গোকুলচন্দ্র তাঁহার অতি আদরের একমাত্র কন্যার অকাল বিয়োগ-ব্যথায় উন্মাদের মত ছিলেন। ঐ সময় আবার একদিন স্বপ্নে তাঁহার এক দিব্যপুরুষের দর্শনলাভ ঘটে। এই অবস্থায় খোকাডাক্তারের লিপিখানা পাওয়া মাত্রই তিনি তাড়াতাড়ি বাড়াদি গ্রামে খোকা ডাক্তারের বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হন। সেখানে শ্রীশ্রীঠাকুরের সর্বপ্রথম সন্দর্শনে যুগপৎ অবাক বিস্ময় ও অপার আনন্দে মুহ্যমান হইয়া পড়েন।—এ কি! শ্রীশ্রীঠাকুরের মূর্তিখানি যে তাঁহারই স্বপ্নদৃষ্ট মহাপুরুষের অবিকল প্রতিচ্ছবি।

এদিকে আবার শ্রীশ্রীঠাকুরও গোকুলচন্দ্রকে পাইয়াই সাদরে বাহুপাশে বক্ষে জড়াইয়া ধরিলেন এবং 'আমি যদি আপনার সন্তান হই, আমি যদি আপনাকে* বাবা বলিয়া ডাকি তবুও কি আপনার মনোব্যথা যাবে না?'—ইত্যাদি কত না স্নেহমাখা দরদভরা সান্ত্বনা-বাক্যে তাঁহার দগ্ধপ্রাণে শান্তি-সলিল সিঞ্চন করিতে লাগিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের কথায় গোকুলচন্দ্র যেমনি তাঁহার অদ্ভুত অন্তর্যামিত্বের প্রত্যক্ষ পরিচয় পাইয়া অপার বিস্ময়ে অভিভূত হইলেন, তেমনি তাঁহার প্রাণ-জুড়ানো মধুর বচন ও স্নেহল আচরণে অন্তরের মর্মন্তুদ জ্বালা একেবারে ভুলিয়া গিয়া আনন্দে আত্মহারা হইলেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের অমিয় সংস্পর্শের অপূর্ব প্রভাবে গোকুলচন্দ্র স্বল্প সময়ের মধ্যেই নিজের বাড়ীঘর বিষয়-সংসারের কথা বিস্মৃত হইয়া দিবারাত্র অষ্টপ্রহর তাঁহাকে লইয়াই আনন্দে মসগুল হইয়া রহিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের আলাপ-আলাপন কীর্তন-নর্তন, স্নান-আহার, শয়ন-বিশ্রাম ইত্যাদি যাবতীয় ব্যাপারে তাঁহার স্বর্গীয় সঙ্গ-সান্নিধ্য প্রাণ ভরিয়া উপভোগ করিতে করিতে ব্যথাতুর ভগ্নহৃদয় গোকুলচন্দ্র সঞ্জীবিত প্রাণবন্ত হইয়া উঠিলেন। আর

---

*তদবধি শ্রীশ্রীঠাকুর গোকুলচন্দ্রকে চিরদিনই "ডাক্তার বাবা" বলিয়া সম্বোধন করিতেন। ইহাদের গুরু-শিষ্যের পরস্পরের স্নেহ-ভালবাসা ও শ্রদ্ধা-ভক্তির মধুময় স্মৃতি কোনদিন ভুলিতে পারিব না। গোকুলচন্দ্রের মত ধন্বন্তরী চিকিৎসক যেমন বিরল, তাঁহার মত ভক্তিমান সেবকও দুর্লভ। কতদিনের কত ঘটনায় তাঁহার সুগভীর ইষ্টানুরাগের জ্বলন্ত পরিচয় সকলকে বিস্মিত ও বিমুগ্ধ করিয়াছে, তাহা বলিবার নয়। আমরা তাঁহাকে অন্তরের অশেষ শ্রদ্ধা নিবেদন করি।

এই অবস্থায় শ্রীশ্রীঠাকুরকে হৃদয়-দেবতা প্রাণের প্রভু জ্ঞানে তাঁহার শ্রীচরণে আত্মসমর্পণ পূর্বক ধন্য হইলেন—কৃতার্থ হইলেন।

প্রিয়পরমের পূণ্য সান্নিধ্যে সে-বার চার-পাঁচদিন পরমানন্দে অতিবাহিত করিয়া গোকুলচন্দ্র অবশেষে তাঁহারই বিশেষ নির্দেশে গৃহে গমন করিলেন। যাত্রা-কালে তিনি শ্রীশ্রীঠাকুরকে দয়া করিয়া যথাসম্ভব সত্বর একবার কুষ্টিয়ায় শুভ পদার্পণ করিবার জন্য সনির্বন্ধ বিনীত প্রার্থনা নিবেদন করিয়া গেলেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের কুষ্টিয়া-লীলার সূত্রপাত এইখানে হইয়া রহিল।

বাড়াদিগ্রামে শ্রীশ্রীঠাকুরের দ্বিতীয়বার শুভাগমন ঘটে ১৩২২ বঙ্গাব্দের আশ্বিন মাসে। গোস্বামী সতীশচন্দ্র তখন খোকাডাক্তারের বাড়ীতে চলচ্ছক্তিহীন অবস্থায় দীর্ঘকাল যাবৎ শয্যাগত অসুস্থ ছিলেন। বহু অভিজ্ঞ চিকিৎসকের আপ্রাণ চেষ্টায়ও কোন সুফল না হওয়ায়, সকলে বিশেষ চিন্তিত হইয়া এ বিষয় শ্রীশ্রীঠাকুরের চরণে নিবেদন করেন। শ্রীশ্রীঠাকুর সংবাদ পাওয়া মাত্র কিশোরী-মোহন ও অনন্তনাথকে সঙ্গে লইয়া কীর্তনের দল সহ বাড়াদি যাত্রা করেন কুষ্টিয়া স্টীমার ঘাটে নামিয়া কিশোরীমোহন দল-বল সহ পদব্রজে কীর্তন করিতে করিতে বাড়াদি গ্রামে খোকাডাক্তারের বাড়ীতে গিয়া উপস্থিত হইলেন এবং শয্যাগত সতীশচন্দ্রের বক্ষের সম্মুখস্থ আঙ্গিনায় কীর্তন করিতে আরম্ভ করিলেন কিছুকাল মধ্যেই গাড়ী করিয়া শ্রীশ্রীঠাকুর ও অনন্তনাথ আসিয়া পৌঁছিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গেই কীর্তনে নামিয়া পড়িলেন। দেখিতে দেখিতে চতুষ্পার্শ্বের আরও বহু লোক আসিয়া কীর্তনে যোগ দিল। জয়ঢাক, শঙ্খ, ঘণ্টা, কাঁসর করতালাদির কর্ণবিদারী প্রচণ্ড ধ্বনির মধ্যে তুমুল বেগে কীর্তন চলিতে লাগিল এই অতি ভীষণ অবস্থায় মুমূর্ষু সতীশচন্দ্রের না জানি কখন কি হয় সেজন্য বাড়ীসুদ্ধ সকলে ভীত সন্ত্রস্ত হইয়া প্রমাদ গণিলেন।

কিন্তু কি আশ্চর্য! সকলে দেখিয়া বিস্মিত—স্তম্ভিত হইলেন যে, মৃতপ্রায় সতীশচন্দ্র হঠাৎ এক লাফে শয্যা হইতে উঠিয়া সবেগে ছুটিয়া উদ্দাম কীর্তনের বিপুল-তরঙ্গে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন এবং নিজেই অগ্রণী হইয়া অসংখ্য লোকের সেই বিরাট কীর্তন-দলটি বীরবিক্রমে পরিচালনা করিতে লাগিলেন। দীর্ঘ-সুদীর্ঘ সময় ধরিয়া চলিল সে তুমুল কীর্তন। সে দিনের সেই প্রচণ্ড কীর্তনের কথা অবর্ণনীয়। কীর্তনপ্রবাহের প্রবল তড়িদ্-আকর্ষণে সন্নিহিত বৃক্ষরাজির শাখাপল্লবাদি থর্-থর্ কম্পমান হইয়া পড়িয়াছিল, বাড়ীর গরু, বাছুর, ছাগল গুলি ছুটিয়া আসিয়া কীর্তনের সঙ্গে তালে তালে নৃত্য করিতে আরম্ভ করিল।

এদিকে কীর্তন সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর সদ্য পুনরুজ্জীবিত সতীশ চন্দ্রকে হাত ধরিয়া সঙ্গে লইয়া নানা কথা বলিতে বলিতে খোকা ডাক্তারের প্রকাণ্ড বসতবাটিখানা সমগ্র একবার প্রদক্ষিণপূর্বক পরিভ্রমণ করিয়া আসিলেন সেদিন উপস্থিত জনমণ্ডলী এই সমুদয় অলৌকিক ব্যাপার স্বচক্ষে দেখিয়া হতভম্ব হইয়াছিল।

বাড়াদি গ্রামে শ্রীশ্রীঠাকুরের শুভ পদার্পণের কিঞ্চিৎ বিবরণ ইতঃপূর্বে এই গ্রন্থের দ্বাদশ অধ্যায়ে ইষ্টভ্রাতা শ্রীহরিপদ সাহার কথিত বিবৃতিতে লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে।

কুষ্টিয়ায়

শ্রীশ্রীঠাকুরচরণে সৎমন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণের পর হইতে গোকুলচন্দ্র অহর্নিশ অনুক্ষণ অনন্যচিত্ত হইয়া নামধ্যানে নিরত থাকেন, একটু সুযোগ পাইলেই হিমাইতপুর আশ্রমে গিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের অমিয় সঙ্গসুখ উপভোগ আনন্দে ভরপুর হইয়া আসেন। যতই দিন যাইতে লাগিল, শ্রীগুরুর কৃপায় অধ্যাত্ম-রাজ্যের নানা দিব্য অনুভূতি লাভে তিনি প্রাণে অভূতপূর্ব শান্তি লাভ করিতে লাগিলেন। এই সময় কিছুকাল নিরন্তর তাঁহার মনে শুধু এই চিন্তাই চলিয়াছিল যে, সংসারী লোক শোকেতাপে দুঃখেকষ্টে সারা জীবন কত জ্বালা যন্ত্রণাই না ভোগে, ইহাদের জীবনেও যদি পরম প্রেমময় শ্রীশ্রীঠাকুরের অমিয় পরশের সৌভাগ্যলাভ ঘটিত, তবে ইহারাও তো তাঁহারই মত অসীম শান্তির অধিকারী হইতে পারিত। শ্রীশ্রীঠাকুরকে যদি একবার কুষ্টিয়ায় আনা যায়, তবেই তো তা সম্ভব হইতে পারে। এই অবস্থায় পরদুঃখমোচনে অতীব ব্যাকুলমনা হইয়া গোকুলচন্দ্র অবিলম্বে হিমাইতপুর আশ্রমে গমন করিলেন এবং শ্রীশ্রীঠাকুরকে দয়া করিয়া সত্বর একবার কুষ্টিয়ায় শুভপদার্পণ করিবার জন্যে এমনভাবে ধরিয়া বসিলেন যে, তিনিও কিছুতেই তাঁহার প্রার্থনা পূরণে সম্মত না হইয়া পারিলেন না।

১৩২১।১৩২২ বঙ্গাব্দের কথা। শ্রীশ্রীঠাকুর ভক্তবৃন্দসহ সেবারই সর্বপ্রথম কুষ্টিয়ায় শুভাগমন করেন। স্থানীয় বারের প্রবীণ উকীল ৺হরিশচন্দ্র রায়ের আমলাপাড়ার বাসায় তাঁহার বাসস্থান নির্দিষ্ট হইল। হিমাইতপুরের ঠাকুর অনুকূলচন্দ্র কুষ্টিয়ায় আসিয়াছেন, এই সংবাদ স্বল্প সময়ের মধ্যেই লোকমুখে সারা সহরে ও চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। শ্রীশ্রীঠাকুরকে সাক্ষাৎভাবে দর্শন ও তাঁহার শ্রীমুখের বাণী শ্রবণে কৃতার্থ হওয়ার মানসে প্রতিদিন অসংখ্য নরনারী দলে দলে আসিয়া উপস্থিত হইতে লাগিল। হরিশচন্দ্রের গৃহে প্রত্যহ সারাদিন অবিশ্রান্ত আলোচনা এবং সন্ধ্যা হইতে গভীর রাত্রি পর্যন্ত অবিরাম তুমুল কীর্তন চলিতে লাগিল। সেই কীর্তনের সঙ্গে ৮।১০ খানা খোল, ১০।১২ জোড়া করতাল, বড় বড় জয়ঢাক, অসংখ্য শঙ্খ কাঁসর ও ঘণ্টার বিপুল বাদ্য হইত। কীর্তনকালে সর্বপ্রথম কিছু সময় পদকীর্তন ও পরে তারকব্রহ্মনাম গীত হইত। সহরের উকীল, মোক্তার, ডাক্তার, শিক্ষক, ব্যবসায়ী প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তি এবং জনসাধারণ সকলে সে কীর্তনে যোগ দিতেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর নিত্য কীর্তনে নামেন। তাঁহার নধর বপুর দিব্য দেহকান্তি ও অপরূপ নৃত্য দর্শনে সকলে মুগ্ধ হয়। কীর্তনে কোন কোন দিন তাঁহার

মহাভাব-সমাধি ঘটে। সে অভূতপূর্ব ব্যাপার দেখিয়া সকলে বিস্মিত হয় এবং সমাধি অবস্থায় উক্ত তাঁহার ভাববাণীর ঐশী প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়। নানা জনে নানা প্রশ্ন লইয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে উপস্থিত হয়, অমিয়মধুর ভাষণে তিনি তাহাদের সকল জটিল সমস্যার সহজ সমাধান দান করেন। কত জনে ব্যথিত মনের কপাট উন্মুক্ত করিয়া আপন মনের গোপন বেদনা তাঁহার চরণে ব্যক্ত করে, তিনি তাঁহার স্বভাবসুলভ স্নেহালিঙ্গনে, কৃপাকরুণ কটাক্ষে ও দরদভরা মধুর বচনে তাহাদের তাপিত প্রাণ শীতল করেন। এইভাবে তাঁহার অসাধারণ ব্যক্তিত্ব ও চারিত্র্যে মুগ্ধ ও আকৃষ্ট হইয়া কত জনে যে তাঁহার শ্রীচরণে আত্মসমর্পণ করিয়া ধন্য হইল তাহা বলিবার নয়। সে-যাত্রা দিনকয়েক কুষ্টিয়ায় অবস্থানের পর শ্রীশ্রীঠাকুর হিমাইতপুরে প্রত্যাবর্তন করেন।

কুষ্টিয়া হিমাইতপুর হইতে স্টীমার যোগে মাত্র দুই ঘণ্টার পথ। সত্যনাম প্রচারের জন্য শ্রীশ্রীঠাকুর তৎকালে প্রায়শঃই কুষ্টিয়ায় যাতায়াত করিতেন। কুষ্টিয়ায় আসিয়া তিনি সাধারণতঃ কখনো উকীল প্রফুল্ল রায়ের, কখনো মোক্তার অশ্বিনীকুমার বিশ্বাসের বাড়ীতে অবস্থান করিতেন। কুষ্টিয়ায় আসিয়া তিনি একাদিক্রমে কোন বার দশ দিন, কোন বার পনর দিন, কখনো কখনো বিশ পঁচিশ দিনও থাকিয়া যাইতেন। যে কিছু কাল তিনি কুষ্টিয়ায় কাটাইতেন, সারাটা সহর রাত্রিদিন জয়ঢক্কা-শঙ্খ-ঘণ্টা-কাঁসর-করতালাদির গুরুগম্ভীর নাদ ও শত শত কণ্ঠের "পতিত-পাবন নাম রাধা-রাধা-রাধা বোল"-এর উচ্চধ্বনিতে মুখরিত থাকিত। অলিতে গলিতে, পথে ঘাটে, হাটে বাজারে, কোর্টে কাছারীতে, অন্দরে বাহিরে সর্বত্র সর্বসময় সকলে শ্রীশ্রীঠাকুরের মধুর কীর্তন, মধুর নর্তন, মধুর আলাপন ও মধুর আলিঙ্গনের কত কথা পরস্পরে বলাবলি করিয়া আনন্দোচ্ছল থাকিত।

কুষ্টিয়ায় অবস্থানকালে শ্রীশ্রীঠাকুর সময় সময় কীর্তনের দল লইয়া নগর পরিক্রমায় বাহির হইতেন। তখন সারা সহরে কীর্তনবন্যার এক বিপুল প্রবাহ ছুটিত। সেই অপূর্ব দৃশ্য স্বচক্ষে দেখিয়া নয়নমন সার্থক করিবার জন্য রাস্তার দুই ধারে কাতারে কাতারে লোক সমাগম হইত এবং জনতার মধ্য হইতে শত শত লোক কীর্তন-তরঙ্গে ঝাঁপাইয়া পড়িত। সেই প্রচণ্ড কীর্তনের ঘনরোলে চতুর্দিক প্রকম্পিত হইত। নগরবাসী আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলের হৃদয়তন্ত্রী এক অনির্বচনীয় আনন্দ শিহরণে ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিত। ইতরপ্রাণী এমন কি পথিপার্শ্বস্থ বৃক্ষাদি পর্যন্ত সেই অপূর্ব নাম-স্পন্দনে অত্যদ্ভুতভাবে সাড়া দিত। সেই অত্যাশ্চর্য -কীর্তনলীলা প্রত্যক্ষ করতঃ ধন্য হওয়ার আকুল আগ্রহে অন্তঃপুর-বাসিনী ললনাকুল আপন আপন গৃহকর্ম ফেলিয়া বাহিরে ছুটিয়া আসিতেন এবং কীর্তনের অপেক্ষায় ঘন্টার পর ঘন্টা প্রকাশ্য দিবালোকে রাজপথে দণ্ডায়মান থাকিতেন। অসংখ্য বাদ্যভাণ্ড সহ অগণিত লোকের সেই বিপুল কীর্তন-সমারোহের মধ্যমণি নৃত্যরত ভাববিহ্বল শ্রীশ্রীঠাকুরের ভুবন

ভুলানো অপরূপ দিব্যমূর্তি দর্শনে পুরনারীগণ অন্তরের উচ্ছ্বসিত আবেগে কাঁদিয়া আকুল হইতেন এবং নিজ নিজ অঙ্গের বহুমূল্য স্বর্ণালঙ্কার তাঁহার রাতুলচরণে অর্ঘ্য নিবেদন করিয়া কৃতার্থ হইতেন।

কুষ্টিয়া সহরে শ্রীশ্রীঠাকুরের অনির্বচনীয় কীর্তন লীলার এই মহা সমারোহের কথা দিনে দিনে লোকমুখে চতুষ্পার্শ্ববর্তী স্থানসমূহে এমন ব্যাপকভাবে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল যে, শ্রীশ্রীঠাকুর কুষ্টিয়ায় আগমন করিয়াছেন, সংবাদ পাওয়া মাত্র নিকটবর্তী বহু গ্রামাঞ্চল হইতে দলে দলে নরনারী তাঁহার দর্শন ও সঙ্গলাভের আকাঙ্ক্ষায় কুষ্টিয়ায় ছুটিয়া আসিত। শ্রীশ্রীঠাকুরও তাহাদের পাইয়া আনন্দে আত্মহারা হইতেন এবং সমাগত সকলকে লইয়া সদালোচনা ও কীর্তনে মত্ত থাকিয়া মহানন্দে দিন কাটাইতেন।

যতই দিন যাইতে লাগিল, শ্রীশ্রীঠাকুরের আর পূর্বের মত প্রায়শঃই কুষ্টিয়ায় আগমন সম্ভব হইয়া উঠিত না। সময় সময় শ্রীশ্রীঠাকুরের জননীদেবী তথায় শুভাগমন করতঃ অশ্বিনীকুমার বিশ্বাসের বাড়ীতে অবস্থান করিতেন। শ্রীশ্রীমার সঙ্গে ভক্ত কিশোরীমোহনও কীর্তনের দল লইয়া আসিতেন। শ্রীশ্রীমা যতদিন কুষ্টিয়ায় থাকিতেন স্থানীয় ভক্তগণ কীর্তনের দল লইয়া নগর পরিক্রমায় বাহির হইতেন। কিশোরীমোহন পুণ্যপুঁথি হাতে লইয়া হুংকার দিয়া লাফাইতে লাফাইতে দলের পুরোভাগে চলিতেন এবং ভক্তগণ উদ্দন্ড নৃত্যসহ কীর্তন করিতে করিতে তাঁহার অনুসরণ করিতেন। বহু লোকের সেই তুমুল কীর্তনে চতুর্দিক মুখরিত হইয়া উঠিত। পথে পথে অসংখ্য লোকের ভিড় জমিয়া যাইত। ভক্তগণ প্রত্যহ কীর্তনের দল লইয়া অশ্বিনীকুমার বিশ্বাসের বাড়ী হইতে বাহির হইয়া গোপীনাথ বাড়ী, বাজার, বারোয়ারী তলা, মোহিনী মিল, কোর্ট, লোহার কারখানা প্রভৃতি স্থান হইয়া দুই মাইলেরও অধিক পথ পরিভ্রমণ করিয়া বেলা দ্বিপ্রহর অন্তে গৃহে ফিরিতেন।

শ্রীশ্রীঠাকুরের কুষ্টিয়ায় অবস্থান কালে তাঁহার কৃপায় কতজন নাম-সাধনায় দিব্য অধ্যাত্ম সম্পদ লাভে ধন্য হইয়াছেন, জীবন-সমস্যার সমাধান পাইয়া কত লোক কৃতার্থ হইয়াছেন, তাঁহার প্রেম-প্রীতি ও আদর-সোহাগের অমৃত পরশে কত অবসাদগ্রস্ত সঞ্জীবিত হইয়াছেন, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। শ্রীশ্রীঠাকুরের সে সমুদয় অপূর্ব জীবনীয় লীলা-কাহিনী লিপিবদ্ধ করিলে একখানা প্রকাণ্ড পুস্তক হইয়া পড়িবে। স্থানাভাববশতঃ আমরা এখানে শুধু ভক্তগণের সহিত তাঁহার দৈনন্দিন জীবনের একটু সংক্ষিপ্ত পরিচয় উপস্থিত করিতেছি।

একদিনের ঘটনা। সেবার শ্রীশ্রীঠাকুর অশ্বিনীকুমার বিশ্বাসের বাসায়। একদিন শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীচরণ দর্শন করিতে কৃষ্ণলাল রায় চৌধুরী বাড়াদি হইতে কুষ্টিয়ায় আসিয়াছেন। কৃষ্ণলাল কুষ্টিয়া বাজারে একটি বড় কাপড়ের দোকানের মালিক। সেদিন তিনি বাড়ী থাকিতেই মনে মনে স্থির করিয়া আসিয়াছিলেন,

যাত্রাপথে পূর্বেই শ্রীশ্রীঠাকুর দর্শন করিবেন এবং পরে সেখান হইতে দোকান খুলিতে বাজারে যাইবেন।

কৃষ্ণলাল শ্রীশ্রীঠাকুরের পরম ভক্ত। শ্রীশ্রীঠাকুর তাহাকে খুবই স্নেহ করেন এবং আদর করিয়া কেষ্টা পাগলা বলিয়া ডাকেন। সেদিন কৃষ্ণলাল উপস্থিত হইলে শ্রীশ্রীঠাকুরের কি আনন্দ! কৃষ্ণলাল প্রণাম সারিয়া উঠিতে না উঠিতেই তিনি তাহাকে হাত ধরিয়া নিজের বিছানার উপর বসাইলেন এবং তাহার কোলে মাথা রাখিয়া শুইয়া পড়িলেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের এরূপ অহেতুকী কৃপা লাভে কৃতার্থ কৃষ্ণলাল সেদিন দোকানে যাওয়ার সংকল্প ত্যাগ করতঃ আনন্দ বিভোর হইয়া তাঁহার অমিয় সঙ্গ ও স্পর্শসুখ প্রাণ ভরিয়া উপভোগ করিতে লাগিলেন।

কিছুক্ষণের মধ্যে ভক্তগণ একে একে অনেকেই আসিয়া উপস্থিত হইলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর তাহাদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনায় মসগুল হইয়া পড়িলেন। অনেকক্ষণ পরে তিনি উঠিয়া বসিলেন এবং কৃষ্ণলালকে তামাক সাজিতে আদেশ করিলেন। কৃষ্ণলাল তামাক সাজিয়া আনিলে শ্রীশ্রীঠাকুর তামাকু সেবন করিতে করিতে সকলের সঙ্গে তত্ত্বালোচনায় মত্ত হইয়া পড়িলেন। কথাবার্তার মধ্যে তিনি হঠাৎ একবার বলিয়া উঠিলেন,—"হ্যাঁরে কেষ্টা! আজ তুই দোকান খুলবি না?" কৃষ্ণলাল সবিনয়ে উত্তর করিলেন,—"দোকান আজ আর কোথায় খোলা হলো! চাবি তো রয়েছে আমার সঙ্গে।" তাহাকে শ্রীশ্রীঠাকুর বলিলেন, —"তবে থাক্, এ বেলা আর খুলে কাজ নেই। স্নানাহারের সময় হয়ে এলো, খাওয়া দাওয়া সেরে ও-বেলা গিয়ে বরং খুলিস।" এই বলিয়াই শ্রীশ্রীঠাকুর উঠিয়া পড়িলেন এবং কিশোরীমোহন, অশ্বিনীকুমার ও অনন্তনাথকে স্নানের জন্য তৈল আনিতে বারবার ডাকিতে লাগিলেন। তাঁহারা তৈল লইয়া উপস্থিত হইলে, শ্রীশ্রীঠাকুর বলিলেন,—"তোরা তিনজনে বেশ আচ্ছা করে কেষ্টার গায় তেল মাখিয়ে দে তো।" শ্রীশ্রীঠাকুরের নির্দেশে তাহারা কৃষ্ণলালের সর্বাঙ্গে উত্তমরূপে তৈল মর্দন করিতে লাগিলেন। কৃষ্ণলাল আর কি করেন, শ্রীশ্রীঠাকুরের এরূপ অদ্ভুত কাণ্ডে তিনি হতভম্ব হইয়া স্থিরভাবে বসিয়া রহিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর এইবার ভক্তবৃন্দ পরিবৃত হইয়া নদীতে স্নান করিতে চলিলেন। এই সময় পল্লীর অন্যান্য ভক্তেরাও শ্রীশ্রীঠাকুরের সঙ্গে স্নান করিবার অপার আগ্রহ ও উৎসাহ ভরে স্নানের ঘাটে আসিয়া সমবেত হইলেন। এইবার সকলে জলক্রীড়ার আনন্দোৎসবে মাতিয়া উঠিলেন। অশ্বিনীকুমার ডুব সাঁতার দিয়া সতীশচন্দ্রের পা জড়াইয়া ধরিতেছেন, সতীশচন্দ্র অশ্বিনীকুমারের গলা জড়াইয়া ধরিতেছেন, কিশোরীমোহন কৃষ্ণলালের গলা জড়াইয়া ধরিতেছেন, কৃষ্ণলাল কিশোরীমোহনের পা জড়াইয়া ধরিতেছেন। শ্রীশ্রীঠাকুর সাঁতার কাটিয়া প্রত্যেকের কাছে যাইয়া তাহাদের সঙ্গে কোলাকুলি করিতেছেন আর মাঝে মাঝে অঞ্জলি ভরিয়া জল লইয়া তাহাদের সকলের গায় ছিটাইয়া দিয়া আমোদ করিতেছেন। ক্রীড়া কৌতুকের সে কি উদ্দাম উন্মাদনা।

সেদিন শৈলকুপা থেকে ভক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র মজুমদার কুষ্টিয়ায় আসিয়াছেন শ্রীশ্রীঠাকুর দর্শনে। অশ্বিনীকুমারের বাসায় উঠিয়া তিনি শুনিতে পাইলেন, শ্রীশ্রীঠাকুর সদলবলে নদীতে স্নান করিতে গিয়াছেন। তৎক্ষণাৎ তিনি দৌড়াইয়া স্নানের ঘাটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ভক্তগণের সহিত শ্রীশ্রীঠাকুরের অপূর্ব জলক্রীড়ার সেই মধুর লীলারঙ্গ সন্দর্শনে আনন্দবিহ্বল অবস্থায় তিনি নদীতীরে দাঁড়াইয়া আছেন, এমন সময় ক্রীড়ারত ভক্তগণ তাঁহাকে দেখিবামাত্র ছুটিয়া গিয়া ক্ষিতীশচন্দ্রকে জামাজুতো সুদ্ধ জলের মধ্যে টানিয়া নামাইলেন। এবার সকলে আরও ভীষণভাবে ক্রীড়ারঙ্গে মাতিয়া উঠিলেন। সে কি অনির্বচনীয় আনন্দ-উল্লাস। দীর্ঘ সময় ধরিয়া চলিল সে মহাসমারোহ। অবশেষে সকলে স্নান-সমাপনান্তে শ্রীশ্রীঠাকুরকে পুরোভাগে লইয়া কীর্তন করিতে করিতে গৃহে ফিরিলেন।

আহারান্তে বিশ্রামাদির পর ভক্তগণ সবাই আবার একে একে শ্রীশ্রীঠাকুরসমীপে আসিয়া সমবেত হইয়াছেন। নানা প্রসঙ্গে গভীর আলোচনা চলিতে লাগিল। কথাবর্তায় সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিল। নিত্যদিনের মত যথারীতি কীর্তন আরম্ভ হইয়া গেল। তুমুল বেগে কীর্তন চলিতে চলিতে রাত্রি যখন দশটা বাজিয়া গিয়াছে, শ্রীশ্রীঠাকুর কৃষ্ণলালকে হঠাৎ ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কিরে কেষ্টা, দোকান খুলবি না? যা, একবার খোল গিয়ে। সারাটা দিন তো আজ আর দোকানে গেলিই না!" কৃষ্ণলাল নম্রকণ্ঠে কহিলেন,—"আবার এত রাত্রে দোকান খুলতে যাব?" শ্রীশ্রীঠাকুর তখন বারবারই জোর দিয়া বলিতে লাগিলেন,—"যা না, যেতে দোষ কি?" শ্রীশ্রীঠাকুরের পুনঃপুনঃ পীড়াপীড়িতে কৃষ্ণলাল আর না গিয়া পারিলেন না। দোকানে যাইয়া তিনি দেখিলেন, মফঃস্বলের বহু পুরাতন বড় বড় খরিদ্দার তাঁহার অপেক্ষায় বসিয়া আছে। কৃষ্ণলালকে দেখিয়াই সকলে সমস্বরে বলিয়া উঠিলেন,—"আমরা সবাই এসেছি পুজোর বাজার করতে। আজই আমাদের সব মাল নিয়ে রওনা হতে হবে। শিগ্‌গির আমাদের বিদেয় করুন।" কৃষ্ণলাল তাঁহাদের লইয়া ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। সেদিন কৃষ্ণলালের একসঙ্গে নগদ প্রায় দশ হাজার টাকার মাল বিক্রয় হইল।

কুষ্টিয়ায় অবস্থানকালীন শ্রীশ্রীঠাকুরের লীলাকাহিনীর কিঞ্চিৎ বিবরণী কুষ্টিয়া নিবাসী প্রত্যক্ষদর্শীভক্ত শ্রীগোপালচন্দ্র কর্মকার মহাশয়ের মুখে যাহা শুনিয়াছি, এই প্রসঙ্গে তাহা নিম্নে বিবৃত করিতেছি। তিনি বলিয়াছেন,—

"কুষ্টিয়ায় আমার তখন একটি কাপড়ের দোকান ছিল। একদিন দোকানে বসিয়া আছি, শুনিলাম, আমলাপাড়ায় অশ্বিনী বিশ্বাস মোক্তারের বাসায় এক সাধু আসিয়াছেন। মনে হইল, একবার দেখিয়া আসি। আমি, বসন্ত রায়-চৌধুরী, বিধু প্রামাণিক এবং আরও জনকয়েক সকাল ৯টা/৯টা ৩০মিঃ সময় সেদিন সেখানে যাইয়া দেখিলাম,—ঘরের বাহিরে বহু লোক রহিয়াছে এবং ভিতরে নানা কথাবার্তা হইতেছে, কোন গোলমাল নাই। ঘরের মধ্যে চৌকির উপর

২২।২৪ বৎসরের একটি সুন্দর চেহারার যুবক বসিয়া আছেন। মেজেতে তাঁহার বাম দিকে মহিলারা এবং ডান দিকে পুরুষরা বসিয়া তাঁহার দিকে একদৃষ্টে তাকাইয়া থাকিয়া তাঁহার কথাবার্তা শুনিতেছেন। উঁহাকে দেখিয়া মনে মনে ভাবিলাম,—উনি আবার সাধু! আমার চিরাভ্যস্ত ধারণা, সাধু হইলে তো গেরুয়াপরা ও জটাজুটধারী হইতে হইবে। আমার সঙ্গীদের মনোভাবও ঐরূপই ছিল। সে দিনের মত আমরা সবাই বাড়ী ফিরিয়া আসিলাম।"

"আর এক দিন শুনিতে পাইলাম, কীর্তনে ঐ সাধুর ভর হয় এবং তখন সংজ্ঞাহীন অবস্থায় তিনি নানা কথাবার্তা বলেন। সেদিন আরও অধিকসংখ্যক সঙ্গীদের লইয়া আবার তাঁহাকে দেখিতে গেলাম। সেখানে যাইয়া ভক্তদের কাছে শুনিতে পাইলাম যে, সাধুকে সঠিক জানিতে হইলে তাঁহার নাম (মন্ত্র) নিতে হয়। আমরাও ভাবিলাম,—সে তো সত্যিই, একজন মহাপুরুষকে বুঝিতে হইলে তাঁহার দীক্ষা নেওয়াই তো দরকার। অতঃপর একদিন সাধুবাবার জনৈক ভক্ত সতীশচন্দ্র গোস্বামীর নিকট আমি, বিধু প্রামাণিক, গিরীন্দ্র বিশ্বাস, বসন্ত রায়চৌধুরী প্রভৃতি মন্ত্র গ্রহণ করি। আমাদিগকে নাম জপ ও ঠাকুর পাগল হরনাথের মূর্তি ধ্যান করিতে বলিয়া দেওয়া হইল। আমরা বসন্ত রায়চৌধুরীর দোকানের ছাদের উপর সাত-আটজনে একসঙ্গে গোল হইয়া বসিয়া, মাঝখানে শ্রীশ্রীহরনাথ ঠাকুরের ফটো রাখিয়া, প্রত্যহ সন্ধ্যার পর নাম-ধ্যান করিতে আরম্ভ করিলাম। আমাদের নাম নেওয়ার পরদিন আরোয়াপাড়ার ফকির সাধু সেখের পুত্র, স্থানীয় মাইনর স্কুলের শিক্ষক গওহর আলি সতীশচন্দ্র গোস্বামীর নিকট মন্ত্র গ্রহণ করে। মন্ত্র নেওয়ার পর তাহার এত আনন্দ হইয়াছিল যে, সে লাফাইতে লাফাইতে বাড়ী যাইয়া পিতার কাছে আপন ভাবাবেগের কত কথা বলিল। তাহার পিতা ছিলেন সাধুপ্রকৃতির লোক। ছেলের অবস্থা দেখিয়া তিনিও যাইয়া সতীশচন্দ্র গোস্বামীর নিকট নাম-দীক্ষা গ্রহণ করিলেন।"

"একদিনের কথা। শ্রীশ্রীঠাকুর কুষ্টিয়ায় আসিয়া ডাক্তার সতীশচন্দ্র জোয়ারদারের বাড়ীতে আছেন। সন্ধ্যার পর কীর্তন আরম্ভ হইয়াছে। সতীশচন্দ্রের বাড়ীর পাশে পূর্বদিকে যে আমবাগান ছিল, সেখানে তুমুল বেগে কীর্তন হইতেছে। রাত্রি ৯টা-১০টার সময় শ্রীশ্রীঠাকুর আসিয়া কীর্তনে নামিলেন। প্রায় দুই ঘন্টাকাল তুমুল কীর্তনের পর শ্রীশ্রীঠাকুর ভাবাবস্থায় সংজ্ঞাহারা হইয়া ভাটিবনের মধ্যে পড়িয়া গেলেন। তখন আমি তাঁহার ডান পা, বিধুভূষণ বাম পা কাঁধে করিয়া এবং অপর সকলে তাঁহার দেহখানি ধরাধরি করিয়া লইয়া সতীশচন্দ্রের বাড়ীতে আনিয়া বারান্দায় মাদুরের উপর শোয়াইয়া দিলাম। শ্রীশ্রীঠাকুর তখন তাঁহার মাথাখানা এপাশ ওপাশ করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে তাঁহার শ্রীমুখ হইতে বাণী বাহির হইতে লাগিল। ডাক্তার গোকুল মণ্ডল, ডাক্তার সতীশ জোয়ারদার, মোক্তার বীরেন্দ্রনাথ রায় প্রভৃতি অনেকেই সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ বাণীগুলি লিখিতে লাগিলেন।

অনেকক্ষণ পরে সমাধিভঙ্গ হইলে, শ্রীশ্রীঠাকুর জলপান করিয়া সুস্থ হইলেন এবং উঠিয়া বসিলেন। অধিক রাত্রিতে ঠাকুরভোগ হইলে পর আমরা সবাই প্রসাদ পাইয়া বাড়ী ফিরিলাম।"

"আর একদিন শুনিলাম, শ্রীশ্রীঠাকুর হিমাইতপুর হইতে আসিয়া গোড়াই নদীর ধারে আমলাপাড়ায় প্রফুল্ল রায়ের বাড়ীতে আছেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের সঙ্গে কিশোরীমোহন, অনন্ত মহারাজ, নফর ঘোষ, তরণী বুনে, কোকন বুনে প্রভৃতি কীর্তনদলের ভক্তরাও আছেন। সকালে ৮টা-৮।৩০ মিনিটের সময় সেখানে গিয়া দেখিলাম, বহু লোকের সঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর কথাবার্তা বলিতেছেন। বেলা প্রায় ১১টা পর্যন্ত আলাপ আলোচনা চলিল। সকলেই নিজ নিজ প্রশ্নের যথাযথ উত্তর পাইয়া খুশী মনে বাড়ী ফিরিলেন। বহিরাগত সকলে চলিয়া গেলে শ্রীশ্রীঠাকুর ভক্তবৃন্দসহ নদীতে স্নানে চলিয়া গেলেন। সকলকে লইয়া শ্রীশ্রীঠাকুর অনেকক্ষণ ধরিয়া আনন্দের সঙ্গে জল ছিটাছিটি, সাঁতরানো ইত্যাদি জলক্রীড়া করিলেন। স্নানের পর বাড়ী ফিরিলে ঠাকুরভোগ হইল।"

"ঐ দিন বিকালে ৪টার পর হইতে আবার লোকসমাগম হইতে লাগিল। ইহাদের সঙ্গে বহুক্ষণ নানা বিষয়ে প্রশ্নোত্তর চলিল। সন্ধ্যার পর কিশোরী-মোহন, নফর ঘোষ, তরণী বুনে, কোকন বুনে ও অন্যান্য স্থানীয় ভক্তগণ বাহিরে সামিয়ানার নীচে কীর্তন আরম্ভ করিলেন। তুমুল বেগে কীর্তন চলিতে লাগিল। ঢাকের গুরু গম্ভীর নাদে কানে তালা লাগিয়া যাওয়ার মত হইল। কীর্তন যখন খুব জোরে চলিতেছে, শ্রীশ্রীঠাকুর আসিয়া কীর্তনে নামিলেন। তাঁহার উপস্থিতিতে কীর্তনের বেগ আরও জোরালো হইয়া উঠিল। রাত্রি ১টা পর্যন্ত তুমুল বেগে কীর্তন চলিবার পর শ্রীশ্রীঠাকুর সমাধিস্থ হইয়া পড়িলেন। তাঁহাকে ধরাধরি করিয়া মাটির উপর শোয়াইয়া দেওয়া হইল। এই সময় তাঁহার দুই পায়ের বুড়া আঙ্গুল দুইটি অতিদ্রুত কাঁপিতে লাগিল। তিনি মাথা এপাশ ওপাশ করিতে লাগিলেন। এই অবস্থায় বাণীও বাহির হইতে লাগিল। অনন্তনাথ ও বীরেন্দ্রনাথ তাহা লিখিতে লাগিলেন। সমাধিভঙ্গের পর শ্রীশ্রীঠাকুর জল পান করিয়া সুস্থ হইলেন।"

"অন্য এক দিনের কথা। শ্রীশ্রীঠাকুর কুষ্টিয়ায় আসিয়া প্রফুল্ল রায় উকীলের বাসায় আছেন। সংবাদ পাইবামাত্র ভক্তগণ সকলেই নিজ নিজ কাজকর্ম ফেলিয়া তাঁহার শ্রীচরণ দর্শনের জন্য ছুটিয়া আসিয়াছেন। সকাল বেলা সমাগত সকলের সঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুরের দীর্ঘ সময় ধরিয়া আলাপ-আলোচনা চলিতে লাগিল। সেদিন বহুলোকের ভিড় হইয়াছিল। এত অসংখ্য লোকের সঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর অনর্গল কথা বলিতেছেন, তাঁহার এতটুকু ক্লান্তি বা বিরক্তির ভাব নাই। কথাবার্তা বলিতে বলিতে স্নানের সময় হইল। ডাক্তার সতীশচন্দ্র জোয়ারদার তখন বলিলেন,—'ঠাকুর, আমি তবে এখন বাড়ী যাই।' তাহাতে শ্রীশ্রীঠাকুর কহিলেন,—'এখন যাবেন কি? স্নানটান করুন, খাওয়াদাওয়া সেরে তবে তো যাবেন।'

সতীশচন্দ্র বলিলেন,—'বাসায় কিছু জরুরী কাজ আছে। তাই যেতে চাইছি।' এই সময় শ্রীশ্রীঠাকুরের স্নানের জন্য তৈল আসিয়া গিয়াছে। তিনি তাড়াতাড়ি আসন হইতে উঠিয়া আসিয়া খানিকটা তৈল লইয়া সতীশচন্দ্রের মাথায় মাখাইয়া দিলেন। তার পর তাহার গায়ের জামা খুলিয়া ফেলিয়া তাহার সর্বাঙ্গে বেশ করিয়া তৈল মাখাইলেন। সতীশচন্দ্র বার বার বাধা দিয়া বলিলেন,—'করেন কি! করেন কি!' শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁহার কোন কথাই শুনিলেন না। উপস্থিত সকলেই তখন গায়ে তৈল মাখিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরকে লইয়া স্নানে চলিলেন। সকলে বহুক্ষণ নদীজলে ক্রীড়াকৌতুকের সঙ্গে স্নান সমাপন করিয়া প্রত্যাবর্তন করিলেন। ঠাকুর ভোগের পর প্রসাদ পাইয়া সকলে বাড়ী ফিরিলেন।"

"কুষ্টিয়ায় আসিয়া শ্রীশ্রীঠাকুর সাধারণত প্রফুল্ল রায় উকীলের কিংবা অশ্বিনী বিশ্বাস মোক্তারের বাসায় অবস্থান করিতেন। সেখান হইতে কোন দিন ডাক্তার গোকুল মণ্ডল, কোন দিন ডাক্তার সত্য দত্ত, কখনো ডাক্তার সতীশ জোয়ারদারের বাড়ী বা অন্যত্র যাইতেন। তিনি যেদিন যেখানেই যাইতেন সর্বত্রই পূর্ণ উদ্যমে কীর্তন ও সদালোচনা চলিত। তাঁহার শুভাগমনে প্রতিবারই এত অসংখ্য লোক সমাগত হইত যে মনে হইত যেন তাঁহার আবাস বাটীতে বাজার জমিয়া গিয়াছে, সদর রাস্তা পর্যন্ত সেই জনতার ভিড় থাকিত। শ্রীশ্রীঠাকুরের দরবারে উপস্থিত সকলে গভীর মনোযোগের সহিত তাঁহার প্রাণমাতানো আলোচনা শুনিতেন এবং প্রতিদিন যথাকালে কীর্তন আরম্ভ হইলে সকলে তাহাতে সানন্দে যোগদান করিতেন।"

"কুষ্টিয়া হইতে শ্রীশ্রীঠাকুর কীর্তনের দল লইয়া বাড়াদি গ্রামে খোকা ডাক্তারের বাড়ী, বারখাদায় পূর্ণ অধিকারীর বাড়ী, বরৈচারায় সতীশ জোয়ারদারের বাড়ী, শৈলকুপায় বঙ্কিম মজুমদারের বাড়ী, কমলাপুরের সুরেন্দ্র বিশ্বাসের বাড়ী প্রভৃতি নানা স্থানে গমন করিয়াছিলেন।"

বহুকাল পূর্বের কথা। সুপ্রসিদ্ধ 'প্রবর্তক' পত্রিকার সুযোগ্য সম্পাদক শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত রাধারমণ চৌধুরী মহাশয় কুষ্টিয়ায় শ্রীশ্রীঠাকুরের কীর্তনলীলা প্রসঙ্গে আলোচনা পত্রিকায় 'পুরোণোস্মৃতি' নামক একটি নাতিদীর্ঘ মনোজ্ঞ প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছিলেন। প্রসঙ্গানুরোধে আমরা নিম্নে তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিলাম ঃ—

"প্রায় বছর চল্লিশেক আগে। বর্তমান বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় শতকের প্রথমার্ধ।....

আমি কুষ্টিয়া হাইস্কুলের তখনকার চতুর্থ এবং এখনকার সপ্তম শ্রেণীর ছাত্র।

সেকাল আর একালের কুষ্টিয়ায় আকাশপাতাল তফাৎ। পদ্মা গরাইয়ের সঙ্গমের কূলকিনারা বিহীন অসীম বিস্তার জলরাশি। এপারে কুষ্টিয়া ওপারে পাবনা। মস্ত বড় ফেরী স্টীমারের পারাপার। সেদিনকার কিশোর চিত্তে এই

জল ও স্টীমার যে রোমাঞ্চ সৃষ্টি করেছিল আজকার দিনে সমুদ্র ও যুদ্ধজাহাজও তা করে না।

পাবনার প্রবেশপথ কুষ্টিয়া। অনুকূলচন্দ্রের লীলার নবদ্বীপ হচ্ছে হিমায়েতপুর আর শান্তিপুর হচ্ছে কুষ্টিয়া। মাঝে গঙ্গা আর পদ্মা। সেদিন ছিল ঠাকুরের কীর্তনযুগ। কীর্তন প্রস্রবণের উৎস ছিল হিমায়েতপুরে আর প্লাবন বয়েছিল কুষ্টিয়ায়। বস্তুতঃ একথা বললে বোধ হয় অত্যুক্তি হবে না যে, পাবনা ঠাকুরকে পাবার ও চেনার আগেই কুষ্টিয়া ঠাকুরকে চিনেছিল ও পেয়েছিল।

আমি থাকি স্কুল সংলগ্ন ছাত্রাবাসে। সম-সাময়িককালে কুষ্টিয়ার আশে-পাশে অনেকগুলি প্রভাব কুষ্টিয়াবাসীর বিশেষভাবে উদীয়মান তরুণ-চিত্তে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। বর্তমান শতাব্দীর প্রথম প্রভাতে স্বামী বিবেকানন্দ বিদেহী হন। দ্বিতীয় শতকে তরুণ চিত্তে তাঁর ধর্ম জাতীয়তাবোধ মূলক ভাব-মূর্তির ক্রম পদসঞ্চার সুস্পষ্ট হয়ে উঠতে সুরু করেছে। নীতি ও দেশাত্মবোধের ভিত্তিতে বরিশালের অশ্বিনী দত্তের অভ্যুত্থান। তাঁর 'ভক্তিযোগ' আর 'ব্রহ্মচর্য' শুধু তরুণদের চিত্ত গঠনে সাহায্য করেনি, পরন্তু তাঁর হাতে গড়া ভক্তশিষ্য যেখানেই গেছেন সেখানেই একটা বিশিষ্ট চারিত্রিক আদর্শের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। কুমারখালির কাঙাল হরিনাথের নাম ও গান ইতিমধ্যেই জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। তখন পাগলা কানাই আর লালন শাহীর বাউল গান লোকের মুখে মুখে। বরিশালের মুকুন্দ দাসের যাত্রা স্বাদেশিকতা ও সমাজ সংস্কারে বিপ্লব করেছিলো বলা চলে। অগ্নিযুগের দুঃসাহসিক বীর কুষ্টিয়ার সন্নিকটবর্তী কয়া গ্রামের যতীন মুখার্জির (বাঘা যতীন) কাহিনী তরুণদের প্রাণে এক নূতন রোমাঞ্চ জাগিয়েছে। শিলাইদহ ও কুষ্টিয়ার ঠাকুরবাড়ীর কাছারীতে রবীন্দ্রনাথের আনাগোনা ছাত্রমহলে কৌতুকের কারণ হয়েছে। সাহিত্যে কুমারখালীর জলধর সেন তখন উদয়ের দিগঙ্গনে মিট্ মিট্ করছেন। মেহেরপুরের সুরেন ভট্চাজ আর দীনেন রায়ের বইয়ের পরিচয় ছেলেরা ইতিমধ্যেই পেয়েছে। ধর্মক্ষেত্রে পাবনার ঠাকুর অনুকূলচন্দ্র আর ফরিদপুরের প্রভু জগদ্বন্ধু দুই দিকপালের মত কুষ্টিয়ার চিদাকাশ জুড়ে বসেছেন। জগদ্বন্ধু মধ্য গগন থেকে তখন অস্তাচলগামী। তাঁর চমকপ্রদ আবির্ভাব ও তিরোভাব দুইই অনেকটা আকস্মিক। অশেষ ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার অঙ্কুর বুকে ধরে ঠাকুর তখন বিকাশোন্মুখ। শত ঘৃত প্রদীপের স্নিগ্ধ আলোকচ্ছটায় তাঁহার পরিমণ্ডল অনুরাগরঞ্জিত। এক শুভলগ্নে কুষ্টিয়ার আঁধার আঙ্গিনায় তিনি বাজালেন মিলনের বিজয় শঙ্খ আর দেখালেন জীবনের রাজপথ। সেদিন এই বিচিত্র ভাব-গঙ্গার ভগীরথদের মধ্যে ঠাকুর ছিলেন কনিষ্ঠতম ত্রিশের কোঠায় যুবক মাত্র। কিন্তু এই নবীন মানুষটির অনুরাগ বিগলিত প্রেম-প্লাবন কুষ্টিয়ার ইতিহাসে ছিল অভূতপূর্ব। সেই বন্যায় ভেসে আসে সৎসঙ্গ, ঠাকুরকে কেন্দ্র করে হিমায়েতপুরে গড়ে ওঠে মধুচক্র।

ঠাকুরকে ঘিরে কুষ্টিয়ায় যে কীর্তনের প্রবাহ নেমেছে তা ইতিমধ্যেই ও-অঞ্চলের

বহুদূর পর্যন্ত মানুষের সবিস্ময় দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। ঠাকুরের ভাব বিভোরতা এমনি ছিল যে, তিনি বহুক্ষণ কীর্তনের আসরে থাকতে পারতেন না—বিবশ অঙ্গে দূরে আবেশহীন থাকবার চেষ্টা করতেন।

এক দিনের ঘটনা। স্কুলেই ঠাকুরের কীর্তনের সংবাদ পেলাম। ছুটি হতে না হতেই ছুটলাম। আমলাপাড়া—অনেকটা দূরে। পথে শ্যামাপদর সঙ্গে দেখা। বললে—হন্তদন্ত হয়ে কোথায় চলেছিস্? বললাম—ঠাকুরের কীর্তনে।

—এই মাটি করেছে, তোরও ঠাকুর-রোগে পেয়েছে দেখ্‌ছি। 'ঠাকুর' 'ঠাকুর' করে শহরটাই মেতে উঠেছে। শুনলাম গোকুল ডাক্তার মাথা মুড়িয়েছে। আর অশ্বিনী বিশ্বাস মোক্তারও মুড়ুবো মুড়ুবো করছে। তাজ্জব ব্যাপার!

শ্যামাপদ ওখানকার চেয়ারম্যান ও প্রখ্যাত উকীল তারাপদ মজুমদারের জ্যেষ্ঠ পুত্র এবং আমার সহপাঠী। বর্তমানে হাইকোর্টের প্রতিষ্ঠাবান এ্যাড্‌ভোকেট। ধীর শান্ত প্রকৃতির মানুষটি বিচার-বিবেচনা না করে কোন কাজ করে না। আমায় পুনশ্চ সতর্ক করলে, ফিরে যা, এখন ঠাকুর নিয়ে মাতামাতির বয়স নয়।

বিতর্কে বাক্য ব্যয় না করে চললাম। কিন্তু যখন পৌঁছালাম, দেখলাম কীর্তন ভেঙ্গে গেছে। ভিড়ও অনেকটা বিরল হয়ে এসেছে। তখনো অনতিদূরে ঠাকুর উপবিষ্ট। ঠিক উপবিষ্ট নন—ভূমিশয্যায় অর্ধশায়িত। সামনে পদদ্বয় সটান ছড়ানো আর পেছনে দুহাতে মাটিতে ভর। খালি গা! পরনে কোঁচানো কাপড়। বিগলিত তনু। ভাবের ঘোর ঠাকুরের তখনো কাটেনি। অর্ধনিমীলিত আঁখি ঊর্ধ্বে আকাশে নিবদ্ধ।

আমার কোন প্রশ্ন ছিল না। প্রশ্নের সে যুগও ঠাকুরের দেওয়া নেওয়া, পাওয়া-পায়ীর কড়া-ক্রান্তি হিসাবে স্থূলতার অবসর নেই। উচ্ছ্বসিত রস-প্রবাহে অভিষিক্ত হয়ে শুধু সমর্পণ ও গ্রহণ।

নির্বাক একটি পাশে আমি নিশ্চল দাঁড়িয়ে আছি। আকস্মিক কার সানুরাগ স্পর্শে চেয়ে দেখি সত্য দত্ত আহ্লাদে আটখানা হয়ে যেন ভেঙ্গে পড়লেন। শুধালেন 'কখন এসেছিস'।

বললাম, 'এই একটু আগে'!

আজকে ঠাকুরের অপূর্বতা অবর্ণনীয়: দত্ত মহাশয় উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন: একটা দিব্য ভাবোন্মাদনায় সবাই অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন!

সত্য দত্তের বাসার পথে আমরা চলেছি। আমলাপাড়ার গরাই নদীর কাছাকাছি তাঁর বাসা। সারাটা পথ দত্ত মহাশয় অবিরাম ঠাকুরের মহিমা কীর্তন করছেন। আমি ভাবছি, অদ্ভুত পরিবর্তন এই মানুষটির। কি ছিলেন আর কি হয়েছেন! ঠাকুরের অপরূপ মহিমা যেন রূপায়িত হয়ে উঠেছে সত্য দত্তের জীবনে। সত্য দত্ত যেন অনুকূলচন্দ্রের গিরিশ ঘোষ! ধ্যানে জ্ঞানে, শয়নে স্বপনে ঠাকুর তার মধ্যে অনাহত অধিকার বিস্তার করেছেন। সত্য দত্তের উজ্জ্বল

অনির্বাণ ইষ্টনিষ্ঠা শুধু নিন্দুকের মুখ বন্ধ করেনি, অনেককে পরিণামে জয়ও করেছেন। সেবাকেন্দ্রিক ইষ্টনিষ্ঠ সত্য দত্তের জীবনে আমরণ এই বিশ্বাস অম্লান থাকতে দেখেছি। পুরুষোত্তম বোধে ঠাকুরকে গ্রহণে তাঁর প্রত্যয় প্রবাহ কখনো কুণ্ঠিত হয়নি। ঠাকুরের মহিমার জন্য তিনি জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত দিয়ে গেছেন। আজিকার বিশাল সৎসঙ্গ সৌধের বনিয়াদ রচনায় সত্য দত্তের এই অনড় প্রত্যয় যে এক খণ্ড কঠিন প্রশস্ত শিলাস্তর বিছিয়ে গেছে, ইহা নিঃসন্দেহে বলা চলে। দিগ্বিজয়ী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের কাশীধামে বৈদান্তিক প্রকাশানন্দ সরস্বতীকে বিতর্কে পরাজয় করার যে পাণ্ডিত্যগরিমা, তার চেয়েও নদের নিমাইয়ের অধিকতর উন্নত উজ্জ্বল স্মরণীয় মহিমা জগাই মাধাই উদ্ধার। স্বল্পখ্যাত আর বিস্মৃত প্রায় সত্য দত্তের সাধারণ প্রাকৃত জীবনের অপ্রাকৃত দিব্য রূপান্তর সাধনে ঠাকুর অনুকুলচন্দ্রের যে ভাগবৎ মাহাত্ম্য তা শুধু যুগে যুগে ঠাকুরকে সম্পূজিত করে রাখবে না, আজকের সৎসঙ্গের অনেক বহিরঙ্গ প্রতিষ্ঠান সৃষ্টির চমৎকারিত্বকেও ছাপিয়ে গিয়ে অন্তর্মুখী নিয়ন্ত্রণের বিশেষ ধারাটিকে চিরদিন উজ্জ্বল করে রাখবে।

পথ চলতে চলতে হঠাৎ এক সময়ে উৎফুল্ল হয়ে সত্য দত্ত বললেন, আজ একটা আশ্চর্য ঘটনা ঘটেছে। কীর্তনের ভিড়ের মধ্যে একজন স্বগত চিন্তা করছিলেন যে, ঠাকুর যদি সত্যই অন্তর্যামী হন তবে তিনি তা চিরকালের জন্য বিশ্বাস করবেন—যদি ঠাকুর নিজে এসে তাঁর গলার মালাটা সেই ব্যক্তির গলায় পরিয়ে দেন। আশ্চর্য ! যে চিন্তা সেই কাজ। একটু পরেই হাসতে হাসতে ঠাকুর ভিড় ঠেলে এসে সহস্র লোকের মধ্যে ঠিক তাঁরই গলায় মালাটা পরিয়ে দিয়ে সস্নেহে পিঠে দু'টো চাপড় দিয়ে গেলেন।"

* * * *

শ্রীশ্রীঠাকুর এক একবার কুষ্টিয়ায় আসিয়া কিছুকাল অবস্থানের পর যখন হিমাইতপুর প্রত্যাবর্তন করিতেন, কুষ্টিয়া অঞ্চলের ভক্তগণ তাঁহাদের প্রিয়পরমের বিরহ বেদনায় কাতর হইয়া তাঁহার সঙ্গসুখ উপভোগের জন্য দলে দলে হিমাইতপুর গিয়া উপস্থিত হইতেন। শ্রীশ্রীঠাকুরও তাহাদের পাইয়া আনন্দে মাতিয়া উঠিতেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের সান্নিধ্যে কিছুকাল পরমানন্দে অতিবাহিত করিয়া সকলে আবার কুষ্টিয়ায় ফিরিয়া আসিতেন। এইভাবে হিমাইতপুর ও কুষ্টিয়ার ভক্তদের অহরহই এই দুই স্থানে যাতায়াত লাগিয়াই থাকিত। এই দুই কীর্তন কেন্দ্রের মাধ্যমেই তৎকালে নাম প্রচারের মহাঅভিযান দেশের নানা স্থানে বিস্তার লাভ করিয়াছিলেন।

কুষ্টিয়ার ভক্তগণ সময় সময় শ্রীশ্রীঠাকুর দর্শনে হিমাইতপুর যাইতেন এবং শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁহাদের পাইয়া আনন্দোল্লাসে কেমন উৎফুল্ল হইয়া উঠিতেন, সে প্রসঙ্গে কুষ্টিয়া নিবাসী প্রবীণ সংঘভ্রাতা গোপালচন্দ্র কর্মকার মহাশয় বলিয়াছেন,—

"শ্রীশ্রীঠাকুর যখন হিমাইতপুরে থাকিতেন, আমরা কুষ্টিয়ার ভাইরা বড়ই ফাঁকা বোধ করিতাম, আমাদের কিছুই ভাল লাগিত না। তাই কয়েকজন মিলিয়া মাঝে মাঝে শ্রীশ্রীঠাকুর দর্শনে আশ্রমে যাইতাম। একবার ডাঃ সত্য দত্ত, কৃষ্ণলাল রায় চৌধুরী, রামকৃষ্ণ প্রামাণিক, হরিপদ ঘোষ, বিধুভূষণ প্রামাণিক ও আমি প্রায় দশবার জন গুরুভাই কুষ্টিয়া হইতে পায় হাঁটিয়া হিমাইতপুরে চলিয়াছি। পথে খেয়ায় গোরাই নদী ও পদ্মানদী এবং নৌকায় ঠাকুরবাড়ীর সন্নিকটবর্তী একটি নদীখাত পার হইয়া আমরা ঠাকুরবাড়ীর দিকে অগ্রসর হইতেছি। কিছু দূরে হইতে দেখিলাম, শ্রীশ্রীঠাকুর নদীর ধারে দাঁড়াইয়া আমাদের দিকে একদৃষ্টিতে তাকাইয়া আছেন। আমরা আরও কাছে গেলে তিনি আনন্দাতিশয্যে চীৎকার করিয়া দুই তিন বার বলিয়া উঠিলেন,—"সত্যদা, এলেন নাকি? ইতিমধ্যে আমরা গিয়া পারে উঠিলাম। আমাদের পাইয়া শ্রীশ্রীঠাকুর যেন আহ্লাদে আটখানা হইয়া পড়িলেন। তিনি সর্বপ্রথম সত্য দত্তকে বাহুপাশে দৃঢ় আলিঙ্গনে আবদ্ধ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিলেন,—"শালা ভীষ্মরে"। তারপর রামকৃষ্ণ প্রামাণিককে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিলেন,—"শালা নারদ রে"। কৃষ্ণলাল রায় চৌধুরীকে বুকে লইয়া কহিলেন—"শালা মনুরে"। আনন্দে উন্মাদ হইয়া তিনি এক এক জনকে এইভাবে জড়াইয়া ধরিতেছেন এবং তাহাকে কোন বিশিষ্ট মুনিঋষি বা মহাত্মার নামে অভিহিত করিতেছেন। সর্বশেষ আমাকে,—বলিলেন—"শালা শঙ্করাচার্য রে!...তাঁহার অফুরন্ত প্রেমের কথা কোনদিন ভুলিবার নয়।"

তপোবন বিদ্যালয়

বর্তমান প্রসঙ্গে এইবার আমরা কুষ্ঠিয়ায় তপোবন বিদ্যালয় ও নাম-চিকিৎসালয় স্থাপন, কলাবাগান ও কমলাপুরের আশ্রম প্রতিষ্ঠা, শ্রীশ্রীবিশ্বগুরু আবির্ভাব মহামহোৎসব, ডি. এস্. পি. প্রসঙ্গ, শ্রীশ্রীঠাকুরের অপূর্ব যীশুপ্রীতি বৃত্তান্ত, কুষ্টিয়া-কেন্দ্রিক প্রচারকার্য প্রভৃতি কতিপয় উল্লেখযোগ্য বিষয়ের ক্রমশঃ কিছু আলোচনা করিব।

এক সময় শ্রীশ্রীঠাকুর কুষ্টিয়ায় একটি আদর্শ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপনের বিশেষ ইচ্ছা প্রকাশ করেন। এই উপলক্ষে শিক্ষার আদর্শ সম্বন্ধে ভক্তদের নিকট তিনি বলিয়াছিলেন—"দেখুন, দেশে বর্তমানে যে শিক্ষা প্রচলিত, তাহাতে শ্রদ্ধার কোন স্থানই নেই। তাহা ব্যক্তিত্ব বিকাশের পক্ষে মোটেই অনুকূল নয়। প্রাচীনকালে ছাত্ররা গুরুগৃহে থেকে আচার্যের প্রতি শ্রদ্ধা অনুরাগের ভিতর দিয়ে ও তাঁহারই প্রীত্যর্থে বিদ্যা অনুশীলন করে ও স্ফূর্তিচিত্তে তাঁহার আদেশ পালন ক'রে প্রকৃত মানুষ হবার শিক্ষা পেত। গুরুও ছিলেন ইষ্টানুরাগী এবং চারিত্র্যে, পাণ্ডিত্যে, ব্যবহারিক নৈপুণ্যে ও আধ্যাত্মিক সাধনায় তৎপর। তাঁহার চারিত্রিক বিভূতির স্নেহল স্পর্শে শিষ্যরা ভরপুর হয়ে থাকত। এই রকম আচার্যানুরাগের ভিতর

দিয়ে যে শিক্ষা তার অভাব হওয়াতে জাতীয় জীবনে এ অধঃপতন এসেছে। যাতে উন্মুক্ত প্রকৃতির কোলে উপযুক্ত আচার্যের সান্নিধ্যে থেকে ছাত্ররা তাহাদের সহজাত সংস্কার ও অভ্যাসগুলিকে সুনিয়ন্ত্রিত করতে অভ্যস্ত হয়ে উঠে ও ভবিষ্যৎ জীবন যুদ্ধের অভিঘাতে পরাস্ত ও বিপর্যস্ত না হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের বৈশিষ্ট্যানুপাতিক নানা প্রকার ভাষা, কৃষি, শিল্প, বিজ্ঞান, কলা প্রভৃতির শিক্ষা পেয়ে উন্মেষশালিনী বুদ্ধি প্রতিভা ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের অধিকারী হয়ে জীবন্ত কর্মপ্রেরণা নিয়ে দশের ও জাতির প্রকৃত সেবার অধিকারী হয়ে ওঠে—সেই উদ্দেশ্যেই তপোবন বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় আমার ইচ্ছা। প্রাচীনকালে ভারতীয় শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্রই ছিল তপোবন। এইরূপ একটি আদর্শ বিদ্যালয় স্থাপন করে ও স্থানে স্থানে যদি আরও আদর্শ শিক্ষা কেন্দ্র স্থাপন করতে পারেন, তাহলে প্রকৃতই দেশের সেবা করা হবে।"

শ্রীশ্রীঠাকুরের পরিকল্পনা মত সুকুমারমতি বালকগণকে আদর্শপ্রাণ শ্রদ্ধাবান ও সচ্চরিত্র করিয়া গড়িয়া তুলিবার উদ্দেশ্যে স্থানীয় ভক্তগণ বিশেষ উৎসাহী ও কর্মতৎপর হইয়া উঠেন। জীবন-চলনার প্রতিক্ষেত্রে কর্মের সঙ্গে ধর্মের সংযোগ রক্ষা করিয়া চলিবার অপরিহার্য প্রয়োজনীয়তার কথা তরুণ বালকগণকে শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যে পরিকল্পিত বিদ্যালয়টিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে আচার্যানুরাগ মূলক শিক্ষা পদ্ধতি প্রবর্তনের সংকল্প গ্রহণ করা হয়। স্থানীয় ধনী ব্যবসায়ী জানকীনাথ সাহা রায় এই বিদ্যালয়ের জন্য তাঁহার খোকসা জানিপুরের তিন বিঘা জমির বিস্তৃত বাগান-বাড়ীখানা ও নগদ কয়েক শত টাকা দান করেন। যোগেন্দ্রনাথ সরকার এম্-এ. বি-এল. প্রমথনাথ শিকদার বি. এ. বি. এস্-সি, বি-এল. প্রভৃতি কতিপয় শিষ্য কর্মীশিক্ষক লইয়া বিদ্যালয়টির কাজ আরম্ভ হয়। কিছুদিনের মধ্যেই জানকীবাবুর প্রদত্ত উক্ত ভূমিতে বিদ্যালয় ভবনের ভিত্তি গাঁথিয়া তোলা হয়। ছেলেদের পাঠদানের সঙ্গে প্রতি সকাল-সন্ধ্যায় ছাত্র শিক্ষক মিলিয়া সমবেত প্রার্থনা প্রভৃতি চলিতে থাকে।

বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্যকে বাস্তবে রূপায়িত করিবার জন্য অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান কল্পে কয়েকজন ভক্ত শিষ্য ও স্থানীয় কতিপয় বিশিষ্ট ভদ্রলোক লইয়া 'হিতৈষী ভাণ্ডার' নামে একটি যৌথ কারবার খোলা হয়। এই প্রতিষ্ঠানটি পরে আরও বৃহদাকারে গঠন করিয়া এক কোটি টাকা মূলধনে 'কমার্স এণ্ড কালচার' নামে রেজিষ্ট্রী করা হয়। উকীল পূর্ণচন্দ্র সাহা, ডাক্তার যতীন রায়, প্রধান শিক্ষক যোগেন্দ্রনাথ সরকার প্রভৃতি শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশিষ্ট শিষ্যগণ ইহার প্রধান কর্মকর্তা নিযুক্ত হন। এই কোম্পানীর উদ্দেশ্য ছিল অতীব মহৎ, বিরাট ও ব্যাপক। যথা—ব্যবসায়ে কোম্পানীর যে আয় হইবে, তাহার অধিকাংশই ব্যয়িত হইবে ভারতীয় শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রচারের জন্য। বিভিন্ন স্থানে আদর্শ শিক্ষাকেন্দ্র—স্কুল, কলেজ ও গবেষণাগার স্থাপন, ভারতীয় সংস্কৃতি বিষয়ক

পুস্তক প্রণয়ন ও প্রকাশ, ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রচার উদ্দেশ্যে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে ও বিদেশে প্রচারক প্রেরণ প্রভৃতি সৎকার্যের ব্যয় উক্ত কোম্পানীর আয় হইতে নির্বাহ হইবে।

দুঃখের বিষয়, নানা কারণে বাধাপ্রাপ্ত হওয়ায় কোম্পানীটির অচল অবস্থা ঘটে। সঙ্গে সঙ্গে পরিকল্পিত বিদ্যালয়টির কাজও বন্ধ হইয়া যায়।

'নাম'-চিকিৎসালয়

সে যুগে শ্রীশ্রীঠাকুর অনেক সময় ভক্তদের নিকট 'নামের' অপার মহিমা সম্বন্ধে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ নানা আলাপ-আলোচনা করিতেন। তিনি বলিতেন,—"সৎনামই আদি নাদ, সৃষ্টির মূলে উৎস, জীবনের ধারক ও অস্তিত্বের পোষক। সুতরাং সত্তার ধারণ, রক্ষণ ও পোষণের জন্য অটুট বিশ্বাস-ভক্তির সহিত নামী পুরুষের (সদ্‌গুরুর) ধ্যান সমন্বিত নামজপই হচ্ছে সর্বোত্তম পন্থা।" নাম-মাহাত্ম্যের কথা বুঝাইতে গিয়া তিনি আরও বলিতেন,—"আমাদের হাত পা, চোখ, কান দিয়ে সব সময় "রঞ্জন রশ্মির" মত অদৃশ্য আলোক-স্রোত বাহিরে প্রবাহিত হচ্ছে, আর মাথাটা যেন বাহির থেকে ঐ আলোক-স্রোত শোষণ করে শরীরের ভিতরে নিচ্ছে। উহাই আমাদের জীবনী শক্তি। মরে গেলে এই প্রবাহটা থেমে যায়।

"খুব নাম করলে দেহমধ্যে প্রবাহিত ঐ অদৃশ্য আলোকস্রোত মস্তিষ্কে সংহত হয়, চোখ দিয়ে তা' বেশী করে ঠিকরে বেরোয়, আর তখন কারুর দিকে কিছুক্ষণ ধরে তাকিয়ে থাকলে বা স্পর্শ করে থাকলে, ঐ সূক্ষ্ম জীবনীশক্তি সঞ্চারণে সে যে শুধু নড়েই ওঠে তা নয়, মৃত হলে জীবন্ত হয়েও উঠতে পারে। সদ্যোমৃত ব্যক্তির শরীর-বিধানের কোন বিশিষ্ট যন্ত্র যদি একেবারে বিকল বা বিকৃত না হয়, তবে ঐ রকম নাম করতে করতে তাকে স্পর্শ করে থাকলে, সে পুনর্জীবিত হয়ে উঠতে পারে।"

শ্রীশ্রীঠাকুর নিজ জীবনের কয়েকটি পরীক্ষা-নিরীক্ষায় জীবন-পোষণে নামের উক্তরূপ অপূর্ব প্রভাবের যে বাস্তব পরিচয় প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, সে সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ উল্লেখ করা যাইতেছে। একদিন একটি গুবরে পোকাকে তিনি মৃতাবস্থায় দেখিতে পান। সবিশেষ পরীক্ষা দ্বারা তিনি পরিষ্কার বুঝিতে পারিলেন যে পোকাটি সত্যই মৃত, উহাতে জীবনের কোন চিহ্ন নাই।—পোকাটির মাথার সঙ্গে উহার দুইখানা মাত্র ছোট ছোট পা সংযুক্ত আছে, শরীরের অবশিষ্ট অংশবিশেষ কিছুই নাই। এই অবস্থায় আপন মনের সহজ ঔৎসুক্যবশতঃ তিনি একটি আঙ্গুল দিয়া পোকাটি স্পর্শ করতঃ ইহার দিকে এক দৃষ্টিতে প্রায় আধ ঘণ্টা কাল গভীরভাবে নাম করেন। ফলে, তিনি দেখিতে পাইলেন, পোকাটার পা দুইখানা একটু একটু নাড়িতে লাগিল, তারপর উপুড় হইয়া একটু চলিল, তারপর আবার চিৎ হইয়া পড়িল, আর নাড়িতে পারিল না। তিনি আবার উহাকে স্পর্শ

করিয়া নাম করিলেন, আবার উহা একটু নড়িল। এইরূপে কয়েকবার পরীক্ষা দ্বারা তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, ইহার শরীরের অপর অংশ বিশেষ কিছুই নাই, তাই প্রাণ পাইলেও ইহার তাহা ধারণ করিবার ক্ষমতা নাই। আর একদিন শ্রীশ্রীঠাকুর একটি মৃত আরসোলার দিকে চাহিয়া ঐ ভাবে স্পর্শ করতঃ নাম করার ফলে, তিনি দেখিয়াছিলেন যে, মৃত আরসোলাটি পুনর্জীবিত হইয়া উঠিয়াছিল। ইহাতে তাঁহার মনে এই দৃঢ় ধারণা জন্মিয়াছিল যে, নাম-স্পন্দনের শক্তি বলেই উহারা প্রাণবন্ত হইয়া উঠিয়াছিল। বলা বাহুল্য, তিনি নিজ জীবনে অন্যান্য আরও নানা জাতীয় ঘটনায় স্বয়ং বিশেষরূপে পরীক্ষা দ্বারা নামস্পন্দনের এতাদৃশ অপূর্ব শক্তি সম্বন্ধে নিশ্চিতরূপে নিঃসন্দেহচিত্ত হইয়াছিলেন।

এই অবস্থায় স্বীয় জীবনের উপলব্ধ ও পরীক্ষিত এই মহান সত্যটি ক্ষেত্র-বিশেষে প্রয়োগ করতঃ জনসাধারণকে তাহার সুফল সম্ভোগের সুযোগ প্রদানের জন্য শ্রীশ্রীঠাকুর একসময় সক্রিয়ভাবে বিশেষ সচেষ্ট হইলেন। নাম-স্পন্দনের সাহায্যে জীবনীশক্তির সঞ্চার বা ইহার গতিবেগ বৃদ্ধি করতঃ মৃতপ্রায় ব্যক্তিকে পুনরুজ্জীবিত এবং দুরারোগ্য রোগীকে নিরাময় করিবার উদ্দেশ্যে তিনি একটি চিকিৎসালয় স্থাপন করিলেন। কুষ্টিয়ায় এক সদর রাস্তার উপর একটি দোতালা বাড়ীতে এই নাম-চিকিৎসালয়টি স্থাপিত হইল। সতীশচন্দ্র গোস্বামী, বীরেন্দ্রনাথ রায়, সতীশচন্দ্র জোয়ারদার, সুশীলচন্দ্র বসু, মহম্মদ গহর আলী, রামকৃষ্ণ প্রামাণিক, রাধারমণ জোয়ারদার প্রভৃতি ইষ্টপ্রাণ ভক্তগণ এই কার্যে আত্মনিয়োগ করেন। ইঁহারা শ্রীশ্রীঠাকুরের নির্দেশমত আপ্রাণ চেষ্টা চালাইয়া নানাস্থানের বড় বড় ডাক্তারদের পরিত্যক্ত বহু মৃতপ্রায় মুমূর্ষু রোগীকে বাঁচাইয়া তুলিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। প্রসঙ্গতঃ ইহা উল্লেখযোগ্য যে কুষ্টিয়ার ডাকপিয়ন লক্ষ্মণ ঘোষ, বরৈচারার জানকী হালদার ও মতি সাহা প্রভৃতি তুমুল কীর্তনের মধ্যে নামস্পন্দনের শক্তি বলে দুরারোগ্য ব্যাধির কবল হইতে আশ্চর্যরূপে রক্ষা পাইয়াছিল। স্থানাভাব বশতঃ নাম-চিকিৎসায় রোগমুক্তির চমকপ্রদ বাস্তব কাহিনীগুলি লিপিবদ্ধ করিতে না পারিয়া আমরা দুঃখিত। এই প্রসঙ্গে আমরা নিম্নে নাম-চিকিৎসা পরিচালনা ব্যাপারের সঙ্গে প্রত্যক্ষ-ভাবে যুক্ত দুইজন প্রবীণ ইষ্টভ্রাতার প্রদত্ত বিবৃতি উদ্ধৃত করিতেছি:

সৎসঙ্গ সভাপতি সুশীলচন্দ্র বসু মহাশয়ের বিবৃতি

"আমি নিজেও একটি মৃতপ্রায় রোগীকে নাম-স্পন্দনের দ্বারা বাঁচাইয়া তুলিবার ব্যাপারে যুক্ত ছিলাম। রোগীর নাম শ্রীকান্ত সরকার। বয়স অনুমান ২৭।২৮। সে "ম্যানেনজাইটিস্" রোগাক্রান্ত হয়। তখন এই রোগের বিশেষ কোন চিকিৎসা ছিল না। রোগীর জীবনের কোনই আশা নাই দেখিয়া ডাক্তারগণ তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। তখন রাত্রি ১১টা। রোগীর নাড়ি ও

হৃদ্‌পিণ্ডের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া গেল। সে অবস্থায় তাহাকে স্পর্শ করিয়া আমি এবং আরও পাঁচজন অনবরত নাম করিতে লাগিলাম। সারা রাত্র এইরূপ নাম করার পর সকালবেলা রোগীর হৃদ্‌পিণ্ডের কাজ একটু আরম্ভ হইয়াছে বলিয়া টের পাওয়া গেল। তখনো রোগী সম্পূর্ণ অজ্ঞান। আমরা ছয়জন তখন প্রাতঃকৃত্যাদির জন্য বিদায় নিলাম। অপর ছয়জন রোগীকে স্পর্শ করিয়া নাম করিতে লাগিলেন। এইভাবে দিবারাত্র নাম হইতে লাগিল। তিন দিনের দিন রোগীর সম্পূর্ণ জ্ঞান ফিরিয়া আসিল। মৃত্যুর কবল থেকে রোগীকে এইভাবে সুস্থ হইতে দেখিয়া আমাদের কি অপূর্ব আনন্দ হইল, তাহা ভাষায় বলিবার নয়। শ্রীকান্তের বিধবা মা ও তাহার স্ত্রী শ্রীকান্তের এই ভাবে পুনর্জীবন প্রাপ্তির জন্য শ্রীশ্রীঠাকুরের উদ্দেশ্যে প্রণাম জানাইয়া বার বার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে লাগিলেন।"

শ্রীরাধারমণ জোয়ারদারের বিবৃতি

"এক সময় কুষ্টিয়ায় সৎসঙ্গ প্রাণতত্ত্বানুসন্ধান সমিতি" (Life Research Society—নাম-চিকিৎসালয়) আমাদের কুষ্টিয়ার একটা দোতালা পাকা বাড়ীতে স্থাপিত হয়। রোগীদের জন্য সেখানে ১৫।১৬টি শয্যা ছিল। হিন্দু, মুসলমান, ব্রাহ্ম, খৃস্টান সকল ধর্মাবলম্বী রোগীকেই সেখানে চিকিৎসা করা হইত। সতীশচন্দ্র গোস্বামী, রামকৃষ্ণ প্রামাণিক, মহম্মদ গহর আলী বিশ্বাস প্রভৃতি ভক্তগণ নামের শক্তি প্রয়োগ করিয়া বহু কঠিন কঠিন রোগীর রোগ মুক্ত করিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশেষ নির্দেশ মত এই চিকিৎসার ব্যবস্থা হইত। চিকিৎসক ও রোগী উভয়কেই নাম করিতে হইত। অশক্ত রোগীর বেলায় শুধু চিকিৎসকই নাম করিতেন। নাম করিবার কৌশল চিকিৎসকগণ শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট উত্তমরূপে শিক্ষা করিয়া লইতেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের আদেশে আমিও মাঝে মাঝে সেখানে গিয়া চিকিৎসকদের নিকট চিকিৎসা প্রণালী শিক্ষা করিতাম। বহু দুরারোগ্য রোগীকে এই নাম-চিকিৎসায় নিরাময় হইতে আমি দেখিয়াছি এবং আমি নিজেও দুই তিনটি রোগীকে সুস্থ করিয়া তুলিতে সক্ষম হইয়াছি।"

কলাবাগানের আশ্রম

১৩২৪ বঙ্গাব্দের কথা। কুষ্টিয়া অঞ্চলে কয়েক বৎসর ধরিয়া নাম-প্রচারের ফলে কুষ্টিয়া ও পার্শ্ববর্তী স্থান সমূহের বহু নরনারী সৎমন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করে। সংকীর্তন ও সদালোচনার মাধ্যমে এই সকল নবীন দীক্ষিতদের ইষ্টানুসরণে প্রেরণা যোগাইবার এবং ঐ অঞ্চলের সর্বত্র আরও ব্যাপকভাবে নাম প্রচারকার্য চালাইবার উদ্দেশ্যে শ্রীশ্রীঠাকুর কুষ্টিয়ায় একটি আশ্রম প্রতিষ্ঠার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। তদনুসারে ভক্তশিষ্য সতীশচন্দ্র জোয়ারদারের কলাবাগানের বাড়ীতে আশ্রমটি স্থাপিত হয়। শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁহার অন্তরঙ্গ পার্ষদ গোস্বামী সতীশচন্দ্রের উপর আশ্রমটি পরিচালনার দায়িত্ব অর্পণ করেন। তদবধি

সতীশচন্দ্র সেখানে সপরিবারে বাস করিতে থাকেন। আশ্রম বাটীতে প্রত্যহ শ্রীশ্রীঠাকুরের নিয়মিত সেবাপূজা, নামধ্যান, সদালোচনা ও সংকীর্তনাদি চলিতে থাকে। আশ্রমে সকল সময়ই নানা আনন্দোৎসব লাগিয়া থাকিত। ১০।১২ জন লোক নিয়তরূপেই সেখানে বাস করিত এবং প্রত্যহই নানা স্থান হইতে ভক্ত সমাগম হইত এবং তাহাদের জন্য আশ্রমের সদাব্রত দিবারাত্র সর্বক্ষণ খোলা থাকিত। সতীশচন্দ্রের ভক্তিমতী পত্নী আশ্রমবাসী এবং আগন্তুক সকলকে আপন পুত্রের মত ভালবাসিতেন এবং নিজেই রন্ধনাদি করিয়া যত্ন সহকারে ভোজন করাইতেন। লোক সংখ্যা কখনো অত্যধিক হইলে রান্নার জন্য পাচক ব্রাহ্মণ রাখা হইত। সতীশচন্দ্র কীর্তনের দল লইয়া প্রত্যহ কুষ্টিয়া ও সহরতলীর বিভিন্ন পল্লীতে পরিভ্রমণ করিতেন এবং বাড়ী বাড়ী যাইয়া সৎ-প্রসঙ্গের আলোচনায় সবাইকে উদ্বুদ্ধ করিতেন। কখনো কখনো তিনি দলবল সহ দূরবর্তী অঞ্চলে যাইয়া সত্যনাম বিতরণ করিতেন। তাঁহার সার্থক যাজন, প্রেমিক চরিত্র ও মধুর আচরণে আকৃষ্ট হইয়া তৎকালে তদঞ্চলের বহু নরনারী সদ্দীক্ষা লাভে ধন্য হইয়াছিল। কুষ্টিয়ায় অবস্থানকালে শ্রীশ্রীঠাকুর সময় সময় ভক্তদের লইয়া কীর্তন করিতে করিতে কলাবাগানের আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইতেন।

কলাবাগানের আশ্রমে ভক্তগণ প্রত্যহ সন্ধ্যা হইতে গভীর রাত্রি পর্যন্ত তুমুল কীর্তন চালাইতেন। সেই প্রাণোন্মাদী কীর্তনে কত সময় কত অদ্ভুত ব্যাপার ঘটিত! স্থানাভাব বশতঃ আমরা এখানে একদিনের একটি ঘটনার কথা বিবৃত করিতেছি: তখন মাঘ মাস, প্রচণ্ড শীত। সন্ধ্যাকালে আশ্রম-আঙ্গিনায় বহু ভক্তের সমাগম হইয়াছে। সেদিন ঠাকুরভোগের জন্য খিচুড়ীর ব্যবস্থা হইয়াছে। গোস্বামী সতীশচন্দ্রকে সকলে ধরিয়া বসিলেন,—"বাবা, আমাদের প্রাণের অনেক দিনের একটি বিশেষ আকাঙ্ক্ষা আজ আপনাকে পূর্ণ করতে হবে। শ্রীশ্রীঠাকুর স্বয়ং এসে ভোগ গ্রহণ করেন, আমরা স্বচক্ষে দেখে কৃতার্থ হতে চাই।" সতীশচন্দ্র তদুত্তরে বলিলেন,—"তা বেশ! তোমরা যদি সবাই তন্ময় হয়ে কীর্তনে মেতে যেতে পার, আর তোমাদের কীর্তনে আমাকেও মাতিয়ে তুলতে পার তবেই হয়। একান্ত মনে তাঁকে ডাকলে, তিনি কিছুতেই সাড়া না দিয়ে পারবেন না।" ভক্তরা সকলে মিলিয়া সর্বমনপ্রাণে কীর্তন আরম্ভ করিলেন। স্বল্প সময়ের মধ্যেই কীর্তন এমন জমিয়া উঠিল যে, সবাই প্রেমানন্দে মাতোয়ারা হইয়া পড়িলেন, সতীশচন্দ্রেরও একরূপ পাগলপারা সংজ্ঞাহারা দশা! এইরূপ ভাববিহ্বল তন্ময় অবস্থায় গোস্বামী সতীশচন্দ্র ভক্তি বিগলিত চিত্তে তাঁহার প্রাণের ঠাকুরের উদ্দেশে ভোগ নিবেদন করিলেন, এদিকে ভক্তগণের সেই উদ্দণ্ড কীর্তন তুমুল বেগে চলিতে লাগিল।

শ্রীশ্রীঠাকুর তখন হিমাইতপুর আশ্রমে পদ্মাতীরে সেবকবৃন্দ পরিবৃত হইয়া বিশ্রাম্ভালাপে রত আছেন। কথাবার্তা চলিতেছে, এমন সময় শ্রীশ্রীঠাকুর হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন,—"কুষ্টিয়া যাওয়া লাগে, চল্, এক্ষুণি যাব।" কথা বলার সঙ্গে সঙ্গেই গাত্রোত্থানপূর্বক তিনি ছুটিয়া চলিলেন। অনন্তনাথ, কিশোরীমোহন,

নফরচন্দ্র প্রভৃতি আরও জন কয়েক যাঁহারা তাঁহার নিকটে ছিলেন, শ্রীশ্রীঠাকুরের পিছনে পিছনে দৌড়াইয়া গেলেন। সঙ্গীদের মনে ভীষণ দুশ্চিন্তা—কন্‌কনে শীত, রাত্রিকাল,—কোথায় কুষ্টিয়া!—সুদীর্ঘ পথ! এত রাত্রে খেয়া পাওয়া যাইবে কিনা···। শ্রীশ্রীঠাকুর এত দ্রুত দৌড়াইতেছেন যে, সঙ্গীরা কিছুতেই তাঁহার নাগাল পাইয়া উঠিতেছেন না, মাঝে মাঝে তাঁহার উচ্চ কণ্ঠের হাঁকডাক শুনিয়া তাঁহারা কোন রকমে তাঁহাকে অনুসরণ করিয়া চলিয়াছেন। এইভাবে তড়িদ্‌গতিতে আট দশ মাইল দীর্ঘ পথ অতিক্রম করিয়া এবং পথিমধ্যে পদ্মা ও গড়াই নদীর দুইটি খেয়া পার হইয়া রাত্রি ১১টার সময় দারুণ শীতের মধ্যে শ্রীশ্রীঠাকুর ভক্তগণ সহ কলাবাগানের আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। ভক্তবৎসল দয়াল ঠাকুরকে অকস্মাৎ এইভাবে পাইয়া বিস্ময় ও আনন্দের আতিশয্যে সকলে সমস্বরে আবেগোদ্দীপ্ত কণ্ঠে উচ্চ জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল।...কীর্তন আঙ্গিনায় পদার্পণ করিয়াই শ্রীশ্রীঠাকুর বিশেষ ব্যস্ততার সঙ্গে বলিলেন,—"শীগ্‌গির খেতে দে, বড্ড খিদে পেয়েছে।" সকলে তখন মহোল্লাসে ত্রস্ততার সঙ্গে তাঁহার পাদ-প্রক্ষালন, ভোজন, আচমন ও শয়নাদির ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। ঠাকুর ভোগের পর সকলে প্রসাদ পাইয়া মহানন্দে বাড়ী ফিরিলেন।

কমলাপুরের আশ্রম

কুষ্টিয়া সহরের পাঁচ মাইল দক্ষিণে গড়াই নদীর শাখা কালী গঙ্গার তীরবর্তী কমলাপুর পল্লী সেকালের একটি বর্ধিষ্ণু গ্রাম। এই গ্রামের ধনী জমিদার ভক্ত সুরেন্দ্রমোহন বিশ্বাসের ঐকান্তিক আকাঙ্ক্ষা সেখানে শ্রীশ্রীঠাকুরের একটি আশ্রম প্রতিষ্ঠা হয়। এ বিষয়ে শ্রীশ্রীঠাকুরের সানুগ্রহ অনুমতি লওয়ার জন্য সুরেন্দ্র-মোহন গোস্বামী সতীশচন্দ্রকে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানান। শ্রীশ্রীঠাকুরের অন্যতম অন্তরঙ্গ পার্ষদ অশ্বিনীকুমার বিশ্বাসের বাড়ীও ছিল উক্ত কমলাপুরেরই পার্শ্ববর্তী দুধকুমড়া গ্রামে। সুরেন্দ্রমোহনের প্রস্তাবটি তিনিও সানন্দে ও সাগ্রহে সমর্থন করেন। ইঁহাদের সবিশেষ অনুরোধে এবং নাম-প্রচার কার্যের সুযোগ-সুবিধার কথা বিশেষ বিচার-বিবেচনা করিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরও অবশেষে এ বিষয়ে সম্মতি দান করিলেন। অতঃপর তাঁহার নির্দেশে সতীশচন্দ্র কলাবাগানের আশ্রমটি কমলাপুরে স্থানান্তরিত করেন। তিনি তথায় পূর্ববৎ সপরিবারে বাস করতঃ আশ্রমটি পরিচালনা করিতে থাকেন। কলাবাগানের মতই এখানেও নিত্যনিয়মিত পূজার্চনা, নামধ্যান, সংকীর্তন, সদালোচনা, ভক্ত সমাগম এবং আনন্দ উৎসবাদি চলিতে লাগিল। গোস্বামী সতীশচন্দ্র দিবারাত্র যাজন কার্যে ব্যাপৃত থাকেন, নিত্য নগর পরিক্রমায় কীর্তনের দল লইয়া নানা অঞ্চলে পরিভ্রমণ করতঃ নামসুধা বিতরণে শত শত নরনারীর তাপিত প্রাণ শীতল করেন। নানাস্থান হইতে কত লোক নিত্য আসিয়া সৎমন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করিয়া ধন্য হয়। এইভাবে আশ্রমের সেবা কার্যের সুনাম ক্রমশঃ চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িতে থাকে। কিছুকাল মধ্যেই ইহা "শ্রীশ্রীঅনুকুল ঠাকুরের আশ্রম" নামে সকলের নিকট সুপরিচিত হইয়া উঠে।

কুষ্টিয়ায় শ্রীশ্রীবিশ্বগুরু আবির্ভাব মহামহোৎসব

শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশেষ ইচ্ছায় কুষ্টিয়ার ভক্তগণ কর্তৃক তৎকালে দলমত নির্বিশেষে শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীবুদ্ধ, শ্রীযীশু, দঃ হজরত মহম্মদ, শ্রীচৈতন্য, শ্রীরামকৃষ্ণ প্রভৃতি যুগপ্রবর্তক মহামানবগণের জন্মোৎসব মহাসমারোহে প্রতিপালিত হইত। এইসকল উৎসবাদির অনুষ্ঠানে প্রতিপালনীয় কর্তব্য সম্পর্কে ভক্তগণের প্রতি শ্রীশ্রীঠাকুরের এইরূপে বিশেষ নির্দেশ ছিল যে, উৎসব উপলক্ষে সদ্‌গুরু, সৎনাম ও সৎসঙ্গের মাহাত্ম্য প্রচারপূর্বক সকলের মনে উদার ধর্মভাব উদ্বোধনের ব্যবস্থা করিতে হইবে এবং নর মাত্রই নারায়ণের প্রতীক—এই বোধে, নিরভিমান হইয়া সরল স্বচ্ছন্দচিত্তে পরম শ্রদ্ধা সহকারে সকল মানবের সেবা করিতে হইবে।

নরসেবা সম্বন্ধে শ্রীশ্রীঠাকুর আরও বলিতেন,—"প্রতিটি নরের মধ্যেই নারায়ণ অধিষ্ঠিত আছেন। নারায়ণই নরকে সর্বৈশ্বর্য লাভের পথ প্রদর্শন করিয়া থাকেন। প্রকৃত নরসেবার মাধ্যমেই বহুরূপে নারায়ণ পূজার সুযোগ পাইয়া মানুষ ধন্য হইতে পারে। নরকে দরিদ্র বলিয়া অশ্রদ্ধা করার মত মূর্খতা আর কিছুই নাই। কোন অনুষ্ঠান উপলক্ষে গরীব কাঙ্গালকে এক মুষ্ঠি অন্ন বিতরণের কোন অর্থ হয় না। ইহাতে দাতার মনের অহংভাবই পুষ্ট হয় এবং দাতা সেবাদানের কৃতার্থতা বোধ এবং আনন্দ লাভের সৌভাগ্য হতে বঞ্চিত হন।

ভক্তগণ শ্রীশ্রীঠাকুরের উপদেশ মত এই সকল উৎসব অনুষ্ঠানে পূর্বতন মহা-পুরুষগণের জীবনী ও বাণী সম্বন্ধে বক্তৃতা, আলোচনা, কথকতা, সৎগ্রন্থ পাঠ ও সংকীর্তনাদির আয়োজন করিতেন। আমন্ত্রিত গরীব দুঃখী, অন্ধ আতুর, সাধু ফকির, বাউল দরবেশ প্রভৃতি সমাগত সকলের সশ্রদ্ধচিত্তে পাদপ্রক্ষালন, গ্রীষ্মকালে পাখার বাতাসে তাহাদের শ্রান্তি অপনোদন, উৎকৃষ্ট ভোজ্য দ্রব্যের ভূরিভোজনে তাহাদের তৃপ্তি সাধন, অর্থ, তণ্ডুল ও বস্ত্রাদি বিতরণে প্রচুর সাহায্য প্রদান প্রভৃতি নানা উপায়ে তাহাদিগকে প্রীত ও আপ্যায়িত করিতে তাঁহারা সবিশেষ যত্নবান থাকিতেন। এই সেবা-দান-অনুষ্ঠানের 'কাঙালী ভোজন', 'দরিদ্র বিদায়' প্রভৃতি প্রচলিত হীনতা-সূচক নাম পরিবর্তন করতঃ তাঁহারা শ্রদ্ধাসহকারে তাহার নামকরণ করিলেন—'নরনারায়ণ সেবা।' ভক্তগণ কর্তৃক জাতিবর্ণ নির্বিশেষে সকল মানবের সেবা ও আত্মোন্নতি বিধান এবং সর্বশ্রেণীর মানবের মধ্যে পবিত্র ভ্রাতৃভাব স্থাপনের নানা কল্যাণ প্রচেষ্টা প্রভৃতি সশ্রদ্ধ সেবাকার্যের ফলে, স্থানীয় সকল ধর্মাবলম্বী জনগণই শ্রীশ্রীঠাকুরের চরিত্র ও মহৎ আদর্শের প্রতি সবিশেষ অনুরাগী হইয়া উঠিয়াছিলেন এবং কালক্রমে তাঁহারা অনেকেই তাঁহার শ্রীচরণে আত্মসমর্পণ পূর্বক ধন্য হইয়াছিলেন।

এইভাবে বেশ কিছুকাল জগতের সব ধর্মমতের মহামানবগণের স্মৃতিতর্পণ উৎসব প্রতিপালন করিতে করিতে একদা ভক্তগণের মনে স্বতই এই বিশেষ প্রশ্নটির উদয় হইল,—আমরা তো এযাবৎকাল সকল মহাপুরুষেরই জন্মোৎসব উদ্‌যাপন করিয়া আসিতেছি, কিন্তু আমাদের পরম প্রেমময় শ্রীশ্রীঠাকুর—যিনি পূর্ববর্তী

তথাগত সকলেরই স্মৃতি বহন করিয়া জীবোদ্ধারের জন্য এযুগে ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়াছেন—যিনি পরমপিতার পূর্ণ প্রকাশ—যিনি বর্তমান পুরুষোত্তম, তাঁহার জন্মোৎসব তো আমরা পালন করিতেছি না, ইহাতে আমরা প্রত্যবায় ভাগী হইতেছি না কি ? বলিতে কি, ভক্তগণের পরস্পরের এবম্প্রকার ভাবধারা আলোচনার সঙ্গে সঙ্গেই সকলে একই সঙ্গে সর্বসম্মতিক্রমে এই স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন যে, আগামী ২৯শে ও ৩০শে ভাদ্র ১৩২৫ বঙ্গাব্দ, শ্রীশ্রীঠাকুরের শুভ ত্রিংশৎ বর্ষ পূর্তি উপলক্ষে তাঁহারা কুষ্টিয়া সহরে মহাসমারোহে তাঁহার পুণ্য জন্মোৎসবের অনুষ্ঠান করিবেন এবং তাহাতে এ যুগে শ্রীভগবানের নরদেহে (শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র রূপে) মর্ত্যে আগমনের শুভ বার্তাটি জগৎবাসীর কাছে যথাযোগ্যভাবে ঘোষণা করিবেন। উৎসবটির নামকরণ করা হইল "শ্রীশ্রীবিশ্বগুরু আবির্ভাব মহামহোৎসব"। এই অনুষ্ঠানে যোগদানের জন্য দেশের জনসাধারণের উদ্দেশে যে আমন্ত্রণলিপি প্রচারিত হইয়াছিল, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করা হইল। যথা ঃ—

শ্রীশ্রীবিশ্বগুরু-আবির্ভাব মহামহোৎসবের আহ্বান-পত্র

সদসদ্ ভেদাতীতং পরমপুরুষমেকং ।
তারয়িতুমবতীর্ণং নিখিল মানবকুলং ।।
ধৃত-সহজ-সমাধি-আনন্দঘন মূর্তিম্ ।
প্রেমবিগলিতচিত্তং বিশ্বগুরুং তং নমামঃ ।।

বহুস্থানে বহুরূপে অংশ মাত্র যাঁর
ঘোষিত হতেছে এবে বলি অবতার,
নিখিল মানবকুল উদ্ধার কারণ
যে নরবিগ্রহে তাঁর পূর্ণ প্রকটন।
ইচ্ছামাত্র সর্ব উচ্চ সমাধি মগন
হ'য়ে যেই করে ভাববাণীর ঘোষণ ।।
পরমপুরুষ সেই সর্ব ভেদাতীত,
জীব তরে হ'য়ে প্রেমে বিগলিত চিত,
ঘনানন্দ মূর্তি ধরি কৈল আগমন,
পাপী পায় শান্তি যাঁরে করি দরশন ।।
হেন সে শ্রীবিশ্বগুরু বিগ্রহ মূরতি
সাষ্টাঙ্গে শ্রীপদে তাঁর করি গো প্রণতি ।।

বর্তমানকালে ত্রিতাপক্লিষ্ট জগত শান্তি শান্তি করিয়া ব্যাকুল হইয়াছে। সর্বধর্মের সাধক মনীষিগণ এমন এক মহাপুরুষের আবির্ভাব প্রতীক্ষা করিতেছেন যিনি এই ধরাধামে শান্তি-বারি সেচন করিবেন। খৃষ্টান বলিতেছেন যীশু আসিতেছেন, মুসলমান বলিতেছেন ইমাম মেহেদি আসিবেন, বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীগণ বলিতেছেন মৈত্রেয় আসিবেন, হিন্দু বলিতেছেন কে আসিবেন জানি না—তবে এক মহাপুরুষের আগমনের পূর্ব লক্ষণসমূহ প্রকাশ পাইতেছে বটে। কোনও কোনও সাধক এমনও বলিতেছেন যে, তাঁহার আগমন হইয়াছে, কিন্তু এখনও তিনি গোপনে আছেন, শীঘ্রই আত্মপ্রকাশ করিবেন। ইহার স্থির সিদ্ধান্ত এখনও কেহই করিতে পারিতেছেন না।

কিন্তু আমরা জানি তিনি এবার আর একাধারে নহেন—সমস্ত পৃথিবীর জন্য বহুভাগে বিভক্ত হইয়া বহুস্থানে বহু মহাপুরুষরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। শ্রীবিবেকানন্দ সর্বধর্ম-সমন্বয়কারী শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকে 'যে শক্তির উন্মেষমাত্রে দিগ্-দিগন্তব্যাপিনী প্রতিধ্বনি জাগরিতা' দেখিয়া 'তাঁহার পূর্ণাবস্থা কল্পনায় অনুভব করিতে বলিয়াছিলেন, আজি বিশ্বমানবের সেই পরিপূর্ণ মহাশক্তির পূর্ণ লীলা-দর্শনের সময় উপস্থিত। উহা আর কল্পনার বিষয় নাই, এই বাস্তব জগতে উহার অভিনয় আরম্ভ হইয়াছে। পুণ্য লোকোদ্ভাসিত কোটি কোটি সূর্য কিরণ-সমুজ্জ্বল আনন্দময় দিব্যধামে গমনের সুবর্ণ সোপান প্রস্তুত—দিব্যধাম-নিবাসী দূতগণ দ্বারে দণ্ডায়মান, দয়ালু মহর্ষিগণ পতিতোদ্ধারে প্রসারিত-হস্ত, সত্য-লোকবাসী মুক্ত পুরুষগণ দ্বারে দ্বারে প্রেমসুধা বিতরণে নিযুক্ত। যদি এই মহাপ্রেমের আকর্ষণে আকর্ষিত না হও, যদি ব্রহ্মর্ষির প্রসারিত-হস্ত উপেক্ষা কর, যদি দ্বারে প্রস্তুত রথ প্রত্যাখ্যান কর—তবে তোমার গভীর যন্ত্রণায় সমবেদনা প্রকাশ করিবার জন্য একটিও প্রাণী বিদ্যমান থাকিবে না। হয়ত খর্ব-নিখর্ব যুগব্যাপী অজ্ঞানতার ক্রোড়ে মহানিদ্রায় অভিভূত থাকিবে এবং কে জানে কত যুগ-যুগান্তর, ক্রীড়াপুত্তলিকার ন্যায় পরিচালিত হইবে। বহুস্থানে বহুভাগে আবির্ভূত মহাপুরুষগণের নেতৃত্ব গ্রহণের জন্য শ্রীভগবান যে নরাকার-বিশিষ্ট দেহাবলম্বন করতঃ মহাভাব বা সর্বোচ্চ সমাধি অবস্থা হইতে ভাব-বাণীর দ্বারা মহাপুরুষগণের পথনির্দেশ এবং জীবসাধারণের মুক্তি অনায়াসলভ্য করিয়া বিশ্বকে মহাকর্ষণে কেন্দ্রমুখী করিতেছেন, সেই পরম পবিত্র শ্রীশ্রীবিশ্বগুরুর চিন্ময়-দেহ এই ধরাধামে অবতরণের তিথিতে আমরা মহা-মহোৎসবের জন্য বিশ্ববাসীকে আহ্বান করিতেছি। হে মানব! যদি ইহা বিশ্বাস করিতে, ইহা ধারণা করিতে অক্ষম হও—তথাপি বলি আইস—তোমার সন্দিগ্ধ চিত্ত লইয়াই শ্রীশ্রীবিশ্বগুরুর চরণ তলে উপস্থিত হও এবং যতদূর সাধ্য পরীক্ষা করিয়া তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ কর—কিন্তু স্মরণ রাখিও সাধন শক্তি সহায়ে গুরু পরীক্ষা করিতে হয়। শ্রীশ্রীবিশ্বগুরু পরীক্ষা করিতে করিতে কত অধিক সাধন শক্তি আবশ্যক তাহাও মনে করিও। আমরা নগণ্য, ক্ষুদ্র, সাধনসম্পদহীন জীব হইয়াও

তাঁহার অহেতুকী কৃপা লাভে ধন্য হইয়াছি বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করিতেছি যে যাঁহার সাধন শক্তি যত অধিক. তিনি শ্রীশ্রীবিশ্বগুরুকে তত অধিক পরিমাণে চিনিতে ও জানিতে পারিবেন। অতএব আইস ভাই সকল, আইস বন্ধু সকল, যাহার যেভাবে ইচ্ছা আইস, সহজ সরল বিশ্বাসে—যুক্তিতর্ক বিচার লইয়া আইস—অন্ধ বিশ্বাসে আইস বা সাধনশক্তি লইয়া পরীক্ষা করিতে আইস—যেভাবে ইচ্ছা একবার তাঁহার সমীপস্থ হও এবং মহাভাব বা সর্ব্বোচ্চ সমাধি অবস্থা দর্শন ও তদবস্থায় ঘোষিত ভাববাণী শ্রবণ কর,—তৎপর যেরূপ অভিরুচি হয় করিও। একটা কথা বলিয়া রাখি, যদি হৃদয়ে কিঞ্চিন্মাত্রও প্রকৃত প্রেমের উন্মেষ হইয়া থাকে তবে এই অতি মানব-প্রেম-সাগরের নিকটস্থ হইলে তুমি প্রেমে বিহ্বল হইয়া যাইবে—হাসিবে, কাঁদিবে, নাচিবে, গাহিবে, কত কি করিবে। ঘৃণা, লজ্জা, ভয়, কে জানে কোথায় তিরোহিত হইবে, পরিশেষে চিদানন্দ-সিন্ধুতীরে চিরনিমগন হইতে হইবে। ইতি—

মহোৎসবের স্থান—কুষ্টিয়া, ই. বি. আর. (নদীয়া)

তারিখ—২৮শে ভাদ্র, ১৪ই সেপ্টেম্বর ; ২৯শে ভাদ্র, ১৫ই সেপ্টেম্বর

বার—শনি, রবি ; সন—১৩২৫

কার্য-বিবরণী—কীর্তন, ধর্মবক্তৃতা, আলোচনা, আবৃত্তি এবং ভোজ্য, পানীয় ও বস্ত্রাদি দ্বারা নর-নারায়ণ সেবা।

বিনীত নিবেদকগণ

শ্রীহরিশ্চন্দ্র রায়, উকিল। শ্রীগোকুলচন্দ্র মণ্ডল, এল-এম্-এস। শ্রীত্রৈলোক্যনাথ সেন, উকিল। শ্রীবীরেন্দ্রনাথ রায়, মোক্তার। শ্রীসতীশচন্দ্র জোয়ারদার, এল্-এম্-পি। শ্রীঅশ্বিনীকুমার বিশ্বাস, মোক্তার। শ্রীযোগেন্দ্রনাথ সরকার, এম্-এ. বি. এল.। শ্রীপ্রমথনাথ শিকদার, বি. এল.। শ্রীপূর্ণচন্দ্র সাহা, উকিল। শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র দাস। শ্রীসুশীলচন্দ্র বসু, বি. এ.। শ্রীপূর্ণচন্দ্র কবিরাজ, বি. এ.।

যাহাতে জাতিবর্ণ নির্বিশেষে সমগ্র দেশের সর্বশ্রেণীর জনগণের যোগদানে আরব্ধ অনুষ্ঠানটি বিরাটভাবে সাফল্যমণ্ডিত হয় সেজন্য ব্যাপকভাবে প্রচারকার্য আরম্ভ হইল। কলিকাতা মহানগরীর ছোট বড় সকল রাস্তায়, বিশেষ বিশেষ কর্মকেন্দ্রে এবং জনবহুল সুপরিচিত সকল স্থানে, প্রতি জিলা ও মহকুমার অলিতে গলিতে, স্কুল কলেজ, কোর্ট কাছারী, হাট বাজার, সহর বন্দর, রেল ষ্টেশন, ষ্টীমার ঘাট—সর্বত্র বৃহৎ অক্ষরে মুদ্রিত প্রাচীর পত্র দ্বারা এবং অগণিত বিজ্ঞাপন পত্র বিলি করিয়া উৎসবের সংবাদ চারিদিকে জনসাধারণের মধ্যে রাষ্ট্র করা হইল। দৈনিক, সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্রপত্রিকায় অনুষ্ঠান-সূচী সহ উৎসব-বার্তা পূর্ব হইতেই প্রকাশিত হইতে লাগিল। ধর্মগুরু, রাষ্ট্রনেতা, অধ্যাপক, শিক্ষক, ডাক্তার, কবিরাজ, হাকিম, উকিল, মোক্তার, শিল্পী, ব্যবসায়ী প্রভৃতি সকল শ্রেণীর বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নিকট আমন্ত্রণ লিপি প্রেরিত হইল। এইরূপ নানাভাবে

প্রচার কার্য চালাইবার ফলে সারা বাংলায় যেরূপ ব্যাপক আকারে উৎসবের কথা ছড়াইয়া পড়িয়াছিল, তাহাতে দেশবাসী সকলের মনেই শ্রীশ্রীঠাকুর সম্বন্ধে একটা ভীষণ কৌতূহল জাগিয়া উঠিয়াছিল।— ইনি কে, কোথায় তিনি থাকেন, কেমন তিনি—ইত্যাদি কত কথা জানিবার জন্য এবং উৎসবে উপস্থিত হইয়া স্বচক্ষে তাঁহাকে দেখিবার জন্য দেশ-বিদেশের বহু নর-নারী উদ্‌গ্রীব হইয়া উঠিয়াছিল।

পরিকল্পিত এই বিরাট অনুষ্ঠানের বিপুল ব্যয় নির্বাহার্থ কর্মকর্তাগণ অর্থ সংগ্রহের জন্য অদম্য উৎসাহে আপ্রাণ চেষ্টা আরম্ভ করিলেন। শিষ্যবর্গ, ভক্তগণ এবং অনুরাগী জনসাধারণ সকলেই শ্রীশ্রীঠাকুরের এই শুভ জন্মন্তীতে মুক্তহস্তে দান করিতে লাগিলেন। নানাস্থান হইতে আগত এই সমুদয় স্বতঃস্ফেচ্ছ অবদান - নগদ টাকাকড়ি, মূল্যবান অলংকার পত্র, নানা জাতীয় ভোজ্যোপকরণ, বস্ত্রাদি ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যসম্ভার যথেষ্ট পরিমাণে উৎসব ভাণ্ডারে জমা হইতে লাগিল। স্থানীয় মারোয়ারী ব্যবসায়ী গৌরীশংকর আগরওয়ালার প্রদত্ত বিশাল আড়ত বাড়ীতে বিরাট উৎসব আপিস বসিল। মৌলবী রজবালী খাঁ কুষ্টিয়া রেল ষ্টেশনের সম্মুখস্থ তাঁহার বিরাট বাড়ী এবং তৎসংলগ্ন বিস্তৃত প্রাঙ্গণ উৎসবের কাজে ব্যবহারের জন্য বিনা ভাড়ায় ছাড়িয়া দিলেন। তাহাতে উৎসব মণ্ডপ, ভাণ্ডার-গৃহ এবং পাকশালা প্রভৃতি বিপুল আকারে প্রস্তুত করা হইল। মোহিনী মিলের কর্তৃপক্ষ স্বতঃস্ফেচ্ছায় সমগ্র উৎসব ক্ষেত্রে বৈদ্যুতিক আলো ও পাখা সরবরাহের দায়িত্ব গ্রহণ করিলেন। অনুষ্ঠানটিকে সর্বাংশে সাফল্যমণ্ডিত করিয়া তুলিবার জন্য স্থানীয় হিন্দু মুসলমান, বাঙ্গালী অবাঙ্গালী ব্যবসায়ী সকলেই আপ্রাণ চেষ্টা ও অক্লান্ত শ্রম করিয়াছিলেন। তাঁহারা সকলেই প্রভূত অর্থদ্বারা এবং আরও বহুপ্রকারে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন। বিদেশাগত বিশিষ্ট অভ্যাগত ভদ্রমহোদয় এবং মহিলাদের অবস্থানের জন্য বহু বড় বড় পাকা বাড়ী পূর্ব হইতেই নির্দিষ্ট করিয়া রাখা হইয়াছিল। বর্ষার বারিপাতে যাহাতে আগন্তুক জনসাধারণের কোনরূপ অসুবিধা না হয়, সেজন্য বহু অর্থব্যয়ে খড়ের অনেকগুলি চালাঘর নির্মাণ করা হইয়াছিল।

উৎসব উপলক্ষে ধর্মসভা, সদালোচনা, কীর্তন ও নানাবিধ আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা এবং আগন্তুক-অভ্যাগত ও সমবেত নরনারায়ণকে উৎকৃষ্ট খাদ্যসামগ্রীর ভূরিভোজনে আপ্যায়িত করিবার সংকল্প গ্রহণ করা হইল। ভোজ্যদ্রব্য নির্বাচন সম্বন্ধে আলোচনা-কালে ভক্তপ্রবর অশ্বিনীকুমার মন্তব্য করিলেন,—'পূর্ববর্তী উৎসবগুলির কোনটিতে অন্নব্যঞ্জন, কোনটিতে খিচুড়ী, কোনটিতে দধি ও চিপিটক ভোগদ্বারা সমাগত নরনারায়ণের সেবা করা হইয়াছে। এ পর্যন্ত কোন বারেই লুচি, তরিতরকারী ও মিষ্টান্ন ভোগের ব্যবস্থা করা হয় নাই। বিশেষ, লুচি-মিষ্টান্নাদি ভোজনের সৌভাগ্য সাধারণ শ্রেণীর জনগণের ভাগ্যে কমই ঘটিয়া থাকে। আমার একান্ত ইচ্ছা, এবার উত্তম গব্য ঘৃতের লুচি, ভাল তরকারী ও

উৎকৃষ্ট মিষ্টদ্রব্য দ্বারা সমাগত অতিথিগণকে উদর পূর্তি করিয়া ভোজন করানো হউক। এই ব্যাপারে স্তূপাকারে লুচি প্রস্তুতপূর্বক লুচির পাহাড় দেখিবার আমার একান্ত সাধ।" অশ্বিনীকুমারের এই প্রস্তাব ইষ্টভ্রাতাগণ সকলে সানন্দে সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করিলেন। সহস্র সহস্র লোকের ভোজ্যদ্রব্য প্রস্তুতকরণ, তাহা পরিবেষণ এবং এই বিরাট উৎসবের অন্যান্য যাবতীয় ব্যাপার যাহাতে সুষ্ঠুরূপে নিষ্পন্ন হয় তজ্জন্য কর্মকর্তাগণ সকলেই যথাপ্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বনে কর্মতৎপর হইলেন।

কর্মিবৃন্দের অদম্য উৎসাহ, অসীম নিষ্ঠা এবং অক্লান্ত শ্রমে উৎসবের বিপুল আয়োজন দ্রুতগতিতে অগ্রসর হইয়া চলিল। দেখিতে দেখিতে কিছুকালের মধ্যেই বহু দিকের নানা কাজকর্ম অনেকাংশে সুসম্পন্ন হইয়া আসিল। উৎসব-অনুষ্ঠানের সংকল্প এবং ইহার প্রস্তুতিপর্বের অগ্রগতির কোন সংবাদই এ পর্যন্ত হিমাইতপুরে ঠাকুরবাড়ীতে জানানো হয় নাই। এইবার উৎসব-সংক্রান্ত যাবতীয় সংবাদ পরিবেষণ, উহার সাফল্যার্থ শ্রীশ্রীঠাকুরের শুভ আশীর্বাদ কামনা এবং এই উপলক্ষে তাঁহার উপস্থিতির জন্য প্রার্থনা নিবেদনের উদ্দেশ্যে কতিপয় সংঘভ্রাতা হিমাইতপুরে আশ্রমে গমন করেন। শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁহাদের মুখে অনুষ্ঠানের সকল ব্যাপার আদ্যন্ত সবিস্তারে অবগত হইলেন।

ইতিপূর্বে শ্রীশ্রীঠাকুর অনেকবারই ভক্তদের উৎসাহ ও আনন্দ বর্ধনের নিমিত্ত তাঁহাদের আয়োজিত অনুষ্ঠানাদিতে সানন্দে যোগদান করিয়াছেন। কিন্তু এবার দেশের জনসাধারণের নিকট তাঁহার প্রশংসা কীর্তন, বিশেষ, তাঁহাকে 'বিশ্বগুরু' বলিয়া প্রচারের যে বিপুল আয়োজন করা হইয়াছে, তাহাতে তিনি অত্যন্ত অসন্তোষ প্রকাশ করিলেন এবং অনুষ্ঠানে যোগদান সম্বন্ধে তাঁহার অসম্মতির কথা স্পষ্ট ভাষায় প্রকাশ করিলেন। আরব্ধ উৎসব সম্পর্কে ভক্তদের সঙ্গে তিনি তৎকালে যে সুদীর্ঘ আলোচনা করিয়াছিলেন, তাহা নিম্নে সংক্ষেপে উল্লেখ করা যাইতেছে। ভক্তদের কথা শুনিয়া শ্রীশ্রীঠাকুর বলিলেন,—'সে কি কথা! আমাকে 'বিশ্বগুরু' 'অবতার' ইত্যাদি বলে প্রচার করা কেন? আমি কি কোন দিন আপনাদের কাছে বলেছি যে, আমি 'বিশ্বগুরু', 'অবতার' ইত্যাদি? আপনারা আমাকে যে 'ঠাকুর' বলেন, তাতেও আমি কত আপত্তি করেছি। তাও আপনারা গ্রাহ্য করেন নি। শেষে ভেবে নিলাম,—লোকে রাঁধুনী বামুনকেও তো 'ঠাকুর' বলে। আমি বরং সে রকমই একজন।......আর, 'বিশ্বগুরু' 'অবতার' ইত্যাদি বলে প্রচার করে লোকের কি বিশেষ উপকার করা হবে? প্রকৃত প্রস্তাবে অবতারাদি সম্বন্ধে লোকের একটা সঠিক ধারণা কিছুই নেই। এ ব্যাপারে সবাই নিজের মনগড়া এক-একটা ধারণা মাত্র পোষণ করে, আর সে রকমটা এখানে দেখতে চায়। তাদের ধারণা অনুযায়ী না হলেই পিছিয়ে যায়। তার চেয়ে যদি একজন উঁচু দরের মানুষ, একজন অনুভূতি-সম্পন্ন লোক, একজন মানব-প্রেমিক,—এরূপ ধারণা নিয়ে কেহ এখানে আসে, তাহলে সে

রকমটা কতকটা মিলিয়ে পায় এবং ক্রমশঃ বাক্যানুসরণ ও চরিত্রানুসরণ করার ফলে বিশেষ উপকৃত হয়। এই রকম গোটা কয়েক লোকও যদি তৈয়ারী হয়, তবে তাদের নিয়ে ঢের কাজ হবে। হুজুগে লোক বেশী আসতে পারে বটে কিন্তু তাদের নিয়ে স্থায়ী রকমের কোন কাজ হয় না। কারণ, তারা পূর্বগঠিত সংস্কারের সাথে সব মিলিয়ে না পাওয়ায় পূর্ণ বিশ্বাসী হয় না, আর ঠিক মত আদেশ পালন করে চলে না। অন্ধ বিশ্বাসী দিয়ে কি কোন মহৎ কাজ হয়? সত্য উপলব্ধিতে খুব বিশ্বাস চাই, জানেন তো সেরূপ বিশ্বাসীর শক্তি অসীম। প্রথম যদি সহৃদয় বন্ধুরূপে—যথাভাবে লোক মিশে, ভালবেসে ফেলে ও তাঁর কথা শুনতে থাকে, তাতে ঐ লোকই ক্রমে উপযুক্ত হয়ে যদি এখানে (নিজেকে নির্দেশ ক'রে) ভগবানত্ব বা অবতারত্ব বলে কিছু থাকে, তবে তা দেখতে পাবে। যেমন অর্জুন শ্রীকৃষ্ণকে বলেছিলেন,—'হে অচ্যুত, আমি তোমায় আগে চিনতে পারিনি। সখা বলে কত ডেকেছি। আমার অপরাধ ক্ষমা কর।' সেও তদ্রূপ বলবে। আর দেখুন, বিশ্বগুরু, অবতার ইত্যাদি গ্রস্ত হওয়া কুষ্ঠব্যাধি গ্রস্ত হওয়া বিশেষ। কুষ্ঠরোগীকে লোক স্পর্শ করে না। 'বিশ্বগুরু' ইত্যাদি হলেও লোকে সেইরূপ সর্বসংকোচ ত্যাগ করে তাঁর সাথে মিশতে পারে না। যতই চেষ্টা করা হোক না কেন, লোকের কেমন একটা সংকোচ ভাব এসেই পড়ে। তাই আমাকে ঐরূপভাবে প্রচার করে আমাকে খুঁতো করে দিবেন না। আমার কাজ করবার পথে একটা বাধা সৃষ্টি করবেন না। আর তা সত্ত্বেও যদি আপনারা তা করেন—আমাকে খুঁতো করে ঠুঁটো জগন্নাথ করে রাখেন, তবে আমার কাজের ভার কিন্তু আপনাদের নিতে হবে, তখন পিছপাও হলে চলবে না।"—

শ্রীশ্রীঠাকুরের সঙ্গে আলোচনায় কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া ভক্তগণ অবশেষে নিতান্ত দুঃখিত অন্তরে তাঁহার চরণে নিবেদন করিলেন,—"ইতিমধ্যে উৎসবের আয়োজন নানাভাবেই যেরূপ দ্রুতগতিতে অগ্রসর হইয়া পড়িয়াছে, তাহাতে এখন ইহা স্থগিত রাখা সম্ভব হবে কি? তদুত্তরে শ্রীশ্রীঠাকুর বলিলেন,—"আমার জন্মোৎসব বলে প্রচার না করে বরং জনসেবার নামে একটা ধর্মোৎসবের মত করুন। তাহাতে অন্নহীনকে অন্ন, বস্ত্রহীনকে বস্ত্র দান করে নরনারায়ণের সেবা করুন। ধর্মসভা, কীর্তন, কথকতা প্রভৃতির ব্যবস্থা করুন। সৎনামের মাহাত্ম্য প্রচার করে মানুষের মনের অজ্ঞান অন্ধকার দূর করুন। ইহাতে আমার আপত্তি নাই, সে তো ভালো কথা, মঙ্গলের কথা, আনন্দের কথা। কিন্তু আমার নামে বা আমার জন্মোৎসব বলে প্রচার করে কোন কিছু করা আমি মোটেই পছন্দ করি না।"

ভক্তগণ এইবার হতাশ হইয়া কুষ্টিয়ায় ফিরিলেন। এখন কি উপায় হইবে, চিন্তা করিয়া সকলে প্রমাদ গণিলেন। নানাস্থানের অসংখ্য লোকের প্রাণপাত পরিশ্রম ও প্রচেষ্টায় বিরাট উৎসবের বিপুল আয়োজন এতদিনে সবই প্রায় সুসম্পন্ন হইয়া আসিয়াছে, দেশের সর্বত্র ব্যাপকভাবে ইহার সংবাদ রাষ্ট্র হইয়া পড়িয়াছে।

এই অবস্থায় যথানির্দ্দিষ্ট দিবসে উৎসবানুষ্ঠান সম্পন্ন না হইলে মহা কেলেঙ্কারীর কথা হইবে। তা ছাড়া অর্থ ক্ষতি ও লোকনিন্দার অবধি থাকিবে না।. গভীর উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা ও দুশ্চিন্তায় সকলের মুখ শুকাইয়া গেল। উপায়ান্তর না দেখিয়া অবশেষে সকলে সমবেতভাবে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন,—শ্রীশ্রীজননী মনোমোহিনী দেবীর চরণে উপস্থিত হইয়া সকল ব্যাপার খোলাখুলি নিবেদন পূর্বক যেরূপেই হউক তাঁহাকে সম্মত করাইতে হইবে। শ্রীশ্রীমা অনুমতি দান করিলে, মাতৃভক্ত ঠাকুর কিছুতেই তাহার অন্যথা করিতে পারিবেন না। ভক্তরা তখন সকলে মিলিয়া হিমাইতপুর যাইয়া সকল ঘটনা শ্রীশ্রীজননী দেবীর চরণে আদ্যন্ত নিবেদন করিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুরের যুক্তি মত শ্রীশ্রীমাও এইভাবে শ্রীশ্রীঠাকুরের নাম প্রচার করার মোটেই অনুমোদন করিলেন না। ভক্তরা ছাড়িবার পাত্র নহেন। তাঁহাদের সনির্বন্ধ কাতর প্রার্থনায়, বিশেষ, উৎসব এইক্ষণ স্থগিত রাখিলে নানাভাবে যে বিপুল অনর্থের সৃষ্টি হইবে,—বর্তমান অবস্থার এই বিশেষ গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া, শ্রীশ্রীমা বাধ্য হইয়াই নির্ধারিত দিবসেই আয়োজিত উৎসব সুসম্পন্ন করার অনুকূলে মত না দিয়া পারিলেন না। শ্রীশ্রীমা কোন গতিকে সম্মতি দিলেন বটে, কিন্তু শ্রীশ্রীঠাকুর তবুও কিছুতেই রাজী হন না। উৎসবে যোগদানের তাঁহার যে আদৌ ইচ্ছা নাই তাহা তিনি সুস্পষ্টভাবেই ব্যক্ত করিলেন। ভক্তরা তখন মনোদুঃখে নিতান্ত ভগ্নব্যাকুলচিত্তে আবার শ্রীশ্রীজননী দেবীর চরণে ধন্না দিলেন এবং গলবস্ত্র হইয়া করজোড়ে তাঁহার চরণে এই প্রার্থনা জানাইলেন—"মা, ঠাকুর না গেলে কি করে হবে? যে ভাবেই হোক তাঁকে রাজী করিয়ে সঙ্গে নিয়ে আপনাকে উৎসবে যোগদান করতেই হবে।" অগত্যা অবস্থাধীনে বাধ্য হইয়া শ্রীশ্রীমা এইবার যাইয়া শ্রীশ্রীঠাকুরকে বিশেষ জোর করিয়াই ধরিয়া বসিলেন। এই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অবস্থায় ভক্তদের মনোবাসনা পূর্ণ করিবার জন্য তিনি শ্রীশ্রীঠাকুরকে নানাভাবে যথেষ্ট অনুরোধ উপরোধ জানাইয়া পীড়াপীড়ি করিলেন। মাতৃদেবীর অনুরোধ ও আব্দার অন্যথা করা শ্রীশ্রীঠাকুরের পক্ষে আর সম্ভব হইল না। অবশেষে তিনি শ্রীশ্রীমাতৃদেবীর সঙ্গে উৎসবে যোগদান করিতে রাজী হইলেন, ভক্তগণ তখন মহোল্লাসে কুষ্টিয়ায় প্রত্যাগমন করিলেন।

উৎসবের পূর্বদিন ২৭শে ভাদ্র শুক্রবার রাত্রি ১১ ঘটিকায় শ্রীশ্রীমা শ্রীশ্রীঠাকুর অনন্ত মহারাজ ও কতিপয় ভক্ত সহ স্টীমার যোগে কুষ্টিয়ায় শুভাগমন করেন। তাঁহাদের অভ্যর্থনার জন্য সেদিন অগণিত ভক্ত নির্দিষ্ট সময়ে ঢাক, ঢোল, খোল, করতাল, শঙ্খ, ঘণ্টা কাঁসরাদি বাদ্যসহ কীর্তন করিতে করিতে স্টীমার ঘাটে উপস্থিত হন। শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীচরণ দর্শনকামী সহস্র সহস্র নরনারীর বিপুল সমাবেশে ঘাটটি সেদিন জনারণ্যে পরিণত হইয়েছিল। স্টীমার হইতে অবতরণ মাত্র শ্রীশ্রীঠাকুরকে প্রণাম করিয়া ধন্য হইবার অধীর আগ্রহে সকলে নদীতীরে অপেক্ষা করিতে ছিলেন। সেদিন স্টীমারের যাত্রী এত অধিক ছিল যে, সকলের

তীরে নামিতে দেড় ঘণ্টারও অধিক সময় লাগিয়াছিল। এদিকে ষ্টীমারটি ঘাটে ভিড়িবামাত্র শ্রীশ্রীঠাকুর সকলের অগোচরে ভিড়ের মধ্যে ত্বরিত পদে নামিয়া পড়েন এবং তাঁহাকে কেহ প্রণাম করিবার পূর্বেই তিনি অপেক্ষমান জনতার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া তাহাদের উদ্দেশ্যে ভূমিষ্ঠ প্রণাম জানান। এই সময় সমবেত জনতার মধ্যে ঠাকুর-প্রণামের ধুম পড়িয়া যায়। রাশি রাশি পুষ্প মাল্যের পূত অর্ঘ্য নিবেদনে সকলে জননীদেবী ও শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীচরণ বন্দনা করিয়া ধন্য হন। এই সময় সমবেত ভক্তবৃন্দ শ্রীশ্রীঠাকুরকে সশ্রদ্ধ সম্বর্ধনা জানাইবার জন্য অগ্রসর হইলে তিনি বলিলেন,—"আমার জন্য ব্যস্ত হইবার কোনই প্রয়োজন নাই। যাহাতে সমাগত অতিথি অভ্যাগতগণকে যথোচিত সেবা যত্নদানে পরিতুষ্ট করিতে পারেন, সেজন্য আপনারা সকলে সমবেতভাবে আপ্রাণ চেষ্টা করুন।"

শ্রীশ্রীঠাকুর জননীদেবী সহ অতঃপর ভক্তদের সঙ্গে উৎসবের নির্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইয়া উৎসব কার্যালয়, সভামণ্ডপ, রন্ধনশালা, ভোজন-আঙ্গিনা, ভাণ্ডারগৃহ প্রভৃতি পরিদর্শন করেন। ভাণ্ডারে সজ্জিত প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড তৈলের পিপা হইতে কি ভাবে নলের সাহায্যে পাকশালার বড় বড় কটাহে প্রয়োজন মত তৈল সরবরাহ করা হইবে, রেলের লাইন পাতিয়া তাহার উপর ট্রলিতে করিয়া খাদ্যসামগ্রী বহন করিয়া কিভাবে তাহা লোকের পাতে পরিবেশণ করা হইবে, বৈদ্যুতিক আলোর সাহায্যে সমগ্র উৎসব ক্ষেত্রটি উজ্জ্বলরূপে আলোকিত করিবার যে ব্যবস্থা করা হইয়াছে, আগন্তুকগণের বাসস্থানের এবং তাহাদের আহারাদির যেরূপ আয়োজন করা হইয়াছে ইত্যাদি সমুদয় বিষয় উৎসবের কর্মকর্তাগণ শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীশ্রীমার চরণে বিশেষভাবে নিবেদন করেন। তাঁহারা সমুদয় দেখিয়া শুনিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হন। শ্রীশ্রীঠাকুর অতঃপর কর্মকর্তাদের সকলকে ডাকিয়া বিশেষভাবে বলিলেন,—"দেখুন আগন্তুকগণের সর্বপ্রকার সুখ-সুবিধার প্রতি তীক্ষ্ণ নজর রাখবেন, কারুর সেবা যত্নের যেন বিন্দুমাত্র ত্রুটি না হয়। একটি লোকও যেন কোথায়ও অভুক্ত না থাকে, বা কেহ যেন স্থানাভাবে কষ্ট না পায়। সকলের সশ্রদ্ধ সেবায় আপনারা ধন্য হউন। পরম পিতা আপনাদের মঙ্গল করুন।" কর্মীগণের সহিত আলাপ-আলোচনাদির পর শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীশ্রীমা বিশ্রাম গ্রহণের জন্য উকীল প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের গৃহে গমন করেন। উৎসব-প্রাঙ্গণে শ্রীশ্রীঠাকুরের শুভ পদার্পণ ইহাই প্রথম এবং ইহাই শেষ। উৎসবানুষ্ঠানের কয়েকদিন শ্রীশ্রীঠাকুর কখনো প্রফুল্ল রায়ের কখনো বা অশ্বিনীকুমার বিশ্বাসের বাড়ীতে অবস্থান করিয়া ছিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর দর্শনের জন্য তাঁহার আবাস ভবনে প্রত্যহ রাত্রিদিন অসংখ্য লোকের ভিড় হইত। নানা জনে নানা প্রশ্ন লইয়া তাঁহার চরণে উপস্থিত হইতেন এবং তাঁহার শ্রীমুখের অমিয় মধুর ভাষণে সকল সমস্যার সহজ সরল সমাধান পাইয়া কৃতার্থ হইতেন।

উৎসবে যোগদানের জন্য নানাস্থান হইতে ট্রেনে ষ্টীমারে, ঘোড়ার গাড়ীতে,

গরুর গাড়ীতে, নৌকায় পদব্রজে পঙ্গপালের মত এত অসংখ্য লোক আসিয়া জড় হইয়াছিল যে, সারা কুষ্টিয়া সহরে, তিল ধারণের স্থান ছিল না। বলিতে কি সেই বিরাট সমারোহের কথা কল্পনায় কেহ ভাবিতে পারে নাই। স্ত্রী পুরুষ, যুবা বৃদ্ধ কত দেশের কত লোক যে সমবেত হইয়াছিল তাহার সংখ্যা করা অসম্ভব ছিল। উচ্চ নীচ, শিক্ষিত অশিক্ষিত, 'সংসারী সন্ন্যাসী, ধনী দরিদ্র জাতিবর্ণ' নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর সহস্র সহস্র নরনারীর সে এক অপূর্ব মহাসম্মেলন! কুষ্টিয়ার মত ক্ষুদ্র সহরে হঠাৎ এক সঙ্গে এরূপ বিপুল জনসমাবেশের ফলে অবস্থা পরিশেষে এমন দাঁড়াইয়াছিল যে, কুষ্টিয়ার বাজারে কয়েকদিন কোথাও খাদ্য-সামগ্রী কিছুই পাওয়া যায় নাই।

উৎসবের পূর্বদিন ২৭শে ভাদ্র রাত্রিতেই দেখা গেল, যে পরিমাণ লোকসমাগম অনুমান করা গিয়াছিল, আগন্তুকের সংখ্যা তাহার দশ গুণ অধিক। এই অবস্থায়ও যাহাতে কেহ কোথায়ও অভুক্ত না থাকে, সেজন্য কর্মকর্তাগণ আপ্রাণ কর্মতৎপর ছিলেন। স্বেচ্ছাসেবকগণ সহরের সর্বত্র ঘুরিয়া আগন্তুক সবাইকে খুঁজিয়া আনিয়া যত্নসহকারে আহার করাইয়াছিলেন। এবং তাহাদের বিশ্রামের যথাযথ ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন। দূরদেশ হইতে বিশিষ্ট ভদ্রলোক ও মহিলাদের আহার্য তাঁহাদের জন্য নির্দিষ্ট বাসস্থানে পৌঁছাইয়া দিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। ২৮শে ভাদ্র সকাল হইতে ২৯শে ভাদ্র রাত্রি পর্যন্ত নির্ধারিত কর্মসূচী অনুযায়ী উৎসবের যাবতীয় অনুষ্ঠান সুষ্ঠুরূপে সম্পন্ন হইয়াছিল। উৎসবের উভয় দিন পত্র-পুষ্পমালা পতাকা-সজ্জিত বৈদ্যুতিক আলোকমালা শোভিত বিরাট সভামণ্ডপে দেশের বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের বক্তৃতা, আলোচনা ও কথকতায় নানাদেশাগত ধর্মপিপাসু ও তত্ত্বজিজ্ঞাসু অসংখ্য নরনারীর চিত্ত বিনোদন করা হইয়াছিল; উৎসব-প্রাঙ্গণে সহস্র সহস্র লোকের অহোরাত্র তুমুল কীর্তন চলিয়াছিল, অগণিত দীন-দুঃস্থকে অর্থ, বস্ত্র ও তণ্ডুলাদি দানে প্রভূত সাহায্য দান করা হইয়াছিল; সুবৃহৎ রন্ধনশালায় সহস্র সহস্র লোকের ভোজ্যদ্রব্য প্রস্তুতের বিরাট আয়োজন চলিয়াছিল; ভাণ্ডারগৃহে উত্তম গব্যঘৃতপক্ক পর্বত-প্রমাণ স্তূপীকৃত লুচি এবং অসংখ্য বৃহদাকার ভাণ্ডে বহু প্রকারের ডাল-তরকারী এবং নানা জাতীয় উৎকৃষ্ট মিষ্টদ্রব্যাদি পর্যাপ্তরূপে সজ্জিত রাখা হইয়াছিল; সুবিস্তৃত ভোজন প্রাঙ্গণে এবং রাস্তায় কাতারে কাতারে লোকজন আহারে বসিয়াছিল আর রেললাইনের ট্রলির সাহায্যে খাদ্যসামগ্রী আনিয়া সযত্নে পরিবেষণ পূর্বক প্রতি বেলা দশ সহস্রেরও অধিক লোককে ভূরিভোজনে পরিতৃপ্ত করা হইয়াছিল, আর এই সমুদয় কল্পনাতীত অত্যদ্ভুত কাণ্ডকারখানার—এই বিরাট রাজসূয় যজ্ঞের যাবতীয় ব্যাপার সর্বাঙ্গসুন্দররূপে সম্পন্ন হইয়াছিল, স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবক যুবকবৃন্দের অপরিসীম কর্মতৎপরতায়, এককথায় বলিতে গেলে বলিতে হয়—এ হেন ব্যাপার 'ন ভূতঃ ন ভবিষ্যতি'। বস্তুতই কুষ্টিয়ার

'শ্রীশ্রীবিশ্বগুরু মহামহোৎসব' সৎসঙ্গের ইতিহাসে এক চির অবিস্মরণীয় কীর্তি এবং তৎস্থানীয় লোকের কাছে সর্বকালের 'কিংবদন্তী' হইয়া রহিল।

উৎসবানুষ্ঠানের কথা যাহা বলিতেছিলাম,—উৎসবের উভয় দিনই বৃষ্টির দরুণ নানা অসুবিধার সৃষ্টি হইয়াছিল, প্রথমদিনের বারিপাতে খাদ্য পরিবেষণ ব্যাপারে কিছুটা বিঘ্ন ঘটিলেও, কর্মকর্তাদের সময়োচিত যথোপযুক্ত কর্মতৎপরতায় বেশ শৃঙ্খলার সঙ্গেই সমুদয় ব্যাপার নিষ্পন্ন হইয়াছিল। কিন্তু দ্বিতীয় দিবস মুষলধারে বৃষ্টিপাত হওয়ায় ভোজন-প্রাঙ্গণটি এমন কর্দমাক্ত হইয়া পড়ে যে, সেখানে লোকজন বসাইয়া খাওয়ানো সম্পূর্ণ অসম্ভব হইয়া উঠে। এই মহাসংকটাবস্থায় স্থানীয় সকল হিন্দু ও মুসলমান ব্যবসায়ী স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া নিজেদের গদি, দোকান ও বসতবাড়ীর গৃহাদিতে আগন্তুকগণের খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করিয়া দেন। যাহাতে কোথায়ও কাহারও খাদ্য পানীয়াদি পাইতে কোন অসুবিধা না হয়, সেজন্য সহর ও বাজারের বিভিন্ন অঞ্চলে কতকগুলি অন্নসত্র খুলিয়া দেওয়া হয়। এইভাবে নানাস্থানে খাদ্য যোগান দেওয়ার কেন্দ্র স্থাপন করতঃ সকলকে গভীর রাত্রি পর্যন্ত ভোজন করানো হয়। স্বেচ্ছাসেবকগণ সারা সহরে প্রতি লোকের বাড়ীতে ও প্রতি রাস্তার মোড়ে খোঁজ করিয়া আগন্তুকদের সন্ধান লইয়া সকলকে যত্ন সহকারে আহার করাইয়াছিলেন। সারা কুষ্টিয়া সহরটিই সেদিন নর-নারায়ণ সেবা-মহা-মহোৎসবের আনন্দ কোলাহলে মুখরিত হইয়া উঠিয়াছিল।

এই সুযোগে উপরি বর্ণিত বারিপাত প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীমুখনিঃসৃত একটি উক্তির উল্লেখ না করিয়া পারিলাম না। সেদিনের প্রবল বর্ষণে উৎসবকার্যে নানা বিঘ্ন ঘটিল, বিপন্ন ভক্তবৃন্দ বিশেষ চিন্তাকুল হইয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের চরণে বৃষ্টি-রোধের জন্য অশ্রুসিক্ত নয়নে কাতর প্রার্থনা নিবেদন করেন। শ্রীশ্রীঠাকুর তাহাতে সহাস্য-বদনে তাহাদিগকে বলিলেন,—"প্রকৃতির তো কোন কোপ নেই কারুর উপর। বৃষ্টির সময় তো বৃষ্টি হবেই। তার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা করুন, নিজেদের ক্ষমতা বাড়ান। আর আমি তো দেখছি,—এতে ভালোই হচ্ছে। এত লোক এক জায়গায় জড় হয়েছে যে, এরূপ ভাবে বৃষ্টি না হলে বাহ্য প্রস্রাবের দুর্গন্ধে হাওয়া দূষিত হয়ে উঠতো। প্রকৃতি আপনাদের সাহায্যই করেছে।"

এইবার আমরা উক্ত উৎসবানুষ্ঠানের অন্যতম আহ্বায়ক ও প্রধান কর্মকর্তা স্বর্গত সৎসঙ্গ সভাপতি সুশীলচন্দ্র বসু এবং কুষ্টিয়া নিবাসী স্বর্গত প্রবীণ ভক্ত গোপালচন্দ্র কর্মকার প্রদত্ত দুইটি সংক্ষিপ্ত বিবৃতির উল্লেখ করিয়া বর্তমান প্রসঙ্গের আলোচনা সমাপ্ত করিব।

শ্রদ্ধেয় ৺সুশীলচন্দ্র বসু লিখিয়াছেন—"১৩২৫ বঙ্গাব্দের জ্যৈষ্ঠ আষাঢ় মাসের কথা। আশ্রম হইতে কুষ্টিয়ায় গিয়াছি। অশ্বিনীদা, বীরুদা, ডাঃ গোকুলবাবু প্রভৃতি স্থানীয় প্রবীণ ভক্তদের সঙ্গে দেশের মধ্যে শ্রীশ্রীঠাকুরের মহিমার ব্যাপক প্রচারের উদ্দেশ্যে একটি বিরাট উৎসব করা সম্বন্ধে আমার

বিস্তারিত আলোচনা হয়। এখন হইতেই উৎসবটিকে সর্বাঙ্গসুন্দরভাবে সাফল্য মণ্ডিত করিবার জন্য সকলে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া যান। ১৩২৫ সনের ২৮শে ও ২৯শে ভাদ্র তারিখে কুষ্টিয়া সহরে বিরাটভাবে এই উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছিল! "শ্রীশ্রীবিশ্বগুরু আবির্ভাব মহামহোৎসব" নামে ইহা চির প্রসিদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। এই উৎসবে এত অধিক লোক সমাগম হইয়াছিল যে, বহু পূর্ব হইতেই যথেষ্ট পরিমাণ আয়োজনাদি করা সত্ত্বেও অনেক বিষয়েই ঈপ্সিত রূপ যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করিয়া উঠিতে পারা যায় নাই। এই উপলক্ষে স্থানীয় মারোয়ারী ও বাঙ্গালী ব্যবসায়ীগণ অনেকেই স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া বিশেষ দায়িত্ব গ্রহণপূর্বক বহু লোকের বাসস্থান ও আহারাদির সুব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন। উৎসবের কয়েকদিন সহরের বিভিন্ন পল্লীতে বহু অন্নসত্র খোলা হইয়াছিল। সমবেত অসংখ্য নর-নারীর অসম্ভব ভিড় এবং নানা আয়োজন অনুষ্ঠানের প্রাচুর্যে সারা কুষ্টিয়া সহর টলটলায়মান হইয়া উঠিয়াছিল।

কলিকাতার সর্বত্র প্রচারিত প্রাচীর পত্রে উৎসবের সংবাদ পাইয়া বহু লোক তথা হইতে কুষ্ঠিয়ায় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যারিস্টার বিখ্যাত ভূপ্রদক্ষিণকারী চন্দ্রশেখর সেন মহাশয়ের পুত্র সুলেখক শাক্যসিংহ সেন বি. এ. মহাশয়ও এই অনুষ্ঠানে যোগদান করিয়াছিলেন। আমার উপর সমাগত বিশিষ্ট অতিথিগণের অভ্যর্থনার ভার অর্পিত ছিল। মনে পড়ে, শ্রীসেন মহাশয় তখন আমাকে বলিয়াছিলেন—

"I have come as a representative on behalf of the prominent men of Calcutta to know all about Viswa Guru."

কি তাঁর মতবাদ কি তিনি করতে চান, বিশ্বগুরুকে দেখে আমার কি ধারণা হয়, এটা জানবার জন্য কলিকাতার গণ্যমান্য অনেকেই উদগ্রীব হইয়া আছেন।" এই সময় শ্রীশ্রীঠাকুরের সহিত শাক্যসিংহ সেন মহাশয়ের নানা বিষয়ের গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হইয়াছিল। শ্রীশ্রীঠাকুরের উদার ভাবরাজি ও অপূর্ব ব্যক্তিত্বে মুগ্ধ হইয়া তিনি শ্রীশ্রীঠাকুরের চরণে সৎনামে দীক্ষিত হইয়াছিলেন।

পরমভক্ত স্বর্গত গোপালচন্দ্র কর্মকার বলিয়াছেন—

"একদিন ডাঃ গোকুলচন্দ্র মণ্ডল, অশ্বিনী বিশ্বাস, সত্য দত্ত, বীরু রায় প্রভৃতি সৎসঙ্গ অধিবেশন কেন্দ্রে বসিয়া প্রার্থনাদির পর কুষ্টিয়ায় একটি বড় রকমের উৎসব করিবার প্রস্তাব করেন। স্থির হইল স্থানীয় ও নিকটবর্তী সকল গুরুভাইদের ডাকিয়া এ বিষয়ে পরামর্শ করিতে হইবে। তারপর চারিদিকের বিশিষ্ট ভাইদের সংবাদ দেওয়া হইল। ডাঃ গোকুলচন্দ্র মণ্ডল, যোগেন্দ্রনাথ সরকার প্রধান শিক্ষক, উকীল হরিশ্চন্দ্র রায়, উকীল প্রফুল্লচন্দ্র রায়, উকীল পূর্ণচন্দ্র সাহা, ডাঃ যতীন রায়, মোক্তার অশ্বিনীকুমার বিশ্বাস, মোক্তার বীরেন্দ্রনাথ রায়, ডাঃ সত্য দত্ত, ব্যবসায়ী কৃষ্ণলাল রায় চৌধুরী ও প্রিয়লাল রায় চৌধুরী, গোপালচন্দ্র কর্মকার, খোকা ডাক্তার, পূর্ণ অধিকারী, শ্রীশচন্দ্র নন্দী,

গিরীন্দ্রমোহন বিশ্বাস প্রভৃতি স্থানীয় প্রধান ইষ্ট ভ্রাতাগণ সকলে মিলিয়া এ বিষয়ে আলোচনা করিলেন। অশ্বিনী বিশ্বাস প্রস্তাব তুলিয়া বলিলেন—"এমন উৎসব করতে হবে যেন সকল মানুষ দেখে তাক লেগে যায়। নারীদের নিমন্ত্রণ করতে হবে। কাউকে বাদ দেওয়া হবে না।"

কুষ্টিয়া রেল স্টেশনের সম্মুখে দক্ষিণ দিকে রুস্তমবালী খাঁর আড়ত বাড়ীতে উৎসবের স্থান নির্দিষ্ট হইল। বিরাট উৎসব হইল। নানা দেশের সহস্র লোকের সে এক বিরাট সমারোহ! উৎসবের কয়দিন সারা কুষ্টিয়া সহরে টলটলায়মান অবস্থা। সে এক অভাবনীয় ব্যাপার! এই 'মহামহোৎসবের' কথা কেহ কোন দিন ভুলিতে পারিবে না।"

কুষ্টিয়ায়, ডি. এস্. পি. প্রসঙ্গ

সেটা ছিল রাজনৈতিক যুগ, বাংলার সেই চিরস্মরণীয় স্বদেশী আন্দোলনের যুগ। শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের কীর্তন-বন্যায় তখন সমগ্র কুষ্টিয়া অঞ্চল পরিপ্লাবিত। শিক্ষক, উকীল, মোক্তার, ডাক্তার, সরকারী কর্মচারী, ব্যবসায়ী প্রভৃতি সহরের গণ্যমান্য বহু ব্যক্তি এবং নানা শ্রেণীর অসংখ্য নরনারী তখন শ্রীশ্রীঠাকুরের অপূর্ব প্রেম ও অসাধারণ ব্যক্তিত্বে আকৃষ্ট হইয়া সৎনামে দীক্ষা গ্রহণ করিয়া ধন্য হইতেছেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের কুষ্টিয়ার ভক্তগণের মধ্যে কতিপয় বিশিষ্ট ব্যক্তিকে পুলিশ বিশেষ সন্দেহের চক্ষে দেখিত এবং তাহাদিগকে রাজদ্রোহের অপরাধী বলিয়া গণ্য করিত। মোক্তার অশ্বিনীকুমার বিশ্বাস ও মোক্তার বীরেন্দ্রনাথ রায় উভয়েই ছিলেন তৎকালে কুষ্টিয়ায় বিপ্লবীদলের নেতা ও নামজাদা স্বদেশী পাণ্ডা। ইঁহাদের গতিবিধির উপর পুলিশ সর্বক্ষণ সতর্ক দৃষ্টি রাখিয়া চলিত। তাঁহারা হামেশাই শ্রীশ্রীঠাকুরের সঙ্গ করেন বলিয়া, পুলিশের শ্রীশ্রীঠাকুর এবং তাঁহার কীর্তনদলের উপর মোটেই সুনজর ছিল না। সেকারণ, শ্রীশ্রীঠাকুরের দরবারে এবং কীর্তন-আসরে পুলিশ কনষ্টেবল মোতায়েন থাকিত। পুলিশ স্থির করিয়াছিল, রাজদ্রোহের অপরাধে শ্রীশ্রীঠাকুরের কীর্তনদলটি ভাঙ্গিয়া দিবে এবং তাঁহার সৎনাম প্রচারের আন্দোলনে বাধা দিবে। পুলিশ অনেক দিন হইতে এই বিষয়ে বিশেষ গুরুত্ব দিয়া অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে চলিতে লাগিল।

অবশেষে কুষ্টিয়ার ডি. এস্. পি. নিজেই একদিন (১৩২৩ বঙ্গাব্দের ২১শে পৌষ) উকীল শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায়ের বাড়ীতে শ্রীশ্রীঠাকুরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে উপস্থিত হইলেন। এবং এ সম্বন্ধে কথা তুলিয়া বলিলেন,—"দেখুন, আপনাকে তো অতি সজ্জন মহান ব্যক্তি বলিয়াই জানি, আপনার প্রতি আমাদের খুবই ভক্তি-বিশ্বাস আছে, কিন্তু যারা আপনার কাছে যাতায়াত করে তাদের মধ্যে কিন্তু জন-কয়েক political suspect—সন্দেহভাজন ব্যক্তিও আছে। আমাদের বিবেচনায় তাঁদের আপনার সঙ্গে মেলামেশা করতে দেওয়া উচিত নয়। পুলিশ সন্দেহ করতে পারে, তাদের অনুসৃত নীতি আপনিও সমর্থন করেন।

ডি. এস্. পি. মহাশয়ের কথার উত্তরে শ্রীশ্রীঠাকুর বিনীতভাবে বলিলেন,—"দেখুন দাদা, আমার কাছে তো নিত্যই কত লোক যাতায়াত করে, তাদের মধ্যে কে যে আপনাদের সন্দেহের পাত্র, তা আমি জানব কি করে? আর জানতে পারলেও আমাকে ভালবেসে যদি কেউ আমার কাছে আসে, একটু কথাবার্তা বলে, তাদের আমি—'এখান থেকে চলে যাও বা এখানে আর এসো না' বলে তাড়িয়ে দেবো কি করে, তা যে আমি পারি না দাদা। তাতে যা হয় আমার ভাগ্যে তা হোক। সেদিনের কথাবার্তার পর ডি. এস্. পি. মহাশয় বিদায় হইলেন।

পুলিশ তদবধি শ্রীশ্রীঠাকুর ও তাঁহার কীর্তনদলের উপর আরও কঠোর সতর্ক দৃষ্টি রাখিয়া চলিতে লাগিল। কিন্তু শ্রীশ্রীঠাকুরের আলাপ-আলোচনা ও কার্যকলাপ তাহারা যতই পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার-বিবেচনা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করিয়া দেখিল, তাঁহার অপূর্ব প্রেম-প্রীতি, দয়া-মমতা, সরলতা ও সততা প্রভৃতি অনুপম চরিত্র মাহাত্ম্যের অত্যুজ্জ্বল পরিচয় পাইয়া তাহারা মুগ্ধ হইল। সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের উপর দীর্ঘদিন ধরিয়া তীক্ষ্ণ নজর রাখিয়াও, তাহাদের চরিত্র সম্বন্ধেও তাহারা সম্পূর্ণ নিঃসন্দেহ হইল এবং ইহাও বুঝিতে পারিল যে, শ্রীশ্রীঠাকুরের মত প্রেমিক চরিত্রের সংস্পর্শ লাভেই তাহাদের জীবন-চলনায় এরূপ অদ্ভুত পরিবর্তন সম্ভব হইয়াছে। পুলিশ তখন সন্দেহভাজন ব্যক্তির নামের তালিকা হইতে অশ্বিনীকুমার ও বীরেন্দ্রনাথের নাম কাটিয়া দিল। কালক্রমে এমন হইল যে, স্থানীয় পুলিশ বিভাগের লোকেরা নিজেরাই শ্রীশ্রীঠাকুরের গুণমুগ্ধ হইয়া তাঁহার অপার মহিমার কথা জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করিতে লাগিল এবং তাহারা অনেকেই সৎনামে দীক্ষা গ্রহণ করিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরকে শ্রীশ্রীগুরুপদে বরণ করিয়া ধন্য হইল।

শ্রীশ্রীঠাকুরের অপূর্ব যীশুপ্রেম

শ্রীশ্রীঠাকুরের কুষ্টিয়ায় অবস্থানকালে জ্ঞানচন্দ্র বিশ্বাস নামক জনৈক ভক্তিমান পাদরী প্রায়শই তাঁহার সঙ্গ করিতে আসিতেন। উভয়ের মধ্যে অধ্যাত্ম বিষয়ে নানা আলাপ-আলোচনা চলিত। শ্রীশ্রীঠাকুরের উদার মতবাদ এবং তাঁহার প্রেমিক চরিত্রে মুগ্ধ হইয়া জ্ঞানবাবু তাঁহাকে সাতিশয় শ্রদ্ধাভক্তি করিতেন। শ্রীশ্রীঠাকুরকে সনির্বন্ধ অনুরোধে রাজী করাইয়া একদিন জ্ঞানবাবু তাঁহাকে তাঁহাদের গির্জায় প্রার্থনা সভায় যোগদানের জন্য লইয়া গিয়াছিলেন। তখন এক আশ্চর্য ব্যাপার ঘটিল। গির্জার প্রাঙ্গণে প্রবেশমাত্র শ্রীশ্রীঠাকুরের ভাবান্তর উপস্থিত হইল। স্থির নিস্পন্দ অপলক দৃষ্টিতে তিনি কিছুক্ষণ গির্জার দিকে তাকাইয়া থাকিয়া হঠাৎ ভাববিহ্বল অবস্থায় মাটিতে পড়িয়া গেলেন এবং তাঁহার শ্রীমুখে 'প্রভুযীশু', 'প্রভুযীশু', 'প্রভুযীশু'—এই কথা কয়টি বারংবার উচ্চারিত হইতে লাগিল আর তিনি দীর্ঘ সময় ধরিয়া সেখানে গড়াগড়ি যাইতে লাগিলেন। এই অপূর্ব মহাভাব দর্শনে জ্ঞানবাবু এবং তথায় উপস্থিত অন্যান্য যীশুভক্তগণ সকলেই

অতীব চমৎকৃত ও মুগ্ধ হইলেন এবং যীশুগতপ্রাণ শ্রীশ্রীঠাকুরের চরণে আন্তরিক শ্রদ্ধা নিবেদনে ধন্য হইলেন।

অন্য একদিন কুষ্টিয়ায় (ইং ১৯১৭, ১২ই ফেব্রুয়ারী) শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীমুখোচ্চারিত যীশুপ্রেমের বাণীগুলি শুনিয়া কীর্তনে উপস্থিত জ্ঞানবাবু ও অন্যান্য যীশুভক্তরা শ্রীশ্রীঠাকুরের অপূর্ব যীশুপ্রেমের পরিচয় পাইয়া বিস্মিত হইলেন এবং তাঁহার শ্রীপদে প্রণতি জানাইয়া নিজেদের ধন্য মনে করিলেন। সেদিনের (একচত্বারিংশৎ ভাবসমাধি দিবসের) বাণীগুলি যথা :—

"প্রেম, প্রেম, প্রেম। দুঃখ, দৈন্য, কষ্ট যা কিছু আছে সব মুছে যাক্, রক্তস্রাব বন্ধ হোক্ বলুক প্রেম প্রেম।··· ···শক্ত বিশ্বাস চাই, নইলে কি হয়? ভালবাসাই জীবন ভাই।··· যীশু অকলঙ্ক চরিত্র, তোমরা যীশুর পূজা করবে না ভাই?··· ।"

কুষ্টিয়া-কেন্দ্রিক প্রচারকার্য

সে যুগে কুষ্টিয়া অঞ্চলে নাম প্রচারের কথা শ্রীশ্রীঠাকুরের নির্দেশে তাঁহার অন্তরঙ্গ পার্ষদ গোস্বামী সতীশচন্দ্র ও ডাক্তার কিশোরীমোহন প্রত্যেকে কখনো একাকী, কখনো বা উভয়ে একসঙ্গে কীর্তনের দল লইয়া পরিভ্রমণ করতঃ পল্লীবাসীর দ্বারে দ্বারে যাইয়া জাতিবর্ণ নির্বিশেষে আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলকে সত্যনাম বিতরণ করিতেন। তাঁহাদের প্রাণোন্মাদী কীর্তনে আকৃষ্ট ও সার্থক যাজনে উদ্বুদ্ধ হইয়া তৎকালে কত স্থানের কত অগণিত নরনারী যে সৎমন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিল, তাহার সীমা-সংখ্যা নাই। ইঁহারা দীর্ঘকাল ধরিয়া অসীম ধৈর্য ও নিষ্ঠার সঙ্গে প্রাণপাত পরিশ্রমে যে সমুদয় অসংখ্য গ্রামাঞ্চলে ঘুরিয়া নাম প্রচার করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে নদীয়া জেলার জগতি, চোরহাঁস, বারখাদা, তালবাড়িয়া, ঘোড়ামারা, চড়াইকোল, কুমারখালি, খোক্সা-জানিপুর, বরৈচারা, আমলাবাড়িয়া, মাচপাড়া, ব্রহ্মপুর, গোপালপুর, দুধকুমড়া, হরিনারায়ণপুর, বাড়াদি, খাকিলপুর, ধুশুড়ু, কণ্ঠগজরা, রাতুলপাড়া, কমলাপুর, ধলহরাচন্দ্র ; ফরিদপুরের মধ্যপুর, পাংশা, বেলগাছী, রাজবাড়ী ; যশোহর জিলার শৈলকুপা, ঝিনাইদহ, কালিয়াগঞ্জ প্রভৃতি স্থান সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। তৎকালে কুষ্টিয়াকে কেন্দ্র করিয়া নদীয়া, ফরিদপুর যশোহর, খুলনা প্রভৃতি বিভিন্ন জেলার বহুস্থানে ব্যাপকভাবে প্রচারকার্য চলিয়াছিল।

কুষ্টিয়া অঞ্চলে নাম প্রচার কালে শ্রীশ্রীঠাকুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ ও কীর্তনদল সহ পরিভ্রমণ করার কালে যে যে স্থান তাঁহার পুণ্য পদরজঃস্পর্শে ধন্য হইয়াছিল তন্মধ্যে বাড়াদি গ্রামে উপেন্দ্রনাথ ও হরিপদ সাহার, বরৈচরার সতীশচন্দ্র ও রাধারমণ জোয়ারদারের, কণ্ঠগজরার সীতানাথ ঘোষের, ধলহরাচন্দ্র গ্রামের যোগেন্দ্রনাথ চৌধুরীর, খোক্সা জানিপুরের পূর্ণচন্দ্র সাহা ও যতীন রায়ের, রাতুলপাড়ার যোগেন্দ্রনাথ ও শ্রীকান্ত সরকারের, কমলাপুরের সুরেন্দ্র বিশ্বাসের,

আমলাবাড়ীর ললিত বসুর, খলিলপুরের অতুল ভট্টাচার্যের, মদাপুরের শরচ্চন্দ্র ঘোষের, ধুশুড়ুতে দীননাথ নন্দীর, বারখাদার প্রিয়নাথ বসুর, সমসপুরের আশুতোষ ঘোষের বাসভবন বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বর্তমান অধ্যায়ের প্রারম্ভে বাড়াদি গ্রামের উপেন্দ্রনাথ সাহার এবং ইতিপূর্বে গ্রন্থের প্রথম দিকে দ্বাদশ অধ্যায়ে ঐ গ্রামের হরিপদ সাহার ও রাতুলপাড়ার যোগেন্দ্রনাথ সরকারের বাড়ীর কীর্তনবৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। এইবার আমরা উপরিউক্ত বরৈচারা, কণ্ঠগজরা, ধলহরাচন্দ্র ও মদাপুরের কীর্তন-কথা কিঞ্চিৎ বিবৃতি করিব।

বরৈচারায়

প্রবীণ ইষ্টভ্রাতা শ্রদ্ধেয় রাধারমণ জোয়ারদার মহাশয় বরৈচারার কীর্তনবৃত্তান্ত নিম্নোক্তরূপ বিবৃত করিয়াছেন ঃ—

"১৩২৩ সনের ২৭শে চৈত্র। শ্রীশ্রীঠাকুর তখন কুষ্টিয়ায়। আমাদের বরৈচারার বাড়ীতে তাঁহার যাওয়ার কথা হইল। ঐ দিন প্রাতে ৯টার ট্রেনে শ্রীশ্রীঠাকুর, অশ্বিনীকুমার বিশ্বাস, বীরেন্দ্রনাথ রায়, কিশোরীমোহন দাস, সতীশচন্দ্র গোস্বামী, মহারাজ অনন্তনাথ রায় এবং কুষ্টিয়ার কয়েকজন গণ্যমান্য উকীল, মোক্তার, ডাক্তার, ব্যবসায়ী প্রভৃতি প্রায় ৫০।৬০ জনকে লইয়া আমি, আমার বড়দা সতীশচন্দ্র জোয়ারদার ও আমার স্ত্রী বরৈচারা রওনা হইলাম। খোক্সা স্টেশনে পৌঁছিবার পর স্থির হইল যে শ্রীশ্রীঠাকুর কয়েকজনকে সঙ্গে লইয়া পথে সমস্পুর গ্রামে আশুতোষ ঘোষের বাড়ী হইয়া আমাদের বাড়ী যাইবেন। এদিকে আমরা অন্যান্য সকলে বরৈচারা যাত্রা করিলাম এবং বেলা প্রায় ১২টার সময় বাড়ী পৌঁছিলাম।

আমার মেজদা তখন সপরিবারে বাড়ীতে থাকেন। শ্রীশ্রীঠাকুর ভক্তবৃন্দ সহ আমাদের বাড়ীতে আসিতেছেন শুনিয়াই তিনি ভয়ানক ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন,—"এতগুলি ভক্তের সঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর যে আমাদের বাড়ী আসছেন, সে তো খুবই সৌভাগ্যের কথা, কিন্তু পূর্বে কোন সংবাদ না দিয়ে তাঁকে এমনভাবে আনবার কারণ কি? এখন আমি এঁদের কি ভাবে সমাদর করব? একে তো পাড়াগাঁ, হাট ছাড়া কিছু পাওয়া যায় না, খোক্সা-জানিপুরের বাজারও ৫।৬ মাইল দূরে, এমন অসময়ে আমি কি উপায় করি?"

মেজদা আমাকে অনুযোগ দিতেছেন এমন সময় শ্রীশ্রীঠাকুর ভক্তবৃন্দ সহ কীর্তন করিতে করিতে আমাদের বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। শ্রীশ্রীঠাকুরকে দর্শন করিয়াই মেজদা একেবারে শান্ত হইয়া পড়িলেন। আমি মেজদাকে বলিলাম,—"কোন চিন্তা করবেন না। দয়াল যখন স্বয়ং উপস্থিত আছেন, তখন তাঁহার ভোগরাগ এবং উপস্থিত ভদ্রলোকদের প্রসাদ পাওয়ার ব্যাঘাত ঘটবার কোন আশঙ্কার কারণ নাই। তিনিই দয়া করে আমাদের মান রক্ষা করবেন। আপনি নিশ্চিন্ত মনে কীর্তনে যোগ দিন। আমি মেজবৌদির সঙ্গে পরামর্শ করে সব-কিছুর ব্যবস্থা করছি।"

অতঃপর মেজবৌদির সঙ্গে আলাপ করিলে তিনি বলিলেন,—"চাউল, দাইল প্রভৃতির কোন অভাব হবে না। তরিতরকারী এবং ভদ্রলোকদের আহারের উপযোগী দই দুধ মিষ্টি প্রভৃতি কিছুই ঘরে নাই।" আমি বলিলাম,—"ঘরে যা আছে, তাই দিয়ে কাজ আরম্ভ করুন, দয়ালের চরণে প্রার্থনা জানিয়ে কাজে লেগে যান, তারপর তাঁর ইচ্ছায় যা হবার হবে।"

এদিকে বাহির বাড়ীতে পূজামণ্ডপে কীর্তন আরম্ভ হইয়াছে। গ্রামের বহু লোক আসিয়া কীর্তনে যোগ দিয়াছেন। মহারাজ, গোঁসাইবাবা ও কিশোরীদা তিনজনে মিলিয়া প্রচণ্ড বিক্রমে কীর্তন পরিচালনা করিতেছেন। অনেকেই বাহ্যজ্ঞান রহিত হইয়া তাণ্ডবনৃত্যে কীর্তনে মাতিয়া উঠিয়াছে। সেই তুমুল কীর্তনের তীব্র আকর্ষণে স্থির থাকিতে না পারিয়া আমিও মাঝে মাঝে কীর্তনে যোগ দিতেছি, আবার এদিকের বিধিব্যবস্থারও খোঁজ নিতেছি। বীরুদা পৃথক ঘরে ঠাকুরভোগ প্রস্তুত করিবার ভার লইয়াছেন এবং আমাদের রান্নাঘরে প্রায় দুইশত লোকের রান্নাবাড়ীর আয়োজন চলিয়াছে।

ইতিমধ্যে একবার আমি বৈঠকখানা দালানের বারান্দায় আগন্তুক ভদ্রলোকদের সঙ্গে কথাবার্তা বলিতেছি, এমন সময় দেখিতে পাইলাম, কয়েকটি লোক মাথায় ও ঝাঁকায় করিয়া নানাজাতীয় তরিতরকারী লইয়া আসিতেছে। আমি তাহাদিগকে এমন অসময়ে এই পথে আসিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, তাহারা বলিল,—"আজ আমাদের বাজারে যাওয়ার সময় অতীত হইয়া গিয়াছে, তাই এই পথ দিয়ে জিনিসগুলো গ্রামের মধ্যে বিক্রী করতে যাচ্ছি।" আমি সবগুলি তরিতরকারী কিনিয়া লইয়া বাড়ীর ভিতরে পাঠাইয়া দিলাম। আশ্চর্যের বিষয়, আর একটু পরেই দেখি, বাড়ীর সম্মুখের রাস্তা দিয়া দুইজন ময়রা ও দুইজন গোয়ালা দুই টিন রসগোল্লা ও দুই ভাঁড় দই লইয়া যাইতেছে। আমি তাহাদিগকে ডাকিয়া আনিলাম। তাহাদের নিকট শুনিলাম, নিকটবর্তী গ্রামের এক বাড়ীতে এই সমুদয় জিনিষের বায়না ছিল, কিন্তু অনিবার্য কারণে তাহাদের ব্যাপার সেদিন স্থগিত হওয়ায় তাহারা জিনিসগুলি ফেরত লইয়া যাইতেছে। আমি উপযুক্ত মূল্য দিয়া দই মিষ্টি সবই কিনিয়া লইলাম। এইবার মেজদার নিকট যাইয়া বলিলাম,—"মেজদা, দয়ালের দয়ায় আপনার ঈপ্সিত মত সকল জিনিসই সহজে মিলে গেল। এখন যাহাতে ঠাকুরভোগ শীঘ্র শীঘ্র সুন্দররূপে হয়, মনের আনন্দে তারই ব্যবস্থা করুন। মেজদাও ত্বরিত গতিতে কাজে লাগিয়া গেলেন।

এদিকে তুমুলবেগে কীর্তন চলিতেছে। আমি আবার কীর্তনে নামিব ভাবিতেছি, এমন সময় দীর্ঘাকৃতি বলিষ্ঠ এক হিন্দুস্থানী যুবাপুরুষ হাতে পাকা বাঁশের লম্বা লাঠি, কোমরে চাপরাশ ও কাঁধে পাগড়ী—আমার কাছে আসিয়া হিন্দীভাষায় জানাইল যে, সে সরকারী কাজে এই গ্রামে আসিয়াছে, এ বেলা আমাদের বাড়ীতে তাহার আহারাদির ব্যবস্থা করিয়া দিতে হইবে। আমি তাহাকে জানাইলাম,—বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ রান্না করিতেছেন, ঠাকুরভোগ হইবে, বহুলোক

এখানে প্রসাদ পাইবেন, সেও তাহা পাইতে পারে। আমার কথা শুনিয়া লোকটি বলিল যে, সে বাঙ্গালী ব্রাহ্মণের রান্না খাইবে না। তাহার জন্য তখন পৃথকভাবে রান্নার ব্যবস্থা করা সম্ভবপর নয় বলিয়া আমি তাহাকে দই, চিড়া, মিষ্টি খাওয়ার অনুরোধ করিলাম। সে তাহাতে রাজী হইল।

মণ্ডপের মধ্যে যে কীর্তন হইতেছিল, বারান্দায় দাঁড়াইয়া সেই কীর্তন শুনিতে শুনিতে হিন্দুস্থানী লোকটির চক্ষু রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। চাপরাশ পাগড়ী দূরে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া,—"কোন হ্যায় বাঙ্গালী গুরু"—এই কথা চীৎকার করিয়া বলিয়া, সে কীর্তনের মধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়িল। বহুক্ষণ ধরিয়া তুমুলবেগে নৃত্য ও কীর্তন করিতে করিতে লোকটি ভাবোন্মত্ত অবস্থায় ভূপতিত হইয়া মণ্ডপের মধ্য হইতে ছিট্‌কাইয়া কামানের গোলার মত বেগে বারান্দা পার হইয়া উঠানে আসিয়া পড়িল। মৃগী রোগীর মত তাহার হাত পা খিঁচাইতে লাগিল। এই অবস্থায় আমি তাড়াতাড়ি ছুটিয়া গিয়া তাহার শুশ্রূষায় নিযুক্ত হইলাম। কিছুক্ষণের মধ্যে তাহার অবস্থা অনেকটা স্বাভাবিক হইলে, তাহাকে ঘরে আনিয়া বিছানায় শোয়াইয়া রাখিলাম।

কীর্তন থামিলে, সকলে বিশ্রাম করিয়া স্নান করিতে গেলেন। বীরুদা ঘরের দরদালানে ঠাকুরভোগের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের আহারাদির পর প্রসাদ বিতরণ আরম্ভ হইল। লোকজন সকলে ভোজনে বসিলে, আমি বাহির বাটীতে আসিয়া দেখিলাম, হিন্দুস্থানী লোকটি স্নান করিয়া বসিয়া আছে। সে আমাকে জিজ্ঞাসা করিল,—"ঠাকুরজীকা ভোগ হো গিয়া ?" আমি বলিলাম,— "ঠাকুরজী তো বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ।" সে বলিল,—"যানে দাও বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ, হাম প্রসাদ খায়েঙ্গা।" আমি তখন তাঁহাকে ঠাকুরভোগের প্রসাদ আনিয়া দিলাম। সে পরমানন্দে ভোজন করিয়া পরিতৃপ্ত হইল।

আহারান্তে কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর আবার মণ্ডপের সম্মুখের উঠানে কীর্তন আরম্ভ হইল। কীর্তন যখন খুব জমিয়া উঠিয়াছে, সকলে ভাব-বিহ্বল অবস্থায় তাণ্ডব নৃত্যে মাতোয়ারা, শ্রীশ্রীঠাকুর আসিয়া কীর্তনে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন। কীর্তনের বেগ শতগুণ বৃদ্ধি পাইল। শ্রীশ্রীঠাকুর ভাবাবেশে দীর্ঘ সময় ধরিয়া নৃত্য করিতে করিতে অজ্ঞান অবস্থায় মাটিতে পড়িয়া গেলেন। তাঁহার দেহে পূর্ব পূর্ব বারের মত সমাধির লক্ষণ সমূহ প্রকাশ পাইতে থাকিল। এই অবস্থায় তাঁহার শ্রীমুখ হইতে সপ্তচত্বারিংশৎ দিবসের ভাববাণী নির্গত হইল এবং তাহা লিপিবদ্ধ করা হইল।

পরদিন সকালে পুনরায় কীর্তন আরম্ভ হইল। বহুলোক আসিয়া সে কীর্তনে যোগ দিল। অনেকেই তখন নাম লইতে ইচ্ছুক হইয়া পার্শ্ববর্তী গ্রাম হইতে আসিয়াছেন। আমি এই সকল আগন্তুকদের সহিত আলাপ-আলোচনায় ব্যাপৃত রহিলাম, কাজেই আমি আর কীর্তনে যোগ দিতে পারিলাম না। গোঁসাই বাবা তখন সকলকে সৎনামে দীক্ষা দিতে লাগিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর ঐ সময়

আমাদের দালানের পশ্চিম দিকের একটি শয়ন কক্ষে একাকী বিশ্রাম করিতেছিলেন। আমি একবার সেখানে যাইয়া দেখিলাম, শ্রীশ্রীঠাকুর বিছানার উপর অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় আছেন এবং আমার গানের খাতাখানা তাঁহার সম্মুখে পড়িয়া আছে। খাতাখানা হাতে লইয়া দেখিলাম, শ্রীশ্রীঠাকুর তাহাতে স্বহস্তে লিখিয়া রাখিয়াছেন,—

"প্রেমী,

তোমার উন্নত শির শ্রীগুরুর পাদপদ্মে বিক্রয় কর। তাঁহার বচন তোমার চলিবার পাথেয় হোক। গুরু অশরীরী হইয়াও শরীরী, নিরাকার হইয়াও সাকার, কোন নির্দিষ্ট স্থানে আবদ্ধ না হইয়াও সদ্‌গুরুর শরীররূপে ঘটে কেবল তোমারই জন্য আবদ্ধ। সত্যকে আলিঙ্গন কর, আর ছাড়িও না. জগত তোমাকে ঘৃণা করিলেও, সদ্‌গুরু তোমাকে ঘৃণা করিবেন না, বা করেন না।"

কথাগুলি পড়িবা মাত্র আমার মাথা ঘুরিয়া গেল। মনে মনে ভাবিলাম,—আমি বোকা, মূর্খ, লেখাপড়া জানি না, জ্ঞান বুদ্ধি, ভক্তি বিশ্বাস কিছুই আমার নাই। আমি সদ্‌গুরু কোনদিন দেখি নাই বা চিনি না। আমি তাঁহাকে কোথায় পাইব? কে আমাকে সদ্‌গুরু চিনাইয়া দিবে? আমি কাঁদিয়া আকুল হইয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের চরণে আমার মনোভাব ব্যক্ত করিলাম। তিনি বলিলেন,—"খুঁজিলেই পাওয়া যাইবে।"

কুষ্টিয়া যাওয়ার জন্য আমরা সকলে সেদিন বিকালবেলা রওনা হইয়া খোকসা রেল-স্টেশনে উপস্থিত হইলাম। এদিকে ধুলশুর জমিদার দীননাথ নন্দী মহাশয়ের সনির্বন্ধ অনুরোধে শ্রীশ্রীঠাকুর পথিমধ্যে তাঁহার বাড়ীতে গেলেন এবং সেখান হইতে রেল স্টেশনে আসিলেন। যে হিন্দুস্থানী লোকটি সেদিন আমাদের বাড়ীতে কীর্তনে যোগদান করিয়াছিল, সেও সকলের সঙ্গে কুষ্টিয়া যাওয়ার জন্য তখন স্টেশনে আসিল। লোকটির নাম রতনলাল সুকুল। মহারাজ মণীন্দ্র-চন্দ্র নন্দীর ষ্টেটের হাবাসপুর কাছারীতে সে বরকন্দাজের কাজ করিত। রতনলাল সেদিন উক্ত কাছারীতে গিয়া ন্যায়েব মহাশয়ের নিকট পাগড়ী, চাপরাশ, লাঠি জমা দিয়া তাহার চাকুরী ইস্তফা দিয়া আসিল এবং আমাদের সঙ্গে কুষ্টিয়া গিয়া সেই দিনই সেখানে সৎমন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করিল।

কণ্ঠগজরায়

১৩২৪ বঙ্গাব্দের জ্যৈষ্ঠ মাস। একদিন কণ্ঠগজরা নিবাসী পরম ভক্ত ডাঃ সতীনাথ ঘোষ মহাশয় জনৈক অশ্বারোহী মারফত বরৈচারার ইষ্টপ্রাণ সৎসঙ্গী শ্রীরাধারমণ জোয়ারদার মহাশয়ের নিকট একখানি জরুরী পত্র দ্বারা সংবাদ পাঠাইলেন,—"শ্রীশ্রীঠাকুর অদ্য প্রাতে স্টীমার-যোগে আমাদের বাড়ীতে শুভ পদার্পণ করিবেন। আপনি যত সত্বর সম্ভব দয়া করিয়া কীর্তনের দল লইয়া অবশ্য অবশ্য উপস্থিত হইবেন, ইহাতে অন্যথা না হয়।" পত্রখানা পাওয়া

মাত্র রাধারমণ চারিদিকে সংবাদ পাঠাইয়া ২০।২৫ জন লোক সংগ্রহ করিলেন এবং সকলে মিলিয়া ঢাক, ঢোল, করতাল, কাঁসর, ঘন্টা প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র সহ কীর্তন করিতে করিতে কণ্ঠগজরা অভিমুখে যাত্রা করিলেন। বেলা ১১টার সময় ইঁহারা সতীনাথ ঘোষের বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা দেখিলেন, শ্রীশ্রীঠাকুরের শুভাগমনে ইতিমধ্যেই সতীনাথের বাড়ী ও তৎসংগে সমগ্র পল্লীখানি আনন্দ-মুখর হইয়া উঠিয়াছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর চরণে প্রণিপাত পূর্বক উপস্থিত সকলে মিলিয়া কীর্তন আরম্ভ করিয়া দিলেন। দেখিতে দেখিতে চতুষ্পার্শ্বের বহু লোক আসিয়া সেই কীর্তনে যোগদান করিল। দীর্ঘ সময় ধরিয়া তুমুল বেগে কীর্তন চলিল। বেলা দ্বিপ্রহর অন্তে কীর্তন সাংগ হইলে সকলে স্নানাদি সারিয়া ঠাকুর-ভোগের প্রসাদ পাইয়া বিদায় হইলেন।

অপরাহ্ন কালে চতুষ্পার্শ্বের গ্রাম সমূহ হইতে লোক সমাগম আরম্ভ হইল। সমবেত জনগণ তখন কোথায়ও পাঁচজন, কোথায়ও সাতজন মিলিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রবীণ ভক্তদের সহিত তত্ত্বালোচনায় রত আছেন, কোথাও কেহ কেহ দীক্ষা গ্রহণ করিতেছেন। সন্ধ্যার পর আবার তুমুল কীর্তন আরম্ভ হইল। কিছুক্ষণের মধ্যে কীর্তন খুব জমিয়া উঠিলে শ্রীশ্রীঠাকুর স্বয়ং আসিয়া কীর্তনে নামিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুরকে পাওয়ায় কীর্তনের বেগ এবং ভক্তগণের আনন্দোল্লাস শতগুণ বৃদ্ধি পাইল। গভীর রাত্রি পর্যন্ত প্রচন্ডবেগে একটানা তুমুল কীর্তন চলিল। কীর্তনের মধ্যে শ্রীশ্রীঠাকুরের মহাভাবসমাধিদশা ঘটিল এবং তদবস্থায় তাঁহার শ্রীমুখ হইতে ত্রি-পঞ্চাশৎ দিবসের মহাভাব-বাণী নির্গত হইল। সমাধি অন্তে গভীর রাত্রে তাঁহার স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়া আসিল। কিছুকাল বিশ্রাম গ্রহণের পর তিনি আহারাদি করিলেন। ঠাকুরভোগের পর সকলে প্রসাদ পাইয়া বিদায় হইলেন।

তৎপর দিবস শ্রীশ্রীঠাকুর সাংগোপাংগসহ কুষ্টিয়া হইয়া হিমাইতপুর রওনা হইলেন, স্থানীয় ও নিকটবর্তী স্থানের সমাগত ভক্তগণও স্ব স্ব গৃহে গমন করিলেন।

খলিশাকুড়িচন্দ্রে

১৩২৪ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ মাসের কথা। শ্রীশ্রীঠাকুর কুষ্টিয়ায় শুভাগমন করিয়াছেন সংবাদ পাইয়া খলিশাকুড়িচন্দ্র নিবাসী পরমভক্ত যোগেন্দ্রনাথ চৌধুরী শ্রীশ্রীঠাকুরচরণে ছুটিয়া আসিয়া সনির্বন্ধ বিনীত প্রার্থনা নিবেদন করিলেন, শ্রীশ্রীঠাকুর যদি দয়া করিয়া ভক্তবৃন্দ সহ একবার তাঁহার গৃহে শুভপদার্পণ করেন, তিনি ধন্য হইবেন। ভক্তের মনোবাসনা পূর্ণ করিবার জন্য শ্রীশ্রীঠাকুর সে-যাত্রা ভক্তবৃন্দ সহ তথায় গমন করিয়া কয়েক দিন অবস্থান করিয়াছিলেন। যোগেন্দ্রনাথের গৃহে প্রত্যহ সন্ধ্যা হইতে রাত্রি পর্যন্ত তুমুল কীর্তন হইত। সমগ্র পল্লীখানা অহর্নিশ আনন্দ-মুখরিত থাকিত। এই খলিশাকুড়িচন্দ্র গ্রামের

ভক্তবর যোগেন্দ্রনাথের গৃহেই কীর্তনকালে ১৩২৪ বঙ্গাব্দের ১লা ও ২রা শ্রাবণ তারিখে মহাসমাধি অবস্থায় শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীমুখ হইতে চতুঃপঞ্চাশত্তম ও পঞ্চ-পঞ্চাশত্তম দিবস-দ্বয়ের মহাভাববাণী নির্গত হইয়াছিল।

মদাপুরে

১৩২৪ বঙ্গাব্দের মাঘ মাস, শ্রীশ্রীঠাকুর নৈহাটী হইতে কুষ্টিয়ায় আসিয়াছেন। সেযাত্রা তাঁহার কুষ্টিয়ায় পদার্পণের সঙ্গে সঙ্গেই ফরিদপুর জেলার মদাপুর গ্রাম নিবাসী একনিষ্ঠ ভক্ত জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ শ্রীশ্রীঠাকুর চরণে উপস্থিত হইয়া ভক্তিভরে কাতর প্রার্থনা নিবেদন করিলেন,—তাঁহার প্রাণের ঐকান্তিক আকাঙ্ক্ষা, শ্রীশ্রীঠাকুর কৃপা করিয়া ভক্তবৃন্দ সহ একবার তাঁহার বাসভবনে শুভ পদার্পণ করতঃ তাহাদিগকে কৃতার্থ করেন। জ্যোতিষচন্দ্রের সনির্বন্ধ অনুরোধ কিছুতেই এড়াইতে না পারিয়া শ্রীশ্রীঠাকুর কালবিলম্ব না করিয়াই অনন্ত মহারাজ, কিশোরী-মোহন, গোস্বামী সতীশচন্দ্র, অশ্বিনী বিশ্বাস, সতীশ জোয়ারদার ও অন্যান্য ভক্তদের সঙ্গে লইয়া মদাপুর যাত্রা করেন। মদাপুর ফরিদপুর জেলায় গোয়ালন্দ লাইনে বেলগাছী স্টেশনের নিকটবর্তী একটি গ্রাম।

শ্রীশ্রীঠাকুরের শুভাগমনে সেবার মদাপুরবাসী আবালবৃদ্ধবনিতা তাঁহার পুণ্য সান্নিধ্য লাভ করিয়া কি অপরিসীম আনন্দ-উল্লাসে মাতিয়া উঠিয়াছিল, তাহা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। যে কয়দিন শ্রীশ্রীঠাকুর তথায় অবস্থান করিয়াছিলেন, জ্যোতিষচন্দ্রের গৃহে অহর্নিশ কীর্তন ও সদালোচনা লাগিয়াই থাকিত। গ্রামবাসী অসংখ্য নরনারী দিবারাত্রি উপস্থিত থাকিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের মধুময় সঙ্গলাভে আনন্দ-বিভোর থাকিত। জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষের বাড়ীতে কীর্তনকালে সেবার ১৩২৪ বঙ্গাব্দের মাঘমাসের সর্বশেষ শুক্রবার ও শনিবার দিবস মহাভাবাবস্থায় শ্রীশ্রী-ঠাকুরের শ্রীমুখ হইতে চতুর্ষষ্ঠিতম ও পঞ্চষষ্ঠিতম দিবসের মহাভাববাণী প্রকাশিত হইয়াছিল। সেবার শ্রীশ্রীঠাকুর মদাপুরের পঞ্চানন চন্দের বাড়ীতেও সদলবলে উপস্থিত হইয়া তুমুল কীর্তন করিয়াছিলেন। মদাপুরবাসী অনেকেই সেবার শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীচরণে সৎমন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করিয়া ধন্য হইয়াছিলেন।

সে যাত্রা জ্যোতিষচন্দ্রের গৃহে শ্রীশ্রীঠাকুরের অবস্থান কালে যে একটি বিশেষ ঘটনা ঘটিয়াছিল, নিম্নে তাহা বিবৃত করা যাইতেছে।

একদিন কীর্তনান্তে শ্রীশ্রীঠাকুর সজ্ঞানভাবে তন্ময় হইয়া জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষের ভ্রাতা শরৎচন্দ্র ঘোষের পত্নী ননীবালা দেবীর পদধূলি স্বীয় মস্তকে ধারণ করিবার জন্য ভীষণ অস্থির হইয়া পড়েন। এইরূপ বীভৎস বিরূপ প্রস্তাবে ননীবালা দেবী কিছুতেই সম্মতি দিতে পারিতেছেন না, এদিকে শ্রীশ্রীঠাকুরও কোনমতেই ক্ষান্ত হইতেছেন না। এই মহা সংকট-অবস্থায় সকলে মহা ফাঁপরে পড়িলেন। কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া কেহই কোন উপায় খুঁজিয়া পাইলেন না।

অবশেষে ননীবালা দেবী তাঁহাদের আত্মীয় শ্রীশ্রীঠাকুরের পরমভক্ত সতীশচন্দ্র জোয়ারদার ও অন্যান্য প্রবীণ গুরুভ্রাতাদের বিশেষ অনুরোধ ও অভয়বাক্যে বাধ্য হইয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের ইচ্ছায় সম্মতি না দিয়া পারিলেন না। এই অবস্থায় অবশেষে তাঁহাকে শ্রীশ্রীঠাকুরের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইতে তাঁহার সর্বাঙ্গ থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল। শ্রীশ্রীঠাকুর তখন আপন মস্তকের উপর ননীবালা মাতার পদযুগল ধারণ করিয়া সকলকে ডাকিয়া ভাববিহ্বল অবস্থায় বলিতে লাগিলেন,—

"তোরা আয় ভাই, দেখে যা মায়ের দয়া, তোরা আয় দেখে যা, তোরা যেথায় ইচ্ছা চলে যা, আর ভয় নাই। মায়ের হাতে অসি নাই, গলে নরমুণ্ডমালা নাই, অট্টহাসি নাই। মা আমার দয়াময়ী, মা আমার পুতুল মা নয়,—চৈতন্যময়ী মা"—বলিতে বলিতে তাঁহার বাহ্যজ্ঞান ক্রমশঃ লোপ পাইতে লাগিল এবং "আমার মা, আমার মা, আমি মা আমি মা"—বহুবার বলিতে বলিতে বাহ্য চৈতন্য সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হইয়া সমাধিস্থ হইয়া পড়িলেন। ননীবালা মাতাও ভাবাবেশে সংজ্ঞাহারা হইয়া জড়িত কণ্ঠে 'রাধাস্বামী' 'রাধাস্বামী' 'রাধাস্বামী' বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন। এদিকে সমাধি অবস্থায়ই শ্রীশ্রীঠাকুর বেহাগ রাগিণীতে গান ধরিলেন,—

একে একে নিভে গেল সূর্য চন্দ্র যত তারা।
বাঁচে মাত্র আমিই—আমি অনন্ত অসীম ধারা ।।
একে একে নিভে গেল সূর্য চন্দ্র যত তারা।
হাসে দিগ্‌বধূ আবার পরিয়া জ্যোতির হার,
ঐ হাসে আবার, হাসে আবার, হাসে হাসে হাসে আবার,
ঐ হাসে হাসে আবার, হাসে হাসে আবার ।।

মদাপুর হইতে শ্রীশ্রীঠাকুর ভক্তবৃন্দসহ রংপুর গমন করেন। সেখানে তিনি পূজ্যপাদ রাধারমণ গোস্বামী (মহারাজ অনন্তনাথের ভগ্নীপতি) মহাশয়ের গৃহে ছয় দিবস অতিবাহিত করেন। এই সময় শ্রীশ্রীঠাকুর প্রত্যহ কীর্তনের দল লইয়া নগর পরিক্রমায় বাহির হইতেন এবং নানা স্থানে পরিভ্রমণ করতঃ অসংখ্য নর-নারীকে কীর্তনানন্দে মাতাইয়া তুলিতেন। রংপুর হইতে শ্রীশ্রীঠাকুর সদলবলে বদরগঞ্জ আগমন করতঃ তথায় কয়েকদিন অবস্থান করেন। বদরগঞ্জেও তুমুল কীর্তনের মাধ্যমে তিনি বহুস্থানে সত্যনাম প্রচার করিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর অতঃপর কীর্তনের দল লইয়া নওগাঁ অভিমুখে যাত্রা করেন। সেখানেও তিনি কয়েকদিন কাটাইয়া ছিলেন এবং কীর্তনের দলসহ নানা অঞ্চলে গমন করিয়া অসংখ্য নরনারীকে সত্যনাম বিতরণ করিয়াছিলেন। নওগাঁ হইতে শ্রীশ্রীঠাকুর ভক্তবৃন্দসহ রওনা হইয়া পথে পথে কীর্তন করিতে করিতে জন্মভূমি হিমাইতপুরে প্রত্যাগমন করেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের সেবার কীর্তনের দলসহ দীর্ঘকাল পরিভ্রমণের ফলে নানাস্থানের বহু নরনারী তাঁহার অমিয় সান্নিধ্য লাভের সুযোগ পাইয়া

হৃদয়ের তাপজ্বালা জুড়াইয়াছিল এবং তাঁহার শ্রীপদে আত্মসমর্পণ পূর্বক সৎমন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করিয়া ধন্য হইয়াছিল।

কুষ্টিয়া সহরে এবং কুষ্টিয়াকে কেন্দ্র করিয়া বিভিন্ন অঞ্চলে দীর্ঘকাল ধরিয়া সত্যনাম প্রচারের ফলে যে সকল ভাগ্যবান বিশিষ্ট ব্যক্তি সে-যুগে শ্রীশ্রীঠাকুর চরণে সৎমন্ত্রে দীক্ষা লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছিল তাঁহাদের মধ্যে কুষ্টিয়ার বিখ্যাত ডাক্তার গোকুলচন্দ্র মণ্ডল, প্রবীণ উকীল হরিশ্চন্দ্র রায়, হরিশ্চন্দ্রের পুত্র উকীল প্রফুল্লচন্দ্র রায়, উকীল ত্রৈলোক্যনাথ সেন, মোক্তার অশ্বিনীকুমার বিশ্বাস, মোক্তার বীরেন্দ্রনাথ রায়, ডাক্তার সত্যচরণ দত্ত, সত্যচরণের ভ্রাতা বাদ্যবিশারদ শ্রীশচন্দ্র দত্ত, রেলের ইঞ্জিনিয়ার শ্রীশচন্দ্র নন্দী, ওভারসিয়ার প্রমথ গাঙ্গুলী, ডাক্তার সতীশচন্দ্র জোয়ারদার, সতীশচন্দ্রের ভ্রাতা রাধারমণ জোয়ারদার, ডাক্তার যুধিষ্ঠির নাথ, যুধিষ্ঠিরের পুত্র উকীল যতীন্দ্রমোহন নাথ, হরিণাকুণ্ডের সুশীলচন্দ্র বসু, বি. এ. খোকসা-জানিপুরের ডাক্তার যতীন রায়, উকীল পূর্ণচন্দ্র সাহা, গোপালচন্দ্র কর্মকার, প্রধান শিক্ষক যোগেন্দ্রনাথ সরকার, যোগেন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীকান্ত সরকার, কুষ্টিয়ার মারোয়ারী ব্যবসায়ী গৌরীশংকর আগরওয়ালা, মোমরাজ আগরওয়ালা পূর্ণমল আগরওয়ালা, লছমীনারায়ণ আগরওয়ালা, লক্ষ্মীচাঁদ আগরওয়ালা, বাড়াদি গ্রামের জমিদার উপেন্দ্রনাথ সাহা ও তাঁহার ভ্রাতাগণ, ঐ গ্রামের জমিদার কুঞ্জলাল রায়চৌধুরী ও দুই ভ্রাতা কৃষ্ণলাল রায় চৌধুরী ও বসন্তলাল রায়চৌধুরী, মহম্মদ আবদুল জব্বর, মহম্মদ গহর আলী, রামকৃষ্ণ বিশ্বাস, শশিভূষণ প্রামাণিক, বিষ্ণুভূষণ প্রামাণিক, শ্রীশচন্দ্র প্রামাণিক, পূর্ণচন্দ্র কবিরাজ বি. এ. কমলাপুরের জমিদার সুরেন্দ্রভূষণ বিশ্বাস ও তাঁহার ভাই গিরীন্দ্রভূষণ বিশ্বাস, তালবেড়িয়ার তারাপদ অধিকারী, পূর্ণচন্দ্র অধিকারী, বারখাদার প্রিয়নাথ বসু, পূর্ণ অধিকারী, চৈতন্য অধিকারী, ঘোড়ামারার রামযদু ঘোষ, কুমারখালীর হরিপদ, তারাপদ, রমাপদ, উমাপদ ও কালীপদ বাগচী, আমলাবাড়িয়ার ললিত বসু, ব্রহ্মপুরের জানকী দাস, অক্ষয় দাস, মধুপুরের জ্যোতিষচন্দ্র ও শরৎচন্দ্র ঘোষ এবং পঞ্চানন চন্দ, ফরিদপুরে রাজবাড়ীর ডাক্তার কেদারনাথ ভট্টাচার্য ও মাখনলাল মিত্র প্রভৃতির নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। শ্রীশ্রীঠাকুরের কৃপাধন্য এই সকল ইষ্টপ্রাণ ভক্তবৃন্দের শ্রীশ্রীঠাকুরের পুণ্য সংস্পর্শে আগমন, দীক্ষা গ্রহণ ও ইষ্টানুরাগের কত না অপূর্ব বিচিত্র কাহিনী! স্থানাভাব বশতঃ আমরা সে সমুদয় জীবনীয় বৃত্তান্তনিচয় প্রিয় পাঠকবর্গ সমীপে উপস্থিত করিতে না পারিয়া দুঃখিত। অতঃপর আমরা হিমাইতপুরে আশ্রম-কেন্দ্রিক প্রচার কার্যের কথা বিবৃত করিব।

হিমাইতপুর-আশ্রম-কেন্দ্রিক প্রচার কার্য

সেকালে কুষ্টিয়ার ন্যায় হিমাইতপুরে আশ্রমকে কেন্দ্র করিয়াও শ্রীশ্রীঠাকুর কীর্তনের দলসহ নানাস্থানে পরিভ্রমণ করতঃ সত্যনাম বিতরণ করিয়াছিলেন। এই

সমুদয়ের মধ্যে হিমাইতপুর, তৎপাশ্বর্বর্তী পল্লী অঞ্চল ও বাড়াদি-গ্রামের কীর্তন-বৃত্তান্ত আমরা বর্তমান অধ্যায়ের প্রারম্ভে লিপিবদ্ধ করিয়াছি। ঐ সময়ে অন্যান্য স্থানে নাম প্রচারের কথা এইবার কিঞ্চিৎ বিবৃত করিবার প্রয়াস পাইব।

মজিলপুর ও চক্রতীর্থে

সংঘভ্রাতা শ্রদ্ধেয় বিরাজকৃষ্ণ ভট্টাচার্য মহাশয়ের সনির্বন্ধ অনুরোধে শ্রীশ্রীঠাকুর বঙ্গাব্দ ১৩২৪ সালের পৌষমাসে সতীশচন্দ্র গোস্বামী, অনন্ত মহারাজ, কিশোরীমোহন, কৃষ্ণচন্দ্র দাস, কৃষ্ণলাল রায়চৌধুরী, সতীশচন্দ্র জোয়ারদার, সত্যচরণ দত্ত, কোকন বসু, তরণী বসু প্রভৃতি কীর্তনদলের সাঙ্গোপাঙ্গ সহ তাঁহার মজিলপুরের বাসভবনে শুভাগমন করিয়াছিলেন। এই উপলক্ষে তদঞ্চলের অধিবাসীগণের প্রাণে বিপুল আনন্দের সাড়া পড়িয়া গিয়াছিল। তাঁহার অবস্থানকালে মজিলপুর ও নিকটবর্তী পল্লী-অঞ্চলের ইতরভদ্র, শিক্ষিত, অশিক্ষিত, ধনীদরিদ্র, অসংখ্য নরনারী প্রত্যহ তাঁহার শ্রীচরণ দর্শন কামনায় বিরাজকৃষ্ণের গৃহে সমবেত হইতেন। তাঁহারা কতজনে নিজ নিজ জীবনের কত জটিল সমস্যার কথা তাঁহার শ্রীচরণে নিবেদন করিতেন এবং তাঁহার অপূর্ব অভ্রান্ত সমাধান লাভে নিশ্চিন্ত হইয়া সানন্দে বিদায় লইতেন। প্রতিদিন সমবেত সকলে গুচ্ছে গুচ্ছে বিভক্ত হইয়া নানা অধ্যাত্ম-তত্ত্ব সম্বন্ধে কত আলোচনা করিতেন। অনন্ত মহারাজ, কিশোরীমোহন, সতীশচন্দ্র গোস্বামী, সতীশচন্দ্র জোয়ারদার, সুশীলচন্দ্র প্রভৃতি শ্রীশ্রীঠাকুরের অন্তরঙ্গ পার্ষদগণ ঐ সমুদয় আলোচনায় অংশ গ্রহণ করিয়া আলোচ্য বিষয় সকলকে প্রাঞ্জল ভাষায় বুঝাইয়া দিয়া মুগ্ধ করিতেন। কখনো কখনো ড্রাম, জয়ঢাক, খোল, করতাল, কাঁসর, ঘণ্টা ইত্যাদি বাদ্য সমন্বিত তুমুল কীর্তনে ভক্তগণ সমাগত সকলকে মাতাইয়া তুলিতেন। এইভাবে অহর্নিশ কীর্তনে, গানে ও সদালোচনায় বিরাজকৃষ্ণের বাড়ীখানা তীর্থক্ষেত্রেরই মত সর্বক্ষণ আনন্দ-মুখর থাকিত। একদিন মজিলপুর উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মহাশয়ের পৌরহিত্যে "শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবন ও মতবাদ" সম্বন্ধে আলোচনার জন্য একটি বিরাট জনসভার অনুষ্ঠান করা হইয়াছিল। উক্ত সভায় অনন্তনাথ, সতীশচন্দ্র জোয়ারদার ও সুশীলচন্দ্র প্রভৃতি যে মনোজ্ঞ ভাষণ দিয়াছিলেন, তাহাতে শ্রীশ্রীঠাকুরের অপূর্ব চরিত্রমাহাত্ম্য এবং তাঁহার উদার ভাবরাজি সম্বন্ধে সবিশেষ জ্ঞান লাভ করিয়া শ্রোতৃবর্গ মুগ্ধ হইয়াছিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের অবস্থান কালে তাঁহার পুণ্য সান্নিধ্য লাভ, অমিয় বচনসুধা পান এবং প্রাণোন্মাদী কীর্তন ও সদালোচনায় নিত্যই কত নরনারী উদ্বুদ্ধ হইতেন! ইঁহাদের অনেকেই শ্রীশ্রীঠাকুর-চরণে আত্মসমর্পণ পূর্বক সৎনামে দীক্ষা পাইয়া ধন্য হইয়াছিলেন।

একদিন মজিলপুরের জমিদার শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় কথা প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুরকে বলিলেন,—এককালে গঙ্গানদী এই স্থান দিয়া প্রবাহিত হতো। নদী মজে গিয়ে এই গ্রামের সৃষ্টি হয়েছে বলে ইহা 'মজিলপুর' নামে পরিচিত

হয়েছে। কথিত আছে, শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু এই স্থান দিয়েই নীলাচল গমন করেছিলেন। যেখানে তিনি অবস্থান করেছিলেন তাহা চক্রতীর্থ নামে পরিচিত। মজিলপুর থেকে চক্রতীর্থ সাত মাইল দূরবর্তী। আপনি আমাদের গ্রামে আশায় ইহা তীর্থক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। মনে হয় অনুমান সাড়ে চারিশত বৎসর পূর্বে শ্রীচৈতন্যদেব যখন এসেছিলেন, তখন তাঁর আগমনেও ঐ স্থানে লোক সমাগম হওয়ায় উহা পুণ্যতীর্থ হয়েছিল, আর তখন থেকেই উহা চক্রতীর্থ নামে খ্যাতি লাভ করেছে।" সত্যেনবাবুর কথায় শ্রীশ্রীঠাকুর ও ভক্তবৃন্দ সকলেরই ঐকান্তিক আকাঙ্ক্ষা হইল, শ্রীমন্মহাপ্রভুর পদরজঃ পূত সেই পবিত্র স্থানটি একবার দর্শন করিয়া আসেন।

পরদিবস (১৯১৭ সনের ২৮শে ডিসেম্বর) শ্রীশ্রীঠাকুর সাঙ্গোপাঙ্গ ও কীর্তনের দল সহ চক্রতীর্থ যাত্রা করেন। প্রভাত হইতে না হইতেই কীর্তনের দামামা ও জয়ঢাক বাজিয়া উঠিল। অনন্ত মহারাজ ও কিশোরীমোহন গান ধরিলেন। অমনি ভক্তরা যে যেখানে ছিলেন, কীর্তনে আসিয়া যোগ দিলেন। দিবারম্ভের সঙ্গে সঙ্গেই সমগ্র গ্রামখানি কীর্তনের ঝংকারে আলোড়িত হইয়া উঠিল। শ্রীশ্রীঠাকুর দুই বাহু উর্ধ্বে তুলিয়া নৃত্য করিতে করিতে কীর্তনদলের পুরোভাগে বেগে ধাবিত হইলেন। ভক্তগণ ঢাক, ঢোল, খোল, করতাল, কাঁসর ও ঘণ্টাদির বিপুল বাদ্যসহ উদ্দাম নৃত্য ও তুমুল কীর্তন করিতে করিতে তাঁহার অনুগমন করিলেন। সেই প্রাণোন্মাদী কীর্তন শুনিয়া চারিদিক হইতে গ্রামবাসী দলে দলে ছুটিয়া আসিয়া কীর্তনের দলে যোগ দিতে লাগিল। তাহাতে, কীর্তনের দল যতই অগ্রসর হইতে লাগিল, উহা ক্রমশঃ বাড়িয়া যাইতে লাগিল। গ্রামবাসীদের হুলুধ্বনি ও হরিধ্বনিতে চতুর্দিক মুখরিত হইয়া উঠিল। সমাগত ব্যক্তিদের অনেকেই ভূলুণ্ঠিত হইয়া শ্রীশ্রীঠাকুরকে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত জানাইল। শ্রীশ্রীঠাকুর যাহাকেই সম্মুখে পাইতেছেন, প্রেমালিঙ্গনে ধন্য করিয়া দ্রুততালে দৌড়াইয়া যাইতেছেন। নামস্পন্দনের তড়িদ্ প্রবাহে তাঁহার মস্তকের কেশদাম ক্ষণে ক্ষণে ঋজু হইয়া উর্ধ্বে উত্তোলিত হইতেছে। কীর্তন করিতে করিতে মাঝে মাঝে পরম ভক্ত গোস্বামী সতীশচন্দ্র ও কিশোরীমোহন হুংকার দিয়া লাফাইয়া উঠিতেছেন। যাঁহাদের দীর্ঘ কেশরাজি গুচ্ছে গুচ্ছে মাথার চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িতেছে। তাঁহাদের চক্ষু আরক্তিম, বদনমণ্ডল স্বর্গীয় বিভায় সমুজ্জ্বল। শ্রীশ্রীঠাকুরের অপূর্ব নৃত্য ও ভক্তগণের তুমুল কীর্তন এমন উন্মাদনার সৃষ্টি করিয়া চলিয়াছে যে, দর্শকবৃন্দ সেই কীর্তনস্রোতে গা ঢালিয়া না দিয়াই পারিতেছিল না। কীর্তনের প্রবাহ যেন বন্যার মত সকলকে ভাসাইয়া লইয়া যাইতেছিল। সে এক অপূর্ব দৃশ্য!

শ্রীশ্রীঠাকুর সারা পথ এমন দ্রুতগতিতে অগ্রসর হইতেছিলেন যে, সঙ্গীরা প্রাণপণ দৌড়াইয়াও তাঁহার নাগাল পাইয়া উঠিতে ছিলেন না। এইভাবে তীরবেগে ছুটিতে ছুটিতে শ্রীশ্রীঠাকুর কিছুকালের মধ্যেই সকলের দৃষ্টিপথের

বাহিরে চলিয়া গেলেন এবং কীর্তনদলের বহু পূর্বেই একাকী চক্রতীর্থে গিয়া উপনীত হইলেন। সেদিন সন্ধ্যা পর্যন্ত সেখানে ভক্তগণের উদ্দণ্ড নৃত্যসহ তুমুল কীর্তন চলিল। তাহাতে শ্রীশ্রীঠাকুরের অর্দ্ধভাবাবস্থায় তাঁহার শ্রীমুখ হইতে ত্রিষষ্টিতম দিবসের একটি মাত্র মহাভাববাণী 'One is equal to various and various is equal to one'—উচ্চারিত হইয়াছিল। অবশেষে কীর্তনান্তে শ্রীশ্রীঠাকুর সন্ধ্যার পর ভক্তগণ পরিবৃত হইয়া মজিলপুর অভিমুখে যাত্রা করিলেন। শুনিয়াছি, ঐদিন চক্রতীর্থের সেই সুদীর্ঘ পথ অতি দ্রুতপদে দৌড়াইতে দৌড়াইতে শ্রীশ্রীঠাকুরের চরণ যুগলে ভীষণাকার ফোস্কা পড়িয়া গিয়াছিল। সে কারণ, শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশেষ অনিচ্ছা ও নিষেধ সত্ত্বেও ভক্তগণ তাঁহাকে পাল্কীযোগে মজিলপুর লইয়া যাওয়ার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

বিরাজকৃষ্ণের গৃহে সাতদিন অবস্থানের পর শ্রীশ্রীঠাকুর কীর্তনের দল সহ হিমাইতপুর আশ্রমে প্রত্যাবর্তন করিলেন। সেদিনের মজিলপুরের সেই বিদায় দৃশ্যটি ছিল বড়ই করুণ, বড়ই মর্মস্পর্শী। শ্রীশ্রীঠাকুরের বিচ্ছেদ বিরহে শত শত শোকাকুল বাল-বৃদ্ধ-বনিতার বিরাট জনতা অশ্রুসজল-নেত্রে মজিলপুর স্টেশনে তাঁহার অনুগমন করিয়াছিল। তাহাদের মর্মভেদী করুণ ক্রন্দনে আকাশ বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছিল। সেই রোরুদ্যমান শোকাকুল বিপুল জনতাকে শান্ত করা সঙ্গীয় ভক্তগণের পক্ষে একান্ত দুঃসাধ্য হইয়া উঠিয়াছিল। এই অবস্থায় শ্রীশ্রীঠাকুর ভাববিহ্বল অন্তরে ছল ছল নেত্রে সকলের দিকে তাকাইয়া করজোড়ে তাহাদের নিকট বিদায় লইলেন।

হরিণাকুণ্ডু গ্রামে

কুষ্টিয়ার বিশ্বগুরু-উৎসবের তিন সপ্তাহ পরে কলিকাতা হইতে শ্রীশাক্যসিংহ সেনের পিতৃদেব 'ভূ-প্রদক্ষিণ'-প্রণেতা সুপ্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর সেন মহাশয় শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীচরণ দর্শন করিতে হিমাইতপুর আশ্রমে আসেন। তিনি চলিয়া যাওয়ার পর শ্রীশ্রীঠাকুর একদিন শ্রদ্ধেয় সুশীলচন্দ্র বসুকে ডাকিয়া বলিলেন,—"চলুন, আপনার বাড়ীতে একবার যেয়ে ঘুরে আসি। এর পরে আমার আর হয়তো কোথাও যাওয়া হয়ে উঠবে না।" শ্রীশ্রীঠাকুর এরূপ ইচ্ছা প্রকাশ করায় সুশীলচন্দ্র আহ্লাদে আত্মহারা হইয়া উঠিলেন। তিনি কালবিলম্ব না করিয়া সেই দিনই শ্রীশ্রীঠাকুরের বাল্যবন্ধু ননী ভাঙ্গীর (প্রমথনাথ সাহা চৌধুরী) সহিত সাক্ষাৎ করিয়া সাঙ্গোপাঙ্গ সহ শ্রীশ্রীঠাকুরের হরিণাকুণ্ডু যাত্রার পাথেয় তাঁহাকে দিলেন এবং যাত্রাপথের জ্ঞাতব্য তথ্যাদির কথাও বলিলেন। স্থির হইল শ্রীশ্রীঠাকুর দলবল সহ ১৯১৮ সনের ১৬ই অক্টোবর আশ্রম হইতে রওনা হইয়া আলমডাঙ্গা রেল স্টেশনে পৌঁছিবেন এবং সেখান হইতে সকলে পাল্কী ও গো-যানে যাত্রা করিয়া ১২ মাইল দূরবর্তী হরিণাকুণ্ডু গ্রামে পৌঁছিবেন। এদিকের সকল

ব্যাপারের যথাযথ সুবন্দোবস্ত করিয়া স্বহস্তে শ্রীশ্রীঠাকুরের যোগ্য সম্বর্ধনার যাবতীয় বিষয়ের বিধি-ব্যবস্থার জন্য সুশীলচন্দ্র বাড়ী রওনা হইয়া গেলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর আশ্রম হইতে পূর্বনির্দিষ্ট দিনে অনন্ত মহারাজ, গোস্বামী সতীশচন্দ্র, কিশোরীমোহন, বীরেন্দ্রনাথ রায়, অশ্বিনী বিশ্বাস, সত্য দত্ত, সতীশ জোয়ারদার প্রভৃতি পার্ষদ ও কীর্তনের দল সহ হিমাইতপুর হইতে রওনা হইয়া কলিকাতায় আসেন এবং ১৮ই অক্টোবর আমলডাঙ্গা রেল স্টেশনে পৌঁছিলেন। ইষ্টভ্রাতা রাধাবিনোদ বিশ্বাস তথায় উপস্থিত থাকিয়া সকলকে স্বাগত জানাইলেন। সেখানে কিছু জলযোগ করিয়া সকলেই পদব্রজেই হরিণাকুণ্ডু অভিমুখে যাত্রা করিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর পাল্কীতে উঠিতে অস্বীকার করিয়া বলিলেন,—"আমার হাঁটা অভ্যাস আছে, আমি হেঁটেই যাব।" সকলেই তখন তাঁহার সঙ্গে পায়ে হাঁটিয়াই রওনা হইলেন। কয়েকখানা গো-যানে তাঁহাদের মালপত্র বোঝাই করিয়া দেওয়া হইল। শ্রীশ্রীঠাকুর সহ সকলে সারাপথ কীর্তন করিতে করিতে সন্ধ্যাকালে সুশীলচন্দ্রের বাসভবনে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। জয়ঢাক, কাঁসর, ঘণ্টা ইত্যাদি বাদ্যসহ তুমুল কীর্তনে সমগ্র গ্রামখানি মুখরিত হইয়া উঠিল। সন্ধ্যায় শান্ত সমাহিত গ্রাম্য জীবনে একটা প্রবল আলোড়নের সৃষ্টি হইল। গ্রামবাসী সবাই ছুটিয়া আসিলেন শ্রীশ্রীঠাকুরকে দর্শন করিবার জন্য। কারণ তাঁহারা পূর্বেই শুনিয়াছিলেন যে, শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁহাদের গ্রামে শুভাগমন করিবেন। অল্প সময়ের মধ্যেই সমগ্র বাড়ীখানা জনারণ্যে পরিণত হইয়া গেল। শ্রীশ্রীঠাকুরের গৌরকান্তি অপূর্ব সহাস্য বদনমণ্ডল, সুঠাম দেহ আজানুলম্বিত বাহু ও প্রেমময় ভাব দর্শনে সকলেই মুগ্ধ হইলেন। সমাগত কেহই আর নড়িতে চাহেন না, প্রত্যেকেই তাঁহার সঙ্গে আলাপ করিতে সমুৎসুক। এই অবস্থায় সমবেত সকলকে সবিনয়ে জানানো হইল,—"বহু পথ পদব্রজে অতিক্রম করায়, শ্রীশ্রীঠাকুর খুবই শ্রান্ত ও ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছেন। এইক্ষণ তাঁহার কিঞ্চিৎ বিশ্রামের বিশেষ প্রয়োজন। আগামীকাল প্রাতঃকালে সকলের সঙ্গেই তাঁহার আলাপ-আলোচনা হইবে।"—আগন্তুকগণ তখন একে একে বিদায় লইলেন।

পরদিবস কোজাগর লক্ষ্মীপূজা। সেদিনের বিবরণী শ্রীযুক্ত সুশীলচন্দ্র বসু নিজেই নিম্নোক্তরূপ বিবৃত করিয়াছেন। যথা :—

"১৯১৮ সনের ১৮ই অক্টোবর শ্রীশ্রীঠাকুর কীর্তনের দলবল সহ হরিণাকুণ্ডু (যশোহর) আমাদের বাড়ীতে এসে পৌঁছুলেন। পরদিন শনিবার ১৯শে অক্টোবর কোজাগর পূর্ণিমা। দলে দলে সকাল থেকেই লোক এসে সমবেত হতে লাগলো। গুচ্ছে গুচ্ছে বসে আলোচনা চলতে লাগলো। মহারাজ, কিশোরীদা, সত্য দত্ত, কৃষ্ণদাস প্রভৃতি আলোচনা চালাতে লাগলেন। মধ্যাহ্ন অতীত হতে চললো, তবুও আলোচনা, বাদানুবাদ, তর্কের ঝড় যেন আর থামতে চায় না। বিকেলের দিকে কিশোরীদা, গোঁসাইদা প্রভৃতি কীর্তনের

দলবল সহ গ্রাম-পরিক্রমায় বের হলেন। সন্ধ্যার পর কীর্তন পরিক্রমা সাঙ্গ করে কীর্তনের দল বাড়ীতে এসে ঢুকল।

বাইরে হলঘরের মধ্যে কীর্তন আরম্ভ হ'ল। জয়ঢাক, কাঁসর ও ঘণ্টার ধ্বনিতে, কীর্তনের উল্লাসে, হরিধ্বনিতে ও মেয়েদের হুলুধ্বনিতে মনে হ'ল যেন ঘরের ছাদ ভেঙ্গে পড়বে। চতুর্দিকে অসংখ্য জনতা ঘরে ঢুকতে না পেরে সোৎসুক নয়নে বাহিরে অপেক্ষমান। কিছুক্ষণ বাদে শ্রীশ্রীঠাকুর কীর্তনে এসে যোগ দিলেন। ভাবের আতিশয্যে সবাইকে তিনি বুকে জড়িয়ে ধরতে লাগলেন। অননুভূত শিহরণে তাদের দেহ-মন পুলকিত হয়ে উঠতে লাগলো। ভরা যৌবনের অপরূপ রূপ নিয়ে অননুকরণীয় মোহন ভঙ্গীতে প্রাণের উচ্ছল প্রাচুর্যে—শেষে দু'বাহু তুলে নেচে নেচে সবাইকে তিনি আপন-ভোলা করে তুললেন। তারপর অনন্ত মহারাজের ঘাড়ে এক হাত রেখে, আর এক হাত ঊর্ধ্বে তুলে কীর্তন করতে লাগলেন। পরে আবার মহারাজকে ছেড়ে দিয়ে দু'বাহু তুলে নৃত্য করতে করতে তাঁর দিব্য দেহখানি বাহ্যচৈতন্যহীন ও বিবশ হয়ে শবের মতন এলিয়ে পড়ল। মহারাজ দেহখানি ধরে আস্তে আস্তে মাটিতে শুইয়ে দিলেন। তখন তাঁর বদনমণ্ডল আরক্তিম স্বর্গীয় বিভায় মণ্ডিত। কপালটা আয়নার মত চক্ চক্ করে কাঁপতে লাগল। ডান পায়ের বুড়ো আঙ্গুলটা থর্ থর্ করে কাঁপতে লাগল। এই অবস্থায় ধীর উদাত্ত স্বরে বাণী নির্গত হ'ল।—"বাপরে বাপ কি ভীষণ অন্ধকার! দুর্ভেদ্য! আর যে ঢুকতে পারছি না। কে আছ? বিরাট অন্ধকার! কারো সাড়া নাই, কারো শব্দ নাই। কেবল ঘোর অন্ধকারের স্তূপ। একি? একি? এ কেমন? আর কিছুই তো দেখতে পারছি না। সব গেল! সব হারিয়ে গেল! যা-কিছু সব যায়-যায়। আর কিছুই থাকে না। এ যে সব সত্তা হারিয়ে যাচ্ছে। ঘুম। এ ঘুমে জেগে থাকা কঠিন। সব ঘুমিয়ে যাচ্ছে। ও ঘুম মধুর ঘুম।"—মনে হয় ভাবাবস্থায় ঠাকুর সাধনার যে স্তর ভেদ করে চলেছেন, তারই বর্ণনা দিচ্ছেন।

যে কয়দিন শ্রীশ্রীঠাকুর হরিণাকুণ্ডে ছিলেন, সব সময়ই তাঁহার সমীপে বিপুল লোক সমাগম লাগিয়াই থাকিত। কীর্তন ও ভগবৎ প্রসঙ্গের আলোচনায় বাড়ীখানা আনন্দ-মুখর হইয়া উঠিত। সেই পবিত্র পরিবেশে শ্রীশ্রীঠাকুরের পুণ্য সান্নিধ্য লাভ করিয়া গ্রামবাসী সবাই উদ্বুদ্ধ হইতেন। ইহাদের মধ্যে অনেকেই শ্রীশ্রীঠাকুরচরণে দীক্ষা গ্রহণ করিয়া ধন্য হইয়াছিলেন। ১৮ই অক্টোবর শ্রীশ্রীঠাকুর দলবল সহ সুশীলচন্দ্রের গৃহে শুভাগমন করিয়াছিলেন এবং ২৬শে অক্টোবর সকাল বেলা আহারাদির পর সকলকে লইয়া বরানগর যাওয়ার উদ্দেশ্যে আলমডাঙ্গা স্টেশন অভিমুখে রওনা হন।

শ্রীশ্রীঠাকুরের আলমডাঙ্গা যাত্রার প্রাক্কালে সমস্ত পল্লীর আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সুশীলচন্দ্রের গৃহে সমবেত হন। এই কয়দিন তাঁহার অবস্থানে গ্রামবাসী সকলেই যেন তাঁহার পরমাত্মীয় হইয়া গিয়াছিলেন। সকলের কাছ হইতে শ্রীশ্রীঠাকুর

ছল ছল নেত্রে করজোড়ে বিদায় লইলেন। সমবেত সকলের চক্ষু অশ্রু ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিল,—যেন তাঁহাদের একান্ত আপনার জন কোন্ সুদূরে চলিয়া যাইতেছেন।

বরাহনগরে

হরিণাকুন্ডু হইতে শ্রীশ্রীঠাকুর পার্ষদগণ ও কীর্তনের দল সহ রওনা হইয়া আলমডাঙ্গা রেল ষ্টেশনে উপস্থিত হন এবং সেখান হইতে বরাহনগরে আগমন করেন। বরাহনগরে তিনি সকলকে লইয়া শরচ্চন্দ্র দে মহাশয়ের গঙ্গাতীরস্থ প্রকাণ্ড বাগানবাড়ীতে কয়েক দিন অবস্থান করিয়াছিলেন। শরচ্চন্দ্র পূজ্যপাদ হরনাথ ঠাকুরের প্রিয় শিষ্য। ঠাকুর মহাশয় কলিকাতায় শুভাগমন করিলে শরচ্চন্দ্র দে মহাশয়ের মাণিকতলার বাসভবনে অবস্থান করিতেন। একবার দে মহাশয় সৎসঙ্গ-সেবক বীরেন্দ্রনাথ রায়কে সবিশেষ অনুনয়-বিনয় সহকারে বলিয়াছিলেন—শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র কথনো এদিকে এলে যদি দয়া করে আমার গঙ্গাতীরস্থ বাগানবাড়ীতে কিছুকাল সদলবলে অবস্থান করেন, আমি নিজেকে ধন্য মনে করব। আমার এই অনুরোধ আপনি দয়া করে শ্রীশ্রীঠাকুরের চরণে নিবেদন করবেন।" শ্রীশ্রীঠাকুর হিমাইতপুরে থাকিতেই বীরেন্দ্রনাথ এ বিষয় তাঁহার গোচরে আনিলে, তিনিও খুসী মনে বরাহনগর যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। ঐ সময় স্থির হয় যে, হরিণাকুন্ডু হইতে প্রত্যাবর্তনকালে আলমডাঙ্গা রেল ষ্টেশন হইতে বরাবর বরাহনগর যাওয়া হইবে। শ্রীশ্রীঠাকুর তদনুসারে শরচ্চন্দ্রের প্রীত্যর্থে হরিণাকুন্ডু হইতে বরাহনগর আসিয়া তাঁহার বাগানবাড়ীতে সাঙ্গোপাঙ্গ সহ কয়েকদিন ছিলেন। শরচ্চন্দ্র এই সুযোগে শ্রীশ্রীঠাকুর ও ভক্তগণের সেবা-সম্বর্ধনায় যথেষ্ট আয়োজন করিয়াছিলেন। বরাহনগরের বাগানবাড়ীতে যে পাঁচদিন শ্রীশ্রীঠাকুর ছিলেন, শরচ্চন্দ্র দে মহাশয় প্রত্যহ কলিকাতা হইতে আসিয়া তাঁহাকে সভক্তি প্রণাম জানাইয়া যাইতেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের বরাহনগর অবস্থানকালে তদঞ্চলেও কীর্তন এবং সদালোচনার মাধ্যমে জনসাধারণের মধ্যে সৎনাম প্রচার করা হইয়াছিল।

নৈহাটিতে

বরাহনগর হইতে শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁহার আত্মীয় শশীভূষণ চক্রবর্তী মহাশয়ের সনির্বন্ধ অনুরোধে সদলবলে তাঁহার নৈহাটীর বাসভবনে উপস্থিত হইয়া কয়েকদিন অবস্থান করিয়াছিলেন। ঐ সময় গোস্বামী সতীশচন্দ্র ও কিশোরীমোহন স্থানীয় অধিবাসীগণকে সকল সময় কীর্তনানন্দে মাতাইয়া রাখিতেন। প্রত্যহ সকালে ও বিকালে সমাগত নরনারীদের সহিত শ্রীশ্রীঠাকুরের আলাপ-আলোচনা চলিত। উপস্থিত সকলে তাঁহার বচনসুধা পান করিয়া তৃপ্ত ও উদ্বুদ্ধ হইতেন। তৎকালে অনেকেই শ্রীশ্রীঠাকুরের চরণে সৎনামে দীক্ষা গ্রহণ করিয়া ধন্য হইয়াছিলেন। দীক্ষিতদের মধ্যে কলিকাতার বিখ্যাত হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক বারিদবরণ

মুখার্জি এবং গণিতজ্ঞ যোগেন্দ্রনাথ সেনের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। নৈহাটী হইতে ভক্তদের কেহ কেহ হিমাইতপুরে অভিমুখে রওনা হন এবং অপর সকলে শ্রীশ্রীঠাকুরের সহিত কুষ্টিয়ায় আসেন এবং সেখানে কয়েক দিন কাটাইয়া সকলে হিমাইতপুর প্রত্যাবর্তন করেন।

কলিকাতায়

কুষ্টিয়ার বিখ্যাত "শ্রীশ্রীবিশ্বগুরু উৎসবে"র সময় শ্রীযুক্ত শাক্যসিংহ সেন বি. এ. মহাশয়ের সৎমন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণের অব্যবহিত পরেই তদীয় পিতৃদেব 'ভূ-প্রদক্ষিণ'-গ্রন্থ-প্রণেতা প্রসিদ্ধ ব্যারিস্টার শ্রদ্ধেয় চন্দ্রশেখর সেন শ্রীশ্রীঠাকুর দর্শনে হিমাইতপুর সৎসঙ্গ আশ্রমে আসিয়া কিছুকাল বাস করেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের সহিত আলাপ-আলোচনায় অতীব প্রীত ও মুগ্ধ হইয়া তিনিও সৎমন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের অপূর্ব চরিত্রমাহাত্ম্য ও উদার ভাবরাজির কথা কলিকাতায় সম্ভ্রান্ত মহলে প্রচারের জন্য তিনি বিশেষ উদ্‌গ্রীব ও উৎসাহী হইয়া উঠেন এবং আশ্রম ত্যাগকালে শ্রীশ্রীঠাকুরকে দয়া করিয়া একবার যত সত্বর সম্ভব তাঁহার কলিকাতার বাসভবনে শুভ পদার্পণের জন্য সনির্বন্ধ অনুরোধ নিবেদন করিয়া যান।

ইতিমধ্যে শ্রীশ্রীঠাকুর হরিণাকুণ্ডু, বরাহনগর, নৈহাটি প্রভৃতি অঞ্চল পরিভ্রমণের পর আশ্রমে প্রত্যাবর্তন করিলে, শ্রীযুক্ত শাক্যসিংহ সেন নিজেই ১৩২৫ বঙ্গাব্দের কার্তিক মাসের শেষভাগে একবার আশ্রমে আসিয়া শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা, অনন্ত মহারাজ, সুশীলচন্দ্র প্রভৃতিকে তাঁহাদের কলিকাতাস্থ কারবাল্য ট্যাংক লেনের বাড়ীতে লইয়া যান। এই সময় চন্দ্রশেখর সেন মহাশয়ের আমন্ত্রণে বহু উচ্চশিক্ষিত লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যক্তি এবং তাঁহার বিশিষ্ট বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়বর্গ শ্রীশ্রীঠাকুর দর্শনে নিত্যই তাঁহার বাসভবনে সমবেত হইতেন। ইঁহাদের সঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুরের শিক্ষা, সংস্কৃতি, সাহিত্য, ধর্ম, সমাজ, বিজ্ঞান, প্রভৃতি বিষয়ে বহু গুরুত্বপূর্ণ গভীর আলোচনা হইত। আগন্তুকগণ তাহার প্রখর বুদ্ধিমত্তা, উদার দৃষ্টিভঙ্গী, বলিষ্ঠ মতবাদ, অসাধারণ ব্যক্তিত্ব এবং সর্বোপরি তাঁহার অপূর্ব প্রেমিক চরিত্রের জীবন্ত পরিচয় পাইয়া নিরতিশয় মুগ্ধ ও প্রেরণোদ্দীপ্ত হইতেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের ভাবাদর্শে উদ্বুদ্ধ হইয়া ইঁহারাও তাঁহাদের পরিচিত মহলে তাঁহার অপূর্ব বৃত্তান্ত প্রচার করিতে থাকেন। এইভাবে তখন হইতে লোকমুখে শ্রীশ্রীঠাকুরের কথা কলিকাতার বিভিন্ন অঞ্চলে বহু বিশিষ্ট সম্ভ্রান্ত পরিবারের মধ্যে রাষ্ট্র হইয়া পড়ে। ফলে, . তাঁহার শ্রীচরণ দর্শন এবং অমিয় বাণী শ্রবণে কৃতার্থ হওয়ার মানসে শ্রদ্ধেয় সেন মহাশয়ের গৃহে শতশত আগ্রহাকুল নর-নারীর ভিড় হইত। ইঁহারা অনেকেই সৎমন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করিয়া ধন্য হইয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে রজত রায় প্রভৃতি কতিপয় ব্যারিস্টারের নাম উল্লেখযোগ্য। শ্রীশ্রীঠাকুরের জগন্মঙ্গলকর মহান আদর্শে উদ্বুদ্ধ হইয়া সুপ্রসিদ্ধ এটর্নি হীরেন্দ্রনাথ

দত্ত, সেণ্ট্রাল কলেজের স্বনামধন্য অধ্যক্ষ ক্ষুদিরাম বসু প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তি তাঁহার বিশেষ অনুরাগী হইয়া ছিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর সে যাত্রা শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর সেন মহাশয়ের বাসভবনে কিছুকাল অবস্থানের পর হিমাইতপুর প্রত্যাবর্তন করেন।

কিছুকাল পরের কথা। শ্রীঅরবিন্দের কনিষ্ঠ ভ্রাতা প্রসিদ্ধ বিপ্লবী বারীন্দ্রকুমার ঘোষ আন্দামান হইতে ফিরিবার পর হিমাইতপুর আশ্রমে আসিয়া কিছুদিন অবস্থান করেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের উদার মতবাদ ও প্রেমিক চরিত্র এবং আশ্রমবাসীদের অনাড়ম্বর জীবনযাপন, উদার মনোভাব এবং প্রীতি ও সৌহার্দ্দপূর্ণ ব্যবহারে তিনি এমনই আনন্দিত ও উদ্বুদ্ধ হইয়াছিলেন যে, সে যাত্রা আশ্রম হইতে কলিকাতা ফিরিয়াই তিনি দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের সুপ্রসিদ্ধ 'নারায়ণ' পত্রিকায় 'পাবনার মধুচক্র' শীর্ষক একটি অতীব মনোজ্ঞ প্রবন্ধ প্রকাশিত করেন। ইহাতে কলিকাতা ও মফস্বলের নানা স্থানের বহু শিক্ষিত ব্যক্তিদের নিকট শ্রীশ্রীঠাকুরের সৎসঙ্গ প্রতিষ্ঠানের গৌরবময় কাহিনী সুপরিচিত হইয়া উঠে। দেশবন্ধুও ঐ সময় বারীন্দ্রকুমারের কাছে সর্বপ্রথম শ্রীশ্রীঠাকুরের বিষয় অবগত হন।

এই সময় ১৯১৯ সালের আগষ্ট মাসে কলিকাতায় ৭নং ঈশ্বর মিল বাই-লেনের বাড়ীটি শ্রীশ্রীঠাকুরের অবস্থানের জন্য ভাড়া নেওয়া হয়। এই বাড়ীটি ছিল সৎসঙ্গের ভূতপূর্ব সম্পাদক ৺শ্যামাচরণ মুখার্জী মহাশয়ের মাতুলালয়। বাড়ীটির একাংশে তাঁহার মা ও দুই মাসীমা বাস করিতেন। ভগিনীরা তিন-জনেই ছিলেন সদ্য-বিধবা। শ্রীশ্রীঠাকুরের জননী মনোমোহিনী দেবীর অপূর্ব সেবাযত্ন ও পরিচর্যায় প্রেরণোদ্দীপ্ত হইয়া তিন ভগিনীই শ্রীশ্রীঠাকুরচরণে দীক্ষা গ্রহণ করিয়া শোকসন্তপ্ত চিত্তে শান্তি লাভ করেন। গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে সে সকল কাহিনী বিস্তারিত ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। তৎকালে শ্রীশ্রীঠাকুর জননী দেবী এবং অনন্ত মহারাজ, অশ্বিনী বিশ্বাস, সুশীল বসু, সতীশ জোয়ারদার প্রভৃতি ভক্তবৃন্দ সহ ঈশ্বর মিল লেনের বাড়ীতে শুভাগমন করতঃ কয়েক মাস বাস করিয়াছিলেন। সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে একদিন ব্যারিস্টার জে. এন্. দত্ত (নেতাজী সুভাষচন্দ্রের মাতুল) মহাশয় তদীয় পত্নী দত্ত মা, কন্যা লেডী মিত্র (স্যার বি. সি. মিত্রের পত্নী), নেতাজী সুভাষচন্দ্রের জননী প্রভাবতী দেবী প্রভৃতি আত্মীয়স্বজন সমভিব্যাহারে শ্রীশ্রীঠাকুর দর্শনে ঈশ্বর মিল লেনের বাড়ীতে আগমন করেন। সেদিন দত্ত মা শ্রীশ্রীঠাকুরকে সন্দর্শন মাত্র ভাববিহ্বল অবস্থায় করজোড়ে স্তব-স্তুতি করিতে থাকেন। সে এক অভূতপূর্ব ঘটনা। আমরা পরে যথাস্থানে এ বিষয় বর্ণনা করিব। ঐ সময় মিঃ জে. এন্. দত্ত প্রভৃতি প্রায়শঃ শ্রীশ্রীঠাকুর দর্শনে সে বাড়ীতে যাতায়াত করিতেন। কলিকাতা ও সহরতলীর নানাস্থান হইতেই প্রত্যহ বহু সম্ভ্রান্ত পরিবারের পুরুষ ও মহিলাগণ শ্রীশ্রীঠাকুরের চরণে উপস্থিত হইতেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে তাঁহারা নানা জটিল সমস্যার সমাধান

লাভে এবং তাঁহার মধুর আচরণ ও অমিয় বচনে মনে অপার শান্তি লাভ করিয়া গৃহে ফিরিতেন। এইভাবে শ্রীশ্রীঠাকুরের স্বর্গীয় সংস্পর্শে পরম প্রীতি ও তৃপ্তি লাভ করিয়া অনেকেই তাঁহাকে শ্রীগুরুপদে বরণ করতঃ সৎনামে দীক্ষা গ্রহণ করিয়া ধন্য হইয়াছিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের কৃপাধন্য এই সকল ব্যক্তিদের মধ্যে ব্যারিস্টার জে. এন্. দত্ত, তদীয় পত্নী দত্ত মা, নেতাজী সুভাষচন্দ্রের পিতৃদেব কটকের সরকারী উকীল জানকীনাথ বসু, তদীয় পত্নী প্রভাবতী দেবী, বসু দম্পতীর জ্যেষ্ঠ পুত্র ব্যারিস্টার সতীশচন্দ্র বসু, তৎপত্নী কমলবাসিনী দেবী, ভূতপূর্ব সৎসঙ্গ সম্পাদক শ্যামাচরণ মুখার্জির মাতা দুর্গাদেবী এবং দুই মাসীমা শেখরবাসিনী দেবী ও মায়া দেবী, শ্রীশ্রীঠাকুরের মেডিক্যাল স্কুলের অধ্যাপক ডাঃ শশিভূষণ মিত্র, বাগবাজারের ধীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, বি এ. সজ্জসদগুরু হুজুর মহারাজের দীক্ষিত ঢাকা নিবাসী ইন্দুহরণ মুখার্জি ও কলিকাতা এন্টালীর সুরেশচন্দ্র মুখার্জি, ব্রহ্মগবর্ণমেণ্টের উচ্চরাজকর্মচারী নিবারণচন্দ্র দত্ত প্রভৃতির নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

আর একবার কলিকাতার ১।১ সি হরিতকীবাগান লেনের বাড়ীখানা শ্রীশ্রীঠাকুরের অবস্থানের জন্য ভাড়া নেওয়া হয়। শ্রীশ্রীঠাকুরের মধ্যম ভ্রাতা প্রভাসচন্দ্র ও সংঘকর্মী সুশীলচন্দ্র বসু তথায় বাস করিতে থাকেন। ইং ১৯২০ সনের শারদীয়া পূজার পূর্বে শ্রীশ্রীঠাকুর জননী দেবী ও অনন্তনাথ প্রভৃতি কতিপয় ভক্তসহ ঐ বাড়ীতে শুভাগমন করেন। এই সময় শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীচরণ দর্শনার্থ তথায় নিত্যই বহু লোকসমাগম হইত। শ্রীশ্রীঠাকুরের পূর্বোক্ত মেডিক্যাল স্কুলের অধ্যাপক মন্ত্রশিষ্য ডাঃ শশিভূষণ মিত্র মহাশয় তৎকালে বেলেঘাটা অঞ্চলে বাস করিতেন। অভিজ্ঞ চিকিৎসক এবং উদার প্রাণ জনসেবক হিসাবে তদঞ্চলে তাঁহার যথেষ্ট সুখ্যাতি ছিল। ইঁহার মাধ্যমে বেলেঘাটা অঞ্চলের মধ্যবিত্ত বহু পরিবারের নরনারী শ্রীশ্রীঠাকুরের অমিয় সংস্পর্শের সুযোগ পান এবং সৎমন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করিয়া ধন্য হন। ইঁহাদের মধ্যে যতীন বসু, ক্ষেত্র বসু, সত্য কবি, নগেন ঘোষাল, বলাই ঘোষ, সুরেন রুদ্র, নরেন রুদ্র, মনোহর বসু, অভিরাম খাঁ, তৎপুত্র সতীশ খাঁ প্রভৃতির নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। দুঃখের বিষয় ইঁহারা কেহই আজ জীবিত নাই। উপরোক্ত ইষ্টপ্রাণ গুরুভাইদের প্রত্যেকের সম্বন্ধে কত দিনের কত কথা এখনো স্মরণে পড়ে। তাঁহাদের জানাই অন্তরের গভীর শ্রদ্ধা।

বেলেঘাটায় দীক্ষিত সৎসঙ্গীর সংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাওয়ায় তথায় একটি শাখা সৎসঙ্গ স্থাপিত হয়। স্থানীয় ইষ্ট-ভ্রাতাগণের সমবেত প্রচেষ্টায় তাহা নিয়মিত পরিচালিত হইতে থাকে। শ্রীশ্রীঠাকুর যখনই কলিকাতায় শুভাগমন করিতেন, জননী দেবী ও সাঙ্গোপাঙ্গ সহ উক্ত বেলেঘাটা শাখাকেন্দ্রে গমন করিতেন এবং কীর্তন ও সদালোচনায় সমাগত সকলকে ইষ্টানুসরণে উদ্বুদ্ধ করিতেন। তৎকালে শ্রীশ্রীঠাকুরের পরম ভক্ত শ্রদ্ধেয় সতীশচন্দ্র গোস্বামী মহাশয় কিছুকাল বেলেঘাটায় নাম প্রচার কার্যে নিয়োজিত ছিলেন। তাঁহার অপূর্ব যাজন ও কীর্তনে উদ্বুদ্ধ

হইয়া তত্রত্য অধিবাসীদের অনেকেই তখন সৎমন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই সময় সিঁথির কুঞ্জলাল, ধীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য এবং আরও অনেকে সৎনামে দীক্ষিত হন। সিঁথিতে দীক্ষিত সৎসঙ্গীর সংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে থাকায় সেখানেও একটি শাখাকেন্দ্র স্থাপিত হয়। এইভাবে ইষ্টভ্রাতাদের যাজনের ফলে, কলিকাতার বিভিন্ন অঞ্চলে এবং সহরতলীর নানাস্থানে সৎসঙ্গীর সংখ্যা দিন দিনই বৃদ্ধি পাইতে থাকে। ১/১সি হরিতকীবাগান লেনের বাড়ীতেই শ্রীশ্রীঠাকুরের অবস্থান কালে ১৯২০ সালে শ্রদ্ধেয় ৺কৃষ্ণপ্রসন্ন ভট্টাচার্য (ঋত্বিকাচার্য) শ্রীশ্রীঠাকুর-চরণে দীক্ষিত হন। ইহার এক বৎসর পূর্বে তিনি শ্রদ্ধেয় ইষ্টভ্রাতা শ্রীধীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর সঙ্গে হিমাইতপুরে সৎসঙ্গ আশ্রমে যাইয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করতঃ তৎপ্রতি সশ্রদ্ধ হইয়াছিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুরচরণে কৃষ্ণপ্রসন্নের দীক্ষা গ্রহণের পর তাঁহার পরিবারস্থ ভ্রাতা ভগিনী সকলেই সৎনামে দীক্ষা গ্রহণ করেন। ইহা উল্লেখ্য যে, পরবর্তীকালে উক্ত ১/১সি হরিতকীবাগান লেনের বাড়ীতেই দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন বাং ১৩৩১ সালের ৩১শে জ্যৈষ্ঠ তারিখে শ্রীশ্রীঠাকুরচরণে সৎনামে দীক্ষা গ্রহণ করিয়া ধন্য হন।

কলিকাতা ও সহরতলীর ভক্তগণের ঐকান্তিক আগ্রহ ও সনির্বন্ধ অনুরোধে তৎকালে সময় সময় শ্রীশ্রীঠাকুর হিমাইতপুরে আশ্রম হইতে কলিকাতায় শুভাগমন করতঃ ১/১ সি হরিতকীবাগান লেনের বাড়ীতে কিছুকাল অবস্থান করিতেন। ঐ সময় তাঁহার শ্রীচরণ দর্শন ও সঙ্গলাভের আকাঙ্ক্ষায় মহানগরীর বিভিন্ন অঞ্চলের অসংখ্য নরনারী নিত্যই আসিয়া ভিড় করিত। সমগ্র বাড়ীখানা সর্বক্ষণ সংকীর্তন ও সদালোচনায় মুখরিত থাকিত। শ্রীশ্রীঠাকুর দিবারাত্রই সমাগত নবাগত আগন্তুক ও ভক্তগণের সহিত আলাপ-আলোচনায় ব্যস্ত থাকিতেন, তাঁহার তখন স্নানাহারেরও এক মুহূর্ত অবসর থাকিত না। যতই দিন যাইতে লাগিল, কলিকাতা ও তৎপার্শ্ববর্তী বিভিন্ন পল্লীর নানা শ্রেণীর কত অসংখ্য নরনারী যে শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রেমে পাগল হইয়া তাঁহচরণে আত্মনিবেদন করিয়া ধন্য হইয়াছিলেন, তাহা বলিবার নয়।

শৈলকুপায় ও কালিয়াগঞ্জে
[শ্রীরাধারমণ জোয়ারদারের বিবৃতি]

১৩২৬ বঙ্গাব্দের ফাল্গুন মাসের কথা। একদিন সংবাদ পাইলাম, পূজনীয় সতীশচন্দ্র গোস্বামী ও কিশোরীমোহন দাস কীর্তনের দল লইয়া প্রচারকার্যে বাহির হইয়াছেন এবং বর্তমানে আমাদের বাড়ী হইতে ১৭।১৮ মাইল দূরবর্তী যশোহর জিলার শৈলকুপা গ্রামে অবস্থান করিতেছেন। আমি অশ্বারোহণে যাত্রা করিয়া তাঁহাদের সহিত ক্ষিতীশচন্দ্র মজুমদারের বাড়ীতে মিলিত হইলাম। রাত্রে কীর্তন আরম্ভ হইল। কীর্তনে সবাই ভাবে উন্মত্ত হইয়া উঠিলেন। সেদিন আমরা প্রায় দেড়শত লোক মিলিয়া এক সঙ্গে উদ্দাম নৃত্যে তুমুলে কীর্তন

করিয়াছিলাম। দেখিলাম, একটা কুকুরও মানুষের মতই নামে পাগল হইয়া সকলের সঙ্গে কীর্তনের তালে তালে নাচিতেছিল। কত লোকের পায়ের আঘাত কুকুরটার গায় লাগিতেছিল, কিন্তু সেদিকে তাহার বিন্দুমাত্র লক্ষ্য ছিল না। শৈলকুপায় এক একদিন দুই তিন বাড়ীতে আমাদের নিমন্ত্রণ থাকিত। ঠাকুর ভোগেরও ব্যবস্থা থাকিত। যখন যে বাড়ীতে আমাদের কীর্তন চলিত, কুকুরটাও সেখানে উপস্থিত হইয়া কীর্তনে যোগ দিত এবং কীর্তন শেষে সকলের সঙ্গে বসিয়া প্রসাদ পাইত।

একদিন সকালবেলা কীর্তন আরম্ভ হইয়াছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই কীর্তন খুবই জমিয়া উঠিয়াছে। হঠাৎ লক্ষ্য করিলাম, কিশোরীদা দ্রুত বেগে দৌড়াইয়া গ্রাম ছাড়িয়া চলিয়া যাইতেছেন। আমরা কীর্তনীয়ারাও তৎমুহূর্তে তাঁহার অনুগামী হইলাম এবং তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ভীষণ বেগে দৌড়াইতে লাগিলাম এই অবস্থায় কুকুরটাও আমাদের সঙ্গে দৌড়াইয়া চলিল। আমাদিগকে হঠাৎ এভাবে চলিয়া যাইতে দেখিয়া গ্রামবাসী সকলে কাঁদিতে কাঁদিতে আমাদের পিছনে ছুটিয়া চলিল। আমরা তাড়াতাড়ি পথিমধ্যে নদী পার হইয়া অপর পারে যাইয়া দ্রুতবেগে চলিতে লাগিলাম। বেশ কিছুদূর অগ্রসর হইয়া আমরা দেখিতে পাইলাম, গ্রামশুদ্ধ লোক তখনও নদীর তীরে দাঁড়াইয়া এক দৃষ্টিতে আমাদের দিকে তাকাইয়া আছে।

কিশোরীদা সাধারণতঃ কীর্তনের দল লইয়া বেগে দৌড়াইয়া পথ চলিতেন এবং কখনো কখনো কোথায়ও একস্থানে দাঁড়াইয়া ভাববিহ্বল অবস্থায় নৃত্য করিতে করিতে কীর্তন করিতেন। সেদিনও আমরা সারাদিন তাঁহার সঙ্গে এই-ভাবে চলিয়াছিলাম। সন্ধ্যাবেলা এক গ্রামের কতকগুলি লোক আসিয়া আমাদিগকে তাহাদের গ্রামে লইয়া যাইবার জন্য বিনীত প্রার্থনা জানাইল। আমরা তাহাদের গ্রামে গিয়া কীর্তন করিতে লাগিলাম। কীর্তন অন্তে রাত্রি প্রায় ১২টার সময় ঠাকুরভোগের ব্যবস্থা হইল। সকলে প্রসাদ পাইয়া শয়ন করিতে গেলাম।

পরদিন প্রাতঃকালে যথারীতি আমাদের কীর্তন আরম্ভ হইল। কিছুক্ষণ কীর্তনের পর কিশোরীদা সে গ্রাম ছাড়িয়া ছুটিয়া চলিলেন, আমরাও তাঁহার সঙ্গে দৌড়াইতে লাগিলাম। এই অবস্থায় শৈলকুপার মত এ গ্রামের অধিবাসী-গণও ছোট বড় সকলে কাঁদিতে আরম্ভ করিল এবং অনেক দূর পর্যন্ত আমাদের পিছনে পিছনে ছুটিয়া আসিল। একটা গাভী ও তাহার বৎস পথের ধারে বাঁধা ছিল। গাভীটা দড়ি ছিঁড়িয়া বাছুরটাকে ফেলিয়া কীর্তনের সঙ্গে ছুটিয়া চলিল। কিশোরীদা কীর্তনরত অবস্থায় দৌড়াইয়া যাইতেছেন, কীর্তনীয়ারাও কীর্তন করিতে করিতে তাঁহার পিছনে ছুটিয়া চলিয়াছে। এইভাবে কত গ্রাম কত মাঠ অতিক্রম করিয়া আমরা কেবলই সম্মুখের দিকে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছি, সেই গাভীটাও কীর্তনের সঙ্গেই রহিয়াছে। সেদিনও সন্ধ্যার কিছু পূর্বে পথিমধ্যে

এক গ্রামের বহু লোক আসিয়া আমাদিগকে তাহাদের গ্রামে যাইতে সানির্বন্ধ অনুরোধ জানাইল। আমরা তথায় গিয়া উপস্থিত হইলাম। কীর্তন একটানা সমানে চলিতে লাগিল। সেই গাভীটাও কীর্তনের সঙ্গেই রহিল। এই সুদীর্ঘ সময়ের কীর্তনে কীর্তনীয়ারা যখনই কেহ ক্লান্ত হইয়া পড়িতেছে, গোস্বামী প্রভু তখনই ছুটিয়া গিয়া কাহাকেও আলিঙ্গন, কাহাকেও বা স্পর্শ করিয়া শক্তি সঞ্চার করিয়া দিতেছেন, তাহাতে কীর্তন আবার তুমুল বেগে চলিতেছে। এইভাবে কীর্তন চলিতে চলিতে রাত্রি দুইটার সময় তাহা সমাপ্ত হইলে, ঠাকুরভোগের ব্যবস্থা হইল। প্রসাদ পাওয়ার পর আমরা সকলে বিশ্রাম লইলাম।

এইভাবে কীর্তন করিতে করিতে গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে চলিবার কালে একদিন পথে কালিয়াগঞ্জ বাজারের লোকজন আসিয়া, সেখানে কিছুদিন থাকিয়া সকলকে কীর্তন শুনাইবার জন্য আমাদিগকে অনুরোধ করিল এবং বাজারের একটি দোতালা দালানে আমাদের সকলের থাকিবার ব্যবস্থা করিয়া দিল। কালিয়াগঞ্জকে কেন্দ্র করিয়া আমরা চতুষ্পার্শ্বের গ্রামাঞ্চলে যাইয়া কীর্তন করিতে লাগিলাম। এই সময় পাল্লা গ্রামের প্রমথ শিকদার, রায় গ্রামের আশুতোষ মিত্র প্রভৃতি বহু গ্রামের বহুলোক আসিয়া আমাদিগকে তাহাদের নিজ নিজ গ্রামে লইয়া যাওয়ার জন্য অনুরোধ জানাইল। আমরা যে কয়দিন সেখানে ছিলাম এই সকল গ্রামে যাইয়া তুমুল কীর্তন করিয়াছিলাম।

এক দিনের কথা। কালিয়াগঞ্জ বাজারের ষোলআনা বন্দর ঘুরিয়া আমরা হাটের মধ্যস্থলে কীর্তন আরম্ভ করিয়াছি। বহুলোক আসিয়া সেই কীর্তনে যোগ দিয়াছে। আমরা সকলে আনন্দে আত্মহারা হইয়া উদ্দাম নৃত্যের সঙ্গে তুমুল কীর্তন চালাইয়াছি। কিশোরীদা গোঁসাই প্রভু পরস্পরে বহুপাশে আবদ্ধ হইয়া মধুর ভঙ্গীতে নৃত্য করিতে করিতে কীর্তন করিতেছেন। এমন সময় মনে হইল, কি যেন একটা গন্ডগোল চলিতেছে। আমি চক্ষু মেলিয়া দেখিলাম, কীর্তনের চারিদিক বেষ্টন করিয়া বহুলোক বড় বড় লাঠি উঠাইয়া আমাদিগকে যেন মারিবার জন্য উদ্যত হইয়া আছে। ইহাতে আমার মনে একটু ভয়ের সঞ্চার হইল। গোস্বামী প্রভু তাহা বুঝিতে পারিয়া তৎক্ষণাৎ ছুটিয়া আসিয়া আমাকে আলিঙ্গনাবদ্ধ করতঃ আমাতে শক্তি সঞ্চারিত করিয়া দিয়া গেলেন। আমি চক্ষু মুদিত করতঃ পূর্ববৎ নিবিষ্ট মনে কীর্তন করিতে লাগিলাম।

কীর্তন শেষ হইলে জানিতে পারিলাম, কীর্তনের প্রভাবে একটি বেশ্যামায়ের তত্ত্ব-জ্ঞানের উন্মেষ হওয়ায়, সে আর ঐরূপ পাপ কাজ না করিয়া সৎভাবে জীবন যাপনের স্থির সংকল্প গ্রহণ করে। ইহাতে তাহার প্রণয়াসক্ত লোকগুলি তাহাকে ঐ সংকল্প হইতে বিরত করিবার জন্য বারংবার নানাভাবে চেষ্টা করে। বেশ্যামা তখন দুর্বৃত্তদের হাত হইতে নিজেকে রক্ষা করিবার জন্য মাথার চুল কাটিয়া ফেলিয়া কীর্তনের মধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়ে। দুর্বৃত্ত লোকগুলি তখন হামলা করিয়া তাহাকে কীর্তন হইতে ছিনাইয়া লইয়া যাওয়ার জন্য

দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয় এবং বড় বড় লাঠি লইয়া কীর্তনের দলটিকে ঘিরিয়া ফেলে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, কীর্তনের অপূর্ব প্রভাবে লোকগুলি লাঠি হাতে হত-ভম্বের মত দাঁড়াইয়া থাকিয়া তন্ময় হইয়া কীর্তন শুনিতে লাগিল, এইভাবে কিছুক্ষণ অতিবাহিত হওয়ার পর, তাহারা প্রাণের আবেগে আকুল হইয়া কীর্তনে ঝাঁপাইয়া পড়িল এবং ভাববিহ্বল অবস্থায় সকলের সঙ্গে নৃত্য করিতে করিতে কীর্তন করিতে লাগিল।

[শ্রীহরিপদ সাহার বিবৃতি]

১৩২৬ বঙ্গাব্দের ফাল্গুন মাসে শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশেষ নির্দেশে গোঁসাই বাবা (সতীশচন্দ্র গোস্বামী) ও কিশোরী বাবা (কিশোরীমোহন দাস) কীর্তনের দল নিয়ে শৈলকুপায় (যশোহর) এসেছিলেন। আমিও তাঁদের সঙ্গে ছিলাম। কোকন ভাই (কোকন বুনে) আমাদের কীর্তনের দলে ঢাক বাজাতো। তার বাজনা শুনলে প্রাণ আপনা আপনি কীর্তনের জন্য নেচে উঠতো। এমন প্রাণ মাতানো ঢাকের বাজনা জীবনে কেউ বোধ হয় কোনদিন শুনে নি। শৈলকুপায় জোয়ারদারদের বাড়ীতে আমাদের থাকবার ব্যবস্থা হলো। কীর্তনের দল নিয়ে আমরা ওখানে পাঁচ ছয় দিন ছিলাম। রোজই তুমুল কীর্তন হতো। আমাদের কীর্তন শুনে কতকগুলি ঈর্ষাপরায়ণ দুষ্ট ব্যক্তি আমাদের শত্রু হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তারা নানা রকমে আমাদের কীর্তনে বাধা সৃষ্টি করতে লাগলো, কিন্তু তাতে আমাদের উৎসাহ উম্মাদনা আরও চতুর্গুণ বেড়ে গেল। যতদিন আমরা সেখানে ছিলাম রাত্রিদিন কীর্তন চলত। গ্রামের সর্বত্র এবং চারিপাশে ঢাকের বাজনা ও সুমধুর "রাধা রাধা রাধা বোল" ধ্বনি ছাড়া আর কিছু শোনা যেতো না। সেই প্রাণোন্মাদা কীর্তন শুনে গ্রামবাসীরা মুগ্ধ হয়ে কাঠের পুতুলের মত স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতো। একদিন সন্ধ্যাবেলা এক বাড়ীতে কীর্তন আরম্ভ হয়েছে। প্রচন্ড বেগে তুমুল কীর্তন চলছে, এমন সময় এক অপূর্ব ঘটনা ঘটলো। বছর সাতেকের একটি ছেলে ও বছর পাঁচেকের একটি মেয়ে হঠাৎ কোথা থেকে এসে কীর্তনে যোগ দিল। এমন মধুর ভঙ্গীতে তারা দুজনে নাচতে লাগলো যে, তাদের নৃত্য দেখে সকলে মুগ্ধ হয়ে গেল। ছবির রাধাকৃষ্ণের মতই এদেরও সুঠাম সুন্দর দেহের উজ্জ্বল জ্যোতি ছিল।

শৈলকুপা থেকে আমাদের হাঁটাপথে যশোহর কালিয়াগঞ্জে যাবার কথা হলো। শৈলকুপার নীচে দিয়েই গোড়াই নদী। এই নদী পার হয়েই আমাদের যেতে হবে। শৈলকুপার লোকেরা এতদিন আমাদের কীর্তন শুনে এমনি মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল যে, আমাদের যাবার কথা শুনে তারাও আমাদের সঙ্গে যাবার জন্য পাগল হয়ে উঠলো। অবশেষে বেগতিক দেখে আমরা তাড়াতাড়ি নৌকা ছেড়ে দিলাম। নদী পার হয়ে আমরা কীর্তন করতে করতে বেগে দৌড়াতে লাগলাম। এদিকে গ্রামবাসীরা সবাই মিলে ভীষণ চীৎকার শুরু করে দিল।

ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়াতে দৌড়াতে কোন মতে আমরা তাদের দৃষ্টিপথের বাইরে গিয়ে পড়লাম। সেদিন সারা রাত্রি পথ হেঁটে আমরা পরদিন কালিয়াগঞ্জ পেঁ'ছিলাম। যে কয়দিন আমরা সেখানে ছিলাম, রোজই তুমুলে কীর্তন হতো! ঐ সময় একদিন হঠাৎ শ্রীশ্রীঠাকুর গিয়ে সেখানে উপস্থিত হলেন। তাঁকে পেয়ে আমাদের কীর্তনের বেগ শতগুণে বেড়ে গেল। সেবার শৈলকুপায় ও কালিয়াগঞ্জে বহু লোক সৎমন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করেছিল।

নওগাঁয় (রাজসাহী)

[শ্রীযতীন্দ্রনাথ বসুর বিবৃতি]

১৩২৪ বঙ্গাব্দের শেষভাগে ভক্তবৃন্দসহ শ্রীশ্রীঠাকুরের নওগাঁ পরিভ্রমণের পর ১৩২৭ বঙ্গাব্দে শ্রদ্ধেয় কিশোরীমোহন দাস সত্যনাম প্রচারের জন্য পুনরায় তথায় গমন করেন। পাবনা-নিবাসী জনৈক গোস্বামী মহাশয়ের নওগাঁয় অনেক শিষ্য-সেবক ছিলেন। বড়ই দুঃখের বিষয়, উক্ত গোস্বামী তাঁহার শিষ্যবর্গের নিকট শ্রীশ্রীঠাকুরের সম্বন্ধে অযথা নানা নিন্দাবাদ করিতেন। ইহাতে তাহারা শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রতি বিশেষ বিদ্বেষভাবাপন্ন ছিলেন।

কীর্তন ও বক্তৃতার মাধ্যমে শ্রীশ্রীঠাকুরের ভাবধারা প্রচারের উদ্দেশ্যে কিশোরীমোহন সে যাত্রা তথায় এক জনসভার আয়োজন করিয়াছিলেন। এদিকে গোস্বামী মহাশয় তাঁহার শিষ্যগণ লইয়া উক্ত সভা পণ্ড করিয়া দিবার জন্য ষড়যন্ত্র আরম্ভ করিলেন। কিশোরীমোহন এ বিষয় পূর্ব হইতে জানিতে পারিয়া হিমাইতপুর আশ্রমে শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট জরুরী সংবাদ প্রেরণ করেন। শ্রীশ্রীঠাকুরও তখন কলিকাতায় ইষ্টভ্রাতা শ্রীসুশীলচন্দ্র বসুকে তারবার্তায় জানাইলেন—"যতীনদাকে নিয়ে আপনি অনতিবিলম্বে নওগাঁ রওনা হউন।"

বিশেষ জরুরী প্রয়োজনে আমি সেদিন হাইকোর্টে গিয়াছিলাম। বাড়ী ফিরিবার পথে ডালহৌসী স্কোয়ারের নিকট সুশীলদার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়। তাঁহার কাছে শ্রীশ্রীঠাকুরের উক্ত আদেশ জানিতে পারিয়া আমরা উভয়ে তৎক্ষণাৎ শিয়ালদহ রেলস্টেশনে চলিয়া যাই এবং বিকালে সাড়ে পাঁচটায় দার্জিলিং মেলে রওনা হইয়া রাত্রি সাড়ে দশটায় নওগাঁয় পৌঁছি! সেই দিনই কিশোরী-মোহনের সভা হওয়ার কথা। আমরা রেলস্টেশন হইতে সরাসরি সভাস্থলে গিয়া উপস্থিত হইলাম। সভায় তখন কীর্তন চলিতেছিল। বলা বাহুল্য, উক্ত গোস্বামী মহাশয় ও আপন দুরভিসন্ধি সিদ্ধির মানসে দলবলসহ তথায় উপস্থিত ছিলেন। শ্রদ্ধেয় কিশোরীমোহন আমাদের দেখিয়াই সভায় সমবেত জনতার সম্মুখে ঘোষণা করিলেন,—"এইমাত্র কলিকাতা হইতে শ্রীশ্রীঠাকুরের দুইজন বিশিষ্ট ভক্ত আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। আপনারা ইঁহাদের নিকট পরম প্রেমময় শ্রীশ্রীঠাকুরের অপূর্ব ভাবরাজি সম্বন্ধে অনেক বিষয় জানিতে পারিবেন।"

আমি তৎক্ষণাৎ হারমোনিয়াম ধরিলাম এবং সকলে সমবেত কণ্ঠে কীর্তন গান

গাহিলাম। রাত্রি ১টা পর্যন্ত এইভাবে পরমার্থ বিষয়ক নানা সঙ্গীত করিয়া আমরা সংকীর্তন আরম্ভ করিলাম। আমাদের গান শুনিয়া সভাস্থ সকলে এমন মুগ্ধ হইলেন যে, কীর্তন শেষ করায় তাঁহারা সকলেই বিশেষ দুঃখিত হইলেন এবং আরও কিছুক্ষণ কীর্তন চালাইয়া যাওয়ার জন্য পুনঃ পুনঃ সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাইতে লাগিলেন। আমরাও তাঁহাদের এরূপ ঐকান্তিক আগ্রহ না মানিয়া পারিলাম না। আরও কিছুক্ষণ খুব তুমুল বেগে কীর্তন চলিল। এই অবস্থায় উক্ত গোস্বামী ও তাঁহার শিষ্যগণ সেদিন আর আমাদের অনুষ্ঠানে কোনরূপ বিঘ্ন সৃষ্টি করিতে সাহসী হইলেন না। এদিকে রাত্রি অত্যন্ত অধিক হওয়ায় আমাদের পক্ষ হইতে জানানো হইল যে, আগামীকাল স্থানীয় থিয়েটার হলে শ্রীশ্রীঠাকুরের ভাবধারা সম্বন্ধে আমাদের একটি বিশেষ সভার অধিবেশন হইবে এবং তাহাতে কীর্তন ও বক্তৃতার মাধ্যমে সকল বিষয় বিশেষভাবে আলোচনা করা হইবে। আমাদের এই বিজ্ঞপ্তিতে শ্রোতৃমণ্ডলী সন্তুষ্ট চিত্তে গৃহে ফিরিলেন।

পরদিন বিকাল চারি ঘটিকায় 'থিয়েটার হলে' আমাদের সভার কার্য যথারীতি আরম্ভ হইল। এখানে একটি কথা বলিয়া রাখি যে, আমাদের আয়োজিত সভানুষ্ঠানটিকে পণ্ড করিবার কু-অভিপ্রায়ে গোস্বামী মহাশয় ঐদিন আমাদের সভাগৃহের অনতি দূরে আর একটি সভার আয়োজন করিয়াছিলেন। কিন্তু বলিতে কি, তাহাতে সামান্য সংখ্যক মাত্র লোকই উপস্থিত ছিলেন। আর ঈশ্বরানুগ্রহে আমাদের সভায় এত অধিক লোক সমাগম হইয়াছিল যে, হল-ঘরে স্থান সংকুলন না হওয়ায় বহু লোককে ঘরের বারান্দায় এবং বাহিরের প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া থাকিয়া বক্তৃতাদি শুনিতে হইয়াছিল। যথাসময়ে মঞ্চের উপর আমাদের কীর্তনের দল ও বক্তারা আসন গ্রহণ করিলেন। আমরা সর্বপ্রথম গান ধরিলাম,—

"হৃদ্‌মাঝারে দাঁড়াও এসে দয়াল ঠাকুর দয়া করি।
মনের সুখে রাখবো বুকে তোমার দু'টি চরণতরী॥
দিবানিশি দেখবো তোমার মোহন তনু ঠাম।
সেই প্রেম গলানো রূপটি মরি জিনি কোটি কাম॥
তোমার প্রেমে পাগল হবো গাইব তোমার নাম,—
রাধা রাধা রাধা নাম,
রাধা রাধা রাধা বলে নাচবো অবিরাম,
তোমার রূপসাগরে মন ভাসাব
জীবন-মরণ এক করি॥

হৃদয় আমার করো তোমার মধুর লীলাভূমি।
নূপুর পায়ে রাধা বলে নাচবে সেথা তুমি॥

আমি শুধু লুটিয়ে রব চরণ তোমার চুমি,
ওহে রাধাস্বামী
ওগো অন্তর্যামী,
এই কর নাথ সুখে দুখে তোমায় যেন না পাশরি ॥"

আমরা প্রায় ২০।২৫ জনে এই কীর্তনটি করি। আমাদের কীর্তন শুনিয়া শ্রোতৃবৃন্দ উল্লসিত অন্তরে সমস্বরে বলিয়া উঠিলেন,—"আবার" "আবার"। আমরা দ্বিতীয়বার কীর্তনটি গাহিলাম। জনতার ভিতর হইতে তুমুল হর্ষধ্বনির মধ্যে গানটি আবার গীত হইবার জন্য শত শত কণ্ঠ হইতে সনির্বন্ধ অনুরোধ আসিল। আমরা তৃতীয় বার গানটি করিলাম। এইভাবে শ্রোতৃবর্গের ঐকান্তিক আগ্রহে আমরা ক্রমান্বয়ে চারিবার কীর্তন করিবার পরেও যখন কীর্তনের জন্য আবারও অনুরোধ আসিল, তখন আর কীর্তন করা হইল না।

কিশোরীমোহন এইবার বক্তৃতা করিতে উঠিলেন। উক্ত গোস্বামী মহাশয় তখন সভাস্থলে দাঁড়াইয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের সম্বন্ধে অজস্র মিথ্যা নিন্দাবাদ আরম্ভ করিলেন। কিশোরীমোহন বজ্রনির্ঘোষ কণ্ঠে গোস্বামী মহাশয়ের উক্তির তীব্র প্রতিবাদ করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে সমবেত জনমণ্ডলী এবং এমনকি গোস্বামী মহাশয়ের শিষ্যদের অনেকে উন্মত্তপ্রায় হইয়া সমস্বরে বলিয়া উঠিলেন,—"ওঁরা যা বলেছেন সবই ঠিক, ওঁদের কথাই শুনতে হয়, এই ব্যাটাই যত নষ্টের মূল, মার ব্যাটাকে, ধর এই ব্যাটাকে…।" এই সকল কথা উচ্চৈঃস্বরে বলিতে বলিতে সভাস্থ সকলে গোস্বামী মহাশয়ের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িলেন। এই অবস্থায় গোস্বামী মহাশয় বেগতিক দেখিয়া প্রাণভয়ে ঊর্দ্ধশ্বাসে সভাস্থল হইতে দৌড়াইয়া পলায়ন করিলেন।

অতঃপর আমরা এই সকল গণ্ডগোলের জন্য সভার কার্য স্থগিত রাখিবার প্রস্তাব করিলে উপস্থিত সকলে সমবেত কণ্ঠে সভার কার্য যথাযথ চালাইয়া যাইবার জন্য পুনঃ পুনঃ অভিমত প্রকাশ করিতে লাগিলেন। কিশোরীমোহনের ভাষণ সমাপ্ত হইল। অতঃপর শ্রদ্ধেয় সুশীলচন্দ্র বসু অনেকক্ষণ বক্তৃতা করিলেন। সর্বশেষে আর একটি কীর্তন করিবার পর সভাভঙ্গ হইল। কীর্তন ও বক্তৃতা শুনিয়া শ্রোতৃমণ্ডলী মুগ্ধ হইলেন এবং উচ্চ প্রশংসাবাদে আমাদের বিশেষভাবে অভিনন্দিত করিলেন।

উক্ত সভায় শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবনী ও কর্মধারা বিস্তারিতভাবে আলোচিত হওয়ার ফলে নওগাঁ সহরে শ্রীশ্রীঠাকুরের কথা এমন ব্যাপকভাবে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল যে, পরদিন হইতে দলে দলে লোক আসিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের কাহিনী পরম ঔৎসুক্য সহকারে শুনিতে লাগিল এবং বহুলোক সৎনামে দীক্ষা গ্রহণ করিয়া ধন্য হইল।

নওগাঁ সহরে সে যাত্রা নাম প্রচারের কিছুকাল পরে নওগাঁ নিবাসী সংঘ-ভ্রাতা শ্রীশ্রীচরণ বসাক বি. এ. ও কবিরাজ গিরীন্দ্রনাথ গোস্বামী শ্রীশ্রীঠাকুরের নির্দেশক্রমে হিমাইতপুর আশ্রম হইতে মহারাজ অনন্তনাথ, কিশোরীমোহন ও

সতীশচন্দ্র গোস্বামী প্রভৃতি শ্রীশ্রীঠাকুরের অন্তরঙ্গ পার্ষদগণকে নওগাঁয় আনিয়া আর একবার তথায় ব্যাপকভাবে প্রচারকার্য চালাইয়াছিলেন। ঐ সময় আশ্রমের একটি বড় কীর্তনের দলও নওগাঁর উক্ত প্রচার কার্যে বিশেষ সহযোগিতা করিয়াছিল। নওগাঁ ও তৎপার্শ্ববর্তী অঞ্চলে এইভাবে কয়েকবার ঠাকুরের ভাবধারা প্রচারের ফলে তথাকার অধিবাসী বহুলোক শ্রীশ্রীঠাকুর-চরণে দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিল এবং কিছুকালের মধ্যে তথায় একটি সুন্দর সৎসঙ্গ কেন্দ্র গড়িয়া উঠিয়াছিল।

সেযাত্রা ভক্তগণ নওগাঁ হইতে কীর্তনের দল লইয়া নাটোর গমন করেন। সেখানে তাঁহারা কিছুদিন অবস্থান করিয়া চতুষ্পার্শ্বের নানাস্থানে কীর্তন ও আলোচনার মাধ্যমে সত্যনাম প্রচার করেন। নাটোর সহরে ভক্তগণ প্রত্যহ কীর্তনের দল সহ নগর পরিক্রমায় বাহির হইতেন। একদিন তাঁহারা সারা সহর ঘুরিয়া স্থানীয় শ্রীশ্রীজয়কালী মাতার মন্দির প্রাঙ্গণে উপস্থিত হন। তথায় একটি বিরাট জনসভার আয়োজন করা হইয়াছিল। ঐ অঞ্চলের অসংখ্য লোক সে সভায় যোগদান করিয়াছিলেন। সাতক্ষীরার উকীল শ্রীকেদারনাথ বসু, প্রধান শিক্ষক শ্রীশ্রীচরণ বসাক প্রভৃতি বিশিষ্ট বক্তাগণ ঐ সভায় প্রাঞ্জল ভাষায় শ্রীশ্রীঠাকুরের জগমঙ্গলকর ভাবরাজি বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেন। ফলে তদঞ্চলের বহু লোক সৎনাম গ্রহণ করিয়াছিলেন।

কয়েক বৎসর পর ১৩২৯ বঙ্গাব্দে শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রবীণ ভক্ত সতীশচন্দ্র গোস্বামী ও কিশোরীমোহন দাস কীর্তনের দলের চারুচন্দ্র সরকার, তরণী বুনে, কোকন বুনে প্রভৃতি প্রায় ৩০।৪০ জন বিশিষ্ট কীর্তনীয়া সহ নাম প্রচারার্থ পুনরায় নওগাঁ গমন করেন। ভক্তগণ কয়েকদিন সেখানে থাকিয়া প্রত্যহ সহরের অলিতে-গলিতে এবং নিকটবর্তী গ্রামসমূহে ঘুরিয়া সত্যনাম প্রচার করিয়াছিলেন। ইহাতে স্থানীয় অধিবাসীদের মধ্যে এক বিরাট জাগরণের সাড়া পড়িয়া গিয়াছিল। ঐসময় স্থানীয় ইষ্টপ্রাণ সংঘভ্রাতা কবিরাজ গিরীন্দ্রনাথ গোস্বামী, চন্দ্রভূষণ নন্দী, গৌরচন্দ্র ঘোষ প্রভৃতির সহায়তায় সহরের হাইস্কুলে এক বিরাট জনসভার আয়োজন করা হইয়াছিল। সভার প্রারম্ভে ভক্ত কিশোরীমোহন তাঁহার উদ্দাম নৃত্য এবং প্রাণোন্মাদী কীর্তনে সমবেত সকলকে মুগ্ধ করেন। অতঃপর বিশিষ্ট বক্তাগণ সদ্গুরু ও সৎনামের মহিমা সম্বন্ধে তত্ত্ব ও তথ্যপূর্ণ আলোচনায় উপস্থিত সকলকে সৎমন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করিতে উদ্বুদ্ধ করেন।

ফরিদপুর, রাজবাড়ী ও ঈশ্বরদী অঞ্চলে

[সুখময় সরকারের বিবৃতি]

বহুকাল আগের কথা। রেলওয়ে ষ্টেশন মাষ্টার সংঘভ্রাতা শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় পরম প্রেমময় শ্রীশ্রীঠাকুরকে সবিশেষ অনুরোধ জানাইয়া তাঁহার অনুমতি ক্রমে একবার আমাদের কীর্তনের দলটি ফরিদপুর লইয়া গিয়াছিলেন। আমরা তাঁহার বাসায়ই থাকিতাম এবং প্রত্যহ কীর্তন লইয়া নানা স্থানে যাইতাম।

এক দিনের কথা। আমরা নিশান হস্তে কীর্তন করিতে করিতে প্রথমতঃ

সমগ্র সহর প্রদক্ষিণ করি এবং অতঃপর স্থানীয় কলেজ প্রাঙ্গণে উপস্থিত হই। সেখানে এক বিরাট জনসভার আয়োজন করা হইয়াছিল। ঐ সভায় ইষ্টভ্রাতা শ্রীশ্রীচরণ বসাক বি. এ. শ্রীপূর্ণচন্দ্র কবিরাজ বি. এ. শ্রীকেশবনাথ বসু বি. এল. শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র দাস, শ্রীকিশোরীমোহন দাস প্রভৃতি বিশিষ্ট বক্তাগণ শ্রীশ্রীঠাকুরের ভাবধারা সম্বন্ধে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেন। ইঁহাদের বক্তৃতায় শ্রোতৃমণ্ডলী বিশেষ উদ্বুদ্ধ হইয়াছিলেন। সভাভঙ্গের পর সহরের কতিপয় নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি সৎমন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করেন। অতঃপর আরও অনেকে হিমাইতপুর আশ্রমে গিয়া দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন।

ফরিদপুর হইতে আমরা রাজবাড়ী যাত্রা করি। পথে প্রভু জগদ্বন্ধুর আশ্রমে উপস্থিত হইয়া তাঁহার সমাধিস্থান প্রদক্ষিণ করতঃ কীর্তন করি। সেস্থান হইতে রওনা হইয়া আমরা পথিমধ্যে এক বিশিষ্ট ধনী ভদ্রলোকের বাড়ীর সম্মুখে উপস্থিত হইলে, তিনি বিশেষ আগ্রহ সহকারে আমাদিগকে তাঁহার প্রাচীর ঘেরা বাড়ীর অন্দর মহলে লইয়া যান। আমরা সেখানে বহুক্ষণ ধরিয়া ভাববিহ্বল অবস্থায় উদ্দাম নৃত্যে তুমুল কীর্তন করি। এদিকে গৃহস্বামী ভদ্রলোক আমাদের জন্য প্রচুর চিড়া, মুড়কী, দই, ক্ষীর, সন্দেশ, রসগোল্লা প্রভৃতি উৎকৃষ্ট খাদ্যসামগ্রী সংগ্রহ করিয়া আনিলেন এবং কীর্তন শেষে আমাদের সকলকে এক পঙ্ক্তিতে বসাইয়া পরম পরিতোষ সহকারে ভোজন করাইলেন। এদিকে তথায় উপস্থিত গ্রামবাসীরা গোস্বামী সতীশচন্দ্র ও কিশোরীমোহনের নিকটে বসিয়া গম্ভীর মনোযোগের সহিত তত্ত্বালোচনা শুনিতে লাগিলেন। তুমুল আনন্দ ধ্বনি ও হৈ-চৈ রবের মধ্যে আমাদের ভোজন-উৎসব প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে, এমন সময় কোকনদা হঠাৎ আসন হইতে উঠিয়া পড়িয়া ডঙ্কায় বাড়ি দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে বসন্তদা গিয়া করতাল ধরিলেন। অমনি আমরাও সকলে যে যাহার অভুক্ত অবশিষ্ট ভোজ্যদ্রব্য পাতে রাখিয়াই আসন হইতে লাফাইয়া উঠিয়া পড়িলাম এবং সকলে মিলিয়া পূর্বের মত তুমুল বেগে কীর্তন আরম্ভ করিয়া দিলাম। কীর্তন যখন খুবই জমিয়া উঠিয়াছে, গোস্বামী সতীশচন্দ্র ও কিশোরীমোহন আসিয়া কীর্তনে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন।

এই সময় ঐ বাড়ীর সকলে আসিয়া আমাদের কীর্তনদলটির চারিদিক বেষ্টন করিয়া দাঁড়াইল। তাহারা এই বুদ্ধি করিয়াছিল যে, সেদিন আর আমাদিগকে অন্যত্র যাইতে দিবেন না। মহারাজ অনন্তনাথ ইহাদের মনোভাব বুঝিতে পারিয়া, গোস্বামী সতীশচন্দ্র ও কিশোরীমোহনকে ইঙ্গিত ক্রমে তাঁহার সঙ্গে লইয়া বহির্বাটীর দিকে বেগে ছুটিয়া চলিলেন। আমরাও তখন সবাই কীর্তন করিতে করিতে তাঁহাদের পশ্চাতে দৌড়াইলাম এবং কেহ বা দরজা টপ্‌কাইয়া, কেহ প্রাচীর ডিঙাইয়া ঝুপ্‌ঝাপ্‌ রাস্তায় নামিয়া পড়িলাম। আমাদের কীর্তন কিন্তু এই অবস্থায়ও পূর্ণ উদ্যমে তীব্র গতিতে সমান তালে চলিতে লাগিল। ছুটিতে ছুটিতে আমরা রেল স্টেশনে আসিয়া উপস্থিত হইলাম এবং তথায় প্রস্তুত রাজবাড়ী-গামী ট্রেনে উঠিয়া পড়িলাম। গাড়ীর মধ্যেও তুমুল বেগে আমাদের কীর্তন চলিতে লাগিল। ট্রেন রাজবাড়ী পৌঁছিলে আমরা নামিয়া পড়িলাম এবং

কীর্তন করিতে করিতে রাখালদার বাসায় গিয়া উপস্থিত হইলাম। সেখানে কিঞ্চিৎ জলযোগের পর আমরা আবার কীর্তন আরম্ভ করিয়া দিলাম। চারিদিক হইতে বহু লোক আসিয়া আমাদের কীর্তনে যোগদান করিল। সেদিন আমরা এইভাবে দিবারাত্রই তুমুল কীর্তনানন্দে অতিবাহিত করিয়াছিলাম।

পর দিবস প্রত্যূষে উঠিয়া প্রভাতী কীর্তন অন্তে কিছু খাবার খাইয়া আমরা কীর্তন লইয়া নগর পরিক্রমায় বাহির হইলাম। কিয়দ্দূরে অগ্রসর হইয়া আমরা এক চৌমাথায় দাঁড়াইয়া দীর্ঘ সময় ধরিয়া উদ্দাম নৃত্যে কীর্তন করি। এই সময় আরও বহুলোক আসিয়া আমাদের কীর্তনে যোগ দান করিল। সমাগত সকলের সমবেত কণ্ঠে কীর্তন যখন খুব জমিয়া উঠিল, গোস্বামী সতীশচন্দ্র ও কিশোরীমোহন হঠাৎ কীর্তনের মধ্য হইতে ছুটিয়া বাহির হইয়া এক বড় রাস্তা ধরিয়া বেগে দৌড়াইতে লাগিলেন। আমরাও কীর্তন করিতে করিতে তাঁহাদের পশ্চাতে ছুটিয়া চলিলাম। কিছুটা পথ অগ্রসর হওয়ার পর দেখা গেল, সেই রাস্তাটার অনেক দূর পর্যন্ত প্রায় এক হাত উঁচু খোয়া (খণ্ড খণ্ড ইটের টুকরা) সাজানো রহিয়াছে। আমরা সেই খোয়ার উপর দিয়াই পরম আনন্দ ও উৎসাহে নাচিয়া নাচিয়া কীর্তন করিতে করিতে দ্রুতবেগে চলিলাম। সে সময় একটি মেথর ভাই ময়লার বালতী মাথায় করিয়া এ রাস্তা দিয়া যাইতেছিল। কীর্তনানন্দে মাতোয়ারা হইয়া ময়লার বালতীটি মাথায় লইয়াই সেও নাচিতে নাচিতে আমাদের সঙ্গে ছুটিয়া চলিল। ইহাতে বালতীর ময়লা ছিটকাইয়া আমাদের গায়ের উপর পড়িতে লাগিল। বলিতে কি, ভক্তদের আনন্দ-উন্মাদনা ইহাতে বিন্দুমাত্র শিথিল হওয়া দূরে থাকুক, তাহা আরও বহুগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছিল। মেথর ভাইটি কীর্তনরসে এমনি মাতিয়া উঠিয়াছিল যে, কিছুক্ষণ পরে সে ময়লার বালতিটি দূরে নিক্ষেপ পূর্বক উর্ধ্ববাহু হইয়া বাদ্যের তালে তালে সকলের সঙ্গে নাচিতে আরম্ভ করিল। ভক্তগণ সেদিন আনন্দ বিহ্বল অবস্থায় কীর্তন করিতে করিতে এমন দ্রুতবেগে ছুটিতে ছিলেন যে, তাঁহাদের পদক্ষেপের সজোর আঘাতে রাস্তার খোয়াগুলি দুইধারে ছিটকাইয়া পড়িতেছিল। ইহাতে রাস্তার দুই পার্শ্বের পথচারীদের যাতায়াতে ভীষণ অসুবিধা হইতেছিল। আমাদের এইরূপ অদ্ভুত উন্মাদবৎ কাণ্ড দেখিয়া তাহারা অনেকে মন্তব্য করিয়াছিল,—"এরা নিশ্চয়ই গাঁজাখোর, নতুবা এমন ভাবে পাগলের মত দৌড়াবে কেন?"

এইভাবে কীর্তনানন্দে বিভোর হইয়া সহরের সকল রাস্তা, বাজার, কোর্ট, কাছারী, গৃহস্থপল্লী ও সহরতলীর নানা অঞ্চল ঘুরিয়া আমরা বেলা দ্বিপ্রহর অন্তে রাখালদার গৃহে ফিরিলাম। বাসায় পৌঁছিবা মাত্র মহারাজ কৃষ্ণলীলার গীত জুড়িয়া দিলেন,—

"কাল বেলি অবসানে গিয়ে যমুনা পুলিনে
মোহন মূরতি এক দেখিয়া আইনু সই…
… … … …
সে যে রাধা রাধা বলে ও বাঁশিটি বাজায় গো।।"

গোস্বামী সতীশচন্দ্র ও কিশোরীমোহনও তখন হেলিয়া দুলিয়া নানা ভাবভঙ্গী সহকারে ঐ গানের তালে তালে নাচিতে লাগিলেন। মহারাজের সুধামাখা কণ্ঠের সেই প্রাণমাতানো সঙ্গীতে সমবেত নরনারী সবাই মাতিয়া উঠিল এবং কেহ হুলুধ্বনি কেহ শঙ্খ ধ্বনি, কেহ বা হরিধ্বনি করিয়া তাহাদের প্রাণের বিপুল আনন্দোচ্ছ্বাস প্রকাশ করিতে লাগিল।

কীর্তন-অন্তে মহারাজ শ্রীশ্রীঠাকুরের অপূর্ব জীবন ও বাণী এবং সৎনামের অপার মহিমা সম্বন্ধে আলোচনা আরম্ভ করিলেন। এই আলোচনা সভায় স্থানীয় ডাক্তার কেদারনাথ ভট্টাচার্য নামক জনৈক পণ্ডিত ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। তিনি নানা তত্ত্বকথার অবতারণা করিয়া মহারাজের নিকট নানা কূট প্রশ্নের উত্থাপন করিলেন। উক্ত ভদ্রলোক ইতিপূর্বেও নাকি বহু সাধু, সন্ন্যাসী ও ধর্মপ্রচারককে এইরূপ প্রশ্নবাণে বিধ্বস্ত করিয়াছেন। আমরা লক্ষ্য করিলাম, মহারাজ ঐ ব্যক্তির উত্থাপিত প্রশ্নাদির কোনরূপে মীমাংসা দান করিতে আদৌ চেষ্টা করিলেন না। তিনি তাঁহাকে তাঁহার স্বভাবসুলভ সহাস্য বদনে শুধু বলিলেন, "দেখুন দাদা, বহুদিন ধরেই তো শুধু তর্কবিতর্ক করেই আসছেন, এখন এসব ছেড়ে দিয়ে একবার একটু কাজ করেই দেখুন না, কি হয়। যদি কোন সুফল না পান, ছেড়ে দিতে কতক্ষণ! নাম নিতে বা ছাড়তে তো আর টাকা পয়সা লাগবে না? কাজ না করে শুধু কথা বলে লাভ কি?" মহারাজের সুতীক্ষ্ম সুস্পষ্ট উক্তিগুলি শুনিয়া ভদ্রলোকটি আর কোনরূপ দ্বিরুক্তি না করিয়া সাগ্রহে তৎক্ষণাৎ সৎমন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করিলেন।

সেবার ফরিদপুর ও রাজবাড়ী অঞ্চলে এইভাবে কিছুকাল নাম প্রচারের ফলে স্থানীয় বিশিষ্ট অধিবাসী বহুলোক সৎনামে দীক্ষা গ্রহণপূর্বক শ্রীশ্রীঠাকুরকে সদ্‌গুরুপদে বরণ করিয়া ধন্য হইয়াছিলেন।

ইষ্টভ্রাতা জমিদার সুরেন্দ্রনাথ পাঁড়ে মহাশয়ের সনির্বন্ধ অনুরোধে শ্রীশ্রীঠাকুর একবার শ্রদ্ধেয় সতীশচন্দ্র গোস্বামী ও কিশোরীমোহনের নেতৃত্বে আমাদের কীর্তনদলকে নাম প্রচারের জন্য তাঁহার বাড়ীতে পাঠাইয়া ছিলেন। সেদিন ঝড় বৃষ্টির মধ্যে ভিজিতে ভিজিতে আমরা ঈশ্বরদি রেল স্টেশন হইতে আড়াই ক্রোশ পথ হাঁটিয়া সুরেন্দ্রনাথের বাড়ীতে গিয়া উপস্থিত হই। রজনীর নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া তখনই আমরা কীর্তন আরম্ভ করিয়া দিলাম। রাত্রি যত অধিক হইতে লাগিল, কীর্তনের বেগও ততই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। অবশেষে গভীর নিশীথে কীর্তনের ভীমনাদ গর্জিয়া উঠিল। উদ্দাম নৃত্যসহ তাণ্ডব কীর্তনে চতুর্দিক প্রকম্পিত করিয়া তুলিল। সেই উত্তাল কীর্তনে নৃত্যপরায়ণ অবস্থায় গোস্বামী সতীশচন্দ্র ও কিশোরীমোহন সময় সময় সিংহবিক্রমে হুংকার দিয়া উঠিতেছেন। পাঁচ পোয়া (১¼ হস্ত পরিমিত ছাউনী যন্ত্র) ডঙ্কা কাঁধে কোকনদা বাজী খাইতে খাইতে পাকে পাকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া বাদ্য করিতেছেন আর আমরা সবাই সেই গুরু গম্ভীর বাদ্যধ্বনির সঙ্গে তালে তালে উদ্দণ্ড নৃত্যে কীর্তন করিয়া যাইতেছি। ডঙ্কা, শঙ্খ, ঘণ্টা, কাঁসর, করতাল প্রভৃতির তুমুল শব্দে গৃহ-স্বামীর বিরাট ভবন মুখরিত হইয়া উঠিয়াছে। এই সময় বাড়ীর ভৃত্য আসিয়া

কর্তাকে সংবাদ দিল,—"গোয়াল ঘরে একটা গরু কীর্তনের তালে তালে এমনি উল্লম্ফনে নাচতে সুরু করেছে যে, ওটাকে বেঁধে রাখা দায় হয়ে পড়েছে।" কর্তা বলিলেন,—"ওটাকে আরও শক্ত করে বেঁধে রাখ।" গরুটাকে অতিকষ্টে বাঁধিয়া রাখা হইল বটে, কিন্তু যতক্ষণ কীর্তন চলিল, গরুটার উল্লম্ফী নৃত্যও ততক্ষণ সমান তালে চলিয়াছিল।

উষাকালে আমাদের কীর্তন থামিল। আমরা তখন সকলে নাম ধ্যানে ব্রতী হইলাম। প্রাতঃকৃত্য সমাপনের পর আবার একদিকে আমাদের কীর্তন এবং অন্যদিকে মহারাজের তত্ত্বালোচনা আরম্ভ হইল। এইরূপ দিবারাত্র তুমুল কীর্তন ও সদালোচনায় আমরা সেখানে এক সপ্তাহ কাল অতিবাহিত করিলাম। প্রতিদিন চতুষ্পার্শ্বের অসংখ্য গ্রামবাসী আসিয়া আমাদের কীর্তনে ও মহারাজের তত্ত্বালোচনায় যোগদান করিত। ইহাতে চতুর্দিকে শ্রীশ্রীঠাকুরের কথা ব্যাপক ভাবে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। বহু নরনারী তখন সৎনামে দীক্ষা গ্রহণপূর্বক ধন্য হইয়াছিল। সপ্তাহান্তে আমরা সুরেনদার বাড়ী হইতে সদলবলে আশ্রম অভিমুখে যাত্রা করিলাম। ঐ সময় সুরেনদা তাঁহার ঐ গাভীটিকে শ্রীশ্রীঠাকুর চরণে উৎসর্গ করতঃ আমাদের সঙ্গে আশ্রমে পাঠাইয়া দিলেন।

কার্সিয়াং-এ

১৯২২ সালের কথা। শ্রীশ্রীঠাকুর অসুস্থাবস্থায় বায়ু পরিবর্তনের জন্য পরিবার-পরিজন ও ভক্তবৃন্দ-সহ কার্সিয়াং গিয়া একমাসেরও অধিক কাল অবস্থান করিয়াছিলেন। তৎকালে ভক্তগণ শ্রীশ্রীঠাকুরের নির্দেশে প্রত্যহ দুই বেলা কীর্তন লইয়া সহর ও সহরতলীর সর্বত্র পরিভ্রমণ করিয়া স্থানীয় আবালবৃদ্ধবনিতা সকলের কাছে নামসুধা বিতরণ করিতেন। তত্রত্য অধিবাসী অনেকেই তখন শ্রীশ্রীঠাকুরের জনকল্যাণ ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ হইয়া তাঁহার অনুরাগী ভক্ত হইয়াছিলেন। কার্সিয়াংএ রোমান্ ক্যাথলিক খৃষ্টানদের একটি 'কনভেণ্ট' ছিল। ভক্তগণ প্রায়শ সেখানে গিয়া মহাপ্রাণ যীশু ও পরমপ্রেমময় শ্রীশ্রীঠাকুরের উদার ভাবধারা ও চরিত্রমাহাত্ম্য সম্বন্ধে আলাপ-আলোচনা করিতেন। তাহাতে মিশনারীগণ শ্রীশ্রী-যীশু ও শ্রীশ্রীঠাকুর উভয়ের জীবনচলনা ও ভাবরাজির অপূর্ব সামঞ্জস্যের পরিচয় পাইয়া অতীব মুগ্ধ হইয়াছিলেন। এবং তজ্জন্য তাঁহারা সকলে শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রতি অশেষ শ্রদ্ধাশীল ছিলেন।

প্রসঙ্গান্তর হইলেও শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবনের অন্যতম উল্লেখযোগ্য ঘটনা বিবেচনায়, আমরা এই সুযোগে তাঁহার তৎকালীন সেই অসুস্থতার কিঞ্চিৎ বিবরণ এখানে লিপিবদ্ধ না করিয়া পারিলাম না। যথা :—

ইংরাজী ১৯২১ সালের এপ্রিল মাসের প্রথম সপ্তাহে শ্রীশ্রীঠাকুর হিমাইতপুর নিজ বাড়ীতে জ্বররোগে আক্রান্ত হন। প্রতিদিন বিকালবেলা তাঁহার জ্বর আসিত।

সর্বপ্রথম মহারাজ অনন্তনাথ তাঁহার চিকিৎসা করেন। অতঃপর সংঘভ্রাতা কুষ্টিয়ার প্রবীণ ডাক্তার গোকুলচন্দ্র মণ্ডল ও কলিকাতার অভিজ্ঞ ডাক্তার ইষ্টভ্রাতা শশীভূষণ মিত্র (মাস্টার মহাশয়) একে একে তাঁহার চিকিৎসা করেন। ইঁহাদের চিকিৎসায় কোন সুফল না হওয়ায় পাবনা সহরের প্রসিদ্ধ চিকিৎসকগণের দ্বারা এলোপ্যাথী, হোমিওপ্যাথী ও কবিরাজী মতে বেশ কিছুকাল চিকিৎসা চালানো হয়। কিন্তু কোন চিকিৎসায়ই কোন সুফল পাওয়া গেল না। জ্বর কিছুতেই ছাড়িল না।

দীর্ঘ এক বৎসর কাল এইভাবে রোগ ভোগের পর শ্রীশ্রীঠাকুরকে চিকিৎসার্থ ১৯২২ সালের ২৭শে মে কলিকাতায় লইয়া যাওয়া হইল। সেখানে গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেনে শ্রীশ্রীঠাকুরের বাল্যবন্ধু হিমাইতপুরের প্রমথ সাহা চৌধুরীর গদি বাড়ীর দ্বিতলের একখানা গৃহে তাঁহার বাসস্থানের ব্যবস্থা হয়। সে সময় কলিকাতার বহু অভিজ্ঞ ডাক্তার শ্রীশ্রীঠাকুরকে পরীক্ষা করিয়া বহু রকম অভিমত প্রকাশ করিলেন। কেহ কেহ রোগ ম্যালেরিয়া বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়া তাঁহাকে কুইনাইন ইন্‌জেক্‌সন দিয়াছিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুরের কিন্তু কুইনাইন প্রয়োগ মোটেই মনঃপূত ছিল না। কারণ তিনি জানিতেন, কুইনাইন তাঁহার শরীর বিধানে মোটেই সহ্য হয় না, এবং এমন কি ইহাতে তাঁহার জীবনেরও আশঙ্কা ঘটিতে পারে। বস্তুতঃই একদিন তাঁহার হৃদ্‌পিণ্ডের ক্রিয়া বন্ধ হওয়ার উপক্রম হইয়াছিল। চতুর্দিকে হাহাকার পড়িয়া গিয়াছিল। কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া সকলে কাতরকণ্ঠে রোদন করিতে লাগিলেন। যাহোক, পরমপিতার দয়ায় এবং ভক্তগণের আকুল প্রার্থনায় সংকট কাটিয়া যায়, তাঁহার প্রাণ রক্ষা হয়। এই কুইনাইন ইন্‌জেকসানে তাঁহার দেহযন্ত্রের উপর চির জীবনের মত এমন বিষক্রিয়া সৃষ্টি করিয়াছিল যে, অনেক দিন পর্যন্ত তিনি হৃদ্‌পিণ্ডের দুর্বলতার জন্য যথেষ্ট কষ্ট পাইয়াছিলেন। এ সম্বন্ধে একদিন তিনি কথাপ্রসঙ্গে বলিতেছিলেন,—"যে বুক হাজার বিপদের মুখেও কোন দিন কাঁপে নাই, এমন কি, মহাশূন্যে মহাপ্রলয়ের ভীষণ গর্জনে—যখন সমস্ত জগৎ রেণু রেণু হয়ে কোথায় মিশে যাচ্ছে—জ্ঞান জ্ঞেয় জ্ঞাতা লয় হয়ে যাচ্ছে—সত্তা অভিভূত হয়ে উঠছে, তখনো এ-বুক একটু কাঁপে নাই, আর এখন তোদের একটু বিপদ দেখলেই আমার বুকের মধ্যে ধড়্‌ফড়্ করে উঠে, আর মনে হয় বুঝি হার্ট ফেল করল।"

শ্রীশ্রীঠাকুরের অসুখের কথা যাহা বলিতেছিলাম। বহু ডাক্তারের বহু চিকিৎসায় কিছুতেই জ্বরত্যাগ হইতেছে না। দেখিয়া কলিকাতার তদানীন্তন প্রসিদ্ধ ডাক্তার গোপাল চাটার্জিকে ডাকা হইল। তিনি T. B. রোগ সিদ্ধান্ত করিয়া রোগীর উপর নানারূপ পরীক্ষাকার্য চালাইলেন। ইহাতে শ্রীশ্রীঠাকুরের শরীর ক্রমশ আরও দুর্বল হইয়া পড়িল। এই অবস্থায় কলিকাতার স্বনামধন্য চিকিৎসক ডাঃ আর. এল্. দত্তের শরণাপন্ন হওয়া গেল। তিনি রোগীকে বিশেষভাবে পরীক্ষা করিয়া অভিমত প্রকাশ করিলেন যে রোগ কিছুতেই T. B.

হইতে পারে না, T. B. ইনজেকসন দেওয়া মোটেই সমীচীন হয় নাই। তিনি বলিলেন,—রোগ বিশেষ কিছু নয়। বহুলোকের সঙ্গে ঠাকুর দিবারাত্র মেলামেশা করেন এবং সকলের সঙ্গে সব সময় অজস্র কথাবার্তা বলেন, বিশ্রাম করিবার অবসর পান কম। কোন স্বাস্থ্যকর স্থানে গিয়া কিছুকাল বিশ্রাম নিলেই তিনি সারিয়া উঠিবেন। ডাঃ দত্ত রোগীকে বায়ু পরিবর্তনের জন্য কার্সিয়াং লইয়া যাওয়ার পরামর্শ দিলেন। ডাঃ আর. এল. দত্ত পাবনায় সিভিলসার্জন থাকা কালে ঠাকুরপরিবারের চিকিৎসক ছিলেন। জননীদেবীকে তিনি বিশেষ-ভাবে বলিলেন যে, তিনি নিজে শীঘ্রই কার্সিয়াং গিয়া কিছুকাল থাকিবেন, রোগীকে তিনি সেখানে যথাযথ তত্ত্বাবধান করিতে পারিবেন। ডাঃ আর. এল. দত্তের পরামর্শ মত শ্রীশ্রীঠাকুরকে কার্সিয়াং লইয়া যাওয়াই সাব্যস্থ হইল। শ্রীশ্রী-ঠাকুর এই প্রস্তাবে বিশেষ আপত্তি জানাইলেন। তিনি পুনঃ পুনঃ এই কথাই বলিতে লাগিলেন,—"তোরা আমায় হিমাইতপুরে নিয়ে চল্, আমি সেখানে গেলেই সেরে উঠব।"

বলা বাহুল্য, এ ব্যাপারে শ্রীশ্রীঠাকুরের কথার উপর গুরুত্ব স্থাপন করার কোন প্রয়োজনীয়তা কেহই বোধ করিলেন না। অবশেষে জননীদেবী শ্রীশ্রীঠাকুরকে লইয়া কার্সিয়াং যাত্রা করিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের পত্নী সরসীবালা দেবী, ভগিনী গুরুপ্রসাদী দেবী, মাসতুত ভাই যতীশচন্দ্র এবং অনন্ত মহারাজ, শশধর কর্মকার, প্রমথ সাহাচৌধুরী, কিশোরীমোহন প্রভৃতি ইষ্টভ্রাতাগণ শ্রীশ্রীঠাকুরের সঙ্গে গেলেন। কিছুকাল পরে ইষ্টভ্রাতা রাধারমণ জোয়ারদারও তথায় যান। কার্সিয়াংএ সকলে শ্রীশ্রীঠাকুরকে লইয়া "জ্যাস্‌মিন বাওয়ার" নামক বাড়ীতে অবস্থান করিতে থাকেন।

ঐ সময় একদিন শ্রীশ্রীঠাকুরের অবস্থা খুবই সংকটাপন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। সংঘভ্রাতা সুশীলচন্দ্র বসু মহাশয় তৎকালে হিমাইতপুর হইতে আশ্রমের কোন জরুরী কাজে কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। সেদিন সন্ধ্যাকালে ধ্যানরত অবস্থায় শ্রীশ্রীঠাকুরের তৎকালীন গুরুতর অবস্থার একখানা সুস্পষ্ট ছবি তাঁহার মানস পটে জ্বল্ জ্বল্ করিয়া ভাসিয়া উঠে। তিনি দেখিলেন, শ্রীশ্রীঠাকুর যন্ত্রণায় ছট্ ফট্ করিতেছেন এবং 'গেলাম রে' 'মলাম রে' বলিয়া আর্তনাদ করিতেছেন। ইহাতে ধ্যান ভঙ্গ হওয়ায় তিনি পুনরায় ধ্যানে বসিলেন, সেবারও তিনি পূর্ববৎ দৃশ্যই দেখিলেন। আবার তিনি ধ্যানে বসিলেন, এবারও তদ্রূপ একই দৃশ্য দেখিতে পাইলেন। এই অবস্থায় শ্রীশ্রীঠাকুরকে দেখিতে কার্সিয়াং যাওয়ার জন্য সুশীলচন্দ্র খুবই অস্থির হইয়া পড়িলেন। এমন সময় মাস্টার মহাশয় ডাঃ শশীভূষণ মিত্র একখানা টেলিগ্রাম হাতে করিয়া তথায় উপস্থিত হইয়া বলিলেন, কার্সিয়াং হইতে এইমাত্র খবর আসিল—**Thakur seriously ill start immediately.** সুশীলচন্দ্র, ডাঃ শশীভূষণ ও ডাঃ গোকুল মণ্ডল তিনজনেই তখন অনতিবিলম্বে কার্সিয়াং যাত্রা করিলেন এবং পরদিন ভোরে গিয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। কার্সিয়াং পেঁৗছিয়া গোকুলবাবু ও মাস্টার মহাশয় শ্রীশ্রীঠাকুরকে

পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন, তাঁহার প্রবল জ্বর এবং তৎসঙ্গে গলায় বুকে ও হৃদপিণ্ডে ও অন্যান্য স্থানে ভীষণ অস্বস্তিকর নানা উপসর্গ রহিয়াছে।

ঘটনাচক্রে সেদিন দুপুরে বাড়ীতে বড় কেহ ছিলেন না। শ্রীশ্রীঠাকুরকে অপেক্ষাকৃত একটু ভাল দেখিয়া শ্রীশ্রীমা ডাক্তারের বাড়ী গিয়াছিলেন, মহারাজ অনন্তনাথ গোকুলবাবু ও মাস্টার মহাশয়কে লইয়া কোন বিশেষ প্রয়োজনে বাহিরে গিয়াছিলেন। বাড়ীর ভিতরে শুধু শ্রীশ্রীবড়মা ও গুরুপ্রসাদী আছেন এবং সুশীলচন্দ্র শ্রীশ্রীঠাকুরের কক্ষে রহিয়াছেন। সুশীলচন্দ্র হঠাৎ লক্ষ্য করিলেন, অসহ্য যন্ত্রণায় শ্রীশ্রীঠাকুর যেন ক্রমশঃ সংজ্ঞাহারা হইয়া পড়িতেছেন। শ্রীশ্রীঠাকুর এই সময় তাঁহার নিজের মাথায় হাত দিয়া সুশীলচন্দ্রকে ইসারা করিলেন। সুশীলচন্দ্র বুঝিলেন তিনি মাথায় জল চাহিতেছেন। সুশীলচন্দ্র তৎক্ষণাৎ শ্রীশ্রী-বড়মাকে ডাকিলেন। তাঁহারা উভয়ে এবং গুরুপ্রসাদী তাড়াতাড়ি জল আনিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের মাথায় প্রচুর পরিমাণে ঢালতে লাগিলেন। এইভাবে কিছুক্ষণ অনবরত তুষার শীতল জল ঢালার ফলে শ্রীশ্রীঠাকুর ধীরে ধীরে সুস্থ হইয়া উঠেন। এই সময় যতীশচন্দ্র বাড়ীতে আসেন। শ্রীশ্রী মা ও ডাঃ আর. এল্. দত্তকে সংবাদ দেওয়ার জন্য তাঁহাকে তৎক্ষণাৎ পাঠানো হইল। খবর পাইয়া তাঁহারাও অবিলম্বেই আসিয়া উপস্থিত হইলেন। একটু সুস্থ হইলে পর শ্রীশ্রীঠাকুর বলিলেন, "সুশীলদা ঠিক সময়েই এসে পড়েছিলেন। আর একটু দেরী হলেই গেছিলাম আর কি! সুশীলদা যে আমার ইঙ্গিত বুঝতে পেরে আমার সর্দি কাশি জ্বর ইত্যাদি সম্বন্ধে কোন বিচার বিবেচনা না করে অনবরত জল ঢেলেছেন, পরমপিতার দয়ায় এতেই বেঁচে গেলাম।"

কার্সিয়াং-এ শ্রীশ্রীঠাকুরের চিকিৎসা চলিয়াছে। কত ঔষধপত্র দেওয়া হইল, কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। এই অবস্থায় আর একদিনও তাঁহার খাত বসিয়া যাওয়ার মত অবস্থা হইয়াছিল। সকলের মুখ বিষাদাচ্ছন্ন। চারিদিকে হুলস্থুল পড়িয়া গেল। ডাক্তারের জন্য ছুটাছুটি আরম্ভ হইল। মহারাজ অনন্তনাথ তখন শ্রীশ্রীঠাকুর-ঘরে প্রবেশ করিয়া দ্বার অর্গল বন্ধ করতঃ শ্রীশ্রীঠাকুরের চরণ যুগল বক্ষে লইয়া অঝোরে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। দর-বিগলিত ধারায় তাঁহার বক্ষস্থল প্লাবিত হইতেছে। আর তন্ময় অবস্থায় আকুল প্রাণে তিনি নাম করিতেছেন। ঘরে অন্য আর কেহই ছিলেন না। এই অবস্থায় সারারাত্রি অতিবাহিত হইল। পরদিন প্রাতে শ্রীশ্রীঠাকুর স্নেহবিগলিত কণ্ঠে বলিলেন,— "নে, আর কাঁদিস্ নে, আমাকে এক্ষুনি হিমাইতপুর নিয়ে চল্। বাড়ী গেলেই আমি ভাল হয়ে উঠব।" অনন্তনাথ বাহিরে আসিয়া সকলের কাছে শ্রীশ্রীঠাকুরের অভিমত ব্যক্ত করিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুরকে লইয়া সেইদিনই সকলে স্বদেশাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

বাড়ী আসিবার পরও শ্রীশ্রীঠাকুরের রোগ-ভোগ চলিতে লাগিল। ডাঃ গোকুলবাবু প্রায়শই কুষ্টিয়া হইতে শ্রীশ্রীঠাকুরকে দেখিতে আসেন। একদিন তিনি তাঁহাকে বলিলেন,—"আমি তো বহু টাকার উপার্জন ক্ষতি করে আপনার

নিকট আছি, কিন্তু অসুখের তো কিনারা কিছুই করতে পারছি না। আপনি যদি দয়া করে নিজে সারবার ইচ্ছা না করেন, তাহলে আমাদের কারও সাধ্য নেই যে আপনাকে রোগমুক্ত করতে পারি।" শ্রীশ্রীঠাকুর অন্য নানা কথা বলিয়া একথা চাপা দিলেন। তাঁহার অসুখ একইরূপে চলিতে লাগিল, বরং তিনি পূর্বাপেক্ষা আরও অধিক দুর্বল হইয়া পড়িলেন। কয়েক দিন পরে গোকুলবাবু আবার আসিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুরকে সারাইয়া তুলিবার জন্য শ্রীশ্রীমা গোকুলবাবু প্রভৃতিকে বিশেষ পীড়াপীড়ি করিয়া ধরিলেন। একদিন শ্রীশ্রীমা শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে খুবই কান্নাকাটি করিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর অতঃপর একদিন প্রবীণ ভক্তদের বলিলেন,— "যাওয়ার জন্য মন প্রস্তুত হয়ে গেছে, আর ফিরবার উপায় নেই। তবে যদি আপনারা এই মন পরিবর্তন করে দিতে পারেন। তবে হয়ত রোগ সেরে যেতে পারে।" সেই দিনই অনন্ত মহারাজ স্থানীয় সৎসঙ্গীদের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া দিবারাত্র ২৪ ঘণ্টা আকুলপ্রাণে নামধ্যানের ব্যবস্থা করিলেন। সকলেই তাহাতে সর্বান্তঃকরণে যোগ দিলেন। প্রত্যেকবার চারজন করিয়া পালাক্রমে পনরদিন দিবা-রাত্র অবিরাম নামধ্যান চলিল। অতঃপর সকলে শ্রীশ্রীমা সহ শ্রীশ্রীঠাকুরের সমীপে উপস্থিত হইয়া তাঁহার রোগমুক্তির জন্য তিনি নিজেই যাহাতে ইচ্ছা করেন, তজ্জন্য কাতর কণ্ঠে প্রার্থনা জানাইলেন। তৎপর দিন শ্রীশ্রীঠাকুর নিজেই অনন্তনাথকে ডাকিয়া বলিলেন,—"যদি সারতে হয় একটু ওষুধ দে।" অনন্তনাথ বলিলেন— কি ঔষধ দিব? ঠাকুর বলিলেন—যা হয় একটা কিছু দে। অনন্তনাথ বলিলেন— কি ঔষধ দিব, বুঝতে পারছি না! শ্রীশ্রীঠাকুর তখন একটা বাইওকেমিক ঔষধের নাম করিলেন। অনন্তনাথ তাহা আনিয়া দিলেন। এই ঔষধ সেবনেই শ্রীশ্রী-ঠাকুরের বহুদিনের অসুখ একেবারে সারিয়া গেল।

নীলাচলে

নেতাজী সুভাষচন্দ্রের ধর্মপ্রাণ পিতৃদেব কটকের ভূতপূর্ব সরকারী উকীল রায়বাহাদুর জানকীনাথ বসু ও ভক্তিমতী জননী প্রভাবতী দেবী উভয়েই ছিলেন শ্রীশ্রীঠাকুরের একান্ত অনুগত ভক্ত। ইঁহাদের ঐকান্তিক আগ্রহ ও অনুরোধে শ্রীশ্রীঠাকুর পরিবারবর্গ ও ভক্তবৃন্দ সহ বঙ্গাব্দ ১৩২৯ সনের ১৬ই পৌষ রবিবার মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের সর্বশেষ পুণ্য লীলাভূমি নীলাচলে গমন করিয়াছিলেন। পুরীধামে সমুদ্রতীরে আর্মষ্ট্রং রোডের উপর অবস্থিত বসু মহাশয়ের নিজস্ব ভবন 'হরনাথ লজে' শ্রীশ্রীঠাকুর ও তাঁহার পরিবারবর্গের জন্য বাসস্থান নির্দিষ্ট হইয়াছিল। নিকটেই আরও কয়েকটি বড় বড় বাড়ীতে অপর সকলের থাকিবার ব্যবস্থা হইয়াছিল।

শ্রীশ্রীঠাকুরের পুরী পৌঁছার কিছুদিন পরে গোস্বামী সতীশচন্দ্র ও কিশোরীমোহন কীর্তনের দল ও আশ্রমিকদের লইয়া হিমাইতপুর হইতে পুরী অভিমুখে যাত্রা করেন। সঙ্গীয় অপর যাত্রীদের কটক হইতে ট্রেনযোগে পুরী পাঠাইবার ব্যবস্থা করিয়া তাঁহারা উভয়ে পথিমধ্যে জগৎপুরে রেল স্টেশনে নামিয়া পড়েন এবং তথা হইতে পদব্রজে সদলবলে কীর্তন করিতে করিতে পুরীতে

শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীচরণে গিয়া উপস্থিত হন। শ্রীক্ষেত্রের মত মহাতীর্থ ক্ষেত্রে শ্রীশ্রীঠাকুরের পুণ্য পাদপীঠতলে অবস্থান করতঃ আনন্দ উপভোগ ও পুণ্য অর্জনের আকাঙ্ক্ষায় বঙ্গদেশবাসী শ্রীশ্রীঠাকুরের বহু শিষ্য ঐ সময় নানাস্থান হইতে শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীচরণ সমীপে আসিয়া সমবেত হইয়াছিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর সে যাত্রা প্রায় দুই শতাধিক ভক্ত সহ দীর্ঘ দেড় মাস বসু দম্পতি-ভবনে অবস্থান করিয়াছিলেন।

এতদিন ধরিয়া পরিবারবর্গ সহ পরমারাধ্য শ্রীশ্রীঠাকুরের যথাযোগ্য সেবাপূজা এবং ভক্তবৃন্দের যথোচিত সম্বর্ধনায় সস্ত্রীক জানকীনাথ যে অপূর্ব নিষ্ঠা, উদারতা ও মহত্ত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহা বলিবার নয়। গৃহাগত পরমাত্মীয় অতিথিগণের ভোজন, শয়ন, বিশ্রাম এবং অন্যান্য যাবতীয় প্রয়োজন পূরণের যথাযথ ব্যবস্থাপনায় যাহাতে কোথাও একটু ত্রুটি না ঘটে, যাহাতে কেহ কোন বিষয়ে বিন্দুমাত্র অসুবিধা ভোগ না করেন, সেজন্য তাঁহারা সর্বক্ষণ তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিতেন। এই বৃহৎ ব্যাপারের সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য তাঁহারা যে অক্লান্ত শ্রম, অসীম ত্যাগ ও অজস্র অর্থ ব্যয় করিয়াছিলেন, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না।

পুরী অবস্থানকালে ভক্তগণ প্রত্যহ প্রাতঃকৃত্য সমাপণ পূর্বক কয়েকটি কীর্তনের দলে বিভক্ত হইয়া নানা দিকে নগর পরিক্রমায় বাহির হইতেন। তাঁহারা সহরের বিভিন্ন অঞ্চল পরিভ্রমণ করিয়া এবং নানা মঠে গমন করিয়া তাণ্ডব নৃত্য সহ তুমুল কীর্তন করতঃ সর্বত্র সকলের কাছে নামসুধা বিতরণ করিতেন। কীর্তনান্তে গৃহে ফিরিতে প্রতিদিনই তাঁহাদের মধ্যাহ্ন উত্তীর্ণ হইয়া যাইত। জয়ডঙ্কা, শঙ্খ, ঘণ্টা ও কাঁসরাদির বিপুল বাদ্যসহ সেই প্রাণোন্মাদী কীর্তনে নগরবাসী আবালবৃদ্ধবনিতা সকলে আনন্দে মাতিয়া উঠিত। ভক্তগণ প্রায়শঃ কীর্তনের দল লইয়া শ্রীশ্রীজগন্নাথ মন্দিরের প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইয়া দীর্ঘ সময় ধরিয়া উদ্দণ্ড নৃত্যসহ তুমুল কীর্তন করিতেন। তথায় সমবেত সহস্র সহস্র নরনারী এবং শ্রীমন্দিরের পাণ্ডাগণ সেই অপূর্ব কীর্ত্তন শুনিয়া আনন্দে উদ্দীপ্ত বিস্ময়ে পুলকিত হইতেন। পুরী প্রবাসকালে ভক্তগণ সময় সময় কীর্ত্তনের দল লইয়া কটক, সাক্ষীগোপাল, ভুবনেশ্বর প্রভৃতি অঞ্চলেও গমন করিয়া ব্যাপকভাবে সত্যনাম প্রচার করিয়াছিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর যতদিন পুরীতে বাস করিয়াছিলেন, তাঁহার আবাসবাটিকাখানি সমাগত শত-শত আগন্তুক ও ভক্তবৃন্দের আনন্দ কোলাহলে রাত্রিদিন মুখরিত থাকিত। নিত্যই সহরের গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ এবং স্থানীয় জনসাধারণ বহু লোক তাঁহার দর্শন ও সঙ্গ লাভের জন্য 'হরনাথ লজে' সমবেত হইতেন। তাঁহারা নিজ নিজ জীবনের নানা জটিল সমস্যাদির সমাধানের জন্য তাঁহার শ্রীচরণে প্রার্থনা জানাইতেন। শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁহার স্বভাবসুলভ ভঙ্গীমায় সে সমুদয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের সহজ সরল মীমাংসা দান করিতেন, তাহাতে সকলের মনে এক দিব্য ভাবোন্মাদনার সঞ্চার হইত—সর্বসংশয় মুক্ত হইয়া তাঁহারা সবাই অসীম স্বস্তি ও শান্তিলাভ করিতেন। আর্ত, ব্যথিত কত নরনারী তাঁহার চরণে উপস্থিত হইতেন।

তাঁহার নয়নাভিরাম দেবমূর্তি দর্শন ও অমিয়মধুর বচন শ্রবণে সকলের তাপিত প্রাণ শীতল হইত। এই অবস্থায় অনেকে মন্তব্য করিতেন,—শ্রীশ্রীঠাকুরের পুরীধামে আগমন যেন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর নবরূপে পুনরাবির্ভাব।" কেহ কেহ অভিমত প্রকাশ করিতেন,—"এতদিন পরে পুরীর আকাশে আবার গৌরচন্দ্রের উদয় হইয়াছে। সেবার পুরী প্রবাস-কালে বহু উৎকলবাসী নরনারী তাঁহার ঐশী প্রেমে আকৃষ্ট হইয়া সৎমন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করতঃ ধন্য হইয়াছিল।

পুরী অবস্থানকালে শ্রীশ্রীঠাকুর প্রায়দিবসই ভক্তগণ পরিবৃত হইয়া সমুদ্র-স্নানে গমন করিতেন। সে এক অনির্বচনীয় মহা আনন্দ-মহোৎসব! শ্রীশ্রীঠাকুর ভক্তগণ সহ সমুদ্র-সৈকতে উপনীত হইলে, সকলে মিলিয়া তথায় বহুক্ষণ তুমুল কীর্তন চালাইতেন। অতঃপর শ্রীশ্রীঠাকুর সকলকে লইয়া সমুদ্রজলে অবতরণ-পূর্বক তরঙ্গ প্রবাহের তালে তালে কীর্তনরত অবস্থায় স্নানক্রীড়ায় মত্ত হইতেন। স্নানকালে দীর্ঘ সময় ধরিয়া দোলন, কীর্তন, আলিঙ্গন হাস্য-কৌতুক ও জল সিঞ্চনাদি আনন্দ-উল্লাসের এক বিপুল অনুষ্ঠান চলিত। স্নান সমাপনান্তে ভক্তগণ শ্রীশ্রীঠাকুরকে পুরোভাগে লইয়া আবার কীর্তন করিতে করিতে গৃহে ফিরিতেন। একদিন সমুদ্রসৈকতে দণ্ডায়মান থাকা অবস্থায় শ্রীশ্রীঠাকুরের একখানা আলোকচিত্র তোলা হইয়াছিল।

পুরী অবস্থানকালীন শ্রীশ্রীঠাকুর সম্বন্ধীয় একটি ঘটনা।

শ্রীশ্রীঠাকুর একদিন প্রাতঃকালে খড়ম পায়ে সমুদ্রতীরে ভ্রমণ করিতে করিতে পাঁচ-ছয় মাইল দূরবর্তী সাক্ষীগোপাল নামক স্থানে গিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। তথায় যাওয়ার তাঁহার পূর্বকল্পিত কোন অভিপ্রায় ছিল না, আপন মনে পথ চলিতে চলিতে এক সময় তিনি জানিতে পারিলেন এতদূরে চলিয়া আসিয়াছেন। জায়গাটা তাঁহার খুব ভাল লাগিয়াছিল, সে কারণ, সারাদিন ঘুরিয়া ঘুরিয়া তথাকার দ্রষ্টব্য সবকিছু দেখিলেন। এদিকে আবাস-বাটিকার সর্বত্র তাঁহাকে পাঁতি-পাঁতি করিয়া খোঁজা হইল, কোথাও তাঁহার কোন সন্ধান মিলিল না। বাড়ীতে মহা হুলস্থুল পড়িয়া গেল। সবাই উদ্বিগ্নমনা, অশ্রুসজল নেত্র। সবারই জীবন্মৃত অবস্থা। উপায়ান্তর না দেখিয়া ভক্তগণ তন্ময়চিত্তে নাম করিতে লাগিলেন। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইলে সহসা নজরে পড়িল, শ্রীশ্রীঠাকুর গৃহপ্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া আছেন। এতক্ষণ পরে হারানিধিকে ফিরিয়া পাওয়ায় সকলের দেহে প্রাণ সঞ্চার হইল।

পুরীধাম ত্যাগের কিছুপূর্বে শ্রীশ্রীঠাকুর মহারাজ অনন্তনাথকে সঙ্গে লইয়া একদিন শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব দর্শনে মন্দিরে গমন করিয়াছিলেন। শ্রীমন্দিরের পাণ্ডাগণ এই সময় তাঁহার শ্রীবিগ্রহ দর্শনের সর্বপ্রকার সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর ১৯২২ সালের ১৪ই ফেব্রুয়ারী পরিবারপরিজন ও শিষ্যবর্গ লইয়া স্বদেশাভিমুখে যাত্রা করেন। তদঞ্চলে আরও কিছুকাল নাম প্রচার কার্য চালাইবার উদ্দেশ্যে শ্রীশ্রীঠাকুর গোস্বামী সতীশচন্দ্রকে তথায় রাখিয়া গেলেন। সতীশচন্দ্র আরও কিছুদিন পুরী অবস্থানপূর্বক ভুবনেশ্বর হইয়া বারিপদা গমন

করেন এবং তথায় অনেককে সৎনামে দীক্ষিত করেন। গোস্বামী সতীশচন্দ্র সেবার দীর্ঘ ছয়মাসকাল উড়িষ্যার নানাস্থানে পরিভ্রমণ করিয়া নাম প্রচার চালাইয়াছিলেন। অতঃপর তিনি আশ্রমে প্রত্যাবর্তন করেন।

শ্রীশ্রীঠাকুরের পুরী-প্রবাস প্রসঙ্গে এইবার তাঁহার তৎকালের নিত্যসঙ্গী শ্রীসুশীলচন্দ্র বসু মহাশয়ের বিবৃতি নিম্নে সন্নিবেশিত হইল। যথা—

[শ্রীসুশীলচন্দ্র বসুর বিবৃতি]

১৯২২ সালে পূজাবকাশের পর নেতাজী সুভাষচন্দ্রের জনক-জননী আশ্রমে আসেন। তাঁহারা উভয়েই শ্রীশ্রীঠাকুরের একনিষ্ঠ ভক্ত ছিলেন। সেই সময়ে একদিন কথা প্রসঙ্গে সুভাষ জননী শ্রীশ্রীঠাকুরকে পুরী নিয়ে যাওয়ার ইচ্ছা—মাতা মনোমোহিনীর নিকট প্রকাশ করেন এবং মাতা মনোমোহিনী সে কথা শ্রীশ্রীঠাকুরকে জ্ঞাপন করেন। শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—"আমার যাওয়া তো মুস্কিল। কেন না, আমার পুরী যাবার সংবাদ পেলে সৎসঙ্গীরা যে যেখানে আছে, সব পুরী গিয়ে উপস্থিত হবে। তাদের সকলের তাল সামলাতে বোস মা ও বোসদার অনেক বেগ পেতে হবে। তা শুনে জানকীবাবু ও বোস মা উভয়ে বললেন, "আমরা সেজন্য প্রস্তুত হয়েই আছি। ভক্তদের সেবা করব—এর চেয়ে অর্থব্যয়ের শ্রেষ্ঠ সার্থকতা কোথায় ?" তাঁদের একথা শুনে শ্রীশ্রীঠাকুর পুরীতে যাবার প্রস্তাবে রাজী হয়ে গেলেন।

প্রথমে আমি শ্রীশ্রীবড়মা ও ঠাকুর পরিবারের অন্যান্য সকলকে নিয়ে পুরী রওনা হয়ে গেলাম। আমরা পুরীতে গিয়ে আর্মষ্ট্রং রোডে অবস্থিত জানকীবাবুর পিতার নামে বাড়ী 'হরনাথ লজে' গিয়ে উঠলাম। পরে ৩১শে ডিসেম্বর ১৯২২ সালে শ্রীশ্রীমা, শ্রীশ্রীঠাকুর, অনন্ত মহারাজ, নফর ভাই প্রভৃতি সহ আশ্রম থেকে পুরীর উদ্দেশে রওনা হয়ে গেলেন এবং তারাও "হরনাথ লজে" গিয়ে উঠলেন। পরে গোঁসাইদা, কিশোরীদা প্রভৃতি কীর্তনদল সহ পুরীতে এসে উপস্থিত হলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর পুরীতে গেছেন শুনে কলকাতা ও অন্যান্য স্থানের বহু সৎসঙ্গী পুরীতে গিয়ে উপস্থিত হলেন। তাঁদের অবস্থানের জন্য আরও বাড়ী নেওয়া হল। এই বহুসংখ্য জনমণ্ডলীর সেবার জন্য বসু দম্পতি আপ্রাণ ছিলেন। তাঁহারা প্রত্যহ এসে সন্ধান নিতেন কার কী কী দরকার হবে ইত্যাদি প্রত্যেকটি বিষয়ে খুঁটি-নাটি খবর নিতেন এবং তার বিহিত ব্যবস্থা করতেন। এতলোক সমাবেশেও তাঁরা বিন্দুমাত্র ক্ষুব্ধ ও বিচলিত না হয়ে সকলের সেবাযত্ন করতেন। তাঁদের আচারে-ব্যবহারে এটা ঘুণাক্ষরেও বোঝা যেত না যে তাঁরা বিরক্ত হচ্ছেন। বরং সদা আনন্দেরই প্রকাশ পেত। শ্রীশ্রীঠাকুর সহ সমবেত ভক্তমণ্ডলী প্রায় দুই মাস পুরীতে ছিলেন। তাঁদের সমস্ত ব্যয়ভার তো তাঁরা বহন করতেনই, এমন কি সমস্ত সৎসঙ্গীর ফিরে যাবার পাথেয় পর্যন্ত অকাতরে সানন্দে বহন করেছিলেন।

পুরীতে অবস্থানকালে "হরনাথ লজ" বাড়ীখানা সর্বদাই কল-কোলাহলে

মুখরিত থাকত এবং পুরী সহর ডঙ্কানিনাদ সহ কীর্তনে উদ্বেলিত হত। মোট কথা শ্রীশ্রীঠাকুর পুরী আসাতে তথায় একটা সাড়া পড়ে গিয়েছিল। বহু শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক তাঁহাদের নানা সমস্যা সমাধানের জন্য শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে আসতেন। শ্রীশ্রীঠাকুর সহাস্য বদনে তা মীমাংসা করে দিতেন। ... দিনরাত্রি বাড়ীটি আলাপে আলোচনায় মুখরিত থাকত। এক-একদিন কীর্তনের দল সহ ডঙ্কা-নিনাদে পুরী সমুদ্র-সৈকতে শ্রীশ্রীঠাকুর সহ আমরা স্নান করতে যেতাম এবং তরঙ্গের তালের উঠা-পড়ার সাথে ডঙ্কানিনাদ ও কীর্তনের উঠা পড়া চলত। অন্যান্য স্নানার্থীরা তা দেখে—মুগ্ধ নয়নে শ্রীশ্রীঠাকুর ও কীর্তনের দলের দিকে তাকিয়ে থাকত। কয়েকদিন সমুদ্রস্নানের পর শ্রীশ্রীঠাকুর আর সমুদ্রস্নানে যেতেন না। সমুদ্রের জল এনে তাঁকে বাড়ীতে স্নান করানো হত।

একদিন প্রাতে শ্রীশ্রীঠাকুর খড়ম পায়ে পুরীর সমুদ্রতীরে বেড়াতে বের হলেন। সমুদ্রতীর ধরে কিছুদূর যেয়ে সাক্ষীগোপালের পথ ধরে এগুতে এগুতে ৬।৭ মাইল দূরবর্তী সাক্ষীগোপালে উপস্থিত হলেন। হঠাৎ শ্রীশ্রীঠাকুরের অদর্শনে সবাই অত্যন্ত ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠলেন। চারিদিকে সবাই ছুটাছুটি করতে লাগলেন। কেননা তিনি যে কাউকে কিছু না বলে সাক্ষীগোপাল যেয়ে উপস্থিত হবেন, একথা কেউ স্বপ্নেও কল্পনা করতে পারেন নি। অবশেষে তিনি নিজেই ঠিক সন্ধ্যার অব্যবহিত পরেই খড়ম পায়ে দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে আবার "হরনাথ লজে" এসে উপস্থিত হলেন। সারাদিন তাঁকে না দেখে সকলের যে কি দুশ্চিন্তা তা আর বলবার নয়। হারানিধিকে ফিরে পেয়ে সবার উল্লাস ও আনন্দের আর সীমা রইল না। শ্রীশ্রীঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বললেন,—"আমি সকালে একটু বেড়াতে বের হয়েছি। সাক্ষীগোপাল যাব কি অন্য কোথায়ও যাব এ ধারণা নিয়ে বের হইনি। কিন্তু আপন মনে হাঁটতে হাঁটতে সাক্ষীগোপাল চলে গেলাম।"

আমরা পুরীতে থাকাকালীন গোঁসাইদা, কিশোরীদা, নফর ভাই, কোকন, তরণী ও অন্যান্য কীর্তনের দলবল সহ কীর্তন করতে করতে জগন্নাথদেবের মন্দিরের সিংহদ্বারে উপস্থিত হলাম। সিংহদ্বারে উপস্থিত হয়ে কিশোরীদা ও গোঁসাইদার উদ্দণ্ড কীর্তন সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করল। পাণ্ডারাও এসে চারিপাশে সমবেত হল। মন্দিরে চর্ম নিয়ে প্রবেশ নিষেধ। চর্ম নির্মিত বাদ্য-যন্ত্রও নিষিদ্ধ। তাই মন্দিরে যাতে আমরা প্রবেশ করতে না পারি সেই জন্য বাধা দিতে পাণ্ডারাও সমবেত হয়েছিল। কিন্তু এমন জোর ও মাতোয়ারা কীর্তন ও উল্লম্ফন চলতে লাগল যে আমাদের বাধা দেওয়া পাণ্ডাদের পক্ষে সম্ভব হল না। পাণ্ডাদের ব্যূহ ভেদ করে কীর্তনের দল এগিয়ে চলল মন্দিরের অন্দরে। মুক্তিমণ্ডলের কাছে গিয়ে সমস্ত পাণ্ডারা সমবেত হয়ে এবার আমাদের জোর বাধা প্রদান করল। কাজেই আমাদের ফিরতে হল। সেদিন কীর্তনের দলে শ্রীশ্রীঠাকুর ছিলেন না।

শ্রীশ্রীঠাকুর একদিন মহারাজকে সঙ্গে করে মন্দিরে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবকে দর্শন করতে গিয়েছিলেন। শ্রীবিগ্রহের পাণ্ডারা শ্রীশ্রীঠাকুরকে যদিও চিনতেন না তথাপি তাঁরা তাঁকে বেশ যত্ন করে সামনে নিয়েই শ্রীবিগ্রহ দর্শনে সহায়তা করেছিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর পুরীতে থাকা কালে অনেক দীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। শ্রীশ্রী-ঠাকুর চলে আসার পর গোঁসাইদা সেখানে থেকে গেলেন। তিনি অনেককে সেখানে সৎমন্ত্রে দীক্ষা দিয়েছিলেন।

[শ্রীযতীন্দ্রনাথ বসুর বিবৃতি]

সেবার আমরা প্রায় আড়াই শত লোক শ্রীশ্রীঠাকুরের সঙ্গে পুরী গিয়াছিলাম। তিনখানা বড় বড় বাড়ীতে আমাদের বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছিল। কিশোরীদার কীর্তনের দল এবং অন্যান্য অনেকে এক বাড়ীতে থাকিতেন, আর একটি বাড়ীতে নানা স্থান হইতে আগত সৎসঙ্গী ও হিমাইতপুর আশ্রমের লোকদের থাকিবার ব্যবস্থা হইয়াছিল। শ্রদ্ধেয় জানকীনাথের নিজস্ব ভবন 'হরনাথ লজে' অবস্থান করিতেন শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁহার পরিবারবর্গ ও অনন্ত মহারাজ প্রভৃতি। আমাদের বেলেঘাটার কন্সার্ট পার্টির শিল্পীগণ, সুশীলচন্দ্র বসু, ফটোগ্রাফার হরেকৃষ্ণ সাহা প্রভৃতির জন্যও 'হরনাথ লজেই' বাসস্থান নির্দিষ্ট হইয়াছিল। 'হরনাথ লজেই' সমাগত সকলের এক সঙ্গে আহারের ব্যবস্থা ছিল।

প্রত্যহ ভোরবেলা কিশোরীদা তাঁহার কীর্তন দল লইয়া 'রাধা রাধা রাধা বোল' কীর্তন করিতে করিতে নগর পরিক্রমায় বাহির হইতেন। আর আমি বেলেঘাটার দল লইয়া বিভিন্ন অঞ্চলে গিয়া কীর্তন করিতাম। কোন কোন দিন আমরা সকল ইষ্টভ্রাতা তিনটি দলে বিভক্ত হইয়া কীর্তন লইয়া সহরের তিন দিকে বাহির হইতাম। শ্রীশ্রীঠাকুর প্রত্যহ প্রাতঃকৃত্যাদির পর গৃহপ্রাঙ্গণে আসিয়া একখানা বেঞ্চের উপর বসিতেন। আমাদের কীর্তনের দলটিও তখন সেখানে উপস্থিত হইত। শ্রীশ্রীঠাকুর আমাকে জিজ্ঞাসা করিতেন,—"যতীনদা আজ আপনারা কোন্ গানটা নিয়ে বেরুবেন? গানটা গেয়ে আমাকে একটু শোনান তো! আর দেখুন, রোজই কিন্তু গান গেয়ে, আমাকে আগে মাতিয়ে তবে আপনারা বাইরে বেরুবেন।" আমি সেই মতে এক এক দিন এক একটি গান পূর্বে হইতেই তালিম দিয়া, সর্বপ্রথম শ্রীশ্রীঠাকুরের সম্মুখে সকলে মিলিয়া তন্ময় চিত্তে গান করিতাম। অতঃপর তাঁহাকে প্রণাম করিয়া আশীর্বাদ লইয়া সেই গানটি গাহিতে গাহিতে সদলবলে বাহির হইয়া পড়িতাম। আমাদের কীর্তনের দলে সাধারণতঃ মহারাজ অনন্তনাথ, গোস্বামী সতীশচন্দ্র, ডাঃ শশিভূষণ মিত্র, সুশীলচন্দ্র বসু, মনোহর বসু, কালীদা, জগদীশ ভাই প্রভৃতি থাকিতেন, পথে পথে আরও বহুলোক আসিয়া আমাদের সঙ্গে যোগ দিত।

শ্রীশ্রীঠাকুর আমাদের কীর্তন দলের জন্য বারখানা খোল, বার জোড়া করতাল,

বারখানা পিটা ঘড়ি ও বারটি শংখের ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন। এইগুলি এবং আমাদের কনসার্ট পার্টির বহু রকম যন্ত্রের বাদ্য ধ্বনি সহ আমরা সহরের নানা রাস্তায় কীর্তন করিতে করিতে চারিদিক মুখরিত করিয়া চলিতাম। নানা অঞ্চল পরিভ্রমণ ও বহু মঠ প্রদক্ষিণ পূর্বক আমরা সর্বশেষ শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীমন্দির প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইয়া তথায় বহুক্ষণ কীর্তন করিয়া দ্বিপ্রহর অন্তে বাড়ী ফিরিতাম। যতক্ষণ কীর্তন চলিত দলের সকলেই তন্ময় চিত্তে কীর্তন করিতেন। কীর্তন কালে কোন কোন দিন নৃত্যপরায়ণ অবস্থায় মহারাজ ও সুশীলদা সংজ্ঞাহারা হইয়া পড়িতেন। তখন বহিরাগত লোকেরা অগ্রসর হইয়া শুশ্রূষা করতঃ তাঁহাদের চৈতন্য সম্পাদন করিতেন।

শুনিয়াছিলাম পুরীতে বারশত মঠ আছে। আমরা প্রায় অধিকাংশ মঠে গিয়া কীর্তন করিয়াছি। 'গম্ভীরা' মঠে (যেখানে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু অবস্থান করিতেন) আমরা অনেক দিন দীর্ঘ সময় ধরিয়া কীর্তন করিয়াছি। তার চেয়েও আরও অধিক সময় আমরা কীর্তন করিতাম শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীমন্দির-প্রাঙ্গণে। একদিন তথায় ভাবগম্ভীর পরিবেশে তুমুল কীর্তনের মধ্যে মহারাজ ও সুশীলদা অজ্ঞান হইয়া পড়েন। সেদিনের প্রাণোন্মাদী কীর্তন শ্রবণে এবং ভক্তগণের ভাববিহ্বল অবস্থা দর্শনে মন্দিরের সুপারিন্টেন্ডেন্ট (স্থানীয় অবসরপ্রাপ্ত মহকুমা শাসক) এবং মন্দিরের প্রবীণ পান্ডাগণ বিস্ময়ে মুগ্ধ হইয়াছিলেন। অগণিত দর্শকমন্ডলীর বিপুল আনন্দোচ্ছ্বাসের মধ্যে ঐ দিন সুদীর্ঘ সময় ব্যাপিয়া আমাদের কীর্তন চলিয়াছিল। মন্দিরের কর্তৃপক্ষ আমাদের কীর্তনে এমনই মুগ্ধ ছিলেন যে, চর্মের সংশ্রব রহিয়াছে এমন কোন বস্তুসহ মন্দির প্রাঙ্গণে প্রবেশ নিষিদ্ধ থাকিলেও, সেই চিরাচরিত প্রথার শিথিল করিয়া তাঁহারা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়াই আমাদিগকে সানন্দে চর্মসংযুক্ত বাদ্যযন্ত্রাদি সহকারে তথায় কীর্তন করিবার অনুমতি দিয়াছিলেন।

পুরী যাত্রাকালে আমরা কলিকাতা হইতে শ্রীহরেকৃষ্ণ সাহা নামক একজন ফটোগ্রাফারকে সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলাম। বার চৌদ্দ দিন তিনি পুরীতে আমাদের সঙ্গে রহিলেন, ঠাকুরের ফটো তোলার আমাদের সকলেরই আপ্রাণ আগ্রহ থাকিলেও তাঁহার অনুমতি না পাওয়ায়, এত দিনের মধ্যে কোন ফটো তোলা সম্ভব হইল না। এদিকে ফটোগ্রাফার ভদ্রলোকটিও দেশে ফিরিয়া যাওয়ার জন্য অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। ইহাতে আমরা সবাই মনভাঙ্গা হইয়া পড়িলাম। এই অবস্থায় একদিন আমরা সকল ইষ্টভ্রাতা এক সঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুরচরণে উপস্থিত হইয়া আমাদের আন্তরিক ঐকান্তিক মনোভিলাষ পূর্ণ করিতে কাতর প্রার্থনা নিবেদন করিলাম। মনে পড়ে, সেই দিনই শ্রীশ্রীঠাকুর আমাকে ডাকিয়া বলিলেন,—"যতীনদা পর্যাপ্ত পরিমাণ ফুল যোগাড় করতে পারেন?" আমি সানন্দে বলিলাম—"হাঁ, নিশ্চয়ই পারব।" শ্রীশ্রীঠাকুর তখন অনন্ত মহারাজকে

ডাকিয়া কহিলেন,—"অনন্ত, কাল ভোরে আমি, যতীনদা, ফটোগ্রাফার এবং আর জন কয়েককে সঙ্গে ক'রে সমুদ্রের ধারে পাল-দার (অবিনাশচন্দ্র পালের) বাড়ীর সম্মুখে যাব। তখন অন্য কেউ যেন সেখানে না যায়, তুই এখানে থেকে তার ব্যবস্থা করবি।"

এদিকে আমি স্থানীয় রাজাদের বাগানের মালীদের কিছু কিছু অর্থ দিয়া প্রচুর ফুল সংগ্রহ করিলাম। শ্রীশ্রীঠাকুর ভোরবেলা জননী দেবী, বাগবাজারের দুর্গামাসীমা, ফটোগ্রাফার ও আমাকে সঙ্গে লইয়া সমুদ্রতীরে উপস্থিত হইলেন। সেখানে তিনি একখানা বেঞ্চের উপর মাসীমাকে বসাইয়া তাঁহার কোলে মাথা রাখিয়া শায়িত হইলেন এবং জননী দেবীকে তাঁহার পার্শ্বে দাঁড়াইতে অনুরোধ করিলেন, আর আমাকে ডাকিয়া কহিলেন,—"যত ফুল এনেছেন, মার পায় দিয়ে পুজো করুন এবং এই অবস্থায় মার ফটো নিতে বলুন।" শ্রীশ্রীঠাকুরের নির্দেশমত জননী দেবীর ফটো নেওয়া হইল।

আমার মনে তখন এই বলিয়া ভীষণ দুঃখ হইতে লাগিল যে, যত ফুল আনিয়াছিলাম, সবই তো জননী দেবীর চরণে দেওয়া হইল, শ্রীশ্রীঠাকুরের পায় তো কিছুই দেওয়া হলো না, আর শ্রীশ্রীঠাকুরের একক কোন ফটোও নেওয়া হইল না! আমার মনের তৎকালীন অত্যন্ত বিষণ্ণ অবস্থায় শ্রীশ্রীঠাকুর হঠাৎ আমার প্রতি কৃপাদৃষ্টিপাত পূর্ব্বক কহিলেন,—"যতীনদা, ঠাকুরের ফটো নেবেন নাকি?" তাঁহার কথায় আহ্লাদে আটখানা হইয়া আমি বলিলাম—"হাঁ, নিশ্চয়ই। ঠাকুরের ফটোর জন্যই তো হরেকৃষ্ণদা ফটোগ্রাফারকে এতদিন ধরে এখানে রাখা হয়েছে।" আমার কথার সঙ্গে সঙ্গেই শ্রীশ্রীঠাকুর মাসীমার কোল হইতে নামিয়া পড়িলেন এবং নিজের পরণের কোচার কাপড় ছাড়িয়া দিয়া সমুদ্র-সৈকতে গিয়া দাঁড়াইলেন। ফটোগ্রাফার এই অবস্থায় শ্রীশ্রীঠাকুরের দুইখানি ছবি তুলিলেন। অতঃপর আমরা সকলে বাড়ী ফিরিলাম।

শ্রীশ্রীঠাকুরের ছবির একখানা ফিল্ম ঐ দিনই ওয়াশ করা হইল। দুঃখের কথা বলিবার নয়, দেখা গেল ছবিখানার দুইটি চক্ষুই নষ্ট। ইহাতে মনো-দুঃখে একান্ত কাতর হইয়া, শ্রীশ্রীঠাকুর চরণে গিয়া এ বিষয় নিবেদন করিলাম। আমার কথা শুনিয়া তিনি হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—"সে কি? ফটো আবার খারাপ হবে কেন? ভাল ক'রে ওয়াশ করতে বলুন।" হরেকৃষ্ণদা পুনরায় যত্ন সহকারে ছবিখানা ওয়াশ করিলেন। দেখা গেল ছবিখানা সর্বাংশেই অত্যুত্তম হইয়াছে। আমি মনের আনন্দে ছুটিয়া গিয়া ছবিখানা শ্রীশ্রীঠাকুরের হাতে দিলাম। শ্রীশ্রীঠাকুর ছবিখানা বারংবার আপন বক্ষ ও শিরোদেশে ঠেকাইতে লাগিলেন এবং হঠাৎ একবার ভাবাবেগে বলিয়া উঠিলেন,—"এটাই পরমপিতার প্রকৃত প্রতিকৃতি হয়েছে।"

পুরী অবস্থানকালে আমরা শ্রীশ্রীঠাকুরের সঙ্গে সমুদ্রস্নানের ক্রীড়া কৌতুকে অপার্থিব আনন্দ উপভোগে ধন্য হইয়াছি। স্নানকালে শ্রীশ্রীঠাকুরকে লইয়া

সৈকত ভূমিতে সেই তুমুল নৃত্য ও কীর্তন, সমুদ্রবক্ষে তরঙ্গ প্রবাহে উদ্দাম জলক্রীড়ার সেই অপূর্ব আনন্দোল্লাসের কথা কেহ কোনদিন ভুলিতে পারিব না।

পুরী প্রবাস প্রসঙ্গে আমরা পরমশ্রদ্ধেয় বসুদা ও শ্রদ্ধেয়া বসুমার অপূর্ব ইষ্টনিষ্ঠা ও মহদন্তঃকরণের উল্লেখ না করিয়া পারিব না! তাঁহাদের সৌজন্য ও সদাশয়তার কথা চিরদিন সকলের স্মরণে থাকিবে। শ্রদ্ধেয় জানকী বাবু প্রত্যহ প্রাতঃকালে আমরা সৎসঙ্গী ভাইদের কাছে উপস্থিত হইয়া, করজোড়ে জানিতে চাহিতেন আমাদের কাহার কি প্রয়োজন এবং অনতিবিলম্বে তিনি তাহা সরবরাহের ব্যবস্থা করিতেন! দুপুরে এবং রাত্রে আমরা যখন সকলে পংক্তি ভোজনে বসিতাম, বসুমা স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া প্রত্যেককে সাধিয়া সাধিয়া ভূরিভোজনে পরিতৃপ্ত করিতেন। এরূপ অমায়িক স্নেহ মমতা আমরা কেহ জীবনে কোনদিন পাই নাই।



পরিশিষ্ট

১

পুরোনো স্মৃতি

(প্রিয়লতা দত্তরায়)

['স্মৃতিতর্পণ'-এর পাদটীকায় উল্লিখিত মদীয়া সহধর্মিণীর বিরচিত এই নিবন্ধটি সৎসঙ্গের মুখপত্র 'আলোচনা' পত্রিকার পঞ্চদশ বর্ষের প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। স্বর্গতা সহধর্মিণীর আত্মার তৃপ্তি-কামনায়, ১৩৭২ বঙ্গাব্দের ২৫শে বৈশাখ তাঁহার শ্রাদ্ধ-দিবসে সৎসঙ্গ-সভাপতি মাননীয় শ্রীসুশীলচন্দ্র বসু বি. এ. মহাশয়ের পৌরোহিত্যে বৈদ্যনাথধাম-দেওঘরের শ্রীশ্রীঠাকুর-মন্দিরে অনুষ্ঠিত সৎসঙ্গ-অধিবেশনে নিবন্ধটি পঠিত হয়।]

সে কবেকার কথা। বাংলা ১৩৩০ সনের শ্রাবণ মাস। আমরা নাম পেলাম পূজনীয় ত্রৈলোক্যদার কাছে। আমার বয়স তখন উনিশ-কুড়ি, আমার স্বামীর বয়স ত্রিশ বৎসর। ময়মনসিং সহরে তিনি ওকালতী করেন। নাম পেয়ে অবধি শ্রীশ্রীঠাকুরকে দেখবার ও তাঁর চরণে থাকবার জন্য দুইজনেই খুব উতলা হ'য়ে পড়লাম। তখন আশ্বিন মাস, খবর পেলাম, শ্রীশ্রীঠাকুরের মা এসেছেন গোলকপুরের রাণীমার বাসায়। উনি শ্রীশ্রীমার পিসীমা। আমরা শ্রীশ্রীমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গেলাম। জমিদার-বাড়ীর এক পরিচারিকা আমাদের পরিচয় নিয়ে আমাকে শ্রীশ্রীমায়ের কাছে নিয়ে গেল। আমি গিয়ে দেখলাম, শ্রীশ্রীমা একখানা খাটে শুয়ে জমিদার-পত্নীর সঙ্গে গল্প করছেন। আমি তাঁদের প্রণাম ক'রে মেজেতে বসলাম। শ্রীশ্রীমা আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "তুই তো বুঝি আশ্রমে যাস্‌নি?" আমি বল্লাম, "না না, আজও যাইনি, শিগ্‌গিরই যাবার ইচ্ছা করি, ঠাকুরকে দেখবার জন্য মনটা বড় অস্থির হ'য়ে পড়েছে।" শ্রীশ্রীমা বললেন "এখন আর যাসনে, তোর কোলের ছেলেটা আর একটু বড় হোক। সেখানে যে খুব কষ্ট ক'রে থাকতে হয়। আচ্ছা, আমি ওখানে গিয়েই অনুকূলের কাছে তোদের কথা বলব।" মা তখন সধবা। পরণে একখানা ফরাসডাঙ্গা শাড়ী, কপালে সিঁদুরের টিপ, সিঁথিতে সিঁদুর, খালি গা, গলায় হার, হাতে গহনা। শরীরের রং উজ্জ্বল গৌরবর্ণ, দেখতে কি সুন্দরই না লাগল, যেন সাক্ষাৎ জগদ্ধাত্রী মূর্তি! দরদভরা কী মিষ্টি আলাপ, যেন কতকালের আপন জন। যতক্ষণ তাঁর কাছে ব'সে গল্প করলাম, কী শান্তি পেলাম! মনটা আমার জুড়িয়ে গেল। বিকাল বেলা জমিদার বাড়ীর গাড়ী দিয়ে শ্রীশ্রীমা আমাদের বাসায় পাঠিয়ে দিলেন।

শ্রীশ্রীমাকে দেখে অবধি শ্রীশ্রীঠাকুরকে দেখবার আকাঙ্ক্ষা আরও শতগুণে বেড়ে উঠল। এর তিন মাস পরে, পৌষ মাসে বড় দিনের ছুটিতে আমার স্বামী একাই গেলেন আশ্রমে। সেখান থেকে ফিরে এসে সারা দিন-রাত তিনি ঠাকুরের কথাই কেবল আমার সঙ্গে কত কিছু গল্প করতেন। উভয়েই আমরা তাঁর চরণে গিয়ে থাকবার জন্য ব্যাকুল হ'য়ে উঠলাম। এদিকে তিনি দেশের বাড়ীর ও ওকালতির কাজ-কর্ম সব গুছিয়ে নিলেন। তারপর একদিন ফাল্গুন মাসের শেষের দিকে আমরা তিনজন যাত্রা করলাম আশ্রমের দিকে। ঠাকুর দর্শনে যাচ্ছি, মনে আর আনন্দ ধরে না। পাক্সী নেমে স্টীমারে উঠলাম। সারারাত্রি স্টীমারে কাট্‌ল। কতক্ষণে আশ্রমে পৌঁছাব, মন অস্থির হ'য়ে উঠল। ভোরবেলা বাজিতপুরে ঘাটে নামলাম। কচিশিশু রজতকে কোলে নিয়ে পদ্মার ধার ধ'রে যেতে লাগলাম। রাস্তা ছেড়ে বাঁধের ধারে মন্দিরের পাশ দিয়ে আমরা আশ্রমের আঙ্গিনায় এসে উঠলাম। দেখলাম, শ্রীশ্রীমা একটা পাকা ঘরের বারান্দায় চৌকির উপর ব'সে আছেন। আমার স্বামী তখন বললেন, "ঐ যে শ্রীশ্রীমার কোলে ব'সে আছেন, উনিই শ্রীশ্রীঠাকুর।"

দেখলাম, শ্রীশ্রীঠাকুর একদৃষ্টিতে আমাদের দিকে তাকিয়ে আছেন। আমরা কিছুটা এগুতেই শ্রীশ্রীঠাকুর আমার স্বামীর নাম ধ'রে চিৎকার ক'রে ব'লে উঠলেন, "অমুক দাদা আইছেন্ নাকি।" আমরা তাড়াতাড়ি ছুটে নিকটে গিয়ে, রজতকে সিঁড়ির উপর নামিয়ে, শ্রীশ্রীমা ও শ্রীশ্রীঠাকুরকে প্রণাম করলাম। শ্রীশ্রীমা তখন শ্রীশ্রীঠাকুরকে বললেন, "এই বউটির কথাই ময়মনসিং থেকে এসে তোকে বলেছিলাম।" আমাদের আগের দিনই পৌঁছানর কথা ছিল, ঝড়-বাদলের জন্য রওনা হ'তে পারিনি। শ্রীশ্রীঠাকুর খুবই ব্যস্ত হ'য়ে আমাদের প্রতীক্ষা করছিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের অপূর্ব রূপ, গুণ ও দরদের কত কথা স্বামীর কাছে শুনেছি। আজ সাক্ষাৎভাবে তাঁর দেবমূর্তি ও দেব-চরিত্রের এই প্রথম পরিচয় পেয়ে আমি আনন্দে আত্মহারা হ'লাম। না জানি কত জন্মের পুণ্যের ফলে মানুষ তাঁর দর্শন পায়! সত্যি, আজ আমার মানব জনম সার্থক হ'লো। শ্রীশ্রীঠাকুর নফরদাকে ডেকে বললেন, আমাদের থাকা-খাওয়ার সব বন্দোবস্ত ক'রে দিতে। নফরদা আনন্দবাজারের আঙ্গিনায় একটি টিনের ঘরের ছোট খোপে আমাদের থাকার ব্যবস্থা ক'রে এবং সব বিষয়ে প্রয়োজনীয় উপদেশ দিয়ে চ'লে গেলেন।

দুপুরে পদ্মায় গিয়ে স্নান ক'রে এলাম। পাঁচ পয়সা সের দরে এক সের দুধ কিনে পাশের এক ময়রার দোকান থেকে জ্বাল দিয়ে এনে ছেলেকে খাওয়ালাম। অনেক বেলায় আনন্দবাজারে খাওয়ার ঘণ্টা পড়ল। যাঁরা ঘরে ভাত নিয়ে যাবেন, সব মেয়েরা জড় হলেন। পাচক-ঠাকুর ডাল-ভাত পরিবেষণ করল। সকলে খাবার নিয়ে যার যার ঘরে চ'লে গেলেন, আমিও গিয়ে নিয়ে এলাম। কিছুক্ষণের মধ্যেই আবার ঘণ্টা পড়ল। এবার পুরুষেরা এলেন থালা হাতে ক'রে। সকলে

সারি বেঁধে ব'সে গেলেন খেতে। খাওয়ার পর এঁটো মুক্ত ক'রে সবাই চললেন পদ্মায়, হাত-মুখ থালা পরিষ্কার ক'রে ঘরে চ'লে গেলেন। দেখতাম, রোজ সকালে কয়েকজন স্ত্রীলোক এসে আনন্দবাজারের রান্নাঘর পরিষ্কার করতেন, পদ্মা থেকে হাঁড়ি-বাসন মেজে আনতেন। দুপুরবেলা ডাল-চালের বস্তা এসে বারান্দায় পড়ত। মেয়েরা তা ঝেড়ে পরিষ্কার ক'রে দিতেন। কেউ কেউ তরকারী কুটতেন ও বাটনা বেটে দিতেন। মেয়েদের এরূপ স্বচ্ছন্দ চলা-ফেরা ও কাজ-কর্ম জীবনে আমি এই প্রথম দেখলাম, আমার খুব ভাল লাগল।

দুইদিন চ'লে গেল, শ্রীশ্রীবড়মাকে তখনো দেখিনি। তাঁকে দেখার একান্ত ইচ্ছা, কি করি! সবাই আমার অপরিচিত। কাকেই বা জিজ্ঞাসা করি, তিনি কোথায় থাকেন। কে-ই বা আমায় নিয়ে যাবে তাঁর কাছে! আনন্দবাজারে যাঁরা কাজ করতে আসতেন, তাঁদের একজনের সঙ্গে আমার বেশ একটু পরিচয় হ'লো, তাঁর নাম পরিমলদি। তাঁর কাছে আমি শ্রীশ্রীবড়মার সঙ্গে সাক্ষাৎ করার ইচ্ছা প্রকাশ করলাম। তিনি আমাকে নিয়ে যেতে রাজী হ'লেন। একদিন বিকালে পরিমলদি আমাকে সঙ্গে ক'রে চললেন শ্রীশ্রীবড়মার বাড়ীর দিকে। আমি রঞ্জতকে কোলে নিয়ে তাঁর পিছনে পিছনে যেতে লাগলাম। আশ্রমের লাইব্রেরী ঘরের পাশ দিয়ে একটু সরু রাস্তা ধ'রে চললাম। রাস্তার দুইধারে ঘন বন। কিছুদূরে এগুলে পর, বাম দিকে একটি ছোট্ট আঙ্গিনা পড়ল। শুনলাম, সেখানে শ্রীশ্রীকর্তামা (শ্রীশ্রীঠাকুরের মায়ের মা) থাকেন। তারপরেই শ্রীশ্রীবড়মার মস্ত বড় আঙ্গিনা। একদিকে একখানি বড় টিনের ঘর, তার বেড়াগুলি গোবর-মাটীতে অতি সুন্দর ক'রে লেপা, তাতে ছোট্ট ছোট্ট দুইটি জানালা।

এই ঘরে থাকেন শ্রীশ্রীবড়মা। তাঁর ঘরের পাশে এক ভিটেয় একটি বড় দোতলা টিনের ঘর ও অন্য ভিটেয় রান্নাঘর। শ্রীশ্রীবড়মাকে উঠানেই পেলাম। কয়েকজন মেয়েলোকের সাথে তিনি গল্প করছিলেন। শ্রীশ্রীবড়মাকে দেখলাম যেন সাক্ষাৎ লক্ষ্মীমূর্তি। সোনার মত উজ্জ্বল গায়ের রং, মাখনের মত কোমল শরীর, দেবী-প্রতিমার মতই সব অঙ্গের গঠন। পরণে একখানা ফরাসডাঙ্গা শাড়ী, কপালে সিঁদুরের টিপ, সিঁথিতে সিঁদুর, খালি গা, হাতে ও গলায় সোনার গহনা—সব মিলে কি অপরূপ সৌন্দর্য! আমি ভক্তিভরে তাঁকে প্রণাম করলাম। হাসিমাখা মুখে তিনি আমার সঙ্গে কত মধুর আলাপ করলেন। কোথা থেকে এসেছি, কবে এসেছি, কোলের শিশুটি ছেলে না মেয়ে, এখানে কোন্ ঘরে থাকি, কোন কষ্ট হচ্ছে কিনা, কত কথা আপন জনের মত আদর ক'রে আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন। আমি একে-একে তাঁর সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে লাগলাম। কিছুক্ষণ কথাবার্তা হওয়ার পর শ্রীশ্রীবড়মা বললেন, "এখন সন্ধ্যা হ'য়ে এসেছে, ছেলেকে নিয়ে ঘরে যা, সময় পেলেই আসিস।" শ্রীশ্রীবড়মাকে প্রণাম ক'রে পরিমলদির সঙ্গে ঘরে চ'লে এলাম।... ...

আশ্রমের সম্মুখে ছিল একটা প্রকাণ্ড খোলা প্রাঙ্গণ। নিচেই পদ্মা। তার

ধারেই উঁচু বাঁধ। বাঁধের গায় পদ্মায় নামবার সিঁড়ি। শীতকালে নদী শুকিয়ে বহুদূরে চ'লে যেত। বর্ষার জল উপচে উঠে বাঁধের কিনারায় লাগত। ঝড় উঠলে ঢেউগুলো বাঁধের গায় আছাড় খেয়ে পড়ত, আর স্রোতের জলে প্রাঙ্গণ ভেসে যেত। নদীতে নানা রং-এর পাল তুলে ছোট-বড় কত নৌকা চলা-ফেরা করত, জেলেরা মাছ ধরত, মাঝে মাঝে শব্দ ক'রে স্টীমার যেত। তখন আশ্রমের দৃশ্যটি বড়ই সুন্দর হ'তো। বাঁধের দুই ধারে ছিল দুইটি চওড়া লম্বা বেদী। বেদীতে ব'সে লোকজন গল্প-গুজব করতো। আর পদ্মার শোভা দেখত। বিকাল বেলা পদ্মার ধারে লোকজনের ভিড় হ'তো। প্রাঙ্গণের শেষে দুই দিকে ছিল দুইটি কটেজ। একটিতে শ্রীশ্রীমা থাকতেন। মাঝখানে ছিল একটি প্রকাণ্ড দালান। দালানটি বহুকাল অসম্পূর্ণ ছিল। ইহারই নাম পরে 'মাতৃমন্দির' হয়েছিল। তখন এই দালানে যাত্রীরা এসে থাকত। প্রতিদিন সন্ধ্যাবেলা সেখানে 'সৎসঙ্গ' হ'তো। শ্রদ্ধেয় সুরেশদা, মহারাজ ও বিরাজদা নানা হিন্দী বই সুর ক'রে পাঠ ক'রে সকলকে শুনাতেন। আশ্রম-প্রাঙ্গণের পূর্বধারে বাঁধের কাছে একটা বড় নিম গাছের নিচে শ্রীশ্রীমার গুরুদেবের মন্দির ছিল। মন্দিরে অনেকগুলি সিঁড়ি ছিল। সেখানেও বিকালবেলা লোকজন ব'সে গল্প-গুজব করত। মন্দিরের নিকটেই উত্তর দিকে ছিল আনন্দবাজারের আঙ্গিনা। শ্রীশ্রীমার কটেজের পিছনেও ছিল একটা বড় প্রাঙ্গণ। তার পশ্চিম দিকে একটি লম্বা ছনের ঘরে লোকজন থাকত, উত্তর দিকে ছিল ডাক্তারখানা ও লাইব্রেরী ঘর। লাইব্রেরী ঘরের পাশ দিয়েই ভিতর-বাড়ীর দিকে যাওয়ার রাস্তা ছিল। তার নিকটেই ছিল একটা মস্তবড় ছনের ঘর, মাটির উঁচু ভিত ও মেজে গোবর-মাটি দিয়ে লেপা, তক্‌তকে ঝক্‌ঝকে। এই ঘরেই থাকতেন শ্রীশ্রীঠাকুর ও মহারাজ।

প্রতিদিন সকালে ও বিকালে শ্রীশ্রীঠাকুর শ্রীশ্রীমার কটেজের বারান্দায় তক্তপোষের উপর শ্রীশ্রীমার কোলের কাছে ব'সে বিনতি-প্রার্থনা করতেন। আশ্রমের স্ত্রী-পুরুষ সকলে সে-প্রার্থনায় যোগ দিতেন। সারাটা সকাল শ্রীশ্রীঠাকুর কখনও পদ্মার ধারে বাবলা-তলায়, কখনও শ্রীশ্রীমার কটেজের বারান্দায়, কখনও লাইব্রেরী-ঘরের সামনে, কখনও তাঁর শোবার ঘরে সকলের সঙ্গে আলাপ-আলোচনায় কাটাতেন। দুপুরে খড়ম পায়ে পদ্মায় স্নান করতে যেতেন। স্নানের পর শ্রীশ্রীবড়মার কাছে ভিতর-বাড়ীতে রান্নাঘরে খেতে যেতেন। স্নানের পর শ্রীশ্রীঠাকুর যখন পদ্মা থেকে হন্‌-হন্‌ ক'রে লাইব্রেরী-ঘরের পাশ দিয়ে সরু রাস্তা ধ'রে ভিতর-বাড়ীর দিকে যেতেন, আমরা রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে তাঁকে দেখতাম। খাওয়া-দাওয়ার পর আবার কখন তিনি ফিরে আসবেন সেজন্য প্রতীক্ষায় থাকতাম। তাঁকে দেখে দেখার আশ মিটত না। শ্রীশ্রীঠাকুর পথের মধ্যে মিষ্টি হাসি হেসে আমাদের নানা কথা জিজ্ঞাসা ক'রে শোবার ঘরে চ'লে যেতেন। মহারাজ, দুর্গানাথবাবা, রাধারমণদা শ্রীশ্রীঠাকুরকে তামাক সেজে দিতেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর পান তামাক খেতে খেতে সকলের সঙ্গে কিছুক্ষণ গল্প ক'রে একটু ঘুমাতেন।

দুপুরের বিশ্রামের পর বিকালবেলা শ্রীশ্রীঠাকুর হারাণ মিস্ত্রীর কাঠের কারখানায় এসে বসতেন। সেটা ছিল শ্রীশ্রীঠাকুরের শোবার-ঘরের সামনেই একটু দূরে। তখন স্ত্রী-পুরুষ সকলে একে একে সেখানে এসে জড় হ'তেন। এই সময় সরোজিনীদি একখানা থালায় ক'রে শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্য ঘিয়ে-ভাজা চিড়ে নিয়ে আসতেন। শ্রীশ্রীঠাকুর কিছুটা খেয়ে এক গ্লাস জল খেতেন, তারপর তামাক খেতেন। আমার একদিন সেই চিঁড়ে ভাজার মহাপ্রসাদ পাবার সৌভাগ্য হ'য়েছিল। তাতে ছিল আদার কুচি, নুন ও চিনি। কোন-কোন দিন বিকালে শ্রীশ্রীঠাকুর লাইব্রেরী ঘরের সামনে বসতেন। সন্ধ্যার পরে পদ্মার ধারে গিয়ে বসতেন। সেখানে অনেক রাত্রি পর্যন্ত সকলের সঙ্গে নানা কথাবার্তা বলতেন। শ্রীশ্রীঠাকুর যখন যেখানে থাকতেন, আমরা সবাই সুযোগ ক'রে সেখানে গিয়ে হাজির হতাম। সকলে প্রাণভরে তাঁকে দেখতাম, আনন্দে মসগুল হ'য়ে তাঁর মধুর আলাপ শুনতাম ও তৃপ্তিতে ভরপুর হ'য়ে থাকতাম।

এইভাবে সুরু হ'লো আমাদের আশ্রম-জীবন। নিজেদের বাড়ী-ঘরের কথা ভুলে গেলাম। আমরা সকলে ঠাকুর-বাড়ীর মানুষ হ'য়ে পড়লাম। শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীকর্তামা, শ্রীশ্রীমা ও শ্রীশ্রীবড়মার স্নেহের ছায়ায় বছরের পর বছর—কত বছর কেটে যেতে লাগল। শ্রীশ্রীঠাকুর মেয়েদের লেখাপড়া, গানবাজনা, শিল্প, চিত্র, সেলাই প্রভৃতি নানা কাজকর্ম শেখবার কত কি ব্যবস্থা করলেন। পুরুষদের জন্যও কত বিদ্যা-শিক্ষার কত কি আয়োজন করলেন, কল-কারখানা কত কি বসালেন, সেজন্য ঘরবাড়ী, দালানকোঠা কত-কিছু তৈয়ার করালেন। পুরুষদের সঙ্গে মেয়েরাও তাদের সাধ্যমত কত কাজ করত। শ্রীশ্রীঠাকুর কর্মীদের সঙ্গে সঙ্গে থেকে সকলকে উৎসাহ দিয়ে কত কাজ করাতেন। প্রতি বৎসর কত বড় বড় উৎসব হ'তো, তাতে কত দেশের কত লোক আসত।

দেখতে দেখতে আমাদের আশ্রম কী ছিল, কী হ'য়ে পড়ল। একটা বসত বাড়ীকে শ্রীশ্রীঠাকুর একটা সহর বানিয়ে ফেল্লেন। আশ্রম দেখতে তখন কত দেশের কত লোক আসত। ক্রমে-ক্রমে কত জায়গার কত লোক বাড়ী-ঘর ছেড়ে শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে এসে থাকতে লাগল। শ্রীশ্রীঠাকুরের মমতা, দয়া, আদর-সোহাগ, চলাফেরা কাজকর্মের সে কত কথা! তা বল্লে কোনদিন ফুরোবে না। সব আজ চক্ষের সামনে জল্ জল্ ক'রে ভেসে উঠছে, মনে হয় যেন সেদিনের কথা। কিন্তু বহুকাল চ'লে গেছে। যাঁদের এসে দেখেছিলাম, শ্রীশ্রীকর্তামা, শ্রীশ্রীমা, মহারাজ, গোঁসাইবাবা, কিশোরীবাবা, দুর্গানাথবাবা—কেউ আর নেই, সবাই একে একে গত হয়েছেন। তাঁদের উদ্দেশ্যে প্রণাম জানাই। রজতকে কোলে নিয়ে এসেছিলাম, তাঁর দয়ায় সে এখন দুটি ছেলের বাবা হয়েছে। বড়খোকা ও মণিকে এসে দেখেছিলাম কিশোর বয়সের, তারা সবেমাত্র পৈতে

নিয়েছে। ফুট্‌ফুটে গৌরবরণ, কী সুন্দর চেহারা, যেন লব-কুশ দুই ভাই। তাদের বয়সও বোধ হয় পঞ্চাশ হ'তে যাচ্ছে। পরমপিতা তাঁদের সুস্থ শরীরে সুদীর্ঘজীবী ক'রে রাখুন। শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীশ্রীবড়মাকে এসে পেয়েছিলাম, তাঁদের ভরাযৌবনকালে। শ্রীশ্রীবড়মার সত্তর হ'তে চলেছে। পরমপিতার দয়ায় শ্রীশ্রীঠাকুর আজ প'চাত্তরে পড়েছেন। তাঁর পুণ্য জন্মদিনে প্রাণে আমার যত শক্তি আছে তা দিয়ে প্রার্থনা করি, তাঁরা উভয়ে সুস্থ দেহমন নিয়ে শত শত বৎসর বেঁচে থাকুন আমাদের সবাইকে নিয়ে। জয় হোক, জয় হোক, জয় হোক আমাদের দয়াল ঠাকুরের।

২

'অমিয়-বাণী'র ভূমিকায় শ্রীশ্রীঠাকুরের পরিচয়

['অবতরণিকা'—৫ পৃষ্ঠার পাদটীকা দ্রষ্টব্য]

এই "অমিয়বাণী"র বক্তা কে, অনেকেরই মনে এই প্রশ্ন উঠিবে। তাঁহার পরিচয় দিতে আমরা অক্ষম, এ-কথা অকপটচিত্তে স্পষ্টভাবে স্বীকার করাই ভাল। প্রত্যক্ষভাবে তাঁহার যতটুকু বুঝিয়াছি, তাহাও নিঃসংকোচে স্পষ্টভাষায় বলিতে পশ্চাৎপদ হইব না। কেহ বলেন তিনি মহাপুরুষ, কেহ বলেন অবতার, কেহ বলেন জগদ্‌গুরু, কেহ বলেন তিনি নাজারেথের যীশু, কেহ বলেন তিনি নদীয়ার গৌরাঙ্গ, কেহ বলেন তিনি বৃন্দাবনের কৃষ্ণ, কেহ বলেন তিনি রামকৃষ্ণ। আমরা এই রকম কিছু-একটা বলিয়া তাঁহাকে বড় বা ছোট করিতে চাহি না। আমরা দেখিতেছি তিনি আমাদেরই মত একজন মানুষ। ইহার অতিরিক্ত আর কিছুই বলিবার কোন যুক্তিযুক্ত কারণ খুঁজিয়া পাই না। অবতার বলিতে অনেকে অনেক রকম বুঝিয়া থাকেন। পূর্ণাবতার, অংশাবতার, আবেশাবতার ইত্যাদি অনেক শ্রেণীর অবতার আছেন। কেহ বা প্রথম জীবনে সাধক থাকিয়া পূর্ণ সিদ্ধি লাভ করিয়া অবতারত্ব লাভ করেন; কেহ বা আজন্ম পূর্ণ থাকিয়াও লোকশিক্ষার্থ অশেষবিধ সাধনা করিয়া থাকেন; কেহ বা জন্মাবধি পূর্ণরূপে অবতীর্ণ হইয়া সাধনভজনের বিশেষ আবশ্যকতা অনুভব করেন না, আবার কেহ বা সাধকভাবে জীবন আরম্ভ করিয়া পূর্ণব্রহ্ম-ধামে উপনীত হইয়া আবার মানুষের পদবীতে অবরোহণপূর্বক কর্ম করিয়া থাকেন। আবার কাহারও কাহারও মতে পূর্ণব্রহ্মের অবতার হওয়া অসম্ভব। কাহারও মতে সকল অবতারই পূর্ণাবতার, অংশাবতার অসম্ভব। কেহ কেহ বলিয়া থাকেন সকল মানুষই অবতার। অবতার সম্বন্ধে বহু বিভিন্ন মত যখন প্রচলিত, তখন আমাদের এই মানুষটিকে অবতার বলিয়া প্রচার করিবার সার্থকতা কোথায়, আর তাহাতে লাভই বা কি? সে কারণে "অমিয়বাণী"র বক্তাকে অবতার বলিয়া ঘোষণা করিয়া অবতারের অর্থ ও স্বরূপ লইয়া অশেষবিধ যুক্তিজালের অবতারণাপূর্বক একটা কোলাহলের সৃষ্টি করিবার কিছু প্রয়োজন আছে বলিয়া

মনে করি না। বহু মানুষ নিত্য তাঁহার সংস্পর্শে আসিতেছেন, এবং বহুজনে তাঁহাকে বহুভাবে দেখিতেছেন।

এই ভূমিকার লেখক প্রথম দর্শন ও প্রথম পরিচয় লাভ করিয়া মনে করিয়াছিল, ইনি নিশ্চয়ই দক্ষিণেশ্বরের ঠাকুর, আবার নূতন কলেবরে আসিয়াছেন। তারপর এই তাণ্ডবনৃত্যকীর্তন-প্রচারক ভাববিহ্বল মানুষটিকে নদীয়া-বিহারী গৌরাঙ্গঠাকুর বলিয়াই ভ্রম হয়। পরে কিছুদিন ধরিয়া তাঁহার পরমপিতার প্রিয় পুত্র যীশুরে অবিকল প্রতিচ্ছবি দেখিতে পাই, পুনশ্চ ঘন পরিচয়ে বিশ্বপ্রেমিক বুদ্ধ ও চতুর-চূড়ামণি কৃষ্ণ বলিয়াই ভ্রম হয়। আমার এই সকল ভিন্ন ভিন্ন সময়ের ধারণার মূল্য কতটুকু তাহা কতক পরিমাণে বুঝিয়া এখন নিরস্ত হইয়াছি।

আসল কথা, তাঁহার পরিচয় দিবার ক্ষমতা বা ভাষা আমাদের নাই। তবে একটা কথা না বলিলে ঠিক সত্য কথা বলা হয় না। তিনি আমাদেরই মত মানুষ, কিন্তু তিনি অতি অদ্ভুত প্রকারের মানুষ। যে-কোন একজন সাধারণ মানুষকে ঠিক ঠিক বুঝিয়া তাহার পরিচয় দেওয়াই যখন আমার পক্ষে অসাধ্য ব্যাপার, তখন এই অদ্ভুত মানুষটির প্রকৃত স্বরূপের পরিচয় আমি কেমন করিয়া দিব? যাঁহাকে চিনিতে গিয়া ধরিতে গিয়া পদে পদে নিজ বুদ্ধির উপর ধিক্কার আসিয়াছে—যাঁহার ভাবে, পরমসুন্দর মুখাবয়বে, নয়নযুগলের চাহনীর ভঙ্গীতে, কার্যকলাপে নিত্য নূতন রসের সঞ্চার দেখিয়া অবাক হইতেছি, কি বলিলে তাঁহার স্বরূপ বর্ণনা করা হয় তাহা সত্যই আমি জানি না। যিনি কখনও জননীর মত স্নেহভরা বুকের ভিতরে আমাদিগকে চাপিয়া ধরিয়া অশ্রুবর্ষণ করেন এবং আবেগপূর্ণ শত-চুম্বনের পুণ্যবর্ষণে আমাদিগের পাপ-তাপ বিধৌত করেন, কখনও পিতার অধিক যত্নে গম্ভীর অথচ করুণ উপদেশে আমাদিগকে যেন হাত ধরিয়াই সত্যের পথে পরিচালিত করিবার জন্য ব্যাকুল—যিনি কখনও ছোট ভাইয়ের মত আবদারে মনপ্রাণ কাড়িয়া লন, কখনও প্রভুর মত সেবা গ্রহণ করেন, কখনও দাসানুদাসের মত আমাদের পদ ধৌত করিয়া দেন, কখনও প্রাণপ্রিয় সখার মত নিবিড় আবেষ্টনে বাঁধিয়া বালকের মত ক্রীড়ারত হন—যিনি কখনও শিশুর মত চপল লীলাভঙ্গী করেন, আবার কখনও বা জ্ঞানবৃদ্ধ বশিষ্ঠের মত তত্ত্বকথার গম্ভীর আলোচনায় রত থাকেন, তাঁহাকে অবতার বলিয়া আমাদের বুক হইতে টানিয়া দূরে সরাইবার চেষ্টা করিলে আমরা অবশ্য প্রতিবাদ করিব। তিনি আমাদের পিতা, তিনি আমাদের মাতা, তিনি আমাদের চতুর মন্ত্রী, আমাদের পরম গুরু; তিনি আমাদের ভ্রাতা, তিনি আমাদের প্রাণপ্রিয় সখা, নিতান্ত আপনার জন।

যিনি সকল প্রকার অলৌকিকতা হইতে সতত দূরে অবস্থান করিতে চাহেন—যিনি নিজে অতিপ্রাকৃত কিছু করিতে না চাহিলেও, যাঁহার সংস্পর্শে আসিয়া কত তথাকথিত অধম জনে অলৌকিক অসাধ্য সাধন করিতেছেন—প্রেমের বন্ধনে

আমাদের সহিত একাত্ম হইয়া যিনি আমাদের অন্তরের সকল কথা, সকল ভাব, সকল ভঙ্গীই সহজভাবে জানিতেছেন—যাঁহার দর্শনে হৃদয় হইতে সকল দুর্বলতা দূরে পালায়—যাঁহার নবনীতকোমল চন্দনশীতল অঙ্গস্পর্শে সকল শোকতাপ নিমেষে অন্তর্হিত হইয়া যায়—যাঁহার ভুবনবিজয়ী হাসিতে আর চাহনীতে কত সহস্র মানুষ বাসনাসক্তির দৃঢ় পাশ হেলায় ছিন্ন করিয়া স্বস্বরূপের দিকে বেগে আকৃষ্ট হইতেছেন—যিনি কৃতবিদ্য না হইয়াও পরাবিদ্যা-গৌরবে নিখিল শাস্ত্রযুক্তির অধিকারী—যাঁহার কথায় সকল সংশয় ছিন্ন হয়—সাধু, অসাধু, দাতা, কৃপণ, ত্যাগী, লোভী সকল মানুষেরই অবস্থার অনুভূতির সহিত যাঁহার সম্যক পরিচয়—ভাষায় এরূপ অদ্ভুত মানুষের পরিচয় কেমন করিয়া দিব ?

আমরা এই মানুষটিকে অবতার খাড়া করিয়া একটা দল গঠন করিতে প্রবৃত্ত হই নাই। এই অদ্ভুত মানুষটিকে—এই নূতন যুগের নূতন মানুষটিকে—আমরা অবতার পুরুষগণের সহিত একাসনে বসাইব না। যাঁহার বাণী প্রকাশিত হইতেছে, তিনিও নিজেকে অবতাররূপে প্রচার করিবার বিন্দুমাত্র আকাঙ্ক্ষার পরিচয় কোনদিন দেন নাই। বরং তাঁহাকে এ সম্বন্ধে ভূয়োভূয়ঃ তীব্র প্রতিবাদ করিতেই শুনিয়াছি। এই মহাযুগের প্রথম প্রভাতে নূতনভাবে নূতন মানুষ গঠন করিবার জন্য তিনি আমাদিগকে আহ্বান করিতেছেন মাত্র। তাঁহার ভাব, তাঁহার কথা অতি স্পষ্টভাবে অতি সহজভাবেই তিনি বলিতেছেন—সে ভাব ও ভাষার ভিতরে নিখিলই নিহিত আছে, কিন্তু তাহার ভিতরে শাস্ত্রদর্শন-সুলভ জটিলতার লেশমাত্র নাই। আমরা তাঁহার বাণীর, তাঁহার দ্বারা প্রচারিত সত্যের প্রচারেই ব্রতী হইয়াছি। তিনি মানুষ হউন, অতি মানুষ হউন, তাহাতে আমাদের কোনই ক্ষতিবৃদ্ধি নাই ; আর যদি "অবতার" শব্দের একটা নির্দিষ্ট অর্থের নির্দেশ করিয়া সেই অর্থে তাঁহাকে কেহ অবতার বলেন, তাহা হইলেও আমাদের বিশেষ আপত্তির কারণ নাই। তবে আমাদের প্রাণের কথাটা এই যে, তাঁহাকে সহজ মানুষরূপে গ্রহণ করিতে কোন মানুষের কোন আপত্তিই থাকিতে পারে না, এবং নিজ জীবনে তিনি যে আদর্শ দেখাইতেছেন, সেই আদর্শ সম্বন্ধে আলোচনা করিলে সকলেরই লাভ হইবার সম্ভাবনা। ... ."

৩

গোত্রকুল-পঞ্জী

[প্রথম অধ্যায় 'গোত্রকুল-পরিচয়' দ্রষ্টব্য]

গোত্র-পঞ্জী

শাণ্ডিল্যবংশ পত্রিকা

ব্রহ্মা

বিরাট

স্বায়ম্ভুব মনু

মরীচি অত্রি অঙ্গিরা পুলস্ত্য ভৃগু পুলহ ক্রতু প্রচেতা

কশ্যপ

অসিত

দেবল শাণ্ডিল্য

পিতৃকুল-পঞ্জী

গোত্র—শাণ্ডিল্য, প্রবর—শাণ্ডিল্যাসিতদেবলাঃ

কালিব্যাস

বামদেব

রামদেব

ক্ষিতীশ

ভট্টনারায়ণ

১। ভট্টনারায়ণ
(কান্যকুব্জ হইতে বঙ্গে আগত)
২। আদি গাঞি ওঝা
৩। জয়মণি ভট্ট
৪। হরিকুঞ্জ (হরিকুব্জ)
৫। বিদ্যাপতি
৬। রঘুপতি
৭। শিবাচার্য
৮। সোমাচার্য
৯। উগ্রমণি
১০। তপোমণি
১১। সিন্ধুসাগর
১২। বিন্দুসাগর
১৩। জয়সাগর
১৪। পিতাম্বর
১৫। লোকনাথ লাহিড়ী
১৬। ভূতনাথ ওঝা
১৭। দিগম্বর
১৮। টুট বা চুট ওঝা
১৯। বল্লভাচার্য
২০। কেশব (কেশাই) লাহিড়ী
২১। বেঁকাই (শ্রীনারায়ণ) লাহিড়ী
২২। মাধব (মাধাই)
২৩। মহামিশ্র
২৪। প্রগর্ভ ভট্ট
২৫। রামাচার্য (রামচন্দ্র আচার্য)
২৬। মধুসূদন বাচস্পতি
২৭। সারঙ্গাই (সারঙ্গদেব লাহিড়ী)
২৮। নন্দকিশোর (নন্দাই লাহিড়ী)
২৯। শঙ্করনাথ লাহিড়ী
৩০। পণ্ডিত ভরতচন্দ্র লাহিড়ী
৩১। বাসুদেব মিশ্র লাহিড়ী
৩২। শিবরাম লাহিড়ী
৩৩। মনোহর চক্রবর্তী
৩৪। রামকৃষ্ণ চক্রবর্তী
৩৫। কৃষ্ণদেব চক্রবর্তী
৩৬। জগন্নাথ চক্রবর্তী
৩৭। ভবানীপ্রসাদ চক্রবর্তী
৩৮। ঈশ্বরচন্দ্র চক্রবর্তী
৩৯। শিবচন্দ্র চক্রবর্তী
৪০। **শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র**
প্রভাসচন্দ্র, কুমুদচন্দ্র,
কুমারী গুরুপ্রসাদী

মাতৃকুল-পঞ্জী

গোত্র—কাশ্যপ, প্রবর—কাশ্যপাপস্যারনৈধ্রুবাঃ

বীতরাগ

সুষেণ মুনি

বুদ্ধ ওঝা

১। দক্ষ

(কান্যকুব্জ হইতে বঙ্গে আগত)

২। সাক্ষনু

৩। পীতাম্বর

৪। হিরণ্যগর্ভ

৫। ভূগর্ভ

৬। বেদগর্ভ

৭। যোগিনী মহামুনি
(জগন্মহামুনি)

৮। স্বর্ণরেখ ৮। ভবদেব

৯। সিন্ধু ওঝা

১০। কৈতেই ১০। মৈতেই
(ক্রতু) ১০। গরুড়

১১। শঙ্করী (সঙ্কর্ষণ)

১২। মুকুন্দ

১৩। যোগেশ্বর ১৩। দিবাকর

১৪। পুণ্ডরীকাক্ষ

১৫। বিশ্বাম্বর আচার্য

১৬। লক্ষ্মীপতি আচার্য

১৭। বৃহস্পতি আচার্য

১৮। উদয়নাচার্য ভাদুড়ী

১৯। পশুপতি

২০। জগাই

২১। সরাই

২২। দামাই

২৩। শ্রীধর

২৪। প্রভাকর

২৫। গোকুল

২৬। বিষ্ণুদাস

২৭। কুমুদানন্দ

২৮। মোহনবল্লভ

২৯। পীতাম্বর

৩০। রামজীবন চৌধুরী

৩১। রামশঙ্কর

৩২। শীতলরাম

৩৩। বৃষেন্দু নারায়ণ

৩৪। রামেন্দ্র নারায়ণ

৩৫। **মনোমোহিনী দেবী**

৩৬। **শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র**
প্রভাসচন্দ্র, কুমুদচন্দ্র, (ট্যাংরা, সুডিল, নির্মলা, ফাগুনী, বিশ্ববিজয়—সকলেই অল্পবয়সে মৃত), কুমারী গুরুপ্রসাদী

৪

বাল্যরচনা

[সপ্তম অধ্যায় 'ছাত্রজীবন'—৯৪ পৃঃ ২৪।২৫ লাইন দ্রষ্টব্য]

শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের বাল্যরচনার পরিচিতি স্বরূপ এখানে কয়েকটি কবিতা ও সঙ্গীত এবং একটি নাটকের কিয়দংশ প্রকাশিত হইল। ইতঃপূর্বে সপ্তম অধ্যায়ের কতিপয় স্থানে প্রসঙ্গক্রমে তাঁহার তৎকালের রচনা হইতে কিছু কিছু উদ্ধৃত করা হইয়াছে।

কবিতাবলী

স্বপ্ন

[এই বৃহৎ কবিতাটির মধ্যাংশের কয়েকটি ছত্র এবং শেষাংশটুকু উদ্ধৃত হইল।]

*　　　*　　　*

তখন বলিতে লাগিল সে দেবী
　　এস তুমি এস আমার ছায়ায়
　　(শান্তি লভিবে যদ্যপি তুমি),
রাখিব সাজায়ে প্রেমফুলে তব
　　শান্তিরসে তব মজাব আঁখি।

*　　　*　　　*

এতেক কহিয়া নিরবিলা দেবী
　　ভাঙ্গিল আমার ঘুমের ঘোর,
বুঝিলাম আমি বুঝিনু অন্তরে
　　মায়ার কুহেলে সকলি ভোর।
ফিরিলাম পুনঃ সংসার সমরে
　　লুকায়ে আমার হৃদয়খানি,
পাছে ডুবে পড়ি মায়ার সাগরে
　　লুকালাম তাই হৃদয়খানি॥

তাড়কাবধ

[এই সুদীর্ঘ কবিতাটির সর্বশেষ আট পংক্তি উদ্ধৃত হইল]

এতেক দেখিয়া শেষে তাড়কা রাক্ষসী
গ্রাসিতে আইলা রামে অতি ত্বরা করি।
ইহা দেখি শেষে রাম হাসিয়া তখন
ছাড়িলেন শতবাণ টঙ্কারি ধনুকে।

পঞ্চবাণ খেয়ে শেষে তাড়কা রাক্ষসী
বিকট চিৎকারি শেষে পড়িলা ভূমিতে।
বিকট গর্জ্জন শুনি বন্য জীবগণ
বন ছেড়ে পলাইতে লাগিলা সকলে।

বটবৃক্ষ

[বিশ ছত্রের এই কবিতাটির প্রথম চারিটি ছত্র উদ্ধৃত হইল]

কি শান্তি আহা রোয়েছে হেথায়
যাতনা থাকে না প্রাণেতে আর।
প্রাণের জ্বালা যায় গো দূরে,
দুখেতে জীবন ভাসে না আর॥

বর্ষসঙ্গীত

[বিশ লাইনের এই কবিতার প্রথম চারি ও শেষ চারি লাইন উদ্ধৃত হইল]

কি করিনু আমি বরষ ধরিয়া
এখন আমার কি হবে হায়!
মনের আনন্দ করিয়াছি শুধু
কি হবে এখন কি হবে হায়!

* * *

শিখিয়াছি এবে ভালরূপে আমি
কেমন ভীষণ পাপের কায়,
আর না আর না সহিতে নারি যে
কি হবে উপায় আমার হায়!

বিধবা

[বহু স্তবকের এই দীর্ঘ কবিতাটির তিনটি স্তবক উদ্ধৃত হইল]

নাহি ওর প্রিয় পতি নিভে গেছে মনবাতি
অতি দুখে তাই আছে নোয়াইয়ে মাথা
ছুঁয়ো না ছুঁয়ো না ঐ ভারত বিধবা॥
বিন্দু বিন্দু অশ্রুধার বহিতেছে অনিবার
শুষ্ক কুসুমের প্রায় আছে পড়ে হেথা।
ছুঁয়ো না ছুঁয়ো না ঐ ভারত বিধবা॥

জগতের যত সুখে   কিছু নাই আছে দুখ
মরম উথলি তায় উঠিতেছে ব্যথা।
ছুঁয়ো না ছুঁয়ো না ঐ ভারত বিধবা॥

আক্ষেপ

[ছাপ্পান্ন পংক্তির এই কবিতাটির প্রথম আট পংক্তি উদ্ধৃত হইল]

কেন হে সুখের শশী   বিস্তারিয়া হাসি রাশি
সুনীল গগন মাঝে কেন দেখা দিলে রে?
ছিঁড়িবারে অভাগার   শান্তির কোমল তার
তাই বুঝি নভোপরে হাসি ঢেলে দিলে রে॥
অতি দুঃখী আমি শশী   বুকে ভরা দুঃখ রাশি
দেখিলে তোমার হাসি হৃদি জ্বলে উঠে রে।
তব সম রূপ রাশি   সুকোমল হাসি মিশি
আমার হৃদয়াকাশে দুই দিন ছিল রে॥

সঙ্গীতাবলী

মানবের জীবন দেখ
রক্তিমাভ রবিপ্রায়।
এই আসে হাসে খেলে
কোথা পুনঃ চ'লে যায়।
আজি যার মহাতাপে
ত্রিভুবন যেন কাঁপে
খুঁজিলেক কালি তারে
আর নাহি পাওয়া যায়।
আজি মহারাজ্য যারা
কালি সবে কোথা তারা?
এ সকল দেখে শুনে
কেন লোকে ভুলে যায়।

নগন মনে
নগন প্রাণে
তটিনী পুলিনে কি গান গাও?
আপনি হাস

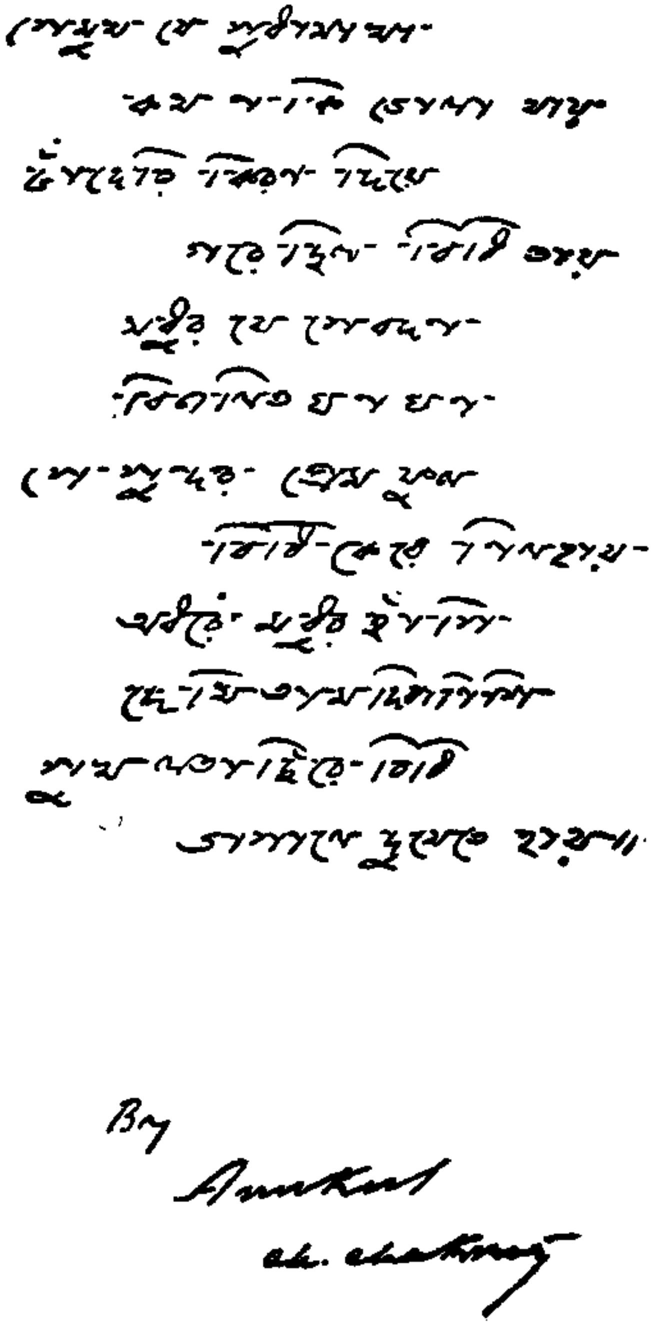
আপনি কাঁদ
কেন লো আপনি আবার ধাও ?
আপনা ভুলে
গগনে তুলে
কার প্রেমসুধা গাহিয়ে যাও ?
আপন মনে
অতৃপ্ত প্রাণে
কেন বারে বারে ফিরিয়া চাও ?
কেন লো কেন
এ ভাব কেন
কেন লো থামিলে আবার গাও ?

কোথা হ'তে আসি
কেন কাঁদি হাসি
কেন বা আবার
কোথায় যাই ।
আপনার মনে
কি ভাবি গোপনে
কেন বা কি ভাবি
কোথায় ধাই ।
স্বপনের মত
হেরি কত পথ
আবার কি ভাবি
ভুলিয়া যাই ।
সে বা কেন হাসে
আমি মরি হেসে
কেন হাসি খেলি
ভাবি গো তাই ॥
এ ঘোরের খেলা
কে বা করে খেলা,
না বুঝিয়ে আমি

কেন খেলাই ?
ওই মহা ঘোর
হবে নাকি ভোর,
কিবা ঘোরে পড়ে
কোথায় যাই ।।
সময়ের স্রোতে
কেন যাই মেতে,
কে হেন ভাবায়,
ভাবি গো তাই ।

ওহে সুধামাখা শশী
কে তোমারে নিরমিল ?
এমন কোমল হাসি
কে তোমারে শিখাইল ?
তোমার উদয়াভাগে
প্রকৃতি প্রফুল্লে হাসে
এ হেন পবিত্রভাবে
কে তোমারে গড়াইল ?
গড়ে মনোহর কান্তি
দিয়ে হৃদে মহাশান্তি,
জগতের শান্তি দিতে
কে তোমারে শিখাইল ?
কোথা সেই শিল্পকর
যে রচিল সুধাকর,
শান্তিতে ভাসাতে ধরা
যে শশীতে সুধা দিল ?

ভালবাসা চাই কভু এ কথাটি বল না ।
ভালবেসে অবশেষে পথে পথে কেঁদ না ।।
ভালবাসা বিষে ভরা



শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের বাল্যরচনার হস্তাক্ষরের প্রতিলিপি:

(১৩১০ সন)

নাই এতে শান্তিধারা
প্রলোভনে ভুলে কভু কেউ ভালবেস না ॥
এতে শুধু অশ্রুজল
থাকে নাক হৃদে বল
অবশেষে হৃদি মাঝে পাবে শুধু যাতনা ॥

(আমি) যাহারে ভালবাসিয়াছি
সেই তো আমার ছলেছে হিয়া।
কতই বলেছে "আমি যে তোমারি"
ব্যথার সময় গেছে পলাইয়া ॥
যারে চুমেছি আকুল পরাণে,
সেই তো ছিঁড়েছে মর্ম্মটি টেনে।
বক্ষে আবেগে তুলেছি যাহারে,
সেই তো গেছে পদ প্রহারিয়া ॥
(ওগো) প্রিয়, কভু চাহিনি তোমায়
ভাই ব'লে তুমি ছাড়নি তো হায়!
মোর না চাওয়ায় সুখে দুখে হায়
তুমি তো কখন যাওনি ফেলিয়া ॥
তুমি প্রিয়তম জেনেছি আমারি
বেদনায় তুমি আরও যে আমারি
সকলেই ছেড়ে গিয়েছে আমারে
তুমি তো কখন যাওনি ছাড়িয়া ॥

নিম্নে কয়েকটি সংগীতের কিঞ্চিদংশ উদ্ধৃত হইল—
রজনী প্রভাতা হ'লো
সে আমার তো এলো না।
সদা তারি তরে প্রাণে পুড়ে মরি
কৈ সে তো ফিরে চেলো না ॥

বুকে ধ'রে কারে শান্তি পাব আমি
কে দিবে জুড়ায়ে জ্বালা?

শান্তিহীন সখী এ পোড়া পরাণ
কে আছে জগতে দিবে শান্তি দান ?
ল'য়ে যাও সখী ফিরায়ে ও ফুল
গাঁথিব না আর মালা ॥

আর কি আসিবে পুনঃ
যে গেছে চলে।
ভাসায়ে আমারে গেছে
নয়ন জলে ॥
তুষানল সম জ্বলে
হিয়াখানি পলে পলে,
আর কি পাব গো তারে
শান্তির জলে ॥

দেবযানী নাটক

তৃতীয় অংক, ১ম গর্ভাংক

৫ম দৃশ্য

দেবযানীর কক্ষ, দেবযানী আসীনা।

দেবযানী। আহা! প্রাণেশ আমার
হাস্যমুখে দেবযানী
বলে' মোরে ডাকেন যখন,
তখন হৃদয় মোর নাচিবারে
থাকে, আহা! আনন্দ সাগরে।
ঐ যে অলকা আসিতেছে
হেথা। প্রাণেশেরে ডাকিবার
তরে এখনি পাঠাব ওরে।

(অলকার প্রবেশ)

অলকা। মা, কচদেব দ্বারদেশে।
সাক্ষাতের হেতু তিনি
আছেন তথায়।

দেবযানী। শীঘ্র যাও, আন ডেকে
তারে।

অলকা। যে আজ্ঞা।

দেবযানী। আহা! কি সৌভাগ্য
মোর। প্রাণেশ আমার
ইচ্ছামত আসিছেন হেথা।
কারে বলি প্রাণেশ
আমার, কভু সে হবে না
মোর। জানি আমি।
তবু কেন বলি তারে
প্রাণেশ আমার।

(কচের প্রবেশ)

দেবযানী। কেন দেব আগমন
হেথা ?

কচ। দেখিবারে দেবযানী
বদন তোমার।

দেবযানী। হবে কি সে সৌভাগ্য
আমার ?

কচ। ভগিনি! ভালবাসি
দেখিয়া তোমায়,
তাই হেথা আসিনু দেখিতে।

দেবযানী। (স্বগত) হবে না আমার সে।
তবে কেন জ্বলে মরে
প্রাণ। যদি হ'তো মোর,
তবে নাহি সম্ভাষিত
'ভগিনি' বলিয়া।
ভালবাসা দূরে যাও,
বাসিব না আর।
ভেঙ্গে যাও হৃদয়-
আসন। কেহ না
বসিবে মোর হৃদয়-

আসনে। ক্ষান্ত হও
অশ্রুজল। গণ্ডদেশে
বহিও না আর। ক্ষান্ত—

কচ। কেন দেবযানি
স্নেহের প্রতিমা মোর!
কি হেতু না বল
কথা আর?
বড় ব্যথা পাব প্রাণে
যদি নাহি কথা কও আর।
একমাত্র স্নেহের পুতুলি
তুমি, তাই ভালবাসি
তোমা হেরিয়ে নয়নে।

দেবযানী। (স্বগত) বল বল বল দেব ঐ কথা
পুনঃ, শুনে ভাসি
আনন্দ-সাগরে।
বহুদিন ঐ কথা শুনিবারে
সাধ মম জাগিছে হৃদয়ে।

কচ। কেন দেবযানি,
ভালবাসি—শুনে
তব বাণী। তাই বুঝি ঘৃণা
ক'রে কহিছ না কথা?

দেবযানী। শুনিয়াছি শিষ্য-
দের কাছে,
সুমধুর গীত গাও তুমি।
তাই দেব শুনিতে সঙ্গীত
মম হৃদয় ব্যাকুল।
রাখিয়া দাসীরে পায়
করহ সঙ্গীত।

কচ। কেন দেবযানি?
যদি তুমি স্নেহভরে
ভালবেসে বলিতে আমায়

'গাও হে সঙ্গীত তুমি'
তাহা হ'লে অনায়াসে
গাহিতাম আমি।
তবে শুন দেবযানি,
গাহিব প্রেমিক গান,
যে গানেতে যোগীগণ
মুগ্ধ দিবানিশি।
যে গানে নারদ
ঋষি তেয়াগি স্বরগ,
ফেরে সদা ত্রিলোক
মাঝারে। যে গানেতে
পঞ্চানন শ্মশান নিবাসী
পঞ্চমুখে গেয়ে তার
নাহি পান সীমা।
এ অধম কচ আজ
ইচ্ছুক সে গানে।
শুন দেবযানি!
সেই গান গাহিবে
অধম। শক্তি নাই,
তবু গান গাহিবারে সাধ।

দেবযানী। গাও দেব
শুনিতে সঙ্গীত, সাধ
হয়েছে আমার।

কচ। গীত

পরমেশ, কেবা জানে মহিমা তোমার!
ঐ যে কুসুমগণ দুলিতেছে অনুক্ষণ
হেলে দুলে নমিতেছে চরণে তোমার।
ঐ যে বিহঙ্গকুল রূপে যার নাহি তুল
নেচে নেচে গাহিতেছে করুণা তোমার।

ঐ হের কল্লোলিনী কুল কুল প্রবাহিনী
কুলু শব্দে প্রক্ষালিছে চরণ তোমার।
জগতের যত প্রাণী তোমারে ঈশ্বর মানি
নমিতেছে সদা তারা চরণে তোমার।
আমি যে অধম প্রাণী ভক্তিস্তুতি নাহি জানি
"অনুকূলে" কৃপা করি দাও হে চরণ তোমার ॥

দেবযানি, যাই তবে আমি।
রাত বেড়ে গেছে, নয়নে নেমেছে
ঘুম। কল্য প্রাতে পুনরায়
আসিব হেথায়।

দেবযানী। তবে দেব যান এবে,
আমিও চলিনু এই
শয়ন আগারে। (উভয়ের প্রস্থান)

৫

যৌবনের রচনা

[ভক্তিমূলক কবিতাবলী]

আমরা গ্রন্থের দশম অধ্যায়ে শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের আধ্যাত্মিক চেতনা ও অনুভূতির পরিচায়ক তঁৎরচিত কতকগুলি ভক্তিমূলক কবিতার উল্লেখ করিয়াছি। তাঁহার তৎকাল-রচিত ঐ শ্রেণীর কবিতার আরও কয়েকটি নিম্নে সন্নিবিষ্ট করা হইল।

পিতঃ! এস হৃদয়ে আমার
পুত্র পরিবার লয়ে দেখি একবার
মাতা পিতা পরিজন
দারা পুত্র ভাইবোন
সবাই দেখিতে তোমা চাহে অনিবার ॥
এস গো পরমপিতা
এস ওগো ভবত্রাতা
এস হৃদি আলো করি দয়ার আধার ॥

এস পতিতপাবন অগতির গতি
ভবভয়হারী হরি হে।

এস দীনজন নাথ নিখিল পালক
চক্রসুদর্শনধারী হে ॥
এস এস এস হে জগতের পিতঃ
এস তুমি মোর চির বাঞ্ছিত
এস দরিদ্রের ধন দুর্ব্বলের বল
দুষ্কৃতি-নিধনকারী হে ॥
দ্যাখ রক্তস্রোতে দুঃখিনী মেদিনী
ভেসে যায় আহা ফাটিয়ে পরানী
এস এস এস ঢাল ঢাল শান্তিবারি
ওগো ত্রিতাপ ভয়হারী হে ॥

পিতা! খোল খোল দ্বার তনয় তোমার
দাঁড়ায়ে মলিন বদনে।
ধূলি কাদা গায় কত কাঁটা হায়
ফুটেছে দু'খানি চরণে ॥
দুটি গণ্ডস্থল বহে অশ্রুজল
কাঁদিছে আকুল পরাণে ॥
চলে অবিশ্রান্ত হয়েছে গো শ্রান্ত
লহ কোলে তুমি যতনে ॥

কই কোথা তুমি
এসে আমার প্রাণ বাঁচাও।
(তুমি) হৃদয় বিহারী যদি
হৃদে থেকে কেন প্রাণ কাঁদাও ॥
(আমি) ভুলেছি সকল কর্ম্ম
তুমি মোর সার ধর্ম্ম
তোমাপানে কি যেন মোর
ছুটিছে হয়ে উধাও ॥
খুলিয়া হৃদয়দ্বার
ডাকি প্রভু অনিবার
এস এস এস তুমি
এসে হেসে সব ভুলাও ॥

আজি এ হৃদয় শুধু তোমা বিনে
মরুভূমি প্রায় জ্বলিছে ভীষণ ॥
যথা ফিরে চাই শুধু তুমি আঁকা
তুমিময় শুধু হেরি এ ভুবন ॥
কোথা আছ তুমি শুধু খুঁজে মরি
পাই না যে তোমা তবু শুধু ঘুরি
হতাশ অন্তরে কাঁদি শেষে একা
আছ তুমি পুনঃ হেরি গো স্বপন ॥
ভাঙ্গা বুক লয়ে কি যেন আশায়
পুনঃ খুঁজি ভেবে পাইব তোমায়,
হায় রে পাষাণী পালাইয়া যাও
দেখাও আঁধার এ তিন ভুবন ॥
হতাশ অন্তরে বুকে ব্যথা ধরি
আঁখি নীরে ভেসে পুনঃ বসে পড়ি
এত ভালবাসি এত কেঁদে মরি
হাত ধরে এসে তোল না কখন ॥
তুমি আছ ভেবে শুধু বেঁচে আছি
বড় সাধ তাই থাকি কাছাকাছি
হায় মিছে ভাবি মিছে কেঁদে মরি
আঁধার হৃদয় আঁধার ভুবন ॥

পিতা। তোমার ছেলে তুমি বিনে দেখবে কেবা আর।
এই বিশ্বভরা ছেলে মেয়ে সকলি তোমার ॥
তুমি সবার সুখে হাস
তেমনি দুখে দুখে ভাস
তোমার কাছে ছোটবড় সবাই একাকার
দুষ্ট ছেলের শাস্তি দাও
শিষ্ট হলেই কোলে লও
বাধ্য ছেলের তোমার কাছে কত সমাদর ॥
শোকে দুখে কোনও ছেলে

ব্যথা পেয়ে কাতর হলে
তুমি নিয়ে ঘুচাও তাহার যত দুখ ভার ॥
শান্তিময় চরণতলে
ভ্রান্তি ভুলে শরণ নিলে
শান্তি শান্তি শান্তি সকল থাকে না দুঃখ তার ॥

মাগো ! এসেছে সন্তান তোমার দুয়ারে
বড়ই দুর্দিনে পড়িয়া ।
দুঃখের কাহিনী শুনাইতে তোমা
বিষাদে হৃদয় মাখিয়া ॥
স্থান পাবে বলে স্নিগ্ধ চরণে
মর্ম্মব্যথা যাবে চলিয়া ।
হেরিয়া পবিত্র শান্ত জ্যোতিটুকু
দুখদাগা যাব ভুলিয়া ॥
ইন্দুবিনিন্দিত মুখপদ্ম হতে
সুধামাখা বোল শুনিয়া ।
কালিমা জড়িত শুষ্ক হৃদি মোর
উঠিবে বলিয়া নাচিয়া ॥
তাই মা আবার এসেছি জ্বালাতে
বড়ই সংসারে জ্বলিয়া ।
স্থান দিবে বলে রাতুল চরণে
যাবে মর্ম্মানল নিভিয়া ॥
তুমি(ই) একদিন করেছ যতন
শান্তি পাব হৃদে বলিয়া ।
তাই মা পেয়েছি এ বালক হৃদে
আসিয়াছি তাই স্মরিয়া ॥
ভুলিলে সন্তানে কলঙ্ক রটিবে
এ দুখ সংসার ভরিয়া ।
রাখিও অধমে শ্রীচরণতলে
যেও না সন্তানে ভুলিয়া ॥

সুখ সুখ করে কেন কেঁদে মর
কাঁদিলে কি সুখ আসিবে হেথা ?
শুধু মুখে মুখে ডাকিলেক তারে
ভুলিবে কি মন দুঃখের ব্যথা ?
যদি চাও মন লভিবারে সুখ
কর্ম্মস্রোতে যাও দুঃখেরে লয়ে।
সেই বন্ধু হয়ে নিয়ে যাবে তোমা
অতীব যতনে সুখের আলয়ে।
সুখ যদি চাও ডাক আগে দুখে
মিলাবেন সুখ আপনি বিভু।
সুখ বিনা দুখ দুখ বিনা সুখ
বিশ্বচরাচরে হয় না কভু ॥

সবই ভুলে রইলি বসে, ভাবলি না মন শেষের কথা।
(ও তোর) আসল কথা কইতে গেলে হয় রে তখন মাথার ব্যথা ॥
দিনে দিনে দিনটা গেল
আবার জীবনসন্ধ্যা এল
চালিনি তুই আকাশ পানে ফুলিয়ে বেড়াস বুকের ছাতা ॥
গেল রে দিন দিনে দিনে
তবুও ফোলা মানে
মানের দায়ে সব খোয়ালি তখন কাঁদিস্ ধরে মাথা ॥

রে অবোধ মন শোন তোরে বলি
কত কাল রবি এমন ভাবে।
দিন যায় চলি দেখিলি না ফিরে
আঁখি মুদে রলি অসার ভবে ॥
অলীক সুখেতে মত্ত হয়ে রলি
ভাঙ্গিল না তোর ঘুমের ঘোর।
কুবাসনা তুই সুবাসনা ভেবে
তাহাতেই সদা রলিরে ভোর ॥

ভেবেছিস্ কিরে এজীবন তোর
এমনি রহিবে যাবত ধরা।
এ নব যৌবন এমনি বহিবে
সুখের স্বপন হবে না সারা॥
পাপ পুণ্যে জ্ঞান শূন্য কি হলি রে
কি নেশায় এত অধীর হলি।
সময়ের স্রোত দ্রুত বয়ে যায়
রলিরে এখনো আপনা ভুলি॥
আজ সেই দিন গেলরে চলিয়া
আসিবে না কভু আবার ফিরে।
শত সাধনায় ফিরিবে না আর
শুনিবে না দিলে মাথার কিরে॥
প্রতিদিন ভানু হয় রে উদিত
প্রতিদিন দেখ যায় রে ডুবে।
তেমনি করিলে জনম গ্রহণ
পৃথিবীতে কেউ থাকে না কবে॥
বিধির আদেশে আসিয়াছ ভবে
সাধিবার তরে তাঁহারই কাজ।
কর তাই তুমি যতটুকু পার
পর সযতনে তাঁহার সাজ॥
বিধির বিধান নহে পাপ কাজ
নহেক বিলাস তাঁহার সাজ।
তাঁহারে স্মরিয়ে কর্ম্মক্ষেত্রে যাও
করহ যতনে তাঁহারি কাজ॥
ভাবিতে হবে না সদা সুখে রবে
দিবেনাক দিন তোমারে ফাঁকি।
বহিবে হৃদয়ে শান্তির হিল্লোল
রাখহ মরমে তাঁহারে আঁকি॥

জীবনটা ত হেসে কেঁদে কোথা দিয়ে চলে গেল।
মত্ত হয়ে বসে আছ মরণের কি বাকী বল॥

আশার পানে চেয়ে চেয়ে
জীবনটা তোর গেল বয়ে
সে আশায় নিরাশ হলি কেবল ঝরে অশ্রুজল ॥

প্রভু তব, তোমা ভুলি
এ সংসার জ্বালাভূমে মরি সদা জ্বলি
ভীষণ হুতাশানলে
জ্বলে মরি পলে পলে
এ ভব গারদে প্রাণ আকুলি বিকুলি ॥
স্নেহ ভালবাসাহীন
অতীব মলিন দীন
মায়া দাবানলে জ্বলি হয়েছে কালি ॥
কি যে আশার আশে
ঘুরে মরি আশে পাশে
ধরে শিরে সমাদরে অশান্তির ডালি ॥

নম সুন্দর কৃপা কর মমপতি।
নম কামিনী হৃদিমণি রমাগতি ॥
তুহুঁ ঈশ্বর দুখহর অনুকূল।
যেন অকূলে ভবকূলে পাই (হে) কূল ॥
কর আশীষ মম ঈশ প্রাণ খুলে।
যেন নিমেষ নাহি থাকি তোমা ভুলে ॥
প্রতি জনমে তোমা ধনে পাই (হে) পতি।
শত বিপদে তব পদে থাকে মতি ॥
দেহ আদরে মম শিরে পদধূলি।
দেখ অবলা বলি হেলা কর ভুলি ॥

ভ্রান্তিময় এ সংসার বিজনে
তব পদ প্রভু কেন ভুলে যাই।

যবে মনে পড়ে রাঙ্গা চরণে
তখনি বা কেন অমনি হারাই ॥
বিপদ সাগরে হাবুডুবু খাই ।
তবু কেন প্রভু তোমা ভুলে যাই ॥
কিবা সুখে মজে (এ) সংসার মাঝে
তোমা ভুলে কেন এত দুঃখ পাই ॥
এ অজ্ঞান সন্তান বড়ই বিকল
দাও হৃদে প্রভু ভকতি অচল
সাধ নাই পেতে সংসারেরই ফল
ও পাদপ্রান্তে যেন স্থান পাই ॥

নরে কি গো দিতে পারে ভালবাসা প্রতিদান ?
কাঁদে কি গো কার তরে পৃথিবীতে নরপ্রাণ ॥
জানে নাক নরগণ
ভালবাসা কি যে ধন
জানেন না বাসিতে ভাল দিয়ে স্বার্থ বলিদান ॥
মিছে কেন অনুক্ষণ
চাও শুধু প্রতিদান
প্রতিদান চাও যদি ডাক নিত্য ভগবান ॥

কেহ নয়রে আপন
এ সংসার মরুভূমে নাইরে আপন ।
যারে তুমি ভালবাস
যারে হেরে সুখে ভাস
সেইজন জ্বালে হৃদে অনল ভীষণ ॥
কাঁদ তুমি যারি তরে
সারাটি জীবন ভরে
ভাসায়তে দুখেতে তোমা ব্যস্ত সেই জন ॥
তোলে না হৃদয়ে ধরি
তোষে না যতন করি
ব্যথার উপরে ব্যথা দেয় অনুক্ষণ ॥

আছে এ ভব-সাগর-পারে এক
শান্তি-শীতল সুন্দর এক।
বাসনা থাকিলে যেতে পথ মিলে
কে যাবে কাহার কেঁদেছে প্রাণ ॥
এসে এত দূরে এমন বিদেশে
কার যেতে সাধ আপনার বাসে
এ মোহিনী মায়া কেটে গেছে কার
কাহার প্রাণে ধরেছে টান ॥
আয়রে কে যাবি আয় ত্বরা করি
পরম পুরুষ ডাকিছে ফুকারি,
ওঁকার পানে ফেলিয়ে কান ॥
মরীচিকা দেখি বারি লভিবারে
যাস্‌নে যাস্‌নে মরুভূমি 'পরে
আকুলি বিকুলি পাবি না শান্তি
পিপাসায় শুধু দহেরে প্রাণ ॥

তব চরণ প্রান্তে পড়ে রব
নিমেষের তরে জগত ভুলিয়ে চরণ দুখানি বুকে থোব
সারাদিন বনে কুসুম তুলি
ঐ চরণ প্রান্তে দিব ডালি
সাঁজের বেলায় ঝিকিমিকি বায় ঐ হৃদয় পেতে বসাইব।

কেন ভোল তারে মন।
জগত-ঈশ্বর যিনি অধম-তারণ ॥
যে জন তোমার তরে কতই যতন করে
ধরাধামে দেখে করি কত আয়োজন ॥
তুমি তারে আছ ভুলে, সে ত তোমা নাহি ভুলে
সে জন ভুলিলে তোমার যাইবে জীবন ॥
দিন আছে ডাক তারে অতিশয় ভক্তিভরে
ভুল না ভুল না তিনি অমূল্যরতন ॥

যদি এত ডেকে প্রতিপদে পড়ে এ অভাগা এতই বিপদে।
কেন কাঁদা তবে কেন বা কাননে কুসুম চয়ন
কেন আশা তৃষা কেন ভালবাসা যাও যাও দূরে থেকো না হৃদে ॥
শুনিলে কাননে কোকিল কূজন
মনে হয় তব মহিমা কীর্ত্তন
কেন এত ভাবা এত ভালবাসা, কেনই বা ডোবা তব প্রেমমদে ॥
মরমের ব্যথা হইলে ভীষণ
কেঁদে কেঁদে সখা করি নিবেদন
আকুল হৃদয়ে মর্ম্মাহত হয়ে ডেকে ডেকে তোমা মরি কেঁদে কেঁদে ॥

দীনবন্ধু বলে প্রেমে গলে ডাক দেখি।
তিনি যে ধনীজন নয় দীনজন নাথ জান না কি?
মিছে কেন কাল ক্ষয়, হোক সে না কেন লক্ষ বাসনা লক্ষ দিয়ে লয়
চোখ কান বুজে এক দম নিরোধিয়া নিশ্বাস দম
বিগলিত করি প্রাণ ধরবে নীরবে তান
তিনি যে প্রেমের নাগর প্রেমের সাগর প্রেমরসে প্রাণ মাখামাখি ॥

কেঁদে কেঁদে হলাম সারা নয়ন খুলে দেখ না কি
মন প্রাণ সব দিয়েছি কি আর বল আছে বাকী
যতই ডাকি আদর করে
ততই তুমি থাক দূরে
আমি শুধু হেথায় কাঁদি তোমারি ঐ স্মৃতি মাখি ॥
মনকে বলি কেঁদোনাকো
তাহারে আর সেধোনাকো
স্মৃতি সাধায় স্মৃতি কাঁদায় তুমিময় জগত দেখি ॥

উদাস পরাণে বসে থাকি একা নীরব নিস্তব্ধ দেশে।
মনে হয় তুমি দিবে বুঝি দেখা অভাগার কাছে এসে ॥
সদা মনে হয় এই বুঝি এলে আদর সোহাগ লয়ে।
হৃদয়ের আশা নিরাশা আসিয়ে লয়ে যায় সব ধুয়ে ॥
হৃদয়ের পানে দেখি গো চাহিয়ে সকলি আঁধারে ভরা।
জ্বলে দাবানল হৃদয় মন্দিরে ঝরে দুটি আঁখি তারা ॥

হতাশ পরাণে পুনরায় দেখি আশার মলিন আলো।
দেখা হবে বলে বাতাসের সনে কে যেন মিশিয়ে গেলো॥
তখনি আবার শতেক নিরাশা হৃদয় আকুল করে।
বলে বার বার হবে নাক দেখা অতীব কঠিন স্বরে॥
শুনে সেই বাণী হৃদয় আমার বাতাহত তরু প্রায়।
নৈরাশ্যের বেগ সহিতে না পারি অমনি ভাঙ্গিয়া যায়॥
নিরদয় তুমি দিলে নাক দেখা অভাগার কাছে এসে।
কহিলে না কথা হৃদয় মোহিয়ে একবার মধু হেসে॥
উদাস পরাণে বসে থাকি হেথা তোমারই দেখার আশে।
মনে নাই আর অভাগার কথা থাকিলে আসিতে পাশে।
নাই থাক মনে রেখেছি হৃদয়ে তোমার মুরতিখানি।
বসিয়াছি ভাল বাসিব জীবনে আমার বলিয়া জানি॥
দেখা তবু মাগি নিমেষের তরে একবার এসো হেথা।
দেখিলে তোমার মোহন মুরতি ভুলিব সকল ব্যথা॥

৬

সংকীর্ত্তন গান

[একাদশ অধ্যায় 'সংকীর্তন ও মহাভাবসমাধি'-র ৩১২ পৃষ্ঠা পাদটীকা দ্রষ্টব্য]

একাদশ অধ্যায়ে সংকীর্তনের কথা আলোচনা প্রসঙ্গে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, অনুকূলচন্দ্র তাঁহার সংগঠিত কীর্তনের দলে গীত হইবার জন্য নিজেই সংকীর্তন গান রচনা করিয়া দিতেন। তাঁহার রচিত ঐ সকল গানের কয়েকটি নিম্নে লিপিবদ্ধ করা হইল। এই সঙ্গে অন্যরচিত কয়েকটি গানও পরিশেষে সংযোজিত হইয়াছে।

শ্রীশ্রীঠাকুরের রচিত সংকীর্ত্তন গান

১

এস পতিতপাবন গুরু গো
ভক্তি-মুক্তি-করে
এস গো গুরু, বস গো গুরু, থাক হৃদয় 'পরে॥
অজ্ঞান-অন্ধকার ঘুচায়ে দাও গো
জ্ঞানাঞ্জন কর দান
(তোমার) প্রেমপুলকে ভাসাও হৃদয়
নাচিয়া উঠুক প্রাণ।

তুমি জ্যোতিময় রূপে হাস গো
হৃদয়ে আকাশে ভাস গো
আজি তোমারি দীন হীন তনয়
ডাকিছে আবেগ ভরে।

২

জাগ রে মন জাগ রে মন
ঘুমায়ো না আর।
একবার ভুলিয়ে সকল
প্রেমে হইয়ে বিহ্বল
হরে-কৃষ্ণ হরে-কৃষ্ণ হরে-কৃষ্ণ বল,
(ও মন) হরে-কৃষ্ণ ভুলে তুমি ঘুমায়ো না আর ॥
কেমন মধুমাখা নাম,
শান্তি ঝরে অবিরাম,
যেমন জ্বালা হোক্ না হরি—নামেতে আরাম
(ও মন) হরে-কৃষ্ণ মধুর নামটি ভুলনাক আর ॥
ও মন মরার মত আর
ঘুমে থেকো না অসাড়,
জেগে হরে-কৃষ্ণ হরে-কৃষ্ণ বল অনিবার,
মন রে, হরে-কৃষ্ণ নাম বিনা জীবের শান্তি কোথা আর ॥
তুমি যাদের ভাব রে আপন
তারা কেহ নয় আপন,
স্বপন ভাঙ্লে ফাঁকি দিয়ে পালাবে তখন,
তখন হরে-কৃষ্ণ নাম বিনা ভবে বন্ধু নাই রে আর ॥

৩

জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ
গোবিন্দ গোবিন্দ বল রে।
রাধে গোবিন্দ গোবিন্দ গোবিন্দ গোবিন্দ
গোবিন্দ ব'লে সদা ডাক রে।
ছাড় রে মন কপট চাতুরি,
বদনে বল হরি হরি।

রাধে গোবিন্দ নামটি বদনে গাইরে
নয়ন-নীরে সদা ভাস রে।
ছাড় রে মন ভবের আশা
অজপা নামে কর রে নেশা।
হরিনাম পরম ব্রহ্ম জীবের মূল ধর্ম,
অধর্ম কুকর্ম ছাড় রে॥

৪

আমি বেদ-বিধি ছাড়ি বেদনাহারী
হরিনাম সদা গাই রে।
হয় হোক মম লক্ষ জনম
তাহে কোন ক্ষতি নাই রে॥
ঘনাম্বু-নিন্দিত শ্যাম সুনীল
মূর্তি যেন ভুলিনাক তিল,
নিত্য নৃত্য করে যেন মোর
চিত্ত যমুনা-পুলিনে রে॥
সন্ধ্যা আমার বন্ধ্যা হউক
তাতে নাহি কোন শোক,
তর্পণজল অর্পণ বিনা
রোধুক পিতৃলোক,
ঘোষুক জগতে নিন্দা-খ্যাতি,
তোষুক রোধুক স্বজন-জ্ঞাতি,
আমি কিছুতেই সে বিমল ভাতি
ভুলিতে নারিব ভাই রে॥
ক্ষুব্ধ পরাণ চাহে গোবিন্দ-
নামামৃতে সদা ভাসিতে,
মুগ্ধ মানসে আত্ম ভুলিয়ে
হরি হরি বলি' নাচিতে।
চাহিনাক আর শৌর্য বীর্য,
চাহে না পরাণ বিশাল রাজ্য,
ধর্ম অর্থ কাম সবই ত্যাজ্য,
মোক্ষের মুখে দিব ছাই রে॥

৫

এত ডেকে গেল তোরা ফিরে চাহিলি না,
ভীষণ মোহের ঘোরে আঁধারে অন্ধ রলি,
জ্যোতিঃ এল, চেয়ে দেখিলি না ৷৷
আসিল গো সে আমার লয়ে প্রেম-প্রীতিহার,
পরাতে গলায় আহা মুছে' অশ্রুজল।
(তোরা) কি ঘোর আবেশে রলি, দিলিনাক কোলাকুলি,
প্রিয়তমে বুঝেও বুঝিলি না ৷৷
জরামৃত্যু পাপভার নিয়ে গেল সে আমার,
দিয়ে হরিনাম-সুধা নিল রে গরল।
যে নাম স্মরণ-ফলে স্তুতি গায় রিপুদলে,
পাপ তাপ কিছু থাকিল না ৷৷
তোদেরই রোদন-ধ্বনি শুনে' কেঁদেছিলেন তিনি,
দুখে পরিত্রাণ দিতে তাই এসেছিল।
আহা! কেঁদে পায় ধ'রে, দিল প্রেম ঘরে ঘরে,
তোরা তারে প্রেম করিলি না ৷৷

৬

(ওরে) যেতে হবে আর দেরী নাই।
পিছিয়ে পড়ে রইবি কত সঙ্গীরা তোর গেল সবাই ৷৷
আয় রে ভবের খেলা সেরে
আঁধার ক'রে এসেছে রে,
পিছন ফেরে বারে বারে কাহার পানে চাহিস্ রে ভাই ৷৷
খেলতে এসে ভবের হাটে
নূতন লোকের নূতন খেলা,
হেথা হ'তে আয় রে স'রে
নইলে তোরে মারবে ঢেলা।
নাবিয়ে দে রে প্রাণের বোঝা,
আর এক দেশে চল রে সোজা,
সেথা নূতন ক'রে বাঁধবি বাসা, নূতন খেলা খেলবি সে-ঠাঁই।

৭

বোল হরিবোল বোল হরিবোল
ভাবনা বল আর কি।
একবার হরে-কৃষ্ণ বল মুখে কৃষ্ণ-কৃষ্ণ বল
হরে-রাম হরে-রাম রাম-রাম বল ॥
হরে-কৃষ্ণ নাম বিনা
জীবের সম্বল আছে কি।
যেমন পতিতপাবন নাম,
তেমন পতিতপাবন কাম,
যেমন পাপী হোক না কেন, পাবে মোক্ষধাম।
রবে তা নইলে হরি নামের বদনাম,
তোমার আমার কি।
হরির নাম মধুময় হরির প্রেম মধুময়
নামে প্রেমে যোগ হ'লে, মধুরে মধুরে হয়।
হরির নাম নিলে প্রাণে আপনি হবে
প্রেম মাখামাখি।
এবার উঠলো প্রেমের বাও
কেন কূলে নাও ডুবাও,
এবার রাধা নামের বাদাম তু'লে পারের দিকে যাও,
ব'সে হাল ধরাও আর হরিগুণ গাও,
পারের ভাবনা কি।
লুট দিতেছে নিতাই
জীবের ভাগ্যের সীমা নাই।
এবার বল না রে ভাই বাহু তু'লে,
নিতাইয়েরর কাছে যাই।
আমরা সবাই মিলে নাম লু'টে খাই
এমন পাব কি?

৮

তোমারই চরণ করিয়া স্মরণ চলেছি তোমারি পথে।
তোমারই ভাবেতে ভাবিব তোমারে আশা করি মনোরথে ॥

ভেঙ্গে চুরে যতেক বাসনা
তীব্র গতিতে চলুক সাধনা,
(মম) মানস নয়ন জেগে থাকে যেন ধ্রুবতারা তব সাথে ॥
শত পদাঘাত বহিয়া বক্ষে
আসিয়াছি পিতা তব সমক্ষে,
হৃদয় আমার জ্ব'লে প্'ড়ে গেছে অবহেলা উৎপাতে ॥
এনেছি অমৃত তোমারই দ্বারে
ঝরে আঁখিজল শতেক ধারে,
পাপী-তাপী ব'লে ঘৃণাই পেয়েছি, আশিস্ পাইনি মাথে ॥
জেনেছি দয়াল প্রেম-পরাৎপর,
(তোমার) পাপীর ব্যথায় আঁখি ঝর ঝর ॥
দু'হাত প্রসারি হে অমৃত-প্রেমী লহ কোলে রাখ সাথে ॥

৯

ওরে, আয় রে, আয় রে, আয় রে আয়,
দে'খে সজল নয়ান করুণ বয়ান, পরাণ ফে'টে যায়।
(আমার হৃদয় ফে'টে যায়) ॥
আয় বুকে নিই, আঁখি মু'ছে দিই,
পেট জ্ব'লে বুঝি গেছে ক্ষুধায়,
ছাতি ফে'টে বুঝি গেছে তৃষায় ॥
কত ডেকেছিস্ তাও আসিনি,
চোখে রেখেছি সাড়া দেইনি,
আমার প্রিয় মোর আয় চিতচোর,
তোদের বুকে নিলে ওরে প্রাণ জুড়ায় ॥
জীবন-সম্বল পরাণ-পুতলী,
আর কেন দুঃখ আকুলি বিকুলি !
সব ব্যথা যাবে চির শান্তি পাবে,
দেখিস্ সুখে দুখে যেন না ভুলায় ॥

১০

গোবিন্দ গোবিন্দ ব'লে
প্রাণ মাতোয়ারা
(প্রাণ মাতোয়ারা আমার মন মাতোয়ারা) ॥

জগৎ মাঝে নানা সাজে
ছুটছে নামের ফোয়ারা,
গোবিন্দ বলিয়ে তোরা
হ'য়ে যা রে আত্মহারা,
গোবিন্দ বলিয়া আমার
ঢুলু ঢুলু আঁখিতারা ॥
গোবিন্দ গোবিন্দ ব'লে
নাচে প্রাণী তালে তালে,
(আমার) প্রাণটি দোলে মনটি দোলে
(আমি) হলেম ওরে পাগল-পারা ॥
গোবিন্দ নামেতে নাচে
নামী আমার নানা ছাঁচে,
(ওরে) গোবিন্দ গোবিন্দ বলিয়া নেচে
সারা জগত হ'লো সারা ॥
আয় রে তোরা ওরে ছু'টে
গোবিন্দ বলিয়া জু'টে,
হেসে কেঁদে নেচে গেয়ে
হ'য়ে যারে আপন-হারা

১১

জাগায়ে তোল গো প্রভু হরনাথ *
হৃদয়ে হৃদয়ে প্রাণ।
নাচিয়া উঠুক মহাশক্তি কয়ে
দিয়ে স্বার্থ বলিদান ॥
পরোপকারে বদ্ধপরিকর
হউক হউক সকল অন্তর,

* অনুকূলচন্দ্রের রচিত অনেকগুলি সংকীর্তন গানের ভণিতায় ঠাকুর হরনাথের নাম দৃষ্ট হয়। অনুকূলচন্দ্রের কীর্তনলীলার যুগে ভারতের ধর্মগুরুদিগের মধ্যে ঠাকুর পাগল হরনাথ সর্বাধিক প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। অনুকূলচন্দ্র আপন সঙ্গীদের মনে ইষ্টনিষ্ঠার ভাব অঙ্কুরিত করিবার মানসে হরনাথের নাম যোজনা করিয়া তাঁহার স্বরচিত অনেকগুলি গান প্রচার করিয়াছিলেন। তাঁহার রচিত কোন কোন গানে হরনাথের নামের সঙ্গে তাঁহার নিজ নামেরও উল্লেখ রহিয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়। 'হরনাথ' সম্বন্ধে একাদশ অধ্যায় 'সংকীর্তন ও মহাভাবসমাধি' ১১৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

দরিদ্র-দেবতা সেবক সকলে
হোক তার প্রতি টান ॥
স্বার্থের ব্যবসা যাউক ভুলিয়া
পর-প্রেমে সবে যাউক গলিয়া,
ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটুক সকলে
যেথা তোমার বিশ্বপ্রাণ ॥
আমি গো অধম দেহ গো শক্তি
নাহি জানি স্তুতি না জানি ভক্তি
সেবিতে দরিদ্র-নারায়ণ ॥

১২

কেন রে হরে-কৃষ্ণ নামে মাত না।
তুমি জগতে আসিয়া অলসে বসিয়া, রহিবে কেন গো বল না ॥
ব্রহ্মসিংহ জাগে তব অন্তর্ভাগে, জানিয়া কেন গো জান না।
মায়া আবরণ দিয়া রেখেছ ঢাকিয়া, আবরণ খুলে দাও না ॥
যদি খুলিতে না পার, নাম-অস্ত্র ধর, কাট আবরণ ভেবো না।
যে কোন প্রকারে ছিঁড়ে দিলে তারে, শমনের ভয় থাকে না ॥
সে সিংহগর্জন শুনে প্রাণমন এদেশেতে আর থাকে না।
তার ওঁকার গর্জনে জ্যোতি ঘনে ঘনে, ক'রে তোলে নব রচনা ॥
আত্মা আতে লয়, থাকে নাকো ভয়, আত্মারাম হয় জান না।
তাই বলি, হায়, যায় রে সময়, অলস আবেশে থেকো না ॥
বলে অনুকূল, শোন রে কিশোরী, কর নামে মন যোজনা।
যাবে আবরণ খুলে, সিংহ অনুকূলে আবরণ খুলে দাও না ॥

১৩

মহাশক্তি ঘুমায় তোর হৃদয়ে
তুই কেন মরার মত?
একবার রাধা-নামের ধ্বনি দিয়ে
শক্তিটাকে জাগিয়ে নে তো!
(আমার) মন্দাদৃষ্ট ব'লে কেন
(তুই) থাকিস্ ওরে ব'সে হেন,
ও তুই রাধা ব'লে ডাক্‌তিস্ যদি
ভাগ্যলিপি বদলে যেতো।

(তুই) যা না ওরে আপন ভুলে,
ডাক না রাধা পরাণ খুলে,
দ্যাখ্, তোর ধ্যানে রাধা জ্ঞানে রাধা
মন রাধা-ছাড়া করিস্ না তো ॥
(তুই) হৃদাকাশে দেখ না চেয়ে,
(হায় রে) কাল মেঘে গেছে ছেয়ে,
ও তুই রাধা-নামের শিঙ্গা ফুঁকে
মেঘখানি গলিয়ে দে তো ।
মধুর প্রেম-ভক্তির বৃষ্টি-ধারায়
দেখবি জগৎ কেমন ভাসায়,
ওই মেঘখানি সব বর্ষে গিয়ে
হ'বে বিশ্বপ্রেমে পরিণত ।
ঠাকুর হরনাথ* বলে কিশোরীরে,
থাকিস্ না আর ঘুমের ঘোরে,
সবার অনুকূল এই শক্তি জাগলে
ভবভয় আর থাকে না তো ।

১৪

কে গো প্রেমী এমন ক'রে বক্ষে নিয়ে ব্যথা জুড়াও ।
কে গো তুমি সোহাগ ভরে তপ্ত আঁখি-জল মুছাও ॥
মোর নাইকো হৃদে প্রেমের কণা, তবুও কেন তুমি ছাড় না ।
দিতে গেলে খোঁজ মেলে না, প্রীতিদানে দুঃখ ঘুচাও ॥
ব্যথার ব্যথী এমন ধারা, পাই না খুঁজে জগৎ সারা ।
দুখে তুমি উদয় হ'য়ে, সুখে ওগো কোথা পালাও ॥
ওগো আঁখিভরা স্নেহরাশি, বদনভরা মধুর হাসি,
দেখতে বড় ভালবাসি, চিরদিন দেখা দাও ।

১৫

রাধা রাধা রাধা নাম বল বারংবার
বল বারংবার ।
রাধা রাধা রাধা নামে চল রে আনন্দধামে,

---

* একাদশ অধ্যায় 'সংকীর্তন ও মহাভাবসমাধি'—১১১ পৃ.ঃ দ্রষ্টব্য ।

নামে আনন্দ খেলে, ও নামে আনন্দ অপার।
রাধা রাধা রাধা নাম বল বারংবার।
নাম-শব্দ-লহরী উঠুক দিগন্ত জুড়ি,
রাধা-নামের বন্যায় ভেসে গেল যত পাপ তাপ,
ও যত পাপভার।
রাধা রাধা রাধা নাম বল বারংবার।
দেহের মধ্যে ছত্রিশ ধারা ঊর্ধ্বগামী হয় গো তারা,
(ও) তোমার হৃদ-আকাশে মহাশক্তি জাগবে আবার,
মহাশক্তি জাগবে আবার।
(এবার) রাধা রাধা রাধা নাম বল বারংবার ॥

১৬

আজি এতদিন গেল চ'লে, উন্মেষ নাই,
কাহার অমিয় নামে প্রাণ জাগিল রে ভাই।
শুনিয়া প্রেমমাখা হরে-কৃষ্ণ নাম,
পরাণ কেমন করে নাহি আরাম,
নাহিক নয়নজল মরণ বিশ্রাম,
হরি যত বলি বলিতে চাই ॥

হৃদয় আকুল মম, প্রাণ বিকল,
হরিবোল বোল বিনে মন চঞ্চল,
কে আছিস্ কোথায় তোরা হরি হরি বল।
হরি বিনে আর সম্বল তো নাই ॥

পাপী-তাপী তোরা কেন হতাশ,
হরি হরি বল, পূরিবে আশ,
আকুল প্রাণে বল হরি ঘুচিবে ফাঁস।
আনন্দে আনন্দে ভাসিবি ভাই ॥

কিশোরীর ভীতি দেখে বলেন হরনাথ,
কাঁদিয়া কেন প্রাণে করিস্ আঘাত,
আমি তোর অনুকূল জনম-মরণ সাথ।
হরি হরি বল কোন ভয় নাই ॥

১৭

দুনিয়াদারীর খেলা ভাবলে পাগল হ'য়ে যাবে।
আজ যে নেশায় বিভোর হ'য়ে আপন ভুলে রবে,
কাল সে নেশা ছুটে গিয়ে অকূলে ভাসিবে।
আজ যে ফুলরানী কোলে নিয়ে ঘুমাবে,
কাল হয়ত সে কোলের কাছে শ্মশান দেখতে পাবে।
আজ যে তোমার ননীর গোপাল আদরে নাচাবে,
কালকে তাহার পচা মাংস শেয়াল শকুনি খাবে।
আজ যে সুন্দরী রূপের গরব করিয়ে বেড়াবে,
কালকে দেখবে সে খাঁদা কুৎসিত ভিক্ষা মেগে খাবে।
আজ যে সুন্দর রূপটি দেখে (আদরে) কোলে তুলে নেবে,
কালকে পচা কুষ্ঠ দেখে (নাকে) রুমাল দিয়ে পালাবে।
তাই বলি ভাই, হরি বল, কাজ কি আর গরবে,
অনুকুল বলে, কিশোরী তোর সবই মিছে ভবে,
হরে-কৃষ্ণ বল রে, যদি সুখে ভবপারে যাবে ॥

১৮

হরে-কৃষ্ণ নামে উঠরে মাতিয়া।
বল বম্ বম্ হরে-কৃষ্ণ হরি,
দিয়ে করতালি নাচিয়া নাচিয়া ॥
ভীষণ গভীর ভৈরব-তানে,
গাহ হরে-কৃষ্ণ সবে প্রাণে প্রাণে,
জড় ও চেতন যে আছ যেখানে।
ত্রিভুবন মাঝে উঠুক ধ্বনিয়া,
প্রতি প্রাণে নাম উঠুক জ্বলিয়া,
শ্মশান মশান উঠুক কাঁপিয়া।
গাহ হরে-কৃষ্ণ তাণ্ডব নাচিয়া
ভূতপ্রেত সনে থিয়া থিয়া ॥
নর-কপালে তোরা দে রে দে রে তালি,
ঠোকাঠুকি হোঃ হোঃ হাস হাস খালি,
হাঃ হাঃ হিঃ হিঃ হোঃ হোঃ বল কালী কালী,
হরে-কৃষ্ণ বলি পড় রে ঢলিয়া ॥
ভীম অট্টহাসে গগন বিদারি,
ঈশ-সিংহাসন ফেলুক আলোড়ি,
সজোরে ছিনায়ে লয়ে আসুক হরি,
থাকুক বিশ্ব স্বরগ হইয়া ॥

ঝলকে ধক্ ধক্ ঘোর-রবা জ্যোতিঃ,
বিশ্ব ঝলসিয়া ফেলুক সে ভাতি।
নতুবা হবে না সত্ত্ব-পানে মতি,
রজানলে পাপ যাউক পুড়িয়া ॥
আয়, ক্ষেপা, দিবি মহাবীর প্রাণ,
হৃদপিণ্ড নামে আহুতি প্রদান,
তবেই জাগিবে বিশ্বের প্রতি প্রাণ।
নতুবা যে গেছে সে গেছে ডুবিয়া ॥
হরনাথ বলে, শুন রে কিশোরী,
বল প্রাণ খুলে হরে-কৃষ্ণ হরি,
করালের বক্ষ ফেল রে বিদারি,
থিয়া থিয়া বিশ্ব নাচাও নাচিয়া ॥

১৯

আকুল প্রাণে ডাকলে তারে, সে কি কভু থাকতে পারে।
পরাণ খু'লে দেখ না ডেকে, বসবে এসে হৃদি 'পরে ॥
আমার আমার যা রে ভুলে, সকল সময় ডাক রে তারে।
আপন ভু'লে, পরাণ খু'লে, তার নামেতে মেতে যারে ॥
সে তো কারো নয় রে আপন, যে ডাকে সে তারি আপন।
ডাকলে তারে থাকতে নারে, আপনি এসে বুকে ধরে ॥
কারু ছেড়ে, কভুও দূরে, কভু তো সে থাকতে নারে।
আমরা তারে দেখতে নারি, সে তো আমাদের সঙ্গে ফেরে ॥
যদি ডাকিস ডাকার মত, আড়ালে আর থাকবে না তো।
অমনি প্রেমের চিন্তামণি হৃদাকাশে ভাসবে ওরে ॥
রাধা রাধা রাধা ব'লে, ডাক না রে ভাই পরাণ খুলে।
প্রেমের ঠাকুর অমনি এসে, তুলবে কোলে সোহাগ ভরে ॥

২০

ও মন, বল্ দেখি বল্, প্রাণে প্রাণে বল্, হরে-কৃষ্ণ বল্
একবার খুলে' মনপ্রাণ
ও মন, কর কর গান
(ব'লে) হরে-কৃষ্ণ হরে-কৃষ্ণ প্রাণ।
পাপীর হৃদে শান্তি ঢেলে' হরে-কৃষ্ণ বল্ ॥
কেমন শান্তি-মাখা নাম,
ঝরে শান্তি অবিরাম,
(ও মন) শান্তি-স্রোতে ভাসবি যদি হরে-কৃষ্ণ বল্ ॥

নাম নিতে নাই রে কালাকাল,
একবার বল্ থাকিতে কাল
নামে কালে কাণ্ড লণ্ড ভণ্ড, কাল হয় উজ্জ্বল,
মন তোর আঁধার ঘরে জ্বলবে আলো, হরে-কৃষ্ণ বল্ ॥
এ নাম অতি জ্যোতির্ময়,
হয় রে অন্ধকার ক্ষয়,
আবার ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ একত্র উদয়।
মন রে দিবানিশি মহামন্ত্র হরে-কৃষ্ণ বল্ ॥

২১

তোরা আয় রে আয়, হরি ব'লে আয়, বেলা ব'য়ে যায়।
বেলা ব'য়ে যায়, বেলা ডুবে যায় ॥
বহু খেলা খেলেছ ভাই,
আশা তাতে মিটে না কি ভাই?
ঐ মাঝ আকাশে সূর্য রাঙ্গা
ডুবু ডুবু ডুবে যায় ॥
এই বেলা ভাই হরি ব'লে,
খেলা ছে'ড়ে আয় রে চ'লে,
ভীষণ আঁধার আসছে ঘিরে, একা থাকা হবে দায় ॥
গরব ক'রে খেলায় মজে,
থাকলে কি আর রক্ষা আছে!
হিংস্র-প্রাণীর মুখে প'লে, জীবন রক্ষা হবে দায় ॥
থাকতে বেলা, ব'লে হরি,
ভবসাগর দে রে পাড়ি,
হরি বল্লে দয়াল মাঝি আদর ক'রে পারে লয় ॥

২২

কে রে পাগল নাচে হরি ব'লে সংকীর্তনে হায়।
মরি কি শোভা দেখা যায় ॥
মুখে হরি হরি বলে,
ভেসে যায় রে নয়ন-জলে,
আঁখি-জলে প্রাণ ভাসায় ॥
দেখ্ রে হ'য়ে আপন-ভোলা,
নাচে কেমন তাল-বেতালা,
দেখলে কাটে মনের ময়লা,
হৃদে প্রেমে গ'লে যায় ॥

হরি বলে ছুটে আসে,
প্রাণ দিয়ে ভাই ভালবাসে,
রক্ষা করে ত্রিতাপ-গ্রাসে, হরি ব'লে সব ভুলায় ॥
এত প্রেম বুকে ভাই,
ত্রিজগতে কাহারো নাই।
ও-বুকেতে বুক মিশালে,
বিশ্ব কোথায় মুছে যায় ॥
আয় রে তোরা আয় রে ছুটে,
পড়ি ক্ষ্যাপার পায়ে লুটে,
হরি বলে, (জীবের) পাপ নিয়ে ভাই,
হৃদয়ভরা প্রেম বিলায় ॥

২৩

এখনো কি ভাঙে নাই মন, তোমার মায়া ঘুম-ঘোর ?
দিন চ'লে যায় আপন মনে, হিসাব কি গো আছে তোর ॥
দারা পুত্র পরিবার সবে,
ভাব তারাই আপন ভবে,
দেখবে তারা কেউ নয় তোমার,
নেশা যবে হবে ভোর ॥
আমার আমার যত কর,
ততই হবে সবই পর,
তোমায় ভাল কেউ বাসে না,
ছলে বাঁধে দিয়ে মায়া ডোর ॥
তুমি আজ যারে বুকে ক'রে,
মিছে শুয়ে আছ ঘুম-ঘোরে,
কালি হয়ত সে-জন রে মন
ফাঁকি দিয়ে পালাবে তোর ॥
তাই বলি, উঠে দাঁড়া,
থাকিস্ না হ'য়ে জ্যান্ত মরা,
পরম পিতার কর্ রে স্মরণ,
যাবে ছুটে নেশা তোর ॥

২৪

আজি হরি-নামে তোমার দ্বারে সেবাশ্রমের ভিক্ষা চাই।
কঠোর হ'য়ে থেকো নাকো, বিপন্নের দিকে তাকা ভাই ॥
অনিত্য এ সংসার মাঝে,
সবই মিথ্যা সবই বাজে,
হরি-নাম আর পর-সেবা এদের চেয়ে সত্য নাই ॥

দেহের সঙ্গে সব সম্বন্ধ,
দেহ ম'লে সবই বন্ধ।
আমার আমি উড়ে গেলে, সম্বন্ধ মিটল ভাই ॥
যদি শান্তি-পথে যেতে চাও,
হরির সেবা ক'রে নাও,
ভক্ত আর্ত বিপন্নের হৃদে হরি সজাগ থাকেন ভাই ॥
সাধ্যমত যত পার,
দীন দুঃখীর সেবা কর,
এদের সেবাই হরির সেবা, এদের হরির পৃথক নাই ॥
হরির কৃপায় সেবক সেজে,
এসেছি আজ তোমার কাছে,
দে' ভিক্ষা ভাই যার যা সাজে, হরি ব'লে চ'লে যাই ॥

২১

হরে-কৃষ্ণ ব'লে ছুটে এসেছি, সেবিতে দরিদ্র-নারায়ণ,
(যেন) তোমার ভাণ্ডার হ'তে নিতে পারি অন্ন করিয়া আহরণ ॥
আত্ম-সেবা মম দাও গো ভুলায়ে,
আত্মা-নারায়ণে দাও গো বিলায়ে,
প্রীতি আত্মা যেন আমি জ্ঞান হয়, ছুটুক প্রেম-প্রস্রবণ ॥
স্বার্থ সংকীর্ণতা দিয়ে দাও বলি,
যেন সবা সনে করি কোলাকুলি,
আমার পরাণ তাঁরে দিয়ে ডালি, ঝরুক মম দু নয়ন ॥
দরিদ্র অতিথি রুগ্ন অনশন
জ্ঞান হয় যেন, এরা দরিদ্র-নারায়ণ,
চিরদিন যেন পারি গো সেবিতে, শান্ত করি মম জীবন ॥
দাও দাও শক্তি প্রভু হরনাথ,
মিটুক আমার অন্তরের সাধ,
তব কৃপা বিনা মিটিবে না সাধ, হবে না ধন্য ঐ পরাণ ॥

অন্য-রচিত কয়েকটি সংকীর্তন গান

১

কি দিয়ে পূজিব গুরো, কি আছে আমার।
প্রেম-ফুলে পূজিলে নাকি পূজা হয় তোমার ॥

সুবাসিত যত ফুল, মালতী বেল বকুল,
নন্দন-কাননে যত পারিজাত ফুল,
তুলসী আর-গঙ্গা-জলে, পূজিলে নাহি তোমায় মিলে,
নয়ন-জলে না ধোয়ালে চরণ তোমার ॥
মহাপূজার উপহার, আমি কোথা পাব আর,
নিরুপায় হইয়ে, তোমার নাম ধরেছি সার।
এই রাধা নাম নিতে নিতে, যদি সে-ফুল ফোটে চিতে,
ফুটিলে ছুটিতে পারে নয়নের ধার ॥
পুরাণে শুনেছি আমি, নামের সনে থাক তুমি,
তাই করি হে রাধাস্বামী, ভরসা তোমার।
মুখে বলব রাধা রাধা, অঙ্গে মাখব ধুলো-কাদা,
পায়ে রাখ বা না রাখ, দয়াল যা ইচ্ছা তোমার ॥

২

আয় ত্বরা ক'রে, কে যাবি রে পারে,
নিবেদন দয়া ক'রে দয়াল মাঝির নায়।
নেয় যারে তারে, বিচার না করে,
যেজন হরিনাম করে, তারে যদি পায় ॥
কলির দশা মলিন হেরি, এলেন পূর্ণব্রহ্ম দেহ ধরি।
জীব তরাইতে বলে হরি হরি, হরিনামে হরি নাচে আর গায় ॥
পাপ-তাপানলে কেন মর জ্বলে, নাচ বাহু তুলে হরি হরি ব'লে,
এস সবে মিলে যাই তথা চ'লে, পূর্ণ শান্তিধাম পাবে যাঁর পায় ॥
অনন্ত অসীম অপার মহিমা, ব্রহ্মা আদি দেবে দিতে নারে সীমা।
শিব-দুর্গা-রাম কিংবা শ্যামা-শ্যাম, যেভাবে যে ডাকে তাঁরে,
সে-ভাবে সে পায় ॥
হরি-নামে মেতে হও রে পাগল, অবিরাম মুখে হরি হরি বল।
হরি-নামে মেতে যে হয় রে পাগল, শমন দেখিয়া তারে
ভয়েতে পালায় ॥

৩

উঠ্‌লো প্রেমানন্দ-রোল রাধা রাধা রাধা বোল।
পতিতপাবন নাম রাধা রাধা রাধা বোল ॥
রাধা রাধা রাধা রাধা রাধা বল বদন ভরে।
প্রেমানন্দে মধুর ছন্দে রাধা বল বদন ভরে।
রাধা গতি রাধা মুক্তি রাধা কেবল পারের সম্বল।
দারা-পুত্র-পরিবার কেহ নয় কার, ধন জন কিছু নয় হে,
এসে অসার সংসারে দু'দিনের তরে, বৃথা কাটে কাল মায়া-মোহে ;

তাই বলি জীব, যদি চাও শিব, প্রাণভরে গাও রাধা-নাম।
এ নাম ধেয়ানে শ্রবণে মননে, অন্তিমে পাবে সেই নিত্যধাম।
রবে না, রবে না, দুঃখ-জ্বালা পাপ-তাপ রবে না, রবে না।
ষড়রিপু আর বাদী হবে না, হবে না,
রাধা নামে আর বাদী হবে না, হবে না।
মহাকাল আর ভাই ছোঁবে না, ছোঁবে না,
রাধা-নামে আর কাল ছোঁবে না, ছোঁবে না ॥
সুধামাখা রাধা-নাম কর রে শ্রবণ,
পাপীর দুঃখ দেখে দয়াল করেছেন প্রেরণ ;
ডাক প্রাণভরে পরম-দয়াল পরমপিতা ব'লে ডাক প্রাণভরে,
দীননাথ দীনবন্ধু ব'লে ডাক প্রাণভরে,
রাধা রাধা রাধা বল ভাই, রাধা রাধা বল ॥
আর কি রইতে পারে, ভক্তের ডাকে কি আর রইতে পারে,
প্রেম-পুলকে রাধা-নামে ডাকলে কি আর রইতে পারে,
সে যে দীন-দয়াল ভকত-বৎসল
ভক্তের ডাকে কি আর রইতে পারে,
প্রাণের আবেগে ডাকলে রে ভাই, দয়াল এসে দেবে কোল।
রাধা রাধা রাধা বোল ॥

৪

হরি, দিন তো গেল, সন্ধ্যা হ'লো, পার কর আমারে।
তুমি পারের কর্তা, শুনে বার্তা, ডাকি হে তোমারে ॥
আমি আগে এসে ঘাটে রইলাম ব'সে,
(ওহে, আমায় পার করবে না হে) (আমায় অধম ব'লে)
যারা পাছে এল, আগে চ'লে গেল, আমি রইলাম পড়ে ॥
যাদের পথের সম্বল আছে সাধনার বল,
(তারা পারে গেল) (আপন আপন বলে হে)
(আমি সাধনহীন, তাই রইলাম প'ড়ে হে)
তারা নিজ বলে গেল চ'লে অকূল পারাবারে ॥

৫

গুরু, দাঁড়ায়ে তোমারি দ্বারে।
জীব উদ্ধারিতে এসেছ ধরাতে, তাই প্রভু তোমায় ডাকি বারে বারে ॥
(তুমিই কেবল জীবের সম্বল তাই প্রভু)
কর্মণা, বচসা, মনসা ত্রিবিধ
পাপে রত আমি আছি অবিরত,
সংখ্যা তার তোমায় জানাইব কত, বলিতে আমার হৃদয় বিদরে ॥

গোপনে গোপনে কত পাপ করি,
জানলে না তুমি এই মনে করি।
মুখে মাত্র বলি, তুমি অন্তর্যামী, কাজের বেলায় ভুলে যাই হে তোমারে ॥
পাপীর বন্ধু তুমি পতিত-পাবন,
তাই তব পদে লইনু শরণ,
নিজ-গুণে তুমি খা কর এখন, এ দীন হীন দুরাচারে ॥
মহাপাপী হ'য়ে যদি তোমায় ডাকে,
করাল কাল কভু ছু'তে নারে তাকে,
বাহু প্রসারিয়া অন্তিম কালেতে কোলে তুলে লও তারে ॥
তোমার বিষম বিরহ অনলে
অভাগার প্রাণ অহরহ জ্বলে,
তাই, করি হে মিনতি, মোহন মুরতি ধর অধমের হৃদয়-মুকুরে ॥

৬

জাগরণে যায় বিভাবরী, আঁখি হ'তে নিল ঘুম হরি', মরি মরি।
যাঁর লাগি ফিরি একা একা,
আঁখি পিপাসিত নাহি দেখা,
তাঁরি বাঁশী ওগো তাঁরি বাঁশি
তাঁরি বাঁশী বাজে হিয়া ভরি, মরি মরি ॥
বাণী নাহি শুনি, তবু কানে কানে
কি যে শুনি, ওগো কি যে শুনি, তাহা কেবা জানে।
এই হিয়া-ভরা বেদনাতে,
আঁখি ছল ছল বারি-পাতে,
ছায়া দোলে, তাঁরি ছায়া দোলে,
ছায়া দোলে দিবানিশি ধরি, মরি মরি ॥

৭

যখন জীবন-আহবে ক্লান্ত শ্রান্ত পরাণ বাহি,
কে আসে তখন মুছাতে নয়ন, ফেলিয়া রহে না কভু,
আমার হৃদয়-দেবতা, সে যে গো আমার প্রাণের প্রভু ॥
বেদনায় দিতে সান্ত্বনা, শোকে ঢালিতে করুণা-বিন্দু,
কে আছে এমন তাঁহারই মতন অপার করুণা-সিন্ধু,
বিশ্ব ঘৃণায় বদন ফিরায়, সে ঠেলে ফেলে না কভু,
আমার হৃদয়, সে যে গো আমার প্রাণের প্রভু ॥

কলুষ কামনা কুৎসিত কায়া কমনীয় সাজে ঢাকি,
আপাত মধুর নরকের পথে ল'য়ে যায় যখন ডাকি,
কে থেকে আড়ালে, ডেকে ডেকে বলে, ও-পথে যেয়ো না কভু,
আমার হৃদয়-দেবতা, সে যে গো আমার প্রাণের প্রভু ॥
মোহ-মদিরায় যে পথ হারায়, হয় গো পতিত পঙ্কে,
যদি মনে প্রাণে ডাকে সে সঘনে, ছুটে এসে তোল অঙ্কে,
জানি তবু, তাঁর ডাকার মতন ডাকিতে নারিনু কভু,
আমার হৃদয়-দেবতা, সে যে গো আমার প্রাণের প্রভু ॥
চির অনাদৃত চির লাঞ্ছিত, তবু আসে ঘুরে ফিরে,
শত লাঞ্ছনা, তবু দেয় হানা রুদ্ধ হৃদয়-দ্বারে,
চির আপনার সে যে গো আমার, নহে তো দুদিনের কভু,
আমার হৃদয়-দেবতা, সে যে গো আমার প্রাণের প্রভু ॥

৮

এমন প্রেম-মাখা হরি-নাম নিতাই কোথায় পেয়েছে।
এ নাম একবার শুনে হৃদয়-বীণে আপনি বেজে উঠেছে ॥
কতদিন শ্রবণে শুনেছি এ নাম,
কখনো তো এমন বরেনি পরাণ,
কি যেন কি এক নব ভাবোদয় হৃদয় মাঝারে হতেছে ॥
কেটে গেছে বিষম নয়নেরি ঘোর,
গলে গেছে কঠিন হৃদয় মোর,
কি যেন কি এক উজ্জ্বল জগতে নিতাই আমায় ল'য়ে চলেছে ॥
আজ হ'তে নিতাই তোর সঙ্গে রব,
জ্ঞানের গৌরব কভু না করিব,
সব ঝেড়ে ফেলে, হরি হরি ব'লে নাচিতে বাসনা হয়েছে ॥
কে যেন কহিছে মোর কানে কানে,
পারের উপায় তোদের হ'লো এতদিনে,
ঐ দেখ প্রেমের ভাণ্ড নিয়ে রে ভাই প্রেমের ঠাকুর এসেছে ॥

৯

পাতকী বলিয়ে কি গো পায়ে ঠেলা ভাল হয়।
তবে কেন পাপী তাপী এত আশা ক'রে রয় ॥
করিতে এ ধুলো-খেলা অবসান হ'লো বেলা,
যারা এসেছিল সাথে, ফেলে গেল অসময় ॥
জীবনে কখন আমি ডাকি না হৃদয়-স্বামী
এ অদিনে এ জীবনে ত্যজিবে কি দয়াময় ॥

১০

রাধা রাধা নাম বল অনিবার, রাধা-নামে হবে জনম সফল।
জীবনে মরণে, শয়নে স্বপনে, রাধা রাধা ধ্বনি কর রে সম্বল ॥
প্রাণহীন কেন ওহে প্রাণীগণ,
জেগে উঠে সবে কর নাম গান,
ভীষণ আঁধারে পাইবে তাঁহারে, ফুটিয়া উঠিবে আলোক বিমল ॥
রাধা-নাম যজ্ঞে এস সবে ভাই,
এস ত্বরা ক'রে আর বেলা নাই,
স্বার্থে বলি দাও, আত্মারে জাগাও, তবে সে পাইবে প্রাণে মহাবল ॥
রাধা রাধা রাধা বল অনিবার,
কেটে যাবে যত মোহ অন্ধকার,
পুলক ছুটিবে, আকুল হইবে, উছলি উঠিবে প্রেমসিন্ধু-জল ॥

১১

কে তোমারে জানতে পারে, তুমি না জানালে পরে।
বেদ বেদান্ত পায় না অন্ত, খুঁজে বেড়ায় অন্ধকারে ॥
যাগ-যজ্ঞ তপোযোগ
সকলি হয় কর্ম্ম-ভোগ
কর্ম্ম তোমার মর্ম্ম কি পায়, তুমি সর্ব্বকর্ম্ম-পারে ॥
সৃষ্টি-জোড়া তোমার মায়া,
কায় নাই কেবলই ছায়া,
মাঠের মাঝে আকাশ ধরা ঘুরে সারা চারিধারে ॥
তুমি প্রভু ইচ্ছাময়,
যদি তোমার ইচ্ছা হয়,
অসাধ্য সুসাধ্য তার, তুমি কৃপা কর যারে ॥
তব কৃপা আশা করি',
রয়েছি জীবন ধরি,
কৃপানাথ কৃপা করি' এস এস হৃদ-মাঝারে ॥

১২

মন, চল নিজ নিকেতনে।
সংসার-বিদেশে বিদেশীর বেশে ভ্রম কেন অকারণে ॥
বিষয়-পঞ্চক আর ভূতগণ, সবই তোর পর, কেহ নয় আপন,
পর-প্রেমে কেন হ'য়ে অচেতন ভুলিছ আপন জনে ॥
সত্য পথে মন কর আরোহণ, প্রেমের আলো জ্বালি' চল অনুক্ষণ,
সঙ্গেতে সম্বল রাখ পুণ্য-ধন, গোপনে অতি যতনে ॥
লোভ মোহ আদি পথে দস্যুগণ, পথিকের করে সর্ব্বস্ব শোষণ
পরম যতনে রাখ হে প্রহরী শম দম দুই জনে ॥

সাধু-সঙ্গ নামে আছে পান্থ-ধাম, শ্রান্ত হ'লে তথায় করিবে বিশ্রাম,
পথ-ভ্রান্ত হ'লে সুধাইবে পথ সে পান্থ-নিবাসী জনে ॥
যদি দেখ পথে ভয়ের কারণ, প্রাণপণে দিও দোহাই রাজার,
সে পথে রাজার প্রবল প্রতাপে, শমন ডরে যাঁর শাসনে ॥

১৩

কারও কথা আর কি শুনি, আমার প্রাণের ঠাকুর জেগেছে রে।
জীবন-তরী উজান চলে, পালে হাওয়া লেগেছে রে ॥
হোক্ না পথে কাঁটা বেড়া,
হোক্ না সে পথ পাহাড়-ঘেরা,
হোক্ না বাধা আকাশ-জোড়া, আমার প্রাণ যে নেচে চলেছে রে ॥
হৃদয় আসন পেতে রেখে,
বসেছিনু যুগে যুগে,
তাই, দয়াল ঠাকুর দয়া ক'রে হৃদয়খানি জম্‌কেছে রে ॥
আমার চক্ষে বারি ঝরে,
সে রোদন যে তারি তরে?
আমার হাসি আমার কান্না সকল সে যে নিয়েছে রে ॥
আমার আমার অহঙ্কারে,
দূরে রেখেছিনু তাঁরে,
তাই, সকল বাধা ভেঙ্গে চুরে' হৃদয়খানি জুড়েছে রে ॥

৭

কিশোরীমোহন ও অনন্তনাথ

[একাদশ অধ্যায় 'সংকীর্তন ও মহাভাবসমাধি'—১৯৩ পৃষ্ঠার পাদটীকা দ্রষ্টব্য।]

কিশোরীমোহন

কিশোরীমোহনের পিতার নাম কেশবলাল দাস বৈষ্ণব, নিবাস হিমাইতপুরের পার্শ্ববর্তী প্রতাপপুর মাঝিপাড়া। ১২৮৭ বঙ্গাব্দের ১৪ই চৈত্র দোলপূর্ণিমা দিবস তাঁহার জন্ম হয়। পিতার আর্থিক অস্বচ্ছলতার দরুন অল্প বয়সেই কিশোরীমোহনকে বিদ্যালয় ত্যাগ করিতে হয়। যৌবনারম্ভে 'কম্পাউণ্ডারী' বিদ্যা শিক্ষা করিয়া তিনি নিজ বাড়ীতেই একটি ক্ষুদ্র 'ডিস্‌পেনসারী' স্থাপন করতঃ চিকিৎসা-ব্যবসায় আরম্ভ করেন। কালে এই কার্যে তিনি বেশ প্রসার-প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন।

অনিয়ন্ত্রিত আচরণের জন্য যুবক কিশোরীমোহনকে গ্রামবাসী কেহই বিশেষ সুনজরে দেখিতেন না। তাঁহার সঙ্গী-সাথী দলবলও বড় কম ছিল না। তদঞ্চলের এই সকল অশিষ্ট মদ্যপ উগ্র-প্রকৃতির লোকদের ভয় করিত না, এমন গৃহস্থ কেহ ছিল কিনা সন্দেহ। কিশোরীমোহন কিন্তু ছিলেন অনুকূলচন্দ্রেরই

অন্যতম অন্তরঙ্গ বাল্যবন্ধু। যৌবনকালে অনুকূলচন্দ্র কিশোরীমোহনকে আদর করিয়া "ডাক্তার" বলিয়া ডাকিতেন ; কিশোরীমোহন-ও তাঁহার সঙ্গীদের কুৎসিত স্বভাব-চরিত্রের কথা সবিশেষ জ্ঞাত থাকিয়াই অনুকূলচন্দ্র ইচ্ছাপূর্বকই তাঁহাদের সঙ্গে সর্বদা প্রাণ খুলিয়া মেলামেশা করিতেন।

অনুকূলচন্দ্রের স্বভাব-সুলভ অনুপম চরিত্র-মাধুর্য ও অকৃত্রিম সেবা-মাহাত্ম্যে গ্রামবাসী সবাই তাঁহার অতীব অনুরাগী ছিলেন। পাছে সঙ্গদোষে তাঁহার মত একজন আদর্শচরিত্র যুবকের অধঃপতন ঘটে, এই ভয়ে তাঁহারা সকলেই অনুকূলচন্দ্রকে উহাদের কুসঙ্গ পরিহার করিয়া চলিতে অহরহই উপদেশ দিতেন। কিন্তু বলিতে কি, অনুকূলচন্দ্র কাহারও কথায় বড় কান দিতেন না। পিতামাতাও যথেষ্ট ভর্ৎসনা তিরস্কার করিয়া পুত্রকে এ-ব্যাপারে কিছুতেই নিরস্ত করিতে পারিলেন না।

আত্মসচেতন দৃঢ়প্রত্যয়ী অনুকূলচন্দ্র জানিতেন, কোনক্রমেই তিনি কিশোরীমোহনের প্রভাবাধীন হইতে পারেন না, বরং কিশোরীমোহনের চরিত্র সংশোধন করতঃ তিনিই তাঁহাকে সৎপথে আনিতে সমর্থ হইবেন। সুতরাং ঐ কুসঙ্গ হইতে দূরে থাকিতে জনক-জননী ও হিতৈষিবর্গ তাঁহাকে শত উপদেশ দিলেও তিনি তাঁহাদের কথা শুনিতে চাহিতেন না। তবে মাতৃভক্ত অনুকূলচন্দ্র জননীদেবীকে সময় সময় বুঝাইয়া বলিতেন,—"মা, তুই মোটেই ভয় করিস না। যদি কিশোরীর পাল্লা ভারী হয়, তবে আমি কিশোরীর দিকে যাব, আর আমার পাল্লা যদি ভারী হয়, তবে কিশোরীই আসবে আমার দিকে। তুই দ্যাখ না, কার পাল্লা ভারী হয়।"

কিশোরীমোহনের একটা মস্ত গুণ ছিল, তিনি লোককে খুব কীর্তনে মাতাইয়া তুলিতে পারিতেন। কিশোরীমোহনের চরিত্র-সংশোধনে অনুকূলচন্দ্র এই সুযোগটি গ্রহণ করিলেন। কিশোরীমোহনের সঙ্গীদের লইয়া একটি কীর্তনের দল গঠন করিয়া কিশোরীমোহনের বাড়ীতেই তিনি নিত্য কীর্তনের ব্যবস্থা করিলেন এবং কিশোরীমোহনকে সেই দলের পাণ্ডা করিয়া দিলেন। অনুকূলচন্দ্রের অক্লান্ত চেষ্টায় ও অদম্য উৎসাহে অনুপ্রাণিত হইয়া সঙ্গীরা সবাই ধীরে ধীরে কীর্তনের অনুরাগী হইয়া উঠিল। তাহাদের অন্তরের মালিন্য দূর করিয়া তাহাদিগকে ইষ্টানুরাগে উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিবার জন্য অনুকূলচন্দ্র সংকীর্তনের সঙ্গে সদালোচনা ও সদ্‌গ্রন্থাদি পাঠেরও আয়োজন করিলেন। ফলে, যতই দিন যাইতে লাগিল, সকলেই ধীরে ধীরে আদর্শানুসরণে আপ্রাণ হইয়া উঠিল। ক্রমে ক্রমে তাহাদের আচার-আচরণেও প্রেম-প্রীতি ও শ্রদ্ধা-ভক্তির উন্মেষ হইতে লাগিল। এ-প্রসঙ্গে আমরা ইতঃপূর্বে গ্রন্থমধ্যে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করিয়াছি।

দলপতি কিশোরীমোহনের কথা আর বলিবার নয়। কিশোরীমোহন এখন আর সে কিশোরীমোহন নাই। এক অপূর্ব ভাবোন্মাদনায় তিনি মাতোয়ারা, ভগবানকে লাভ করিবার দুর্বার প্রেরণায় তিনি পাগলপারা, অভীষ্ট-সিদ্ধির জন্য

চলিয়াছে তাঁহার নিত্য কঠোর সাধনা। উম্মার্গ কিশোরীমোহনকে ভগবন্মুখী করিয়া তুলিবার জন্য অনুকূলচন্দ্রের সকল ব্যাকুল প্রচেষ্টা এতদিনে সফল হইল। এই সুযোগে তিনি তাঁহাকে তৎকালীন ভারত-বিখ্যাত মহাপুরুষ পাগল ঠাকুর হরনাথের সঙ্গ করিবার জন্য প্রায়শই তাঁহার সোনামুখী আশ্রমে পাঠাইতেন। হরনাথের পুণ্য সংস্পর্শে আকৃষ্ট হইয়া কিশোরীমোহন তাঁহার চরণে দীক্ষাগ্রহণের জন্য স্বীয় অন্তরের ঐকান্তিক আকাঙ্ক্ষার কথা বহুদিন ব্যাকুল অন্তরে নিবেদন করিলে, ঠাকুর তাঁহাকে বিশেষভাবে বুঝাইয়া বলিলেন,—"দেখ, যিনি যুক্তিপরামর্শ দিয়া তোমাকে এখানে পাঠাইয়াছেন, তিনিই তোমার গুরু। তিনি সদ্‌গুরু, যুগপুরুষোত্তম। তাঁহার সংঘ গড়িবার সময় হইয়াছে। তুমি সর্ব মন-প্রাণ দিয়া তাঁহারই অনুসরণ কর, তোমার পরম মঙ্গল হইবে, আমিও তো তাঁতেই আছি।" ঠাকুরের এই কথা তখন কিশোরীমোহনের বিশেষ মনঃপুত হইল না।

অনুকূলচন্দ্রের চরিত্র-সম্পদ ও সেবা-মাহাত্ম্য প্রভৃতি অতুলনীয় গুণ-গ্রামের কথা কিশোরীমোহনের অবিদিত নয়। তাঁহার মহৎ ব্যক্তিত্বের জন্য তিনি তাঁহার অনুরাগীও বটেন। কিন্তু অনুকূলচন্দ্রের যত গুণই থাকুক, তিনি কি সদ্‌গুরু হওয়ার যোগ্য পাত্র? বিশেষ, তিনি তাঁহার ছেলেবেলার খেলার সাথী, বয়সেও তাঁহার কত ছোট। এই অবস্থায় তিনি তাঁহার নিকট কিরূপে আত্মসমর্পণ করিবেন? আবার ঠাকুর হরনাথের কথাই বা অমান্য করেন কিভাবে?—ইত্যাদি নানা চিন্তায় কিশোরীমোহন কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িলেন। সমস্যার সমাধানের জন্য মনের দ্বন্দ্ব-সংশয়ের নিরসন করিতে তিনি ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। তিনি মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন,—যিনি সদ্‌গুরু, তিনি নিশ্চয়ই সর্বজ্ঞ; অনুকূল-চন্দ্রকে তিনি পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন; তাঁহার কার্যকলাপে যদি অন্তর্যামিত্বের পরিচয় পান, তবেই তিনি তাঁহাকে ইষ্টরূপে গ্রহণ করিবেন, নতুবা নয়। তদবধি অনুকূলচন্দ্রের উপর কিশোরীমোহনের চলিল কত-না বিচিত্র পরীক্ষা! সে-সকল অপূর্ব অলৌকিক কাহিনীর কয়েকটি মাত্র অতি সংক্ষেপে নিম্নে উল্লেখ করা যাইতেছে।—

একদিন গভীর তামসী অমাবস্যা-রাত্রিতে কিশোরীমোহন একাকী নির্জন শ্মশানে সাধনায় সমাসীন আছেন, আকুল ক্রন্দনে আর্তকণ্ঠে তিনি ভগবানকে ডাকিতেছেন—"দয়াল, কোথায় তুমি, একটিবার দেখা দাও, অভাগার তাপিত প্রাণ শীতল কর।" এদিকে অনুকূলচন্দ্র কিশোরীমোহনের খোঁজে ঠিক সেখানেই গিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। এমন সময় মনুষ্য-কণ্ঠের "ডাক্তার" "ডাক্তার"—এই কথা কয়টি কিশোরীমোহনের শ্রুতিগোচর হইল। এই নির্জন নিশীথে ইহা ভূত-প্রেতের শব্দ ছাড়া অন্য কিছু নয়, এরূপ ভাবিয়া কিশোরীমোহন ভয়ে কাতর হইয়া বার বার উচ্চৈস্বরে 'রাম-নাম' উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। এই সময় কিশোরীমোহন দ্বিতীয় বার শুনিতে পাইলেন,—'রাম-নাম' করছ কেন? আমি ভূত নই, আমি অনুকূল।" এইবার কিশোরীমোহন কিঞ্চিৎ সাহসের সঙ্গে

বলিলেন,—"তুমি যদি অনুকূল, তবে এমন অসময়ে এখানে কেন ?" সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যুত্তর শ্রুত হইল,—"তোমার জন্যই এসেছি, চল বাড়ী চল।" এই অবসরে অনুকূলচন্দ্র কিশোরীমোহনের নিকটবর্তী হইয়া তাঁহাকে হাতে ধরিয়া বাড়ীর দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। অনুকূলচন্দ্র আগে আগে যাইতেছেন, কিশোরীমোহন তাঁহার পিছনে চলিয়াছেন। কিশোরীমোহনের মনের সন্দেহ তখনও ঘুচে নাই। তিনি জানিতেন, ভূত-প্রেতের পা মাটিতে পড়ে না। সহযাত্রীর পা ভূমিস্পর্শ করিতেছে কিনা, তাহাই তিনি বিশেষভাবে লক্ষ্য করিতে লাগিলেন। এমন সময় সঙ্গীটি বলিয়া উঠিলেন,—"ডাক্তার, পা ঠিকই মাটিতে পড়ছে, আমি ভূত নই, তুমি নির্ভয়ে চল।" কিশোরীমোহন বিস্মিত অন্তরে ভাবিলেন,—"তবে তো দেখছি, ঠাকুর হরনাথের কথাই ঠিক।"

কিশোরীমোহনের সন্দেহ তবু যায় না। তাঁহার মাথায় আবার পরীক্ষার বুদ্ধি জাগিল। তিনি ভাবিলেন,—"ও যদি এখন পদ্মায় ডুব দিয়ে আসে, তবেই আর আমার মনে কোন সংশয় থাকবে না।" কিশোরীমোহনের যা ভাবা, অনুকূলচন্দ্রেরও সঙ্গে সঙ্গে তাই করা। তিনি বলিয়া উঠিলেন,—"ডাক্তার, দাঁড়াও, জুতোয় গু লেগেছে মনে হচ্ছে, পদ্মায় একটা ডুব দিয়ে আসি।" এই বলিয়া অনুকূলচন্দ্র গায়ে কাপড়-চোপড় লইয়াই পদ্মায় নামিয়া স্নান করিয়া আসিলেন। কিশোরীমোহনের জ্ঞানচক্ষু তবু খুলিল না। তাঁহার সন্দিগ্ধ মন ভাবিতে লাগিল,—"এমনও তো হ'তে পারে অনুকূল সত্য-সত্যই গু মাড়িয়েছে, আর তাই স্নান করল। যাক্, আবার যদি ও স্নান করে, তবেই আমি পুরোপুরি নিঃসন্দেহ হব।" এদিকে অনুকূলচন্দ্র বাড়ী পৌঁছিয়াই স্নান-ঘাটের দিকে অগ্রসর হইতে হইতে বলিলেন,—"ডাক্তার, দেহের ময়লা ধুলেই যায়, মনের ময়লা কিন্তু সহজে দূর হয় না। তাহ'লে আর একবার স্নান ক'রে আসি, কি বল ?"—এই বলিয়া অনুকূলচন্দ্র আবার জলে নামিয়া স্নান করিয়া উঠিলেন। কিশোরীমোহন ভারাক্রান্ত অন্তরে স্ব-গৃহাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

কিশোরীমোহন এখনও দোদুল্যমান-চিত্ত। ঘটনা-পরম্পরায় এক একবার স্থির বিশ্বাস হয়—অনুকূলচন্দ্র সত্যই সর্বজ্ঞ—সদ্‌গুরু, কিন্তু পরক্ষণেই বিরুদ্ধ চিন্তা-স্রোতের ঘূর্ণাবর্তে পড়িয়া তিনি দিশাহারা হইয়া পড়েন। —অনুকূলচন্দ্র সদ্‌গুরু—এ কিভাবে সম্ভব হ'তে পারে ?—না আছে তার বিন্দুমাত্র শাস্ত্রজ্ঞান—না আছে তার এতটুকু সাধন-ভজন। অনুকূলচন্দ্রকে আবার পরীক্ষা করিতে কিশোরীমোহন কৃতসংকল্প হইলেন। কিশোরীমোহন একদিন বাজার হইতে এক জোড়া খেজুরের গুড়ের সন্দেশ কিনিয়া আনিয়া ঘরে একখানা পটের পিছনে লুকাইয়া রাখিয়া মনে মনে ভাবিলেন,—"অনুকূল রোজই কীর্তনের পর একগ্লাস জল চাহিয়া খাইয়া যায়; আজ যদি সে নিজে হইতে সন্দেশ চাহিয়া খায়, তবেই বুঝিব, সে সত্যিই অন্তর্যামী।" বলিতে কি, অন্যদিনের মত অনুকূলচন্দ্র আর সেদিন জল চাহিলেন না, তাড়াতাড়ি বাড়ী চলিয়া গেলেন।

পূর্ব-পূর্ব বারের মত এবার কোন সাড়া না পাওয়ায় কিশোরীমোহনের মন সন্দেহের ঘনান্ধকারে পুনরায় আচ্ছন্ন হইয়া পড়িল। এজন্য তিনি মনে মনে বেশ উৎকণ্ঠা এবং অস্বস্তিও বোধ করিতে লাগিলেন। আশ্চর্যের বিষয়, দুপুর রাত্রিতে অনুকূলচন্দ্র হঠাৎ কিশোরীমোহনের বাড়ীতে উপস্থিত হইয়া বলিলেন,—"ডাক্তার, রোজ তো শুধুই জল খেয়ে যাই, আজ সন্দেশ চাই—এক জোড়া, তখন এত লোকের সামনে চাইতে পারিনি।" কিশোরীমোহন সহজভাবে উত্তর করিলেন,—"সে কি কথা! এত রাত্রে আমি সন্দেশ পাব কোথায়?" অনুকূলচন্দ্র বলিলেন,—"কেন, আজ যে তুমি বাজার থেকে আমার জন্য এক জোড়া সন্দেশ কিনে এনে এই পটের পিছনে রেখে দিয়েছ।"—এই বলিয়া তিনি নিজেই গিয়া পটের পিছন হইতে সন্দেশ বাহির করিয়া আনিলেন এবং সন্দেশ সহ জল-পান করতঃ বাড়ী চলিয়া গেলেন। কিশোরীমোহন হতভম্ব হইয়া থাকিলেন।

এত দেখিয়া, এত বুঝিয়াও কিশোরীমোহন নিঃশেষে নিঃসন্দেহ হইতে পারিলেন না। আবার পরীক্ষা!—একদিন কিশোরীমোহন দুইটি পাত্রে ভোগ সজ্জিত করিয়া, একটি ঠাকুর হরনাথের নামে ও অপরটি অনুকূলচন্দ্রের নামে নিবেদন করিয়া মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন,—"অনুকূল যদি এইক্ষণ নিজে থেকে এসে তার নামের ভোগটি খেয়ে যায়, তবেই চির-তরে আমার সকল সংশয়ের অবসান ঘট্‌বে, ঠাকুর হরনাথের কথামত তাকেই আমি গুরু ব'লে মাথায় ক'রে নেব।"......এদিকে অনুকূলচন্দ্রও তন্মুহূর্তেই কীর্তন-সঙ্গী দুর্গানাথ সান্ন্যালের সঙ্গে বেড়াইতে বেড়াইতে কিশোরীমোহনের গৃহে আসিয়া হাজির হইলেন। সজ্জিত ভোগ দুইটি সম্মুখে দেখিয়া তিনি আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া সান্ন্যাল মহাশয়কে লইয়া আহারে বসিলেন। অনুকূলচন্দ্র দুইটি ভোগই নিজের কাছে টানিয়া আনিয়া বলিলেন—"দুই কি আছে ডাক্তার, সবই এক। এ-ও আমার, ও-ও আমার। দুর্গানাথদা, আপনি ও-টা খান, আমি এ-টা খাই।" বলা বাহুল্য, অনুকূলচন্দ্র তাঁহার নামে নিবেদিত ভোগটিই নিজে গ্রহণ করিলেন। পরমানন্দে আহার শেষ করিয়া তিনি কিশোরীমোহনের নিকট হইতে বিদায় লইলেন।

এইরূপ আরও কত দিন কত ভাবেই না কিশোরীমোহন অনুকূলচন্দ্রের অন্তর্যামিত্বের পরীক্ষা লইলেন! এদিকে আবার দীর্ঘকাল ধরিয়া নিজের দৈনন্দিন অভাব-অভিযোগ, বিপদ-আপদ, দুঃখ-বিপাক ও অবসাদ-বিষাদের কত অসংখ্য ব্যাপারে কিশোরীমোহন অহরহ অপ্রত্যাশিতভাবে অনুকূলচন্দ্রের অজস্র করুণা, অগাধ প্রেম ও অফুরন্ত সেবার প্রত্যক্ষ পরিচয় পাইতে পাইতে বিমুগ্ধ বিস্মিত হইয়া আছেন। এই অবস্থায় প্রেমময় অনুকূলচন্দ্রের ঐশী-শক্তির বাস্তব পরিচায়ক ঐ সকল অলৌকিক অসংখ্য ঘটনা—স্থানাভাববশতঃ যাহা এখানে বিবৃত করা সম্ভব হইল না—অনুক্ষণ অনুধ্যান করিতে তাঁহার অনুকূলচন্দ্র সম্পর্কে, বিশ্বরূপ দর্শনের পর শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে অর্জুনের যে অবস্থা

ঘটিয়াছিল, তাহাই যেন হইল। বাল্যসখা অনুকূলচন্দ্রের শ্রীপদে তনু, মন, প্রাণ—সর্বস্ব উৎসর্গ করিয়া কিশোরীমোহন আজ তাঁহারই প্রেমে পাগল হইয়া উঠিলেন।

তদবধি কিশোরীমোহন তাঁহার প্রিয়পরম অনুকূলচন্দ্রের আরব্ধ লোককল্যাণ যজ্ঞে আত্মাহুতি দিয়া কৃতার্থ হইলেন। তাঁহার জীবনে ইষ্টসেবার উজ্জ্বল দৃষ্টান্তের অভাব নাই। এককালে তিনি তাঁহার প্রাণোন্মাদী কীর্তনে সারা বাংলায় প্রেমের যে বিপুল প্লাবন আনিয়াছিলেন, কার্সিয়াং, পুরুলিয়া, রাঁচি, কাশীধাম, শ্রীক্ষেত্র প্রভৃতি দূর-দূরান্তের কত অসংখ্য নর-নারীর তৃষিত অন্তরে যে শান্তিসলিল সেচন করিয়াছিলেন,—দুঃখের বিষয়, সে সকল অপূর্ব কাহিনী এখানে বলিবার অবকাশ নাই। পরবর্তীকালে, ঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের আদর্শ-প্রচার, প্রতিষ্ঠান-রচনা, সৎ-দীক্ষাদান, লোক-সংগ্রহ ও জন-সেবাদি সকল কার্যেও কিশোরী মোহনই ছিলেন তাঁহার দক্ষিণহস্ত-স্বরূপ। বস্তুতই কিশোরীমোহন সারাজীবন অনুকূলচন্দ্রকে ছায়ার মত অনুসরণ করিয়া একনিষ্ঠ আদর্শ ভক্তের যে প্রকৃষ্ট পরিচয় রাখিয়া গিয়াছেন, এ জগতে তাহা বিরল।

ভক্তবীর কিশোরীমোহন ১৩৫১ বঙ্গাব্দের ১৯শে বৈশাখ তেষট্টি বৎসর বয়সে তাঁহার আরাধ্য দেবতার শ্রীচরণোপান্তে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

অনন্তনাথ

বঙ্গাব্দ ১২৯৩ সালের ৬ই আশ্বিন শনিবার অনন্তনাথের জন্ম হয়। ইঁহার পিতার নাম দ্বারকানাথ রায় ও মাতার নাম ব্রহ্মময়ী দেবী। অনন্তনাথের পৈতৃক নিবাস পাবনা-সহরের অন্তঃপাতী কাশীপুর গ্রাম। সাত বৎসর বয়ঃক্রম-কালে তাঁহার পিতৃবিয়োগ হয়। আর্থিক অস্বচ্ছলতার জন্য তিনি বাল্যে লেখাপড়া বিশেষ কিছু শিক্ষা করিতে পারেন নাই, মাত্র সপ্তম মান পর্যন্ত পড়াশোনা করিয়াছিলেন। ষোল বৎসর বয়সে তিনি হিমাইতপুরের ডাক্তার বসন্তকুমার চৌধুরীর নিকট কম্পাউণ্ডারীর কাজ শিক্ষা করেন, এবং তৎসঙ্গে কিঞ্চিৎ ডাক্তারী-বিদ্যাও তিনি অধ্যয়ন করিয়াছিলেন।

অনন্তনাথ যখন ডাক্তার বসন্ত চৌধুরীর বাড়ীতে থাকেন, তখন হইতেই অনুকূলচন্দ্রের সহিত তাঁহার অন্তরের ঘনিষ্ঠতা জন্মে। সেই অবধি অনুকূল-চন্দ্র অনন্তনাথকে চোখে চোখে রাখিতেন এবং সর্বদা নানা সদুপদেশ দানে তাঁহাকে জীবন-চলার পথে সাহায্য করিতেন। এ-সম্বন্ধে তৎকালীন একটি ঘটনার উল্লেখ করিতেছি।—সে সময় কাশীপুর-হাটে গোলা বসিয়াছে, তৎসঙ্গে বেশ্যাপাড়াও বসিয়াছে। অনেক সেখানে যাতায়াত করে। সমবয়স্ক ছেলেরা একদিন অনন্তনাথকে ধরিয়াছে,—'অনন্ত, আজ তোকে আমাদের সঙ্গে যেতে হবে।' অনন্তনাথের মাথায়ও খেয়াল চাপিয়াছে, তিনিও যাইবেন। অনন্তনাথ সাজ-সজ্জা করিতেছেন, এমন সময় হিমাইতপুর হইতে তাঁহার কাশীপুরের সেই

নির্জন কক্ষে অনুকূলচন্দ্র গিয়া উপস্থিত হইয়া বলিলেন,—"কি রে অনন্ত! কোথায় যাবি? চল্ না দু'জনে একটু বেড়িয়ে আসি।" অনন্তনাথ অনুকূলচন্দ্রের কাছে সকল বৃত্তান্ত বলিলেন এবং উভয়ে ভ্রমণে বাহির হইয়া পড়িলেন।

এই সময় অনন্তনাথের মাতৃদেবী স্বর্গারোহণ করেন। মাতৃশোকে অনন্তনাথ খুবই শোকাকুল হইয়া পড়েন। মাতৃ-বিয়োগের দুই বৎসর পরে তাঁহার বিবাহ হয়। তিন বৎসরের মধ্যে একটি পুত্র-সন্তান রাখিয়া তাঁহার স্ত্রী পরলোক গমন করেন। দুঃখের বিষয়, শিশুপুত্রটিও মাত্র বাইশ দিন জীবিত থাকিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এই ঘটনার পর হইতে অনন্তনাথ আত্মার শান্তি কামনায় গুরু-গ্রহণের জন্য অস্থির হইয়া পড়েন এবং রংপুর যাইয়া ভগিনীপতি রাধারমণ গোস্বামী মহাশয়ের নিকট বৈষ্ণব-মন্ত্রে দীক্ষাগ্রহণ করেন।

এদিকে অনুকূলচন্দ্রের আন্তরিক গভীর ভালবাসার টানে অনন্তনাথ ক্রমশই তাঁহার দিকে ঝুঁকিয়া পড়িতে লাগিলেন। একদিন এই সহজ মধুর প্রণয়-সম্পর্কই অনন্তনাথের জীবনে এক নব জীবনের দ্বার খুলিয়া দিয়াছিল। শ্রীশ্রীঠাকুর যে বসিয়া বসিয়া অনন্তনাথকে ধর্মকথা শুনাইতেন, তাহা নহে। শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রতি অনায়াস প্রীতির আকর্ষণে কত দিনের কত রাত্রি তাঁহার সঙ্গ করিতে করিতে অনন্তনাথের অন্তর ফাটিয়া কোথা হইতে একদিন জাগিয়া উঠিল ভগবানকে পাইবার প্রবল আকাঙ্ক্ষা। স্ত্রী-বিয়োগের পর অনন্তনাথ তাই মনে করিলেন, ভগবানকে পাইবার সাধনার সুযোগ ভগবানই তাঁহাকে জুটাইয়া দিলেন। ভগবদ্-লাভের এই তীব্র বাসনা দিন-দিন তাঁহার মনকে ভীষণভাবে পীড়া দিতে লাগিল। উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য তিনি কঠোর তপস্যা আরম্ভ করিলেন। কালক্রমে অদ্বৈতানুভূতি, শব্দ-শ্রবণ, জ্যোতি-দর্শন প্রভৃতি সাধন-জগতের অনেক কিছুই তাঁহার হইল। কিন্তু এ সকল সম্পদ পাইয়াও তিনি মোটেই তৃপ্ত হইতে পারিলেন না; ভাবিতেন—অনুভূতি না হয় হইলই, কিন্তু ভগবানকে পাইলাম কৈ? তাঁহাকে নরদেহ-ধারিরূপে পাইয়া যদি তাঁহার সঙ্গ করিতে না পারিলাম, তবে এ জীবন বহন করিয়া লাভ কি?—যতই চিন্তা করেন, মন ভীষণভাবে চঞ্চল হইয়া উঠিতে লাগিল। অবশেষে একদিন ভাবিলেন,—এ জীবনে যখন তাঁহাকে পাইলামই না, দেখি পরজন্মে নূতন দেহে নবীন উৎসাহে সাধনা করিয়া পাই কিনা।—এই মনে করিয়া অনন্তনাথ ইহ জীবন নাশ করিতে কৃতসংকল্প হইলেন। নির্জনে সাধনা করিবার জন্য বাড়ীর নিকটেই কাশীপুরের বিস্তীর্ণ প্রান্তরের মধ্যস্থলে তিনি যে কুটীর নির্মাণ করাইয়াছিলেন সেই সাধন-গৃহের আড়-কাঠে একটি বস্ত্র রজ্জুর ন্যায় বন্ধন করতঃ তাহার সাহায্যে উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করিতে মনঃস্থ করিলেন।

সন্ধ্যার প্রাক্কাল। মুষলধারে বৃষ্টি পড়িতেছে। শ্রীশ্রীঠাকুর হিমাইতপুরে নিজ বাড়ীতে ডাক্তারখানার বারান্দায় বসিয়া সমাগত রোগীদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনায় নিযুক্ত ছিলেন। এমন সময় তিনি হঠাৎ বারান্দা হইতে লাফ দিয়া

মাটিতে পড়িয়া বেগে দৌড়াইতে লাগিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়াইয়া প্রায় অর্ধ-ক্রোশ পথ অতিক্রম করিয়া কাশীপুরের মাঠে অনন্তনাথের সেই সাধন-গৃহের দ্বারে উপস্থিত হইলেন এবং সজোরে দরজায় আঘাত করিয়া—"অনন্ত রে, দরজা খোল্, দরজা খোল্, ভিজে গেলাম, শিগ্‌গির দরজা খোল্" বলিয়া বজ্র-গম্ভীর স্বরে চিৎকার করিয়া ডাকিতে লাগিলেন। সেই মুহূর্তে অনন্তনাথও জীবন অন্ত করিবার জন্য বন্ধন-রজ্জু গলায় পরিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। বাহির হইতে এইরূপে আকস্মিক বাধা পাইয়া কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থায় অনন্তনাথ প্রস্তর মূর্তির ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিলেন আর ভাবিতে লাগিলেন—ভগবান, তোমাকে পাওয়ার কি এতই বিঘ্ন ! কপাট অধিকক্ষণ অনুকূলচন্দ্রের নিরন্তর সুতীব্র আঘাত সহ্য করিতে পারিল না, দ্বার অর্গলচ্যুত হইল। অনুকূলচন্দ্র গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া অনন্তনাথকে হস্ত-প্রসারণপূর্বক দৃঢ় আলিঙ্গনে আবদ্ধ করিয়া বলিলেন,—"আমি কী অপরাধ করেছি যে, তুই আমায় ফেলে চ'লে যাচ্ছিলি ? 'ভগবান' 'ভগবান' ব'লে পাগল, ভগবান যে তোর পাছে পাছে ঘুরে বেড়াচ্ছে।" নির্বাক বিস্ময়ে এবার অনন্তনাথ অনুকূলচন্দ্রকে জড়াইয়া ধরিয়া প্রাণের আবেগে কাঁদিতে লাগিলেন। বাল্যের ক্রীড়ার সঙ্গীটির প্রেমালিঙ্গনে ও মধুর সম্ভাষণে অনন্তনাথ তখন তাঁহার মধ্যে কী দেখিতে পাইলেন, তাহা অপরের বোধগম্য নয়। বলাবাহুল্য, সেইদিন হইতে অনন্তনাথ অভাবনীয়রূপে পাইলেন শ্রীশ্রীঠাকুরের সঙ্গ। শ্রীশ্রীঠাকুর তখনই সেই অবস্থায় অনন্তনাথকে জননীদেবীর নিকট লইয়া গেলেন।

দুই বৎসর যাইতেছে। অনুকূলচন্দ্র প্রায়শ সকাল-সন্ধ্যা অনন্তনাথের বাড়ী যান। পরস্পরে নানা বিষয়ে আলাপ-আলোচনা করেন। অনুকূলচন্দ্রের জননী মনোমোহিনী দেবী সম্বন্ধেই বেশী কথাবার্তা হয়। তাঁহার সাধন-পদ্ধতি, তপস্যা, ইষ্টনিষ্ঠা ও গুরুকৃপার নানা অপূর্ব কাহিনী শুনিয়া অনন্তনাথ অবশেষে মাতৃদেবীর নিকট সৎ-নাম গ্রহণ করেন এবং সন্ত-মতের পশ্চিমদেশীয় গুরুদেব শ্রীশ্রীসরকার সাহেবের মূর্তি স্থাপন করতঃ নাম-ধ্যান চালাইতে থাকেন। অনুকূলচন্দ্র রোজই রাত্রি প্রভাত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই অনন্তনাথের বাড়ী গিয়া উপস্থিত হন, সারাদিন তাঁহাকে সাধন-ভজন সম্বন্ধে নানা উপদেশ দান করেন। তখন অনুকূলচন্দ্রের মহাভাবসমাধির অবস্থা চলিতেছে। অনন্তনাথ দেখিলেন,—অনুকূলচন্দ্র অবলীলাক্রমে চৌরাশী প্রকারের আসন করিয়া যাইতেছেন, জাগতিক নানা সমস্যার অপূর্ব সমাধান করিতেছেন, ঈশ্বর-তত্ত্ব, অবতারবাদ প্রভৃতি জটিল ধর্মতত্ত্বের সহজ সরল সুস্পষ্ট মীমাংসা দান করিতেছেন। দিনের পর দিন অনুকূলচন্দ্রের অসংখ্য ভাববাণী শুনিতে শুনিতে অনন্তনাথের এই দৃঢ় প্রত্যয় জন্মিল যে,—সাধক যখন তপস্যার উচ্চ স্তরে আরোহণ করে, তখন সে নিজেকে ভগবান বলিয়া বোধ করে ও সর্বসমস্যার সমাধান করিতে সমর্থ হয় এবং ইহাই সাধনার চরম, আর অনুকূলচন্দ্রও তদবস্থা লাভ করিয়াছেন। একদিনের ভাববাণীতে অনুকূলচন্দ্র অনন্তনাথের নাম ধরিয়া ডাকিয়া বলিয়াছিলেন,—"অনন্ত

রে, কোথাও রওনা হ'তে হ'লে, মেল ট্রেনে যাওয়া যায়, **mixed train**-এ যাওয়া যায়, আবার গরু-মহিষের গাড়ীতেও যাওয়া যায়। ইহা বুঝে যা' করার হয় করবি।" ভাবাবস্থায় অনুকূলচন্দ্র হইতে এইরূপ আরও অনেক দিন অনেক নির্দেশ তিনি শুনিতে পাইলেন। ইহাতে অনুকূলচন্দ্রের ভগবত্তা সম্বন্ধে দৃঢ়-বিশ্বাসী হইয়া অনন্তনাথ তাঁহাকেই শ্রীগুরুপদে বরণ করিলেন এবং মাতৃপ্রদত্ত সাধন-পদ্ধতি ঐকান্তিক আপ্রাণতার সহিত অনুসরণ করিয়া চলিলেন।

ইহার পর অনন্তনাথ কাশীপুরের স্বীয় পৈতৃক ভবন পরিত্যাগ করিয়া হিমাইতপুরে অনুকূলচন্দ্রের সঙ্গে তাঁহার নিজ বাটীতে আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন। তখন পদ্মানদী ঠাকুর-বাড়ীর নিচ দিয়াই প্রবাহিত হইত। নদী-তীরবর্তী দক্ষিণ-দ্বারী একখানা খড়ের ঘরে অনুকূলচন্দ্র থাকিতেন। অনন্তনাথও সেই ঘরেই নাম-ধ্যান করিতেন। অনুকূলচন্দ্রের আদেশে অনন্তনাথ এই সময় আবার কঠোর তপস্যা আরম্ভ করিলেন। সেজন্য কাশীপুরের মাঠে একটি মন্দির নির্মিত হইল। তথায় অনন্তনাথ বাহ্যজ্ঞানশূন্য ও আহার-নিদ্রা-মলমূত্রত্যাগ-বর্জিত হইয়া একাদিক্রমে পাঁচ দিন—সাত দিন, এক মাস,—দুই মাস, এমন কি তিন মাস একাসনে ধ্যানমগ্ন থাকিয়া সাধনা করিয়াছেন। এইরূপ দুশ্চর তপস্যায় তাঁহার দেহ অস্থিচর্মসার হইয়া গিয়াছিল। তাঁহার তীব্র সাধনার কথা শ্রীশ্রী-ঠাকুরকে একদিন বলিতে শুনিয়াছি—"অনন্তর সাধনা কি কঠোর! এমনও হয়েছে, কত কাল ঘর থেকে বেরোয়নি। আমি একদিন গিয়ে দেখি, সারা শরীর বরফের মত ঠাণ্ডা, বুকে একটুও স্পন্দন নেই। মনে করলাম—ম'রে গেল নাকি! তার সমস্ত গায়ের পিঁপড়ে ছাড়িয়ে দিই, মাছিগুলো কোন রকমে গা থেকে তাড়িয়ে দিই—তারপর ঘর থেকে বেরিয়ে আসি। শেষে ধীরে ধীরে অনেকক্ষণ পরে জ্ঞান হ'লো। শরীরের অবস্থা দেখে মনে হ'তো, আর বেশী দিন বাঁচবে না।"

সাধনা-কালে অনন্তনাথ একবার শুধু দুগ্ধ পান করিয়া এবং মৌনব্রত পালন-পূর্বক ছয় মাস কাটাইয়াছিলেন। তখন সর্বেন্দ্রিয়-সংযম-পূর্বক অধিকাংশ সময় তিনি ধ্যানমগ্ন থাকিতেন। এই অবস্থায় কেবলমাত্র শ্রীশ্রীঠাকুরের সঙ্গে নেহাৎ প্রয়োজনে কদাচিৎ সামান্য কথাবার্তা বলিয়া সাধনার বিভিন্ন অবস্থাদি সম্বন্ধে উপদেশ লইতেন। একবার দীর্ঘকাল ধ্যানমগ্ন থাকিয়া তিনি প্রত্যক্ষ-ভাবে এই অনুভূতি লাভ করিলেন যে, শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্রই পূর্ণ ভগবান এবং এ পর্যন্ত জগতে যত অবতার পুরুষের আগমন হইয়াছে তিনি তাঁহাদের সকলের পরিপূরক এবং তিনিই বর্তমান পুরুষোত্তম। অনন্তনাথের সেই মহা-সাধনার যুগে আশ্রমে আগন্তুকের সংখ্যা ক্রমেই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে। কর্মপ্রতিষ্ঠান তখনও কিছুই স্থাপিত হয় নাই। তৎকালে কলনাদিনী পদ্মার তীরবর্তী আশ্রম-বাটিকায় দিবারাত্র কেবল তত্ত্বালোচনা চলিত। কোথায়ও একদল লোক শ্রীশ্রী-ঠাকুরের সঙ্গে, কোথায়ও একদল অনন্তনাথের সঙ্গে, কোথায়ও বা আগন্তুকগণ

নিজেরাই দলবদ্ধ হইয়া পরস্পরে আলাপ-আলোচনায় এমন মত্ত হইয়া পড়িতেন যে, কাহারও স্নান-আহার-নিদ্রার কথা মনে থাকিত না।

একটি কথা এইখানে বলিয়া রাখি। অনন্তনাথ তপস্যার বলে সাধন-জগতের যেরূপ উচ্চস্তরে আরোহণ করিয়াছিলেন, তাহাতে শ্রীশ্রীঠাকুর বলিতেন,—"সন্ত-মতের পূর্ব পূর্ব গুরুদের নামের সহিত 'মহারাজ' শব্দ যুক্ত দেখা যায়, যথা—স্বামিজী মহারাজ, হুজুর মহারাজ, মহারাজ সাহেব প্রভৃতি ;—অনন্তনাথও ঐ জাতীয় একজন উন্নত সাধক, সুতরাং তাহাকেও 'মহারাজ' বলিয়া ডাকা উচিত।" অনন্তনাথের এইরূপ অলৌকিক আধ্যাত্মিক উন্নতিলাভে সন্তুষ্ট হইয়া শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁহাকে 'মহারাজ' আখ্যা দেন। সেই হইতে শ্রীশ্রীঠাকুরের অসংখ্য শিষ্যবর্গ সকলেই তাঁহাকে সর্বদা 'মহারাজ' বলিয়া ডাকিতেন।

অনন্তনাথের সাধন-সময়ের বহু ঘটনার একটি মাত্র বলিতেছি। একদিন শ্রীশ্রীঠাকুরের সঙ্গে অনন্তনাথের নিম্নলিখিতরূপ কথাবার্তা হইল। অনন্তনাথ বলিলেন,—"কামাদি রিপু জয় করা খুব কঠিন ব'লে মনে হয় না।" তদুত্তরে শ্রীশ্রীঠাকুর বলিলেন,—"ওতে স্বাধীন কর্তৃত্ব কিছুই নেই। ঐ সব ব্যাপার ইষ্টনিষ্ঠা ও পরমপিতার দয়ার উপরেই নির্ভর করে।" এ সম্বন্ধে শ্রীশ্রীঠাকুরের সহিত অনন্তনাথের আরও অনেক আলাপ-আলোচনা হইল। কিন্তু অনন্ত-নাথের মতের কোন পরিবর্তন হইল না। তাঁহার দৃঢ় ধারণা, সাধনায় ইন্দ্রিয় জয় অবশ্যই হয়। বলা বাহুল্য, নিজের তৎকালীন স্বচ্ছ মানসিক অবস্থা পর্যবেক্ষণ করিয়াই বোধ হয় তিনি এরূপ মন্তব্য করিতে সাহসী হইয়াছিলেন। ঘটনাচক্রে এই সময় একদিন ফাল্গুনী পূর্ণিমায় অনন্তনাথ নবদ্বীপ গমন করেন। তথায় তিন-চার দিন অহর্নিশ তিনি বৈষ্ণব ও বৈষ্ণবীদের কীর্তন শ্রবণ ও নৃত্য দর্শন করিয়াছিলেন। ইহাতে তাঁহার মনের এরূপ অবস্থা হইল যে, যে-দিকেই দৃষ্টিপাত করেন কীর্তনের সেই বৈষ্ণবীদের মূর্তি তাঁহার চক্ষের সমক্ষে ভাসিয়া উঠিতে লাগিল। এই অবস্থায় তাঁহার ভীষণ কামোত্তেজনা প্রকাশ পাইল,—আহার-নিদ্রা ভুলিয়া গেলেন। দারুণ ছটফটানি। সর্বাঙ্গে অসহ্য জ্বালা, প্রাণ যায়-যায় অবস্থা! লোকালয়ে থাকা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব হইল। উপায়ান্তর না দেখিয়া গঙ্গাতীরে যাইয়া এক নির্জন স্থানে বালুকা-রাশির উপর তিনি গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন। আর্তনাদ করিতে করিতে রাত্রি প্রভাত হইল। এইভাবে পরবর্তী সারাটা দিনও কাটিল। সন্ধ্যাবেলা মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন,—"বেশ্যালয়েই যাব, যা হয় হবে।" অভীষ্ট-সিদ্ধির জন্য তিনি তদভিমুখে রওনা হইলেন এবং এক বেশ্যারমণীর দরজায় গিয়া ধাক্কা দিলেন। এমন সময় বিশ-পঁচিশ বৎসর বয়স্কা একটি নারী আসিয়া তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া বাড়ীর ভিতর লইয়া যায়। অনন্তনাথ তন্ময়চিত্তে স্ত্রীলোকটির আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। আশ্চর্যের বিষয়, এমন সময় হঠাৎ তাঁহার মনে শ্রীশ্রীঠাকুরের দিব্য মূর্তিখানি ভাসিয়া উঠিল এবং সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রীলোকটির দৈহিক

রূপ-লাবণ্য কোথায় অন্তর্হিত হইল,—উহা অস্থি, মজ্জা, মেদ, মাংস, রক্ত ও ক্লেদে পূর্ণ এক অতি বীভৎস কুৎসিত মূর্তিতে পরিণত হইল। হত-চৈতন্য অবস্থায় কিছু সময় অতিবাহিত হওয়ার পর তাঁহার স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়া আসিলে তিনি এক দৌড়ে নদীতীরে গিয়া উপস্থিত হইলেন। তথায় কিয়ৎকাল বিশ্রামের পর সুস্থ হইয়া স্নান করিয়া বাসায় ফিরিলেন। সেই দিনই রাত্রির ট্রেনে তিনি হিমাইতপুর অভিমুখে যাত্রা করিলেন এবং আশ্রমে পৌঁছিয়াই শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে আনুপূর্বিক সকল ঘটনা বিবৃত করিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর শুনিয়া কতক্ষণ খুব হাসিলেন।

পূর্বোক্ত পদ্মাতীরস্থ শ্রীশ্রীঠাকুরের শয়ন-গৃহের পার্শ্বে আর একখানা খড়ের ঘর ছিল। শ্রীশ্রীঠাকুর তথায় অনন্তনাথের মাতৃদেবীর স্মৃতিতে "ব্রহ্মময়ী ঔষধালয়"-নামে একটি দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর অনন্তনাথের উপর উক্ত ডাক্তারখানার সর্ববিধ দায়িত্ব অর্পণ করিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের নির্দেশে অনন্তনাথ প্রত্যহ বহু দূরবর্তী গ্রামে গিয়া রোগী দেখিতেন। চতুষ্পার্শ্বস্থ দীন-দরিদ্র-অনাথগণের সেবাকার্যে তিনি সর্ব মন-প্রাণ নিয়োগ করিয়াছিলেন। কি অসীম যত্ন, আগ্রহ ও দরদের সঙ্গে অনন্তনাথ পীড়িতের চিকিৎসা ও সেবাশুশ্রূষা করিতেন, তাহা স্বচক্ষে যাঁহারা না দেখিয়াছেন তাঁহাদিগকে কিছুতেই বোঝানো যাইবে না। অনন্তনাথের আশ্চর্য রোগনির্ণয়-ক্ষমতা ও ঔষধ-ব্যবস্থা দেখিয়া সকলেই বিস্মিত হইতেন। কত দুরারোগ্য রোগীকে যে তিনি কত অদ্ভুত সহজ প্রক্রিয়ায় নিরাময় করিয়াছেন, তাহার সীমা-সংখ্যা নাই। হিমাইতপুরের মত গণ্ডগ্রাম হইতে কলিকাতা মহানগরীতে আমন্ত্রিত হইয়া তখন কত পরিবারে কত কঠিন ব্যাধির চিকিৎসায় যে তিনি দক্ষতা দেখাইয়াছেন তাহার অবধি নাই।

শ্রীশ্রীঠাকুরের নির্দেশে অনন্তনাথকে আধ্যাত্মিক সাধনার সঙ্গে জাগতিক নানা কর্তব্যের দায়িত্বও গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। তৎকালে সৎসঙ্গ-প্রতিষ্ঠানের সহকারী সভাপতির বিপুল কর্মভার তাঁহার উপর ন্যস্ত ছিল। লোক-সংগ্রহ এবং লোক-পালন তাঁহার সর্বপ্রধান কর্তব্য ছিল। এই সকল কাজে তিনি প্রথমত তেমন আনন্দ পাইতেন না। কারণ, অধিকাংশ সময় নীরবে ধ্যানধারণা-সাধনায় অতিবাহিত করিতেই তিনি ভালবাসিতেন। মাঝে মাঝে তাঁহাকে বলিতে শুনিয়াছি,—"আর এই সকল বিষয়ে যাইতে ইচ্ছা হয় না। মনটাকে এত নিচে নামাইয়া আনিতে আমার অত্যন্ত কষ্ট হয়, তবু করিতেই হইবে, কারণ, ইহা মালিকের ইচ্ছা।" ধর্ম ও কর্মযোগের রহস্য সম্বন্ধে শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁহাকে প্রায়শই বলিতেন,—"দ্যাখ্ অনন্ত, লোকহিতকর কাজ না ক'রে শুধু ব'সে ব'সে নাম-ধ্যান করলে ধর্ম হয় না। সাধনা যেমন করতে হবে, বাস্তব কর্মে ইষ্টের নির্দেশও তেমনই মূর্ত ক'রে তুলতে হবে।" গুরুগতপ্রাণ অনন্তনাথও শ্রীশ্রীঠাকুরের এই আদেশ শিরোধার্য করিয়া নিজ জীবনকে তদনুসারে গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। গুরুর আজ্ঞা প্রতিপালনে অনন্তনাথের কোনও দ্বিধা ছিল না, প্রশ্ন ছিল না।

শ্রীশ্রীঠাকুর যখন যাহা বলিতেন, তাহা যত দুঃসাধ্যই হউক, তিনি নির্বিচারে নির্বিকার চিত্তে তৎক্ষণাৎ তাহা পালন করিতেন। গুরুর ইচ্ছাপূরণে তিনি ছিলেন একজন নির্দ্বন্দ্ব নির্ভীক বীর সাধক। অনন্তনাথের এই অসামান্য গুরু-নিষ্ঠার দৃষ্টান্ত-স্বরূপ অসংখ্য কাহিনীর মধ্যে একটি মাত্র এখানে বিবৃত করিতেছি।—

একবার আশ্রমে ডাক্তারখানার পশ্চাতে কি জানি একটা জন্তু মারা যায়। উহার মৃতদেহ হইতে অতি উৎকট দুর্গন্ধ বায়ুতে ভাসিয়া আসিয়া সকলকে অস্থির করিয়া তোলে। এমন সময় শ্রীশ্রীঠাকুর সেই পথ দিয়া যাইতেছিলেন। তাঁহার নাকে এই দুর্গন্ধ প্রবেশ করিতেই তিনি ইহা কিসের গন্ধ খোঁজ করিতে বলেন। অনুসন্ধানে জানা গেল, একটা গরুর ঠ্যাং জঙ্গলের মধ্যে পড়িয়া আছে এবং তাহা হইতেই দুর্গন্ধ আসিতেছে। অনন্তনাথ তখন ডাক্তারখানায় বসিয়া রোগীদের ঔষধের ব্যবস্থা দিতেছিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁহাকে ডাকিয়া বলিলেন,—"অনন্ত রে, ডাক্তারখানার পিছনে মরা গরুর ঠ্যাং নাকি প'ড়ে আছে, তা থেকে ভয়ানক দুর্গন্ধ আসছে, তুই এক্ষুণি গিয়ে মুখে ক'রে কামড়ে ওটাকে ঐ নদীর চরায় দূরে ক'রে ফেলে দিয়ে আয় তো।" অনন্তনাথ শ্রীশ্রীঠাকুরের আদেশ পাওয়ামাত্র সানন্দে সেই পূতিগন্ধময় পোকা-পড়া গরুর ঠ্যাংখানা দাঁতে কামড় দিয়া লইয়া নদীর ধারে আস্তে আস্তে চলিয়া গেলেন। যাওয়ার সময় তাঁহার শরীরের উপর উহার পচা রস ও পোকা পড়িতেছিল। গরুর ঠ্যাংটি ফেলিয়া দিয়া তিনি হস্তপদাদি ধুইয়া ঘরে ফিরিয়া আসিলেন এবং পূর্ববৎ রোগীদের ঔষধ-ব্যবস্থা করিতে নিযুক্ত হইলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুরের সেবায় অনন্তনাথের কি আগ্রহই না ছিল! মন্দিরে ধ্যানে বসিয়াছেন, উঠিয়া আসিয়া দুধ কিনিয়া নিজ হাতেই শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রিয় ক্ষীর মিষ্টদ্রব্যাদি তৈয়ার করিয়া লইয়া তাঁহার ভোগের সময় উপস্থিত হইয়াছেন। কায়মনোবাক্যে গুরুসেবা করিবার জন্য তিনি সর্বদা সচেষ্ট থাকিতেন। শ্রীশ্রী-ঠাকুর কখন কি কাজের আদেশ দেন তাহা জানিবার জন্য তিনি সর্বক্ষণ উৎকীর্ণ হইয়া থাকিতেন। রাত্রি দুই প্রহর অতীত হইয়াছে। শ্রীশ্রীঠাকুরের ফরমাইস হইল, অমুক জিনিষ খাইবেন। হয় বাজিতপুর ঘাট, না হয় পাবনা হইতে, না হয় নিজ হাতে প্রস্তুত করিয়া অনন্তনাথ যত শীঘ্র সম্ভব তাহা শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে উপস্থিত করিয়াছেন। শ্রীশ্রীঠাকুরও এমন ছিলেন, চাহিবামাত্রই না পাইলে অস্থিরতা প্রকাশ করিতেন। একটু বিলম্ব সহ্য করিতে পারিতেন না।

অনন্তনাথের ইষ্টপ্রীতি তাঁহার সারাজীবনের ক্ষুদ্র বৃহৎ প্রতিটি কার্যে ফুটিয়া উঠিয়াছে।—বেলা দুইটা তিনটা বাজিয়াছে। মাথার উপর প্রচণ্ড রৌদ্র। অনন্তনাথ বিস্তৃত মাঠে শস্যক্ষেত্রে বসিয়া মটর তুলিয়া পকেট ভর্তি করিতেছেন,— শ্রীশ্রীঠাকুর খাইবেন, তিনি কড়াইশুটি ভালবাসেন। মায়ের ঘরে লেবু আছে কিনা, প্রত্যহ খোঁজ নিবেন। না থাকিলে যেরূপেই হউক লেবু আনিতেই

হইবে,—ঠাকুর-ভোগে লাগিবে। কখনও কোথায়ও গেলে দুই চক্ষে যাহা ভাল লাগিয়াছে, শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্য লইয়া আসিয়াছেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের যতকিছু দায়িত্ব সবই ছিল যেন অনন্তনাথের নিজের দায়িত্ব। ঠাকুর-বাড়ীর কোন অভাব-অভিযোগের কথা তৎকালে কখনও শ্রীশ্রীঠাকুরের কর্ণে পৌঁছিত না। মাতৃদেবীর যাহা প্রয়োজন অনন্তনাথ আনিতেছেন। বাড়ীর ছেলেমেয়ে বউ সকলেই জানিত—তাহাদের যাহার যাহা দরকার, যোগাইবেন এই একটি মানুষ। শ্রীশ্রীঠাকুরের সেবার উদ্দেশ্যে তাঁহার পরিবার-পরিজন ও বৃহত্তর পারিপার্শ্বিকের সর্বকিছু দায়িত্ব অনন্তনাথ নিজে একাকী বহন করিতেন। ঠাকুরের সংসার ছিল তাঁহার নিজের সংসার। শ্রীশ্রীঠাকুরের জনক-জননীকে তিনি আপনার জনক-জননী বলিয়াই মনে করিতেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের আত্মীয়-স্বজন শিষ্যবর্গ সবাই ছিল তাঁহার আপন-জন। শ্রীশ্রীঠাকুরের সঙ্গে অন্তর-বাহির সর্বদিকে সর্বভাবে এক আত্মা এক মন এক দেহ হইয়া চলিতেই তিনি সর্বদা সচেষ্ট থাকিতেন। শ্রীশ্রীঠাকুর ছাড়া অনন্তনাথের নিজস্ব বলিয়া আর কিছু ছিল না। তাঁহার সারাজীবনের সকল কর্মের একমাত্র লক্ষ্য ছিল শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রীতি-সম্পাদন।

অনন্তনাথ গীতবাদ্যে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন না বটে, কিন্তু উচ্চকণ্ঠে সুমিষ্টস্বরে অতি সুন্দর গান করিতেন। তাঁহার অপূর্ব সুধাকণ্ঠের সুর-ঝঙ্কারে সকলের প্রাণ বিমোহিত হইত। দূরবর্তী গ্রামবাসীদের সেবাকার্য সমাপ্ত করিয়া অনন্তনাথ যখন প্রত্যহ আপন মনে প্রাণ মাতানো সুরে গান গাহিতে গাহিতে নিশীথের গভীর নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া আশ্রমে ফিরিতেন তখন নিদ্রালু আশ্রমবাসীদের প্রাণে কি অপূর্ব শিহরণ খেলিয়া যাইত!

কীর্তনেও অনন্তনাথ অদ্ভুত শক্তির পরিচয় দিয়াছেন। কীর্তনে এক এক দিন উচ্চকণ্ঠে গান ধরিয়াছেন, একই সুরে গানের একই পদ গীত হইতেছে, দিবারাত্র অবিরাম তাহাই চলিতেছে। অন্যান্য ভক্তগণের সঙ্গে অনন্তনাথও ঊর্ধ্ববাহু হইয়া মুদিত নয়নে বাহ্যজ্ঞানশূন্য অবস্থায় নৃত্য করিতেছেন। শ্রীশ্রী-ঠাকুরের সেই কীর্তনের যুগে অনন্তনাথ কীর্তনের দল লইয়া বহু স্থানে পরিভ্রমণ করিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের সৎ-নাম প্রচার করিয়াছেন। তাঁহার আপনভোলা নৃত্য-ভঙ্গিমা দর্শকমাত্রকেই স্বর্গীয়-ভাবে অনুপ্রাণিত করিয়া তুলিত।

অনন্তনাথের লেখাপড়া অতি সামান্যই ছিল, কিন্তু তিনি ছিলেন অসীম জ্ঞানের ভাণ্ডার। তত্ত্ববিচারে সময়-সময় তাঁহার সেই অপূর্ব জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যাইত। শ্রীশ্রীঠাকুরের পিতৃদেবের শ্রাদ্ধের সময় বিশিষ্ট পণ্ডিতগণের যে মহাসম্মেলন হইয়াছিল তাহাতে অনন্তনাথ যে তত্ত্বালোচনা করিয়াছিলেন তাহাতে তাঁহার অপূর্ব জ্ঞানের ও অদ্ভুত বিচার-শক্তির পরিচয় পাইয়া পণ্ডিত মণ্ডলী অতীব মুগ্ধ হইয়াছিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুরের শিষ্যবর্গ নানা প্রশ্নের মীমাংসার জন্য শ্রীশ্রীঠাকুরের চরণে মাঝে মাঝে যে সকল পত্রাদি লিখিতেন, শ্রীশ্রীঠাকুরের আদেশ ও উপদেশ মত অনন্তনাথ

তাহার উত্তর দিতেন। এই সকল পত্রের কতকগুলি সংগ্রহ করিয়া ১৩৩৩ বঙ্গাব্দের ৩০শে ভাদ্র 'সান্ত্বনা'-নামে পুস্তকাকারে প্রকাশ করা হইয়াছিল। সাধন-সংক্রান্ত নানা প্রকার উপদেশ ব্যতীত অনেক জটিল তত্ত্বের সহজ মীমাংসা পত্রগুলির মধ্যে পাওয়া যায়। পত্রগুলি বাস্তবিকই জ্ঞান ও ভক্তিতত্ত্বের মন্দাকিনী প্রবাহ—ভাবের গভীরতায় এবং ভাষায় মিষ্টতায় বড়ই উপাদেয়। 'সান্ত্বনা' পাঠ করিয়া তৎকালে কত জনে যে সান্ত্বনা লাভ করিয়াছেন তাহার সংখ্যা করা যায় না। পুস্তকখানি তৎকালীন বহু সাময়িক পত্রের উচ্চ প্রশংসা লাভ করিয়াছিল। আমরা এখানে তদানীন্তন সর্বশ্রেষ্ঠ মাসিক পত্রিকা 'প্রবাসী'র মন্তব্যটি উদ্ধৃত করিতেছি। 'প্রবাসী' লিখিতেছেন,—"* * * এই পত্রগুলিতে লেখকের জ্ঞান, ভক্তি ও কাব্যশক্তির যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। ধর্মার্থ-বিষয়ক পত্রগুলির মধ্যে সাহিত্যেরও অনেক উপাদান আছে।" সৎসঙ্গের সমকালীন মুখপত্রে অনন্তনাথের লিখিত যে সকল মূল্যবান প্রবন্ধ মাঝে মাঝে প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতেও তাঁহার গভীর তত্ত্বজ্ঞানের অতি সুন্দর পরিচয় পাওয়া যায়।

অনন্তনাথ ১৩৪১ বঙ্গাব্দের ২৯শে মাঘ মাত্র ৪৮ বৎসর বয়সে আশ্রমবাসী ও নানা দেশবাসী শ্রীশ্রীঠাকুরের শিষ্যবর্গ আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সবাইকে মহাশোক-সাগরে ভাসাইয়া ইহলীলা সংবরণ করেন। অনন্তনাথ ছিলেন শ্রীশ্রীঠাকুরের অন্তরঙ্গ সখা, অবাল্য তাঁরই লীলা-সহচর—সবারই প্রাণের একান্ত আপনজন। স্বীয় জীবনে ইষ্টনিষ্ঠার যে জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত তিনি রাখিয়া গিয়াছেন তাহা অতুলনীয়। আজীবন শ্রীশ্রীঠাকুরের সঙ্গ করিয়া অনন্তনাথ বিশেষভাবে ইহাই উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে,—আর কোনও সাধনাই সাধনা নহে, ইষ্টের প্রতি অবিচ্ছিন্ন ভালবাসাই চরম সাধনা, আর এই ভালবাসার টানে কর্মের ভিতর দিয়া প্রিয়তমকে তৃপ্তি দিবার এক-একটা সাফল্যের আনন্দই মানুষের জীবনে সত্যিকারের প্রাপ্তি বা ভোগ—যাহার তুলনায় স্বর্গের কাল্পনিক সুখ নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। অনন্তনাথ যত দিন বাঁচিয়াছিলেন সকলকে এই উপদেশই দিতেন এবং মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তেও পার্শ্বস্থ শুশ্রূষাকারিগণকে বলিয়া গেলেন,—"ভালমন্দ এ জীবনে অনেক কিছুই করলাম। তোরা যত পারিস প্রাণপণে শ্রীশ্রীঠাকুরের ইচ্ছা পূর্ণ করিস, মানুষের জীবনে ইষ্টপ্রতিষ্ঠা ছাড়া কর্তব্য আর কিছুই নাই।"

অনন্তনাথের তিরোধানে পরমপ্রেমময় শ্রীশ্রীঠাকুর এবং তাঁহার গুণমুগ্ধ অগণিত ইষ্টভ্রাতা যে কি মর্মন্তুদ ব্যথা অনুভব করিয়াছিলেন তাহা বলিবার নয়! তাঁহার প্রতি স্বত-উৎসারিত প্রীতির উপহার লইয়া সে-সময়ে নানা পত্র-পত্রিকায় বহু কবিতা, প্রবন্ধ ও পত্রাবলী প্রকাশিত হইয়াছিল। তাঁহার প্রথম স্মৃতিবার্ষিকী উপলক্ষে শিষ্যগণের উদ্দেশে লিখিত পরম দয়াল শ্রীশ্রীঠাকুরের কথা-কয়টিই শুধু নিম্নে উৎকলিত করিয়া আমরা বর্তমান প্রসঙ্গের সমাপ্তি করিব।

"রা"

আশিস্‌বর্দ্ধনপরেষু,

এই কাঙাল আমাকে—

প্রথমেই যারা গ্রহণ করেছিল, তারা মাত্রই ছিল দুই জন। সে এক জন আমার কৈশোরের ছিল খেলার সাথী—আমার অনন্ত মহারাজ—আর এক জন—কিশোরীমোহন দাস।

এক জনই মাত্র আছে—আর এক জন—সে চ'লে গেছে—এই দুনিয়ার মানুষের স্থূল দৃষ্টির অন্তরালে—বিরহ ও বেদনার ঢেউয়ে পারিপার্শ্বিক সব অন্তর হলদল ক'রে—

সেদিন এই তো এল—ওই আসে—সেই ২৯শে মাঘ—যেদিন আমার পায়ের তলা থেকে লহমায় দুনিয়াটা যেন সরে গিয়েছিল, আকাশটা হ'য়ে গিয়েছিল নীলহারা ফাঁকা—

ঐ দিনে কি কেউ ভাই তোরা—তার স্মৃতির আগুন জ্বালিয়ে—সেই তার স্মৃতিতর্পণ ক'রে শ্রদ্ধার দানে এই পারিপার্শ্বিককে তৃপ্ত ক'রে তার এই আমার আগুনে-ছোঁয়া প্রাণ প্রত্যেক প্রাণে জ্বালিয়ে দিবি না?

কে আছ দরদী! আমার এই ক্ষীণ ডাকে প্রাণের সুরের টানে—চ'লে এস শ্রদ্ধাতর্পণে—যা দিতে সাধ—তাই নিয়ে।

দীন

তোদেরই

'আমি'

সৎসঙ্গ, পাবনা

১৮ই মাঘ, ১৩৪২ সন



শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র

শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র

প্রথম খণ্ড

ব্রজগোপাল দত্তরায় এম. এ., বি. এল.

তপোবন প্রকাশন
৩৩, কলেজ রো ✪ কলিকাতা-৭০০০০৯

সম্পাদনায় ঃ
রজতবরণ দত্তরায় এম. এ., কাব্যতীর্থ
অধ্যক্ষ, বারাসাত গভর্ণমেন্ট কলেজ

প্রকাশনায় ঃ
শ্রীমতী মায়া ভক্ত
তপোবন প্রকাশন
৩৩, কলেজ রো
কলিকাতা—৭০০০০৯

প্রথম প্রকাশ ঃ
আষাঢ় সংক্রান্তি, ১৩৪৬ বঙ্গাব্দ
(১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দ)
সৎসঙ্গ, হিমাইতপুর,
পাবনা, বাংলাদেশ।

ব্যবস্থাপনায় ঃ
শ্রীনিতাইচন্দ্র ভক্ত
৩৩, কলেজ রো
কলিকাতা ৭০০০০৯

দ্বিতীয় প্রকাশ ঃ
(পরিবর্ধিত অভিনব সংস্করণ)
প্রথম খণ্ড
তালনবমী, ৬ই আশ্বিন, ১৩৭৩ বঙ্গাব্দ
(২৩ সেপ্টেম্বর, ১৯৬৬ খ্রীষ্টাব্দ)
সৎসঙ্গ, বৈদ্যনাথ-দেওঘর,
সাঁওতাল পরগণা, বিহার।

প্রচ্ছদ রচনায় ঃ
শ্রীহরেশ্বর কাহালি

মূল্য—পঁয়তাল্লিশ টাকা মাত্র

মুদ্রণকার্যে ঃ
শ্রীমদনচন্দ্র প্রধান
সারদামাতা প্রেস
১৬ সিমলা স্ট্রীট,
কলিকাতা—৭০০০০৬

তৃতীয় প্রকাশ ঃ
(পরিবর্ধিত রাজ সংস্করণ)
প্রথম খণ্ড
২১ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৯১ বঙ্গাব্দ
(৪ জুন, ১৯৮৪ খ্রীষ্টাব্দ)
কলিকাতা, পশ্চিমবঙ্গ।

সত্তা সচ্চিদানন্দময়—
অসৎনিরোধী স্বতঃই ;
সচ্চিদানন্দের পরিপোষক যা' তা'ই ধর্ম,
ধর্ম মূর্ত্ত হয় আদর্শে,
আদর্শে দীক্ষা আনে অনুরাগ,
অনুরাগ আনে বৃত্তিনিয়ন্ত্রণ,
বৃত্তিনিয়ন্ত্রণ আনে ধৃতি,
ধৃতি আনে সহানুভূতি,
সহানুভূতি আনে সংহতি,
সংহতি আনে শক্তি,
শক্তি আনে সম্বর্দ্ধনা ;
আর, এই ধৃতি আনে প্রণিধান,
প্রণিধান হ'তেই আসে সমাধি,
আবার, সমাধি হ'তেই আসে কৈবল্য—
তৃষ্ণার একান্ত নির্বাণ—
মহাচেতনসমুত্থান !

শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র

মঙ্গলাচরণ

বেদানামপ্যবেদ্যং যন্মুনীনাং মৌনকারণম্ ।
তত্ত্বং গুহাতমং তদ্ধি বিভাতি যত্র শাশ্বতম্ ॥
অব্যক্তো ব্যক্তবর্ণো যঃ প্রমূর্তো হি নিজেচ্ছয়া ।
কারুণ্যেনাবতীর্ণশ্চ রাজতে মহসাং নিধিঃ ॥
চরমে চরমং যত্র গম্ভীরং বিশ্বমোহনম্ ।
কঠোরং মধুরং কান্তং বিচিত্রভাবভাস্বরম্ ॥
পুরাণং নূতনং নিত্যং রূপং মূর্তমনুত্তমম্ ।
আধানং সর্বরূপাণাং সমাহারমনোহরম্ ॥
সর্ববন্ধবিহীনস্য বন্ধনং লোকমঙ্গলম্ ।
যস্য লোকান্ সমাহর্তুং লীলা লোকোত্তরা পরা ॥
যত্রোদ্ভূতং মহাধাম ধর্মস্য ভূতপোষকম্ ।
জীবজীবনদীপানাং দীপনং ব্যসনং কিল ॥
যস্য স্রবতি দাক্ষিণ্যং সন্ততং শ্বসিতাদপি ।
প্রাণাঃ স্ফুরন্তি হাস্যেন বচসা প্রেক্ষিতেঙ্গিতৈঃ ॥
যমন্বেতি তপো যজ্ঞো বিদ্যাঽবিদ্যা চ শ্রিষ্যতি ।
ভোগস্ত্যাগশ্চ সংযাতি পরমোঽপরমো মুদ্রা ॥
মহার্ণবে সমেতা হি বহবশ্চ সরিদ্বরাঃ ।
তথৈব সঙ্গতা যত্র যোগাঃ সর্বে সমীকৃতাঃ ॥
গেহিনো বর্ণিনো মুক্তাঃ পণ্ডিতাঃ প্রাকৃতাস্তথা ।
মানিনো ভোগিনো ভক্তাঃ কর্মিণঃ কামিনশ্চ বৈ ॥
বহুভাবা মনুষ্যা হি যত্র প্রোতা বিনান্বিতাঃ ।
শোভন্তে সুষমাভাসা সূত্রে মণিগণা ইব ॥
ভেদং ভিনত্তি সাম্যেন সংগ্রহেণ চ বিগ্রহম্ ।
বিভর্তি যো জগৎ কৃৎস্নং নিঘ্নানো ধর্মসংকটম্ ॥
ক্লিশ্নাতি কর্মণঃ পাশং পুষ্ণাতি পাবনীং গতিম্ ।
মুষ্ণাতি যো মলং নিত্যং নিষ্ণাতস্ত্রাণতারণে ॥

প্রপন্নো যমমোঘাত্মা মধুনেব হি মাদ্যতি ।
সুভগানঘকামশ্চ প্রসীদতি ন সীদতি ॥
অকূলে কূলমাপ্নোতি যমাশ্রিত্য ভবাম্বুধৌ ।
অপথে গহনারণ্যে সংসারে লভতে দিশম্ ॥
ভদ্রং ভবতি সর্বস্য সর্বঃ সর্বেণ যুজ্যতে ।
হেয়ং হিত্বা হি ভূমানং যমাসাদ্য প্রপদ্যতে ॥
যোগিভিস্তপসা হন্ত দুরাপং যৎ পরং পদম্ ।
হেলয়া দীয়তে যেন ভক্তিমাত্রপণেন হি ॥
ব্যতীত্য মরণং মর্ত্যো যেন বৈ বিন্দতেঽমৃতম্ ।
সদানুকূলরূপায় তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥
দধানাঃ শ্রীগুরোঃ প্রীতিং কুর্বাণাশ্চামলং ব্রতম্ ।
ভুঞ্জানাশ্চ শ্রিয়ং শ্রেয়ঃ পশ্যেম শরদাং শতম্ ॥
শান্তং ভবতু নশ্চিত্তং শান্তং কর্মাশুভং সদা ।
শান্তিঃ ক্ষরতু নো বাচঃ শান্তির্ভবতু ভূতলে ॥*

---

* গ্রন্থকার-তনয় শ্রীব্রজভূষণ দত্তরায়-কর্তৃক রচিত ।

মঙ্গলাচরণের বঙ্গানুবাদ

যাহা বেদসমূহেরও অবেদ্য এবং মুনিগণের মৌনভাবের হেতু সেই গুহ্যতম শাশ্বত তত্ত্ব যাঁহার মধ্যে ভাস্বর ; (স্বরূপত) অব্যক্ত হইয়াও যিনি নিজ ইচ্ছায় ব্যক্তরূপে প্রকাশিত এবং (জীবকুলের প্রতি) করুণাবশে (এই ধরাধামে) অবতীর্ণ হইয়া তেজঃপুঞ্জের আধাররূপে বিরাজমান ; এই চরম কালে যাঁহার মধ্যে ঘটিয়াছে এক পরম চরম রূপের প্রকাশ—যে রূপ গম্ভীর ও বিশ্বমোহন, যে রূপ কঠোর ও মধুর-সুন্দর, যে রূপ বিচিত্র ভাবচ্ছটায় উদ্ভাস্বর, যে রূপ সনাতন ও পুরাতন হইয়াও চিরনূতন, যে রূপ সকল রূপের সমাহার-সিদ্ধ মনোজ্ঞ আধার ; সর্বপ্রকার বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়াও যাঁহার একমাত্র বন্ধন হইল—লোককল্যাণ ; লোকসংগ্রহের নিমিত্ত যাঁহার লোকোত্তর পরম লীলা ; প্রাণিগণের পোষক যে ধর্ম সেই ধর্মেরই মহৎ আধার যাঁহার মধ্যে উদ্ভূত ; জীবগণের জীবনদীপের দীপনকর্মই যাঁহার ব্যসন ; যাঁহার প্রশ্বাসে দাক্ষিণ্যের নিঃসরণ ; যাঁহার হাস্যে বচনে প্রেক্ষণে ও ইঙ্গিতে জীবনের স্ফুরণ ; তপ ও যজ্ঞ, বিদ্যা ও অবিদ্যা, ত্যাগ ও ভোগ এবং পরধর্ম ও অপর ধর্ম সব কিছুই যাঁহার মধ্যে সংশ্লিষ্ট ও সুসমন্বিত ; মহাসমুদ্রে যেরূপ বড় বড় নদী আসিয়া মিলিত হয়, সেইরূপ সর্বপ্রকার যোগক্রিয়া যাঁহার মধ্যে সম্মিলিত ও সমীকৃত হইয়াছে ; গৃহী ও ব্রহ্মচারী, মূর্খ ও পণ্ডিত এবং সাধারণ লোক, মানী ভোগী ভক্ত কর্মী ও কামী প্রভৃতি বহুভাবযুক্ত বহু মানুষ যাঁহার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে সংযুক্ত ও বিনায়িত হইয়া, সূত্রে গ্রথিত বিচিত্র মণিখণ্ডের ন্যায়, সুষমার দীপ্তিতে শোভমান ; যিনি সাম্যের দ্বারা বিভেদকে এবং সংগ্রহের দ্বারা বিগ্রহকে বিদীর্ণ করেন ; ধর্মের সংকট বিনাশ করিয়া যিনি কর্মবন্ধন ছিন্ন করেন ; পাবনী গতির যিনি পোষক ; মালিন্যের অপহর্তা যিনি ; ত্রাণ ও তারণকর্মে যিনি সুদক্ষ ; যাঁহার শরণাপন্ন হইলে মানুষের আত্মা ধন্য হয় এবং মানুষ যেন মধুপানে মত্ত হইয়া ওঠে এবং সুন্দর ও পবিত্র কামনাযুক্ত হইয়া প্রসন্নতা লাভ করে—(কখনো) অবসাদগ্রস্ত হয় না ; যাঁহাকে আশ্রয় করিয়া মানুষ অকূল ভবসাগরে কূলের নিশানা পায় এবং সংসাররূপ পথহীন গহন অরণ্যে সন্ধান পায় ; যাঁহাকে গ্রহণ করিলে সকলের কল্যাণ হয়, সকলে সকলের সঙ্গে যুক্ত হয়, হেয় পদার্থ পরিত্যাগ

করিয়া বৃহত্বকে লাভ করে ; যে পরম পদ যোগিগণেরও তপস্যায় সুলভ নহে সেই পদ যিনি সামান্য ভক্তির মূল্যে হেলায় প্রদান করেন ; যাঁহার দ্বারা মর্ত্যবাসী মরণকে অতিক্রম করিয়া অমৃতলাভ করে;—সর্বদা অনুকূল যাঁহার স্বরূপ সেই শ্রীগুরুকে নমস্কার করি। শ্রীগুরুর প্রীতি-সম্পাদনে ও পবিত্র ব্রত পালনে ব্যাপৃত থাকিয়া এবং শ্রী ও শ্রেয়ঃ সম্ভোগে নিরন্তর হইয়া আমরা যেন শত বর্ষ যাবৎ বাঁচিয়া থাকি। আমাদের চিত্ত শান্ত হউক, আমাদের অশুভ কর্ম শান্ত হউক, আমাদের বাক্ হইতে শান্তি ক্ষরিত হউক, ধরাতলে শান্তির আবির্ভাব হউক।

---

* মঙ্গলাচরণ ও তাহার বঙ্গানুবাদ গ্রন্থকার-জনক রজতবরণ দত্তরায় কর্ত্তৃক রচিত।

উৎসর্গ

'মা'

হে আমার জীবন-সর্বস্ব প্রিয়পরম!

এ ধরাধামে যাঁহাকে তুমি

তোমারই জীবত্ব বলিয়া মনে করিতে,

যাঁহাকে ছাড়া তোমার অস্তিত্ব

কল্পনায়ও ভাবিতে পারিতে না,

যিনি ছিলেন তোমার

'সব আরাধনার প্রতীক,

সব আশার উৎস,

সব কামনার বিশ্রাম,

সব ব্যথার শান্তি-প্রলেপ',

যাঁহাকে হারাইয়া সব-কিছু থাকিতেও

এ দুনিয়ায় আজ তুমি সর্বহারা কাঙ্গাল,

আমাদের সেই পরমারাধ্যা পুণ্যবতী

মহামহিমময়ী জননীদেবী মনোমোহিনীর

পবিত্র স্মৃতির উদ্দেশ্যে আজ তোমার

এই চরিত-কথা উৎসর্গ করিলাম।

সৎসঙ্গ, পাবনা — শ্রীচরণাশ্রিত দীন সেবক

আষাঢ় সংক্রান্তি, ১৩৪৬ — ব্রজগোপাল

'মা'

স্মৃতিতর্পণ

স্বর্গগতা সহধর্মিণী প্রিয়মলতা দেবীর* উদ্দেশে

মাতৃহারা পিতৃহারা এ অভাগা আমার যৌবন-প্রভাতে তুমি এসে দাঁড়িয়েছিলে পাশে। সেই থেকে জীবন-পথে কতই না পেলাম তোমার কাছে। কি যে পাইনি, তাই তো ভেবে পাইনি কোনও দিন। আজ তুমি বহু দূরে। অন্তরের অন্তঃপুরে তোমার স্মৃতির বীণা বেজে ওঠে কত সুরে!

বিবাহের অনতিকাল মধ্যেই পরমপ্রেমময় শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীচরণাশ্রয় লাভের পরম সৌভাগ্যে ধন্য হলাম কৃতার্থ হলাম আমরা। অনুপম রূপলাবণ্য নিয়ে তুমি তখন ভরাযৌবনে পা দিয়েছ। তোমার পিতৃকুলের, তোমার শ্বশুর-কুলের, তোমার স্বজন-পরিজনের বিত্ত-বৈভব, মান-মর্যাদার পরিপূর্ণ সম্ভার তখন তোমার চারিপাশে। এমনই সময়, কত জন্মের কত পুণ্যফলে, ইষ্টদেবের আমোঘ দিব্য আকর্ষণে, সকল ঐহিক সুখে জলাঞ্জলি দিয়ে, কুলবধূ তুমি সন্ন্যাসিনীর বেশে স্তন্যপোষ্য একমাত্র শিশু পুত্রটিকে কোলে ক'রে ছুটে চললে কোন্ অজানা সুদূরে—তাঁরই শ্রীচরণোদ্দেশে। তদবধি তাঁকে কেন্দ্র ক'রে আরম্ভ হ'লো তোমার দুশ্চর তপস্যার জীবন। স্বামীর কাছে পাওয়ার আশা সেই থেকে একদম ছেড়ে দিয়ে, স্বামীকে শুধু দেবার নেশাতেই মাতাল হ'য়ে নিজেকে উৎসর্গ করলে তুমি ধর্মক্ষেত্রে—কর্মক্ষেত্রে। পরিজনের গঞ্জনা, স্বজনের উপেক্ষার যাতনা, ব্যাধির যন্ত্রণা, দারিদ্র্যের তাড়না—দুর্বার দুর্দৈবের কত আঘাতই না এল তোমার জীবনে? শ্রীগুরুর কৃপা সম্বল ক'রে সকল ঝড়-ঝঞ্ঝার মধ্য দিয়ে তুমি শুধু এগিয়ে চললে আপন লক্ষ্যের দিকে, ধৈর্য ও তিতিক্ষায় অটল হ'য়ে কল্যাণ-চেতনা ও কর্মনিপুণতার সার্থক বিনিয়োগে। সেবায় যত্নে, পরিচর্যায় সাহচর্যে নিত্য তুষ্টি ও পুষ্টির যোগান দিয়ে পতি ও পুত্রকে ব'য়ে নিয়ে চললে তুমি মহান্ আদর্শের ক্রমাধিগমনের পথে। আযৌবন তোমার জীবনের এই ক্লান্তিহীন মহতী মঙ্গল-সাধনার সুদীর্ঘ ইতিহাস সত্যই এক ভীষণ অগ্নিপরীক্ষার রোমাঞ্চকর কাব্য! লোকলোচনের অগোচর তোমার সে তীব্র কঠোর জীবন-সংগ্রামের সংবাদ কয়জনে আর রাখে! আমিই কি পেরেছি তার সবটুকু উপলব্ধি করতে!

শ্রীশ্রীগুরুদেবকে বরণ করেছিলে তুমি তোমার সবটুকু সত্তা দিয়ে। তাই ধ্যানে ধারণায়, বাক্যে ব্যবহারে, চলনে চরিত্রে, আচারে ও আচরণে—জীবনের প্রতিক্ষেত্রে

---

*শ্রীশ্রীঠাকুর-প্রসঙ্গে স্বর্গগতার রচিত 'পুরোহিত স্মৃতি'-শীর্ষক একটি নিবন্ধ পরিশিষ্টে উদ্ধৃত করা হইল।

প্রতিটি পদক্ষেপে তোমার আত্ম-বিনায়নের, তোমার ইষ্টানুশীলনের যোগাভ্যাস ক্লান্তিহীন নিবিড় বিক্রমে মূর্ত হয়েছে—দেখেছি আমি। তাই তো দেখেছি, কি ঠাকুর-দেবতার পূজার্চনায়, কি স্বামী-পুত্রের সেবাশুশ্রূষায়, কি অতিথি-অভ্যাগতের আদর-আপ্যায়নায়, কি প্রতিবেশি-পারিপার্শ্বিকের সমবেদনী সহযোগিতায়, কি গৃহকর্মের নিপুণতায়, কি শিল্পকলার দক্ষতায়, কি দেহমনের শুচিতায়, কি বেশভূষার সুরুচিশালীনতায়—জীবনযাত্রার গুরু-লঘু ছোট-বড় সকল ব্যাপারে ইষ্টরাগরঞ্জিত তোমার সহজ প্রকাশটি অনবদ্য সুষমায় অম্লান অভিব্যক্ত রয়েছে চিরদিন !

সেই তাঁরই কাছ থেকে জীবন নিয়ে এসে, এ ধরায় তাঁরই সঙ্গে থেকে, তাঁরই স্মরণে, মননে ও অনুশাসনে চ'লে, এ সংসারে তাঁরই পূজার অর্ঘ সাজিয়ে, অবশেষে সারা জীবনের সর্ব কর্মফল তাঁরই শ্রীপদে অঞ্জলি দিয়ে ভববন্ধন-মুক্ত হ'য়ে, আজ তুমি আবার ফিরে গিয়েছ তাঁরই শাশ্বত শান্তির আশ্রয়ে। সাধন-ভজনহীন মর্তের এ দীন অভাজন আমি কি দিয়ে তোমার মহতী পুণ্যস্মৃতির তর্পণ করব ?

পরমদয়াল শ্রীশ্রীঠাকুরই ছিলেন এ দুনিয়ায় তোমার প্রিয়পরম, পরম শরণ। তাঁর পুণ্যনাম বহু জনের মধ্যে বিলিয়ে দেবার জন্য জীবনভর তোমার ছিল কত না আকুতি, কত না আকুলতা ! তোমারই প্রেরণা তোমারই আরাধনার ফলে "শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র", "শ্রীঅনুকূলচন্দ্র", "বাণীশতক", "আর্যবাদ" প্রভৃতি গ্রন্থনিচয়ের প্রণয়ন ও প্রকাশনা এবং ইষ্টার্থপূরণে আরও কতিপয় পুস্তকের রচনা সম্ভব হয়েছিল এ দীনের জীবনে। বর্তমান চরিতকথাখানিও তোমারই উদ্দীপনা ও অতন্দ্র সেবাসাধনার ফল। এই গ্রন্থের পাণ্ডুলিপিটি সম্পূর্ণ প্রস্তুত থাকা সত্ত্বেও তুমি তা মুদ্রিত দেখে যেতে পারনি। এজন্য কত ব্যথা ছিল তোমার মনে ! আমারও এ দুঃখ রাখার স্থান নেই। এতদিনে তাঁর দয়ায় প্রস্তুত গ্রন্থের প্রথম খণ্ডটির প্রকাশে আমাদের আরব্ধ ইষ্টব্রতের উদ্‌যাপনপর্বের সূচনা হ'ল,—আর তাই দেখে তোমার তৃষাতুর আত্মা আজ তৃপ্ত হবে,—ব্যথাতুর চিত্তে এই আমার একমাত্র সান্ত্বনা।—

সৎসঙ্গ
বৈদ্যনাথ-দেওঘর
তালনবমী, ১৩৭৩

তোমারই তর্পণ-তিয়াসী
তাঁরই দীন সন্তান
ব্রজগোপাল

ভূমিকা

[শ্রীগৌরীনাথ শাস্ত্রী এম. এ., পি. আর. এস., ডি. লিট., এফ. এ. এস.].

॥ শ্রীঃ ॥

ঠাকুর শ্রীঅনুকূলচন্দ্রের ভক্তগণ অনেকবার আমাকে সাদর আমন্ত্রণ জানিয়েছেন দেওঘর আশ্রমে যাবার জন্যে; কিন্তু যাওয়া আমার হয়ে ওঠেনি। শেষে একবার ডাক এলো যার মাধ্যমে তাকে কেমন করে প্রত্যাখ্যান করি! সে জানালো—যাবার একান্ত আগ্রহ, ঠাকুরের ইচ্ছা—আপনাকে যেতে হবে। রাজী না হয়ে পারিনি সেবার। জসিডি স্টেশনে নেমে দেখি আমাকে নিতে এসেছেন রজতবরণের পিতা—যিনি এই অপূর্ব গ্রন্থরত্নের রচয়িতা। সেদিনই আশ্রমে যাবার পথে তাঁর এই গ্রন্থরচনার শুভ সংকল্প শুনেছিলাম। তারপর কয়েক বছর কেটে গেছে। গ্রন্থকারের পারিবারিক জীবনে পরিবর্তন এসেছে অনেক। কিন্তু আনন্দের কথা—লক্ষ্য তাঁর স্থির ছিল বলে আজ এই গ্রন্থখানি লিখিত ও মুদ্রিত হলো। যাঁর জীবনকে আশ্রয় করে এর প্রকাশ তিনি ত অন্যের মাধ্যমে স্বীয় প্রকাশের অপেক্ষা রাখেন না। রসশাস্ত্রে বলে রস ও রসের আস্বাদ একই অভিন্ন বস্তু। তত্ত্বদৃষ্টিতে উভয়ের মধ্যে কোনও প্রভেদ নাই। তেমনি এই গ্রন্থ ও গ্রন্থের যিনি নায়ক এ উভয়ই তত্ত্বের দৃষ্টিতে একই সত্তা। তথাপি ব্যবহারিক জগতে এ দুয়ের প্রয়োজন আছে। তাই একথা বললে অসঙ্গত হবে না যে, এই গ্রন্থমধ্যে শ্রীঠাকুর আত্মপ্রকাশ করেছেন। জীবের জন্যে, সাধারাণ মানুষের জন্যে দ্বৈতভূমিতে অবতরণের প্রয়োজন আছে। তাই অভিনন্দন জানাই এই গ্রন্থের রচয়িতাকে যিনি জনকল্যাণের জন্য রহস্যময় শ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের সত্তাকে এই গ্রন্থের মধ্যে রূপায়িত করার প্রয়াস পেয়েছেন। আর আশীর্বাদ ভিক্ষা করি তাঁর সেই লোকোত্তীর্ণ ভাগবতী সত্তার উদ্দেশে যিনি প্রেরিত করেছেন তাঁর ভক্তকে, শক্তি সংযোজিত করেছেন ভক্তবিগ্রহে, যার ফলে সম্ভব হয়েছে গ্রন্থের প্রকাশ। গ্রন্থকার আজ ধন্য—তিনি আবাল্য যে রসাস্বাদনে আগ্রহশীল তার অভীষ্ট গুরুকৃপাবলে আজ তা অধিগত হল। কিন্তু আমরা

তাঁকে আমাদের অন্তরের সকৌতুক অভিনন্দন, কারণ শ্রীঠাকুর তাঁকে

নিমিত্ত করে এইরূপে আমাদের কাছে প্রকাশিত হোলেন। গ্রন্থকার সাবলীল ভাষায় অন্তর চরিত্রের যে নিখুঁত আলেখ্য অঙ্কন করেছেন তা সম্ভবপর হয় একমাত্র তাঁরই পক্ষে যিনি একাগ্র ও শরণাগত। একাগ্রতা ও শরণাগতি ব্যতিরেকে ভাগবতী কৃপার আস্বাদন ঘটে না। লেখকের রচনা প্রমাণিত করে সংশয়াতীতরূপে যে তিনি সেই দুর্লভ আস্বাদনের অধিকারী। তাই স্তব্ধ বিস্ময়ে সমস্ত গ্রন্থখানি পাঠ করেছি—ভক্তহৃদয়ে ভগবানের প্রকাশভঙ্গিমার অনিতর-সাধারণ সাক্ষ্যরূপে গ্রহণ করে নিজেকে সুরক্ষিত বোধ করছি।

আকাশ-পথে

(দিল্লি থেকে কলকাতা), শ্রীগৌরীনাথ শাস্ত্রী

১০ই সেপ্টেম্বর, ১৯৬৬।

গ্রন্থকারের নিবেদন

বহুকাল পূর্বে, পরমপ্রেমময় শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের জীবন ও ভাবধারা সম্বন্ধে আমি "শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র" এই নামে একখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলাম। গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় ১৩৪৬ বঙ্গাব্দের আষাঢ়-সংক্রান্তি দিবসে। পাঠকবর্গের আগ্রহানুকূল্যে প্রকাশনার অচির-কাল মধ্যেই পুস্তকটির মুদ্রিত সকল সংখ্যাই ফুরাইয়া যায়। তদবধি নানাস্থান হইতে উহার পুনর্মুদ্রণের জন্য বহু অনুরোধ আসিয়াছে। কিন্তু নানা কারণে এতদিন আমি সে কার্য সম্পাদন করিতে পারি নাই। এ জন্য নিরতিশয় দুঃখিত অন্তরে আমি সকলের নিকট ক্ষমাপ্রার্থী।

উল্লিখিত গ্রন্থের পাঁচশতাধিক পৃষ্ঠার অনল্প পরিসরের মধ্যেও আমি শ্রীশ্রী-ঠাকুরের ঘটনাবহুল মহাজীবনের, তাঁহার বিচিত্রমুখী কর্মধারার ও তাঁহার বিশ্বপ্লাবী ভাবরাজির অতি সামান্যই প্রকাশ করিতে পারিয়াছিলাম। তাই তদবধি আমি এই আকাঙ্ক্ষাই নিরন্তর অন্তরে পোষণ করিয়া আসিতেছি,—আমার সাধ্যমত আরও বর্ধিত আকারে ও যথাসম্ভব পূর্ণাঙ্গরূপে তাঁহার অমিয়চরিতকথার একখানি নবীন সংকলন প্রকাশিত করিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করি। আমার এই ঐকান্তিক মনোবাসনার কথা আমি উক্ত গ্রন্থের মুখবন্ধেও প্রকাশ করিয়াছিলাম এবং এই ব্যাপারে আমাকে সাহায্য করিবার জন্য সকলের নিকট প্রার্থনা জানাইয়াছিলাম। পরিকল্পিত গ্রন্থখানা যথাসম্ভব সত্বর পাঠকবর্গের সমীপে উপস্থাপিত করিবার উদ্দেশ্যে আমি যদিও তদবধি অবিরাম যত্নশীল রহিয়াছি, তথাপি দুর্ভাগ্য আমার উপর্যুপরি নানারূপ প্রবল বাধাবিপত্তির তাড়নায় বিপর্যস্ত থাকায়, সংকল্পিত কার্যের বাস্তব রূপায়ণের সুযোগলাভ এতদিন আমার ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে নাই। দুর্দৈবের তুমুল ঝড় যদিও আমার এই বৃদ্ধ বয়সে অদ্যাপি দুর্বার বেগে বহিয়াই চলিয়াছে, তবু ইহারই মধ্যে শ্রীশ্রী-ঠাকুরের অসীম দৈবী প্রেরণা ও অপার করুণা সম্বল করিয়া ক্ষীণ দেহের সীমিত শক্তির ঐকান্তিক বিনিয়োগে যতটুকু যাহা সম্ভব করিয়া তুলিতে পারিয়াছি, তাহারই কিয়দংশের উপহার লইয়া আজ আমি সহৃদয় পাঠক-সমাজের নিকট উপস্থিত হইলাম। বৃহদায়তন বলিয়া সমগ্র গ্রন্থখানা এককালে প্রকাশ করা সম্ভব হইল না।

কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের মাননীয় অধ্যক্ষ সর্বজনবরেণ্য শিক্ষাব্রতী পণ্ডিত-প্রবর শ্রীগৌরীনাথ শাস্ত্রী এম. এ., পি. আর. এস., ডি. লিট., এফ. এ. এস. মহোদয়ের লিখিত ভূমিকাটি দীন গ্রন্থকারের এই ক্ষুদ্র উপহারের গৌরব বিধান করিয়াছে। শ্রদ্ধেয় শাস্ত্রী মহাশয়ের এই সানুগ্রহ সহযোগিতার ঋণ পরিশোধের সামর্থ্য আমার নাই। পরমপিতা তাঁহাকে অখণ্ড সুখ, শান্তি ও সমৃদ্ধির অধিকারী করুন—ইহাই আমার ঐকান্তিক প্রার্থনা।

বর্তমান গ্রন্থের মূল পরিকল্পনা, ইহার রচনা ও প্রকাশনাদি সকল ব্যাপারে আমার আত্মজ কল্যাণীয় শ্রীমান রজতবরণের নিষ্ঠাপূত নিরলস যত্ন ও শ্রম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইষ্টকর্মে সহতপা পুত্রের এই স্বতঃপ্রেরিত সহায়তা পিতা আমার অপরিসীম তৃপ্তি ও আনন্দের কারণ। শ্রীমান সুস্থ শরীরে সুদীর্ঘ-জীবী হইয়া ইষ্টসেবায় তাহার জীবন উত্তরোত্তর সার্থক করিয়া তুলুক—এই কামনা করি।

গ্রন্থস্থ বিষয়বস্তুর সংকলনকার্যে আমি শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবন ও ভাবধারা সম্বন্ধে আমার স্বীয় ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা এবং শ্রীশ্রীঠাকুরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত বিশিষ্ট শিষ্যবর্গের নিকট প্রাপ্ত তথ্যসম্পদের উপরেই বিশেষভাবে নির্ভর করিয়াছি। আমার ব্যক্তিগত অনুরোধে দয়া করিয়া সাড়া দিয়া যাঁহারা শ্রীশ্রী-ঠাকুরের জীবন সম্পর্কে লিখিত ও কথিত বিবরণসম্ভারে এই গ্রন্থের উপকরণ-ভাণ্ডারের উপচয় সাধন করিয়াছেন এবং গ্রন্থের উৎকর্ষ-সম্পাদন প্রভৃতি ব্যাপারে যাঁহারা আমাকে নানাভাবে সাহায্য করিয়াছেন, তাঁহাদের প্রত্যেকের উদ্দেশে আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। শ্রীশ্রীঠাকুরের গ্রন্থরাজি, তাঁহার অন্তরঙ্গ পার্ষদগণের বিরচিত রচনাবলী এবং সৎসঙ্গ-প্রতিষ্ঠানের প্রচারিত মুখপত্রাদির অমূল্য আকর হইতেও আমি বহু উপাদান সংগ্রহ করিয়াছি। এ-সমুদয়ের সংকলয়িতা, রচয়িতা এবং সম্পাদয়িতা সকলের নিকটই আমি অকুণ্ঠচিত্তে অশেষ ঋণ স্বীকার করিতেছি।

শ্রীশ্রীঠাকুরের গোত্রকুল-পরিচয় প্রসঙ্গে আমি 'সম্বন্ধ নির্ণয়াদি' প্রসিদ্ধ কুলজী-গ্রন্থের তথ্যাবলী বিশেষভাবে আলোচনা করিয়াছি। ইহা ছাড়াও, রাজসাহীনিবাসী শ্রদ্ধেয় পণ্ডিত পার্বতীচরণ শর্মা স্মৃতিরত্ন মহাশয়ের সৌজন্যে এবং কাশীধামস্থ 'সত্যলোক'-প্রতিষ্ঠাতা পরম ধার্মিক সত্যচরণ লাহিড়ী মহাশয়ের সংগৃহীত প্রাতঃ-স্মরণীয় যোগিরাজ শ্যামাচরণ লাহিড়ী মহোদয়ের বংশ-তালিকা ও বাণীমন্দির —প্রচার বিভাগ (২৫৯, আপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা) কর্তৃক প্রকাশিত লাহিড়ীবংশ-পত্রিকা প্রভৃতির সাহায্যে শ্রীশ্রীঠাকুরের পিতৃকুলের, এবং পাবনা-

হিমাইতপুর-নিবাসী কাশ্যপগোত্রীয় শ্রদ্ধেয় ডাক্তার বসন্তকুমার চৌধুরী মহাশয়ের সংরক্ষিত বংশাবলীর সাহায্যে শ্রীশ্রীঠাকুরের মাতৃকুলের আনুক্রমিক বিবরণ প্রস্তুত করা সম্ভবপর হইয়াছে। এজন্য উল্লিখিত সকলকে আমার অন্তরের গভীর শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।

গ্রন্থের দশম অধ্যায়ে শ্রীশ্রীঠাকুরের রচিত বলিয়া যে সকল ভক্তিমূলক কবিতা উদ্ধৃত হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে বক্তব্য এই যে, ঐ কবিতাগুলি শ্রীশ্রীঠাকুরের স্বহস্ত-লিখিত কোনও পাণ্ডুলিপি হইতে গৃহীত হয় নাই। পূর্বে ইষ্টপ্রাণ গুরুভ্রাতা অনেকেই তাঁহাদের সংগৃহীত কবিতা ও গানের খাতায় বহু প্রসিদ্ধ লেখকের রচনার সঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুরের রচিত বলিয়া তৎকালে সুপরিচিত অনেক কবিতা সাগ্রহে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিতেন। দশম অধ্যায়ে উৎকলিত কবিতাগুলি উক্ত সংগ্রহেরই অন্তর্ভুক্ত।

শ্রীশ্রীঠাকুরের জ্যেষ্ঠ আত্মজ সৎসঙ্গ-প্রতিষ্ঠানের পরিচালক কল্যাণপ্রতীক শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, সৎসঙ্গের বর্তমান সভাপতি শ্রদ্ধেয় শ্রীসুশীলচন্দ্র বসু বি.এ., সৎসঙ্গের মুখপত্র 'আলোচনা' পত্রিকার সম্পাদক ইষ্টব্রত শ্রীপ্রফুল্লকুমার দাস এম. এ., ইষ্টযোগী শ্রীননীগোপাল চক্রবর্তী এম.এ. ও শ্রীধীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী বি.এ.—ইঁহারা প্রত্যেকে গ্রন্থের সমগ্র পাণ্ডুলিপিটির পরীক্ষণকার্য বিশেষ যত্ন সহকারে সম্পাদন করিয়া দিয়াছেন এবং বহু মূল্যবান উপদেশ দানে আমাকে অশেষ উপকৃত করিয়াছেন। এজন্য এই সকল গুরুভ্রাতা প্রত্যেকের নিকট আমি চিরকৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ রহিলাম।

'সৎসঙ্গ প্রেস'-এর কর্মাধ্যক্ষ ইষ্টভ্রাতা শ্রীঅমূল্যকুমার ঘোষ এবং তাঁহার সহকারিবৃন্দের আগ্রহদীপ্ত তৎপরতায় এই গ্রন্থের মুদ্রণ ও বাঁধাই অতীব দক্ষতা ও সুষ্ঠু ক্ষিপ্রতার সহিত সম্পন্ন হইয়াছে। গ্রন্থস্থ চিত্রসমূহের মুদ্রণব্যাপারে শ্রীশ্রীঠাকুরের দ্বিতীয় পুত্র মঙ্গলপ্রতিম শ্রীবিবেকরঞ্জন চক্রবর্তী, ইষ্টপ্রাণ গুরুভ্রাতা শ্রীগুরুদাস সিংহ ও শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র ঘটক এবং 'সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউস'-এর ইষ্ট-প্রেমিক কর্মিবৃন্দের আন্তরিক আনুকূল্য সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। গ্রন্থের 'প্রুফ'-সংশোধন-কার্যে ইষ্টভ্রাতা শ্রীকুমারকৃষ্ণ ভট্টাচার্য আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন। এই অবসরে ইঁহাদের সকলকে আমি সানন্দ ধন্যবাদ জানাইতেছি।

জীবনচরিত রচনায় সত্যের অপ্রকাশ বা অতিরঞ্জন ও অসৎকল্পনাবিলাস বর্জনীয়—এই নীতি স্মরণে রাখিয়া আমি উপস্থিত গ্রন্থে বস্তুগত যাথাতথ্য ও ভাবগত সত্য রক্ষায় যথাশক্তি যত্ন অবলম্বন করিয়াছি। এতৎসত্ত্বেও, অজ্ঞতা ও অসতর্কতা এবং অন্যান্য কারণে গ্রন্থের যেখানে যে ত্রুটি-বিচ্যুতি ও অসম্পূর্ণতা

রহিয়া গেল, সুধী পাঠকবর্গ অনুগ্রহপূর্বক সে-বিষয়ে আমাকে অবহিত করাইবেন, এবং গ্রন্থের ভবিষ্যৎ সংস্করণের উৎকর্ষ ও পুষ্টি বিধানে শুভার্থী প্রত্যেকেই নিজ-নিজ অভিমত ও তথ্য-সম্পদের সানুগ্রহ উপায়নে আমাকে উপকৃত করিবেন, ইহাই কামনা করি।

এই পুস্তক পাঠে যদি একটি প্রাণও শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রেমপারাবার মহান প্রাণের স্পর্শলাভে সঞ্জীবিত ও উদ্বুদ্ধ হইয়া ওঠে, আমার এই দীন উপহার ধন্য হইবে।

সৎসঙ্গ, বৈদ্যনাথ-দেওঘর
তাপনবমী, ৬ই আশ্বিন, বঙ্গাব্দ ১৩৭৩,
২৩শে সেপ্টেম্বর, খৃষ্টাব্দ ১৯৬৬।

বিনীত
গ্রন্থকার

সম্পাদকের নিবেদন

পঁয়তাল্লিশ বছর আগের কথা। পাবনা হিমাইতপুর আশ্রম থেকে প্রকাশিত হল মদীয় পিতৃদেব ব্রজগোপাল দত্তরায় বিরচিত শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবনচরিত—৫১৪ পৃষ্ঠায় এগারটি পরিশিষ্টসমেত তেরটি অধ্যায়ে পঁয়তাল্লিশটি চিত্রসম্বলিত বৃহৎ গ্রন্থ—"শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র"। তখন শ্রীশ্রীঠাকুরের বয়স পঞ্চাশ বছর। মঙ্গলমূর্তি শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের মহাজীবন লক্ষ লক্ষ মানুষের ব্যক্তিজীবনে ও তদানীন্তন মনুষ্যসমাজে সে যুগে এক লোকোত্তর বৈপ্লবিক উত্তরণের অবতারণা করেছিল, অবুতাবিচিত্র-চরিত্র এক অভূতপূর্ব সহনীয় সুতাৎপর্যে। সুমহান এই জীবন ও তার সুগম্ভীর গতিপ্রকৃতি ও বিশাল বিস্তার পর্যাপ্তরূপে প্রকাশ করা অসাধ্য হলেও, তাকে অন্তত যথার্থ অবিকৃতরূপে পাঠক বর্গের মধ্যে পরিবেষণের ঐকান্তিক আগ্রহ থেকেই এই জীবনীগ্রন্থের রচনা ও প্রকাশ। সেকালে দেশে দেশে ঘরে ঘরে এই জীবনীগ্রন্থটি শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবন ও জীবনধর্মের আলোচনা ও অর্চনার পথ সহজ সুগম ও উপভোগ্য করে তুলেছিল সকলের কাছে। গলদ ও গোজামিলমুক্ত দীপ্ত জীবনধর্মে মানুষকে দীক্ষিত শিক্ষিত ও সিদ্ধ করে তোলাই যাঁর আজন্ম জীবনসাধনা তিনিই শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র। তাঁকে প্রকৃতরূপে জনসমাজে উপস্থাপন করাই ছিল এই জীবনীগ্রন্থের উদ্দেশ্য। সিদ্ধাই-বিভূতিমণ্ডিত একজন অলৌকিকশক্তিধর তথাকথিত ধর্মগুরুরূপে ভীরু মানুষের কাছে শ্রীশ্রীঠাকুরকে প্রচারের প্রবণতা এই গ্রন্থে নেই। বোধ হয় এই কারণেই গ্রন্থটি প্রকাশিত হবার পর শ্রীশ্রীঠাকুর একদিন কথাপ্রসঙ্গে অত্যন্ত আহ্লাদের সুরে বলেছিলেন—"ব্রজগোপালদা আমারে বাঁচাইছে।"

শ্রীশ্রীঠাকুরের আশীর্বাদে এবং শত শত পাঠকের অভিনন্দনে যদিচ ধন্য হল এই গ্রন্থের প্রকাশ, তবু, অনন্ত তৃপ্তির সঙ্গে, প্রণেতার প্রাণে অনির্বাণ এক অতৃপ্তির শিখা জ্বলছিল তখন থেকেই। জীবনী গ্রন্থটির মধ্যে যে মহাজীবনের আলেখ্য নির্মাণের চেষ্টা করা হয়েছে, তার মাত্রা ও মহত্ত্বের একটি বৃহৎ অংশই গ্রন্থে স্থাপন করা সম্ভব হয় নি। এই ভেবে আরও বড় করে একটি জীবনীগ্রন্থ রচনার আকাঙ্ক্ষায় পিতৃদেব ব্যাকুল হয়ে উঠলেন এবং অবিলম্বে সেই আকাঙ্ক্ষা-পূরণে দুশ্চর কর্মযজ্ঞে ব্রতী হলেন। নানা দুঃখকষ্ট বিপদ-আপদ ঘটনা-দুর্ঘটনার মধ্য দিয়েও তাঁর এই প্রচেষ্টা চলতে থাকে অবিরাম বেগে। সাতটি

খণ্ডে এই গ্রন্থ রচনার পরিকল্পনা করা হয়। সেই পরিকল্পনার প্রথম ফলশ্রুতি—১৯৬৬ খ্রীষ্টাব্দে বৈদ্যনাথ-দেওঘর থেকে প্রথম খণ্ডের প্রকাশ। আগের জীবনীর প্রথম বাহান্ন পৃষ্ঠার বিষয়বস্তু পরিবর্তিত আকারে এই প্রথম খণ্ডের ৫৩৩ পৃষ্ঠার অবকাশে নূতন ভাবে পরিবেষণ করা হয়। অনুরূপভাবে অন্যান্য খণ্ডের জন্যও আয়োজন উদ্যোগ চলতে থাকে বিপুল উৎসাহে।

১৯৬৫ সালে মদীয় জননীদেবীর পরলোকগমনের পর পিতৃদেব একাই বৈদ্যনাথ-দেওঘর ধামে সৎসঙ্গের 'হুসেনী লজ'-নামক গৃহের একাংশে অবস্থান করেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের আদেশে তিনি তখন সৎসঙ্গ তপোবন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের কাজে নিযুক্ত। বিদ্যালয়ের কাজের সঙ্গে সঙ্গে পিতৃদেব জীবনীগ্রন্থের উপকরণ সংগ্রহ, সংগৃহীত উপকরণসম্ভারের বিন্যাস ও পরিবেষণ ইত্যাদি কাজও চালিয়ে যেতে থাকেন। এই ভাবে কয়েক বৎসরের অক্লান্ত পরিশ্রমে পরিকল্পিত জীবনী-গ্রন্থটি যখন ক্রমশ একটি নির্দিষ্ট রূপ পরিগ্রহ করতে সুরু করেছে, তখন ঘটলো একটি বিশেষ ঘটনা। ১৯৬৮ খ্রীষ্টাব্দের শেষ ভাগে হঠাৎ একদিন শ্রীশ্রীঠাকুর অত্যন্ত ব্যাকুলভাবে পিতৃদেবকে আদেশ করলেন—জননী শ্রীশ্রীমনোমোহিনীদেবীর জীবনচরিত রচনার জন্য। আদেশ শ্রবণমাত্র পিতৃদেব নির্দ্বিধায় সেই কাজে আত্মনিয়োগ করেন। ফলে শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবনচরিত রচনার কাজ বন্ধ থাকে। ১৯৬৯ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারীতে শ্রীশ্রীঠাকুরের মহাপ্রয়াণের পর পিতৃদেব আর মাত্র তিন বৎসর জীবিত ছিলেন। ঐ সময়মধ্যে চরম শারীরিক অপটুতাসত্ত্বেও এবং দুর্যোগবিপত্তির মধ্যেও তিনি তাঁর কাজে অবিচল ছিলেন এবং জীবনাবসানের পূর্বেই শ্রীশ্রীজননীদেবীর জীবনচরিত রচনার কাজ সম্পূর্ণ করেন। এজন্য তিনি যে অশেষ তৃপ্তির অধিকারী হয়েছিলেন তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু শ্রীশ্রীঠাকুরের পরিকল্পিত জীবনীগ্রন্থটি তখনো সম্পূর্ণ করতে না পারায় তাঁর অন্তরে উৎকণ্ঠার অন্ত ছিল না। মৃত্যুর মাত্র কয়েকদিন পূর্বে তিনি আমার পূজনীয় শ্বশুরমহাশয় ৺চন্দ্রনাথ বৈদ্য মহাশয়কে ডেকে বলেছিলেন—"আমরা যদি ঠাকুরের কথা বলে যেতে না পারি, পৃথিবীর লোক আর তাঁকে জানতে পাবে না। আপনারা আছেন। আমার পরিকল্পনা রজতের কাছে রইলো। দেখবেন কি করা যায়।"

১৯৭২ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই জানুয়ারী পিতৃদেব পরলোক গমন করেন। তাঁর লেখা জননী শ্রীশ্রীমনোমোহিনী দেবীর জীবনচরিত, এবং শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবনচরিতসংক্রান্ত পরিকল্পনা ও উপকরণাদি তদবধি আমার কাছে। নানা অনিবার্য কারণে সেই অমূল্য রচনাবলীর প্রকাশ এতদিন সম্ভবপর হয় নি।

অবশেষে সেদিন পরমপ্রীতিভাজন গুরুভ্রাতা, কলকাতার 'প্রোগ্রেসিভ বুক ফোরামে'র স্বত্বাধিকারী শ্রীনিতাইচন্দ্র ভক্ত এই কাজে নিজেই এগিয়ে আসেন। তাঁরই অম্লান আগ্রহে ও উদ্যমে তাঁরই ব্যবস্থাপনায় শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র এবং পুরুষোত্তমজননী শ্রীশ্রীমনোমোহিনী দেবী এই দুখানা গ্রন্থ আজ মুক্তির পথে। পরমদয়াল শ্রীশ্রীঠাকুরের অশেষ কৃপাবলেই এটা সম্ভব হয়েছে বলে মনে করি।

শ্রীযুক্ত ভক্তের সঙ্গে আলোচনাক্রমে শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবনীগ্রন্থটি মাত্র দুটি খণ্ডে প্রকাশের ব্যবস্থা করা হয়েছে। প্রথম খণ্ডটি আগের চেয়ে আরও একটু বড় করে এবং অবশিষ্ট উপকরণরাজি আর মাত্র একটি খণ্ডে সাজিয়ে গুছিয়ে এবং দরকার মত নতুন কিছু লেখাও তৈরী করে দিতে হবে। এ দায়িত্বের ভার স্বভাবতই আমাকেই নিতে হয়েছে। এই কাজে আমার গুরুপূজো, পিতৃপূজো এবং ভ্রাতৃপূজো—এই ত্রিবিধ পূজোই অনুষ্ঠিত হবে। জীবনীগ্রন্থ রচনার সেই প্রথম মুহূর্ত থেকে শেষ দিনটি পর্যন্ত এই কাজে আমি পিতৃদেবের সঙ্গে অন্তরঙ্গভাবে সংযুক্ত ছিলাম। এটিই আমার একমাত্র সৌভাগ্য ও সুযোগ যা সম্বল করে অপরিমিত ব্যক্তিগত দীনতা সত্ত্বেও আমি আনন্দ ও প্রত্যয়ের সঙ্গে আজ এই গ্রন্থের সম্পাদনা কর্মে ব্রতী হয়েছি। এই ব্রত সার্থকভাবে সুনিষ্পাদিত হলে আমি ধন্য হব।

পিতৃদেবের অন্তরাত্মার প্রতিক্ষণের সেই আকুল আর্তিকে প্রতিধ্বনিত করে বলি—লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবনের মধ্যে ছড়িয়ে রয়েছে শ্রীশ্রীঠাকুরের যে বিশাল দিব্য মহাজীবন তাকে তিল তিল করে সংগ্রহ করে একটি সর্বোত্তম সমগ্র জীবনালেখ্যরচনার কাজ সত্যি আজও বাকী রয়ে গেল;—তাঁর গহন জীবনস্বরূপ ও জীবনদর্শনের অনুধ্যান হয়ে রইলো অনন্ত কালের অসমাপ্ত সাধনকর্ম; ব্যষ্টি ও সমষ্টিজীবনের সর্বত্র তাঁরই অভীষ্ট পালনপোষণ ধর্ম রূপায়ণের কর্মযজ্ঞ আজ অনাগত কালের প্রতীক্ষিত মঙ্গলব্রত। পিতৃদেবের এই আর্তির সঙ্গে আজ আমার এই আশাও উচ্চারণ করি—পিতৃদেবের নিবেদিত এই পুণ্য জীবনচরিত, তাঁর ধারণায়, যত সামান্য ও অসম্পূর্ণই হোক না কেন, অসামান্য ও পূর্ণত্বের বিভবগৌরবে শ্রীশ্রীঠাকুরের সুমহান জীবনকে জনগণের সমক্ষে উন্মোচনের প্রেরণা এই গ্রন্থ থেকে অবশ্যই যথাস্থানে সঞ্চারিত হবে।

পরিশেষে এই গ্রন্থের ব্যবস্থাপক, প্রকাশক, মুদ্রাকর, প্রচ্ছদশিল্পী প্রভৃতি সকল সহযোগীকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই। সুধী ও সহৃদয় পাঠকবর্গের কাছে এই প্রার্থনা—আগামী সংস্করণে উপস্থিত গ্রন্থের মার্জন ও শোভাসম্পাদন সম্পর্কে তাঁদের মূল্যবান উপদেশ প্রদান করে তাঁরা যেন আমাকে উপকৃত করেন।

বিনীত

রজতবরণ দত্তরায়

১৬ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৯১ বঙ্গাব্দ
৩০ মে, ১৯৮৪ খৃষ্টাব্দ
অমরাবতী কলোনী
নবপল্লী, বারাসাত
২৪-পরগণা

সূচীপত্র

বিষয়সূচী

চিত্রসূচী

✪ বন্দনা ✪

শরণ লই পরমপিতা পরমেশ্বরের—সেই এক ও অদ্বিতীয়ের।

প্রণাম জানাই সর্বকালের সর্বদেশের ঈশ্বরবার্তাবাহী জীবদরদী মহামানবগণের শ্রীচরণে। শরণ লই তাঁহাদের সত্তা-উৎসারিত উদ্বর্দ্ধনী সেবাযজ্ঞের। বরণ করি তাঁহাদের প্রদর্শিত আপূরয়মাণ বৈশিষ্ট্যপালী সাত্বত জীবনাদর্শ। স্মরণ করি তাঁহাদের তিমির-বিদারী অমোঘ উপদেশাবলী।

প্রলীন প্রণিপাতে প্রণাম জানাই আমার জীবনসর্বস্ব প্রিয়পরম পরমপ্রেমময় শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের শ্রীপাদপদ্মে। শরণ লই তাঁহার প্রজ্ঞাদীপ্ত অমৃতনিষ্যন্দী উচ্ছলিতপ্রেমা ভাগবত জীবনধারার। স্মরণ করি তাঁহার মহাবাণী—

> ব্রহ্ম ভিন্ন আর কেহ উপাস্য নহে, ব্রহ্ম এক ও অদ্বিতীয়।
>
> তথাগত তাঁহার বার্তাবহগণ অভিন্ন।
>
> তথাগতগণের অগ্রণী বর্তমান পুরুষোত্তম পূর্বপূর্বগণের পূরণকারী বিশিষ্টবিশেষবিগ্রহ
>
> তদনুকূলশাসনই অনুসর্তব্য—তদিতর কিছু নহে।
>
> শিষ্টাপ্তবেদপিতৃপরলোকদেবগণ শ্রদ্ধেয়—অপোহ্য নহে।
>
> বর্ণাশ্রমানুগ সদাচার জীবনবর্দ্ধনীয় নিত্যপালনীয়।
>
> বিহিত সবর্ণানুলোমাচার পরমোৎকর্ষহেতু, প্রতিলোমাচার স্বভাব-পরিধ্বংসী।

প্রণাম জানাই মদীয় গোত্রপ্রবর্তক মৌদ্গল্যদেব ও গোত্রবরেণ্য ঔর্ব, চ্যবন, ভার্গব, জামদগ্ন্য আপ্নুবৎ মহর্ষিগণের শ্রীপদারবিন্দে।

প্রণাম জানাই আমার বংশের স্বনামধন্য পুরুষোত্তম দত্ত প্রমুখ প্রাচীন পুরুষবৃন্দের শ্রীপদে।

প্রণাম জানাই আমার পরমপূজনীয় পিতৃদেব জগৎচন্দ্র দত্ত ও পরমারাধ্যা মাতৃদেবী বসন্তময়ীর শ্রীচরণকমলে।

✪ অবতরণিকা ✪

কোলের কচি শিশুটি যখন, মাতৃহারা হইলাম। কৈশোরে বাবাকে হারাইলাম। অভাগা আমাকে আদর করিবার কেউ রহিল না এ দুনিয়ায়। অন্তর মথিত করিয়া একটা ঘনীভূত হাহাকার আমার সমগ্র সত্তাকে আলোড়িত করিতে লাগিল। প্রাণের একটা দুর্বার আকাঙ্ক্ষা, একটা তীব্র বেদনা, একটা বিরাট ক্ষুধা! অফুরন্ত প্রাচুর্যে ভরপুর না হইলে যেন আর বাঁচি না!

দিন যাইতে লাগিল। ছাত্রজীবন সমাপ্ত করিলাম। কালধর্মে সুরু হইল কর্মজীবন। অধ্যাপনা করিলাম, ওকালতী করিলাম, বিবাহ করিলাম, একটি পুত্রসন্তানও জন্মগ্রহণ করিল। সংসার করি কিন্তু শান্তি পাই না। যেদিকে তাকাই, মনে হয় নিঃসীম শূন্যতা।

এদিকে মনের ঈদৃশ অস্বস্থ অবস্থা, তাহাতে পারিপার্শ্বিক সংসার-সমাজের নারকীয় বীভৎস রূপ দেখিতে দেখিতে প্রাণ আরও অতিষ্ঠ হইয়া উঠিল। দেখিলাম—ধর্মে-ধর্মে রেষারেষী, বর্ণে-বর্ণে শ্রেণীতে শ্রেণীতে বিদ্বেষ, দলে-উপদলে কলহ, সম্প্রদায়ে-সম্প্রদায়ে বিরোধ, রাজা-রাজায় দ্বন্দ্ব, রাষ্ট্রে-রাষ্ট্রে সংঘর্ষ লাগিয়াই আছে; প্রবঞ্চনা, প্রতারণা, অপ্রেম, অশ্রদ্ধা সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবেশ করিয়াছে; জীবনের প্রায় সকল ক্ষেত্রেই দুর্বুদ্ধি ও দুর্নীতি উলঙ্গ হইয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছে; প্রেম প্রীতি, শ্রদ্ধা সেবা, স্নেহ মমতা, সাহায্য সহানুভূতি, সহ্য ধৈর্য প্রভৃতি সৎবৃত্তি মানব-মন হইতে যেন বিদায় লইয়াছে! এ-হেন পাপের রাজ্যে শান্তি কোথায়? সুখ কোথায়? এই নিদারুণ বিধ্বস্তির কবল হইতে পরিত্রাণের উপায় কী? দুর্দৈবের দিনে ত্রাণকর্তার আবির্ভাব তো ঘটে! সমস্যার সমাধানের জন্য, পতিতের উদ্ধারের জন্য, ভীত, ব্যথিত ও পীড়িতের রক্ষার জন্য তিনি তো যুগে-যুগে দেহধারণ করিয়া আসেন। সমাজের এই চরম অধঃপতনের কালে—মানুষের এই সংকট-মুহূর্তে পরিত্রাতা কি আবার আসিবেন না? কোথায় তিনি? কোথায় সে দরদী?—এইরূপ নানা চিন্তায়ও আমার অস্বস্থ মন তখন মুহুর্মুহুঃ ব্যাকুল হইয়া উঠিত।

আমাদের বাড়ীতে পূর্বপুরুষের প্রতিষ্ঠিত গৃহদেবতা শালগ্রাম শিলার নিত্য-পূজার্চনা হইত। আমি বাল্যাবধি স্বভাবতই সেই পূজা-কর্মের অতীব অনুরাগী ছিলাম, বিশেষ বাড়ীর দোল-দুর্গোৎসবাদি পূজা-পার্বণানুষ্ঠানে সর্বদাই সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিয়া প্রভূত আনন্দও পাইতাম। কিন্তু আমার আর্ত্ততা—আমার ব্যাকুলতা—তাহার শান্তি কোথায়? ভাবিলাম, দীক্ষাগ্রহণ করতঃ নামধ্যান ও ব্রতপূজাদির অনুষ্ঠানে ব্যাপৃত থাকিয়া মানসিক শান্তিলাভের

চেষ্টা করিব। জানিতাম, দীক্ষাগ্রহণ-ব্যাপারে সদ্‌গুরুর শরণাপন্ন হওয়াই শ্রেষ্ঠ কর্তব্য। কিন্তু কোথায় তাঁহার সন্ধান পাইব। এ-অবস্থায় পরিবারের চিরাচরিত প্রথায় কুলগুরু সকাশেই দীক্ষা লইয়া জীবনপথে যাত্রা সুরু করিব মনঃস্থ করিলাম। দীক্ষাগ্রহণের জন্য বিশেষ শুভদিনের প্রয়োজন হয়। কিন্তু আমার মনের তখন এমনি অবস্থা যে, কাল-বিলম্ব অসহ্য বোধ হইতেছিল। পুজনীয় কুলপুরোহিত মহাশয়ের সঙ্গে আলোচনায় জানিতে পারিলাম, যে-কোন সংক্রান্তি-দিবসেও দীক্ষাগ্রহণের বিধান আছে। তখন শ্রাবণ মাসের মাঝামাঝি। স্থির করিলাম, ঐ শ্রাবণ-সংক্রান্তিতেই এই অবশ্য-করণীয় কর্তব্যটি সমাধা করিব। সে-মতে পুরোহিত মহাশয়কে এই ব্যাপারের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি যথাসম্ভব সত্বর সম্পন্ন করিয়া রাখিবার জন্য সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাইয়া আমি তাড়াতাড়ি নিজ বাটী—ময়মনসিংহ জেলার কিশোরগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত বনগ্রাম হইতে রওনা হইয়া স্বীয় কর্মস্থল ময়মনসিংহ সহরে চলিয়া আসিলাম।

দিনকয়েক পরের ঘটনা। সেদিন শনিবার। 'বারলাইব্রেরী'তে গিয়া দেখিলাম, আমার টেবিলের উপর হাতে-লেখা একখন্ড কাগজ পড়িয়া রহিয়াছে। আমি তাহা হাতে লইয়া অন্যমনস্কভাবে মুচড়াইতে মুচড়াইতে এক সময় নিজেরই অজ্ঞাতসারে নীচে মেজেতে ফেলিয়া দিই। ঘন্টা-দুই পর কোর্টের কাজ সারিয়া আবার ঘরে আসিয়া নিজ আসনে বসিলাম এবং সেই পরিত্যক্ত কাগজটুকু কেন জানি তুলিয়া লইয়া পড়িতে লাগিলাম। উহা পাঠে জানিলাম, সেদিন অপরাহ্ণে স্থানীয় দুর্গাবাড়ীতে এক ধর্মসভা হইবে। বন্ধুবর উকীল শ্রীউমেশচন্দ্র সেন, এম্-এ, বি-এল মহাশয়কে সঙ্গে লইয়া আমি যথাসময়ে উক্ত সভায় গিয়া উপস্থিত হইলাম। ঐ সভায় বক্তা শ্রীত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী মহাশয় ধর্ম-সম্বন্ধে এক দীর্ঘ ভাষণ দিয়াছিলেন। ভাষণে উপস্থাপিত বহু বিষয় শ্রোতৃবৃন্দের অনেকেরই চিরাভ্যস্ত সংস্কারের অনুকূল ছিল না। কিন্তু বক্তার একটি কথা সেদিন আমাকে বিশেষ ভাবাইয়া তুলিয়াছিল। তিনি তাঁহার ভাষণে প্রসঙ্গত "উত্তমো ব্রহ্মসদ্ভাবো ধ্যানভাবস্তু মধ্যমঃ। স্তুতির্জপোহধমোভাবো বাহ্যপুজাধমাধমঃ॥" -এই শাস্ত্রীয় বচনটি উল্লেখ করিয়াছিলেন। ইহাতে আমার মনে কৌতূহল জাগিল, তবে কি বক্তা কোন সদ্‌গুরুর সন্ধান পাইয়াছেন। সভাভঙ্গের পর তাঁহার পরিচয় লইয়া জানিলাম, তিনি শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের প্রতিষ্ঠিত পাবনা-হিমাইতপুর আশ্রমের একজন প্রচারক। তাঁহার সহিত ময়মনসিংহ মুক্তাগাছা উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের তদানীন্তন প্রধান-শিক্ষক শ্রদ্ধেয় শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত বি-এ মহাশয়ও ছিলেন। তিনিও ঐ আশ্রমের একজন বিশিষ্ট শিষ্য। তাঁহার সহিত দীক্ষাগ্রহণ-সম্বন্ধে আমার কিছুকাল বেশ গুরুত্বপূর্ণ নানা আলাপ-আলোচনা হইল। কথাবার্তার শেষে তিনি আমাকে তাঁহাদের ঠাকুর-চরণে দীক্ষাগ্রহণ করিবার অনুরোধ জানাইয়া বলিলেন,—"দেখুন, আমাদের ঠাকুরকে আমরা সদ্‌গুরু বলিয়াই জানি।

তাঁহার চরণে দীক্ষা নিলে আপনার অভীষ্ট অবশ্য সিদ্ধ হইবে, অন্যথা আপনি কিন্তু এই সুবর্ণ সুযোগটি হেলায় হারাইবেন।" তাঁহার কথাটা আমার মনে লাগিল। ভাবিলাম—সত্যই তো, সদ্গুরু লাভের জন্য আমার কতকালের ঐকান্তিক আকাঙ্ক্ষা; ইনি যদি সদ্গুরু হন, আর আমি যদি তাঁহাকে কাছে পাইয়াও গ্রহণ না করি, তবে আমার মতো দুর্ভাগা মূর্খ আর কে আছে। উঁহাদের সহিত কথাপ্রসঙ্গে উক্ত আশ্রমের প্রকাশিত কোন গ্রন্থাদি আছে কিনা জানিতে চাহিলে, তাঁহারা আমাকে 'সত্যানুসরণ', 'অমিয়-বাণী' ও 'পুণ্যপুঁথি'* এই পুস্তক তিনখানি পড়িতে দিলেন।

পরদিন হইতে আমি উক্ত পুস্তক-পাঠে মনোনিবেশ করিলাম। সর্বাগ্রে 'সত্যানুসরণ' পুস্তিকাখানি পড়িতে আরম্ভ করিলাম। ইহার সর্বপ্রথম বাণীটি পাঠ করিবামাত্র আমার হৃদয়তন্ত্রী কি এক অপূর্ব শিহরণে ঝংকৃত হইয়া উঠিল। গীতায় পার্থসারথি যেমন কম্বুকণ্ঠে বলিয়াছেন,—"ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্বল্যং ত্যক্ত্বোত্তিষ্ঠ পরন্তপ", এখানেও সেই কথা—"সর্বপ্রথম আমাদের দুর্বলতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হবে, সাহসী হ'তে হবে, পাপের জ্বলন্ত প্রতিমূর্তি ঐ দুর্বলতা। তাড়াও যত শীঘ্র পার. ঐ রক্তশোষণকারী অবসাদ-উৎপাদক vampire-কে।............।" সমগ্র পুস্তিকাখানি এক নিঃশ্বাসে পড়িয়া ফেলিলাম। ইহার জ্ঞানগর্ভ তেজোদ্দীপ্ত সঞ্জীবনী সুধাপূর্ণ বাণীগুলি পড়িতে পড়িতে আমি আনন্দে বিস্ময়ে আবেগে অভিভূত হইয়া পড়িলাম। 'অমিয়-বাণী'র ভূমিকা এবং ঐ গ্রন্থের প্রতি-পৃষ্ঠায় বক্তার সহজ স্বাভাবিক অবস্থার স্বচ্ছ সাবলীল আলোচনাগুলিও তাঁহার সম্বন্ধে আমার বিশ্বাসকে জাগ্রত করিল। তারপর, পুণ্যপুঁথির সর্বত্র ছড়ানো—"সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ, অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ",—"তোদের আঘাতে আমি জেগে উঠব। সকলকে বল, ভয় নাই, চিন্তা নাই.........অভীরভীরভীঃ",—"ছুটে আয়, আমি তোদের শান্তি দিব, আমি তোদের স্থান দিব, আমি নরকে স্বর্গরাজ্য স্থাপিত ক'রে দিব"—"আমি পরম কারণ। অনন্ত কোটি দেবতা, ইন্দ্র, চন্দ্র, বরুণ, ব্রহ্মজ্যোতি, শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গজ্যোতি, সেই পরম পুরুষ শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীকৃষ্ণের সত্তা—আমিই সব,"—"কত ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, কৃষ্ণ,

---

*সত্যানুসরণ—শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীহস্ত-লিখিত পুস্তিকা—ছোট-ছোট কথায় সত্যের স্বতঃ-উৎসারিত সহজ প্রকাশ। ইহার সম্বন্ধে গ্রন্থের পরবর্তী খণ্ডে আলোচনা করা হইবে।

অমিয়-বাণী—শ্রীঅশ্বিনীকুমার বিশ্বাস সংকলিত—শাস্ত্র ও দর্শনাদি-সম্বন্ধে শ্রীশ্রীঠাকুরের যৌবনারম্ভের কথোপকথন-গ্রন্থ। এই পুস্তকের ভূমিকায় বর্ণিত শ্রীশ্রীঠাকুরের দীক্ষা-প্রসঙ্গটি গ্রন্থের পরিশিষ্টে উদ্ধৃত করা হইল।

পুণ্যপুঁথি—শ্রীশ্রীঠাকুরের মহাভাবসমাধি-অবস্থার বাণী-সঙ্কলন। গ্রন্থের চতুর্দশ অধ্যায়ে এই প্রসঙ্গে আলোচনা করা হইল।

বুদ্ধ, আল্লা, খোদা, যীশু—কোটি-কোটি অবতার আমি সব হয়েছিলাম—সব হচ্ছে আমার অবিরাম গতি,"—প্রভৃতি বাণীগুলি পাঠ করিবার পর, আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধি দ্বারা যতটুকু সম্ভব, বাণীর বক্তার প্রকৃত স্বরূপটি আনুমান করিতে কিছুই আর বাকী রহিল না। এতদিনে আমার মনের কোণে সঞ্চিত কতকালের জমাটবাঁধা অন্ধকার—দুঃখ দৈন্য, সংশয় সংকোচ, অবসাদ বিষাদ কোথায় যেন চিরতরে বিলীন হইয়া গেল। আমার এতদিনের ভারাক্রান্ত হৃদয় আশা ও উৎসাহের দিব্য প্রেরণায় আনন্দোদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। প্রশ্নশূন্য হইয়া আমি নিশ্চিন্ত হইলাম।

এদিকে পূর্বনির্দিষ্ট কুলগুরুর দীক্ষাগ্রহণের তারিখ নিকটবর্তী হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু আমি সে-সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নীরব থাকিয়া আশ্রমের পুস্তকপাঠেই দিন কাটাইতেছি। ইহাতে আমার স্ত্রী অতীব ব্যাকুল হইয়া সংকল্পিত দীক্ষাগ্রহণকার্য্য সত্বর সম্পন্ন করিবার জন্য আমাকে সবিশেষ পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন। এ-ব্যাপারে তাঁহার এইরূপ অধীর আগ্রহ প্রকাশের কারণ—তিনি নিজেও আমার সঙ্গে ইষ্টমন্ত্র গ্রহণ করিবেন বলিয়া মনে মনে স্থির সংকল্প করিয়া রাখিয়া ছিলেন। এই অবস্থায় তাঁহার নিকট তখন আপন মনোভাব সানন্দে ব্যক্ত করিয়া বলিলাম,—'আমাদের পরম সৌভাগ্য, এতদিনে আমি আকাঙ্ক্ষিত সদ্‌গুরুর সন্ধান পাইয়াছি। তিনি পাবনা-হিমাইতপুর আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকুলচন্দ্র। ইঁনিই আমাদের পরমারাধ্য ইষ্টদেব।' অতঃপর দুই-এক দিনের মধ্যে—বঙ্গাব্দ ১৩৩০ সালের ২৮শে শ্রাবণ সোমবার মধ্যাহ্নকালে আমরা স্বামী-স্ত্রী উভয়ে পূর্বোক্ত প্রচারক পূজনীয় ঋত্বিক্ শ্রীত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী মহাশয়ের নিকট সৎমন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণপূর্বক পরমপ্রেমময় শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকুলচন্দ্রকে শ্রীগুরুপদে বরণ করিয়া ধন্য হইলাম।

জীবনদেবতার সন্ধান পাইয়াছি। মনে আর আনন্দ ধরে না। প্রাণ অস্থির হইয়া উঠিল—কবে তাঁহাকে দেখিব। ১৩৩০ বঙ্গাব্দের আশ্বিন মাস। এই সময় সংবাদ পাইলাম, ঠাকুরের জননীদেবী তাঁহার পিতৃস্বসার (গোলকপুরের রানীমাতার) বাসভবনে ময়মনসিংহ সহরে আসিতেছেন। আনন্দে অধীর হইয়া আমরা উভয়ে যথাকালে মাতৃদেবীর শ্রীচরণে গিয়া উপস্থিত হইলাম। আমাদের পাইয়া মা কি খুসীই না হইলেন! তাঁহার প্রাণ জুড়ানো কথাবার্তায় আমরা অপার শান্তিলাভ করিলাম। এই সময় আমরা মাতৃদেবী সকাশে শ্রীশ্রীঠাকুরের আশ্রমে আমাদের জীবনযাপনের ঐকান্তিক অভিপ্রায় নিবেদন করিলে, তিনি স্নেহকোমলকণ্ঠে বলিলেন,—"তোদের কোলে কাঁচ শিশু ; ও আর একটু বড় হোক ; আরও কিছুদিন পরে বরং যাবি। ওখানে যে খুব দুঃখ-কষ্ট সহ্য ক'রে থাকতে হয়। আচ্ছা, দিনকয়েক পরেই আমি আশ্রমে যাচ্ছি। ওখানে গিয়েই অনুকুলের কাছে আমি তোদের কথা বলবো।"

এদিকে যতই দিন যাইতেছে, ঠাকুর-দর্শনের বিলম্ব আমার নিকট ততই অসহ্য হইয়া উঠিতেছে। আর কালক্ষেপ করিতে না পারিয়া অবশেষে একদিন আমি একাকীই আশ্রমে গিয়া উপস্থিত হইলাম। সেদিনটি ছিল ১৩৩০ বঙ্গাব্দের ১০ই পৌষ। তখন বড়-দিনের ছুটি। ঠাকুরের পূত-পাদপীঠতলে সারাটা ছুটি যেন এক নিমেষে কাটিয়া গেল। সে দিব্য সংস্পর্শের কি অনির্বচনীয় আনন্দ! আশ্রমে যে-কয়টি দিন ছিলাম, অহর্নিশ তাঁহার পাদমূলে বসিয়া তৃষাতুরের মত তাঁহার বচনসুধা পান করিয়া অসীম তৃপ্তি-সম্ভোগে ভরপুর হইয়াছি, আমার আজন্ম-তাপিত পরাণ শীতল করিয়াছি।

আমার ছুটি ফুরাইয়া গেল। বাড়ী ফিরিতে হইবে। যাত্রার পূর্বক্ষণে ঠাকুর-চরণে বিদায় নিতে গিয়াছি। তাঁহাকে ছাড়িয়া যাইতে প্রাণ কিছুতেই চাহিতেছে না, দেহমন অবশ হইয়া পড়িতেছে। তাঁহার আসনের সন্নিকটেই দাঁড়াইয়া আছি। দেখিলাম, আমার প্রতি তাঁহার দৃষ্টি স্থিরনিবদ্ধ। মমতা-জড়ানো সে করুণ চাহনী আমাকে পাগল করিয়া তুলিল। মনে হইল, বিস্ফারিত লোচনের সেই অকম্পিত স্নেহসিক্ত দিব্য দৃষ্টিপাতে তিনি আমার বিগত লক্ষ-লক্ষ জীবন, আমার বর্তমান ও ভবিষ্যৎ জীবন সকলই নিরীক্ষণ করিতেছেন, আমার সমগ্র সত্তাকে সুরলোকের সুধাধারায় অভিস্নাত করিয়া দিতেছেন। তাঁহার দরদভরা সজল আঁখিতারা আমাকে যেন অব্যক্ত ভাষায় এই কথাই বারংবার সুস্পষ্টরূপে জানাইয়া দিতেছে,—তিনি আমার জন্মজন্মান্তরের চিরসাথী, তিনি আমার চির-বন্ধু, তিনি আমার প্রিয়পরম—সারা দুনিয়ায় তিনিই আমার একমাত্র আপনার জন।

স্বর্গীয় বিভামণ্ডিত ঠাকুরের সেই ভাবগম্ভীর প্রশান্ত বদনমণ্ডলের প্রতি অপলকনেত্রে চাহিয়া রহিয়াছি, এমন সময় কি এক অলৌকিক আনন্দের উচ্ছল আবেগে অভিভূত হইয়া আমি যেন আত্মহারা হইয়া পড়িলাম, পুলক-স্পন্দনে আমার সর্বশরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল, চক্ষু-যুগল অশ্রুভারাক্রান্ত হইল, রোরুদ্যমান অবস্থায় সংজ্ঞাহারা হইয়া আমি ভূতলে পড়িয়া গেলাম। আমার তৎকালীন মানসিক অবস্থাটা যেন—

নিমেষের দেখা চোখে-চোখে তারে, আপনা হারায়ে ফেলেছি।
কহিতে গিয়ে কথারই কথা, আমি মরম খুলিয়ে দিয়েছি॥
কি ছিল লুকানো নয়নে, তার অমিয় মধুর বচনে
আমি দেখিয়া শুনিয়া ভাবিয়া ভাবিয়া কি জানি কি যেন হয়েছি।
সে যে গো আমার সাধনা-কামনা, মনপ্রাণ তারে সঁপেছি॥

পূজ্যপাদ মহারাজ অনন্তনাথ রায় * আমার নিকটেই দাঁড়াইয়া ছিলেন, তিনি আমাকে বুকে তুলিয়া লইলেন। তাঁহার সস্নেহ শুশ্রূষায় বেশ কিছুক্ষণ পরে

*শ্রীশ্রীঠাকুরের তৎকালীন অন্যতম প্রধান পার্ষদ।

সম্বিৎ ফিরিয়া পাইয়া আমি কিঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইলাম। ঠাকুর তখন ছল-ছল নয়নে বাষ্পজড়িত অস্ফুট কণ্ঠে, "এবার যান, আবার চ'লে আসবেন"— কোনমতে শুধু এই কথা কয়টি বলিয়া সেবারের মত আমাকে বিদায় দিলেন। অবসন্ন দেহমন লইয়া আশ্রমের অন্যান্য যাত্রীদের সহিত আমিও স্টীমার-ঘাটের দিকে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইলাম, আর ক্ষণে ক্ষণে তাঁহার প্রাণকাড়া করুণ চাহনী, তাঁহার অমিয়-মধুর বাণী, তাঁহার পুণ্য পরিবেশের কত কথা মনে উঠিয়া আমাকে পাগল করিতে লাগিল। প্রিয়পরমের বিরহলগ্নের সেই অনির্বচনীয় অনুভূতি কোনদিন ভুলিতে পারিব না, উহা আমার ইহজীবনের মধুর বেদনাময় অক্ষয় অমূল্য সম্পদ, আমার অনন্ত জীবন-পথের পরম পাথেয়।

কাছারী খোলার সঙ্গে-সঙ্গে আমিও বাড়ী ফিরিলাম। কিন্তু কবে আবার আশ্রমে গিয়া ঠাকুরের শ্রীচরণতলে নিয়তরূপে বাস করিব, মনে সর্বক্ষণ এখন শুধু এই চিন্তাই চলিতে লাগিল। এই অবস্থায় আপন মনস্কামনা পরিপূরণের উদ্দেশ্যে তদনুকূল ব্যবস্থাদি যত সত্বর সম্ভব সমাধা করিবার কাজে আত্মনিয়োগ করিলাম। মক্কেলদের মামলা-মোকদ্দমার পরিচালন-ভার বন্ধুবর উকীল শ্রীউমেশচন্দ্র সেন এম্-এ, বি-এল মহাশয়ের হস্তে অর্পণ করিলাম এবং বাড়ীর বিষয়-সম্পত্তির দায়িত্ব প্রভৃতি সকল ব্যাপার আপন সহোদর ভ্রাতাগণকে বুঝাইয়া দিলাম। প্রায় একমাস কাল মধ্যে অত্যাবশ্যক সমুদয় ব্যাপারের বিধিব্যবস্থার কাজ যথাসম্ভব সমাপ্ত করিয়া বঙ্গাব্দ ১৩৩০ সালের ফাল্গুন মাসের শেষভাগে স্ত্রী ও শিশুপুত্রটিকে সঙ্গে লইয়া একদিন প্রত্যূষকালে ময়মনসিংহ সহর হইতে যাত্রা করিয়া পাক্সী হইয়া পাবনার হিমাইতপুর পল্লীতে ঠাকুরবাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। তদবধি দয়াল ঠাকুরের শ্রীচরণচ্ছায়ায় তাঁহাকেই কেন্দ্র করিয়া আমার জীবন আবর্তিত হইতেছে।

আমার আশ্রম-জীবন গ্রহণের কয়েক বৎসর পূর্বে বঙ্গাব্দ ১৩২৫ সালে ঠাকুরের ত্রিংশত্তম জন্মতিথি উপলক্ষে কুষ্টিয়ায় বিখ্যাত শ্রীশ্রীবিশ্বগুরু মহামহোৎসব মহাসমারোহে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। ১৩২১ সাল হইতে ১৩২৬ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ পাঁচ বৎসর ধরিয়া বহুলোক ঠাকুরের অভূতপূর্ব ভাবসমাধি-অবস্থা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। ঠাকুর তাঁহার কীর্তনের দল লইয়া নানা স্থানে কয়েক বৎসর পরিভ্রমণ করতঃ জনসাধারণের মধ্যে পুণ্য সত্যনাম বিতরণ করিয়া আসিয়াছেন। এইরূপ নানাভাবে ঠাকুরের কথা তখন দেশময় ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। ফলে, বঙ্গের আবালবৃদ্ধবনিতা অনেকের মুখেই তখন হিমাইতপুরের ঠাকুরের নাম কীর্তিত হইতেছিল। যৌবনের উদ্দাম আবেগে ঠাকুর তখন সবেমাত্র তাঁহার বিরাট বিশ্বহিত যজ্ঞের অনুষ্ঠান আরম্ভ করিয়াছেন। সে-সময় সপরিবারে আমরা মাত্র জনকয়েক কর্মী নিয়তরূপে আশ্রমে বাস করিতে আরম্ভ করিয়াছি। বন-জঙ্গলের ফাঁকে ফাঁকে তখন সেখানে ধীরে ধীরে দুই একটি করিয়া ক্ষুদ্রকায় কর্মপ্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিতেছে।

তদবধি নানা স্থান হইতে দলে-দলে লোক আসিয়া ঠাকুরের কাছে জুটিতে লাগিল। আত্মীয় আসিল, অনাত্মীয় আসিল, স্বদেশী আসিল, বিদেশী আসিল, স্বজন আসিল, পরজন আসিল,—কত আসিল, আসিতেই লাগিল। দেখিতে দেখিতে দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক, সাহিত্যিক, রাজনীতিক, অধ্যাপক, চিকিৎসক, শিল্পী, ব্যবসায়ী—সত্যান্বেষী শত শত শিক্ষিত এবং শান্তিকামী শত শত ব্যথিতের সমাগমে তাঁহার ক্ষুদ্র পল্লীভবন জনকোলাহলময় হইয়া উঠিল। শরণার্থী সবাইকে ঠাকুর অবারিত আলিঙ্গনে গ্রহণ করিলেন। তাঁহার জ্ঞানের আলোকে কতজনের জ্ঞানচক্ষু উদ্দীপ্ত হইল। তাঁহার প্রাণের পরশে কতজনের প্রাণ সঞ্জীবিত হইল। কতজনের মনের কত কথা—সুখ-দুঃখ, আশা-নৈরাশ, হর্ষ-বিষাদের কত কাহিনী তাঁহার বুকে আসিয়া বাসা জুড়িল।

ঠাকুরের সস্নেহ আকুল আহ্বানে সেবকগণ তখন তাঁহারই নির্দেশক্রমে তদীয় লোককল্যাণকর জনজাগরণী ভাবরাজির প্রচার ও বাস্তব রূপায়ণে আত্মনিয়োগ করিল। ঠাকুরের প্রেরণাদীপ্ত পরিচালনায় এবং কর্মিবৃন্দের দুশ্চর তপস্যায় তাঁহারই পল্লীবাটিকায় ধীরে ধীরে নানা কর্মপ্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিতে লাগিল। যেখানে নীতি ছিল না, সমাজ ছিল না—ব্যভিচারের এমনি লীলাস্থলে, মরুভূমিতে মরূদ্যান সৃষ্টির ন্যায়, নরকে স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠার ন্যায় কি অদ্ভুত পরিবর্তনই না সংঘটিত হইল! তাঁহার অক্লান্ত সাধনায় হিংস্রশ্বাপদসঙ্কুল অরণ্যানীর ভিতর মানব-সভ্যতার কত অভিনব বিচিত্র প্রতিষ্ঠান মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া উঠিল।—বিজ্ঞানকেন্দ্র, শিল্পকেন্দ্র, তড়িৎভবন, কলাভবন, চিকিৎসালয়, মুদ্রণালয়, গ্রন্থশালা, নাট্যশালা, সাধনমন্দির, বিদ্যামন্দির, রাস্তাঘাট, হাটবাজার, ঘরদরজা, দালানকোঠা,—কত কিছু! ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত সেই 'পাবনা সৎসঙ্গে'র কথা কে না জানে! ইহা পাবনা জিলার, তথা সমগ্র বঙ্গদেশ, এমনকি ভারতেরও অন্যতম দর্শনীয় বস্তু বলিয়া কীর্তিত হইয়াছে।

কালের বিচিত্র গতি!—বাংলার ও ভারতের গৌরব পাবনার সেই 'সৎসঙ্গ' মহাকেন্দ্র আর নাই। লক্ষ-লক্ষ মানুষের পুণ্য তীর্থভূমি, মানব-সভ্যতার সুমহান পাদপীঠ সেই জীবন্ত পল্লীপ্রতিষ্ঠান আজ মহাকালের যাদুশালার অন্তর্গত। ঠাকুর স্বেচ্ছায় তাহা পরিত্যাগ করিয়া আজ প্রায় বিশ বৎসর যাবৎ দেওঘর বৈদ্যনাথধামে অবস্থান করিতেছেন। সহস্র সহস্র লোক যেখানে নিরন্তরূপে বাস করিত, সারা বৎসর যেখানে প্রবাসী বিদেশী কত অসংখ্য লোকের সমাগম হইত,—কত মনীষী, কত পর্যটক, কত সাংবাদিক, জিজ্ঞাসু কত ব্যক্তি মধুপগুঞ্জের মত যে অপূর্ব প্রতিষ্ঠান-মধুচক্রে অবিশ্রান্ত গুঞ্জন তুলিয়াছে, দিবারাত্র সমানভাবে যেখানে কর্মের প্রবাহ তুমুল বেগে চলিয়াছে, জীবনের জ্যোতি যেথায় বিদ্যুৎ-ছটার মত দিকে দিকে বিচ্ছুরিত হইয়াছে, অগণ্য গৃহবিপণিপূর্ণ স্বহস্ত-নির্মিত অমরাবতী-সদৃশ সে পল্লীনগরী মৃৎপাত্রের মত

মুহূর্তে ফেলিয়া দিয়া বিরাট কর্মী পুরুষসিংহ আবার অবতীর্ণ হইয়াছেন কর্মের নব পটভূমিকায়—নবীন রণাঙ্গনে—নূতন উদ্যমে।

বৈদ্যনাথধামে আসিয়াও কতিপয় বৎসরের মধ্যেই ঠাকুর তাঁহার স্বভাব-সুলভ অপূর্ব প্রেম, প্রেরণা ও প্রচেষ্টার প্রভাবে যে অত্যাশ্চর্য কান্ড করিলেন, সে-কথা ভাবিতে গেলেও বিস্মিত হইতে হয়। স্বদেশ-ত্যাগের সময় শুধুমাত্র একটি গাড়ু ও একখানা গামছা লইয়া পরিবার-পরিজন ও শিষ্যবর্গ সহ বিদেশে বিভূঁইয়ে আসিয়া পরের আবাসে তিনি কোনমতে মাথা গুঁজিয়া বসিয়াছিলেন। বাংলার তখন মহাদুর্দিন। ছিন্নমূল স্বদেশবাসীরা ঐ সময় দলে-দলে তাঁহার চরণতলে ছুটিয়া আসিতে লাগিল বৈদ্যনাথধামে। নিজে নিঃসম্বল উদ্বাস্তু হইয়া এবং এমনকি, পুনর্বাসন-ব্যাপারে সরকারের নিকট হইতে একটি পয়সাও সাহায্য না লইয়া এই মহাসংকটমুহূর্তে আশ্রয়প্রার্থী কাহাকেও বিমুখ করিলেন না ঠাকুর, সবাইকে অভয়দানে পরম স্নেহে তিনি আপনার বুকে তুলিয়া লইলেন। এই সকল বিপন্ন নিরন্ন কাঙালদের লইয়াই কাঙালের ঠাকুর আবার সুরু করিলেন, তাঁহার বিশ্ব সেবাযজ্ঞের বিরাট অভিযান। তাঁহার সার্থক পরিচালনায় ও নিবেদিতপ্রাণ সেবকবৃন্দের অকুণ্ঠ শ্রমে এদিকে ওদিকে রচিত হইল কর্মকেন্দ্রের কত সুরম্য হর্ম্য, সংগৃহীত হইল কত জায়গাজমি ঘরবাড়ী, কত অভিনব যন্ত্রপাতি, কত বিচিত্র সাজসরঞ্জাম, আরম্ভ হইল নব নব পরিকল্পনার রূপায়ণ, ভারত ও বহির্ভারতের নানা স্থানের কত নরনারীর সঙ্গে স্থাপিত হইল তাঁহার দরদী অন্তরের গভীর প্রেমের নিবিড় বন্ধন, নিত্য সমাগম ঘটিতে লাগিল দেশবিদেশের কত অসংখ্য জ্ঞানী ও গুণিগণের—দেখিতে দেখিতে তাঁহার সদ্য-অধ্যুষিত বিহার-ভূমির শূন্য উষর অঞ্চলটি প্রাণস্পন্দনে সঞ্জীবিত ও কর্মকোলাহলে মুখরিত হইয়া উঠিল।

ঠাকুর অনুকুলচন্দ্রের কথা বলিতে যাইতেছি,—আমার পক্ষে অসাধ্য এই প্রয়াসে মনে হয়—"তিতীর্ষুর্দুস্তরং মোহাদুডুপেনাস্মি সাগরম্"। তাঁহার কথা বলিতে গিয়া পার পাই না। মাতৃগর্ভে থাকিতেই যিনি 'নাম' করিতেন, অতি বাল্য হইতেই সাধন-জগতের চরমাবস্থার সাক্ষাকারের অনুভূতিনিচয় সহজভাবে যাঁহার জীবনে প্রকট হইয়া পড়িয়াছে, আশৈশব যিনি লোকসঙ্গ ভালবাসেন, আজীবন যিনি মানব-মনের কত জটিল রহস্য ভেদ করিয়া চলিয়াছেন, দুনিয়ার সর্ববিধ সমস্যার অভ্রান্ত সমাধান স্বীয় বিচিত্র অভিজ্ঞতা ও তীক্ষ্ণ অন্তর্দৃষ্টির বলে নখদর্পণে রাখিয়া যিনি অনুক্ষণ নিঃসংশয়চিত্তে দৃঢ়কণ্ঠে তাহা ঘোষণা করিতেছেন, 'আপনি আচরি ধর্ম" যিনি অপর সবাইকে তাহা সর্বক্ষণ পরম ধৈর্যের সঙ্গে শিক্ষা দিতেছেন, যে দরিদ্র পল্লীসন্তান সেবা ও চরিত্রমাহাত্ম্যে অগণিত মানবের হৃদয়রাজ্যে তাহাদের স্বপ্রতিষ্ঠিত সিংহাসনে সার্বভৌম সম্রাটের আসন অধিকার করিয়া আছেন, আর্য-সভ্যতার মূর্ত জীবন্ত প্রতীক, জীবন-বৃদ্ধির অমৃতমন্ত্রের উদ্গাতা সেই ক্ষণজন্মা মহাপুরুষের জীবন-কাহিনীর কোন্

কথা রাখিয়া কোন্ কথা বলিব, কোন্‌টা আগে বলিব, কোন্‌টা পরে বলিব, দিশা পাইয়া উঠি না। বাল্যাবধি যাঁহার সকলের প্রতি একান্ত আপন ভাব, পশুপক্ষী, কীটপতঙ্গ, উদ্ভিদাদির দুঃখেও যাঁহার অসহ্য বেদনাবোধ, সহস্র সহস্র মানবের অজ্ঞান-অন্ধকার দূরে করিয়া যিনি তাহাদের অন্তর জ্ঞানালোকে সমুদ্ভাসিত করিতেছেন, কত জনে কত ভাবে যাঁহার অজস্র করুণানির্য্যাসে নিষিক্ত হইয়া শান্ত, শীতল ও সার্থক হইতেছে, সমস্যাপীড়িত ব্যথিত বিক্ষুব্ধ মহাজাতির বুকে যাঁহার নূতন বিপ্লবী আন্দোলন নবীন চেতনার বিপুল প্লাবন আনিয়াছে— ক্ষুদ্র আমি তাঁহার ইয়ত্তা কী করিয়া পাইব?

শত শত মানুষ লইয়া ঠাকুর প্রতিদিন যে কী করিতেছেন সংবাদপত্রের স্তম্ভে তাহা প্রকাশিত হয় না। তাঁহার পুণ্য স্পর্শে কত অভিশপ্ত শাপমুক্ত হইয়াছে, কত বিভ্রান্ত পথ পাইয়াছে, কত সর্ব্বস্বান্ত ঋদ্ধিমান হইয়াছে, কত হতাশ প্রাণে যে আশার আলো জ্বলিয়াছে, মানুষের ইতিহাসে তাহা কোনদিনই লিপিবদ্ধ হইবে না। তাঁহার সস্নেহ সুকৌশল অপূর্ব পরিচর্য্যায় কামদহন-জর্জরিত কত তাপিত প্রাণ যে প্রেমচন্দনচর্চিত স্বচ্ছ শান্ত ও শীতল হইল, ক্রোধে অগ্নিশর্মা কত উদ্ধত মানব যে ধীর গম্ভীর প্রকৃতিস্থ হইল, দুরাকাঙ্ক্ষ কত লোভী লালসা ত্যাগ করিল, কত দাম্ভিক বিনয়ী হইল, কত হিংসুক প্রেমিক হইল, কত বিষয়াসক্ত নির্লিপ্ত হইল, কত ভোগী ত্যাগী হইল,—কে তাহার সংখ্যা করিবে! ধনী তাঁহার সান্নিধ্যে আসিয়া দীন ও দাতা হইল, নির্ধন তাঁহার সংস্পর্শে দৈন্য ও দারিদ্র্যদোষমুক্ত হইয়া উঠিল। তাঁহার প্রেরণায় কত অকবি কবি হইয়াছে, অবৈজ্ঞানিক বৈজ্ঞানিক হইয়াছে, মূর্খ পণ্ডিত হইয়াছে, অলস কর্মী হইয়াছে, মূক মুখর হইয়াছে, তাঁহার প্রভাবে কত অমানুষ যে মানুষ হইয়াছে, তাহার কি কোন সীমা সংখ্যা আছে! ঠাকুর বক্তৃতামঞ্চে দাঁড়াইয়া ভাষণ দেন না, বেতার-যোগে তাঁহার বাণী গৃহে গৃহে ঘোষিত হয় না সত্য, কিন্তু, লোকচক্ষুর অন্তরালে নিরালায় নিভৃতে মানুষ-তৈয়ারীর যে অপূর্ব কারখানা তিনি স্থাপন করিয়াছেন, তাহা এ যুগে বস্তুতই এক অভাবনীয় অভিনব ব্যাপার। জীবনের প্রতিটি মুহূর্তের প্রাণপাত পরিশ্রমে তিনি আজ যে আদর্শ মানব-মহাগোষ্ঠীর ভিত্তি পত্তন করিয়া যাইতেছেন, তাহা যে একদিন সত্য শিব ও সুন্দরের মহতী প্রতিষ্ঠায় সার্থক সাফল্য লাভ করিবে, এ কথা নিঃসন্দেহেই বলা যাইতে পারে।

দেশ জুড়িয়া আজ ঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের প্রতিষ্ঠা। তাহা কিসের জন্য? কেহ বলিবেন—তিনি একজন মস্তবড় সমাজ-সংস্কারক। কেহ বলিবেন—তাঁহার মত প্রবীণ বিচক্ষণ দার্শনিক কয়জন আছেন! কেহ প্রচার করেন—তিনি একজন প্রকাণ্ড সাহিত্যিক। কেহ আখ্যা দেন—তিনি অমিত প্রতিভাশালী সর্বশাস্ত্রবিদ্ মহা পণ্ডিত ব্যক্তি। কেহ ভাবেন—তিনি ধর্মের মূর্ত অবতার-পুরুষ।—ইত্যাদি কত কিছু।

অনুকূলচন্দ্রের জীবনবৃত্ত নিরীক্ষণ করিয়া তাঁহার সম্বন্ধে এক কথায় শুধু ইহাই বলিতে ইচ্ছা হয়—তিনি পরমপিতার বোধবুদ্ধ ভাবদীপ্ত প্রেমমুগ্ধ সন্তান, প্রিয়পরমের প্রতি প্রেমের উচ্ছল আকর্ষণে জীবকুলের দরদী বন্ধু,—আত্মসত্তাবোধে প্রতিপ্রত্যেকের পরিপোষণ-মহাযজ্ঞের মহান ঋত্বিক্—এ যুগের মহাপরিপূরণকারী তিনি। তাই তাঁহাকে আশ্রয় করিয়া জাগিয়া ওঠে মানুষের সুপ্ত জীবন, তাঁহার স্নিগ্ধ স্নেহস্পর্শে জ্বলিয়া ওঠে তীক্ষ্ন অন্তর্দৃষ্টি, তীব্র কর্মপ্রেরণা, তাঁহার সামীপ্য লাভে মানুষের ক্ষুদ্র জীবন সার্থক হইয়া ওঠে বিরাটের আলিঙ্গনে—ব্যক্ত হইতে অব্যক্তের সন্ধানে।

লোকোত্তর চরিত্রের আবির্ভাব জগতে সর্বদা ঘটে না, কদাচিৎই তাহা সম্ভব হয়। জানি না, পূর্বজন্মের কি অসীম সুকৃতির ফলে, প্রিয়পরমের শ্রীপদাশ্রয় লাভের সৌভাগ্য আমার ঘটিয়াছিল! তাই তো যৌবনারম্ভ হইতে তাঁহার বৈচিত্র্যময় জীবনের অপূর্ব লীলাবৈভব প্রাণ ভরিয়া কত উপভোগ করিলাম!—তাঁহার দেবদুর্লভ চরিত্র ও অতিমানবীয় ব্যক্তিত্বের স্পর্শে ধন্য হইলাম!—তাঁহার করুণাধারায় এ মরু-জীবন স্নিগ্ধ ও সঞ্জীবিত হইল! যতই দিন যাইতেছে, অন্তরের অন্তর দিয়া ইহাই সুনিশ্চিতরূপে উপলব্ধি করিতেছি, এ হেন পরম সম্পদ্ একাকী উপভোগ করিবার বস্তু নয়। সবারই জন্য যাঁহার আবির্ভাব, সবাইকে লইয়া যাঁহার জীবনের জয়যাত্রা, সবারই স্বার্থে যাঁহার বিচিত্র মঙ্গল-আয়োজন, সবারই দরদী সে-বিশ্ববান্ধবের শুভ আগমন-বার্তা তাঁহারই আত্মস্বরূপ জগদ্বাসীর কাছে পরিবেশণ করিতে না পারিলে প্রাণে শান্তি কোথায়! স্বস্তি কোথায়! আর একটি কথা। জীবন্ত আদর্শ সদ্গুরুরূপী মহামানবের পরমপবিত্র দিব্যমূর্তি ভক্তিভরে দর্শন করিলে, তাঁহার শ্রীমুখ-নিঃসৃত অমিয় বচন সশ্রদ্ধচিত্তে শ্রবণ করিলে, তাঁহার স্বর্গীয় হাবভাব চাল-চলন নিবিষ্টমনে প্রত্যক্ষ করিলে, তাহার জীবন-বৃদ্ধির অনুশাসনবাণী নিষ্ঠার সহিত অনুসরণ করিলে, মানুষমাত্রেই পরমমঙ্গলের অধিকারী হইতে পারে—স্বয়ং এই শাশ্বত সত্যের চির-অনুরাগী বলিয়া, এতজ্জাতীয় মহাপুরুষের চরিতকথা সর্বসাধারণের গোচরার্থে প্রকাশ করা আমি আমার অপরিহার্য অবশ্যকরণীয় কর্তব্য বলিয়া মনে করি। তাই আমার অশেষ দীনতা ও অযোগ্যতা সত্ত্বেও এই কার্যে ব্রতী না হইয়া পারিলাম না।

বিরোধ, বিভেদ ও বৈষম্যমূলক নানা জীবন-সমস্যার সার্থক সমাধানের পথে প্রতিটি জনকে এক অদ্বিতীয় ঈশ্বর-প্রাপ্তির চরম লক্ষ্যে পৌঁছাইবার জন্য ঠাকুরের জীবন-ভর কী কঠোর সাধনা! আর তাই, স্বভাবতই তাঁহার জীবনের এক বৃহৎ অংশ লোকচক্ষুর অন্তরালে গুপ্তরূপে ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে। দেশ-বিদেশের লক্ষ লক্ষ মানবের বাঁচা-বাড়ার মর্মে মর্মে তাঁহার অমর জীবনস্রোত অনুপ্রবিষ্ট হইয়া প্রতিটি প্রাণে অসীমের সুর-ঝংকার তুলিয়া অধরার উদ্দেশে

ধারায় প্রবাহিত হইতেছে। অসাধারণ বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত এইরূপ একটি বিশাল ও সুগভীর জীবনের যৎকিঞ্চিৎ পরিচয় প্রকাশ করিতে গেলেও, আমার মনে হয়, বহু একনিষ্ঠ সাধকের সুদীর্ঘকালব্যাপী, সুপরিকল্পিত এবং সুপরিচালিত সম্মিলিত প্রচেষ্টার প্রয়োজন। তবু, আমার অন্তরের আকুতি, তাঁহার বিরাট বিশাল ব্যক্তিত্ব আমার এ ক্ষুদ্র জীবনে যতটুকু হৃদয়ঙ্গম করিলাম, তাঁহার অনন্যসাধারণ বিপুল বিচিত্র কার্যকলাপ এ চর্মচক্ষে যাহা দেখিলাম, তাঁহার জগন্মঙ্গলকর উদার ভাবরাজি স্বীয় স্থূল বুদ্ধিতে যৎসামান্য যাহা উপলব্ধি করিতে পারিলাম, তাহার এক তিলও যদি বিশ্বসভায় প্রকাশ করিতে পারিতাম! যে আধ্যাত্মিক সাধনা ও চারিত্রিক প্রেরণাবল থাকিলে ঈদৃশ বিশ্বপ্রেমিক মহামানবের প্রকৃত স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারা যায়, তাহার এক কণিকাও আমার নাই। তাই, প্রকৃত সাধকজনোচিত ও ভক্তজনসুলভ অনুভূতির আলোকে আমি তাঁহার জীবন ও কর্মকে প্রত্যক্ষ করিতে পারি নাই। সাধারণ মানুষের নিতান্ত সংকীর্ণ ও সীমাবদ্ধ বুদ্ধিতে তাঁহার চরিত্র ও কার্যকলাপ যতটুকু সম্ভব দেখিতে ও বুঝিতে পারিয়াছি, তাহারও অতি সামান্যই এই গ্রন্থে প্রকাশ করা সম্ভব হইয়াছে, তাহাতেও আবার অনিবার্যভাবেই কত স্থানে কত অপূর্ণতা অস্পষ্টতা ও ত্রুটিবিচ্যুতি যে রহিয়া গেল, তাহা বলিবার নয়!

আমার দৃষ্টি ও বোধের বাহিরে বহু বহু জীবনের মাঝে এই মহাজীবনের যে বিরাট ও গভীর অংশ পড়িয়া রহিল, যদি কোনও দিন তাহার কিঞ্চিৎমাত্রও লোকসমক্ষে প্রকাশিত হয়, তবেই তাহার অখণ্ড স্বরূপের কিছুটা যথার্থ পরিচয় উদ্‌ঘাটিত হইতে পারে। আমার জীবন-সর্বস্ব পরমপ্রেমময় শ্রীশ্রীঠাকুরের ঐরূপ একখানি সর্বাঙ্গসুন্দর সার্থক চরিতগ্রন্থের প্রকাশনার আশায় আমি জন্মজন্মান্তর উদ্‌গ্রীব উন্মুখ হইয়া থাকিব।

৬ই আশ্বিন
১৩৭৩ বঙ্গাব্দ
তালনবমী

বিনীত
দীন গ্রন্থকার